প্রদীপ

সচিত্র মাসিক পত্র।

প্রথম ভাগ।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম্,এ সম্পাদিত।

২১।১ সুকীয়া ষ্ট্রীট "প্রদীপ" কার্য্যালয়
হইতে
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১৩০৪—১৩০৫।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

INDRA BROS
CALCUTTA
67, BAGH-BAZAR STREET

TORN PAGES

সূচী।

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
...য় (সচিত্র কবিতা) ...	শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি,এ, ...	৩৮৩
জগদীশচন্দ্র বসুর প্রতি (সচিত্র)	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৭১
জগদীশচন্দ্র বসু (সচিত্র) ...	সম্পাদক	ঐ
প্রফুল্লচন্দ্র রায় (সচিত্র) ...	,, ...	১০৩
...য্যা (কবিতা)	শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি. এ ...	২৪৬
...পুরী	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস এম্. এ	২৬১
কবিতা)	শ্রীপূর্ণচন্দ্র সেন	১১
১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে (সচিত্র) ...	শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত	৬
...মোহন বসু (সচিত্র) ...	শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী এম্. এ	৩৬৬
...র বিবাহ (সচিত্র)	শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় বি. এল ...	৫৫
...শ কেন নীল ? (কবিতা) ...	শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি. এ ...	১৫৮
কালকার স্কুলের ছেলেরা ...	শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাস	১৮২
...ত (কবিতা)	শ্রীনিত্যকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম্. এ ...	১
...র বিদ্যাসাগর (সচিত্র) ...	শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী এম্. এ	৩১১
... ...	শ্রীজগদানন্দ রায়	৩৫৮
... ...	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৩৮৭
...শোধ (গল্প)	শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়	২৩৩
...টি প্রার্থনা (কবিতা)	শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি. এ ...	২৮৬
...ন্ কাহিনী	শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বি. এ (কেম্ব্রিজ) ...	১৮৫
...কাল (উপন্যাস)	শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার ১৮,৭৬,১২৫,১৬৯,২০৩,২৫৪,৩৩২,৩৯১	
...টি প্রশ্ন	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ রায়	২৭৮
...প্তি স্বীকার ও সমালোচনা ...	... ...	২১৩, ৩৭২, ১৭৮
...টা মিষমী (সচিত্র)	সম্পাদক	১৫৬
...ী সমালোচনা সম্বন্ধে মন্তব্য ...	শ্রীরমণীমোহন ঘোষ বি. এল্	২২৩
...কে বিলাতে পাঠাইব কি ? ...	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	২৯২
...স্বপন্ (কবিতা)	শ্রীশরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী এম্, এ, বি, এল ...	২৮৬
...তি নির্ব্বাচন (সচিত্র) ...	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় এম্. এ ...	২৪৭
...ণা	৺ দীনেশচরণ বসু	১৭৭
...(সচিত্র)	শ্রীমাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১১, ১৪৪
...আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (সচিত্র) ...	সম্পাদক	
... ...	শ্রী...	

...ভ্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার

সূচী।

	লেখকের নাম	
...া	শ্রীমতী—	৩
...কুমার	শ্রীচন্দ্রশেখর কর বি. এ	৩
...সচিত্র কবিতা)	শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় এম্. এ ...	১
...পালের বক্তৃতা (কবিতা) ...	,, ...	—
...লেখক বর্গের প্রতি	সম্পাদক	১।
প্রথম ...বী (সচিত্র)	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় এম. এ	—
...ণা (কবিতা)	শ্রীবিনয়কুমারী ধর	১৫র
...য়ে সূর্য্যগ্রহণ	শ্রীঈশানচন্দ্র দেব বি. এ	২৮ট
...র সুখ	শ্রীজলধর সেন	১৭০, ২রাং
...প্র... খেয়াল (সচিত্র)	শ্রীগোবিন্দনাথ গুহ এম্. এ ...	২নয়,
...ছেন, উত্তর	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় এম্. এ	৩...
একটি ...সল বঙ্কিমচন্দ্র (সচিত্র)	শ্রীচন্দ্রনাথ বসু এম্. এ	২১৫
...ত ...ক্ষী (কবিতা)	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩৭।
...আ...ায় (গান)	,, ...	১৪...
...অ...জ্ঞান বা প্রকৃতি চর্চ্চা	... ...	১৫া,
...বিদ্রোহ (কবিতা)	শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী ...	১৫ল
...বিশেষ দ্রষ্টব্য	... ...	২১রা
...দ্ধদেব (কবিতা)	কুমারী লজ্জাবতী বসু	১০২।
...স্পতির কলঙ্ক	শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত বি. এ (কেম্ব্রিজ) ...	১৫০
...বেনামী চিঠি (গল্প)	শ্রীমতী রাধামণি দেবী	২৭৯
...মরিব কি বাঁচিব ?	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এম্. এ. বি. এল ...	২
...মনের প্রতি (কবিতা)	শ্রীমতী বিনয়কুমারী ধর	১০
...নুষ্যজাতির মৃত্যু	শ্রীমুরলীধর রায় চৌধুরী এম্ এ ...	১৯২
...য়াবাদ (কবিতা)	শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি, এ, ...	৯
...মাবাবু (গল্প)	শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়	৩৯
...ষমীজাতী (সচিত্র)	সম্পাদক	১৩৩
...ক্-বধিরের শিক্ষা (সচিত্র)	শ্রীযামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৫১
...য়েলী সাহিত্য	শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ...	১০৯
...য় আফ্রিকার দুটি অসভ্যজাতি (সচিত্র) ...	শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস	৩০৩
...না (কবিতা)	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৪৭
...া প্যারীমোহন (সচিত্র)	সম্পাদক	৩৩
...দ্রোহ আইন ও সমাজনীতি ...	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এম্ এ, বিএল ...	১৩৭
...গোপাল্ ভাণ্ডারকর (সচিত্র) ...	সম্পাদক	১...
...যদি ব...রিত	...বতা হরিদাস ভট্টাচার্য্য	
...ন্ধু মিত্র বাহা... (সচিত্র)		

TORN PAGES

সূচী।

বিষয়	লেখকের নাম
শব্দাভিজ্ঞান বা সঙ্কেত লিখন (সচিত্র) ...	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ ... ...
পল্টন (সচিত্র)	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি. এল. ৫৭,১০৭,১২২,১৪৮,
কবর্গের প্রতি নিবেদন	সম্পাদক ... ...
(কবিতা)	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ...
লা শৈল (সচিত্র)	শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি. এ ...
অশ্রু (সচিত্র গল্প)	শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ... ...
লাসের দুর্ব্বুদ্ধি (গল্প)	শ্রীমতী রাধামণী দেবী ... ...
গোপাল ভট্ট গোস্বামী	শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ৭৯,
...নী (গল্প)	শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় ... ...
পুরী	শ্রীনিখিলনাথ রায় বি. এ ... ২২০, ২৬...
কবির দয়াল সিংহ (সচিত্র)	সম্পাদক ... ...
...র সৈয়দ আহম্মদ খাঁ (সচিত্র) ...	সম্পাদক ২
...মোহাদকের নিবেদন	... ... ২
র বিবরাজদ্দৌল্লা (সচিত্র সমালোচনা) ...	সম্পাদক ১৬
শ কেন্তান্ত সংগ্রাম (সচিত্র)	শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ২৩, ৬৫
কালকনা	সম্পাদক ১
ত (কাতি রমণী (সচিত্র গল্প)	শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ৮৫
বিধীন ও পরাধীন নারী জীবন ...	শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাস ৯১
স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল	শ্রীরজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ... ৩৭০
হাফ্‌টোন ছবি	শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বি, এ ... ৩৩৫
শেহামির (সচিত্র)	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ... ৩২৬
টি প্রা হীরার মূল্য (গল্প)	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ৩৩৮
হোলী-কাহিনী (কবিতা)	শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ... ১৩১
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু এম্. এ, শ্রীরামনৃসিংহ বক্সী, শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি.এ, শ্রীরমণীমোহন ঘোষ বি. এল, শ্রীমন্মথনাথ দে, শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস এম্, এ, শ্রীমতী বিনয়কুমারী ধর প্রভৃতি ... ... ২১২ ও ৩২২

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।
৩৯৬/১

প্রদীপ

প্রথম বর্ষ। পৌষ ১৩০৪। ১ম সংখ্যা।

সূচনা।

"প্রদীপে"র বিজ্ঞাপন পড়িয়া হয়ত অনেকেই ভাবিয়াছেন,—"এতগুলি বাঙ্গলা মাসিক পত্র থাকিতে আবার একটি কেন?" ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, যত প্রকার মাসিক পত্র হইতে পারে, বাঙ্গলায় তৎসমুদয়ই আছে, ইহা, বোধ হয়, কেহই বলিবেন না। "প্রদীপ"কে আমরা যেরূপ কাগজ করিতে চাই, তদ্রূপ বাঙ্গলা কাগজ একটিও নাই। ইহাই ইহার প্রকাশের কারণ। অবশ্য আমাদের কথার অর্থ এ নয় যে আমরা অশ্রুতপূর্ব্ব একটা কিছু করিব; বা "প্রদীপ" "সর্ব্বোৎকৃষ্ট" মাসিকপত্র হইবে, ইহার আলোকে অপর পত্রগুলি নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে। আমরা কেবল এই বলিতে চাই যে আমরা নিজ ক্ষুদ্র সাধ্যানুসারে সামান্য ভাবে নূতন কিছু করিতে চেষ্টা করিব।

"প্রদীপে" কি কি বিষয়ে প্রবন্ধাদি থাকিবে? এই প্রশ্নও অনেকের মনে উদিত হইয়া থাকিবে। ইহার যথোচিত উত্তর দেওয়া বড় কঠিন। অন্যান্য সামগ্রীর ন্যায় প্রয়োজনানুসারে নানাবিধ রচনা ফরমাইস দিলেই পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রথম হইতে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া ভাল নয়, এবং অঙ্গীকার করা সম্ভবপরও নহে। তদ্ভিন্ন পাঠকবর্গের রুচি এবং প্রয়োজন এরূপ বিভিন্ন প্রকারের যে, সকলের মনোরঞ্জন অসম্ভব বলিলেও চলে। যদি আমরা বলি, "প্রদীপে" নানাবিষয়ক গভীর তত্ত্বনিচয় আলোচিত হইবে, তাহা হইলে সারগ্রাহী ব্যক্তিগণ সন্তুষ্ট হইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু অপর দিকে যাঁহারা প্রধানতঃ বা কেবল মাত্র চিত্তবিনোদন ও কালক্ষেপের জন্য মাসিক পত্র পাঠ করেন, তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইবেন। আবার যদি বলি, ইহাতে গল্প এবং কৌতুকজনক প্রবন্ধ ও কবিতা প্রচুর পরিমাণে থাকিবে, তাহা হইলে তত্ত্বান্বেষিগণ ...র বেন, কিন্তু আমোদলিপ্সুগণ নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইবে। এবম্বিধ সঙ্কটে পড়িয়া অর্দ্ধজরতীয় ন্যায় অনুসারে উ...রাং পক্ষের সন্তোষজনক কোন উত্তর দেওয়া সম্ভব কিনা, সন্দেহের বিষয়। যাহাই হউক, সংক্ষেপে এইমাত্র বলিতে পারি যে, শিক্ষা এবং চিত্তবিনোদন উভয়ের যথাযোগ্য সংমিশ্রণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমরা "প্রদীপ" সম্পাদন ও পরিচালনের চেষ্টা করিব। সংসারে মানবের অনুশীলনীয় যতগুলি বিষয় আছে, তৎসমুদয়ের তালিকা দিয়া, সর্ব্ববিষয়ক প্রবন্ধ "প্রদীপে" থাকিবে, এরূপ লিখিয়া দিলে শুনায় ভাল এবং আড়ম্বরও বেশ হয়। কিন্তু আমরা আড়ম্বরের বিরোধী; সুতরাং এবিষয়ে প্রচলিত রীতির অনুসরণ করিতে পারিলাম না।

অঙ্গীকার করিলেই যে অঙ্গীকার পালন করিতে পারা যায়, তাহা নয়। সুতরাং কার্য্য দেখিয়া বিচার করাই ভাল। কিন্তু আমাদের বিনীত অনুরোধ এই, বঙ্গসাহিত্যানুরাগিগণ "প্রদীপে"র প্রথম সংখ্যা দেখিয়াই যেন শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত না হন।

পরমেশ্বরের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া আমরা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। আমরা কেবল খাটিতেই অধিকারী, ফলে আমাদের অধিকার নাই। ফলদাতা তিনি। কিমধিকমিতি।

ঈপ্সিত।

কোন্ উপাদানে আমি গঠিব তোমায়?
হে ঈপ্সিত! হাতে ল'য়ে শত অভিধান
প্রতি পৃষ্ঠা খুঁজিয়াছি; কবি কল্পনায়
বক্ষে লয়ে, লক্ষ্য করি অনন্ত বিমান,

পশিয়াছি স্বর্গলোকে, দেখেছি সেথায়
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরে—ত্রিধা অধিষ্ঠান—
সৃজনে পালনে আর সংহার-লীলায়।
কিন্তু তৃপ্ত নহে মন; চাহে কি পরাণ
নামের বাঁধন দিয়া বাঁধিতে তোমারে?
থাকো তুমি চিরদিন স্নিগ্ধ জ্যোতিরাশি
ভব-অন্ধকার-মাঝে। পড়িবে ঢলিয়া
শ্রান্ত এ পতঙ্গ যবে অন্তিম আঁধারে,
সেইদিন, হে বাঞ্ছিত, আপনা প্রকাশি'
শান্তিময় ক্রোড়ে তারে লইও তুলিয়া।

মরিব কি বাঁচিব?

বা

শস্য ও স্বাস্থ্য।

অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য
ক্ষুধার্ত্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ।
ত্বমেকা গতির্দেবী নিস্তারকর্ত্রী
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

আমি পথিক। চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার, ঘোরা তমিস্রা। আকাশে চাঁদ নাই, তারা নাই। আকাশ ব্যাপিয়া অন্ধকার, গাঢ় অন্ধকার। চক্ষু থাকিতে আমি অন্ধ। এই অন্ধ রজনীতে এই অন্ধ হতভাগ্যকে কেহ কি আলোক দিবেন? এমন কি কোন মহাপুরুষ নাই, যিনি দয়া করিয়া আমাকে এবং আমার মত অগণ্য হতভাগ্যকে প্রদীপ ধরিয়া পথ প্রদর্শন করিতে পারেন? অন্ধকার অজ্ঞান, অন্ধকার দুঃখ। প্রদীপ জ্ঞান, প্রদীপ আনন্দ।

অন্ধকারে আমরা বড় কষ্ট পাইতেছি, বড় কষ্টে মরিতেছি। মরিতেছি—ক্ষুধায়, রোগে, মামলায়, কুশিক্ষায়, পাপে। চতুর্দ্দিকে মৃত্যুর অন্ধকার। জীবনের প্রদীপ কে ধরিতে পারেন? হে পণ্ডিত, হে স্বদেশভক্ত, হে মহাপুরুষ, আমাদিগকে রক্ষা করুন; আমাদিগকে অনাহার হইতে, ব্যাধি হইতে, বিবাদ হইতে, মহা পাতক হইতে রক্ষা করুন। যন্ত্রণায় আমরা ছট্‌ফট্ করিতেছি।

মরিব কি বাঁচিব? বাঁচিয়া থাকিতে হইলে আহারের আবশ্যক। আহারের জন্য শস্য প্রয়োজন। আমরা যত লোক, প্রতি বৎসর তত শস্যের সংস্থান কৈ? এই বাঙ্গালাদেশে এই বৎসর চৌষট্টি ক্রোর মণ ধান্য জন্মিয়াছে। বাঙ্গালার লোকসংখ্যা প্রায় সাতক্রোর হইবে।

দেখুন, এক বৎসর যেমন কম শস্য হয়, আর এক বৎসর তেমন অধিক হয়। কমে আর অধিকে গড়পড়তায় কি সমুদয় ভারতবাসীর আহারের সংস্থান হইতে পারে না? ভারতবর্ষে যে শস্য হয়, তাহা যদি দেশে থাকে, অর্থাৎ তাহার রপ্তানি না হয়, তাহা হইলে শস্যের অনটন হয় না, সহজ বুদ্ধি এবং পাটীগণিতের সহজ নিয়মে, এইত প্রতিপন্ন হয়। সহজ বুদ্ধিতে আরও বোধ হয় যে, যেদেশে নিত্য দুর্ভিক্ষ, সে দেশের শস্য রপ্তানিতে অমঙ্গল বই মঙ্গল হইতে পারে না। কিন্তু ধন-বিদ্যাবিশারদ কোন কোন ইংরাজের মুখে আমরা শুনিতে পাই যে, এই শস্য রপ্তানিতে ভারতের শস্যের মূল্য বাড়িতেছে, এবং তাহাতে ভারত-কৃষককুলের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। তাহারা পূর্ব্বের অপেক্ষা অধিক টাকা পাইতেছে, অধিকতর সুখসচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করিতেছে। এই পণ্ডিতগণ ভারতে শস্যের যে অনটন হয়, তাহা মোটেই স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, এ কি সম্ভব, যে, কৃষক নিজের প্রয়োজনীয় শস্য ঘরে না রাখিয়া অন্যের নিকট শস্য বিক্রয় করে? এই পণ্ডিতগণের মতে ভারত-কৃষক নিজের প্রয়োজনের জন্য শস্য রাখিয়া যে উদ্বৃত্ত থাকে, তাহাই বিক্রয় করে, এবং তাহাই ব্রিটিশ বণিক্ ক্রয় করেন। সংক্ষেপে, ভারতের লোকের অপেক্ষা ভারতের শস্য অধিক। এই হইল বিলাতী সিদ্ধান্ত নং ১।

অপরপক্ষে, কতকগুলি ইংরাজ বলিয়া থাকেন যে, ম্যাল্‌থসের প্রদর্শিত নিয়মানুসারে, দেশের লোকসংখ্যা যে পরিমাণে বাড়িতে পারে, শস্যপরিমাণ সে অনুপাতে বাড়িতে পারে না। সুতরাং ভারতের দুর্ভিক্ষ, লোক সংখ্যার অতিরিক্ত বৃদ্ধির অনিবার্য্য ফল। সংক্ষেপে, ভারতের শস্যের পরিমাণ অপেক্ষা লোকসংখ্যা অধিক। এই হইল সিদ্ধান্ত নং ২। পাঠকের মনে আছে, ১নং সিদ্ধান্ত এই, ভারতের লোকসংখ্যা অপেক্ষা শস্যপরিমাণ অধিক। এই দুইটী সিদ্ধান্ত কি পরস্পরবিসম্বাদী? একটী যদি সত্য হয়, অপরটী নিশ্চিত মিথ্যা। ইংরাজ পণ্ডিতগণের মধ্যে, এরূপ পরস্পরসংহারক উপপত্তির আবির্ভাব কিরূপে

হইয়াছে তাহা বুঝি না। তবে, শস্যাধিক্যই দুর্ভিক্ষের বা শস্যাভাবের হেতু, এই কথা না মানিতে পারিলে, ভারতের লোকসংখ্যা অপেক্ষা শস্যপরিমাণ অধিক, এই (প্রথম) সিদ্ধান্ত স্বীকার করা যায় না। অপর পক্ষে, যদি দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত সত্য হয়, অর্থাৎ যদি ভারতের লোকসংখ্যা উৎপন্ন শস্যের অপেক্ষা অধিক, এইরূপ হয়, তাহা হইলে এই হ্রস্ব-শস্য, রপ্তানির দ্বারা, হ্রস্বতর করা বাতুলের কার্য্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। বরঞ্চ এবম্বিধ ভারতে, যাহাতে শস্যের রপ্তানি না হইয়া, আমদানি হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য।

ভারতের শস্য রপ্তানি যে ভারতের দুর্ভিক্ষের কারণ নহে, এই মতের পোষকতায় আর একটী কথা শুনিতে পাইতাম। অনেক সাহেব, বিশেষতঃ বিলাতী বণিক্, বলিতেন, রেলপথের বহুল বিস্তার না হওয়াই ভারতের দুর্ভিক্ষের কারণ। অর্থাৎ প্রতি বৎসর শস্য ভারতের কোন অঞ্চলে কম, কোন অঞ্চলে অধিক হয়। রেলপথের অভাবে এক অঞ্চলের শস্যাধিক্য দ্বারা আর এক অঞ্চলের শস্যাভাব দূরীকৃত হইতে পায় না। এমন কি মহাপণ্ডিত স্যার উইলিয়ম হণ্টার সাহেব সদর্পে তাঁহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন, সমুদয় ভারতে কখন অনাবৃষ্টি হয় নাই অর্থাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং রেলপথ চতুর্দ্দিকে বিসর্পিত হইলে ভারতবর্ষে আর দুর্ভিক্ষ হইবে না, অন্নাভাবে আর লোক মরিবে না, এই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু গত বৎসরের ভারতব্যাপী ভীষণ দুর্ভিক্ষ, জঠরানলদগ্ধ জনরাশির হৃদয়বিদারক ধবলকঙ্কালস্তূপ দ্বারা হণ্টারপ্রমুখ পণ্ডিতপুঞ্জের এই দুঃসাহসিক প্রবচন অসংশয়িতভাবে পরিখণ্ডন করিয়াছে। অতএব অন্নের অনটন দূরকরা সম্বন্ধে রেলপথের উপর যে আশা ছিল, এখন তাহা আর নাই। তবে এখন আশা কোন্ দিকে? অন্নাভাবে ভারতবাসী যে নিত্য মরিতে লাগিল, তাহার উপায় কি? প্রশ্নটা অতি কঠিন। তাহার উপর আবার এ সম্বন্ধে, আমাদিগের দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের মধ্যেও প্রকৃত আলোচনা ও জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব। সুতরাং আমাদিগের দেশের প্রায় সমুদয় লোকের নিকট এ বিষয়টী গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। যাঁহারা সংবাদপত্রে ও সাময়িকপত্রে লেখেন, ভরসা করি, তাঁহারা এই গুরুতর প্রাণধারক ও প্রাণ নাশক বিষয়টী অধ্যবসায়ের সহিত, চিন্তাশীলতার সহিত নিয়ত সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিবেন।

অনেকে বলেন, ভারতের অন্নকষ্ট নিবারণ করা অতি সহজ। ভারতের শস্য রপ্তানি এককালে বন্ধ করিয়া দিলেই হয়। প্রতিবৎসর ভারত হইতে গড়ে প্রায় ২০ কোটি টাকার চাউল ও গম রপ্তানি হয়। মণ করা ৪৲ টাকা মূল্য ধরিলে, ৫ কোটি মণ চাউল ও গম দেশ হইতে চলিয়া যায়। ৫ মণে একজনের সম্বৎসরের খোরাক চলিতে পারে। ৫ কোটি মণে ১ কোটি লোকের সম্বৎসরের আহার চলে। সুতরাং প্রতি বৎসর দেশ হইতে ১ কোটি লোকের সম্বৎসরের খোরাক চলিয়া যাইতেছে। সুতরাং এই শস্য দেশে থাকিলে যে ভারতের অন্নকষ্ট দূরে যায়, তাহা সহজেই মনে হয়। কিন্তু ইংলণ্ডের লোকের আহারের জন্য যে শস্য প্রয়োজন, তাহার অপেক্ষা সেখানে অনেক কম শস্য হয়। ভারত, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে শস্যের রপ্তানি বন্ধ হইলে ইংলণ্ডে দুর্ভিক্ষ হইবে। সুতরাং ইংলণ্ড তাহা করিবেন, ইহা আশা করা যায় না।

আর কেহ কেহ বলেন ভারতে গড়ে বৎসরে প্রায় ২৫ কোটি টাকার বিদেশীয় কাপড় বিক্রয় হয়। এই বিদেশীয় কাপড়ের উপর উচ্চহারে কর বসান উচিত। তাহাতে বিলাতী কাপড়ের মূল্য বাড়িবে, বাড়ুক। ক্রমে আমরা বিলাতী কাপড় পরিধান ত্যাগ করিব। এখন চারি টাকায় সুন্দর চারিখানা বিলাতী কাপড় হয়। তখন না হয় মোটা দেশী কাপড় পরিব। মোটা কাপড় পরিলে লোকে মরে না, শস্য দেশ হইতে যাইলে লোকে মরে। বিলাতী কাপড়ের আমদানি ক্রমে বন্ধ হইলে, এখন দেশের যে টাকা বা অন্ন, বিলাতী কাপড় ক্রয় করাতে, দেশের বাহির হইয়া যাইতেছে, তখন তাহা দেশেই থাকিবে, বস্ত্রবয়ন করিয়া দেশে অনেক লোক খাইতে পাইবে।

এ কথা ত ভাল। কিন্তু আপত্তি এই যে, যাহাতে বিলাতী প্রবল তাঁতিকুলের আহারের অভাব হইবে বা অর্থের ক্ষতি হইবে, তাহাও ইংলণ্ড আমাদিগের অনুরোধে করিবেন, তাহার ভরসা নাই। ইংলণ্ড অবাধ বাণিজ্যের এক্ষণ পক্ষপাতী। অবাধ বাণিজ্যই ইংলণ্ডের আহারের উপায়। শিল্পজাত দ্রব্য বেচিয়া ইংলণ্ড শস্য ক্রয় করিতে চাহেন এবং ক্রয় করেন। পূর্ব্ব প্রস্তাবেও যে আপত্তি,

এ প্রস্তাবেও সেই আপত্তি। ইংলণ্ড বিলাতী কাপড়ের উপর যে সামান্য শতকরা ৩॥০ টাকা কর বসাইয়াছেন, তাহা ভারতের তাঁতিদিগের সুবিধার জন্যও নহে, বিলাতী কাপড়ের আমদানী কমাইবার জন্যও নহে, তাহা ইংলণ্ড নিজেই স্বীকার করেন।

সংক্ষেপে শস্যরপ্তানি বন্ধ করিয়া বা বিলাতী কাপড়ের উপর কর বসাইয়া ভারতের অন্নাভাব দূর করার কোনও আশা নাই। আমাদিগকে অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

পতিত জমি আবাদ করিয়া কৃষি-বিস্তার করা, সার প্রভৃতি উপায় দ্বারা কৃষির উন্নতি করা, উপযুক্ত আহার ও চিকিৎসার দ্বারা গোরক্ষা ও বৃদ্ধি করা, ইউরোপীয় কল-কারখানা এদেশে প্রচলিত করিয়া শিল্পের উন্নতি করা—এইরূপ কয়েকটী প্রত্যক্ষ হিতকর বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া ব্যতীত আর কোনও উপায় নাই। আমরা নিজে এতাবৎ সম্বন্ধে সমুচিত যত্নবান্ হইলে গবর্ণমেণ্টের নিকটও কোন কোন বিষয়ে আনুকূল্য পাইতে পারি। আজি কালি কোন কোন বাঙ্গালী ভারতের অন্নাভাব দূরীকরণ বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন, ইহা আহ্লাদের বিষয়। "Poverty Problem in India" নামক পুস্তকখানি ইংলণ্ডেও সমাদৃত হইয়াছে। "Wealth of India" নামক মাসিক পত্রিকা খানিও আমাদিগের বিশেষ উপকার করিবে আশা করি।

মূল কথা এই যে, ভারতবাসীর এই জীবন ও মৃত্যু এখন শস্যজন্ম ও শস্যরক্ষার উপর নির্ভর করিতেছে। ইংরাজি ধনতত্ত্ববেত্তারা যাহাই বলুন, বাণিজ্যবিস্তারের প্রাচীন প্রশংসা যতই ঘোষিত হউক না কেন, রেলপথ বিস্তার দুর্ভিক্ষের মহৌষধি বলিয়া যতই বিজ্ঞাপিত হউক না কেন,—যখন দেখিতেছেন, রেল ও বিদেশীয় বাণিজ্য বিস্তার সত্ত্বেও, সভ্য ইংলণ্ডের শাসন সুশৃঙ্খলা সত্ত্বেও, ঘনঘন দুর্ভিক্ষ হইতেছে এবং সেই দুর্ভিক্ষ কোনও কোনও বৎসর ভারতের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইতেছে, যখন দেখিতেছেন, যদিও প্রায় সমুদয় দ্রব্য সুলভ হইতেছে, কেবল ভারত-বাসীর প্রাণপ্রতিম শস্য দিন দিন দুর্লভ হইতেছে; তখন অবশ্যই বুঝিতে হইবে, আমাদিগের ভয়ানক বিপদ উপস্থিত, তখন বুঝিতে হইবে, এই বিপদের হেতু নির্ণয় করা নিতান্ত আবশ্যক, তখন বুঝিতে হইবে, এই বিপদের সঙ্গত প্রতীকার না করিলে, যেমন আমাদিগের অসংখ্য দরিদ্র ভাই ভগিনী গত এবং বর্ত্তমান বৎসর অন্নাভাবে ক্ষুধায় জ্বলিয়া মরিয়াছে এবং অনেকে মরিয়া শৃগাল ও কুকুরের উদরে গিয়াছে, তেমনি আমাদিগের সন্তানসন্ততিগণ ঐরূপ দুর্গতি প্রাপ্ত হইবে, ঐরূপ ভবিষ্যতে আবার ঝাঁকে ঝাঁকে মরিবে।

ভারতে এক্ষণে একদিকে যেমন শস্যাভাব, তেমনি অপরদিকে স্বাস্থ্যাভাব। দেশ ম্যালেরিয়াতে উৎসন্ন যাইল। দেশের অভ্যন্তরে যেখানে যাও, দেখিবে, শীর্ণ হস্তপদ, স্ফীত উদর, ক্ষীণ দেহ, সূক্ষ্ম গ্রীবা, নিস্তেজ চক্ষু। আশ্বিন মাস হইতে ঘরে ঘরে জ্বর। আর এই জ্বরে যে একবার পড়ে, সে পৌষ মাস পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ জ্বরে আক্রান্ত হয়। পূর্ব্বে জ্বর সবিরাম হইত, এখনকার জ্বর প্রায়ই অবিরাম হয়। সুতরাং পূর্ব্বে জ্বর যেমনি ছাড়িয়া যাইত, অমনি কুইনাইন দিবার সুবিধা হইত এবং কুইনাইন দিলে আর জ্বর আসিত না। এখনকার জ্বর আপনি অর্থাৎ বিনা চিকিৎসায় প্রায় বিরাম হয় না। যদি বা বিরাম হয়, তাহা হইলেও কুইনাইন দিলে তেমন আর উপকার হয় না। বরঞ্চ অনেক সময় অপকার হয়। পূর্ব্বে লোকের যকৃত এত খারাপ হইত না। এখন ম্যালেরিয়ার জ্বরে ভুগিয়া ভুগিয়া হউক, অথবা অপমিশ্রিত দূষিত খাদ্য ভক্ষণ করিয়াই হউক, পীড়িত লোকের যকৃত ক্রমেই খারাপ হইতেছে। সুতরাং বিবর্দ্ধিত ও বিকৃত যকৃতে কুইনাইন প্রয়োগে, উপকার না হইয়া, অনেক স্থানেই অপকার হয় ও কোথায়ও বা মৃত্যুও হয়। পূর্ব্বে কাহারও জ্বর না ছাড়িলে জোলাপ দেওয়া হইত এবং তাহাতে উপকারও হইত। এখন জীর্ণ দেহে জোলাপ দিলে অনেক স্থানে জ্বরের সহিত অতিসার যোগ দেয় এবং এইরূপে জোলাপ দেওয়ায় সহজ জ্বর কঠিন আন্ত্রিক জ্বরে পরিণত হয়। যে সকল ডাক্তার এই পরিবর্ত্তিত অবস্থা লক্ষ্য না করিয়া পূর্ব্ব প্রণালীতে কেবল পুঁথিগত বিদ্যায় চিকিৎসা করেন, তাঁহারা অনেক রোগী মারিয়া ফেলেন। এইত গেল জ্বরের কথা। তাহার উপর কলেরা ও বসন্ত এই দুই ভয়ানক রোগ যখন তখন এক এক অঞ্চল ছারখার করিতেছে। এই দুঃখরাশির উপরে আবার অভূতপূর্ব্ব ভীষণ মহামারী, রাজার দৃঢ় প্রতীকারচেষ্টা সত্ত্বেও, চতুর্দ্দিকে শনৈঃ শনৈঃ

বিক্ষিপ্ত হইতেছে। বুঝি, ভারতবাসীর অন্তিমকাল উপস্থিত হইল। চতুর্দ্দিকে ভয়াবহ অন্ধকার দেখিতেছি। দেশের মত্ত ধনিগণ বিলাসে মগ্ন। দেশের শিক্ষিত-গণ হয় অর্থচিন্তায়, না হয় আত্মঘোষণায় আবিষ্ট। দেশের জনসাধারণ অজ্ঞানের, মোহের, অনাহারের, পিষ্টপেষণে জড়বৎ। আমাদিগের এ বিষয়ে আলোচনা নাই, অনুসন্ধান নাই, প্রতীকারের চেষ্টা নাই। আমরা নিজে প্রতীকারের কোনই চেষ্টা করিব না, কেবল গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া নিশ্চিন্ত থাকিব—এই হইল আমাদিগের দেশহিতৈষিতা।

যাহারা স্কুল কালেজে পড়ে, বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর দোষে তাহাদিগের স্বাস্থ্য একবারে চিরকালের মত ভাঙ্গিয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এমন ছাত্র দুর্লভ, যাহার শরীরে কোন কঠিন রোগ প্রবেশ করে নাই। এ বিষয় আমি সবিস্তার "নব্যভারতে" পূর্ব্বে লিখিয়াছি। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না।

আর একটী কারণে ইংরাজি-শিক্ষিত লোকের স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইতেছে। ইংরাজি শিখিয়া ভারতবাসী আচারভ্রষ্ট হইয়াছে। যে সকল আচার সহস্র সহস্র বৎসরের পর্য্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা-প্রসূত, আমাদিগের দেশের বায়ুর ও জলের ও অন্যান্য ভৌতিক অবস্থার উপযোগী বা স্বাস্থ্যকর বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল এবং ধর্ম্মসংযুক্ত হইয়া জন-সাধারণের অবশ্যপাল্য ছিল, বাঙ্গালী ইংরাজি পড়িয়া তাহা কুসংস্কার ও উপধর্ম্ম মনে করিয়া ত্যাগ করিয়াছে। সেই সকল আচারের গূঢ় মর্ম্ম ও হেতু কোন কোনও তীক্ষ্ণবুদ্ধি ইংরাজ, বিজ্ঞানের সাহায্যে, ইদানীং এখন একটু একটু বুঝিতেছেন এবং বুঝাইতেছেন। তথাপি অধিকাংশ মূঢ় ইংরাজি-শিক্ষিত বাঙ্গালী তাহা বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া, ব্যঙ্গের ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া থাকেন। এই সকল বিকৃত বাঙ্গালিগণের দৃষ্টান্তে যাহারা ইংরাজি এক পাতাও পড়ে নাই, তাহারাও কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক, প্রায় সকলেই উদ্ধত ভাবে দেশাচার পরিত্যাগ করিতেছে এবং এইরূপে নিজের দেহের ভিতর ব্যাধি প্রবেশের পথ সহজ করিয়া দিতেছে। আমার অর্থ অবশ্য এমন নহে যে যাহাই চিরপ্রচলিত প্রথা, মন্দ হইলেও তাহাই চিরকাল রক্ষা করিতে হইবে। আমি কেবল এই বলিতেছি যে, আমরা মূঢ়তাবশতঃ পরীক্ষা বা বিবেচনা না করিয়া, কেবল অন্ধ অনুকরণের বশবর্ত্তী হইয়া দেশোপযোগী অনেক স্বাস্থ্য-জনক আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া দেহকে আরও অসুস্থ করিতেছি। যাঁহারা স্বদেশের উন্নতি কামনা করেন, যাঁহারা চিন্তাশীল, যাঁহারা রাশি রাশি পুস্তক ও প্রবন্ধ লিখিতেছেন, তাঁহাদিগের নিকট আমরা এই সকল নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে আলোক চাহি। বাঙ্গালা সাময়িক বা সংবাদ-পত্রে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রায়ই কোন আলোচনা বা আন্দোলন দেখা যায় না। দেশে যত বাঙ্গালী ডাক্তার আছেন, তাঁহারা ইউরোপীয় বিজ্ঞান শিখিয়াছেন। চিকিৎসা ব্যবসা দ্বারা হয়ত বেশ অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। কিন্তু দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি কল্পে তাঁহাদিগের মনোযোগ নাই। এতগুলি বাঙ্গালা পত্রিকা মাসে মাসে বাহির হইতেছে; তাহার মধ্যে এতাবৎকাল স্বাস্থ্যসম্বন্ধে কয়টা প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে? কেহ কেহ বলিতে পারেন, এসকল বিষয় লেখা বড় কঠিন, ইহা-দিগের তথ্য দুর্জ্ঞেয়। কিন্তু "ব্রহ্ম", "পরব্রহ্ম," "ব্রহ্মাণ্ড," "মায়াবাদ," "সান্ত অনন্ত" ইত্যাদি বিষয় কি আরও দুরূহ, আরও দুর্জ্ঞেয় নহে? এই সকল বিষয়েত ভূরি ভূরি প্রবন্ধ মাসে মাসে দেখিতে পাই। তবে যদি বলেন, এই সকল বিষয়ে অনেক বিলাতী গ্রন্থ আছে। লেখকগণ সহজেই তাহার অনুবাদ বা অনুবর্ত্তন করিয়া প্রবন্ধ লিখিতে পারেন। একথা সত্য হইলেও হইতে পারে। কিন্তু স্বাস্থ্যসম্বন্ধেও প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ আছে, এবং ইদানীং বিলাতী ডাক্তারগণ অনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন। এই সকল প্রবন্ধে প্রকাশিত তথ্যগুলি বাঙ্গালা সাময়িকপত্রে আলোচনা ও পরীক্ষা করিলে কি কোন শুভফল ফলিতে পারে না?

এই বৎসরের নবেম্বর মাসের Indian Medical Gazetteএ ম্যালেরিয়া জ্বর সম্বন্ধে একজন ইংরাজ ডাক্তার একটী উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইংরাজি অন্য সারবান্ সাময়িকপত্রে এবং দৈনিক সংবাদ-পত্রেও তাহার আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাঙ্গালা সাময়িকপত্রে ও সংবাদ-পত্রে ঐ বিষয়ের আলোচনা বা উল্লেখ না হওয়াই অধিক সম্ভব। যে সকল বিষয় আলোচনা করিলে দেশের লোকের প্রত্যক্ষ উপকার হইতে পারে, যে সকল বিষয়

TORN PAGES

লিখিলে অনেক লোক বুঝিতে পারে, অনেক লোকের উপকার হয়, তাহা লিখিতে অধিকাংশ বাঙ্গালী লেখকের পক্ষে কোনও নিষেধ আছে। একথাটী আমি দুঃখে লিখিলাম। তবে বলা আবশ্যক, কোনও কোনও বাঙ্গালী লেখক এই সকল প্রত্যক্ষ হিতকর বিষয় আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান শোচনীয় দুরবস্থার গাঢ় অন্ধকারের ভিতর ইহা একটী আশার রশ্মি।

কিন্তু একদিকে শস্যের এইরূপ অনটন, অন্য দিকে ভীষণ ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত রোগের বৃদ্ধি হইতেছে; এবং লোমহর্ষণ অভূতপূর্ব্ব মহামারী তাহার করাল ছায়া দ্বারা ভারতকে আচ্ছন্ন করিতেছে। এখন বুঝিতে হইবে, ভারতবাসীর পক্ষে ভয়ানক দিন উপস্থিত হইয়াছে। ভারতবাসী জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইবে কি না, পুণ্য আর্য্যধাম শ্মশানে পরিণত হইবে কি না, এ ঘোর সমস্যা আমাদিগের নিকট উপস্থিত। সংক্ষেপে, আমরা বাঁচিব কি মরিব, আমরা অনাহারে রোগের প্রতীকার করিয়া বাঁচিব, না মোহে মত্ত থাকিয়া, প্রতীকার না করিয়া, নিরুপায় পশুপালের ন্যায় মরিব, ইহাই এখন সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য।

তাই বলি, পণ্ডিত স্বদেশহিতৈষী ভাই, তোমার বিদ্যাবত্তার, বুদ্ধির, গবেষণার প্রদীপ, আধ্যাত্মিক ইত্যাদি গভীর প্রসঙ্গ হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত করিয়া, এই ভয়ানক আশুসঙ্কটে এই ঘোর গাঢ় তিমিরে, তোমার প্রজ্ঞা-প্রদীপের আলোক প্রদান কর। কেবলমাত্র গবর্ণমেণ্টের চেষ্টার উপর নির্ভর করিয়া, কেবলমাত্র শাসনকর্ত্তাদিগের নিকট আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়া, কেবলমাত্র বাক্‌পটুতা প্রদর্শন করিয়া, নিশ্চিন্ত থাকিও না। সত্যবান্ সাহসী সাধু হইয়া, নীরবে কার্য্য কর। দেখিবে, কার্য্য করিলে, চীৎকার না করিয়া আত্মসাহায্য আরম্ভ করিলে, গবর্ণমেণ্টও তোমাদিগকে শ্রদ্ধা করিবেন, সাহায্য করিবেন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

আগ্রা—১৮৫৭ অব্দের মধ্যভাগে।

মে মাসে মিরাট ও দিল্লীর সংবাদে আগ্রার ইউরোপীয়গণ যেরূপ শঙ্কিত হয়েন, আগ্রার অধিবাসিগণও সেইরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠে। মোগলের প্রাধান্যকালে আগ্রা সাতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল। উহা সমৃদ্ধিতে দিল্লীর অব্যবহিত নিম্নে স্থান পাইলেও, সৌন্দর্য্যগৌরবে এক সময়ে দিল্লী অপেক্ষাও প্রধান ছিল। উহার অতুলনীয় তাজমহল জগতে আজ পর্য্যন্ত আপনার প্রতিপত্তি রক্ষা করিতেছে। সুনীল যমুনা পূর্ব্বের ন্যায় উহার পাদদেশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। যখন যমুনা হইতে তাজের অনুপম সৌন্দর্য্য দৃষ্টিগোচর হয়, তখন দর্শক ভাবস্রোতে অতীতের দিকে নীয়মান হইয়া, সেই অতুলনীয়, সমৃদ্ধিময় দৃশ্য মানসপটে চিত্রিত করিতে থাকেন। চিরস্মরণীয় আকবর যে স্থানে থাকিয়া আপনার তেজোমহিমায় ও গুণ গৌরবে লোকের মধ্যে দেবভাবে সংপূজিত হইয়াছিলেন; এবং চিরপ্রসিদ্ধ মতি মসজিদ নির্ম্মাণ করাইয়া, যে স্থানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, শাহজহাঁ যেস্থানে আপনার প্রণয়িণীর অন্তিম বাসনার অনুরূপ কর্ম্ম করিবার জন্য বহুকোটী মুদ্রা ব্যয় করিয়া, অপূর্ব্ব শিল্প চাতুরীর একশেষ দেখাইয়াছিলেন, সেস্থান পূর্ব্বতন সময়ের ন্যায় বর্ত্তমান কালেও আপনার প্রতিপত্তি রক্ষা করিতেছিল। তাজের দিকে ইংরেজের সৈনিকনিবাস অবস্থিত। এই স্থানে ইউরোপীয় সৈন্য ও সিপাহীদিগের আবাসগৃহ, সৈনিকনিবাসের অফিসারদিগের বাঙ্গালা, এবং প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদিগের উপাসনা-মন্দির ছিল। সহরের বহির্ভাগে লেফটেনেণ্ট গবর্ণরের আবাসগৃহ, গবর্ণমেণ্টের আফিস, কারাগার, কলেজ, রোমান কাথলিকদিগের উপাসনা-মন্দির এবং প্রধান প্রধান সিবিল কর্ম্মচারীর আবাসগৃহ সমূহ রহিয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের আফিস এক প্রান্তে এবং সিপাহীদিগের আবাসগৃহ অপর প্রান্তে ছিল। দুর্গ এবং সহরের মধ্যে সেতু নির্ম্মিত ছিল। এই সেতু অতিক্রম করিলেই কানপুর এবং আলিগড়ের পথে উপনীত হওয়া যাইত।

এই সময়ে আগ্রার সৈনিকদলে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় উভয় শ্রেণীর সৈন্য ছিল। ইউরোপীয় সৈনিকদিগের মধ্যে ৩ গণিত পদাতি ও একদল গোলন্দাজ এবং সিপাহী সৈন্যের মধ্যে ৪৪ ও ৬৭ গণিত দল অবস্থিতি করিতেছিল। ব্রিগেডিয়ার পোলহোয়েল সমগ্র সৈনিকদলের অধিনায়ক ছিলেন।

মিরাট এবং দিল্লীর সংবাদ ১২ই ও ১৩ই মে আগ্রায় উপস্থিত হয়। সংবাদপ্রাপ্তির পূর্ব্ব দিন ইউরোপীয়গণ আত্মরক্ষার জন্য সাবধান হয়েন। একদল ইউরোপীয় সৈন্য দুর্গে থাকিতে আদিষ্ট হয়। ইউরোপীয়েরা আপনাদের পিস্তলগুলি কার্য্যোপযোগী করিয়া রাখেন। আগ্রায় দুইদল সিপাহী ছিল। পক্ষান্তরে একদল ইউরোপীয় পদাতি এবং গোলন্দাজ সৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল। কেবল আগ্রার সিপাহীরা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইলে, বোধ হয়, ইউরোপীয় সৈনিকগণ তাহাদের ক্ষমতা রোধে অসমর্থ হইত না। কিন্তু যদি জনসাধারণ উত্তেজিত হইয়া উঠিত, অধিকন্তু আগ্রার পার্শ্ববর্ত্তী নগরে যে সকল সিপাহী অবস্থিতি করিতেছিল, তাহারা যদি দলে দলে আগ্রায় উপস্থিত হইত, তাহা হইলে তত্রত্য ইংরেজদিগের বিপদ অনিবার্য্য হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা ছিল।

যখন মিরাটের সিপাহীগণ উত্তেজিতভাবে দিল্লীতে গমন করিয়াছে, তখন ইংরেজের উত্তরপশ্চিম প্রদেশের রাজধানী যে, মিরাট বা অপরাপর স্থানের উত্তেজিত সিপাহীদিগের লক্ষ্যের বিষয়ীভূত হইবে না, তাহা কোন ইংরেজ সে সময় মনে করেন নাই। যাঁহার উপর জনবহুল সমগ্র উত্তরপশ্চিম প্রদেশের শাসন ও পালনের ভার সমর্পিত ছিল, তিনিও সিপাহীদিগের আক্রমণ আশঙ্কায় বিচলিত হইয়াছিলেন। এ সময় আগ্রা রক্ষা করা তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। এই গুরুতর কর্ত্তব্য সম্পাদনের উপায় নির্দ্ধারণ জন্য তিনি ১৩ই মে আগ্রাবাসী প্রধান প্রধান ইংরেজকে আহ্বান করিলেন। দেওয়ানি ও সৈনিক বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী, খৃষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচারক ও অন্যান্য ইউরোপীয় এই উদ্দেশ্যে মন্ত্রণা-গৃহে সমবেত হইয়াছিলেন। লেফটেনেণ্ট গবর্ণর কলবিন্ সাহেব উপস্থিত বিপদের সময় সমুদয় খৃষ্টানকে দুর্গে লইয়া যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। লেফটেনেণ্ট গবর্ণরের মন্ত্রণাদাতারা সহসা এইরূপে ভয়প্রকাশ করা সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন না। তাঁহারা বিরোধী হওয়াতে লেফটেনেণ্ট গবর্ণরের অভিমতানুসারে কার্য্য হইল না। মন্ত্রণা-গৃহে যাঁহারা সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সাতিশয় উত্তেজনার সহিত আপন আপন অভিমত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যাঁহারা আহুত হয়েন নাই, তাহারাও ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া, ঐরূপ উত্তেজনার পরিচয় দিতে লাগিলেন। একজন কহিলেন যে, এসময়ে সকলেরই দুর্গে যাওয়া কর্ত্তব্য। অন্যজন কারাগার সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলেন। অপরজন খাদ্যসামগ্রীর ব্যবস্থা করিতে কহিলেন। আর একজন সৈনিকনিবাসস্থিত সিপাহীদিগের বিষয়ে মনোযোগ দিতে কহিলেন। এইরূপে প্রত্যেকে আপনভাবে আপনাদের কথা কহিতে লাগিলেন। প্রত্যেকেই আপন মত প্রকাশের সময়ে আগ্রহ ও উত্তেজনার একশেষ দেখাইতে লাগিলেন। এইরূপে সমাগত লোকের অস্থিরতায় নানা গোলযোগ ঘটিতে লাগিল। বহু গোলযোগের পর সিদ্ধান্ত হইল যে, সমগ্র সৈনিকদল কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত হইবে। লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর সৈনিকদিগকে সময়োচিত উপদেশ দিবেন। ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গিদিগকে লইয়া, একটি সৈনিকদল সংগঠন করিতে হইবে। শাস্ত্রীগণ নগরের নানা স্থানে যাইয়া, অধিবাসীদিগের উদ্বেগ দূর করিবে, এবং তাহাদিগকে প্রশান্তভাবে থাকিতে কহিবে।

মন্ত্রণাসভা ভঙ্গ হইল। এদিকে কাওয়াজের আয়োজন হইতে লাগিল। পরদিন প্রাতঃকালে সমুদয় সৈন্য কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত হইল। দেওয়ানি বিভাগের সমুদয় প্রধান কর্ম্মচারী ঐ স্থলে উপস্থিত হইলেন। লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর কল্‌বিন সাহেব শকটারোহণে আগমন করিলেন। তাঁহার উপস্থিতিতে সম্মানসূচক তোপধ্বনি হইতে লাগিল। ইউরোপীয় মহিলাগণ যখন আপনাদের আবাসগৃহে থাকিয়া, তোপের শব্দ শুনিতে পাইলেন, তখন তাঁহারা সিপাহী ও ইংরেজদিগের মধ্যে যুদ্ধ হইতেছে আশঙ্কা করিয়া একান্ত ভীত হইয়া উঠিলেন। লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর শকটে দণ্ডায়মান হইয়া, সর্ব্বপ্রথম ইউরোপীয় সৈনিকদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন যে, তাহারা যেন তাহাদের সহযোগী সিপাহীদিগের প্রতি অবিশ্বাস স্থাপন না করে। কিন্তু যে সকল দুর্বৃত্ত, দিল্লীতে পাদরির কন্যাকে নিহত করিয়াছে, যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদের সম্মুখীন হইলে, তাহারা যেন ঐ বিষয় ভুলিয়া না যায়। লেফ্‌টেনেণ্ট যখন এইরূপ বলিতেছিলেন, তখন ইউরোপীয় পদাতিগণ উত্তেজনার সহিত দৃঢ়মুষ্টিতে আপনাদের বন্দুক ধরিতেছিল। তাহাদের তদানীন্তন ভাবদর্শনে বোধ হইয়াছিল যে, লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর যাহাদিগকে তাহাদের বিশ্বাসের পাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছিলেন, তাহারাই তাহাদিগকে গুলি করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। অতঃপর কল্‌বিন সাহেব

সিপাহীদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক হিন্দুস্থানী ভাষায় কহিলেন যে, তাহাদের উপর তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস রহিয়াছে। যদি কাহারও কোন বিষয়ে অভিযোগ থাকে, তাহা হইলে তাহারা সে বিষয় প্রকাশ করিতে পারে। অথবা যদি কোম্পানির প্রদত্ত যুদ্ধভূষণ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলেও তাহারা অগ্রসর হইয়া আপনাদের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে পারে। লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের কথা শেষ হইল। কোন সিপাহী অভিযোগ প্রকাশ বা সামরিক বেশ পরিত্যাগের অভিপ্রায়ে অগ্রসর হইল না। তাহারা প্রতি মুহূর্ত্তে ধর্ম্মনাশের আশঙ্কা করিতেছিল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিদ্বেষ-বহ্নিতে তাহাদের হৃদয় দগ্ধীভূত হইতেছিল। তাহারা সে সময়ে আশঙ্কায় অধীর ও বিদ্বেষভাবে উত্তেজিত হইল না বটে, কিন্তু উপস্থিত ইউরোপীয়গণ তাহাদের অপ্রসন্নভাবব্যঞ্জক মুখভঙ্গী দর্শনে পূর্ব্বের ন্যায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া রহিলেন।

লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর অতঃপর দিল্লী ও আগ্রার পথ নিরাপদ রাখিতে উদ্যত হইলেন। এই উদ্দেশ্যে একজন ইংরেজ কর্ম্মচারী নিয়োজিত হইলেন। কর্ম্মচারীর প্রতি এই আদেশ দেওয়া হইল যে, তিনি পথের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের অধিবাসীদিগের উত্তেজনা দূর করিবেন। সিপাহীগণ দিল্লী হইতে আগ্রার অভিমুখে ধাবিত হইলে, আগ্রার সৈনিকদল তাহাদের গতিরোধের জন্য বিনা বাধায় অগ্রসর হইতে পারে, তদ্বিষয়ে যথোপযুক্ত উপায় নির্দ্ধারণ করিবেন; এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে যখন যাহা ঘটিবে, তাহা কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিতে যত্নশীল হইবেন। এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া, কলবিন্ সাহেব বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিলেন।

এই সময়ে ভারতের মিত্ররাজগণের সাহায্য গ্রহণ করা, একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। ইঁহাদের রাজ্যে সমরকুশল লোকের অধিবাস ছিল। ইঁহাদের অধীনে অনেক সাহসী সৈনিক যুদ্ধোপযোগী অস্ত্রাদিতে সজ্জিত থাকিত। ইঁহাদের আদেশে অনেকে অনেক দুঃসাধ্য কার্য্য সাধনে উদ্যত হইত। এইরূপ সঙ্গতিপন্ন, এইরূপ সহায়সম্পন্ন এবং এইরূপ ক্ষমতাপন্ন অধিপতিদিগের সাহায্য ব্যতিরেকে ইংরেজ উপস্থিত যুদ্ধে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। এই সকল অধিপতি রাজ্যরক্ষার জন্য যে সকল সৈন্য রাখিতেন, তৎসমুদয়ের উপর প্রধানতঃ এতদ্দেশীয় অধিনায়কগণ কর্ত্তৃত্ব করিতেন। এতদ্ব্যতীত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কোন কোন ভূপতিকে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করিয়া, তাঁহাদের রাজ্যে আপনাদের এক এক দল সৈন্য রাখিতেন। অধিপতিদিগকে এই সকল সৈনিকদিগের ব্যয়ভার বহন করিতে হইত। এই সকল সৈনিক ইউরোপীয় সেনানায়কদিগের অধীনে থাকিয়া, ইউরোপীয় সামরিক প্রণালী অনুসারে শিক্ষা লাভ করিত। মহারাজ সিন্ধিয়ার রাজধানীতে এইরূপ সুশিক্ষিত সৈনিকদল ছিল। কোটা রাজ্যেও এই শ্রেণীর এক দল সৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল। এতদ্ব্যতীত ভরতপুর রাজ্যে তেজস্বী ও দৃঢ়কায় জাঠগণ সৈনিক শ্রেণীতে নিয়োজিত ছিল। ভরতপুর আগ্রার নিকটবর্ত্তী ছিল। গোবালিয়রের উপরেও আগ্রার বিষয় অনেকাংশে নির্ভর করিতেছিল। এই সকল রাজ্যের সৈনিক বলে ইংরেজদিগের শক্তিবৃদ্ধি অথবা শক্তিনাশ হইতে পারিত। সুতরাং কল্‌বিন্ আত্মশক্তি বৃদ্ধির জন্য ভরতপুরের ভূপতি ও গোবালিয়র রাজার নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। এই প্রার্থনা উভয় ভূপতির নিকটে গ্রাহ্য হইল। উভয় ভূপতি কালবিলম্ব না করিয়া লেফটেনেণ্ট গবর্ণরের সাহায্যের জন্য সৈনিকদল পাঠাইলেন। ভরতপুরের একদল সৈন্য ১৫ই মে কাপ্তেন নিকস্‌ন্ নামক একজন ইউরোপীয় সেনানায়কের অধীনে মথুরায় উপনীত হইল। পরদিন গোবালিয়র হইতে অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ সৈন্য আগ্রায় পদার্পণ করিল। মহারাজ সিন্ধিয়া আপনার শরীররক্ষক সৈনিকদিগকেও লেফটেনেণ্ট গবর্ণরের অধীনে রাখিতে বিমুখ হইলেন না। এই সময়ে অপরের সাহায্য গ্রহণ গবর্ণমেণ্টের শক্তিহীনতার পরিচায়ক হইতে পারে। লোকে ইংরেজের উত্তরপশ্চিম প্রদেশের রাজধানীতে ভিন্ন ভিন্ন ভূপতির সৈনিকদলের সমাগম দেখিয়া, গবর্ণমেণ্টকে ক্ষমতাশূন্য বলিয়া মনে করিতে পারে। কিন্তু লেফটেনেণ্ট গবর্ণর লোকের এইরূপ ধারণার পর্য্যালোচনা করেন নাই। লোকে গবর্ণমেণ্টকে শক্তিশালী বা শক্তিহীন ভাবুক, তিনি তদ্বিষয়ে কোন বিচার বিতর্ক না করিয়া, মিত্ররাজগণের সাহায্য গ্রহণে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, যদি ভারতের ভূপতিগণ

এসময়ে তাঁহাদের বিপক্ষ হয়েন, তাহা হইলে কোন রূপ পার্থিব ক্ষমতা তাঁহাদিগকে সর্ব্বধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। সুতরাং এসময়ে মরাঠা, জাঠ ও রাজপুতদিগের উপর বিশ্বাস স্থাপন এবং তাহাদের ক্ষমতার উপর নির্ভর করাই তাঁহার অবলম্বনীয় নীতি ছিল। উপস্থিত বিপত্তিকালে তিনি এই নীতিই শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, আগ্রায় আপাততঃ কোনরূপ গোলযোগের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল না। সপ্তাহকাল এইরূপ বিনা গোলযোগে অতিবাহিত হইল। রাজ্যশাসনের জন্য যে যে কার্য্য আবশ্যক, তৎসমুদয়ের সম্পাদনে কোনরূপ শৃঙ্খলাহানি ঘটিল না। সাধারণেও নিত্যকর্ত্তব্যসম্পাদনের সময়ে আপনাদের প্রশান্তভাব বিসর্জ্জন দিল না। বিচারক যথাসময়ে বিচারগৃহে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। রাজস্বসংগ্রাহক রাজস্বসংগ্রহকার্য্য যথাসময়ে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। মাজিষ্ট্রেট নিয়মিতরূপে নিরুদ্বেগে আপনার কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট হইতে লাগিলেন। গবর্ণমেণ্ট ও মিশনরি স্কুলে পূর্ব্বের ন্যায় ছাত্রসমাগম হইতে লাগিল। অধ্যাপকগণ পূর্ব্বের ন্যায় অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। কোমলমতি শিক্ষার্থিগণও পূর্ব্বের ন্যায় পাঠাভ্যাসে মনোনিবেশ করিতে লাগিল। দেওয়ানি বিভাগের কোন কোন কর্ম্মচারী এ সময়ে স্থানান্তরপ্রবাসী আত্মীয়দিগের বিপদের আশঙ্কা করিয়া, বিপক্ষ সিপাহীদিগের প্রতি জাতক্রোধ হইয়াছিলেন; কেহ কেহ বিপদ অবশ্যম্ভাবী মনে করিয়া একান্ত ভীত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ ভয় ও দুর্ভাবনার নিদর্শন সৈনিক বিভাগে পরিদৃষ্ট হয় নাই। সৈনিক বিভাগের তরুণবয়স্ক অফিসারগণ পূর্ব্বের ন্যায় আপনাদের অভ্যস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রশান্তভাবে অশ্বারোহণে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন, যথানিয়মে বিলিয়ার্ড খেলিতে লাগিলেন, নদীসন্তরণে আমোদিত হইতে লাগিলেন, রাত্রিকালে সিপাহীদিগের আবাসগৃহের সম্মুখে সুষুপ্তিসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। উত্তেজিত সিপাহীগণ যে, এ সময়ে তাঁহাদের ক্ষমতা বিনষ্ট, তাঁহাদের আধিপত্য বিলুপ্ত, তাঁহাদের সমুদয় কার্য্য বিশৃঙ্খল করিতে উদ্যত হইয়াছে, ইহা যেন তাঁহাদের মনেও স্থান পাইল না। ইউরোপীয়গণ এইরূপ প্রশান্তভাবে থাকিলেও, কর্ত্তৃপক্ষ আকস্মিক বিপ্লব নিবারণের জন্য যথোপযুক্ত উপায়ের অবলম্বনে উদাসীন থাকেন নাই। ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গিগণ সখের সৈনিকদলে প্রবেশ করিলেন। যাঁহাদের স্ত্রী-পুত্র নাই, কোনরূপ পার্থিব বন্ধনে যাঁহারা আবদ্ধ নহেন, তাঁহারা সন্তুষ্টচিত্তে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক নগরের বহির্ভাগ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। যাঁহারা পরিবারবদ্ধ হইয়া বাস করেন, তাঁহারা কেবল নগরের পরিদর্শনকার্য্যে নিয়োজিত হইলেন। নগরের ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহের শান্তপ্রকৃতি অধিবাসীদিগকে অভয়দান করা, এবং উদ্ধতস্বভাব লোকদিগকে ভয়প্রদর্শন করা, ইহাদের প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইল।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

মায়াবাদ।

সুখীর উক্তি।

বলেছেন শাস্ত্রকার স্বপ্ন এ সংসার;—
হায় হায় তাই যদি হয়;—এ জীবন,
যদি মাত্র শুধু হায় অভিনয় সার;
তবে আর কেন? হোক্ চক্ষুরুন্মীলন;

পড়ে যাক্ যবনিকা ; মিথ্যা—কুহেলিকা,
সুধাসিক্ত অন্ধকার দূর হোক্, ছুটি
আসুক সত্যের সূর্য্য, বক্ষোদেশে ফুটি
রহুক তাহার কোটি আলোক—ছুরিকা।
এত স্নেহ ভালবাসা, এত সুখ সাধ,
—অতি মৃদু অতি ক্ষীণ কুসুমের প্রায়—
সকলি হউক ভস্ম সে প্রখরতায়।
চির—অবসিত হোক্ আনন্দ, বিষাদ।
বহুক ভীষণ ঝড়, উন্মথিত করি
এ সাহারা অগ্নিসিন্ধু চিরদিন ধরি॥

দুঃখীর উক্তি।

হে ঈশ্বর, এ জগৎ তব
হোক্ হোক্ মায়ার সৃজন।
ইহা যেন সত্য নাহি হয় ;
হোক্ প্রভু প্রপঞ্চ স্বপন।
এস এস ওহে মায়াবাদী,
করি তব চরণ গ্রহণ।
বলে যাও অলংঘ্য যুকতি,
শঙ্কাশূন্য কর মম মন।

কি আনন্দ, কি আনন্দ রে!
এ জগৎ সত্য নহে—নহে॥
কি আনন্দ! সত্য নহে আমি
লুঠিতেছি তাহার বিরহে॥
কি আনন্দ! যে শোক-অনলে
এই প্রাণ নিশিদিন দহে,
নাহি—নাহি অস্তিত্ব তাহার ;—
মায়াবাদী, এ জ্ঞান ধন্য হে!

এত দুঃখী আমরা যেখানে,
সে জগৎ হোক্ স্বপ্নময়।
যে জগতে সুখ, জাগরণ,
সেই হোক্ সু চির আলয়।
শূলময় প্রবাস-স্বপন
ত্যজি গৃহে জাগিব নিশ্চয়।
ফুলময় সে শুভলোকের
শোভা সুখে মানিব বিস্ময়।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

মনের প্রতি।

ওরে মন, তুই আমারি কি নোস্?
কেবলি আমার একা?
আমারি মরমে রহিবি লুকানো,
কাহারে দিবিনে দেখা?
তোর মালা শুধু পরিব আমি,
তোর গান শুধু শুনিব আমি,
দুজনে মিলিয়া দিবস যামি
রহিব স্বপনে ভোর!
জগতের মাঝে কেবলি রহিব
তোর আমি, তুই মোর?
ফুলের মাঝারে মধুর সম
তারার মাঝারে আলোক সম
মিশে র'বি তুই হৃদয়ে মম
এই ত ছিলরে কথা;
আজ কেন মন, হোলিরে এমন?
বড় যে পেতেছি ব্যথা!
আজ কেন মন হোলিরে এমন?
আমারে চাস্‌নে যেন?
অবহেলা কোরে ফেলিয়ে আমায়
কাহারে খুঁজিস্ হেন?
দীরঘ নিশাস্ ফেলিস্ ধীরে,
পথ হোতে কেন আঁখি না ফিরে?
দীপরশ্মি সম শিখা হোতে ঝোরে,
বাহিরে লুটাতে আশ,
সাঁজের বাতাসে সুরভির মত
কাহাতে মিশাতে চাস্?
মনে যদি তোর জেগে ওঠে এবে
সহসা একটি গান,
একটি কথা কি একটি বাসনা
ব্যাকুল করে ও প্রাণ ;
আমারে শুনায়ে পাস্‌নে সুখ,
অবনত কোরে রহিস্ মুখ,
কেন মন হোল মোদের দুজনে
এমন বিবাদ বল্?
অভিমানে দেখ্, নয়ন আমার
করিতেছে ছল্ ছল্!
বল্ শুনি মন, বারেক আমায়
তুই কি আধেক কার?
কোন্ সুলগনে কাহার নয়নে
দেখেছিস্ ছায়া তার।
দুটিতে মিশিয়া একটি হোতে ;
একত্রে ভাসিতে জীবন স্রোতে,
বড় সাধে বুঝি আকুল হইয়া
ভুলিয়া গেছিস্ মোরে ;
ছি, ছি, তুই মন, হবি যে এমন
আগে কে জানিত ওরে!

শ্রীবিনয় কুমারী ধর।

অশ্রু।

নীরদ আঁখির জল,
দিবারাতি করি পাত,
সিক্ত করি হিমাদ্রির শিলাময় ও পরাণ ;
ছুটায় নির্ঝর শত,
কঠিন সে বুক হোতে,
উন্মত্ত উল্লাসে তারা চলে যায় গেয়ে গান।
সেইরূপ একদিন,
আজি হোক্ কালি হোক্,
শোক-তপ্ত আঁখি জল এই অভাগার হায় ;
ভেদিয়া, তাচ্ছীল্যে ঘেরা
পাষাণ হৃদয় তব,
ফুটাবে প্রেমের উৎস, রোধিতে নারিবে তায়।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র সেন।

জ্যোতিষ।

প্রথম অধ্যায়।

নভো-মণ্ডলের সাধারণ দৃগ্‌বিষয়।

(১)

নভো-মণ্ডলের ধ্যান।—মেঘ নাই, কুয়াশা নাই, চন্দ্র উদিত নাই, এমন পরিষ্কার অথচ অন্ধকার রজনীতে, একটু নিশ্চিন্ত হইয়া, অর্থাৎ সাংসারিক ব্যাপার হইতে ক্ষণকালের জন্য অবসর লইয়া, ঊর্দ্ধে নেত্রপাত করিলে, নভোমণ্ডলের অনির্ব্বচনীয় শোভা সন্দর্শন করিয়া অপূর্ব্ব বিস্ময় রসে পরিপ্লুত হইতে হয়। আকাশে তুষার মণ্ডিত উত্তুঙ্গ শিখরশালী হিমবান্ নাই, উত্তাল তরঙ্গমালা বিভূষিত সাগর নাই, এমন কিছুই নাই যে, দেখিবামাত্র চমকিত,—বিস্মিত হইতে হয় ; অথচ কেবল ঐ তারাস্তূপ তারাস্তর, তারামালা সমূহ নিরীক্ষণ করিতে করিতে হৃদয়-কন্দরে অনাদির, অনন্তের, অসীমের, মহত্ত্বের এবং সৌন্দর্য্যের অস্ফুট ভাব আবির্ভূত হয় এবং তন্নিবন্ধন বিস্ময়-বিমিশ্রিত ভক্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজ করিতে থাকেন। এই কারণেই কবি বলেন,—

ব্যতিযজতি পদার্থানান্তরঃ কোঽপি হেতু
র্ন খলু বহিরুপাধীন্ প্রীতয়ঃ সংশ্রয়ন্তে।
বিকশতি হি পতঙ্গস্যোদয়ে পুণ্ডরীকম্
দ্রবতি চ হিমরশ্মাবুদ্‌গতে চন্দ্রকান্তঃ॥

মনোমধ্যে কত প্রশ্নের উদয় হয়, কত তথ্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি জন্মে ; আবার কত ভাব মানসিক বৈক্লব্য প্রযুক্ত প্রতিজ্ঞারূপে পরিণত হইতে পারে না। এই অসীম শূন্যসাগরের কি সীমা নাই? এই অতলস্পর্শ গহ্বরের কি তল নাই? এই সংখ্যাতীত জ্যোতিষ্কের কি সংখ্যা নাই? অসীম শ্যামসাগরে ভাসমান এই অসংখ্য দীপমালা কি সেই অনাদির সেই অনন্তের মহোৎসব উপলক্ষে নিরাজনা বিধি,—দীআলী অথবা ত্রিদশাধিপতি সহস্রলোচন নির্নিমিষলোচনে বিশ্বসংসার অবলোকন করিতেছেন? এই হীরার রাশি সকল কোন্ খনি হইতে, কিরূপে, কে আনিল, কে ঢালিল, কে ছড়াইল, কে বুনিল? এই রত্নরাজি সকল কি এতই অকিঞ্চিৎকর যে, এ গুলি নিশীথিনীর শ্যামল বক্ষে লণ্ডভণ্ড হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে? কেউ

আদর ক'রে গাঁথে না, কেউ যত্ন ক'রে গুছায় না। জ্যোতিষ্কগণের কি কোন উদ্দেশ্য আছে? ইহারা কি এই ভাবে চিরকাল অবস্থিতি করিতেছে? অথবা ইহারা কোন পুণ্যতম তীর্থাভিমুখে সংযাত্রায় প্রবৃত্ত আছে?

দৈনিক গতি।—এইরূপ চিন্তা-স্রোতের বেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে দেখা যায় যে, তারাগুলি স্থির নাই, প্রায় সকলেই চলিতেছে। যে গুলি পূর্ব্ব আকাশে প্রায় ভূমিসংলগ্ন ছিল বা বৃক্ষাদির উপরে দেখা যাইতেছিল, সে গুলি ক্রমে ক্রমে মাথার দিকে আসিতেছে এবং নূতন নূতন তারার উদয় হইতেছে; যে গুলি মাথার উপর পানে ছিল সে গুলি একে একে পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িতেছে। আবার যে তারাগুলি পশ্চিম আকাশে মাটীর বা গাছ পালার উপর ছিল, সে গুলি ডুবিতেছে। আর একটু ভাবিয়া দেখিলে জানা যায় যে, তারা গুলি চলিতেছে বটে, কিন্তু উহাদের ভাব ভঙ্গির ব্যত্যয় ঘটিতেছে না। যে তারা, যে ভাবে, যার দিকে, যতদূরে ছিল, সে তারা সেই ভাবে, সেই দিকে, তত দূরে থাকিয়া চলিতেছে। আজ রাত্রিতে আকাশের নক্সায় তারাগুলিকে যে যে স্থানে দেখিবে, কাল রাত্রিতে নক্সা করিলে সে গুলিকে তেমনই ভাবে দেখিবে, হাজার হাজার বর্ষ পরেও তেমনই ভাবে দেখিবে। তারাগণের ভঙ্গি কলিকাতা হইতে যেমন দেখিতেছ, গ্রীনুইচ হইতে তেমনই দেখিবে, ওয়াসিংটন হইতে এবং জেদো হইতেও তেমনই দেখিবে। ফল কথা এই যে, সমস্ত আকাশমণ্ডল যেন একটা কাঁচের ফাঁপা গোলা; তারাগুলি যেন এক একখানি হীরা, ঐ গোলায় লাগান রহিয়াছে, আর পৃথিবী একটী বিন্দুবৎ ঐ গোলার মাঝারে রহিয়াছে। গোলাটি ঘুরিতেছে।

নভোমণ্ডলের অক্ষ।—গোলাটি ঘুরিতেছে বলিলেই বুঝিতে হইবে কিছুর চারিদিকে ঘুরিতেছে; যেমন নাটাই ঘুরে একটা শলার চারিদিকে, কুমারের চাক ঘুরে একটা আলের চারিদিকে, তেমনই নভোমণ্ডল যেন একটী কল্পিত শলাকা পরিতঃ আবর্ত্তন করে। ঐ শলাকাকে জ্যোতিষীরা নভোমণ্ডলের অক্ষ বলেন; যেমন গৃহস্থের মেয়েরা ঢেঁকির আখশলী বলেন, গাড়োয়ানেরা গাড়ীর অথ বলে। ঐ অক্ষের উভয় প্রান্ত বা আল যেন আকাশে গাঁথা আছে, উহার নড় চড় নাই। উত্তরের আল্‌কে উত্তর কেন্দ্র ও দক্ষিণের আল্‌কে দক্ষিণ কেন্দ্র বলে। উত্তর কেন্দ্র হইতে ১ অংশ ১৫ কলা অন্তরে একটী তারা আছে, তাহাকেই ধ্রুবতারা বলে; কারণ বোধ হয় যেন ঐ তারাটীর গতি নাই, ঐটীই কেন্দ্র। কিন্তু ধ্রুব বস্তুতঃ কেন্দ্র হইতে উক্ত পরিমাণ অন্তরে থাকিয়া কেন্দ্র পরিতঃ ধীরে ধীরে পরিভ্রমণ করে। বলিলাম, ধ্রুব কেন্দ্র হইতে ১অংশ ১৫ কলা অন্তরে থাকে; এখন ১।১৫ অংশাদি আকাশের কতটুকু, তাহা বুঝা আবশ্যক। পূর্ণিমার চাঁদের মাঝামাঝি মাপ প্রায় আধ অংশ বা ৩০ কলা; তবেই বাস্তব কেন্দ্র হইতে ধ্রুব ২½ চাঁদ তফাতে থাকিয়া ঘুরেন।

কোন্ তারাটী ধ্রুব?—রাত্রিকালে উত্তর আকাশ নিরীক্ষণ করিলে, প্রতিনিশ কোন না কোন সময়ে, সপ্তর্ষি পুঞ্জ দৃষ্টিগোচর হয়; ইহার অপর নাম চিত্র শিখণ্ডী (১) এই সাতটী তারা সমধিক উজ্জ্বল, এবং কিয়ৎ পরিমাণে ময়ূরাকারে বা শকটাকারে (২) বিন্যস্ত থাকায় এই পুঞ্জকে খুঁজিতে বড় কষ্ট হয় না, এবং অনায়াসে চিনা যায়।

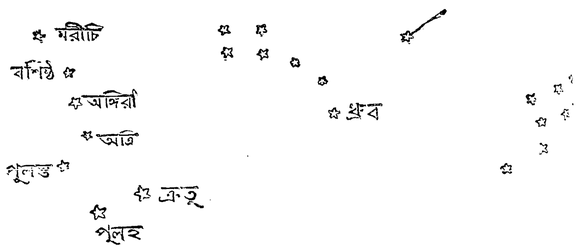

এই চিত্রের বামে সপ্তর্ষি। ইউরোপীয়েরা ইহাকে অর্যামেজর বা গ্রেটবেয়ার অর্থাৎ বৃহদৃক্ষ বলেন, এবং ইংরাজদিগের মধ্যে সাধারণ লোকে ডিপ্‌পার বা শকট বলিয়া থাকে। মধ্যের পুঞ্জে যে সাতটি তারা সপ্তর্ষি আকারে বিন্যস্ত অথচ ঔজ্জ্বল্যে ও আয়তনে অপেক্ষাকৃত ন্যূন ও সাতটির নাম ধ্রুবমৎস্য (৩) বা শিশুমার (৪)।

(১) সপ্তর্ষয়ো মরীচ্যত্রিমুখাশ্চিত্রশিখণ্ডিনঃ। অমর কোষঃ।

(২) স্ফুটতরমুপরিষ্টাদল্প মূর্ত্তের্গ্রহস্য
স্ফুরতি সুরমুনীনাং মণ্ডলং ব্যস্ত মেতৎ।
শকটমিব মহীয়ঃ শৈশবে শার্ঙ্গপাণে
শ্চপল চরণকাজ প্রেরণোত্তুঙ্গিতাগ্রম্॥ ১১। ৩। মাঘে।

(৩) ভার্কেন্দূনাং বিলোক্যাত্র ধ্রুবমৎস্য পরিভ্রমং॥ ৩। ১০। শি।
সৌম্যে মীনাকৃতির্ভানাং ধ্রুবমৎস্য ইতি শ্রুতঃ॥ সিদ্ধান্ত দর্পণে?

(৪) তারাময় ভগবতঃ শিশুমারাকৃতিঃ প্রভোঃ।
দিবি রূপং হরের্যত্তু তস্য পুচ্ছে স্থিতো ধ্রুবঃ। বিষ্ণু পুরাণং।
৯। ২। ১।

ইউরোপীয়েরা এই পুঞ্জকে ক্ষুদ্রর্ক্ষ বলেন। দক্ষিণের ছয়টীর নাম কাশ্যপেয়ী, (৫) ইউরোপীয় নাম কেশিওপিয়া। সপ্তর্ষির পুলহ ও ক্রতু নামক তারা দুইটীকে সূচক বলে। এই দুইটী তারা দিয়া মনে মনে রেখা টানিয়া বর্দ্ধিত করিলে, ঐ রেখা শিশুমারের পুচ্ছের তারা দিয়া যায়, এই তারাকেই ধ্রুবতারা বলে। আর অত্রি হইতে ধ্রুব দিয়া রেখা কল্পনা করিলে সে রেখা কাশ্যপেয়ীর থ দিয়া যাইবে। এখন ধ্রুবতারা কোন্‌টী তাহা জানা গেল।

নভোমণ্ডলের আবৃত্তিকাল।—অর্থাৎ কতক্ষণে সমস্ত আকাশ একবার ঘুরে।—যদি একটি টিনের নলের ভিতরে খাড়াভাবে একটি সরু তার লাগান যায়, আর নলটি এমন করিয়া বসান যায় যে উহা না নড়ে চড়ে, তবে রাত্রিকালে যে সময় কোন তারা চলিতে চলিতে নলের ভিতর আসিয়া ঐ তারে পৌছায়, আর তখন সময় কত তাহা ঘড়ী দেখিয়া লিখিয়া রাখ, তাহা হইলে দেখিবে যে পর রাত্রিতে ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেণ্ড পরে ঐ তারা আবার সেই তারে আসিয়া লাগিবে। অতএব এই ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেণ্ড সময়ে সমস্ত আকাশ একবার ঘুরিল। নলটি একটু উচু বা নীচু করিয়া বসাইলে দেখিবে অন্যান্য তারা উহার ভিতর দিয়া চলিতেছে এবং তাহাদের আবৃত্তি কালও ঠিক ঐ ২৩। ৫৬। ৪ ঘণ্টাদি।

নাক্ষত্র দিন।—সমস্ত আকাশ যে সময়ের মধ্যে একবার ঘুরে সেই সময়কে নাক্ষত্র দিন বলে। এই নাক্ষত্র দিন ৬০ দণ্ডে বিভক্ত; ১দণ্ডে ৬০ পল, ১ পলে ৬০বিপল; অথবা ১ দিনে ২৪ ঘণ্টা, ১ ঘণ্টায় ৬০ মিনিট, ১ মিনিটে ৬০ সেকণ্ড। নভোমণ্ডল ৩৬০ অংশে বিভক্ত; অতএব যখন ২৪ ঘণ্টায় ৩৬০° ঘুরে তখন ১ঘণ্টায় ১৫°, ১ মিনিটে ১৫′ এবং ১ সেকণ্ডে ১৫″ ঘুরে।

সংখ্যাবাচক শব্দের উপর একটু ডাইন দিকে ° এরূপ চিহ্ন থাকিলে বৃত্তের অংশ বুঝায়; ′ এইরূপ চিহ্ন থাকিলে ঐ অংশের ৬০ ভাগের একভাগ কলা বুঝায়; আর ″ এইরূপ চিহ্ন থাকিলে ঐ কলার ৬০ ভাগের একভাগ বিকলা বুঝায়।

আহ্নিক গতির বিরাম নাই।—কিবা রাত্রি কিবা দিন নভোমণ্ডল অবিরত ঘুরিতেছে। কিন্তু দিনের বেলা দৃশ্য বদলিয়া যায়। শত সহস্র তারার পরিবর্ত্তে এক প্রকাণ্ড প্রজ্বলিত বহ্নিমণ্ডল দর্শন করি। এই মহামহিম জবাকুসুম সংকাশ দিনমণি এই পৃথিবীকে মুক্তহস্তে আলোক ও তাপ দান করেন। ইহাকে আমরা সূর্য্য বা সবিতা বলি; কারণ ইনিই এই জগতের উৎপত্তির কারণ, ইহারই প্রসাদে এই জগৎ রহিয়াছে। ইহার কিরণ এত প্রখর যে তাহাতে অর্থাৎ দিনের বেলা নক্ষত্র আদি অন্যান্য জ্যোতিষ্কের আলোক টের পাওয়া যায় না, চাঁদ পর্য্যন্ত যেন নিবে থাকে। অত্যন্ত তেজস্বী দূরবীক্ষণ সহায়ে সূর্য্য বিদ্যমানেও উজ্জ্বল তারা সমস্ত দেখা যায়। যে তারাগুলি সূর্য্যের অত্যন্ত নিকটস্থ, কেবল সেইগুলি দৃষ্টিগোচর হয় না। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, নভোমণ্ডলের পরিভ্রমণ যেমন রাত্রিকালে, তেমনই দিবাভাগে, হইয়া থাকে।

সকল জ্যোতিষ্কই এই দিনগতির বশবর্ত্তী। কিন্তু রবি, চন্দ্র, গ্রহগণ, এবং ধূমকেতু সকলের আপন আপন গতি আছে; সেই গতি নিবন্ধন তারাগণের মধ্যে তাহাদের অবস্থানের পরিবর্ত্তন দেখা যায়। অদ্য যেখানে একটি গ্রহ দেখিলাম কল্য, কল্য না হয় দু পাঁচদিন পরে, দেখিব যে সেটি একটু পূর্ব্বদিকে স'রে গিয়াছে।

এই স্থলে একটু থামিতে হইবে; কারণ ইহার পর জ্যোতিষিক কথা প্রসঙ্গে, মধ্যে মধ্যে এক একটা এমন শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে যে, সেগুলির অর্থ সহজে বুঝা যায় না। এরূপ শব্দকে পারিভাষিক শব্দ বলে। জ্যোতিষে কেন, সকল শাস্ত্রেই পারিভাষিক শব্দ আছে, সেগুলি না বুঝিলে প্রস্তাব বুঝা যায় না।

গণনার সুবিধার জন্য, এবং শাস্ত্রার্থ সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবার জন্য, জ্যোতিষীরা নভোমণ্ডলে এবং ভূমণ্ডলে কতিপয় বিন্দু, রেখা, বৃত্ত ও ক্ষেত্র কল্পনা করিয়াছেন। কি আকাশে, কি পৃথিবীতে, বিন্দু-জ্ঞাপক কোন থাম গাঁথা নাই, রেখা-জ্ঞাপক কোন প্রাচীর গাঁথা নাই, অথবা বৃত্ত-জ্ঞাপক কোন লোহার পতর মারা নাই; অথচ কোন

(৫) পূর্ব্বভাগে ভগবান্ মরীচিরপরে স্থিতো বশিষ্ঠোঽস্মাৎ।
তস্য অঙ্গিরাস্ততোঽ ত্রিস্তস্যাসন্নঃ পুলস্ত্যশ্চ॥
পুলহঃ ক্রতুরিতি ভগবানাসন্নানুক্রমেণ পূর্ব্বাদ্যাঃ।
বৃহৎ সংহিতা। ১০। ৫। ৬
যুগাদৌ বিষ্ণুতারায়া ক্রতুর্ভাদ্যে ব্যবস্থিতা।
প্রাচ্যাং ত্রিভাগৈঃ পুলহঃ পুলস্ত্যো হতো দশাংশকৈঃ॥
অত্রি স্তত স্ত্রিভির্ভাগৈঃ অঙ্গিরা অষ্টভি স্ততঃ।
বশিষ্ঠ সপ্তভি স্তস্মান্মরী চির্দশভিস্ততঃ॥ কমলাকরঃ॥

গ্রহের অবস্থান বা গতি জানাইতে হইলে বলিতে হইবে অমুক বিন্দু বা বৃত্ত বা রেখা হইতে অমুক দিকে এতদূরে গ্রহ আছে।

ক্ষেত্র।—যে সমতল পদার্থের উপর কোন আকারের চিত্র করা যায়, সেই সমতল পদার্থের উপরিভাগকে ক্ষেত্র বলে। কাগজে ঘর আঁকিলে ঐ কাগজের উপরিভাগ ঐ ঘরের ক্ষেত্র হইল। কিন্তু জ্যোতিষীর বা গণিতজ্ঞের ক্ষেত্র কথঞ্চিৎ ভিন্ন ভাবের। তাঁহার বিন্দু, রেখা ও বৃত্ত্যাদি যে সমতলে অবস্থিত সেই কল্পিত সমতলই তাহার ক্ষেত্র। ক্ষেত্রের ভাব অবিলম্বেই হৃদয়ঙ্গম হইবে!

ত্রিজ্যাবৃত্ত।—কোন গোলে বৃত্ত অঙ্কিত করিলে ঐ বৃত্তের ক্ষেত্র যদি ঐ গোলের মধ্য দিয়া যায়, তবে ঐ বৃত্তকে ত্রিজ্যাবৃত্ত বলে। ক্ষেত্রের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য ভাবিয়া দেখ এখানে ক্ষেত্র শব্দ দ্বারা কি উপলব্ধি হইতেছে। গোলকে যে কোনরূপে এক কোপে বা চোটে দ্বিখণ্ড করিলে প্রত্যেক খণ্ড যদি সমান হয়, তবে প্রত্যেক খণ্ডের পরিধি ত্রিজ্যাবৃত্ত হইবে; আর গোলকে অসম দ্বিভাগ করিলে প্রত্যেক খণ্ডের পরিধি হ্রস্ববৃত্ত হইবে। ত্রিজ্যাবৃত্তকে সাধারণতঃ বৃহদ্বৃত্ত বলে।

ত্রিজ্যা শব্দের ব্যুৎপত্তি।—ত্রিজ্যা = ৩রাশির জ্যা = ৯০°এর জ্যা = ব্যাসার্দ্ধ। অর্থাৎ গোলকের ব্যাসার্দ্ধ গোলগত যে বৃত্তের ব্যাসার্দ্ধের সমান তাহাই ত্রিজ্যাবৃত্ত বা বৃহদ্বৃত্ত।

বিষুবন্মণ্ডল।—নভোমণ্ডলের অক্ষ কি তাহা এখনই বলিয়া আসিলাম। সেই কল্পিত অক্ষরেখা অবশ্য ভূগর্ভ দিয়া যায় অর্থাৎ পৃথিবীর মাঝার দিয়া যায়। এখন মনে মনে নভোমণ্ডলে এমন একটি বৃহদ্বৃত্ত অঙ্কিত কর যে, উহার ক্ষেত্র পৃথিবীর মাঝার দিয়া যায়, আর পূর্ব্বোক্ত অক্ষ ঐ বৃত্তের ক্ষেত্রে খাড়া হইয়া অর্থাৎ লম্বিতভাবে থাকে। এই বৃত্তকে বিষুবন্মণ্ডল, বা বিষুবদ্বৃত্ত বা নাভীমণ্ডল বলে। পৃথিবীর যে নিরক্ষ বৃত্ত তাহা এই বিষুবন্মণ্ডলের সমক্ষেত্রিক ও সমকেন্দ্রিক। বিষুবন্মণ্ডলটা আকাশের কোন্ খানটা পানে আছে তাহা একটু পরেই আঁকিয়া দেখাইব।

লম্বরেখা।—একটী ওলন ঝুলাইয়া দিলে, ওলনের সূতা যখন স্থির হয়, তখন ঐ সূতাকে, অর্থাৎ ঐ সূতার অবস্থান গত কল্পিত সূতাকে, লম্বসূত্র বা লম্বরেখা বলে। লম্বরেখা দ্রষ্টার ক্ষিতিজে লম্বিত। এই লম্বরেখা বর্দ্ধিত করিলে দৃশ্য খগোলার্দ্ধের যে স্থান স্পর্শ করে, তাহাকে খ-স্বস্তিক বা খ-বিন্দু বলে; এবং ক্ষিতিজ ক্ষেত্রের অধঃস্থিত অদৃশ্য খগোলার্দ্ধের যে স্থান স্পর্শ করে, তাহাকে অধঃস্বস্তিক বা অধোবিন্দু বলে। ফলতঃ যিনি যেখানে দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার মাথার উপর আকাশে যে বিন্দু, তাহাই সেখানের খ-বিন্দু এবং উহার বিপরীত দিকে অদৃশ্য আকাশে যে বিন্দু তাহাই সেখানের অধোবিন্দু। খস্বস্তিক এবং অধোবিন্দু ক্ষিতিজের দুটী পৃষ্ঠকেন্দ্র স্বরূপ, কারণ আকাশের ঐ দুই বিন্দু দিয়া যত বৃত্ত কল্পনা করিবে, তৎসমুদয় ক্ষিতিজ বৃত্ত দ্বারা দ্বিখণ্ডিত হইবে।

খ-স্বস্তিককে খ বিন্দু খটিকা এবং মধ্যবিন্দুও বলে। ঐ স্থলে স্বস্তিক শব্দের অর্থ বিন্দু।

দৃগ্‌বৃত্ত।—যে সকল বৃত্তের ক্ষেত্র লম্বরেখাগত সেই সকল বৃত্তকে দৃগ্‌বৃত্ত দৃগ্‌বলয় বা দৃন্মণ্ডল বলে; এ সূত্রের দ্বারা বোধ করি দৃগ্‌বৃত্ত যে কি তাহা ঠিক বুঝা গেল না। মনে কর লম্ব সূত্র খাড়া রহিয়াছে, আর তুমি কতকগুলা অভ্রের বড় বড় চাকা তৈয়ার করিলে, চাকাগুলা এত বড় যে উহার কিনারা আকাশে ঠেকে। এখন যদি ঐ অভ্রের চাকাগুলি পূর্ব্বপশ্চিমে উত্তর দক্ষিণে কোণাকোণী, যে কোন দিকে হউক, এমন করিয়া ধর যে, উহার মাঝার পৃথিবীর মাঝারের সঙ্গে এক হয়, আর উহার গায়ে ঐ ওলন সূতা কেবল মাত্র ঠেকে থাকে, এবং উহার পরিধি অর্থাৎ উপান্ত নক্ষত্র মণ্ডল দিয়া যায়, তবে ঐ চাকার পরিধিকে দৃগ্‌বৃত্ত বলিব।

যাম্যোত্তরবৃত্ত।—যে দৃগ্‌বৃত্ত খগোলের কেন্দ্র দিয়া যায় তাহাকে যাম্যোত্তর বৃত্ত বা মধ্যাহ্ন রেখা বা কেবল রেখা বলে। মধ্যাহ্ন রেখা অগত্যা খস্বস্তিক দিয়া যায়। কলিকাতার খস্বস্তিক ও নভোমণ্ডলের কেন্দ্রদ্বয় দিয়া যে দৃগ্‌বৃত্ত যায়, সে কলিকাতার যাম্যোত্তর বৃত্ত হইল।

উত্তর ও দক্ষিণ বিন্দু।—যাম্যোত্তর বৃত্তের লক্ষণ বলিলাম; ঐ বৃত্তের ক্ষেত্র অবশ্য পৃথিবীর অক্ষদিয়া যায় এবং উহা ক্ষিতিজের ক্ষেত্রে লম্বিত অর্থাৎ খাড়া। যাম্যোত্তর বৃত্তের ক্ষেত্র, আর ক্ষিতিজের ক্ষেত্র এই উভয় ক্ষেত্রের কাটাকাটী যে রেখায় হয়, তাহাই মধ্যরেখা। এই রেখা উত্তরে যেখানে ক্ষিতিজে ঠেকিল, সেই বিন্দুই উত্তর বিন্দু, আর যেখানে দক্ষিণে ক্ষিতিজে ঠেকিল, সেই বিন্দুই দক্ষিণ বিন্দু।

সমমণ্ডল।—যাম্যোত্তর বৃত্ত আমাদের মাথার উপর দিয়া ও আকাশের উত্তর ও দক্ষিণ কেন্দ্র দিয়া গেল। এখন যদি এমন একটি দৃগ্‌বৃত্ত কল্পনা করা যায় যে উহার ক্ষেত্র যাম্যোত্তর বৃত্তের ক্ষেত্রকে লম্বভাবে কাটে অর্থাৎ একটির ক্ষেত্র অপরটির ক্ষেত্রে মাটাম সহি হইয়া দাঁড়ায়, তবে এই দৃগ্‌বৃত্তের সমমণ্ডল নাম দেওয়া যায়। যাম্যোত্তর বৃত্তের ক্ষেত্র আর সমমণ্ডলের ক্ষেত্র যে রেখায় কাটাকাটী করিল, সেই রেখা পূর্ব্ব ও পশ্চিম রেখা হইল।

পূর্ব্ব ও পশ্চিম বিন্দু।—যে প্রাক্‌পশ্চিমা রেখার উল্লেখ করা গেল, ঐ রেখা যেখানে উত্তর বিন্দু হইতে ডাইনে ক্ষিতিজকে স্পর্শ করে, সেই বিন্দুর নাম পূর্ব্ব বিন্দু; আর উত্তর বিন্দু হইতে যেখানে বামে ক্ষিতিজকে স্পর্শ করে, সেই বিন্দুকে পশ্চিম বিন্দু বলে।

ক্ষিতিজ।—এতক্ষণ আমরা ক্ষিতিজের লক্ষণ না করিয়া ক্ষিতিজ শব্দ ব্যবহার করিতেছিলাম; তাহার কারণ এই যে, যে সকল বৃত্তাদির কথা বলিলাম তাহার মধ্যে একটা না একটা পাঠক জানেন, ইহা প্রথমে স্বীকার করিয়া লইতে হয়, নচেৎ সুবিধা হয় না। প্রথমে যে লম্ব সূত্রের কথা বলিয়াছি, সেই লম্ব সূত্র যে কল্পিত ক্ষেত্রের উপর লম্বিত অর্থাৎ ঠিক খাড়া, সেই ক্ষেত্রকে ক্ষিতিজক্ষেত্র বলে।

পৃষ্ঠক্ষিতিজ।—ক্ষিতিজ ক্ষেত্র যখন ভূপৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া নভোমণ্ডল স্পর্শ করে, তাহাকে পৃষ্ঠক্ষিতিজ বলে।

গর্ভক্ষিতিজ।—যে ক্ষিতিজ ক্ষেত্র ভূগর্ভ দিয়া নভোমণ্ডল স্পর্শ করে, তাহাকে গর্ভক্ষিতিজ বলে।

যদিও বস্তুতঃ পৃষ্ঠক্ষিতিজে ও ভর্গক্ষিতিজে ভূব্যাসার্দ্ধ অন্তর তথাপি নভোমণ্ডলের অসীম দূরত্ব প্রযুক্ত গর্ভক্ষিতিজ ও পৃষ্ঠক্ষিতিজ উভয়ে প্রত্যক্ষতঃ একটি বৃহদ্বৃত্তে পরিণত হইয়া নভোমণ্ডল স্পর্শ করে।

উন্নতাংশ।—ক্ষিতিজের উপর, অর্থাৎ যেখানে বোধ হয় আকাশে ও মাটীতে ঠেকাঠেকী হইয়াছে, তাহার উপর কোন গ্রহ বা নক্ষত্র কত উচ্চে আছে তাহার পরিমাণ করিতে হইলে, ঐ জ্যোতিষ্ক দিয়া একটী দৃগ্‌বৃত্তের কল্পনা করিতে হয়। ঐ দৃগ্‌বৃত্তের যে অংশটুকু ঐ জ্যোতিষ্ক আর ক্ষিতিজের মধ্যে রহিল, তাহাই ঐ জ্যোতিষ্কের ক্ষিতিজ হইতে উচ্চতার চাপাত্মক পরিমাণ। ঐ চাপটুকুর নাম উন্নতাংশ।

নতাংশ।—আর ঐ দৃগ্‌বৃত্তের যে অংশটুকু খ-স্বস্তিক আর জ্যোতিষ্কের মধ্যে রহিল সেইটুকুর নাম নতাংশ। নতাংশ উন্নতাংশের কোটি; কারণ নতাংশতে উন্নতাংশ যোগ করিলে বৃত্তপাদ অর্থাৎ ৯০ অংশ হয়।

দৃক্‌ক্ষেপ।—মনে কর কোন জ্যোতিষ্ক দিয়া একটী দৃগ্‌বৃত্ত কল্পিত হইল, ঐ দৃগ্‌বৃত্ত ক্ষিতিজ বৃত্তকে কাটিল। দৃগ্‌বৃত্ত ও ক্ষিতিজবৃত্ত যেখানে কাটাকাটী করিল সেই বিন্দু হইতে খগোলের উত্তর বিন্দু পর্য্যন্ত বা দক্ষিণ বিন্দু পর্য্যন্ত ক্ষিতিজবৃত্তের যে চাপাংশ তাহাকে দৃক্‌ক্ষেপ বলে।

বিস্তার।—ক্ষিতিজের যে বিন্দুতে কোন জ্যোতিষ্কের উদয় বা অস্ত হয়, সেই বিন্দু হইতে পূর্ব্ব বা পশ্চিম বিন্দুর যে চাপাত্মক অন্তর, তাহাকে বিস্তার বলে।

অগ্রা।—বিস্তারের জ্যাকে অগ্রা বলে।

নতাংশ এবং দৃক্‌ক্ষেপ দ্বারা জ্যোতিষ্কের অবস্থান নিরূপণ কেবল স্থান বিশেষে, এবং ক্ষণ বিশেষে, হইতে পারে। কিন্তু আহ্নিক গতি নিবন্ধন স্থান ও ক্ষণের প্রতি নিয়ত পরিবর্ত্তন হইতেছে। সুতরাং নতাংশ ও দৃক্‌ক্ষেপেরও প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তন হইতেছে। কেবল তাহাই নহে, ভিন্ন ভিন্ন দ্রষ্টা এক জ্যোতিষ্কের যুগপৎ ভিন্ন ভিন্ন নতাংশ ও দৃক্‌ক্ষেপ দেখেন। জ্যোতিষ্কের অবস্থান ক্ষিতিজ সম্বন্ধে অবধারিত না করিয়া বিষুবদ্‌বৃত্ত সম্বন্ধে অবধারিত করিলে দ্রষ্টার অবস্থানের অপেক্ষা করিতে হয় না, এবং স্থিরতার পক্ষে কালের উপরেও নির্ভর করিতে হয় না; কারণ স্থির তারাগণের যে গতি তাহা বর্ষে কতিপয় বিকলা মাত্র।

ধ্রুব প্রোত বৃত্ত।—খগোলের উভয় কেন্দ্র দিয়া যে বৃত্তের কল্পনা করা যায় তাহাকে ধ্রুব প্রোত বৃত্ত বলে। ধ্রুবপ্রোতবৃত্ত অবশ্য বিষুবদ্‌বৃত্তের উপর দিয়া লম্ব ভাবে চলিয়া যায়।

ক্রান্তি।—ধ্রুবপ্রোত বৃত্ত যদি কোন জ্যোতিষ্ক দিয়া যায়, তবে ধ্রুবপ্রোত বৃত্ত বিষুবদ্‌বৃত্তকে যে বিন্দুতে কাটে, সেই বিন্দু এবং ঐ জ্যোতিষ্কের মধ্যে ধ্রুবপ্রোত বৃত্তের যে অংশটুকু তাহাই ঐ জ্যোতিষ্কের ক্রান্তি।

জ্যোতিষ্ক যদি বিষুবদ্‌বৃত্তের উত্তরে থাকে, তবে তাহার

ক্রান্তিকে উত্তর ক্রান্তি বলে, আর যদি উহা বিষুবদ্‌বৃত্তের দক্ষিণে থাকে, তবে উহার ক্রান্তিকে দক্ষিণ ক্রান্তি বলে।

লম্ব।—ক্রান্তির কোটির নাম লম্ব; অর্থাৎ কেন্দ্র হইতে জ্যোতিষ্কের যে চাপাত্মক অন্তর তাহাই ঐ জ্যোতিষ্কের লম্ব; আর বিষুবদ্‌বৃত্ত হইতে ঐ জ্যোতিষ্কের যে চাপান্তক অন্তর তাহাই উহার ক্রান্তি; সুতরাং ক্রান্তি + লম্ব $= ৯০^{\circ}$।

বিষুবাংশ।—কোন জ্যোতিষ্ক দিয়া একটি ধ্রুবপ্রোত বৃত্ত কল্পনা কর। ঐ ধ্রুবপ্রোত বৃত্ত বিষুবদ্‌বৃত্তকে যে বিন্দুতে কাটিল, সেই বিন্দু হইতে বিষুবদ্‌বৃত্তের কোন নির্দ্দিষ্ট বিন্দু পর্য্যন্ত বিষুবদ্‌বৃত্তের যে খণ্ড সেই খণ্ড গত অংশাদি বিষুবাংশ। ঐ নির্দ্দিষ্ট বিন্দু হইতে বিষুবাংশের গণনা আরম্ভ হয় এবং ১,২,৩ ইত্যাদি অংশ বা ঘণ্টা মানে ৩৬০ অংশ বা ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত হয়। এই বিন্দুকে পাত বলে এবং উহা ♈ মেষের মুখাকৃতি চিহ্ন দ্বারা ব্যঞ্জিত হয়।

নতকাল।—যাম্যোত্তর বৃত্ত এবং কোন জ্যোতিষ্ক গত ধ্রুবপ্রোত বৃত্ত এতদুভয়ের অন্তর্গত যে কোণ তাহাকে ১৫ অংশে ১ ঘণ্টা, এই হিসাবে কাল মানে পরিণত করিলে নতকাল হইল।

দিনবৃত্ত।—যে বৃত্তে তারার ভ্রমণ হয় সেই বৃত্তের নাম দিনবৃত্ত। এই বৃত্ত বিষুবদ্‌বৃত্তের সমান্তর।

বিন্দু বৃত্ত ইত্যাদির লক্ষণ যথা সাধ্য বাক্য দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা পাইলাম। এক্ষণে রেখাময় চিত্র দ্বারা উক্ত বিন্দু ইত্যাদির অবস্থান দেখান যাইতেছে।

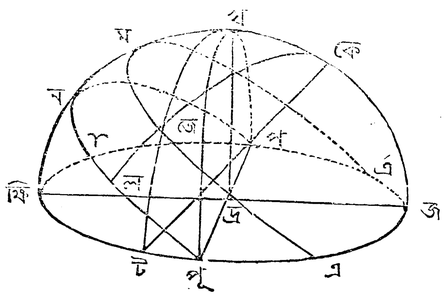

দ্র—দ্রষ্টা।
ক্ষি পূ জ প—ক্ষিতিজ।
খ—খস্বস্তিক।
জ্যো—জ্যোতিষ্ক।
এ ম এ´—দিনবৃত্ত।
দ্র কে—অক্ষ।
কে—কেন্দ্র।
ক্ষি খ জ—যাম্যোত্তর বৃত্ত।
ক্ষি জ—মধ্যরেখা।
জ—উত্তর বিন্দু।
ক্ষি—দক্ষিণ বিন্দু।
ক্ষ জ্যো ট—দৃগবৃত্ত।
প খ পূ—সমবৃত্ত।
পূ—পূর্ব্ববিন্দু।
প—পশ্চিম বিন্দু।
পূ ন প—বিষুবদ্‌বৃত্ত।
কে জ্যো ল—জ্যোতিষ্ক গত ধ্রুবপ্রোত বৃত্ত।
প—পাত।

ইষ্টকালে অর্থাৎ যখন ইচ্ছা তখনই কোন জ্যোতিষ্কের অবস্থান নিম্ন লিখিত ত্রিবিধ বৃত্তযুগলের মধ্যে অন্যতম বৃত্তযুগল সহায়ে অবধারিত হইতে পারে। যথা,

(১) ট জ্যো, উন্নতাংশ (বা খ জ্যো, নতাংশ), এবং ক্ষি ট, দৃক্‌ক্ষেপ,

(২) জ্যো ল, ক্রান্তি (বা জ্যো কে, লম্ব) এবং ♈ ল, বিষুবাংশ; অথবা

(৩) জ্যো কে, লম্ব, এবং জ্যো কে খ, এতকাল।

আহ্নিকগতি জনিত দৃগ্‌বিষয়।—তারাগণের সম্পূর্ণ আহ্নিকগতি যদি দর্শকের দৃষ্টিগোচর হইত, তবে দেখা যাইত যে তারা সকল নভোমণ্ডলের অক্ষরেখা-পরিতঃ বৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণ করিতেছে; কিন্তু অখিল খগোলের অর্দ্ধমাত্র নয়নগোচর হয়, অতএব স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে ঐ বৃত্তাকার পথের কিয়দংশ ক্ষিতিজের অধঃ, সুতরাং অদৃশ্য থাকে।

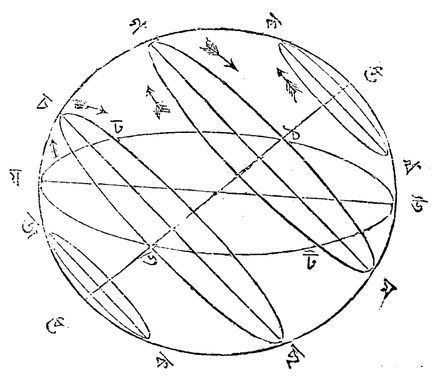

এই পরিলেখে কে র্কে নভোমণ্ডলের অক্ষ, উ ট ড য ঢ ঠ ক্ষিতিজ, য উ যাম্যোত্তর রেখা, ক খ, গ ঘ, চ ছ, জ ঝ চারিটি সমান্তর বৃত্ত। মনে কর এই চারিটি বৃত্তে চারিটী তারা চলে, তাহা হইলে বেশ বুঝা যাইতেছে যে,

১মতঃ যে তারার দৈনিক গতি ক খ বৃত্তে হয়, সে তারা কখন ক্ষিতিজের নীচে যায় না।

২য়তঃ যে তারা জ ঝ বৃত্তে গমনাগমন করে, সে তারা কখন ক্ষিতিজের উপর আসেনা।

৩য়তঃ যে তারা ঠ গ ট ঘ বৃত্তে চলে, তাহাকে ততক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, যতক্ষণ সে ঐ বৃত্তের ঠ গ ট খণ্ডের কোন স্থানে থাকে। আর ঐ বৃত্তের ঠ ঘ ট খণ্ড ক্ষিতিজের উর্দ্ধ অধঃ তজ্জন্য তারাটি যতক্ষণ ঠ ঘ ট এর কোন স্থানে থাকে, ততক্ষণ আর তারাটীকে দেখিতে পাওয়া যায় না।

৪র্থতঃ যে তারা ঢ চ ড ছ বৃত্তে চলে, তাহাকে ততক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়—যতক্ষণ সে ঐবৃত্তের ঢ চ ড খণ্ডের কোন স্থানে থাকে। আর ঐ বৃত্তের ঢ ছ ড খণ্ড ক্ষিতিজের অধঃ তজ্জন্য তারাটী যতক্ষণ ঢ ছ ড এর কোন স্থানে থাকে ততক্ষণ আর তারাটীকে দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই সকল তারা পূর্ব্বাকাশে ক্ষিতিজে ঠ এবং ঢ বিন্দুতে উদয় হয় এবং পশ্চিমাকাশে ক্ষিতিজের ট এবং ড় বিন্দুতে অস্তমিত হয়।

যে তারা রোজ রোজ গ ঘ পথে ঘুরে, তাহার গতির দৃশ্যাংশ ঠ গ ট অদৃশ্যাংশ ট ঘ ঠ অপেক্ষা বেশী; আর যে তারা রোজ রোজ চ ছ পথে ঘুরে, তাহার গতির দৃশ্যাংশ ঢ চ ড অদৃশ্যাংশ ঢ চ ড় অপেক্ষা কম।

জ্যোতিষ্কগণের পরাকোটি প্রাপ্তি।—যাম্যোত্তর বৃত্ত যে কেন্দ্রের উর্দ্ধ ও অধঃ দিয়া যায়, তাহা আর বুঝাইয়া দিবার আবশ্যক নাই।

যখন তারাগণ কেন্দ্রের উর্দ্ধে যাম্যোত্তর বৃত্ত অতিক্রম করে, তখন বলা যায় যে, তারাগণের পরাকোটি প্রাপ্তি হইল, অর্থাৎ তাহার উন্নতির পরম সীমায় আসিল। সকল তারাই অহোরাত্র মধ্যে যাম্যোত্তর বৃত্ত দুইবার পার হয়; একবার কেন্দ্রের উর্দ্ধে, আর একবার কেন্দ্রের অধঃ। যে তারা ক খ বৃত্তে ঘুরে তাহার উর্দ্ধ পরাকোটি ক এবং অধঃ পরাকোটি খএ হয়।

পরিলেখ দেখিয়া স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, যে সকল তারা নিরক্ষ বৃত্তের উত্তরে থাকে, সে সকল তারা ক্ষিতিজের উর্দ্ধে যতক্ষণ থাকে, তাহা অপেক্ষা ক্ষিতিজের অধঃ অল্পক্ষণ থাকে। যে সকল তারা নিরক্ষ বৃত্তের দক্ষিণে থাকে, তাহারা ক্ষিতিজের উপর যতক্ষণ থাকে, তাহা অপেক্ষা অধিকক্ষণ ক্ষিতিজের নীচে থাকে। আর যে সকল তারা নিরক্ষ বৃত্তে ভ্রমণ করে, তাহাদের স্থিতিকাল ক্ষিতিজের উর্দ্ধে যতক্ষণ, ক্ষিতিজের অধঃও ততক্ষণ।

স্থানবিশেষ সম্বন্ধে কতকগুলি তারা সতত উদিত—কতক গুলি তারা সতত অস্তমিত থাকে।—স্থানবিশেষের ক্ষিতিজের উত্তর বিন্দু উ দিয়া নিরক্ষ বৃত্তের সমান্তর বৃত্ত অঙ্কিত করিলে ঐ বৃত্তের উত্তর আকাশে স্থিত যে সকল তারা, তাহারা ঐ স্থান সম্বন্ধে সতত উদিত থাকে; আর ক্ষিতিজের দক্ষিণ (যাম্য) বিন্দু য দিয়া নিরক্ষ বৃত্তের সমান্তর বৃত্ত অঙ্কিত করিলে ঐ বৃত্তের দক্ষিণ আকাশে স্থিত যে সকল তারা তাহারা ঐ স্থান সম্বন্ধে সতত অস্তমিত থাকে। এই কারণ বশতঃ শ্রীনগরের উত্তরস্থিত ইয়ারকাণ্ড প্রভৃতি স্থানের লোকেরা অভিজিতকে বার মাস উদিত এবং অগস্ত্যকে বার মাস অস্তমিত দেখে। ইয়ারকাণ্ডের অক্ষাংশ ন্যূনাধিক ৩৮ অভিজিতের ক্রান্তি ৩৮ ৪১´ উত্তর অগস্ত্যের ক্রান্তি ৫২ ৩৮´ দক্ষিণ। কলিকাতার ক্ষিতিজের উপর শিশুমার ক্রমেল কাশ্যপেয়ী অক্ষক এবং সপ্তর্ষির উত্তরাংশ এই কয়েকটি উপরাশি সর্ব্বদা উদিত থাকে।

কতিপয় পারিভাষিক শব্দের ইংরাজি।

অংশ, Degree.
অক্ষ, Axis.
অগস্ত্য, Canopus.
অগ্রা, Sine of Amplitude.
অঙ্গিরা, Alioth.
অত্রি, Megrez.
অবঃ স্বস্তিক, Nadir.
অভিজিত, Vega Lyra.
অবস্থান, Position.
আবৃত্তি, Rotation.
উত্তর বিন্দু, North point.
উন্নতাংশ, Altitude.
কলা, Minute.
কাশ্যপেয়ী, Cassiopeia.
কেন্দ্র, Pole.
কোটি, Complement.
ক্রতু, Dubhe.
ক্রমেল, Camel.
ক্ষিতিজ, Horizon.
ক্ষুদ্রর্ক্ষ, Ursa-minor.
ক্ষেত্র, Plane.
খটিকা, Zenith.
খস্বস্তিক, Zenith.
খ বিন্দু, Zenith.
গর্ভক্ষিতিজ, Rational Horizon.
চাপাত্মক, Angular.
চিত্র শিখণ্ডি, Ursa Major.
জ্যোতিষ্ক, Heaveniy body.
তক্ষক, Draco.
ত্রিজ্যা, Sine of 90° বা Radius.
ত্রিজ্যাবৃত্ত, Great circle.
দক্ষিণ বিন্দু, South point.
দিনবৃত্ত, Stars diurnal circle.
দৃকক্ষেপ, Azimuth.
দৃগবিষয়, Phenomenon.
দৃগবৃত্ত, Vertical circle.
দৈনিক গতি, Diurnal motions.

দ্রষ্টা, Observer.
ধ্রুব, Pole star.
ধ্রুব প্রোতবৃত্ত, Declination circle.
নতাংশ, Zenith distance.
নতকাল, Hour angle.
নভোমণ্ডল, Celestial sphere.
নাক্ষত্র দিন, Siderial day.
নাভীমণ্ডল, Equinoxial.
নিরক্ষবৃত্ত, Equator.
পরাকোটি, Culmination.
পরিভ্রমণ, Revolution.
পশ্চিম বিন্দু, West point.
পাত, First Point of Axis.
পুঞ্জ, Constellation.
পুলস্ত্য, Pheeda.
পুলহ, Merak.
পূর্ব্ব বিন্দু, East point.
পৃষ্ঠকেন্দ্র, Pole of sphere.
পৃষ্ঠক্ষিতিজ, Sensible Horizon.
ভঙ্গি, Configuration.
ভূগর্ভ, Centre of earth.
ভূমণ্ডল, Sphere of Earth.
মরীচি, Alkaid.
মাটাম সহি, Square.
যাম্যোত্তর বৃত্ত, Meridian.
রাশি, Censtellation.
রেখা, Line.
লম্ব, Colatitude.
লম্বরেখা, Plumb line.
বশিষ্ঠ, Mizar.
বিকলা, Second.
বিন্দু, Point.
বিষুবদ্বৃত্ত, Equinoctial.
বিষুবন্মণ্ডল, Do.
বিস্তার, Amplitude.
বৃহদৃক্ষ, Ursa Major.
বৃহদ্বৃত্ত, Great circle.
শিশুমার, Ursa minor.
সমমণ্ডল, Prime vertical.
সমান্তর, Parallel.
সপ্তর্ষি, Ursa major.
সূচক, Pointers.
স্থিরতারা, Fixed star.
স্বস্তিক, Point.

কলিকাল।

(উপন্যাস।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিধবা হওয়ার পর সুষমা এই প্রথম শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছে। শাশুড়ী ত তাকে বরাবরই স্নেহের চক্ষে দেখেন, কিন্তু এবার যেন, স্নেহের গাঢ়তা আরও বাড়িয়াছে! তিনি বধূকে সদাই চোখে চোখে রাখেন, পাছে কোন বিষয়ে বধূ কষ্ট পায়। আসল কথা পুত্রবধূকে পাইয়া তিনি পুত্রের শোক নিবারণ করিতে চান, কিন্তু বৃথা চেষ্টা।

সুষমার বয়স যখন দশ, তখন সুকুমারের সহিত তাহার বিবাহ হয়। সে আজ পাঁচ বৎসরের কথা। প্রায় দুই বৎসর হইল, সুষমা বিধবা হইয়াছে।

সুকুমারের আর দুইটী সহোদর আছেন। জ্যেষ্ঠের নাম শিবচরণ। শিবচরণ কন্‌ট্রাক্টরি করেন, কাজেই প্রায়ই তাঁকে বিদেশে থাকিতে হয়। তাঁর স্ত্রীর নাম জয়কালী। শিবচরণ কখনও একস্থানে বেশীদিন থাকিতে পারেন না। তাই ইচ্ছা-সত্ত্বেও তাঁর পরিবার কাছে রাখা ঘটে না। এদিকে জয়কালী শ্বশুরবাড়ীতে থাকিতে ততটা ইচ্ছুক নন, বাপের বাড়ীতেই তাঁর বেশীদিন কাটে। বিশেষ জয়কালীর মারও আর অন্য ছেলেপিলে নাই, কেবল জয়কালী আর তাঁর একটী ছোট ভাই। জয়কালীর ছেলেবেলা হইতেই একটু বিশেষত্ব আছে, তিনি কাহারও অধীন থাকিতে পারেন না। গৃহিণীপনার সাধটা তাঁর বড়বেশী প্রবল। এদিকে শাশুড়ীঠাকুরাণী সে পক্ষে বড় কড়া। স্বভাবতঃ তিনি মাটীর মানুষ, মায়ামমতায় হৃদয়খানি যেন পূর্ণ! কিন্তু অন্যায় বা "অসইরণ" তিনি দুচক্ষে দেখিতে পারেন না। তাঁর কাছে বাড়ীর ছোটবড় সবাই সমান। জয়কালী কিন্তু ইহাতে বড় নারাজ। বলিতে গেলে তাঁরই স্বামী এখন বাড়ীর মধ্যে উপার্জ্জক, আর "সে" কি না পাঁচটার একটা! বিশেষ ছেলেপিলের মা হইয়াও কি আর এমন হাত তোলায় থাকিতে পারা যায় গা? শাশুড়ী বুড়া হ'য়েছে; এখনত তার হরিনাম জপিবার সময়। এ বয়সে কি ঘর সংসার দেখা তার ভাল দেখায়! তবুও যে সেই একচোখো শাশুড়ী মাগী "গিন্নিমি" ছাড়ে না, এর মানে কি জয়কালী বুঝে না! কিন্তু স্বামী যে তাঁর মা, মা, করিয়াই পাগল! পোড়া বুড়িটে মরেও না!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এখন শিবচরণ যে খুব মাতৃভক্ত, এমন কথা, ইতিহাসে লেখে না! দুষ্ট লোকে বলে, তিনি গভীর জলের মাছ। মাকে তিনি সহজে চটাইতে চান না। মার হাতে যে কিছু টাকা আছে, তাহা শিবচরণ বেশ জানিতেন। কন্‌ট্রাকটারী করিতে তিনি মার নিকট হইতে ইতিপূর্ব্বেই আড়াই হাজার টাকা লইয়াছেন!

জয়কালী বেশী দিন বাপের বাড়ী থাকিতেন বটে, কিন্তু তাঁর খরচ যোগাইতেন শিবচরণ! এদিকে শিবচরণ মাকে বুঝাইতেন, "মা, যে বউ তোমার কথার অবাধ্য, আমি তাকে বাড়ীতে স্থান দিই না।" মা জিভ কাটিতেন, বলিতেন, "অমন কথা বল্‌তে নেই।"

স্বভাবগুণে সবাই সুষমার উপর সন্তুষ্ট, কিন্তু জয়কালী তার উপর বরাবরই চটা! অত ন্যাকামো, "তার" ভাল লাগে না! মানব চরিত্র পাঠে জয়কালী অভ্রান্ত! জয়কালী বুঝিয়াছিলেন, এই মিটমিটে ডানটা ছেলে খাবারই যম! ওই যে অত ভাল মানুষ, এসবত কেবল ছল! কেবল শাশুড়ীর মন ভুলাইবার চেষ্টা!

সুষমা শ্বশুর বাটী আসার কিছু দিন পর জয়কালী বাপের বাড়ী গিয়াছিলেন। শাশুড়ীর অনুরোধে সুষমা প্রত্যহ আহারান্তে রামায়ণ কি মহাভারত পড়িত, শাশুড়ী শুনিতেন! শাশুড়ীও নানা রূপ গল্প, উপাখ্যান বলিতেন, সুষমা নিবিষ্ট মনে শুনিত। এইরূপে পরস্পরে পরস্পরকে শান্ত রাখিতেন। একই ব্যথায় উভয়ে ব্যথিত, উভয়েই উভয়ের ব্যথা বুঝিতেন, বুঝি সেও এক সান্ত্বনা!

অকস্মাৎ সুষমা মহা বিপদে পড়িল! তাহার শাশুড়ী সংশয়াপন্না পীড়িতা হইলেন। সুষমার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল! এ বিপদে সহায়হীনা সুষমা চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতেছিল; দৈবক্রমে একটু আলো দেখা দিল। সেই সময় তাঁহার দেবর ভূপেন্দ্র গ্রীষ্মাবকাশে শ্বশুর বাড়ী আসিয়াছিলেন। সুষমা তাঁর শাশুড়ীর ইচ্ছা মত সস্ত্রীক আসিবার জন্য সংবাদ পাঠাইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভূপেন্দ্র সস্ত্রীক বাটী পৌঁছিয়া দেখিলেন, বাস্তবিকই মার পীড়া বড় কঠিন। তাঁর ইচ্ছা, ভাল ডাক্তার আনাইয়া চিকিৎসা করান, কিন্তু মা কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। অগত্যা কবিরাজী চিকিৎসা অবলম্বন করিতে হইল। সে অঞ্চলে ভাল কবিরাজ নাই, ভূপেন্দ্র সেই জন্য প্রথম ডাক্তারীর পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। যাহোক কবিরাজ মহাশয় বিশেষ যত্নের সহিত চিকিৎসা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, বৃদ্ধ বয়সের এ রোগ চিকিৎসার অতীত!

মার অনুরোধে, ভূপেন্দ্র বড় বধূকে আনিতে পাল্কি বেহারা পাঠাইলেন। ইতি পূর্ব্বে জয়কালী, কি ওজরে আসিতে পারেন নাই; এবার সত্য সত্যই শাশুড়ীর বাঁচিবার আশা নাই জানিয়া জয়কালী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না! চোখের জল মুছিতে মুছিতে পাল্কীতে উঠিলেন। জয়কালীর মা তখন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, "একলা ঘরে গিন্নি হবি মা গো মা!"

ভূপেন্দ্র বাড়ী আসিয়াই পীড়ার সংবাদ শিবচরণকে দিয়াছিলেন, কিন্তু শিবচরণ ঠিক সময়ে পৌঁছিতে পারিলেন না! মাতাঠাকুরাণীর গঙ্গা লাভের দুই দিন পর তিনি বাটী পৌঁছিলেন।

শোকের প্রথম মুহূর্ত্ত অতীত হইলে শিবচরণ খোঁজ লইলেন, মা টাকাকড়ি ও গহনাপত্রের কি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। যাহা শুনিলেন, তাহাতে কিছু বিস্মিত হইলেন। শিবচরণের বিশ্বাস মার হাতে অন্ততঃ আরও দশ হাজার টাকা ছিল! কিন্তু এ মোট পাঁচ হাজার টাকার ফর্দ্দ, বাকী টাকাগুলা যায় কোথায়? আবার সেই পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে ভূপেন্দ্র আড়াই হাজার, মেজো বধূ দুই হাজার, আর বাকী মোট ৫০০ পাঁচশ বড় বধূ! গহনা অধিকাংশই ভূপেন্দ্রের স্ত্রী পাইয়াছে। তার স্ত্রীর ও কন্যার ভাগে কয়খানি মাত্র পড়িয়াছে। কন্‌ট্রাক্টরি করিতে শিবচরণ আগে মার নিকট আড়াই হাজার টাকা লইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাই বলে মা কি তাঁকে আর কিছুই দিয়া গেলেন না! কেমন একটা খট্‌কা শিবচরণের মনে বাধিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অন্যের মন বুঝিতে পারুন না পারুন, স্বামীর মন বুঝিতে অনেক স্ত্রীই নিপুণ জহুরী। মুখের আকার ইঙ্গিতেই তাঁরা স্বামীর মনের ভাব বুঝিয়া লন।

স্বামীর মনের নিভৃততলে, অতি গোপনে ফল্গুনদীর মত, যে ভাব লহরী খেলিতেছিল, জয়কালী অনায়াসে মানস-চক্ষে তাহা দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া যেন কিছুই বুঝেন নাই, এই ভাবে কথায় কথায় এই টাকা সম্বন্ধে নিজের ঘোর সন্দেহ প্রকাশ করিলেন, আর বলিলেন, "আমরা ত পরের মেয়ে, আমাদের কথা কি বিশ্বাস করবে? মায়ের পেটের ভাই, চোর হোক, বঞ্চক হোক, তার মত ত আর আমি তোমার আপনার নই?" ইত্যাকার দীর্ঘ ভূমিকা ফাঁদিয়া জয়কালী অবাধে বলিয়া চলিলেন,—"কত দিন মেজো বৌতে আর ভূপেনে পরামর্শ করিতে শুনেছি, আবার আমাকে দেখলেই অমনি তারা চুপ্ করিত", ইত্যাদি, ইত্যাদি। সোণায় সোহাগা মিলিল, শিবচরণের তখন আর সন্দেহের কারণ রহিল না। তিনি এত দিন অন্ধকারে ছিলেন; আজ সহসা আলো পাইয়া নিমেষে যেন সমস্ত বুঝিয়া ফেলিলেন।—ওঃ কি কলিকাল! শেষ আর মনের ভাব গোপন করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, "জয়! (শিবচরণ আদর করিয়া স্ত্রীকে জয় বলিয়া সম্বোধন করিতেন) মেজো বউত পরের মেয়ে,

সে না হয় ফাঁকি দিতে পারে, কিন্তু ঐ বাইশ বছরের ছোঁড়া ভূপেন্‌টা কল্লে কি? সে কি না ভাই হ'য়ে আমায় ফাঁকি দিলে? আর মা ই বা কি ব'লে বাকি টাকার কথা তোমায় লুকোলেন? তুমি যা বল্‌তে, এখন দেখ্‌চি, তা সবই ঠিক।" জয়কালী অমনি উৎসাহে, গর্ব্বে বলিয়া উঠিলেন, "দেখ্‌লে? কাঙ্গালের কথা বাসি হ'লে মিষ্টি লাগে।" তার পর স্বামী স্ত্রীতে যে সকল কথা-বার্ত্তা হইল, তাহা আর সকলের শুনিয়া কাজ নাই। অনেক কথাবার্ত্তার পর শেষ শিবচরণ প্রতিজ্ঞা করিলেন, এমন বুদ্ধিমতী স্ত্রীর পরামর্শ ভিন্ন শিবচরণ আর এক চরণও চলিবেন না। পণ্ডিতেরা ত বলিয়াই গিয়াছেন, "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মায়ের শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হইয়া গেলে শিবচরণ এক দিন ভূপেন্দ্রকে নির্জ্জনে লইয়া সাংসারিক অনেক রকম পরামর্শ করিলেন। ভূপেন্দ্র সাংসারিক বিষয়ে আগাগোড়াই দাদার মতে সায় দিয়া গেলেন। কথাবার্ত্তা শেষ হইলে, ভূপেন্দ্র উঠিয়া যাইতেছেন, তখন শিবচরণ ভূপেন্দ্রকে আবার ডাকিলেন, বলিলেন,—"দেখ ভাই হঠাৎ একটা কথা মনে হ'লো, তা, তা থাক, সেকথা একদিন হবে।" ভূপেন্দ্র চলিয়া যান, "তখন আচ্ছা আচ্ছা তা না হয় আজই হোক," বলিয়া শিবচরণ আরম্ভ করিলেন। "আমি বল্‌ছিলাম কি, তবে তাতে যদি তোমার অমত হয়, তা কাজ নাই। তা কথাটা এই আমার ইচ্ছাটা ঐ টাকাগুলো মিছি মিছি ঘরে জমা না রেখে, কেন সুদে খাটান যাক্‌না? ভূপেন্দ্র কথাটা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া বলিলেন, "কোন্ টাকাটার কথা বল্‌ছেন?" শিবচরণ উত্তর দিলেন, "ওই যে মা যে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে গেছেন, সেটা একসঙ্গে ধার দিলে ভাল হয় না কি? যার যেমন টাকা সে তেমন সুদ পাবে।" ভূপেন্দ্র উত্তর করিলেন, "বেশী সুদের জন্য আবার যাকে তাকে ধার দেওয়াটাও ঠিক নয়, তবে যদি আপনার কোন জানাশুনা বিশ্বাসী লোক থাকে, তবে ত কোন কথাই নাই; কিন্তু আমার ইচ্ছা, মেজোবৌর টাকাটা তাঁর কাছেই থাক্।" শিবচরণ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, মেজোবৌমার টাকাটা তাঁর ইচ্ছা হ'লে তাঁর কাছেই থাকবে।"

দিন কয়েকের মধ্যে শিবচরণ চলিয়া গেলেন। কাজ ফেলিয়া আসিয়াছেন, বেশী দিন থাকিতে পারিলেন না। শিবচরণের মারফত টাকা ধার দিতে সুষমা কোন আপত্তি করে নাই, কাজেই বলা বাহুল্য শিবচরণ টাকাগুলি সঙ্গে লইয়া গেলেন।

জয়কালী, শাশুড়ীর পীড়ার কথা শুনিয়া "অদিনে অক্ষণে" আসিয়াছিলেন, তাই যাত্রা বদলাইতে তাঁকেও কিছু দিনের জন্য একবার বাপেরবাড়ী যাইতে হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গিন্নির মৃত্যুতে শোকটা সব চেয়ে বেশী লাগিল সুষমার। সে এতদিন শাশুড়ির স্নেহেই দারুণ কষ্ট ভুলিয়া থাকিবার চেষ্টা করিত। এখন সেই স্নেহময়ী শাশুড়ীর অভাবে সুষমা নিতান্তই অধীরা হইয়া পড়িল। সে সময় তাঁর বড় সাধ হইয়াছিল, একবার মার কাছে যায়, কিন্তু মা তখন বহুদূরে, তীর্থে।

এই দুঃসময়ে সুষমার এক স্নেহশালিনী সখী মিলিল; সে ভূপেনের স্ত্রী সরোজবাসিনী! সুষমা সহজেই লজ্জাবতী, স্পর্শমাত্র মুদিয়া আসে। আবার ঘটনাচক্রে সে সদাই নিরীহ, কোন কথায় থাকিতে চায় না, সরোজ হাস্যময়ী, পরিহাসপরায়ণা, একটু বেশী মাত্রায় আপ্যায়িতশালিনী, তবু দুজনে মিলিল। সুষমা দুঃখিনী, সরোজ পরদুঃখকাতরা, সুষমা সরলা, সরোজ সারল্যে মুগ্ধা, সুষমা স্নেহভিখারিণী—সরোজ স্নেহশালিনী, তাই দুজনে মিলিল। সরোজের অকৃত্রিম স্নেহে, অকপট সমবেদনায় সুষমা অনেক দুঃখ ভুলিল। একে সখীজনোচিত প্রণয়, তায় আবার সহোদরাধিক স্নেহ, মিলন বড় গাঢ় হইল।

বাড়ীতে তখন গিন্নিপক্ষ আর কেহ ছিল না। একটী পুরাতন বিশ্বাসী ঝি মাত্র সম্বল। সুষমা ও সরোজ তাহাকে একটু সমীহ করিয়া চলিত—সেও লোক বড় ভাল—বউ দুটীকে বড় যত্ন করিত। সাংসারিক কাজকর্ম্মও বেশী ছিল না। দুই জা'য়ে মিলিয়া-মিশিয়া রাঁধিত। রান্না অল্প, গায়ে লাগিত না। তবে একাদশীর দিন, সরোজ সুষমাকে রান্নার দিকে ঘেষিতে দিত না। সুষমার তাতে ভারি কষ্ট। সরোজ ছেলে মানুষ, একা কি সব পারে! কিন্তু সরোজ কথা শুনে কই? কাজেই সুষমা

সে সময় তার কাছে বসিয়া গল্প করিতে করিতে এটী ওটী সাহায্য করিত।

ভূপেন্দ্রের 'ল' লেক্‌চার শেষ হইয়াছে, তাই তিনি এখন কলিকাতায় না গিয়া কিছু দিন বাড়ীতেই থাকিলেন। আর না থাকিলেও ত হয় না। বাড়ীতে দ্বিতীয় অভিভাবক কেহ নাই। দুটী "চেটো" বৌ, বৌ দুটীকে এরূপ অরক্ষিতভাবে রাখিয়া যাওয়াও চলে না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ভূপেন্দ্র "কোলের ছেলে," মার বড় আদরের ধন। মার শোকটা, প্রথম প্রথম তাঁরও বড় লাগিয়াছিল; কিন্তু সময়ে সব সয়। বিশেষ, মা নিতান্ত অসময়ে তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া যান নাই, এও এক সান্ত্বনা। বরং আরও কিছু দিন পূর্ব্বে গেলে দারুণ পুত্রশোক বুঝি তাঁকে পাইতে হইত না।

দিনে দিনে শোকের আতিশয্য কমিতে লাগিল—ক্রমে ভূপেন্দ্র মনের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া পাইলেন; শাশুড়ীর জন্য সরোজও কাতর হইয়াছিল, সেও আবার শান্ত হইল। তাঁহাদের দিন আবার সুখে কাটিতে লাগিল। কিন্তু পূর্ব্বে ঠিক এমন দিন ত কাটে নাই, সরোজও আর কখনও এমন করিয়া, প্রাণখুলিয়া স্বামীর সহিত মিশিতে পারে নাই! কই আগে ত স্বামীকে এতটা আপনার ভাবিতে পারে নাই? শোকের সময় এই নবীন দম্পতী পরস্পর পরস্পরের সান্ত্বনার প্রধান অবলম্বন ছিল, তার উপর আবার প্রায় সর্ব্বদাই একত্র বাস, ইহাতে কিছু হয় না হয়, বলিতে পারি না, কিন্তু সরোজ আপনার অজ্ঞাতে স্বামীকে বড় ভালবাসিয়া ফেলিল। তার শ্বশুরবাড়ীতে সকলেই অপরিচিত। এখানে আত্মীয় বন্ধু, সাথী, যা কিছু, তা স্বামী। সর্ব্বদাই স্বামীর চিন্তা, স্বামীর প্রসঙ্গ, স্বামীর সাহচর্য্য, সরোজ ক্রমে স্বামীকে বড় ভালবাসিল; আগে সরোজ রাত্রে স্বামীর সহিত বেশী কথা কহিতে পারিত না, বড় ঘুম আসিত, তখন অধিকাংশস্থলে ভূপেন্দ্র বক্তা, সরোজ শ্রোতা। ভূপেন্দ্র ভক্ত, সরোজ আরাধ্যা; ভূপেন্দ্র দাতা, সরোজ গৃহীতা। ক্রমে সেদিন ফিরিল, এখন আর স্বামীর সহিত অল্প কথা কহিয়া সরোজের তৃপ্তি হয় না—বরং স্বামী বেশীক্ষণ কাছ ছাড়া থাকিলে সরোজ এখন স্বামীকে অনুযোগ করে। বেশী কথাবার্ত্তা না কহিলে অভিমান করে। তাহার হৃদয় এখন দিবারাত্রি কি এক মধুর সঙ্গীতে মুগ্ধ থাকিত। সে সঙ্গীতে প্রণয়-যমুনা উজানে বহিল। ভূপেন্দ্রও প্রীত হইলেন। বড় সুখে দিন কাটিতে লাগিল।

এই নবীন দম্পতীর সুখে সুখী হইলেন, আর এক-জন! সরোজ সুষমার দুঃখে দুঃখী, ব্যথায় ব্যথী, তাই সুষমাও সরোজের সুখে সুখ অনুভব করিল। নিরবচ্ছিন্ন দুঃখে, কেহ জীবন কাটাইতে পারে না; নিজে যে দুঃখী, সংসারে যার নিজের সুখ বলিয়া কিছু নাই, সে সুযোগ পাইলে সহজে পরের সুখে সুখী হইতে শিখে। নহিলে মানুষ বাঁচে না। সরোজের স্বভাব গুণে সুষমার মুখে আবার হাসি ফুটিল। ক্রমে সরোজের সহিত তাহাদের স্বামীস্ত্রীর কথা লইয়া সুষমার একটু আধটু তামাসাও চলিতে আরম্ভ হইল। জীবনে যে হাসিতে পায় না, কোন আমোদে যে যোগ দিতে পারে না, তার মত অসুখী কে? সুষমা পরের সুখে সুখী হইয়া ঘোর বিষাদেও একটু আনন্দ পাইল। তাই এতদিনে আবার সে মুখে হাসি দেখা দিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সরোজ স্নান করিয়া এলো চুলে, আপন মনে গুণ্ গুণ্ করিতে করিতে আপনার ঘরে বাক্‌স খুলিতেছিল, পশ্চাৎ হইতে হটাৎ কে তার হাত দুটী ধরিল, বলিল "আজ!" সরোজ অন্যমনস্ক ছিল, বড় ভয় পাইয়া চমকিয়া উঠিল, চীৎকার করিতে যাইতেছিল, কিন্তু যাহা দেখিল, তাহাতে আর গলা উঠিল না, অপ্রতিভ হইয়া জিভ কাটিয়া তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় দিতে যাইতেছিল, পারিল না। যে হাত ধরিয়াছিল, সে, যে হাত ছাড়ে না।

"ছি ও আবার কি, হাত ছাড়," বলিয়া সরোজ একটু কুটিল কটাক্ষে স্বামীর দিকে চাহিলেন। ভূপেন্দ্র সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া আবার বলিলেন, "আজ কি হয়!"

"ছি ছাড়, দিদি দেখে ফেল্‌বে" বলিয়া সরোজ হাত ছাড়াইতে চেষ্টা করিল, শেষ, না পারিয়া নোলকপরা মুখখানি একটু নাড়িয়া, একটু জোরে, একটু আবদারের সুরে বলিল—"ছাড়বে না?" "না—আর একটু দেখি—। অনুরোধে, উপরোধে, তুমিত নিজ হ'তে সাধ মেটালে না; যদি সুবিধা পেয়েছি, তবে একটু ভাল করেই দেখি।" তখন

ভূপেন্ সরোজের সেই বিক্ষোভিততড়াগতুল্য কুঞ্চিত কেশ-দাম, তার সেই কেশে ঢাকা অনিন্দ্যসুন্দর মুখ খানি অতৃপ্ত নয়নে দেখিতে লাগিলেন—দেখিতে দেখিতে যেন আপনার অজ্ঞাতে বলিয়া উঠিলেন,"কি সুন্দর" ! "খুব হয়েছে; এখন ছাড়," বলিয়া সরোজ আবার হাত টানিল। ভূপেন্দ্র তখন কি ভাবিতেছিলেন—হাত ছাড়িয়া বলিলেন"সরোজ ? তুমি এমন সুন্দর হ'য়ে এ ঘরে প'ড়লে কেন ! কোন বড় মানুষের সঙ্গে বিয়ে হ'লে তুমি কত সুখী হ'তে পার্ত্তে" !

"তোমার রোজ রোজ ও কি কথা ? কেন ? কিসের দুঃখ ! অমন কথা যদি তুমি ফের বল, তবে কিন্তু তোমার সঙ্গে আর কথা কব না", বলিতে বলিতে অভিমানিনী অভিমান ভরে চলিয়া যাইতেছিল, ভূপেন্দ্র ডাকিল "সরোজ" !

হাসিয়া সরোজ ফিরিল, ভূপেন্দ্র কেন ডাকিলেন, সরোজ তাহা বুঝিয়াছিল—তাই সে হাসিয়া ফিরিল।

সরোজ অল্প দিনেই স্বামীকে চিনিয়াছিল। তাঁর নিত্য নূতন খেয়াল ! ভূপেন্দ্রের যে এরূপ এক আধটু পাগলামি ছিল, আমরা তাহা ইতিপূর্ব্বে বলিতে ভুলিয়াছি।

সরোজ যখন সুষমার কাছে গেল, তখনও, তাহার অধরপ্রান্তে হাসির রেখাটুকু একেবারে মিলায় নাই, অস্তগমনোন্মুখ চন্দ্র-রশ্মির মত তখনও ঝিকিমিকি করিতেছিল। সুষমা হাসিয়া বলিল, "ফিলো ?" "কই দিদি ? কিছুত নয়"। সরোজ মুখে ইহা বলিল বটে, কিন্তু অপাঙ্গে তার তখনও হাসি খেলিতেছিল, কাজেই ধরা পড়িল। সুষমার নিকট এরূপ ধরা সরোজ প্রত্যহই পড়িত, অথবা ইচ্ছা করিয়াই ধরা দিত।

নবম পরিচ্ছেদ।

দুই 'জায়ে' বড় প্রীতিতে দিন কাটাইতে লাগিল। সরোজ সুষমাকে কিছু লুকায় না, সুষমাও মাঝে মাঝে সরোজের কাছে আপনার দুঃখের কথা বলে, তবে সকল পারে না, কিছু রাখিয়া ঢাকিয়া চলে। সুখের সকল কথা বলা চলে, কেননা, প্রিয়জনের তাহাতে আনন্দ পাওয়াবই কথা, কিন্তু দুঃখের কথায়ত তাহার কোন সুখ নাই, কেবল বেদনা !

সরোজের সুখে সুষমা সুখী হইত সত্য, কিন্তু অলক্ষ্যে তাহার হৃদয়ের বেদনাভার ক্রমে গুরু হইতে গুরুতর হইল।

এখন প্রতিপদে, সুষমার স্বামীকে মনে পড়ে,—সেই স্নেহ, সেই সোহাগ, সেই মূর্ত্তি, সকলই মনে পড়ে, আর মনে হয়, যে কয়টী দিন তাঁকে পাইয়াছিল, প্রাণ খুলিয়া কেন তাঁর সহিত মিশে নাই ! সুষমা এখন রাত্রে, শূন্য বিছানায়, শূন্য হৃদয়ে, কেবলই ভাবে, "কেন আমি তাঁর কাছে অত লজ্জা করিতাম, কেন তাঁকে মনঃকষ্ট দিতাম ! কেন তাঁর সকল কথা, সকল অনুরোধ পালন করিতাম না ! তিনি কি সেই অভিমানে এদাসীকে ছাড়িয়া গেলেন ! সেই সে বিদায়ের শেষ দিন, যেদিন তিনি বিদেশে যাত্রা করিয়াছিলেন, কেন সেদিন পোড়া লজ্জা আসিল"—ভাবিতে ভাবিতে সুষমার চক্ষু দুইটী জলে ভরিয়া উঠিত, তখন সে বালিশে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ডাকিত—"কোথায় তুমি, প্রিয়তম, একবার এস ! আর লজ্জা করিব না, আর কষ্ট দিব না, একবার এস, একবার কাছে বস, একবার তেমনি ক'রে "সু" ব'লে ডাক" ! সুষমা দিন দিন এমন করিয়া ডাকে, এমনি করিয়া কাঁদে ! কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। এইরূপে অন্ধকারচিত্তে দিনে দিনে স্বামীর সেই প্রেম-মূর্ত্তিখানি, উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল ; জ্বালা বাড়িল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

সীমান্ত সংগ্রাম।

(প্রথম প্রস্তাব)

সীমান্ত নীতি ও চিত্রল।

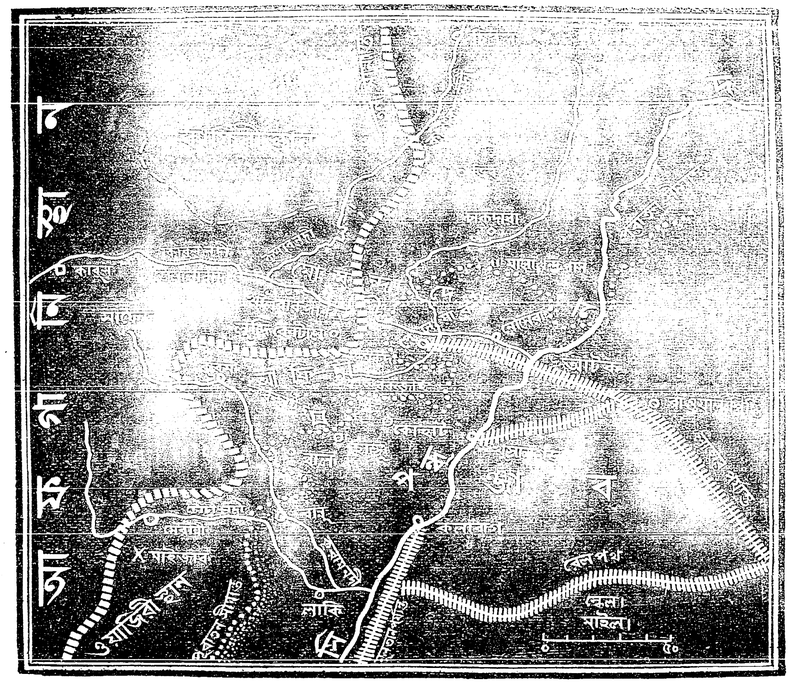

বিপদ কখনও একাকী আইসে না। এই প্রবাদের সত্যতা এবার আমাদিগের ভাগ্যে যেরূপ প্রমাণিত হইয়াছে, সেরূপ আর কোথাও হইয়াছে কিনা, জানি না। অনাবৃষ্টিহেতু দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষের ধ্বংস-লোলুপ-শিখা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল ; সে অনল নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বেই ভূমিকম্পে বুভুক্ষিত কঙ্কালসার দেশবাসী গৃহহীন হইল। এই সময়েই আবার সীমান্তপ্রদেশে নূতন বিপদ উপস্থিত হইয়াছে।

দুর্দ্ধর্ষ পার্ব্বতীয় জাতিগণ কর্ত্তৃক অধিবাসিত দুরারোহ পর্ব্বতশ্রেণী ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে প্রাচীররূপে দণ্ডায়মান। সেই অনুর্ব্বর গিরিমালার একদিকে ইংরাজাধিকৃত ভারত-সাম্রাজ্য, অপরদিকে মধ্য এসিয়ায় রুশিয়ার সাম্রাজ্যের সীমান্ত ও আফগানিস্থান। ইতিপূর্ব্বে বিচক্ষণ ইংরাজ শাসনকর্ত্তারা এই পর্ব্বতশ্রেণীকেই সীমান্তরূপে গণনা করিতেন ; স্বাধীনতাপ্রিয় পার্ব্বত্যজাতিরাও বহিঃশত্রুর আগমনপথে প্রবল বাধা থাকিত। যদি কখনও তাহারা পর্ব্বতাবাস হইতে আসিয়া ইংরেজাধিকার মধ্যে কোনরূপ অত্যাচার করিত, তখন ইংরাজসেনাদল অগ্রসর হইয়া সহজেই তাহাদিগকে পরাভূত করিত। যদি সহসা তাহাদিগকে আক্রমণ করা অসুবিধাজনক বলিয়া বিবেচিত হইত, তবে উপত্যকাপথ বন্ধ করিয়া ইংরেজাধিকৃত স্থানের বাজারে দুষ্কৃতদিগের গমনাগমনপথ রুদ্ধ করিয়া দিলেই চলিত; তাহার পর শরতের শেষে বা বসন্তের প্রারম্ভে ইংরাজ সেনা পর্ব্বতারোহণ করিত ; ফসল ও মেষাদি নষ্ট হইবার ভয়ে তাহারা সহজেই ইংরাজের নিকট পরাভব স্বীকার করিত। প্রকৃত পক্ষে তখন পার্ব্বত্যজাতিদিগকে পরাভূত না করিয়া তাহাদিগের সহিত সদ্ভাবসংরক্ষণই ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য ছিল। রুষাতঙ্কে "অগ্রসর" নীতির প্রভাবে তখন বৎসর বৎসর এত জীবননাশ ও অর্থধ্বংস হইত না। স্থিরবুদ্ধি লর্ড লরেন্সের মতে কোন নূতন নীতি প্রবর্ত্তিত করিবার পূর্ব্বে তিনটি বিষয় বিবেচনা করা উচিত।—প্রথমতঃ তাহাতে যেন সহসা বা অল্পদিনের মধ্যে ভারতবাসীদিগের স্কন্ধে নূতন করের বোঝা চাপাইতে না হয়। দ্বিতীয়তঃ, তাহাতে যেন ভারতবাসী প্রজারা প্রকৃতই অসন্তুষ্ট না হয়। তৃতীয়তঃ, তাহাতে যেন সংগৃহীত রাজস্ব অতিরিক্ত ব্যয়িত হওয়ায় অর্থ জমাইবার অসুবিধা না হয়। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড লরেন্স এই "অগ্রসর" নীতি সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার অর্থ এইরূপ—"মধ্য

এসিয়া সংক্রান্ত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলে আমাদের কোন লাভ নাই, কিন্তু মাননাশ ও সেনাগণের জীবননাশ হেতু লোকসান্ যথেষ্টই আছে। ইহাতে ভারতবর্ষে আমাদিগের শাসনের মূল দৃঢ় হওয়া দূরে থাকুক, বরং শিথিল হইতে পারে। ইহার ব্যয়ের কথা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। ভারতবর্ষের নানা অভাবের বিষয় আমি অবগত আছি;—দেশে অভাব অনেক, দেশে মূলধন সংগ্রহের অভাব, নূতন কোন কর সংস্থাপন দেশের সকলেরই বিরক্তিকর। সুতরাং যে সকল সংগ্রাম না করিলে আমাদের সম্মানের হানি হয় না; সে সকল সংগ্রামে সাধারণের অর্থ অপব্যয় করিতে আমি নিতান্তই নারাজ।" রুশাতঙ্কগ্রস্তগণের যুক্তির বিরুদ্ধে তিনি বলিয়াছিলেন যে, রুশিয়ার আগমন রোধাভিপ্রায়ে যদি ইংরাজ অগ্রসর হন, তবে রুশিয়ারই সুবিধা হইবে, তাহার সেনাদিগকে অধিক পথ আসিতে হইবে না; অথচ প্রকৃত আড্ডা হইতে দূরে পড়িয়া ইংরাজ সেনাদলের অসুবিধার অন্ত থাকিবে না। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে দ্বিজিহ্ব, "অগ্রসর নীতির" প্রবল পৃষ্ঠপোষক সেনাপতি রবার্টস্‌ও এই মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

ইহার পর কিছুদিন "অগ্রসর নীতির" হুজুগ চাপা পড়িয়াছিল। য়িহুদী মন্ত্রী লর্ড বিকন্স ফিল্ডের ধর্ম্মাধর্ম্ম ন্যায়ান্যায় জ্ঞান বড় ছিল না। একটা কিছু বৃহদনুষ্ঠান করাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। তিনি আবার "অগ্রসর নীতির" পুনরুত্থানে মনোযোগ দিলেন। লর্ড নর্থব্রুকের পর ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড লিটন ভারতবর্ষের বড়লাট হইয়া আসিলেন। মণিকাঞ্চন যোগ হইল। লর্ড লিটন লর্ড বিকন্সফিল্ডের অভিপ্রায় মত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সার রবার্ট স্যাণ্ডিমান বেলুচ্‌দিগের সম্বন্ধে যে নীতির" অনুসরণ করিয়াছিলেন, দুর্বুদ্ধিবশতঃ লর্ড লিটন পাঠানদিগের সম্বন্ধে সেই নীতি অনুসরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। লর্ড রবার্টস্ এই কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন স্থির হয়। সিন্ধুর পরপারবর্ত্তী ভূমিখণ্ড পঞ্জাবের ছোটলাটের শাসনাধীন প্রদেশ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া ভারতগবর্ণমেণ্টের অধীনে লর্ড রবার্টস্‌কেই সেই নবরচিত প্রদেশের চিফকমিশনার নিযুক্ত করা স্থির হয়। সীমান্তের ভার এই চিফ কমিশনারের হস্তে অর্পণ করাই লর্ড লিটনের গভর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু এই লঙ্কাভাগের কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই আফ্‌গান সমর উপস্থিত হইল। লর্ড রবার্টসের আশা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইল। লর্ড রিপণের শাসনকালে আফ্‌গান সমর শেষ হইল—একের পাপে অন্যে কষ্ট পাইলেন। তাহার পর লর্ড ডফ্‌রিণ বড় লাট হইয়া আসিলেন; তখন লর্ড রবার্টস্ সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন। এবার ক্ষমতা পাইয়া লর্ড রবার্টস্ তাঁহার প্রিয় "অগ্রসর নীতি" প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টিত হইলেন। বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভার সৈনিক সদস্য সার জর্জ চেস্‌নি এবং পররাষ্ট্র সচিব সার মর্টিমার ডুরাণ্ড তাঁহার সহায় হইলেন। সেনা বিভাগে সেনাপতির এই "অগ্রসর নীতি" অত্যন্ত আদৃত হইল। সেনাপতি, সৈনিক সদস্য এবং পররাষ্ট্রসচিব একযোগে কাজ করিলে তাহার বিরোধী হওয়া বড়লাটের পক্ষে বড় সহজ হয় না; কিন্তু লর্ড ডফ্‌রিণ বিশেষ কর্ম্মঠ লোক ছিলেন; তিনি ইচ্ছা করিলে এই "অগ্রসর নীতি" বিনষ্ট করিতে পারিতেন। তিনি তখন কর্ম্মত্যাগ কল্পনা করিতেছিলেন; তিনি আর ইহাতে হস্তক্ষেপ করিলেন না। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড ল্যান্সডাউন যখন বড় লাট হইয়া আসিলেন, তখন "অগ্রসর নীতির" পুরা বাহার; তিনি তখন চেষ্টা করিলেও বোধ হয় সহজে এই "অগ্রসর নীতির" প্রবল বেগ প্রতিহত করিতে পারিতেন না। এই নব নীতি প্রবর্ত্তনের জন্য প্রধানতঃ দায়ী—লর্ড রবার্টস্; তিনিই প্রথমে ইহা প্রচলিত করিতে বদ্ধপরিকর হয়েন। সীমান্তবাসী জাতিদিগের আচার ব্যবহার ও স্বভাব সম্বন্ধে বিশেষরূপ অভিজ্ঞ সৈন্যসম্প্রদায়ের সম্পর্কশূন্য পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা মাত্রেই এই "অগ্রসর নীতির" প্রতিবাদ করিয়াছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ব্যবস্থাপক সভায় সৈনিক সভ্যেরই প্রাধান্য। ঘোড়দৌড়, সার্কাস, থিয়েটারের আনন্দ কোলাহলে শাসনকর্ত্তাদিগের কণ্ঠস্বর কলিকাতার বড় লাটের কর্ণগোচর হইত না; বিলাসের বৃন্দাবন সিমলা শৈলে, পিক্‌নিক্ পার্টির গোলমালে সে ক্ষীণ কণ্ঠস্বর কেহ কাণে তুলিত না। চিত্রল অভিযানের পর আর সহসা "অগ্রসর নীতি" পরিহার করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল।

সীমান্তে গোলযোগ লর্ড ল্যান্সডাউনের গভর্ণমেণ্ট, লর্ড এল্‌গিনের গভর্ণমেণ্টের স্কন্ধে চাপাইয়া গিয়াছেন।

একার্য্যে প্রধান পাণ্ডা লর্ড রবার্টস্—ব্রহ্মদৈত্যের শ্রাদ্ধে আলেয়া অধ্যক্ষ।

এই "অগ্রসর নীতির" খরচের জন্য দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত দরিদ্রতম দেশবাসীদিগকে কত দিতে হইয়াছে, তাহা স্থির করা সহজ নহে। কর্ণেল হানা মোট খরচগুলি তুলিয়া দেখাইয়াছেন, মোট ৭১৪,৫৮০,৪৮০৲ টাকা খরচ হইয়াছে। বড় বড় খরচ গুলির হিসাব দিবার পর, এখন আমরা বিগত বাইশ বৎসরের মোট খরচের বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করিব। এই "অগ্রসর নীতির" কল্যাণে বিগত বাইশ বৎসরে ভারতবর্ষের ঋণ ১০৫ ক্রোর বাড়িয়াছে এবং সৈনিক বিভাগের ব্যয় ১১৮ ক্রোর বাড়িয়াছে। এই ১০৫ ক্রোর ঋণের সুদ ৫ ক্রোর। লর্ড নর্থব্রুকের শাসন কালের পর সৈনিক বিভাগের ব্যয় ৭ ক্রোর হিসাবে বাড়িয়াছে। কাজেই বাইশ বৎসর কাল পরে বৎসরে ১২ ক্রোর ব্যয় অধিক হইতেছে; অথচ সীমান্ত লইয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের কিছুমাত্র লাভ নাই। লর্ড লিটন চারি বৎসরে ৭০ ক্রোর টাকা ব্যয় করেন, লর্ড রিপণ পাঁচ বৎসরে ১০২ ক্রোর টাকা ব্যয় করেন, লর্ড ডফরিণ চারি বৎসরে ৮০ ক্রোর টাকা ব্যয় করেন, লর্ড ল্যান্সডাউন পাঁচ বৎসরে ১১০ ক্রোর টাকা ব্যয় করেন। ব্যয়াধিক্য হইয়াছে ২৬৪ ক্রোর টাকা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে লর্ড রবার্টস্, লর্ড লিটন ও লর্ড বিকন্সফিল্ড যদি হতভাগ্য ভারতবর্ষের "বৈজ্ঞানিক সীমান্ত" অর্থাৎ "Scientific Frontier" উদ্ভাবন না করিতেন, তবে বিগত বাইশ বৎসরে ভারতবর্ষ ঋণমুক্ত হইতে পারিত। তাহা হইলে দেশবাসীদিগের নিত্যব্যবহার্য্য লবণের উপর আর শুল্ক বসাইতে হইত না; অন্যান্য করভারও অনেকটা কমাইয়া দেশের লোকের সুখ ও সুবিধা সংবর্দ্ধনের বিশেষ সুযোগ ঘটিত। লবণের শুল্ক উঠাইলে দরিদ্র প্রজারও আয় কর উঠাইলে মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন কর্ম্মচারীদিগের, সুবিধার সীমা থাকিত না।

ভারতের রাজস্বের অর্দ্ধেক ইংলণ্ডে যায় Home charges নির্ব্বাহ করিতে, প্রায় একচতুর্থাংশ যায় সৈনিক বিভাগের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে। এই খানে বলিয়া রাখা ভাল যে সৈনিক বিভাগের অধিকাংশ ব্যয় সীমান্ত সংরক্ষণে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষের সংগৃহীত রাজস্বের অধিকাংশই দেশের বাহিরে ব্যয়িত হয়; সুতরাং তাহাতে দেশের লোকের উপকার বড় কিছু হয় না। "অগ্রসর নীতি" পরিত্যক্ত হইলে দেশের রাজস্ব দেশের লোকের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য ব্যয়িত হইয়া দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে পারিত।

এখন আমরা সীমান্তের বর্ত্তমান গোলযোগের কারণ নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইব। সীমান্তে বর্ত্তমান গোলযোগের আরম্ভ ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের চিত্রল অভিযানে। একবার বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য, চিত্রলে ইংরাজের অধিকার কি। চিত্রল দখলের সময় লর্ড এল্‌গিন ইহার একটা কৈফিয়ত দিয়াছেন। সে কৈফিয়তের অর্থ এইরূপ—১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে চিত্রলের সর্দ্দার কাশ্মীরের মহারাজার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। চিত্রল কাশ্মীরের অধীন, আবার কাশ্মীর ইংরাজের অধীন; কাজেই চিত্রল ইংরাজের অধীন, কাজেই চিত্রলের শুভাশুভ দেখা, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অবশ্যকর্ত্তব্য। চিত্রলের মুসলমান মেহতর অর্থাৎ সর্দ্দার কেন যে সহসা একজন হিন্দুরাজার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা বুঝা যায় না; তাহার প্রমাণও প্রদর্শিত হয় নাই। প্রথমতঃ প্রমাণাভাবে এই কথাতেই সন্দেহ উপস্থিত হয়; তাহার পর একথা স্বীকার করিয়া লইলেও চিত্রলের ব্যাপারে ইংরাজের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার কি? ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরের সহিত ইংরাজের সন্ধি হয়—১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মহারাণী যখন স্বয়ং এদেশের রাজ্যভার গ্রহণ করেন, তখন সেই সন্ধিসর্ত্ত দৃঢ়ীকৃত হয়। সেই সন্ধি অনুসারে কাশ্মীর ইংরাজের অধীন রাজ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হয় নাই, পরন্তু সন্ধিসূত্রে সম্বদ্ধ স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়াই পরিগণিত হইয়াছিল। কাজেই চিত্রলের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার ইংরাজের অধিকার কি, তাহা বুঝা যায় না। তবে যাহার গায়ে জোর থাকে, সে সহজেই অধিকার অনধিকারের কথা উপেক্ষা করিতে পারে।

চিত্রলের মেহতরের সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বিশেষ সদ্ভাব ছিল; ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বৎসর বৎসর তাঁহাকে কিছু অর্থও যোগাইতেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে চিত্রলের মেহতর তাঁহার প্রজাগণকর্ত্তৃক নিহত হয়েন। চিত্রলে ইংরাজের একজন "এজেণ্ট" ছিলেন। ভৃত্য ও অতিথি ভিন্ন বিধর্ম্মী (কাফের) দিগকে রাজ্যমধ্যে বাস করিতে দেওয়া মুসলমান রাজ্যে আইন-

বিরুদ্ধ। রাজ্য হইতে বিধর্ম্মীকে বিতাড়িত করিবার আবশ্যক হইলে মুসলমানগণ পরস্পরের মধ্যে বিরোধ বিস্মৃত হইয়া একযোগে কার্য্য করিয়া থাকে, এ কথা বুঝা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উচিত ছিল। দুঃখের বিষয় ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে সার উইলিয়াম হে ম্যাকনাটেন্ ও সার আলেকজাণ্ডার বার্ণসের হত্যাকাণ্ড এবং ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে সার লুই ক্যাভিনারির হত্যার কথা ভারতগবর্ণমেণ্ট বড় সহজেই বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তাই ইংরাজ রাজ্যের বাহিরে চিত্রলে একজন "এজেণ্ট" রাখিয়াছিলেন। পূর্ব্ব মেহতরের হত্যার পর নূতন মেহতর "এজেণ্ট"কে চিত্রল হইতে চলিয়া যাইতে বলিলেন; তাঁহাকে আরও বলিয়া দিলেন যে, চিত্রল ইংরাজের অধীন নহে; ইংরাজ যদি চিত্রলের সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধ রাখিতে চাহেন, তবে চিত্রলে মুসলমান দূত প্রেরণ করা আবশ্যক হইবে। ইহার পরে ইংরাজ "এজেণ্ট" অবরুদ্ধ হইলেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এই সংবাদ পাইয়া যুদ্ধসজ্জা করিতে লাগিলেন। উমরা খাঁ চিত্রলীদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন,—তাঁহাকে শাস্তি প্রদান করা আবশ্যক হইল। পেশোয়ার হইতে ১৫ হাজার সৈন্য লইয়া সার রবার্ট লো চিত্রলাভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করিলেন; আর গিলগিট, মাস্টুজ প্রভৃতি স্থানে প্রায় ৫০০ ইংরাজ সেনা ছিল, তাহাদিগকে চিত্রলাভিমুখে যাত্রার আদেশ প্রদত্ত হইল। বহুব্যয়সাধ্য চিত্রল-অভিযান আরম্ভ হইল। এই সময় ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের একটা বড় সুবিধা হইয়া গেল। উমরা খাঁ ডিরের শাসনকর্ত্তা সর্দ্দারকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন। ইংরাজের নিকট অনেক অর্থ এবং ততোধিক আশা পাইয়া ডিরের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা ইংরাজের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। তাঁহার ৫০০০ হাজার লোক ১৯শে এপ্রিল তারিখে অবরুদ্ধ "এজেণ্ট"কে উদ্ধার করিল। পথে বহুবিধ কষ্টভোগ করিয়া গিলগিট ও মাস্টুজের সেনাদল লইয়া কর্ণেল কেলি তাহার পর দিবস চিত্রল হইতে দশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থানে পৌছিলেন। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সত্ত্বেও সার রবার্ট লোর চিত্রলে যাইতে আরও এক মাস লাগিল। কাজেই দেখা যাইতেছে, ডিরের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য না করিলে সার রবার্ট লোর সেনাদল চিত্রলে পৌছিবার বহুদিন পূর্ব্বেই ইংরাজ "এজেণ্ট" নৃশংসভাবে নিহত হইতেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অবিমৃষ্যকারিতার ফলে কতকগুলি নিরপরাধ ইংরাজ কর্ম্মচারীর জীবননাশ হইত।

"অগ্রসর নীতির" এই শোণিতসিক্ত অঙ্কে এখানেই যবনিকা পতিত হইলে ভাল হইত; কিন্তু তাহা হইল না। উমরা খাঁকে শাস্তি দিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট বদ্ধপরিকর হইলেন। উমরা খাঁকে আক্রমণ করিবার জন্য ইংরাজ সেনাদলকে অনেকগুলি পার্ব্বত্য জাতির আবাসস্থান দিয়া যাইতে হইয়াছিল। অভিযানের সময় বড়লাট সেই সকল পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে যে ঘোষণা প্রচার করেন, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপঃ—চিত্রলের মধ্যে বর্ত্তমান অত্যাচার নিবারণ করা ও ভবিষ্যতে এইরূপ ব্যাপার সংঘটনের পথ রোধ করাই ভারত গবর্ণমেণ্টের একমাত্র উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইলেই সেনাদল অপসৃত করা হইবে। উমরা খাঁর দুষ্কার্য্যের জন্য ইংরাজদিগকে যে সকল স্থান দিয়া যাইতে হইতেছে, সে সকল স্থান চিরদিনের জন্য অধিকার করা বা সেই সকল স্থানের অধিবাসিদিগের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার অভিপ্রায় গবর্ণমেণ্টের নাই। অধিবাসীরা ইংরাজদিগকে আক্রমণ না করিলে বা কোনরূপে তাহাদিগের অভিযান বিলম্বিত না করিলে, তাহাদিগের উপর কোন অত্যাচার হইবে না।

চিত্রল অধিকৃত হইল; কিন্তু প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া চিত্রল ত্যাগ করিয়া আসিবার ইচ্ছা ভারত গবর্ণমেণ্টের বড় ছিল না। ভারতবর্ষ হইতে সকল সংবাদ ইংলণ্ডে প্রেরিত হইল। ইংলণ্ডে তখন উদারনৈতিকদলের প্রাধান্য—তখন লর্ড রোজবেরী প্রধান মন্ত্রী, আর সার হেনরী ফাউলার ভারতসচিব। ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া চিত্রল দখল রাখা ইংলণ্ডের মন্ত্রিদলের অভিপ্রেত হইল না। বিজ্ঞ, দক্ষ অনেকেই চিত্রল ত্যাগ করিয়া আসিবার পক্ষে মত দিলেন; ভারতবর্ষে সেই আদেশ প্রেরণ করাই স্থির হইল। এই সময় একটা ঘটনা ঘটিল—পার্লেমেণ্টে একটা প্রস্তাব লইয়া লর্ড রোজবেরী মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিলেন। আবার রক্ষণশীলদলের প্রাধান্য হইল; এবার প্রধানমন্ত্রী হইলেন লর্ড সলস্‌বেরী, আর ভারতসচিব হইলেন লর্ড জর্জ হ্যামিল্টন। পূর্ব্বতন ভারতসচিব চিত্রল পরিত্যাগ করিবার আদেশ ভারতবর্ষে প্রেরণ করিবার সময় পান নাই—যে দিন তিনি ঐ আদেশ প্রদান করিবেন, সেই দিনই উদারনৈতিক মন্ত্রিদল পদত্যাগ করিলেন।

রক্ষণশীল দল মন্ত্রী হইয়া পূর্ব্ব মন্ত্রিদলের সংকল্পমত কার্য্য করা আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিলেন না; ভারতগবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা সফল হইল। নূতন ভারতসচিবের উপদেশে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া ইংরাজ চিত্রল দখলে রাখিলেন—পার্ব্বত্য জাতিদিগের আবাসভূমিতে ইংরাজ সেনার ঘাটি বসিল। ইহা অবশ্য বড়লাট লর্ড এল্‌গিন, ভারতসচিব লর্ড জর্জ্জ হ্যামিল্টন ও প্রধান মন্ত্রী লর্ড সল্‌সবেরীর সম্মতিক্রমে হইল। লর্ড বীকন্সফীল্ডের মন্ত্রিত্বকালে এই লর্ড সল্‌সবেরীই ভারতসচিব ছিলেন।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।]

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

পরজীবী।

শাস্ত্রে পরভাগ্যোপজীবীদিগের নিন্দা আছে। নিন্দা থাকিবারই কথা। নিজে নিজে উদ্যোগী না হইয়া পরের স্কন্ধে জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক ব্যাপারটা সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া কোনক্রমে সুনীতি নহে। কিন্তু অন্নচিন্তার তুল্য দারুণ চিন্তাই বা কি আছে? এ চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি পাইলে কে না আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করে? এই জন্যই ত নরসমাজে পরভাগ্যোপজীবীর সংখ্যা কম হইবার সম্ভাবনা অল্প। এক ফোঁটা মধুর সন্ধান পাইলে নরমক্ষিকা দলে দলে তথায় বিচরণ করে।

কিন্তু পরজীবীদিগের মধ্যে সকলে সমান দুঃখভাগী কিম্বা হেয় নহে। বস্তুতঃ উহাদিগকে তিনভাগ করিতে পারা যায়। তোমার প্রতিবেশী কায়ক্লেশে অন্নসংস্থান করে। তুমি অন্নগতপ্রাণের রক্তটুকু শোষণ করিয়া নিজের অন্নসংস্থান করিয়া লইলে। নিজের আহার ভাবনা নাই, পায়ের উপর পা দিয়া বেশ আমোদে আহ্লাদে দিন কাটাও; প্রতিপালকের সর্ব্বনাশ হইল কি না, সে ভাবনা তুমি ভাব না। তুমি পরজীবীর মধ্যে অধম।

কিন্তু মনে কর, তুমি একেবারে নিষ্কর্ম্মা নও। সুবিধামত নিজে কখন কখন বাজার হইতে এটা ওটা খাবার সংগ্রহ করিয়া আন্। তবে পৃথক্ বাসা না করিয়া নিজে রাঁধাবাড়ার কষ্টটুকু না লইয়া তোমার প্রতিবেশীর উপর সে ভারটা চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলে। সময়বিশেষে আবশ্যক হইলে তাঁহার ভুক্ত উচ্ছিষ্ট অন্নাদি আহার করিতেও তুমি কুণ্ঠিত নও। প্রতিপালক ধনী, বিলক্ষণ অন্নসংস্থান আছে; তিনি বড় একটা ক্ষতি অনুভব করেন না! তবে কি না, তুমি তাঁহার কোন উপকারও করিলে না। তুমি মধ্যম।

আবার মনে কর, তুমি যেমন প্রতিবেশীর অন্ন খাও; তিনিও তেমনই তোমার দ্বারা নিজের কিছু কাজ না করাইয়া ছাড়েন না। এমন কি, তুমি না থাকিলে হয়ত তাঁহার বসবাস কঠিন হইয়া পড়িত, আবার তিনিও না থাকিলে তোমার জীবিকানির্ব্বাহ হইত না। তুমি আশ্রয়দাতার যে উপকার কর, তাহারই পরিবর্ত্তে তাঁহার নিকট কিছু পাবার প্রত্যাশা কর। তুমি তাঁহার স্কন্ধে চড়িয়া বসিয়াছ বটে, তথাপি তুমি উত্তম। এমন কি, তুমি পরের আশ্রয় ছাড়িতে পারিলে, তোমাকে আদৌ পরজীবী বলিতাম না।

নিকৃষ্ট প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যেও পরজীবীর সংখ্যা অল্প নহে। তাহাদিগকেও অধম, মধ্যম, উত্তম, এই তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। প্রথমে পরজীবী প্রাণীর দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

আজকাল কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় নগরে কেহ কেহ নিজের বাসায় শোওয়া বসা করে এবং হোটেলে গিয়া আহারের ব্যবস্থা সারিয়া আসে। ছারপোকা ঠিক ইহাদের মত। উহারা আমাদের শরীরে বাস করে না। কিন্তু খাবার সময় দেহরূপ হোটেলে আসিয়া আহার সমাপন করিয়া যায় এবং যাবার সময় খাবার মূল্য দিতে ভুলিয়া যায়। এই মৎকুণের ভাই উৎকুণ পৃথক্ বাসা করিতেও চায় না। আমাদের দেহরূপ হোটেলের কেশরূপ গৃহের পাশে বসবাস করে। রুখু চুল উকুণে ভরা, শুনিলেই গা শিহরিয়া উঠে, দেখিলে ত কথাই নাই। অণুবীক্ষণযন্ত্র সাহায্যে, অধিক নয়, ২০।২৫ গুণ বড় করিয়া দেখিলেই বীভৎসরসের হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি হয়। সর্ব্বাঙ্গ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোমে আবৃত, কদাকার দেহ। উদরটাই যথাসর্ব্বস্ব, মস্তকটা যেন উদরের একটা ক্ষুদ্র স্ফোটক মাত্র। দুই গোলাকার চক্ষু, পাঁচভাগে বিভক্ত দুইটি

স্পর্শিনী মুখের দুই পাশে শোভা পায়, তিনটি তিনটি ছয়টি, স্থূল পা বিপুল উদরটাকে বহিয়া বেড়ায়। পায়ের নখ দেখিলেই উকুণের স্বভাব বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। বিড়ালও এইরূপ নখগুলিকে পায়ের তলার দিকে বাঁকাইয়া রাখে এবং আবশ্যক হইলে বাহির করে। দেহের রক্ত শোষণ করিয়া যে উদর পূর্ণ করে, তাহার মুখে কোন না কোন প্রকার ছেদন-অস্ত্র থাকা আবশ্যক। কিন্তু মৃত কিম্বা জীবিত উকুণের মুখে রক্তশোষণ করিবার শুণ্ড কিম্বা দেহ বিদ্ধ করিবার কোন অস্ত্র, কিছুই দেখা যায় না। অনেক দিন মানুষকে ঠকাইয়াছিল। কিন্তু মানুষের ধূর্ত্ততার কাছে সকলকেই হারিমানিতে হয়। দুই চারিদিন একটা উকুণকে খাইতে না দিয়া বিলক্ষণ ক্ষুধার্ত্ত করিয়া হাতের উপর ছাড়িয়া দাও, দেখিবে বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপং। অবশ্য এস্থলে একটা দৃষ্টিকাচ লইয়া দেখা চাই। হাতের তাপে এবং হয়ত সুগন্ধে তাহার চিত্ত বিনোদিত হয়, মুমূর্ষুদেহে জীবনের লক্ষণ প্রকাশিত হয়। দুই এক পা চলিয়া, স্পর্শিনী এদিকে ওদিকে নাড়িয়া, পাগুলি গুটাইয়া মাথাটা নীচু করে এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা ক্ষুদ্র কাল শুঁড় মুখের ভিতর হইতে পুনঃ পুনঃ বাহির করিতে থাকে। সেই লুকান শুঁড়ের অগ্রভাগে ধারাল ছুরী থাকে, তদ্দ্বারা চুলের গোড়ার কাছে বিঁধিয়া শুঁড় দিয়া রক্ত চুষিয়া লয়।

প্রাণি-রাজ্যে উৎকুণ অধম পরজীবী। পরের দেহের রক্তরূপ অংশ আহার করিয়া পুষ্ট হয়। তেমনই সে পতঙ্গ-শ্রেণিভুক্ত হইলেও তাহার ভাগ্যে কখনও পক্ষলাভ ঘটে না। তাহার উড়িবার প্রয়োজনই বা কি? উদরসর্ব্বস্ব কেবল প্রচুর বংশবৃদ্ধি করিয়াই নশ্বর জীবন সার্থক করে।

কিন্তু আমাদের উদরে যে তিন প্রকার কৃমি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা উকুণের মত পরজীবী হইলেও একটু ভিন্ন। উকুণ রক্ত পান করিয়াই দেহসাৎ করে না, তাহাকে পাক করিয়া লয়। কৃমিগুলা, উকুণের মত আমাদের দেহ ভোজন করে না, আমাদের উদরের জীর্ণীকৃত ভুক্ত অন্ন গ্রহণ করে। এবিষয়ে ফিতার আকার সদৃশ কৃমি বিশেষ দৃষ্টান্ত। এই ভয়ানক কৃমির মুখ, উদর, রক্ত কিম্বা রক্তনালী কিছুই নাই। সর্ব্বাঙ্গ শরীর দ্বারা আমাদের উদরস্থ পক্ক অন্ন শোষণ করে। যে ভোজ্য রসে ডুবিয়া থাকে, তাহার একটা মুখে কি হইবে? যাহা হউক, ইহা মধ্যম পরজীবীর দৃষ্টান্ত।

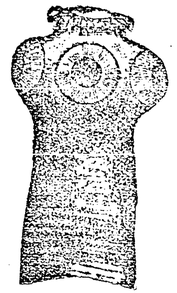

শূকরমাংসের ফিতাকৃমির মাথা।

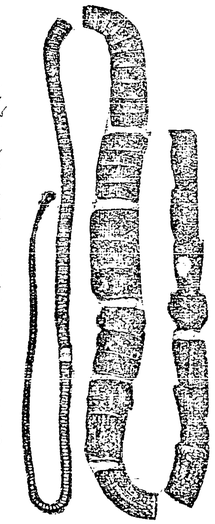

গোমাংসের ফিতাকৃমির দেহের ছেদসমূহ।

অনেকেই জানেন, ফিতাকৃমির দেহখান কতকগুলি ছেদে বিভক্ত। মাথাটা কিছু চেপ্‌টা এবং দেহের অন্যান্য অংশ হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন। তার পরেও কয়েকটা ছেদ একটু ভিন্ন। কিন্তু তার পর সমুদয় দেহখান কেবল কতকগুলি একই আকারের ছেদের একত্র সমাবেশ। এইরূপে উহা ১০।১২ হাত লম্বা হইয়া থাকে। এই ভাবে দেখিলে, ফিতাকৃমিকে একটা প্রাণী না বলিয়া প্রাণীর উপনিবেশ বলিতে হয়। অর্থাৎ কতকগুলি একজাতীয় প্রাণী পরস্পর যুড়িয়া থাকিয়া একত্র বাস করে। কাজেই উহার একটা ছেদ আমাদের পেটে থাকিয়া গেলেই তাহা হইতে উপনিবেশরূপ দীর্ঘাকার কৃমির ক্রমশঃ উৎপত্তি হয়।

এই কৃমি কেবল আহার বিষয়েই বিচিত্র নয়। উহার প্রত্যেক ছেদই দ্বিলিঙ্গ। অর্থাৎ প্রত্যেকটাতেই স্ত্রী ও পুং জননেন্দ্রিয় আছে। কিন্তু ঐ দুই ইন্দ্রিয়ের মধ্যে পুংজননেন্দ্রিয় অপর ইন্দ্রিয়ের পূর্ব্বে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। কাজেই প্রত্যেক ছেদ দ্বিলিঙ্গ হইলেও উহার স্ব-নিষেক ক্রিয়া ঘটিতে পায় না। কোন ছেদের নিষেক ক্রিয়ার পর জরায়ুটি বহুসংখ্যক ডিম্বে পূর্ণ হয়। পাখী ডিমে তা (তাপ?) দিয়া তন্মধ্যস্থিত অপরিস্ফুট ভ্রূণকে পরিপুষ্ট করে। তাহাই পিতৃমাতৃসদৃশ আকারে ডিম্ব হইতে বহির্গত হয়। স্তন্যপায়ীদিগেরও ডিম্ব হইতে সন্তান জন্মে, প্রভেদের মধ্যে মাতৃগর্ভেই ডিম্বস্থ ভ্রূণটি পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু এই কৃমির ডিম্ব মানুষরূপ আশ্রয়দাতার উদরে পরিপুষ্ট হয় না।

শূকর, আহারের সঙ্গে এই কৃমির ডিম্ব উদরস্থ করিলে, তাহার উদরে ডিম্ব পরিপুষ্ট হয়। কিন্তু ডিম্ব হইতে একেবারে পিতৃমাতৃসদৃশ কৃমি না বাহির হইয়া, অন্য আকারের ক্ষুদ্র পোকা (Larva) জন্মে। এই পোকা শূকরদেহের মাংসপেশী প্রভৃতি কঠিনাংশে প্রবেশ করে। এই প্রকার, একজাতীয় ফিতাকৃমির দ্বিতীয় দশা গো-দেহে, অন্য এক জাতীয়ের দ্বিতীয় দশা মৎস্যে অতিবাহিত হয়। মৎস্যমাংসভোজী মানুষের ভুক্ত মৎস্যমাংসের সহিত ইহারা উদরে প্রবেশ করিয়া ফিতাকৃমিতে পরিণত হয়। কুকুরের ফিতাকৃমির পোকা-দশা শশকের দেহে; বিড়ালের, ইন্দুরের দেহে; ব্যাঘ্রের, রোমন্থনকারী ভক্ষ্যের দেহে পুষ্টিলাভ করিয়া আমমাংসের সহিত পূর্ণাবয়ব কৃমির আশ্রয়দাতার উদরে প্রবেশ করে।

পরজীবী প্রাণিসম্বন্ধে বলিতে গেলে অন্য এক প্রকার আহারোপায় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। পচামাছ কয়েকদিন জলে ফেলিয়া রাখিলে যেমন দুর্গন্ধ হয়, তেমনই সেই জলটাও ঘোলা হয়। ঐ জলের একবিন্দু অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখিলে বহুবিধ জীব দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের মধ্যে কতকগুলির ইতস্ততঃ সন্তরণ দেখিয়া সেগুলিকে প্রাণী বলিয়া সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ঐ সকল প্রাণীর মধ্যে কোন কোনটার দেহে দুইটি সূক্ষ্ম কিন্তু দীর্ঘ কেশবৎ কশা (চাবুক) (flagella) থাকে। উহাদের মুখ নাই, হাত পা অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির ত কথাই নাই। দেহখানি এক টুকরা জীবনাধার (protoplasm) মাত্র। জলে কশাঘাত করিয়া সেই জীবনাধার টুকু ইতস্ততঃ লাফাইয়া বেড়ায়; এবং সেই জলের বিকৃত জৈবপদার্থ দেহে শোষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। অতএব ইহারা উকুণের মত জীবিত প্রাণীর দেহ কিম্বা কৃমির মত দেহস্থ ভুক্তবস্তু আহার না করিয়া বিকৃত উচ্ছিষ্ট বস্তু আহার করে। এজন্য ইহাদিগকে বিকৃতভোজী (saprophyte) বলা যাইতে পারে।

উত্তম পরজীবীর একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। সমুদ্রে অল্প বা অধিক গভীর জলে লাল, সবুজ, নীল প্রভৃতি বিবিধ বর্ণের একপ্রকার সুন্দর পুরুভুজ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগকে পুরু-(=অনেক) ভুজ (=বাহু) বলিবার কারণ এই যে, ইহাদের মুখের চারিদিকে ৪।৫ সারি, হাতের মত ধারণক্ষম, স্পর্শিনী আছে। দেহখান লম্বা ও কোমল, উপরে ফুলের কেশর সদৃশ স্পর্শিনী। বস্তুতঃ প্রস্ফুটিত ফুলের মত দেখিতে বলিয়া, ইহাদিগকে পুষ্প পুরুভুজ বলা যাইতে পারে। কিন্তু পুরুভুজটি দেখিতে সুন্দর হইলেও গুণে সুন্দর নহে। এমন পেটুক প্রাণী অল্পই আছে। উহার দেহখান লম্বালম্বি দুইখণ্ড করিলে দেখা যায় যেন দীর্ঘাকার উদরের নিমিত্তই দেহখান হইয়াছে। সেকালের পিতলের দোয়াতের আকার যেমন, এই পুরুভুজের আকারটা প্রায় তেমন। কিন্তু পেটুকের চলিবার পা বা সাঁতরাইবার পাখ্‌না কিছুই নাই। দেহের অধোভাগে শামুকের পায়ের মত একটা চাকৃতি আছে। তদ্দ্বারা উহা প্রস্তরে কিম্বা অন্য জন্তুর দেহ আঁটিয়া ধরিয়া থাকে। ঐ পা দিয়া ধীরে ধীরে চলিতে কিম্বা আবশ্যক হইলে জলে ভাসিয়া উঠিতে পারে বটে, কিন্তু এত কষ্টে উহার লম্বোদর পূর্ণ করা অসম্ভব। এজন্য উহাকে বাহন খুঁজিতে হয়। সেই বাহনই আবার উহার খাবার যোগাড় করিয়া দেয়।

সমুদ্রে একরকম চিংড়ি আছে। আমাদের পরিচিত চিংড়ির মত সেগুলার দাড়া পা থাকিলেও লেজটা কঠিন খোলায় ঢাকা থাকে না। কাজেই অমন কোমল দেহ লইয়া শত্রুমধ্যে গমনাগমন করা ঐ চিংড়ির পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। এজন্য ইহারা মৃত শামুকের খোলা খুঁজিয়া সেই খোলার মধ্যে দেহের কোমল অংশ পূরিয়া দিয়া কেবল মুখটি বাহির করিয়া রাখে। নিজের শরীর যখন বয়সে মোটা হইয়া পড়ে, তখন প্রথম ঘরখানি ত্যাগ করিয়া বড় ঘর খুঁজিয়া লয়। সেই ঘরকে উহাদিগকে বহিয়া লইতে হয়। কিন্তু একটা ঘর লইলেই বা দাঁড়ায় কোথায়? আমাদের পরিচিত চিংড়ির লেজে সাঁতার দিবার জন্য কতকগুলা পাল্‌কা থাকে, ঐ চিংড়ির সে সব কিছু নাই। কাজেই লেজটা শামুকের ভিতরে রাখিয়া স্বচ্ছন্দে বাস করে। সংসার অসার ভাবিয়া নিজে গৃহনির্ম্মাণ করে না, পরের ত্যক্তগৃহে কোনমতে দিনপাত করে। এজন্য এই চিংড়ির ঋষি-চিংড়ি নাম দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ঋষি হইলেও শত্রুভয় অনেক। বড় বড় মাছগুলা উহাকে গ্রাস করিতে সর্ব্বদা মুখ হাঁ করিয়া বেড়ায়। এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে এই চিংড়ি এক একটা পুষ্প-পুরুভুজকে নিজের ঘরের গায়ে আশ্রয় দেয়।

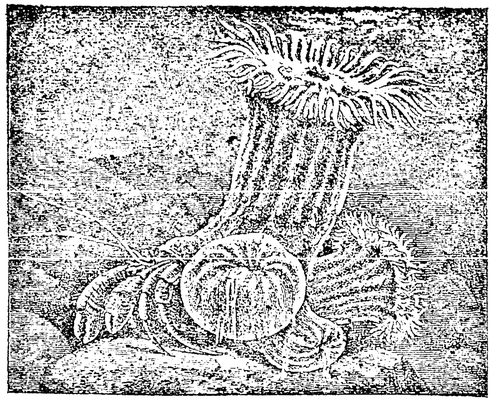

ঋষি-চিংড়ির উপর পুষ্প পুরুভুজ।

যে মাছ একবার এই পুরুভুজের কাছে গিয়াছে, সে আর দ্বিতীয়বার যাইতে চায় না। পুরুভুজের ভুজের মধ্যে মধ্যে এক রকম হুল থাকে। কাজেই পুরুভুজের সাহায্যে ঋষি চিংড়ি কতকটা নির্ভয় হয়। প্রত্যুপকারে ঋষি পুরুভুজকে এখানে ওখানে বহিয়া লইয়া বেড়ায় এবং খাদ্যাদি দিয়াও অতিথির সৎকার করে। অতিথি নিজেই ঊর্দ্ধমুখ হইয়া চিংড়ির মুখের ঠিক নীচে শামুকের খোলাটাকে আটকাইয়া ধরে। কাজেই চিংড়ির আহার সময়ে যে উচ্ছিষ্টাদি মাংসখণ্ড পড়িয়া যায়, তাহা পুরুভুজ তৎক্ষণাৎ উদরস্থ করে। তবেই এই পুরুভুজ এবং চিংড়ি পরস্পরের সাহায্যে পরস্পরের উপকার করিয়া জীবন অতিবাহিত করে। সুতরাং পরাশ্রয়ী হইলেও পরভোজী নহে।

এখন উদ্ভিদরাজ্যের অধম ও মধ্যম পরজীবীর দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। আমাদের জীবন প্রক্রিয়া কতকটা সকলেরই জানা আছে, এজন্য অপরাপর প্রাণীর আহারাদি ক্রিয়া বুঝিতে গোলযোগ হয় না। কিন্তু উদ্ভিদ্‌গণের জীবন ক্রিয়া আমাদের হইতে অনেক বিষয়ে ভিন্ন। আমাদের মুখ আছে, পাকযন্ত্ররূপ উদর আছে। কাজেই কঠিন ভক্ষ্যও গলাধঃ করিয়া পরিপাক করিয়া থাকি। কিন্তু উদ্ভিদের মুখ নাই, উদররূপ নালী নাই। কাজেই উহাদিগকে রস ও বায়ু শোষণ করিতে হয়। আর এক কথা, আমাদের ভক্ষ্য আমাদের দেহের উপাদানের মত জৈব; উদ্ভিদের ভক্ষ্য, বায়ু জল এবং জলে দ্রবীভূত লবণাদি অজৈব পদার্থ। আমাদের ভক্ষ্যবস্তু পরিপাক করিবার অর্থ দেহ-নির্গত রস-বিশেষ সংযোগে তাহাকে দ্রব করা; উদ্ভিদের পরিপাক করার অর্থ জল বায়ু লবণাদি মিশাইয়া জটিল বস্তুতে পরিণত করা। আমরা পাকনালী মধ্যে ভক্ষ্যবস্তুকে ভাঙ্গি, উদ্ভিদে গড়ে।

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা অধিকাংশ প্রাণী ও উদ্ভিদ সম্বন্ধে প্রযোজ্য। প্রাণিগণের মধ্যে ঐ সাধারণ ব্যবস্থার ব্যতিক্রম দেখা গিয়াছে। উদ্ভিদগণের মধ্যেও সেই প্রকার ব্যতিক্রম আছে। এই ব্যতিক্রম বুঝিতে গেলে উদ্ভিদের আহারক্রিয়া সম্বন্ধে আর একটু জানা আবশ্যক।

লতাপাতা হরিদ্‌বর্ণ। যে রঙ্গের (pigment) জন্য গাছের পাতা হরিদ্‌বর্ণ দেখায়, তাহাকে পত্রহরিৎ (chlorophyll) বলা যায়। অনেক উদ্ভিদের এই রঙ্গ আছে, অনেকের নাই। বেঙের ছাতি শেষোক্ত উদ্ভিদের সহজবোধ্য দৃষ্টান্ত। তবেই স-পত্রহরিৎ এবং অপত্রহরিৎ, এই দুই ভাগে যাবতীয় উদ্ভিদ বিভক্ত করিতে পারা যায়।

স-পত্রহরিৎ উদ্ভিদের বৃদ্ধি এবং পরিপুষ্টিকার্য্যে পত্রহরিৎ অত্যাবশ্যক। উহাই, উদ্ভিদের ভক্ষ্য, বায়ুস্থিত কার্ব্বন দ্ব্যক্‌সাইডের কার্ব্বন লইয়া মূল দ্বারা মৃত্তিকা হইতে শোষিত জলের সহিত সম্মিলিত করিয়া শ্বেতসারাদি উদ্ভিদ-দেহ-নির্ম্মাণোপযোগী সামগ্রী প্রস্তুত করে। কিন্তু অগ্নি ব্যতীত যেমন কোন বস্তু পাক করিতে পারা যায় না, সূর্য্যের তেজ ব্যতীত তেমনই উদ্ভিদও আবশ্যক সামগ্রী গড়িয়া লইতে পারে না। আর্দ্র ও অন্ধকার গৃহে আলু রাখিলে তাহার অঙ্কুর বাহির হইয়া কতকটা লম্বা ডাঁটা এবং কয়েকটা বিবর্ণ ক্ষুদ্রাকার পাতা হয়। কিন্তু আলুটি গাছের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিশীর্ণ হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ এক একটা আলু আলুগাছের খাদ্যভাণ্ডার স্বরূপ। ভাণ্ডারে যতদিন প্রস্তুত সামগ্রী থাকে, ততদিন গাছটি বাড়িতে থাকে, শেষ হইলেই গাছটি আহারাভাবে মরিয়া যায়। কিন্তু সেই প্রকার আলু ফাঁকা জমিতে পুতিলে সবুজ পাতা বাহির করিয়া বাড়িতে থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সৌরতেজে প্রথমে পত্রহরিতের উৎপত্তি এবং পরে তাহার সাহায্যে বায়ুর কার্ব্বন-দ্ব্যক্‌সাইড বিশ্লিষ্ট হইয়া জৈব যৌগিকের উৎপত্তি হয়। বস্তুতঃ বায়ুর কার্ব্বন-দ্ব্যক্‌সাইড, মৃত্তিকার জল এবং সেই জলে মিশ্রিত লবণাদি,

বৃক্ষরূপ জীবের অপক্ক অন্ন, সবুজ পাতা তাহার পাকশালা, পত্রহরিৎ তাহার পাচক, এবং সৌরতেজ তাহার অগ্নি।

তবেই যে সকল উদ্ভিদের পত্রহরিৎ নাই, সেলগুলিকে হয় সপত্রহরিৎ গাছ আশ্রয় করিতে হয়, কিম্বা অন্য পক্ক-খাদ্য দেহসাৎ করিতে হয়। বস্তুতঃ এ সকল উদ্ভিদ হয় পরজীবী কিম্বা বিকৃতজীবী। দুই একটা দৃষ্টান্ত দিলে কথাটি স্পষ্ট হইবে।

আলক বা আলগুশিলতা * অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। কুল, আকন্দ প্রভৃতি নানা গাছের উপর পত্রশূন্য, সূতার মত সরু, চাঁপাবর্ণ লতা দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলা সর্ব্বনেশে লতা। যে গাছকে আশ্রয় করে, নির্ম্মম হইয়া তাহার দেহের রস শোষণ করিয়া নিজের বৃদ্ধি ও পুষ্টি সম্পাদন করে। লোভী ত বটেই, অপরিণামদর্শীও বটে। নচেৎ ভোজনদাতাকে বেড়িয়া চুষিয়া শুকাইয়া ফেলিত না। ইহাদের মূল নাই, পাতা নাই, ডাঁটায় পত্রহরিৎ নাই। পাকশালাও নাই, পাচকও নাই। কাজেই অন্ন সংস্থানের সমুদয় ভার অন্নদাতার স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়া অধমতার চূড়ান্ত পরিচয় দেয়। কিন্তু এদিকে ফুল হয়, বীজরূপ সন্তান হয়। উপযুক্ত ভূমিতে পড়িলে বীজ হইতে ক্ষুদ্র লতা হয়। সেই সময় হইতেই পরের ঘাড়ে চড়িবার জন্য লতাটি এদিকে ওদিকে নড়িয়া অন্নদাতা অনুসন্ধান করে। না পাইলে মরিয়া যায়; পাইলে তাহার দেহে শোষকমূল প্রবিষ্ট করিয়া মৃত্তিকাগত মূলটি ছিঁড়িয়া দেয়।

মধ্যম প্রকার পরজীবী উদ্ভিদের দৃষ্টান্তও আছে। আম, অশ্বত্থ প্রভৃতি গাছের ডালে বন্দা বা মান্দা নামে এক প্রকার গাছ জন্মিতে দেখা যায়। মৃত্তিকার সহিত ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই কিন্তু পাতাগুলি হরিদ বর্ণ। সেই পত্র-হরিতের সাহায্যে সূর্য্যের তেজে বায়ুর কার্ব্বন-দ্ব্যক্‌সাইড বিশ্লিষ্ট করিয়া দেহনির্ম্মাণোপযোগী সামগ্রী প্রস্তুত করে। কিন্তু মৃত্তিকার রস ব্যতীত ঐ সকল সামগ্রী প্রস্তুত হইতে পারে না। কাজেই আশ্রয়দাতার বল্কল মূল দ্বারা বিদ্ধ করিয়া তাহার ভিতরের রস শোষণ করিতে থাকে। বৃক্ষের বল্কলের নীচে যে শক্ত কাঠ থাকে, তাহার অধিকাংশই শিরা। কোন কোন শিরা দিয়া মৃত্তিকার রস দূরস্থ মুকুলে উপনীত হয়। বন্দার শোষক-মূল সেই সকল শিরা পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হয়, এবং সেখানে গিয়া আশ্রয়দাতার শিরাবাহিত মৃত্তিকার রস শোষণ করিয়া মূলের কাজ সম্পাদন করে॥ তবেই দেখিতে গেলে, বন্দা মৃত্তিকার রসের জন্য আম্রাদি আশ্রয় বৃক্ষের নিকট ঋণী। অন্যান্য দ্রব্য সংগ্রহ কিম্বা অন্নপাক ক্রিয়া নিজে করে। এজন্য ইহারা পরজীবীদিগের মধ্যে মধ্যম।

আর এক বিষয়ে বন্দা গাছ আলক লতা হইতে ভিন্ন। বন্দার ফুল হয়, ফুলগুলি দেখিতেও মন্দ নয়। বলা বাহুল্য, ফুল হইতেই ফল, ফল হইতেই বীজ হয়। পাকা বীজগুলির গায়ে চট্‌চটে আটা থাকে। ফল পাকিয়া আশ্রয়দাতার ডালে পড়িলে, আটা মাখান বীজগুলি ডালে লাগিয়া যায়। সেই খানেই অঙ্কুর হয়, এবং অঙ্কুরের মূল শাখার বল্কল ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। আলক লতা কিম্বা বন্দার কোমল মূল কঠিন বল্কল ভেদ করিতে পারে, একথা সহজে বিশ্বাস হয় না। কিন্তু একটু দেখিলে বুঝা যায় যে, যেখানে যেখানে উহাদের ডাল আশ্রয়বৃক্ষের ডালের সংস্পর্শে আসে, সেই সেই খানে পরস্পরের চাপে আশ্রয়বৃক্ষের ডালে ঘা হয়। ঘা বল্কলের মত শক্ত নহে। কাজেই তাহার ভিতর দিয়া মূল চালাইতে বিশেষ বিঘ্ন হয় না। মূল-প্রবেশপথ ছাড়িয়া চারিদিকে ঘার উপর নূতন ত্বক্ জন্মে। তাহাতে পরজীবীগুলির আশ্রয় দাতার ডালে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকিবারও বিশেষ সুযোগ হয়।

বিকৃতভোজী উদ্ভিদের সঙ্খ্যাও অল্প নহে। বেঙের ছাতি, দোয়াতের কালীর উপর শাদা লোমের মত যে ছাতা ধরে, ইহারা বিকৃত জৈব-পদার্থ আহার করিয়াই তৃপ্ত। ইহাদের মূল নাই, পত্র নাই, পত্রহরিৎ নাই। বস্তুতঃ ইহারা আহার বিষয়ে প্রায় প্রাণীর তুল্য। জীবনাধারই যাবতীয় জীবের আদি উপকরণ। কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন, এই চারিটি মূল পদার্থ উহার প্রধান উপাদান। এই সকল বিকৃতভোজী উদ্ভিদ, প্রাণিগণের মত, জৈব পদার্থের কার্বন ব্যতীত বায়ুস্থিত কার্বন দ্ব্যক্‌সাইডের কার্বন গ্রহণ করিতে পারে না। জৈব-পদার্থে এবং জলে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন থাকে। বায়ুতেও প্রচুর অক্সিজেন আছে। কেবল নাইট্রোজেন সংগ্রহ করাই কঠিন। বায়ুতে নাইট্রোজেন,

* আকাশবালী বা আকাশবল্লী দেখিতে এই প্রকার হইলেও তাহা স্বতন্ত্র। তবে, তাহাও পরজীবী।

অক্সিজেন অপেক্ষা চারিগুণ অধিক থাকিলেও ঐ বায়ুবৎ নাইট্রোজেন আমাদের কিম্বা উদ্ভিদের দেহস্থ করিবার শক্তি নাই। আমরা আমাদের ভক্ষ্যবস্তুর সঙ্গে নাইট্রোজেন উদরস্থ করি। স-পত্রহরিৎ উদ্ভিদ মৃত্তিকাস্থিত সোরা প্রভৃতি নাইট্রোজেন যুক্ত পদার্থ মৃত্তিকার রসের সঙ্গে মুল দিয়া শোষণ করে। এই বিকৃতভোজী উদ্ভিদও সেইরূপ করিতে পারে। অধিকন্তু আমাদের মত জৈবপদার্থস্থিত নাইট্রোজেনও লইতে পারে। সুতরাং ভক্ষ্য বিষয়ে এই সকল উদ্ভিদ প্রাণী হইতে ততটা ভিন্ন নহে।

'বাক্‌টিরিয়া' নামক উদ্ভিদ্-বিশেষের নাম আজকাল 'বাসিলি', 'অণুজীব' প্রভৃতির প্রসাদে অনেকেই শুনিয়াছেন। কেবল ভক্ষ্য বিষয় বিচার করিলে, পূর্ব্বোক্ত ছাতাকে প্রাণী বলিয়া ভ্রম হয়, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে প্রকৃত উদ্ভিদের সহিত উহার সাদৃশ্য আছে বলিয়া উহাকে কখনও প্রাণী বলিতে পারা যায় না। কিন্তু বাক্‌টিরিয়াগুলি প্রাণী না উদ্ভিদ, ইহা স্থির করিতে অনেক জীববিৎকে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হইয়াছে। উহাদের কতকগুলি পরভোজী, কতকগুলি ভুক্তভোজী, আর কতকগুলি বিকৃতভোজী। সুতরাং ভক্ষ্য ধরিলে উপরের প্রশ্নের একটা সদুত্তর পাওয়া যায় না। আবার, উহাদের দেহ এত ক্ষুদ্র যে, তাহার উপাদান বিচার করিয়াও সহজে কোন ফল পাইবার সম্ভাবনা নাই। এই সকল কারণে কেহ কেহ উহাদিগকে প্রাণিবিশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন, কেহ কেহ অন্যান্য কারণে উদ্ভিদ্ বলিতেন। এই গোলযোগ মিটাইবার অভিপ্রায়ে কেহ বা উহাদিগের নাম অণুজীব (microbe) রাখিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক অনেক পণ্ডিতের মতে উহারা উদ্ভিদ্ বিশেষ। প্রাণী হউক, উদ্ভিদ্ হউক, উহাদের পরজীবীর মধ্যে যেগুলি আমাদের দেহভোজী, সেইগুলিই আমাদের রোগ-বিশেষের কারণ। কাজেই ইচ্ছা হয়, সেগুলা অন্ততঃ আমাদের দেহ ভক্ষণ না করিত!

উপরে অধম ও মধ্যম পরজীবীর দৃষ্টান্ত দেওয়া গিয়াছে। উত্তমের দৃষ্টান্ত এখনও বাকি আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহাদের যে দুই একটা দৃষ্টান্ত অল্পদিন জানা গিয়াছে, সেগুলির নাম ধাম সাধারণ পাঠকের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য হইবার আশঙ্কা আছে। যাহা হউক, দুই একটার জীবন-বৃত্তান্ত মোটামুটি বুঝিতে কষ্ট নাই। আপাত দৃষ্টিতে ইহাদিগকে পরজীবী বোধ হইলেও প্রকৃতপক্ষে আশ্রয়দাতার ঘনিষ্ঠ বন্ধু বন্ধু বন্ধুর সাহায্য করে, উহারাও উভয়ে পরস্পরের সাহায্য করিয়া জীবন ধারণ করে। ঐ সাহায্যের একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। আমরা প্রতি নিশ্বাসে কার্ব্বন-দ্ব্যক্‌সাইড বহির্গত করিতেছি, উহাই আবার স-পত্রহরিৎ বৃক্ষের প্রধান ভক্ষ্য। আমরা শ্বাসক্রিয়ায় বায়ুর অক্সিজেন লইতেছি, তাহাই আবার স-পত্রহরিৎ উদ্ভিদ্ ভক্ষ্য পরিপাক করিবার সময় বহিষ্কৃত করে। এখন মনে করুন, যে একটা প্রাণিদেহে একটা স-পত্রহরিৎ উদ্ভিদ্ বাস করে উভয়ের একত্র বাসে উভয়ের সুবিধা বই অসুবিধা হইবে না। যাহা একে ত্যাগ করে, তাহা অন্যে গ্রহণ করে বস্তুতঃ এরূপ জীবদ্বয়ের কোনটিকে প্রকৃত পরজীবী বলিতে গেলে এক অর্থে সকল প্রাণী ও উদ্ভিদকেই পরজীবী বলিতে হয়। তবে, পরস্পর সংলগ্ন থাকিয়া জীবদ্বয় আহার-কার্য্য সম্পাদন করে; এজন্য ইহাদিগকে অন্যোন্যজীবী বলা যায় (symbiosis)।

অন্যোন্যজীবী প্রাণী ও উদ্ভিদের দৃষ্টান্ত বেশী জানা নাই। তবে এখানে দুইটির উল্লেখ করা যাইতেছে। উপরে যে পুরুভুজের কথা বলা গিয়াছে, তাহার দেহের মাংসের মধ্যে এক প্রকার সূক্ষ্ম সামুদ্র শৈবাল জন্মিয়া থাকে। শৈবাল কার্ব্বন-দ্ব্যক্‌সাইড শোষণ করিয়া কার্ব্বনটুকু নিজের দেহে রাখিয়া দেয় এবং অক্সিজেনটুকু বাহির করে। সেই অক্সিজেন পুরুভুজের শ্বাসক্রিয়ায় লাগিয়া যায়। আবার পুরুভুজ নিশ্বাসের সঙ্গে যে কার্ব্বন-দ্ব্যক্‌সাইড বহির্গত করে, তাহা শৈবালের কাজে আসে।

এখানে একটি প্রাণী এবং একটি উদ্ভিদ একত্র বাস করিয়া উভয়েই উপকার পায়। দুইটি উদ্ভিদের মধ্যেও এইরূপ অন্যোন্য-জীবিত্বের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আম লেবু, তাল, নারিকেল প্রভৃতি গাছের ছালের উপরে শাদা সবুজ, পিঙ্গলাদি নানা বর্ণের চাকা চাকা দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। শিলার উপরেও উহারা জন্মে বলিয়া, উহাদিগকে শৈলেয় (Liehens) বলা যায়। এক একটি চাকা এক এক উপনিবেশ। কিন্তু প্রত্যেক উপনিবেশে সপত্রহরিৎ এবং অপত্রহরিৎ উদ্ভিদ একত্র বাস করে। উহাদের জীবনক্রিয়া যে ভিন্ন, তাহা উপরে বলা গিয়াছে। সুতরাং ঐরূপ সহবাসে উভয়বিধ উদ্ভিদেরই উপকার হয়।

উপরে যে কয়েকটি বিষয় বলা গেল, তাহার সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাউক। জীব বলিলে আজকাল বাঙ্গালায় প্রাণী ও উদ্ভিদ্ বুঝিয়া থাকি। আমাদের ন্যায় প্রাণীগুলির আহারব্যবস্থা এক প্রকার। এবং আম্রাদির ন্যায় বৃক্ষগুলির অন্য প্রকার; ইহারা স্বজীবী। এতদ্ভিন্ন, কতকগুলি জীব পরজীবী আছে। উহাদের মধ্যে তিন ভাগ করা গিয়াছে। উৎকুণ ও আলকলতার ন্যায় জীব পরের দেহ ভক্ষণ করে বলিয়া পরভোজী, কৃমি ও বন্দার ন্যায় জীবগুলি পরের দেহে বাস করিয়া ভুক্তরস পান করে বলিয়া ভুক্তভোজী এবং কয়েকটি অন্যোন্যভোজী। ভুক্তভোজীর ন্যায় কতকগুলি জীব বিকৃতভোজী। এই শেষোক্ত শ্রেণীর জীব প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌রাজ্যের সংযোগ ঘটাইতেছে। বুঝিবার সুবিধার নিমিত্ত আহারব্যবস্থা দেখিয়া নিম্নে জীবগুলির শ্রেণীবিভাগ করা গেল।

- জীব
  - প্রাণী
    - স্বজীবী—স্বজীবী (মানুষ)
    - পরজীবী
      - পরভোজী (উৎকুণ)
      - ভুক্তভোজী (কৃমি)
      - অন্যোন্যভোজী
  - উদ্ভিদ
    - মৃতজীবী—বিকৃতভোজী (কশাল প্রাণী, ছাতা)
    - পরজীবী
      - অন্যোন্যভোজী
      - ভুক্তভোজী (বন্দা)
      - পরভোজী (আলক)
    - স্বজীবী—স্বজীবী (আম্র)

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

যোদ্ধা প্যারীমোহন।

পুরাকালে বিজয় সিংহ নামক এক বঙ্গদেশীয় রাজকুমার বাহুবলে লঙ্কাদ্বীপ অধিকার করেন। তাঁহার নাম অনুসারে লঙ্কা সিংহল নামে অভিহিত হয়। সে অনেক কালের কথা। মুসলমান রাজত্বকালে আমরা মহারাজ প্রতাপাদিত্য, রাজা সীতারাম রায়, প্রভৃতি বাঙ্গালী যোদ্ধৃবর্গের নাম শুনিতে পাই। বিষ্ণুপুরের স্বাধীন নৃপতিগণের মধ্যে অনেকেই যোদ্ধা ছিলেন, এবং রাজোপাধিধারী বঙ্গের অনেক জমীদার মুসলমান-শাসনকালে পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহারা বাঙ্গালী সেনাদল লইয়া যুদ্ধ করিতেন, ইহাই সম্ভবপর। যখন বঙ্গে ইংরাজদিগের প্রভুত্বের সূত্রপাত হইতেছিল, তখনও বাঙ্গালীদের ভীরুতা-পবাদ সর্ব্বত্র ঘোষিত হয় নাই। তখনও ইংরাজ সেনাপতিগণ বাঙ্গালী সৈন্যের অনাদর করিতে আরম্ভ করেন নাই। ইহার একটি প্রমাণ আমরা বিষপ হীবরের ভারতবর্ষীয় দৈনন্দিনলিপি হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"I have, indeed, understood from many quarters, that the Bengalees are regarded as the greatest cowards in India; and that partly owing to this reputation, and partly to their size, the Sepoy regiments are always recruited from Behar and the upper provinces. Yet that little army with which Lord Clive did such wonders, was raised chiefly from Bengal. So much are all men the creatures of circumstance aud training." *

Heber's *Indian Journal*, Chapter IV.

ইহা হইতে দৃষ্ট হইবে যে, ক্লাইব বাঙ্গালী সৈন্যের সাহায্যে অনেক অদ্ভুত বীরত্বের কাজ করিয়াছিলেন। হীবর ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে উদ্ধৃত কথাগুলি লিখিয়াছিলেন। ওয়াল্‌টার হ্যামিল্টন্ সাহেবও তাঁহার ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া গেজেটিয়রে লিখিয়াছেন;—"The Native Bengalis are generally stigmatized as pusillanimous and cowardly, but it should not be forgotten, that, at an early period of our military history in India, they almost entirely formed several of our battalions, and distinguished themselves as brave and acttive soldiers." —Quoted by the *Indian Mirror*. ৫০।৬০ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালীর ভীরু বলিয়া এত দুর্ণাম কেমন করিয়া হইল, আমরা তাহা নির্ণয় করিতে পারি নাই। ইহা ঐতিহাসিকগণের গবেষণার বিষয় বটে। অবস্থা-বৈগুণ্যে যে বীরজাতিও ভীরু হইয়া যায়, উড়িয়াগণ তাহার দৃষ্টান্তস্থল। বাঙ্গালা ভাষায় ভাল ইতিহাস অল্পই আছে। ক্লাইবের সময়ের ইতিহাস সম্বন্ধে ইংরাজীতে কয়েকখানি গ্রন্থ এবং

* তাৎপর্য্য—"আমি নানা সূত্রে অবগত হইয়াছি বটে যে, বাঙ্গালীরা ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভীরু বলিয়া বিবেচিত হয়; এবং কতকটা এই অখ্যাতির দরুণ, কতকটা তাহাদের খর্ব্বাকৃতিবশতঃ, সিপাহী সৈন্যদল বেহার এবং উত্তরপশ্চিমাঞ্চল হইতেই সংগৃহীত হইয়া থাকে। অথচ যে ক্ষুদ্র সৈন্যদল লইয়া ক্লাইব এত বিস্ময়কর কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা প্রধানতঃ বঙ্গদেশ হইতেই সংগৃহীত হইয়াছিল। মানুষের প্রকৃতি, অবস্থা এবং শিক্ষার উপর এতই নির্ভর করে!"

অনেক রাজকীয় কাগজপত্র আছে, তৎসমুদয় হইতে উক্ত সময়ের বহুবিধ বৃত্তান্ত সংগৃহীত হইতে পারে। জীবিত বাঙ্গালী ঐতিহাসিকগণের মধ্যে "সিরাজউদ্দৌলা" "মীর কাসিম" প্রভৃতি ঐতিহাসিক চিত্রের লেখক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বঙ্গদেশে ইংরাজ-রাজত্বের আদিযুগ বিশেষভাবে অনুশীলন করিয়াছেন। তাঁহার "সিরাজ-উদ্দৌলা" তৎসাময়িক ইতিহাস, পাঠকবর্গের সম্মুখে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছে। অক্ষয় বাবু একজন প্রতিভাশালী অধ্যবসায়শীল স্বদেশানুরাগী লেখক। তিনি যেরূপ উদ্যম সহকারে ভস্মাচ্ছাদিত ঐতিহাসিক তত্ত্বরাশি বাহির করিতেছেন, তাহাতে বিষপ্ হীবরের কথার যাথার্থ্য সম্বন্ধে তিনি কিছু বলিতে পারিবেন বলিয়া আশা করি।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস ব্রাজিলে যেরূপ অদ্ভুত শৌর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা বর্ত্তমানে * তাহার আলোচনা করিয়াই কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিয়া থাকি। কিন্তু তাঁহার বীরত্বের কাহিনী সত্য হইলে কি হয়, অনেক ইংরাজ তাহা বিশ্বাস করেন না। আমরা এমনই হীন হইয়া পড়িয়াছি যে, ইংরাজে না মানিলে আমাদের যশও

* সীমান্ত-সমরে কুচবেহারের মহারাজার কার্য্যের বৃত্তান্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে এই প্রবন্ধ লিখিত হয়।

মঞ্জুর নয়! যাহা হউক, সুরেশচন্দ্র বিদেশে যুদ্ধ করিয়াছেন; তিনি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী। সুতরাং এরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, তিনি বিদেশের আব হাওয়ায়, বিদেশী খানা খাইয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্মের জোরে বীর হইয়াছেন। তাই আজ আমরা এমন একজন বাঙ্গালীর বীরত্বের কথা বলিব, যিনি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, এবং ভারতবর্ষেই যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

যোদ্ধৃজাতিই যে মহৎ, আর কেহ মহৎ নয়, ইহা সত্য নহে। যুদ্ধই যে বীরত্ব প্রদর্শনের একমাত্র বা শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র, তাহাও নয়। কিন্তু যে জাতি একেবারেই যুঝিতে পারে না, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই জন্যই আমরা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছি যে, বাঙ্গালী অতীতকালে এবং বর্ত্তমানযুগে যুদ্ধ করিয়াছে, এবং সুযোগ পাইলে এখনও যুদ্ধ করিতে পারে। তবে ইহা সত্য বটে যে বাঙ্গালী যুদ্ধপ্রিয় জাতি নহে।

আমরা যাঁহার জীবনী লিখিতে যাইতেছি, তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত উত্তরপাড়া হিতকরী সভা ইংরাজীতে প্রকাশিত করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় উহা অতিশয় সংক্ষিপ্ত। হিতকরী সভা যদি যত্নপূর্ব্বক তাঁহার জীবনের একটি বিস্তৃত ইতিহাস মুদ্রিত করেন, তাহা হইলে বড়ই ভাল হয়। "যোদ্ধামুন্সেফের" নাম অনেকেই জানেন। আমিও উহা বহু পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম। তৎপরে, এলাহাবাদের কায়স্থ পাঠশালার পার্শ্বস্থিত বৃহৎ অট্টালিকা ও উদ্যান যোদ্ধামুন্সেফের, ইহা যখন অবগত হই, তদবধি তাঁহার সম্বন্ধে কিছু লিখিতে ইচ্ছা হয়। আজ সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিলাম। তাঁহার জীবনের যে কয়েকটি কথা লিখিতেছি, তাহার অধিকাংশই হিতকরী সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা হইতে গৃহীত। উক্ত সভার সম্পাদক মহাশয় আমাকে উহার এক খণ্ড পাঠাইয়া দিয়া কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীপ্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে উত্তরপাড়া নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উত্তরপাড়া ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন; এবং উহার এক জন প্রতিভাশালী ছাত্র বলিয়া পরিচিত হন। তজ্জন্য উক্ত বিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক রবার্ট হাণ্ড সাহেব তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন। উত্তরপাড়া বিদ্যালয় হইতে তিনি উচ্চতর শিক্ষা লাভার্থ হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন এবং তথা হইতে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কথিত

আছে, তৎপরে তিনি সার্টিফিকেট গ্রহণপূর্ব্বক, পদব্রজে, পাথেয়স্বরূপ সঙ্গে কেবল মাত্র দুইটি টাকা লইয়া, গৃহ পরিত্যাগ করেন; এবং কাশী পৌঁছিয়া তথায় কিছুকাল এক আত্মীয়ের বাসায় অবস্থিতি করেন। সেখানে থাকিয়া তিনি আইন পড়িতে আরম্ভ করেন। মুন্সেফী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি প্রথমে অনুবাদক, পরে মুন্সেফী পদে নিযুক্ত হন। তিনি যখন গোরখ্‌পুরে মুন্সেফের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, তৎকালে সিপাহী যুদ্ধের আরম্ভ হয়। তখন তাঁহার বয়স ২২।২৩ বৎসর মাত্র। এই সময়ে তিনি এলাহাবাদ জেলার অন্তর্গত মঞ্চনপুর নামক স্থানে বদলী হন। সেখানে কয়েকজন ইংরাজদ্বেষী জমীদার বিদ্রোহী হইয়া গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমরসজ্জা করে। তাহারা কয়েকটী গ্রাম লুট করিয়া জ্বালাইয়া দেয়, এবং আরও নানা প্রকার অত্যাচার করে। প্যারী বাবু তাহাদের অসদাচরণ গবর্ণমেণ্টের গোচর করিয়া শাসনকর্ত্তাদিগের নিকট বিদ্রোহদমনার্থ সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু এলাহাবাদস্থ রাজকীয় কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে কোন প্রকার সাহায্য প্রেরণ করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাকে যে কোন প্রকারে হউক তাঁহার তহশীলে শান্তি স্থাপন করিতে পরামর্শ দেন। তৎকালে এলাহাবাদের কমিশনার তাঁহাকে যে পত্র লিখেন, তাহা হইতে নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল:—

"Once for all I have to repeat to you that no troops will leave this station for any purpose. * * * You have now in your Tehsil:

1. A detatchment of 12 N. I.
2. A detatchment of Sikhs will come from Khaga.
3. 50 Matchlockmen hired by yourself.
4. The Tehsil and Thana establishments.

"If you want powder and shot they shall be sent out to you by the Kotwal, &c,. Keep a good look out on the Rajapoor Ghat yourself and keep your Tehsil well defended." *

এই অবস্থায় তিনি ৮০০ গ্রামবাসীকে লইয়া একটি সেনাদল গঠন করেন; এবং অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া বিদ্রোহী জীমদারগণের দলপতি ধাখন সিংহের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হন। এই ধাখন সিংহের নামে গ্রামবাসিগণ ভয়ে আড়ষ্ট হইত। নিজের চেষ্টায় সংগৃহীত সেনাদলের অধিনায়ক হইয়া, কোন প্রকার রাজকীয় সেনার সাহায্য ব্যতিরেকে, তিনি দর্‌হাবাল নামক স্থানে অবস্থিত বিদ্রোহিগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। মঞ্চনপুরে উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। প্যারীমোহন এই যুদ্ধে জয়লাভ করেন। যে ধাখন সিংহের নামে লোকে ভয়ে অভিভূত হইত, সেই বিদ্রোহী দুদ্ধর্ষ জমীদার নিজ কতিপয় সহচরের সহিত পরাভূত ও নিহত হন। এলাহাবাদের তাৎকালিক মাজিষ্ট্রেট এফ্ টম্‌সন্ সাহেব রাজভক্ত ইংরাজ-প্রজাগণের সম্বন্ধে এলাহাবাদের কমিশনার সাহেবের নিকট যে রিপোর্ট প্রেরণ করেন, তাহা হইতে নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইতেছে:—

"Babu Peary Mohan was appointed a Moonsif at Manjhanpur in this District in November last, and has since been indefatigable in his exertions to drive back the rebels in his part of the district. Though not actually in his province of duty, he offered himself to the Commissioner to assemble the well-affected Zemindars, to engage and conciliate the doubtful, thus create a Government party against the disaffected. He has succeeded so well that he has been able gradually to restore the Police authority in all but a few villages now held by the rebels. In one instance he fought a pitched battle with the rebels and gained a victory, his report of which I enclose." *

তিনি এই প্রকারে সাহস ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার জন্য বিখ্যাত হইয়া উঠেন। তৎকালে তাঁহাকে মঞ্চনপুর হইতে বদলী করিবার প্রস্তাব হওয়ায় এলাহাবাদের কমিশনার থর্‌হিল্ সাহেব লেখেন:—

"Babu Peary Mohan has established so high a reputation for personal courage and determination that his presence has, I believe, hitherto prevented an irruption of the rebels from the right bank of the Jumna and the Magistrate is of opinion that his withdrawal at this time would be shortly followed by much disorganization, &c., &c. In this opinion I entirely concur." *

যাঁহারা বাঙ্গালীর সাহসে বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা একবার একজন ইংরাজের লিখিত এই কথাগুলি ভাল করিয়া বুঝিয়া পড়িলে ভাল হয়। একজন ২২।২৩ বৎসরের বাঙ্গালী যুবার প্রতাপে বিদ্রোহীরা যমুনা পার হইতেই সাহসী হইল না! আজকাল ইংরাজেরা প্রায়ই বলেন যে, বাঙ্গালী কেরাণী, শিক্ষক এবং বিচারকের কার্য্য করিতে পারে, কিন্তু যাহাতে দশজন মানুষকে শাসনে রাখিয়া কাজ চালাইতে হয়, দ্রুত গমনাগমনের দরকার হয়, অধিনায়কত্বের, নির্ভীকতার, সত্বর কর্ত্তব্যনির্ণয়ের প্রয়োজন হয়, বাঙ্গালী এরূপ কাজের উপযুক্ত নয়। যাঁহারা এইরূপ মনে করেন, তাঁহাদিগকে অগত্যা বলিতে হইবে যে, প্যারীমোহন বাঙ্গালী ছিলেন না!

সিপাহীবিদ্রোহ-দমনান্তে সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপিত হইলে, গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে কাণপুরে এক বৃহৎ দরবার আহ্বান করিয়া, বিদ্রোহিগণকে প্রভূত সাহস ও তেজের সহিত আক্রমণ জন্য, † প্যারীমোহনকে হাজার টাকা মূল্যের এক খিলাত এবং কয়েকটী গ্রাম, পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করেন। এই সময়ে তিনি "যোদ্ধা মুন্সেফ" নামে সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়া উঠেন।

এতদ্ব্যতীত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তাঁহার রাজভক্তির পুরস্কার স্বরূপ ডেপুটী কলেক্টর নিযুক্ত করেন। তিনি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই কার্য্য করেন। এই পদের কর্ত্তব্যসমূহ তিনি এরূপ সুখ্যাতি ও সাধুতার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন যে, বারাণসীর মহারাজা তাঁহার ক্ষমতা ও কার্য্যদক্ষতার কথা শুনিয়া নিজ সুবৃহৎ জমীদারীর কার্য্যপরিচালনার্থ গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া তাঁহাকে নিযুক্ত করেন। তিনি প্রায় ৫ বৎসরকাল মহারাজার অধীনে কার্য্য করেন। তদনন্তর ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে পর, উক্ত আদালতে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। কয়েক মাস ওকালতী করিয়াই তিনি নিজ ব্যবসায়ে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। তাঁহার আয়ও বিশেষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে প্রধান সরকারী উকীল নিযুক্ত করেন। হাইকোর্টের জজগণ তাঁহাকে সম্মান করিতেন। জনসাধারণের নিকটেও তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল।

তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ৩৯ বৎসর ৩ মাস বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি নিজ উইলে অনেক সৎকার্য্যের জন্য দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জন্মভূমি উত্তরপাড়ার হিতকরী সভাকে তিনি মাসিক ১৫ টাকা সাহায্য দিবার বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার উইলে এইরূপ ব্যবস্থা আছে যে, যদি তাঁহার ভাগিনেয় নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগমন করেন, তাহা হইলে তাঁহার (প্যারী বাবুর) পত্নীর মৃত্যুর পর তাঁহার জমীদারীর অর্দ্ধেক আয় হিতকরী সভা পাইবেন; অথবা উক্ত সভার অবর্ত্তমানে উহার স্থলাভিষিক্ত অন্য কোন সভা পাইবেন। এই অর্থ নিম্নলিখিতরূপে ব্যয়িত হইবে। মাসিক ৫০০৲ টাকা উত্তরপাড়া বিদ্যালয়ের নিঃস্ব ছাত্রগণের বেতন দেওয়াতে খরচ হইবে। অতঃপর যদি কিছু বাকী থাকে, তাহা হইলে উহা হইতে কৃষি, রসায়ন বা শিল্পশিক্ষার্থী উত্তরপাড়াবাসী বা তদভাবে বঙ্গের অন্যান্য স্থানবাসী ব্যক্তিগণকে বৃত্তি দেওয়া যাইবে।

তিনি মিষ্টভাষী, অমায়িক ও দরিদ্রের প্রতি দয়াবান্ ছিলেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে তিনি গরীব লোকদের দুঃখ দূর করিবার জন্য বিস্তর অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি শিক্ষার বড় পক্ষপাতী ছিলেন। এলাহাবাদে মিওর সেণ্ট্র্যাল কলেজ স্থাপন কার্য্যে তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর স্যার উইলিয়ম মিওর একটী বক্তৃতাতে বলেন,—"The names of Lala Gaya Prasad, of Babus Peary Mohan and Rameshur Chaudhuri, have been

* তাৎপর্য্য—"আপনাকে জানাইতেছি যে, কোনও উদ্দেশ্যে কোন সৈন্যদলই এলাহাবাদ ছাড়িয়া যাইবে না। আপনার তহশীলে এখন নিম্নলিখিত সৈন্য সকল আছে;—* * * আপনি যদি গোলাগুলি ও বারুদ চান, তাহা কতোয়াল প্রভৃতির হাতে প্রেরিত হইবে। রাজাপুর ঘাটের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন এবং নিজ তহশীল সুরক্ষিত রাখিবেন।"

* তাৎপর্য্য—"প্যারী বাবু গত নবেম্বর মাসে মঞ্চনপুরের মুন্সেফ নিযুক্ত হইয়া জেলার ঐ অংশের বিদ্রোহিগণকে তাড়াইয়া দিবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। যদিও ইহা তাঁহার কর্ত্তব্যের সীমা বহির্ভূত, তথাপি তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কমিশনার সাহেবের নিকট বিদ্রোহিদিগের বিরুদ্ধে একটি রাজভক্ত দল গঠনের প্রস্তাব করেন। এই কার্য্যে তিনি এতদূর সফলপ্রযত্ন হইয়াছেন যে, তিনি ক্রমে ক্রমে বিদ্রোহিগণের অধিকৃত কয়েকটি গ্রাম ব্যতীত আর সর্ব্বত্রই পুলিসের প্রভুত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। একস্থলে তিনি বিদ্রোহিদের সহিত রীতিমত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন। ঐ যুদ্ধের তল্লিখিত বৃত্তান্ত এই মোড়কের মধ্যে পাঠাইলাম।

* তাৎপর্য্য—"বাবু প্যারীমোহন সাহসী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলিয়া এরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন যে, আমার বিশ্বাস, যে, তিনি উপস্থিত থাকাতেই যমুনার দক্ষিণ তীর হইতে বিদ্রোহিরা বামতীরে আসিতে সমর্থ হয় নাই। মাজিষ্ট্রেট মনে করেন যে, এখন তাঁহাকে তাঁহার কর্ম্মস্থল হইতে স্থানান্তরিত করিলে বড় বিশৃঙ্খলা ঘটিবে। এ বিষয়ে আমি তাঁহার সহিত সম্পূর্ণ একমত।

† For his having "distinguished himself by his intrepidity and the vigour of his attacks upon the insurgents."

mentioned to me as foremost in this movement" কলেজ স্থাপনার্থ চাঁদা তুলিবার জন্য প্রথমে যে কমিটি নিযুক্ত হয়, প্যারী বাবু তাহার সম্পাদক মনোনীত হন; এবং তিনি নিজে ১০০০৲ টাকা চাঁদা দেন। এখন এই কলেজই উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশের শ্রেষ্ঠ কলেজ বলিয়া পরিগণিত। তিনি উত্তর পশ্চিম-প্রদেশের সর্ব্বসাধারণের কিরূপ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন, তাহা এই বলিলেই বেশ বু যাইবে যে, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন একটী প্রকাশ্য সভা আহূত হয়। ঐ সভা যে চাঁদা তুলি ছিলেন, তাহা হইতে প্রতি দ্বিতীয় বৎসর মিওর কলেজে পদার্থবিদ্যাধ্যায়ী সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রকে একটী স্বর্ণপদক পু স্কার দেওয়া হয়।

CALCUTTA

শ্রীজগদীশ চন্দ্র বসু

প্রদীপ

প্রথম ভাগ। } মাঘ, ১৩০৪। { ২য় সংখ্যা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
গ্রন্থক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

মামা বাবু।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

চক্রধর চৌধুরীর উপরি উপরি অনেকগুলি সন্তান মরিয়া যাওয়াতে তাহার একমাত্র বংশধর শ্যামসুন্দরের প্রতি আদর ও যত্নের মাত্রা এতই বর্দ্ধিত হইল যে, তাহাতেই তাহার মস্তকটি একেবারে ভক্ষিত হইল। চক্রধর কলিকাতায় এক মহাজনের আড়তে গদিয়ানী চাকরী করিত। পল্লী অঞ্চলে তাহার মহাজনদের দুই চারিটা আড়ত ছিল, সেই সকল আড়ত তদারকের ছলে দুই এক মাস অন্তর বাড়ী আসিয়া চক্রধর বাড়ীতে কয়েকদিন কাটাইয়া যাইত। কলিকাতায় লেখাপড়ার প্রচলন এবং শিক্ষিত লোকের সম্মান দেখিয়া তাহার আগ্রহ হইয়াছিল যে, তাহার ছেলেটিও লেখাপড়া শিখিয়া একটা মানুষের মত মানুষ হয় এবং দিব্য জামাজোড়া গায়ে দিয়া দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত আফিস করে। চক্রধরের বয়স কিছু বেশী হইয়াছিল, সুতরাং সে মনে করিয়াছিল, ছেলেটি মানুষ হইয়া উঠিলেই সে কাজে ইস্তফা দিয়া বাড়ী আসিবে এবং পায়ের উপর পা রাখিয়া দুবেলা দুটি খাইবে আর হরিনাম করিবে। বেশী কিছু না হয়ত ছাত্রবৃত্তি পাস করিলে ছেলে একটা মোক্তারও হইতে পারে। তখন তাহার অন্ন খায় কে? উক্ত ব্যবস্থাশাস্ত্রজীবীদিগের সম্বন্ধে চক্রধর চৌধুরীর এমনি একটা উচ্চ ধারণা ছিল।

কিন্তু বাপের সংকল্প যতই উচ্চ হোক্, লেখাপড়ায় ছেলের কিছুমাত্র মনোযোগ ছিল না। গ্রামের বাঙ্গালা স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া সে পাড়ার দুষ্ট ছেলেদের দলপতি হইয়া উঠিল। স্কুলে এমন অমনোযোগী ছাত্র দ্বিতীয় ছিল না। পণ্ডিত পড়া জিজ্ঞাসা করিলে তাহার পেটব্যথা করিত, অঙ্ক কসিবার সময় সে শ্লেটের উপর ময়ূর আঁকিত এবং শেষ ঘণ্টায় স্কুলের সকল ছাত্র যখন সারি দিয়া দাঁড়াইয়া, সুর করিয়া কড়া গণ্ডা আওড়াইত, তখন শ্যামসুন্দর গোলে হরিবোল দিত, আর নিকটবর্ত্তী ছেলেদের চাদরে চাদরে গ্রন্থি বাঁধিয়া মজা দেখিত। পণ্ডিত মহাশয় তাহার গায়ের চাদর খুলিয়া কখন জলবিছুতি লাগাইতেন, কখন তাহার পিঠে বাখারি ভাঙ্গিতেন, কিন্তু সে সংশোধনের অতীত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রহার অত্যন্ত গুরুতর হইলে, বেতের অগ্রভাগ হইতে দেহটাকে বাঁচাইবার জন্য দুই হাত বিস্তার করিয়া কঠোর আর্ত্তনাদ করিত। পণ্ডিত মহাশয় এক একদিন তিন হাত জমী মাপিয়া তাহার নাকে খত দিয়া লইতেন, কোন দিন পণ্ডিতের আদেশক্রমে তাহার দুইজন সমপাঠী তাহার দুই কাণ ধরিয়া সকল ছেলের সম্মুখে পাঁচ সাতবার ঘোড়দৌড় করাইত; কিন্তু শাস্তি যতই গুরুতর হোক, ষাঁড়ের মত শুষ্ক চীৎকার ভিন্ন, তাহার চক্ষে কেহ কোন দিন একবিন্দু অশ্রু দেখে নাই। শ্যামসুন্দরের বাপ বাড়ীতে আসিয়া মধ্যে মধ্যে তাহাকে পড়াইতে বসিত; বেলা শেষ হইয়া আসিলে, বাহিরের ঘরের বারান্দায় বসিয়া বর্ত্তুল ভুঁড়িটি এবং প্রশস্ত বক্ষের উপর কাঁচা পাকা ঘন রোমরাজি বিকাশ করিয়া নিমীলিত নেত্রে যখন সে ফর্‌সী টানিত, তখন শ্যামসুন্দর কাছে বসিয়া সুর করিয়া পড়িত, "লেখাপড়া করে যেই, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই," কিন্তু তাহার দৃষ্টি অদূরবর্ত্তী জেলেদের পেয়ারা গাছের শাখাতেই ন্যস্ত থাকিত এবং গাড়ী ঘোড়া চড়া অপেক্ষা, বৃক্ষারোহণের কল্পনাই তাহার নিকট অধিকতর প্রীতিকর বলিয়া বোধ হইত। অবশেষে তাহার পিতা কোন স্বাগত আত্মীয় বন্ধুর সহিত বৈষয়িক আলাপে প্রবৃত্ত হইলেই সে সমস্ত বৈকালটা

বোসেদের ফুলবাগান, দত্তদের আমবাগান এবং মুখুয্যেদের কামরাঙ্গা বাগান প্রভৃতি অনেক গম্য ও অগম্যস্থানে এক-দল দুষ্ট ছেলের দলপতি হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইত।

এইরূপে শুক্লপক্ষের শশিকলার মত অথবা সহজ কথায় বন্ধনবিহীন ষণ্ডের ন্যায় শ্যামসুন্দর প্রতিদিন পিতামাতার অন্ধ স্নেহ এবং অন্নজলে পরিপুষ্ট হইতে লাগিল। গ্রাম্য জমীদার চাটুয্যেদের ছোটবাবু এই সময়ে এক সখের পাঁচালীর দল খুলিয়া গ্রামের অনেকগুলি ছেলের পরকাল নষ্ট করিবার আয়োজন করিয়া তুলিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই শ্যামসুন্দরের এক আধটু গান করিবার অভ্যাস ছিল। দলে মিশিয়া প্রতিরাত্রি রীতিমত গানের আখড়া চলিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে সে তামাক ছাড়াইয়া মদ ও গঞ্জিকার জুরিস্‌ডিক্‌সনে পদার্পণ করিল। তাহার বৃদ্ধ পিতা আশা করিয়াছিল, অন্ততঃ পক্ষে সে একটা মোক্তার হইয়াও দু'দশ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিবে, কিন্তু শ্যামসুন্দর হঠাৎ এক প্রকাণ্ড কালোয়াতে পরিবর্ত্তিত হইল! বিধি-লিপি এমনি অচিন্তনীয়।

যাহাহউক, ছাত্রবৃত্তির তিন ক্লাশ নীচে হইতে এইরূপে পড়াশুনায় ইস্তফা দেওয়াতে শ্রীমান্ শ্যামসুন্দরের জীবন বেশ নিষ্কণ্টক হইয়া উঠিল। মায়ের অনেকগুলি ছেলের অকালমৃত্যু হওয়ায়, তিনি সকালে সকালে একটি নোলক-পরা বধূ আনিয়া সংসারসুখটা ষোলআনা রকমে ভোগ করিবেন, এমন আশা করিলেন; কিন্তু মানুষের সকল আশা পূর্ণ হয় না। পুত্রের বিবাহ দিবার পূর্ব্বেই অপূর্ণ আশা লইয়া তাঁহাকে ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইল।

পুরুষের অন্নবস্ত্র এবং রূপগুণের যতই অভাব হোক্, দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশের প্রতি পিতামহ বৃদ্ধ প্রজাপতির এতই অনুগ্রহ যে, তাহার বিবাহের জন্য কখন কন্যার অভাব হয় না। বিশেষতঃ আজকাল পল্লীসমাজে ছেলে অপেক্ষা ছেলের বাপকে দেখিয়াই কন্যাগ্রস্ত ব্যক্তিগণ স্ব স্ব অপরিণীতা কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ পাকাইয়া তুলেন। সুতরাং গদীয়ান চক্রধরের পুত্রের বিবাহে কিছুমাত্র গোলযোগ হইল না। রামনগরের ত্রিলোচন সরকারের কন্যার সহিত শ্যামসুন্দরের বিবাহ স্থিরীকৃত হইল। কন্যার বর্ণ মসীকৃষ্ণ হইলেও তাহার সুবর্ণলতা নাম রাখিতে পিতামাতার আপত্তি দেখা যায় না। সেই নজীর অনুসারে ত্রিলোচনের কন্যার বিদ্যুল্লতা নাম রাখা হইয়াছিল। ত্রিলোচন কিছু সম্পত্তি রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছিল, তাই লোভান্ধ চক্রধর বিদ্যুল্লতার রূপের পরিচয় পাইয়াও এ বিবাহে আপত্তি করে নাই। বিবাহের পূর্ব্বে একদিন সে বৃদ্ধ কুল-পুরোহিতকে এ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করিয়াছিল; কিন্তু পুরোহিত ঠাকুরও কিছু আশা রাখিতেন, তাই তিনি শ্লোক আওড়াইয়া চক্রধরকে বুঝাইয়া দিলেন যে, পরাশর-সংহিতায় লিখিত আছে, কলিযুগে ছেলের পাস তাহার কুল এবং মেয়ের বাপের অর্থ তাহার রূপ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

বিবাহের অচিরকালমধ্যেই মাতৃস্নেহবঞ্চিত যুবক শ্যামসুন্দর শাশুড়ীর স্নেহ ও ঐশ্বর্য্যে তাঁহার সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়া পড়িল এবং শ্বশুর বাড়ীতেই স্থায়ী আড্ডা গাড়িল। চক্রধর তাহাতে অসন্তুষ্ট হইল না; সে মনে ভাবিল,"ছেলেটা যদি বেয়ানকে হস্তগত করিয়া দু'পাঁচশো টাকা ঘরে আনিতে পারেত মন্দ কি"? 'শস্যঞ্চ গৃহমাগত' চাণক্য পণ্ডিতের এই শ্লোকটার অর্থ সে ভাল রকমই বুঝিত। কিন্তু শ্বশুরবাড়ী আসিয়া গৃহের কথা কি অসমর্থ বৃদ্ধ পিতার কথা শ্যামসুন্দরের বড় মনে পড়িত না।

শ্বশুরবাড়ী কিছু দিন বাস করিয়া শ্যামসুন্দর দেখিতে পাইল, কতকগুলি অনাবশ্যক পরিবার সেখানে বিনা প্রতিবাদে প্রতিপালিত হইতেছে, কিন্তু সেগুলিকে বিদূরিত করিবার কল্পনা এ পর্য্যন্ত কাহারো মনে উদিত হয় নাই। অতএব এই সুমহৎ কার্য্যে শ্যামসুন্দর আপনার মনোযোগ অর্পণ করিল।

সংসারে প্রায়ই দেখা যায়, যাঁহারা অন্নবস্ত্রাদি দ্বারা অন্যের জীবনযাত্রা সুগম করিয়া দেন, তাঁহাদের স্নেহ ছায়ায় এমন এক একটা দুঃশীল লোক আশ্রয় গ্রহণ করে, যাহারা প্রতিপাল্য ব্যক্তিগণকে মুখের আহার হইতে বঞ্চিত না করিয়া কিছুতেই পরিতৃপ্ত থাকিতে পারে না। তবে সৌভাগ্যবশতঃ বিধাতা যাহাদিগকে অন্যের প্রতিপালন ক্ষমতা দান করেন নাই, তাহাদের মধ্যেই এরূপ পাশবিক বৃত্তি অঙ্কুরিত হইতে দেখা যায়।

শ্যামসুন্দরের এই অনধিকারচর্চ্চায় তাহার খুড়শ্বশুর নবদ্বীপচন্দ্রের সহিত তাহার বিষম বিবাদ উপস্থিত হইল। শেষে সে শাশুড়ীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া খুড়শ্বশুরের সহিত বিষয় বিভাগের জন্য অত্যন্ত জেদের সঙ্গে মোকদ্দমা আরম্ভ

করিল। ক্রমে জেলা আদালত হইতে হাইকোর্ট পর্য্যন্ত মোকদ্দমা গড়াইল, যে কিছু নগদ টাকা ছিল, তাহা উকীল রসুমে আর মোকদ্দমার ব্যয়ে নিঃশেষ হইয়া গেল; শেষ বিচারে খুড়শ্বশুরেরই সুবিধা হইল। মোকদ্দমারূপ সুবৃহৎ বহ্নিচক্র হইতে যে কিছু স্থাবর সম্পত্তি রক্ষা পাইয়াছিল, তাহা সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিয়া, নগদ টাকা, তৈজসপত্র, স্থবিরা শাশুড়ী এবং যুবতী স্ত্রী লইয়া পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়সে শ্যামসুন্দর পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিল।

এখন শ্যামসুন্দরই বাড়ীর কর্ত্তা। বৃদ্ধ চক্রধর অক্ষমতা বশতঃ কাজে ইস্তফা দিয়া চলিয়া আসিয়াছে, এখন সে শুধু হরিনাম করে আর দুবেলা দুটি খায়। বৃদ্ধ বয়সে আহারের প্রতি সকলেরই একটু লোভ হইয়া থাকে; বোধ হয় ইহা বার্দ্ধক্যের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা; কিন্তু এই আহারলিপ্সাটা শ্যামসুন্দরের শাশুড়ী ও স্ত্রীর চক্ষে অতি কদর্য্য যথেচ্ছাচার বলিয়া প্রতীয়মান হইত। শ্যামসুন্দরের স্ত্রী যখন তখন প্রবল-ব্যাত্যা তুলিয়া বলিত,—"আমরা যে প্রতিদিন গহনা বন্দক দিয়ে টাকা আনচি, একি শুধু ঐ বুড়োটার জন্যে মাছের ঝোল, আর ঘি দুধ যোগাতে?" সঙ্গে সঙ্গে শাশুড়ী কন্যার মতের পোষকতা করিয়া শ্যামসুন্দরকে বলিত, "আমার যে দুতোলা আছে, তাতো তোমারই। ও বুড়োটার খোরাকেই যদি সব খরচ হয় তবে আর আমার এখানে এসে কি লাভ হলো?" পিতার এই অবিবেচনার বিরুদ্ধে শ্যামসুন্দর প্রথম প্রথম কিছু বলিতে সাহস করিত না, কিন্তু অবশেষে তাহার স্ত্রী যখন পঞ্চম ছাড়িয়া সুর সপ্তমে তুলিয়া স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,"অপদার্থ, নির্বিঘ্নে মিন্‌সে, তুমি বসে থাকবে আর তোমাদের বাপ বেটাকে আমার বাপের টাকা ভেঙ্গে পুষবো?"—তখন শ্যামসুন্দরের চৈতন্যোদয় হইল। স্ত্রীর ভয়ে সে পিতার সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত বন্ধ করিল। সে বেলা দশটার মধ্যে স্নান করিয়া আসিয়া আয়না চিরুণী লইয়া দুই ঘণ্টা ধরিয়া বেশবিন্যাস করিত, তাহার পর যথারীতি আহারাদি সম্পন্ন করিয়া শ্বশুরবাড়ীর বাঁধা হুকাতে একটী পানের সহিত এক শিলিম তাম্রকূট সশব্দে পরিপাকপূর্ব্বক খিড়কী দ্বার দিয়া ভবানী চাটুর্য্যের বাড়ী পাশার আড্ডায় উপস্থিত হইত। ভবানী চাটুর্য্যের বাড়ী গ্রামের মধ্যে খেলা ও গল্পের প্রধান আড্ডা। এখানে শ্যামসুন্দরের গল্পে অনেক রাজামহারাজা মারা পড়িত; আজকাল ইংরেজদের সৈন্যবল কিরূপ, রুসের ভারত আক্রমণের সম্ভাবনা আছে কিনা, অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলিখাঁর কি রকম নবাবী ছিল, হাইকোর্টের জজদের মধ্যে কে কেমন বিচারক, এবং ব্যারিষ্টারদের মধ্যে কে কত ভাল ইংরাজী বলিতে পারে, এই সকল বিষয়ে সে দাড়ী নাড়িয়া মুখের নানাপ্রকার ভঙ্গি করিয়া অনর্গল এমন গল্প বলিত যে শ্রোতৃবর্গ সবিস্ময়ে তাহার বাক্যসুধা পান করিয়া ক্লান্ত হইত না। কেহ তাহার বক্তৃতা শক্তির প্রশংসা করিত, কেহ বলিত, বাঙ্গলা দেশে তাহার মত লোক দ্বিতীয় নাই। আত্মপ্রশংসার একটা নিবিড় ধূম্রালোক সৃজন করিয়া শ্যামসুন্দর সংসার ভুলিয়া যাইত এবং মনের সুখে অধিক করিয়া তামাক টানিত।

এদিকে মধ্যাহ্নে স্নান করিয়া আসিয়া চক্রধর বেলা ১টা পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, কখন তাহাকে আহারের জন্য ডাকা হয়, কিন্তু কেহই বৃদ্ধকে আহারার্থ আহ্বান করিল না। অবশেষে তৃতীয় প্রহরের পর বাড়ীর মধ্যে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল,"বেয়ান, রান্না হ'লো কি?" বেয়ান মুখখানি হাঁড়ির মত করিয়া উত্তর দিল, "দুবেলা চা'ল সিদ্ধ করবার জন্যেত আর কেউ দাসী বাঁদি নেই, একটা পয়সা রোজগারের ক্ষ্যামতা নেই, ভাতের খোঁজ করাত আছে, ভাত আসে কোথা হতে?"—বৃদ্ধ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিল, অবনতমস্তকে নিজের অবস্থার কথা চিন্তা করিতে লাগিল। হায় বার্দ্ধক্য! আজ তাহার সংসার অরণ্য, জীবন অন্ধকারপূর্ণ, নিজ গৃহেও তাহার স্বাধীনতা নাই; সেদিন আর তাহার কিছুই আহার হইল না। তাহার হাতে দুই একটি টাকা ছিল, তাহাই ভাঙ্গাইয়া কোন কোন দিন দু'পয়সার চিড়া কিনিয়া আনিয়া তদ্দ্বারা ক্ষুধার নিবৃত্তি করিত, কোন দিন মুড়ী খাইয়া কাটাইত। কিন্তু তাহাতেও অব্যাহতি নাই। বেয়ান শুনাইয়া শুনাইয়া বলিত, "হাতে টাকার পুঁটুলি আছে, লুকিয়ে লুকিয়ে ভাল-মন্দ খাওয়া হয়, এতবড় গেরস্তালিটা কি রকম ক'রে চ'লে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।"—বৃদ্ধ দুঃখে অভিমানে পুত্রকে কোন কথা বলিত না। একদিন অপরাহ্নে চক্রধর বাহিরের ঘরে বসিয়া নিজের দুরদৃষ্টের কথা ভাবিতেছে, এমন সময় তাহার তিন বৎসর বয়স্ক পৌত্র সুধীরকুমার একটা বাটিতে মুড়ী লইয়া টলিতে টলিতে দাদার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল,

এবং তাহার মুখের উপর কোমল বড় বড় চক্ষু দুটি স্থাপন করিয়া আধবিগলিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরদাদা, তুই ভাত খাত্‌নে কেন, আগ ক'রেতিচ্‌? খা, মুলি খা," বলিয়া তাহার মুখে একমুষ্টি মুড়ী তুলিয়া দিল। বৃদ্ধের স্নেহ ও দুঃখ উথলিয়া উঠিল, অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বলিল, "না দাদা, আমি রাগ করিনি, তুমি মুড়ী খাও।"—সহসা বালক মুড়ীর বাটী ভূমিতলে ফেলিয়া তাহার ঠাকুরদাদার পিটের উপর ভর দিয়া পক্ককেশপূর্ণ মস্তকটি আক্রমণ করিল। এমন সময় দ্বারপ্রান্ত হইতে সুধীরের আই-মা কঠোরস্বরে বলিয়া উঠিল, "সুধীর ওখানে কি কচ্চিস্‌, আয় বাড়ীর মধ্যে।"—সুধীর মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমি বালি দাবোনা, দাদা মতায়ের পাকা তুল তুলবো।" "আর পাকা চুল তুলতে হবে না," বলিয়া তাহার আই-মা তাহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল; বালকের তীব্র চীৎকার রুদ্ধদ্বারের অন্তরালে বিলুপ্ত হইয়া গেল। বৃদ্ধ চক্রধর উচ্ছ্বসিত অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না, কাঁদিয়া বলিল, "বেয়ান, ভাতবন্দ করিয়াছ, উহাকে আমার কাছে হইতে কাড়িয়া লইয়ো না; তিন বৎসর ধরিয়া উহাকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছি।"—কিন্তু কে ইহার উত্তর দিবে?

পিতার এই প্রকার দুরবস্থার কথা শুনিয়া কন্যা রাজমোহিনী নৌকা করিয়া তাহাকে স্বামীর কর্ম্মস্থান রতনপুরে লইয়া গেল। রাজমোহিনীর স্বামী ইন্দু বাবু রতনপুরের জমীদারের দেওয়ান। ইন্দুবাবুর আশ্রয়ে আসিয়া বৃদ্ধ কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিল, কন্যার যত্ন ও পরিচর্য্যায় তাহার হৃদয়ের ক্ষত অনেক পরিমাণে বিদূরিত হইল, কিন্তু তাহার তিন বৎসরের সেই ক্ষুদ্র নাতিটির প্রত্যেক দিনের সহস্র প্রকার আবদার, তাহার হাস্য কলরব এবং সাদরসম্ভাষণের মধুর স্মৃতি এই বিরহবিষাদক্লিষ্ট জীর্ণ প্রবাসী বৃদ্ধের হৃদয় পীড়িত করিতে লাগিল, তাহার কন্যার পুত্রকন্যাগণ তাহার হৃদয়ের সে অভাব পূর্ণ করিতে পারিল না।

অকিঞ্চিৎকর, অকর্ম্মণ্য নির্ব্বোধ বৃদ্ধকে বিদায় দিয়া শ্যামসুন্দরের স্ত্রী ও শাশুড়ী অনেকটা সান্ত্বনা লাভ করিল। শ্যামসুন্দরকে প্রথম প্রথম বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়গণের নিকট কিছু অনুযোগ সহ্য করিতে হইয়াছিল, কিন্তু সে অপ্রতিভ হইবার লোক নহে। কেহ তাহার ব্যবহারে দোষ প্রদর্শন করিলে সে উত্তর করিত, "বাবার ঐ একরকম কেমন স্বভাব! এতটা কাল তিনি আমার শাশুড়ীর অন্নে প্রতিপালিত হ'লেন, এখন সামান্য অছিলা ধ'রে আমার ভগিনীর বাড়ী চলে যাওয়া কি ভাল হ'য়েছে? বুড়ো হয়েছেন, যদি তাঁর একটু বুদ্ধি হ'লো।" শুনিয়া অনেকেই শ্যামসুন্দরের পিতৃভক্তির প্রশংসা করিত।

কিন্তু আর ত বসিয়া থাকা চলে না, শ্বশুরবাড়ীর গহনাগুলি ক্রমে নিঃশেষিত হইয়া আসিল; পত্নীর অসংযত রসনার উগ্রতাও অধিকতর অসহনীয়, সুতরাং বাধ্য হইয়া শ্যামসুন্দরকে অর্থোপার্জ্জনে মনোনিবেশ করিতে হইল। কিন্তু বড়লোকের মোসাহেবী ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যে তাহার পারদর্শিতা না থাকায় অগত্যা সে চাকরী লাভের দুরাশা পরিত্যাগ করিল।

কিছু কিছু করিয়া টাকা কর্জ্জ লইয়া অবশেষে সে এক মুদীখানার দোকান খুলিয়া বসিল। চাউল, ডাইল হইতে হাঁড়ি, কাঠ সকল জিনিষই দোকানে সঞ্চিত আছে। কিন্তু দোকানের আয় অপেক্ষা সংসারের ব্যয় অনেক বেশী, কাজেই দোকানের মূলধন ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল, শেষে দোকানের ঝাঁপ চিরস্থায়ী রকমে বন্ধ হইয়া গেল। মহাজনেরা টাকার তাগাদা করিতে আসিলে শ্যামসুন্দর অতি গম্ভীর বিষণ্ণ লোকের মত উত্তর করিতে লাগিল, "রয়ে ব'সে নেও ভাই। তিন হাজার টাকা বিলের বাকি, আদায় পত্র না হলে কি ক'রে দেনা শোধ করি?"—কলিকাতার মহাজন সুপারী, মসলা, এবং কেরোসিন তেলের জন্য অনেক টাকা পাইবে। পুনঃ পুনঃ তাগাদা দ্বারাও যখন তাহারা কপর্দ্দক মাত্র আদায় করিতে পারিল না, তখন তাহারা নালিশ করিবার ভয় দেখাইল।

কলিকাতার মহাজন নালিশ করিতে চাহিয়াছে, কথাটা গ্রামে রাষ্ট্র হইবা মাত্র শ্যামসুন্দরের গ্রামের মহাজনেরা তাহাকে আরও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। চাটুর্য্যেদের মেজ বাবুর সঙ্গেই তাহার প্রণয় কিছু বেশী। তিনি মধ্যে তাহাকে দুই শত টাকা কর্জ্জ দিয়াছিলেন। সহসা একদিন ডাকাইয়া বলিলেন, "টাকাটা আমার স্ত্রীর, বড় জেদ আরম্ভ করিয়াছে, কোন রকমে ওটা শোধ করে ফেল ভাই।"—ছোট বড় সমস্ত দেনা উদ্যতফণা সর্পের ন্যায় তাহাকে দংশন করিতে প্রস্তুত হইল। তখন শ্যামসুন্দর নিরুপায় হইয়া হাজার টাকায় ভদ্রাসনবাড়ী খানি হরিপুরের বিশ্বাসদের কাছে বন্ধক রাখিয়া কতক কতক দেনা শোধ করিল। রেহেনী তমঃসুকে তাহার পিতাকেও যথারীতি নাম স্বাক্ষর করিতে হইল। আমরা লোকমুখে শুনিয়াছি, বৃদ্ধ তাহার অন্তিমের সম্বল এই পৈত্রিক অট্টালিকা টুকু উত্তমর্ণের গ্রাসে নিক্ষেপ না করিবার জন্য যথাবিহিত চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু বেয়ানের প্রবল ঝঙ্কারে সেই ক্ষীণপ্রাণ জীর্ণ বৃদ্ধের ক্ষুদ্র প্রতিবাদ আবর্ত্তময়ী ঝটিকার মুখে শুষ্কপত্রের ন্যায় উড়িয়া গেল।

বাড়ী বাঁধা দিয়া ঋণশোধ চলিতে পারে, কিন্তু সে টাকায় সপরিবারে দীর্ঘকাল ধরিয়া উদরান্নের সংস্থান হয় না, কাজেই উপায়ান্তর না দেখিয়া শ্যামসুন্দর তাহার ভগিনী রাজমোহিনীর শরণাপন্ন হইল। আর কিছু না হউক, তাহার ভরসা হইল, কিছুদিন সে পাওনাদার গুলার তাগাদা হইতে রক্ষা পাইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

একটা ক্যাম্‌বিশের ছোট ব্যাগ, ছোট একটি কলি হুকা, তার উপযুক্ত একটি কলিকা এবং সাদা কাপড় লাগানো ঝালরওয়ালা একটা ছাতি লইয়া জামাই বাবুর মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যুতা কাপড়, কামিজ চাদরে সুসজ্জিত শ্যামসুন্দর রতনপুরের জমিদারী কাছারীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ভগিনী রাজমোহিনীর সহিত কিছুদিন পূর্ব্বে সামান্য কি কারণে তাহার মনোবিবাদ ঘটিয়াছিল। এমন কি সেই জন্য শ্যামসুন্দর আর কখন ভগিনীগৃহে পদার্পণ করিবে না এরূপ প্রতিজ্ঞাও করিয়াছিল; কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া ভ্রাতা যে পুনর্ব্বার তাহার গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন, ইহা ভাবিয়া রাজমোহিনী অত্যন্ত আনন্দিতা হইল, ভগিনীর প্রতি ক্রোধ বিস্মৃত হইয়া আপন মায়ের পেটের ভাই যে আপনা হইতে তাহার গৃহে আসিয়াছে, এই সুমধুর বিশ্বাসে রাজমোহিনীর নারীহৃদয় প্লাবিত করিয়া সেখানে ভ্রাতৃস্নেহ উথলিয়া উঠিল, রাজমোহিনী অন্তরের সহিত ভ্রাতাকে মার্জ্জনা করিল।

বিপিন খানসামা যখন রতনপুরে মামাবাবুর শুভাগমন সংবাদ জ্ঞাপন করিল, রাজমোহিনী তখন দোতালার একটা কুঠুরীতে পদদ্বয় বিস্তৃত করিয়া কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ পাঠ করিতেছিল, আর বিরু ওরফে বিরূপা ঝি পিঠের দিকে বসিয়া কালো কেশের ঝাড়ে বিলি দিতে দিতে মধ্যে মধ্যে স্তুতিবাদের মৃদুমধুর বুকনি চালাইতেছিল। রাজমোহিনী তাড়াতাড়ী পুঁথি বন্দ করিয়া ভ্রাতাকে বহির্দ্বার পর্য্যন্ত আগাইয়া লইতে আসিল, স্মিতমুখে বলিল, "অনেকদিন পরে যাহোক দাদার আমাদের মনে পড়েছে, বৌ ভাল আছেত, মাউই মা, সুধীর, সকলের খবর ভালত?"—রাজমোহিনীর ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা চারিদিক হইতে ব্যগ্রবাহু বিস্তার করিয়া 'মামা' 'মামা' বলিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। সংক্ষিপ্ত উত্তর দ্বারা ভগিনীর কৌতূহল নিবারণ পূর্ব্বক, 'মামাবাবু' একদল শিশুফৌজপরিবেষ্টিত হইয়া দ্বিতলে চলিলেন, জলযোগের গুরুতর আয়োজন পড়িয়া গেল।

বৃদ্ধ চক্রধর আহারান্তে একখানি অনুচ্চ চারপাইর উপর শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছিল। কন্যাগৃহে আসিয়া পরাধীনতার জন্য তাহার যতটা মানসিক সুখের অভাব থাক্‌, অন্নকষ্টের জন্য শান্তির অভাব ছিল না। বৈকালে জাগিয়া উঠিয়াই বৃদ্ধ পুত্রের আগমনসংবাদ জানিতে পারিল, কম্পিতপদে উপরের ঘরে আসিয়া সাগ্রহে পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিল "কি বাবা শ্যাম, বাড়ীর সব মঙ্গলত, সুধীর ভাল আছে?"—শ্যামসুন্দর তখন জল যোগে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। গত রাত্রি হইতে এত বেলা পর্য্যন্ত তাহার আহার হয় নাই। রেকাবী হইতে একটা রসগোল্লা লইয়া ক্ষুধানলে আহুতি প্রদান করিতে করিতে সংক্ষেপে উত্তর করিল, "হুঁ" বৃদ্ধ পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল, "দেনাগুলি পরিশোধের কি ব্যবস্থা কল্লে?" দাড়ী-বহুল-মুখে গাম্ভীর্য্যসঞ্চয়পূর্ব্বক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শ্যামসুন্দর উত্তর দিল, "সে ভাবনা আমার আছে।" ভয়ে বৃদ্ধ আর কোন প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না, ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল।

মামাবাবুর রতনপুরে শুভাগমনের পর হইতে দাস দাসী মহলে, হাটের দোকানদারদের মধ্যে, পুকুরের মাছের দলে ভারি হাঙ্গামা পড়িয়া গেল। রতনপুরের কাছারীর সম্মুখে প্রতি সপ্তাহে শনি মঙ্গলবারে একটা করিয়া প্রকাণ্ড হাট বসিত, শনিবারের হাটকে 'চারের' হাট ও মঙ্গলবারের হাটকে 'তিনের' হাট বলিত। দেওয়ান ইন্দুবাবুর চাকরেরা শনি মঙ্গলবারে এই হাট হইতে সপ্তাহের ব্যবহারোপযোগী জিনিষ পত্র কিনিয়া রাখিত; ভগিনী গৃহে আসিবার

দুই একদিন পরেই শ্যামসুন্দর ভগিনীর কাছে প্রস্তাব করিল যে প্রতি হাটে দুটাকা আড়াই টাকার জিনিষ কেনা হয় কিন্তু জিনিষ পত্র তেমন দেখিয়া শুনিয়া ক্রয় করা হয় না, চাকর বাকর গুলা দুই হাতে চুরী করে। রাজমোহিনী বুঝিল, "দাদার মত এমন ব্যথার ব্যথী সংসারে দুটী নাই; চাকর বাকরদের চুরী দেখিয়া দাদার মনে বড়ই কষ্ট হইয়াছে। বাসায় ত আরো কত জন আছে, দেবর কমলাকান্ত ইন্দুবাবুর অধীনে জমীদার সরকারে সদর আমিনি করিতেন ও সস্ত্রীক এখানে থাকিতেন, তারাত একদিন ভুলিয়াও বলে না যে চাকরেরা দুহাতে পয়সা লুটিতেছে।"—অতএব প্রসন্ন মুখে দাদাকে বলিল, "তুমিত দিন কত আছ। যে ক'দিন থাক মাছ তরকারীগুলো দেখে শুনে কিনে দিয়ো।"—শ্যামসুন্দর মাথা নাড়িয়া সস্মিতবদনে ভগিনীর প্রস্তাবের অনুমোদন করিল।

পরদিন হাটবার। ক্রসকরা জুতা জোড়াটি পায়ে দিয়া, উনপঞ্চাশ নম্বরের ধোলাই রেলির থানের কোচাটা গলায় বেড় দিয়া, নাতিস্থূল ভুঁড়িটি সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত করিয়া শ্যামসুন্দর হাটের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল; সঙ্গে পাঁচকড়ি চাকর। ইন্দু বাবুর আদেশ যেন হাটের দোকানদারদের কাছে অন্যায় করিয়া কি কমদাম দিয়া কোন জিনিষ লওয়া না হয়। মামাবাবু বাজার সরকারী পদটি গ্রহণ করিবার পর হইতে এ নিয়মটি উঠিয়া গেল। বাজারে আলুর সের দুই পয়সা, মামাবাবুর কাছে দেড়টি পয়সার বেশী আদায় করিবার যো নাই; পাঁচ আনা মাছের সের, মামাবাবু পছন্দমত মাছ লইয়া ওজন না করিয়াই বাড়ীর ভিতর পাঠাইয়া দেয়, তাহার পর পছন্দমত একটা দাম দিবার আদেশ হয়। সুধু তাহাই নহে; এক হাটে পর্য্যাপ্ত তরকারী ক্রয় করিয়া তাহার কিয়দংশ বাসায় উদ্বৃত্ত থাকিলে পরের হাটে বিক্রেতাকে সেই সকল শুষ্ক তরকারী ফেরত দিয়া তৎপরিবর্ত্তে নূতন তরকারী গ্রহণ করা মামাবাবুর অন্যতম বাহাদুরী বলিয়া পরিগণিত হইত।

দোকানদারগণ এইরূপে উৎপীড়িত হইলেও তাহাতে ইন্দু বাবুর খরচের কোন রকম সাশ্রয় লক্ষিত হইল না। বরং পূর্ব্বাপেক্ষা খরচপত্র অধিক হইতে লাগিল। ঈর্ষাপরায়ণ দুষ্ট চাকরেরা বলাবলি করিত, মামা বাবু খরচ পত্র বেশী করিয়া লেখে, কিন্তু ইহা বিশ্বাসযোগ্য কথা নহে; কারণ মামা বাবুর হাতে বাজারের ভার দেওয়ার পর হইতে যেমন উৎকৃষ্ট তরকারী, ভাল মাছ, বাজারের শ্রেষ্ঠ দ্রব্যগুলি গৃহে আনীত হয়, আগে কোন দিনই যে তেমন হইত না, একথা রাজমোহিনী কিছুতেই অস্বীকার করিত না।

কিন্তু মাছ তরকারী যতই উৎকৃষ্ট হোক, মামা বাবুর ব্যবহারে চারিদিকে অসন্তোষের কোলাহল নিবৃত্ত হইল না। দোকানদারেরা তাহার ব্যবহারে অত্যন্ত কাতর হইয়া দেওয়ানজীকে এ সকল কথা জানাইবার জন্য উৎসুক হইল, কিন্তু একেবারে ইন্দু বাবুর কাছে না গিয়া কমলাকান্তের কাছে তাহারা সমস্ত কথা বিবৃত করিল। তাহারা ইহাও বলিল যে, দেওয়ানজী যদি সম্বন্ধীর প্রতি প্রীতি বশতঃ এই অত্যাচারের প্রতিবিধান না করেন, তাহা হইলে রাজা বাবুর কাছেও তাহারা আরজ করিতে সঙ্কুচিত হইবে না। কমলাকান্ত মিষ্ট বাক্যে তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া বিদায় দিলেন।

পরদিন প্রভাতে কমলাকান্ত ইন্দু বাবুকে বলিলেন, "দাদা, আমাদের এখানে যেটুকু মান সম্ভ্রম ছিল, তাহা ত আর থাকে না। আপনার নিজের লোক সাধারণের প্রতি যে অত্যাচার করিতেছে, তাহাতে আমাদের উপর সাধারণের ভক্তি বিশ্বাস কিরূপে থাকিবে? আর মনিবের কানে একথা উঠিলেই বা তিনি কি ভাবিবেন?"—ইন্দু বাবু প্রথমে কিছু বুঝিতে পারিলেন না। তখন কমলাকান্ত সবিস্তারে তাঁহার নিকট সকল কথা ব্যক্ত করিলেন। ক্রোধে ইন্দুকান্তের মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি তখনই সেই অপদার্থ সম্বন্ধীটার ঘাড় ধরিয়া তাহাকে বাসার বাহির করিয়া দিবেন এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু অনেক কথা ভাবিয়া সে ক্রোধ দমন করিবার জন্য কিয়ৎকাল দ্রুতপদবিক্ষেপে বারান্দায় ঘুরিয়া বেড়াইলেন। তাহার পর স্ত্রীকে গিয়া বলিলেন, "তোমার দাদা আমাদের আত্মীয়, সাধারণের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। তাহার হাতে বাজার করিবার ভার দিয়াছ। সে দোকানদারগুলাকে এক আধ পয়সার জন্য যে রকম জ্বালাতন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা শুনিয়া বড় লজ্জা বোধ হয়। আমার সুনাম ও হিতের প্রতি যদি তোমার কিছু লক্ষ্য থাকে, তাহা হইলে তোমার দাদার হাতে আর সে ভার দিয়ো না।"—রাজমোহিনী বিস্ফারিত লোচনে বলিল, "দাদাকে আবার বাজার করবার

ভার দেব কেন? চাকরেরা দুহাতে বাজারের পয়সাগুলো লুটে খায়, তাই দাদাকে বলেছিলাম ওদের দিকে একটু নজর রেখো; আমার যেমন কপাল, কর্ত্তে যাই ভাল, হয় মন্দ; আর লোকেরই বা এত লাগানি ভাঙ্গানিতে দরকার কি? আমি ত আর কারো ঘাড়ে পড়িনি,—দাদার যদি অদেষ্ট মন্দ না হবে, ত তোমাদের দুয়োরে এসে পড়ে থাকবে কেন?"—প্রভাতেই খানিকটে প্রবল অশ্রুবিসর্জ্জন হইয়া গেল। ইন্দু বাবু বিচলিত না হউন, কিছু বিরক্ত, কিঞ্চিৎ ব্যথিত হইলেন; একান্নবর্ত্তী পরিবারের যাঁহারা পরিচালক, তাঁহারা হৃদয়কে ইস্পাতের ন্যায় ঘাতসহ ও লৌহের ন্যায় কঠিন করিতে না পারিলে, প্রতিদিনের কঠোর কথায়, মর্ম্মভেদী বিদ্রূপে এবং পক্ষপাতিত্বের অশ্রান্ত অভিযোগে তাহা ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া যায়। ইন্দু বাবুর হৃদয় কুসুমসুকোমল ছিল, প্রকৃত কাব্যরসের আস্বাদনে তাহা পুলকিত হইয়া উঠিত, সামান্য সুকুমার ভাবস্পর্শে তাহা বীণার তারের ন্যায় ঝন্‌ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিত, পরদুঃখে তাঁহার অশ্রু বিগলিত হইত, দীনদুঃখী বিপন্নের তিনি আশ্রয় ছিলেন, কিন্তু কাহারো অন্যায় আবদার তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না, কর্ত্তব্যক্ষেত্রে তাঁহার হৃদয় বজ্রের ন্যায় কঠিন হইয়া উঠিত; সহস্র প্রলোভন, তোষামোদ কিম্বা ভ্রূভঙ্গীতেও তিনি বিচলিত হইতেন না। এত গুণ না থাকিলে তিনি সামান্য পনেরো টাকা বেতনের 'প্রাইভেট টিউটারী' হইতে এত উচ্চপদ লাভ করিতে পারিতেন না।

ইন্দুকান্ত ও কমলাকান্ত উভয়ে সহোদর ভ্রাতা; অকৃত্রিম স্নেহ-বন্ধনে উভয়ের হৃদয় আবদ্ধ ছিল, সাংসারিক উন্নতি ও পারিবারিক মঙ্গলের জন্য উভয়েই সমান যত্নশীল। সন্ধ্যার পর কাছারীর কাজ সারিয়া উভয়ে একত্র বসিয়া অনেক পারিবারিক কথার আলোচনা করিতেন; বলা বাহুল্য এই সকল আলোচনার মধ্যে শ্যামসুন্দরের স্থান ছিল না। শ্যামসুন্দর কমলাকান্তকে একেবারেই দেখিতে পারিত না, এবং ভগিনীকে স্বার্থানুরোধে যতই আত্মীয় মনে করুক, ইন্দুকান্ত ও কমলাকান্তের সে বিন্দুমাত্রও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিল না। ভ্রাতৃদ্বয় যতক্ষণ বাসায় থাকিতেন, ততক্ষণ শ্যামসুন্দর সেদিকে ঘেঁসিতেও সাহস করিত না, কিন্তু তাঁহারা কাছারী চলিয়া গেলেই সে হুঁকা হাতে লইয়া আসর জমকাইয়া বসিত, আর কোথা হইতে কার্ত্তিকে ছুতোর, নিমু কামার, হরিবোলা ময়রা ও জগা কুমোর আসিয়া তাহার গল্প শুনিতে আরম্ভ করিত। শ্যামসুন্দর তাহার সহচরবর্গকে এমন সকল কথা বলিত, যাহাতে স্পষ্ট প্রমাণ হইত যে রতনপুরের দেওয়ান ইন্দুবাবু তাঁহার সম্বন্ধীর নিতান্ত অধীন।

যাহারা ভীরু ও সন্দিগ্ধচেতা, তাহাদের চরিত্রের এই একটা বিশেষত্ব দেখা যায় যে অন্যে তাহাদের অলক্ষ্যে কি কথা বলিতেছে, তাহা গোপন হইতে না শুনিলে রাত্রে তাহাদের নিদ্রাকর্ষণ হয় না। শ্যামসুন্দরেরও এ বিশেষত্ব ছিল। কমলাকান্ত যখন তাঁহার দাদার নিকট শ্যামসুন্দরের কীর্ত্তিকাহিনী প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন সে এক বাতায়নের অন্তরাল হইতে সকল কথা শুনিতেছিল; শুনিয়া সে কমলাকান্তের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল; প্রতিজ্ঞা করিল কমলাকান্তকে আগে রতনপুর ছাড়াইবে, তাহার পর নিজে সে স্থান ত্যাগ করিবে।

শ্যামসুন্দর মধ্যাহ্নে ভগিনীর কাছে গিয়া কাঁদিয়া পড়িল; বলিল, "এত অপমান আমার আর সহ্য হয় না। আমি কি তোমার দেওরের পাকা ধানে মই দিয়াছি যে সে দেওয়ানজীর কাছে আমার কথা মিথ্যা করিয়া লাগায়? আমি ত তাহার সম্পর্কে এখানে আসি নাই। যদি জানিতাম তাহার ভাত খাইতেছি তাহইলে অনেক আগেই চলিয়া যাইতাম, আমার বাবাকেও থাকিতে দিতাম না। বাড়ীতে কি আমার ভাতের অভাব?"—কথাটা রাজমোহিনীর কাণে এই নূতন প্রবেশ করিতেছে না, সুতরাং ক্ষণকালের জন্য অপমান ও ক্রোধে তাহার মুখখানি জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় লোহিতাভ হইয়া উঠিলেও সে অধিক কিছু বলিল না, সংক্ষেপে উত্তর করিল, "সব শুনেছি, কি বলবো বল! আমি এবাড়ীর কেউ নই, আমার সবই অদৃষ্টের দোষ।"—অর্থাৎ দেবরকে দূর করিয়া দিবার ক্ষমতা থাকিলে সে বাড়ীর কেহ হইতে পারিত, কথার ভাবখানা অনেক পরিমাণে এইরকম, এবং ভ্রাতৃদ্বয়ের সুপবিত্র গভীর প্রেমবন্ধনের মধ্যে বিদ্বেষের সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা চালাইতে পারিলেই হয় ত সে নিজের শুভাদৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিত, কিন্তু আপাততঃ তাহার এই পবিত্র কামনা সংসিদ্ধির কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না। কিন্তু চেষ্টার কোন ত্রুটী হইল না। ইন্দুকান্ত ও কমলাকান্ত কাছারী চলিয়া গেলে সেই দিন হইতে উপরের

ঘরে ভ্রাতাভগিনীতে নানাবিধ ষড়যন্ত্র চলিত ; কি কথা হইত কেহ বলিতে পারে না, কিন্তু সমস্ত বেলার মধ্যে তাহাদের কথার আর শেষ হইত না, দাসীগণের মধ্যে কেহ কেহ দৈবাৎ সেখানে উপস্থিত হইলে সহসা তাহাদের সমস্ত গোপনীয় পরামর্শ বন্ধ হইয়া, 'আজ বড় গরম,' 'হাটে মাছের আমদানী একেবারে বন্ধ,' 'গরুটার দুধ বড় কমে গেছে'—এই রকমের সংক্ষিপ্ত প্রকাশ্য সমালোচনা-স্রোত তাহাদের মুখ-বিবর হইতে উত্থিত হইত।

এই জন্য আজকাল শ্যামসুন্দরের অবসর বড় কম। বাহিরে তাহাকে আর বড় একটা দেখা যাইত না। কার্ত্তিকে ছুতোর, নিমচাঁদ কামার এবং হলা কুমোর প্রভৃতি ইয়ারের দল একে একে কাছারী বাড়ীতে আসিয়া জুটিত, তাহার পর শ্যামসুন্দরের জন্য অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া চলিয়া যাইত, শেষে আর আসিত না।

রতনপুর কাছারীর সন্নিকটে একটা পুষ্কর্ণী ছিল, পুকুরটাতে প্রচুর মাছ। বঙ্কিম বাবু বলিয়াগিয়াছেন নিষ্কর্ম্মা অবতারের বধ্য পুষ্কর্ণীর মাছ। এই মহাজনোক্ত প্রবচন অনুসারে শ্যামসুন্দরের চঞ্চল, লুব্ধ-দৃষ্টি অবিলম্বে এই পুষ্কর্ণীর মাছের উপর পতিত হইল। সুতরাং হুইল, সুতা, বড়সী সমস্ত যোগাড় করিয়া শ্যামসুন্দর পুকুরে রীতিমত চার করিয়া মাছ ধরিতে বসিল ; ছোট বড় রুই, মৃগেল প্রভৃতি মৎস্যবংশের প্রতিদিন ধ্বংশ হইতে লাগিল।

মহকুমা হইতে হাকিমেরা 'সরকোটে' বাহির হইয়া অনেক সময়ই রতনপুরে আসিয়া তাঁবু গাড়িতেন, সুতরাং উকীল মোক্তারগণকেও এখানে আসিতে হইত ; সে কয়দিনের জন্য তাঁহারা দেওয়ানজীর স্কন্ধেই ভর করিতেন। সেই সময়ে এবং অন্য আবশ্যককালে হাটে মৎস্যের অভাব হইলে ইন্দু বাবু পুষ্কর্ণী হইতে মাছ ধরাইয়া অতিথিসৎকার করিতেন ; কিন্তু প্রতিদিন নিয়ম বাঁধিয়া সখের খাতিরে এমনভাবে মাছ মারা নিষ্প্রয়োজন দেখিয়া একদিন সকালে কমলাকান্ত চাকরদের ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, "মামাবাবুকে বলিয়াদিস্, প্রত্যহ এরকম করিয়া মাছ ধরিবার কোন দরকার নাই।"

সেই দিন অপরাহ্নে সকলে কাছারী চলিয়া গেলে, শ্যামসুন্দর নীলু খানসামাকে ডাকিয়া বলিল, "নীলু আজ ঐ পুকুরের কোণটাতে বস্‌তে হবে, খানিকটে ময়দার টোপ তৈয়ারি কর তো।" মামাবাবুর প্রতি নীলুর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। তাহার রতনপুরে আসিবার পর হইতে নীলুর খাটুনী অনেকটা বাড়িয়া গিয়াছে, রাত্রে একটু নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইবার পর্য্যন্ত যো নাই। একশবার করিয়া তামাক সাজাইয়া তাহাকে হয়রান করিয়া দেয়। দুবেলা বাপান্ত ত আছেই, তাহার উপর কর্ণমর্দ্দন এবং চপেটাঘাত মধ্যে মধ্যে তাহার উপরি পাওনা ছিল। সমস্ত দিন খাটিয়া কোথাও সে দুদণ্ড গল্প করিতে গিয়াছে, মামাবাবুর হুঁকা বন্ধ হইয়াছে কি না, অমনি তাহার উপর মহা তর্জ্জন আরম্ভ হইল, "বেটা তুই সমস্ত দিনথাকিস্ কোথা, গুঁতো না খেলে আর সোজা হবিনে।" মনিব অন্নবস্ত্রে প্রতিপালন করিতেছেন, তাঁহার এতখানি জুলুম সহ্য হয়, কিন্তু মনিবের শ্যালকের এতটা তর্জ্জন গর্জ্জন সে নিতান্তই বাহুল্য বলিয়া মনে করে। এতদিনে সে মামাবাবুর অপমানের কিঞ্চিৎ প্রতিশোধ লইবার অবসর পাইল, বলিল "আপনি তো চার কর্ত্তে বল্লেন ; এদিকে ছোট বাবু মাছ মারতে বারণ করে গিয়াছেন। আপনার কথা শুনে কি তাঁর কাছে জুতো খাব ?" মামাবাবু ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "জুতো মারে কে ? আমি বল্‌চি তুই চার করগে যা।" নীলু উত্তর করিল, "হ্যাঁ, আপনি তখন যত আটকাবেন তা জানি ; হুঁকো হাতে সুড় সুড় করে পলাবার পথ পাবেন না। চার করা আমার কর্ম্ম নয়।"—শ্যামসুন্দর অবিলম্বে বিদ্রোহভাবাপন্ন নীলুর দুঃসাহসের কথা ভগিনীর কর্ণগোচর করিল। ভগিনী বলিল "কেন তুমি তার গালে দুটো চড় বসিয়ে দিলে না।"—কিন্তু নীলু তখন সে পাড়া ছাড়িয়া পলাইয়াছে। অগত্যা শ্যামসুন্দর নিজেই চার ফেলিয়া মাছ ধরিতে গেল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বাহ্নে কমলাকান্ত কাছারী হইতে ফিরিবার সময় দেখিতে পাইলেন, শ্যামসুন্দর তখনো হুইল ফেলিয়া হুঁকা হাতে পুকুরের পাড়ে বসিয়া রহিয়াছে ; একটা প্রকাণ্ড রুইমাছ ধরা হইয়াছে, তথাপি আশা মেটে নাই। আরো একটা ধরিতে পারিলে মনের ক্ষোভ মেটে। সমস্ত দিন কতকগুলো চাষার সঙ্গে বকাবকি করিয়া কমলাকান্তের মেজাজটা বড় ভাল ছিলনা, শ্যামসুন্দর আজও মাছ ধরিতেছে দেখিয়া তিনি অধিকতর বিরক্ত হইয়া উঠিলেন ; উচ্ছ্বসিত ক্রোধ দমন করিয়া কিঞ্চিৎ শ্লেষের সহিত বলিলেন,

"কিহে, হাতে কাজকর্ম্ম না থাক্‌লে পুকুরের মাছগুলো কি এমনি ভাবেই নিকেশ কর্ত্তে হয় ? কুটুমবাড়ী এসেছ, খাওদাও থাকো ; যাতে গৃহস্থের ক্ষতি হয়, এমন কাজে হাত দিবার দরকার কি ?" শ্যামসুন্দরের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। বলিল, "তুমি আমাকে বলবার কে হে ? আমি তোমার খাই না পরি ? আমার ভগিনীর অন্নে মানুষ হ'য়ে তুমি আমাকে এত অপমানের কথা বল ? আমি তোমার কি তোয়াক্কা রাখি ?" কমলাকান্ত বলিলেন, "তুমি অতি নির্ব্বোধ, তাই আমার কথায় অপমান বোধ করিতেছ। তুমি জান না, নিজের মান নিজের কাছে।" অশ্রুরুদ্ধনেত্রে শ্যামসুন্দর ভগিনীর নিকট এই সংবাদ জ্ঞাপন করিল। তখন ভ্রাতা ভগিনী উভয়ে মিলিয়া প্রবল অশ্রুবর্ষণ ও প্রচুর আক্ষেপ করিতে লাগিল। ভগিনী রুদ্ধমানকণ্ঠে সুর করিয়া বলে, "আমার এখানে কোন কথাই খাটে না, তা জেনে শুনেও কেন অপমান হতে এসেছ গো ; তোমার অপমান যে আমি আর সহ্য করতে পারিনে গো।" ভাই অশ্রুগদগদভাবে বলে, "আমি কি ভাতের কাঙ্গাল যে দুঃখে প'ড়ে এখানে এসেছি ? তোমাদের দেখ্‌তে এসে এত লাঞ্ছনা হবে, জান্‌লে কখন এখানে মান খোয়াতে আস্‌তাম না।" ভ্রাতাভগিনীতে এইরূপে পরিতাপ করিতেছে, এমন সময় বৃদ্ধ চক্রধর সেখানে আসিয়া ভয়স্বরে বলিল, "কেন বাবা শ্যামসুন্দর, আমি যেন পেটের দায়ে মেয়ের দুয়োরে পড়ে আছি, তুমি কোন দুঃখে এখানে আস ?"

সন্ধ্যার পর কমলাকান্ত ইন্দু বাবুকে আদ্যোপান্ত সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। অবশেষে বলিলেন, "আমার কথায় শ্যামসুন্দর, আপনার শ্বশুর এবং বৌঠাকুরাণী অত্যন্ত অপমান বোধ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের মনে আঘাত দেওয়ার দুরভিসন্ধি আমার কিছুমাত্র ছিল না। পুষ্কর্ণীর মাছ থাকাতে আমার কিছুমাত্র স্বার্থ নাই, আপনার সুনাম এবং স্বার্থের দিকে আমার দৃষ্টি না থাকিলে আমি এবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিতাম। বৌঠাকুরাণীর বিশ্বাস আমি তাঁহারই সর্ব্বনাশ করিতেছি। আপনি পিতৃতুল্য, চিরকাল আমাকে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু আমার আশঙ্কা হইতেছে, আমি এখানে থাকিলে ক্রমে আপনাদের মানসিক শান্তি বিনষ্ট হইবে। মানুষের মনকে বিশ্বাস করিতে নাই। কালে আমাদের পারিবারিক প্রীতিবন্ধনও শিথিল হইতে পারে। সে দুর্দ্দিন আসিবার পূর্ব্বেই আমি এখান হইতে বিদায় হইতে ইচ্ছা করি। বিশেষ চেষ্টা করিলে অন্যত্র একটা চাকরী যোটান তেমন কঠিন হইবে না।" শুনিয়া ইন্দু বাবুর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "ভাই, সামান্য কথায় তোমার এরূপ বিচলিত হওয়া উচিত নয়। পৃথিবীতে মানুষকে অনেক সহ্য করিতে হয়। তোমার কথা শুনিয়া আমি মনে বড় বেদনা পাইলাম। যাহাতে ভবিষ্যতে আর কোন গোল না হয়, আমি তাহার উপায় করিব।"

রাত্রে আহারাদির পর ইন্দু বাবু শ্যামসুন্দরকে বলিলেন, "তুমি এখানে আসার পর হইতে আমাদের পরিবারের মধ্যে খানিকটে অশান্তি প্রবেশ করিয়াছে ; তুমি কুটুম্ব এখানে আসিয়াছ, যত দিন ইচ্ছা থাকিতে পার, কিন্তু যাহাতে আমার সুনাম নষ্ট হয়, কি আমাদের সংসারটা ভাঙ্গিয়া যায়, এমন কোন কাজ যদি তোমা হইতে হয়, তাহা হইলে বড়ই দুঃখের কথা বলিতে হইবে। তোমাকে বেশী কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না।" দুঃখে ক্ষোভে অপমানে শ্যামসুন্দর তখনই বাড়ী যাইতে উদ্যত হইল, কিন্তু, কেন বলা যায় না, বোধ হয়, গৃহে অশনবসনের ব্যবস্থার কথা মনে করিয়া সহজে রাগ দেখাইতে পারিল না ; দুই একবার নৌকার খোঁজ হইল, নদীতীরে দুই চারিবার যাতায়াত করিল, তাহার পর সে ইন্দু বাবুর বাসা ছাড়িয়া এক প্রতিবেশীর বাড়ী গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল।

শ্যামসুন্দর রাগ করিয়া পরের বাড়ী আশ্রয় লইয়াছে শুনিয়া ইন্দু বাবু তাহাকে অনুনয় বিনয় করিয়া আবার বাসায় ডাকিয়া আনিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রতি তাহার আক্রোশ বিদূরিত হইল না। সে ইন্দু বাবুর পরিবারে প্রত্যহই একটা না একটা নূতন উপদ্রব সৃষ্টি করিয়া আপনার প্রভাব ও অধিকারের পরিচয় দিতে লাগিল। বাড়ী হইতে ক্রমাগত পত্র আসিতেছে, খরচপত্রের বড় অভাব হইয়াছে, আর দিনপাত হয় না, কিন্তু তাহাতে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই ; পুত্রের অতি কঠিন পীড়ার সংবাদেও সে বিচলিত হইল না, বুঝিল বাড়ার লোক কৌশল করিয়া তাহাকে গৃহপিঞ্জরে আবদ্ধ করিতে চাহে। অবশেষে যখন গ্রামস্থ দুই একজন আত্মীয় পত্র লিখিল, যে চাটুর্য্যেরা ডিক্রীজারী করিয়া তাহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিয়া লইয়া গিয়াছে, শীঘ্র কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া না আনিলে আর সেগুলি উদ্ধারের সম্ভাবনা

নাই, তখন শ্যামসুন্দরকে অগত্যা রতনপুর ত্যাগ করিতে হইল। রাজমোহিনী সাহায্যস্বরূপ তাহাকে এক শত টাকা দান করিল। শীঘ্র পরিশোধ করিব বলিয়া তাহার নিকট হইতে সে আরো এক শত টাকা কর্জ্জ লইল। তাহার পর ইন্দু বাবুকে বলিল, আর চাকরী না করিলে তাহার চলিবে না; অতএব তিনি যদি কলিকাতার দুই একজন সম্ভ্রান্ত বন্ধুবান্ধবের নামে তাহাকে দুই একখানি সুপারিশ পত্র দেন, তাহা হইলে তাহার মহা উপকার হয়। তাহার উপকার করিতে ইন্দু বাবুর আপত্তি ছিল না, তিনি তিন চারি খানি সুপারিশ পত্র ও কিছু পাথেয় দিয়া শ্যামসুন্দরকে বিদায় দান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্যামসুন্দর গৃহে আসিয়া কতকগুলি ক্রোকী জিনিষ খালাস করিয়া লইল। পাওনাদারগণকে বলিল, "কলিকাতায় আমার চাকরী হইয়াছে, শীঘ্রই সেখানে যাইতে হইবে। একার ফিরিয়া আসিয়াই তোমাদের সকল দেনা শোধ করিব। আর দুটো মাস চুপ করিয়া থাক।"—কেহ তাহার কথায় বিশ্বাস করিল, কেহ করিল না; কিন্তু এক সপ্তাহ পরেই সে কলিকাতা চলিয়া গেল। কলিকাতার পদস্থ ভদ্রলোকের নামে যে কয়খানি সুপারিশ পত্র লইয়াছিল, তাহা হাতে করিয়া সে উমেদারীতে বাহির হইল। কিন্তু সুপারিশ পত্র দেওয়া যত সহজ, চাকরী দেওয়া তত সহজ নহে। ইন্দু বাবুর বন্ধুগণের মধ্যে কেহ বলিলেন, "তুমি কিছুদিন আগে আসিলে সুবিধা হইতে পারিত, এখনত কিছু উপস্থিত দেখিতেছি না।"—কেহ বলিলেন, "মাসখানেক পরে আসিও, তখন দেখা যাইবে।" একজন বলিলেন, "ইন্দু বাবু ইচ্ছা করিলেইত রতনপুর ষ্টেটে তোমার একটা কাজ করিয়া দিতে পারিতেন। ইন্দু বাবু আবার এজন্য আমাকে লিখিয়াছেন! এখন যে কিছু করিতে পারিব, এমন আশা নাই।"

শ্যামসুন্দর যখন দেখিল, আপাততঃ কাজকর্ম্মের কোন সুবিধা নাই, তখন সে তাহার সেই সকল নবপরিচিত মুরুব্বির নিকট উপস্থিত হইয়া একদিন বলিল, "আমি কলিকাতায় নূতন আসিয়াছি, এক জুয়াচোরের হাতে পড়িয়া সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া নিতান্ত নিরুপায় হইয়াছি, আপনি ইন্দু বাবুর বন্ধু, আমার পরিচিত লোক এ সহরে আর কেহ নাই, আমাকে কিছু টাকা কর্জ্জ দিয়া উদ্ধার করুন।" এই অভিনব উপায়ে, ধূর্ত্ত সকলের নিকট হইতে দশ পাঁচ টাকা কর্জ্জ লইয়া কলিকাতায় বসিয়া সার্কাস ও থিয়েটার দেখিতে লাগিল।

সহসা একদিন সে সংবাদ পাইল, কৃষ্ণনগরে তাহার শ্যালীপতি তারাপ্রসন্ন বিশ্বাস অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগে মারা গিয়াছে। তারাপ্রসন্নের অনেকগুলি নগদ টাকা আছে বলিয়া তাহার শুনা ছিল, এই অবসরে সে তাহা হস্তগত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিল না। দারজিলিং মেলে চাপিয়া সেই দিনই রাত্রে কৃষ্ণনগরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

কৃষ্ণনগরে প্রায় তিন মাস বাস করিয়া মিষ্টবাক্যে শ্যালিকার মন ভিজাইয়া কলেকৌশলে যে কিছু টাকা হস্তগত হওয়া সম্ভব, তাহা বাহির করিয়া আর কোথায় কিরূপে অর্থ সংগ্রহ হইতে পারে তাহাই ভাবিতেছে, এমন সময় সে গ্রামস্থ একজন লোকের মুখে সংবাদ পাইল, তাহার ভগিনীপতি ইন্দুকান্ত বাবু রতনপুরে সাংঘাতিক পীড়িত, জীবনের আশা অতি অল্প।

শরতের রৌদ্রময় স্থির মধ্যাহ্নে আকাশের অতি ঊর্দ্ধদেশে দিগন্তের ক্রোড়ে সংলগ্ন থাকিয়া শকুনি যেমন ধরাতলের অতি দূরতর প্রদেশে শিকারের আশায় চাহিতে থাকে এবং সহসা কোথাও খাদ্য দ্রব্য দেখিতে পাইলে তীক্ষ্ণ লক্ষ্যে দ্রুতপক্ষে সেই দিকে ধাবিত হয়, শ্যামসুন্দরও সেইরূপ ত্বরিত গতিতে সেই দিনই রতনপুরে যাত্রা করিল। জিনিষপত্র ভাল করিয়া গুছাইয়া লইবারও অবসর হইল না।

শ্যামসুন্দর যেদিন রতনপুরে আসিয়া পৌছিল, তাহার দুই দিন পূর্ব্বে ইন্দু বাবু কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্যামসুন্দর দেখিল, কমলাকান্ত ভ্রাতৃশোকে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন; তাঁহার জ্ঞান লুপ্তপ্রায়, বর্ষার দুর্দ্দমনীয় জলপ্রবাহে জীর্ণ বাঁধের মত তাঁহার স্বাভাবিক ধৈর্য্যবন্ধন শতধা বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে, দেখিয়া শ্যামসুন্দরের চক্ষে পৈশাচিক আনন্দ ফুটিয়া উঠিল। অনন্তর শোকবিদগ্ধা ভগিনীর নিকট উপস্থিত হইয়া আয়াস-বিগলিত অশ্রুর সহিত কিঞ্চিৎ কপট সহানুভূতি প্রকাশ পূর্ব্বক বলিল, "যাহা অদৃষ্টে ছিল, তাহাত হইয়া গিয়াছে, সে জন্য আর শোক করিয়া কি হইবে? এখন লোকজনের কাছে যে কিছু পাওনা আছে, সময় থাকতে তা আদায় করবার চেষ্টা দেখ। কমলাকান্ত যদি টাকাটা কোন কৌশলে আদায় ক'রে লয়, তা হ'লে তোমার হাতে খোলা পড়িবে।"—উদ্বেলিত শোকাবেগ দমন করিয়া রাজমোহিনী বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিল, "আমাকে একেবারে পথে বসিয়ে রেখে গেল গো, ছেলেপিলের জন্যে একটা পয়সা সম্বল রেখে যায়নি, সর্ব্বস্ব ঘুচিয়ে কেবল সকল গুষ্টির পেট ভরিয়েচে, আমার যে দশ টাকা পাওনা আছে, তা দাদা তুমিই আদায়পত্র কর, আর আমার কে আছে, কাকে বিশ্বাস করবো? সুসময়ে সকলেই আপনার হয়, অসময়ে কেউ ফিরেও তাকায় না, তুমি যে মায়ের পেটের ভাই ছিলে, তাই আমার এ বিপদের কথা শুনে দৌড়ে এসে মাথা দিয়ে পড়েছ।"

ইন্দু বাবু পাকা লোক ছিলেন, তিনি বিনা লেখাপড়ায় কাহাকেও এক পয়সা কর্জ্জ দেন নাই। হাতচিঠা, হ্যাণ্ডনোট, খত প্রভৃতিতে প্রায় ছয় সাত শত টাকার কাগজ রাজমোহিনীর হস্তে ছিল, রাজমোহিনী সমস্ত কাগজপত্র ভ্রাতার হস্তে প্রদানপূর্ব্বক তাহার প্রতি টাকা আদায়ের ভারার্পণ করিল; রতনপুরের বাস জন্মের মত উঠিয়া গেল। পুত্রকন্যাগুলিকে লইয়া নিরাভরণা শুভ্রবেশিনী বিধবা ছয় বৎসর পরে ভিখারিণীবেশে বাসস্থান গোবিন্দপুরে ফিরিয়া আসিল।

কমলাকান্তই এখন এই বৃহৎ পরিবারে, একমাত্র আশ্রয়। তিনি একাকী অপেক্ষাকৃত একটা ছোট বাসা ভাড়া করিয়া ভগ্নহৃদয়ে, নিরুৎসাহ চিত্তে প্রভুর কাজ করিতে লাগিলেন, জীবনের সে সাহস, চিত্তের সে প্রফুল্লতা, মনের শান্তি সমস্ত বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, শুধু সর্ব্বদর্শী, সুখদুঃখের প্রতি চির উদাসীন, কঠোর কাল তাঁহার চক্ষের উপর এক খানা বিষাদাচ্ছন্ন কৃষ্ণবর্ণ যবনিকা প্রসারিত করিয়া দিয়াছে; তাহার ভিতর দিয়া তিনি জগতের প্রত্যেক দ্রব্য, জীবনের পরিবর্ত্তন ঘোর মসী চিহ্নে চিত্রিত দেখিতে লাগিলেন। দুই মাস আগেকার সেই পুলক কম্পিত, আলোক প্রদীপ্ত বসুন্ধরা যেন কতদূরে এক অন্ধকার সমাকীর্ণ অলংঘ্য ব্যবধানের অন্তরালে সরিয়া গিয়াছে। তাই সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর তিনি যখন সন্ধ্যাকালে তাঁহার নির্জ্জন কুটীরে প্রত্যাগমন করিতেন, তখন জীবনের প্রতি একটা নিদারুন অনাস্থায় তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত; তিনি আলোকহীন, শব্দহীন, নির্জ্জন গৃহের বারান্দায় একখানি জীর্ণ মাদুরের উপর উপবেশন করিয়া দেখিতেন মশকের দল পরিপূর্ণ ক্ষুধা সঞ্চয় পূর্ব্বক অদূরবর্ত্তী পঙ্কিল জলাশয়ের সন্নিকটে কচুবনের ঊর্দ্ধে ঝঙ্কার আরম্ভ করিয়াছে, গৃহ প্রান্তস্থ সুবৃহৎ নিম্ব গাছের ভিতর দিয়া সন্ধ্যাবায়ু তাহার নিবিড় পত্র রাশিকে কম্পিত করিয়া সন্‌সন্ শব্দে বহিয়া যাইতেছে, এবং ঊর্দ্ধাকাশে নক্ষত্রগুলা নত নেত্রে তিমিরনগ্ন ধরনীর দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে; তাঁহার সুখশান্তিহীন, চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয় এই নিঃসঙ্গ প্রবাসে সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর মত বেদনাপ্লুত সহস্র স্মৃতি বক্ষে ধরিয়া প্রবল দুঃখে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁপিয়া উঠিত; দৈবাৎ অদূরবর্ত্তী সৌধবাতায়নে তাঁহার দৃষ্টি পড়িলে তিনি দেখিতে পাইতেন সেখান হইতে কেরোসিনের উজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইয়া অট্টালিকাপ্রান্তবর্ত্তী পুকুরের জলে বায়ু চঞ্চল হিল্লোলের উপর একখানি জ্যোতি মেখলার সৃষ্টি করিয়াছে; এবং বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া যে গৃহে তিনি জ্যেষ্ঠ সহোদরের সহিত পরম সুখে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সেই গৃহে রতনপুরের নূতন দেওয়ান তারিণী চরণ বাবু বন্ধুবর্গের সহিত মহানন্দে বাদ্য যন্ত্রের সহযোগে সঙ্গীত চর্চ্চা করিতেছেন, সেই গীতোচ্ছ্বাসে নির্দ্দয় অদৃষ্ট দেবতার কঠোর পরিহাস হাস্যের ন্যায় তাঁহার কাণে আসিয়া বাজিত, সমস্ত বিশ্ব নিয়মের দুর্ব্বোধ্যরহস্য তাঁহার নিকট কিছু মাত্র স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইত না, অবশেষে যখন বৃদ্ধা ঝি আসিয়া বলিত, "ছোট বাবু, উনন ধরান হয়েছে"—তখন তিনি ধীরে ধীরে সেখান হইতে উঠিয়া পাক শালায় প্রবেশ করিতেন, কিন্তু তাঁহার অনন্ত দুশ্চিন্তা নিদারুণ দুঃস্বপ্নের মত হৃদয়ের উপর দিবারাত্রি একটা বিরাট লৌহভার চাপাইয়া রাখিত।

কিন্তু শ্যামসুন্দর এখনো তাহার সর্ব্বনাশের চেষ্টায় বিরত হইল না। দুর্ব্বৃত্ত সয়তান আদি মাতা ইভকে শুধু স্বর্গ ভ্রষ্ট করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাহারই অনিষ্টকারিতায় মানবের সহিত মৃত্যুর অবিছিন্ন সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, কমলাকান্তের নিরুপায় পরিবার যাহাতে অনাহারে বিনষ্ট হয়, সেজন্য শ্যামসুন্দর তাঁহার চাকুরীর স্থলেও কুঠারাঘাত করিবার সংকল্প স্থির করিল। সে রাষ্ট্র করিয়াছিল যে, কমলাকান্ত তাহার বিধবা ভগিনী ও তাহার পুত্রকন্যাগুলিকে গৃহ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছে। সে ই এখন বিপন্ন

পরিবারের একমাত্র আশ্রয়। এই হেতুবাদে সে জমীদারের নিকট একটি চাকরী প্রার্থনা করিল। কিন্তু তাহাতে যখন অকৃত কার্য্য হইল, তখন ভগিনীর পাওনা টাকা আদায় করিয়া তাহার ভূতপূর্ব্ব 'এয়ার' বর্গের সংসর্গে নানা কুক্রিয়ায় তাহা উড়াইতে লাগিল।

এ দিকে ভগিনী ক্রমাগত পত্র লিখিতে লাগিল; "দাদা কত টাকা আদায় হইল শীঘ্র পাঠাইয়া দিবে, টাকার অভাবে আমার বড় কষ্ট হইতেছে।" শ্যামসুন্দর দুই পাঁচ খান পত্র পাওয়ার পর উত্তর লিখিল "তোমার দেবর বিপক্ষতাচরণ করিয়া টাকা আদায়ে ব্যাঘাত জন্মাইতেছে, দেনদারেরা টাকা দিতে চাহে না, যাহার নিকট এক শত টাকা পাওনা আছে, এক পয়সা সুদ দেওয়া দূরের কথা, সে পঞ্চাশ টাকার বেশী দিতে চাহে না, টাকাগুলি একেবারে যায় দেখিয়া যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহাই আদায় করিতেছি।"

অনেক পীড়াপীড়ির পর শ্যামসুন্দর ভগিনীর নিকট এক শত টাকা পাঠাইয়া দিল, এবং ছয় মাস কাল রতনপুরে থাকিয়া দেনদারদিগকে কিছু কিছু টাকা রেহাইত দিয়া সমস্ত টাকা উঠাইয়া লইয়া বাড়ী আসিল।

ইন্দুবাবুর বাড়ী হইতে শ্যামসুন্দরের গৃহ অধিক দূরে নহে; দাদা বাড়ী ফিরিয়াছে শুনিয়া রাজমোহিনী আশাসপূর্ণ হৃদয়ে তাহার সহিত সাক্ষাতের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু শ্যামসুন্দর আর সে দিকে অগ্রসর হইল না। রাজমোহিনী কতবার তাহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন কিন্তু শ্যামসুন্দরের কিছুতেই অবসর হয় না, অগত্যা একদিন রাত্রে ভগিনী ভ্রাতার সহিত সাক্ষাতের জন্য পিতৃগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কত কাল পরে!—রাজমোহিনীর সুখ ও সৌভাগ্যের দিনে তিনি পিতৃগৃহে আসিলে সমস্ত পাড়াখানি পৌরবধূগণের আন্দোলনে গুঞ্জিত হইয়া উঠিত, রাজপুত্রবধূর ন্যায় রাজমোহিনীকে কোথায় রাখিবে তাহা তাহারা ভাবিয়া পাইত না, এবং তাঁহার পুত্র কন্যাগণের সামান্য অযত্ন সম্ভাবনায় সকলে সর্ব্বদা আতঙ্কিত থাকিত, আর আজ সেই গৃহে অবজ্ঞাতা, অনাথা, দুঃখিনী অনাহূত ভাবে কতকাল পরে একাকিনী পদক্ষেপ করিতেছেন! শোকে দুঃখে তাঁহার বক্ষস্থল ফাটিয়া চক্ষে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। কম্পমান পদদ্বয়কে বহু কষ্টে স্থির রাখিয়া ভ্রাতার সম্মুখে গিয়া অবনত মস্তকে অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বলিলেন, "দাদা, এতবার ডেকে পাঠাইলাম, একবারও দেখা করবার সময় হ'লো না, দুর্দ্দিনে তুমিও আমাকে পরিত্যাগ কল্লে।"—এই প্রকার অতর্কিত আক্রমণে শ্যামসুন্দর কিছু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল, কিন্তু সে বুদ্ধিমান, দুর্ব্বলতা সারিয়া লইয়া বলিল, এতদিন তোমারই কাজে বিদেশে ঘুরে বেড়ালাম, এখন তুমি একথা বলবেইত।"—রাজমোহিনী বলিলেন, "শুনেছি আমার সমস্ত টাকাই আদায় হয়েছে, কিন্তু একটি শো টাকার বেশীত কিছু পাইনি, আমি যে একেবারে সম্বলহীন, টাকাগুলি না পেলে আমার গতি কি হবে?" শ্যামসুন্দর উপেক্ষাভাবে, কিঞ্চিৎ উদ্ধতভাবে উত্তর করিল, "কে বল্লে তোমার সমস্ত টাকা আদায় হয়েছে? বেশী বেশী সুদের লোভে যত মহাজনছাড়া ব্যাটাদের টাকা কর্জ্জ দিয়েছিলে, এক পয়সা আদায় কর্ত্তে হয়রান হয়ে যেতে হয়। তোমার ছ'শ টাকার মধ্যে একশো পাঠিয়েছি, আর মোট একশো আদায় হয়েছে, আমি ছ'মাস সেখানে বাসা করে থেকে টাকা আদায় করেছি, সেখানে মাসে আমার পনেরো টাকা খরচ হয়েছে, ছ'মাসের দরুণ এই ৯০৲ টাকা বাসা খরচ বাদে আর থাকে দশ টাকা, চাটুর্য্যে বাড়ী আমার নিমন্ত্রণ আছে, এখন আর বিলম্ব করবার সময় নেই, আর এক সময় টাকা ক'টা তোমাকে ফেলে দেব।"—এই কথা বলিয়া শ্যামসুন্দর নিমন্ত্রণ রক্ষায় বাহির হইল। রাজমোহিনী ব্যগ্রভাবে ডাকিলেন, "দাদা, শোন, একটা কথা শুনে যাও, কত টাকার মধ্যে কত টাকা আদায় হ'ল, তার একটা হিসাব আছেত?" শ্যামসুন্দর ফিরিয়াও চাহিল না, শ্যামসুন্দরের শাশুড়ী বক্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "তোমার এ কি রকম বিবেচনা, বাছা, দেখচো ছেলে বেরুচ্ছে এখন, এরকম করে কি পিছনে ডাকে? টাকাকড়ি চাইবারও ত সময় অসময় আছে। টাকা না থাকে কার? আমারত এককালে কত টাকা ছিল, টাকা থাক্‌লেই কি এমনি করে চক্ষু লজ্জা ঘুচোয়? আপন ভাই আহার নিদ্রা ছেড়ে ছ'ছটা মাস হয়রান হয়ে তোমার টাকা আদায় করে দিলে, আর তুমি কিনা তার সব হিসাব কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিতে এসেছ, খুব মেয়ে ত তুমি বাছা?" রাজমোহিনী আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না, বহির্দ্বারের কবাট দুই হস্তে চাপিয়া ধরিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সকাতরে বলিলেন, "ভগবান, সর্ব্বস্ব গেল, আমি দাঁড়াইব কোথা?" তাঁহার অশ্রুপূর্ণ

নতদৃষ্টিতে বোধ হইতেছিল যেন তিনি অবমানিতা, অভিমানিনী জানকীর ন্যায় জননী বসুমতীর নিকট নীরবে প্রার্থনা করিতেছিলেন, "মা তুমি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া তোমার কোলে আমাকে স্থান দেও।"

সেদিন শরৎকালের জ্যোৎস্না বিধৌত মধুর রাত্রি, পূর্ব্বাকাশে উজ্জ্বল চন্দ্র হাসিতেছিল, চারিদিক নিস্তব্ধ, গ্রাম্য কোলাহল নৈশ প্রশান্তির মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, কেবল মানবের সুখ দুঃখে একান্ত উদাসীন একটা বিরহী পাখী অদূরবর্ত্তী তরুপল্লবের অন্তরাল হইতে এই জ্যোৎস্না বিহ্বলা নিশীথিনীর মধ্যে দীর্ঘস্বরে আপনার একক জীবনের অন্তর্ব্যথা চরাচরে ব্যাপ্ত করিতেছিল। এমন সময় পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়স্কা একটি গৃহস্থ রমণী ধীর পদবিক্ষেপে শ্যামসুন্দরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অশ্রুভারাক্রান্ত চক্ষে রাজমোহিনী প্রথমে তাঁহাকে দেখিতে পান নাই, রমণী ধীরে ধীরে রাজমোহিনীর নিকটে আসিয়া বিশীর্ণ মৃণালের ন্যায় তাঁহার শোভাহীন নিরাভরণ প্রকোষ্ঠ দুই হস্তে জড়াইয়া ধরিয়া সকরুণ স্নেহোদ্বেলিত কণ্ঠে বলিলেন, "দিদি আমরা থাকিতে তোমার দুঃখ কি? এতদিন তুমি আমাদিগকে প্রতিপালন করিয়াছ, এখনো তুমি সংসারের কর্ত্রী হইয়া আমাদিগকে সংসারের কাজকর্ম্ম শিখাও, তোমার যে গতি, আমাদেরও সেই গতি; সম্পদের দিনে আমরা কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকি নাই, এই বিপদের দিনেও পরমেশ্বরের নামে বুকের ব্যথা ঢাকিয়া এসো আমরা আরো কাছাকাছি হইয়া থাকি, যেমন করিয়া হোক্ দিন কাটিবেই।"—এই মধুর হৃদয়া পুণ্যবতী সাধ্বী কমলাকান্তের প্রেমময়ী পত্নী—পদ্মমুখী।

[সমাপ্ত]

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

মূক-বধিরের শিক্ষা।

আমাদের দেশে একটা সাধারণ প্রবাদ আছে যে, "ইংরাজ সকলই করিতে পারে, কেবল মরা মানুষ বাঁচাইতে পারে না।" কথাটা শুনিতে কেমন কেমন লাগে বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বলে কত অসম্ভব কথা নিত্যকার বিষয়ে পরিণত হইয়াছে, ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। "খঞ্জ হেঁটে যায়" এই সত্যত প্রায় সর্ব্বদাই ইন্দ্রিয় গোচর হয়। "অন্ধ চক্ষু পায়" এটাও যথার্থ কথাই বটে। ইউরোপ ও আমেরিকাতে বিস্তর অন্ধ-বিদ্যালয় আছে। এই সকল বিদ্যালয়ে অন্ধ বালক বালিকাগণ লিখিতে ও পড়িতে শিখে। ইহাদের শিক্ষার জন্য উঁচু অক্ষরে ছাপান পুস্তক পাওয়া যায়। ঐ উঁচু অক্ষরের উপর অঙ্গুলি চালনা করিয়া, অন্ধেরা আমাদের মত তাড়াতাড়ি পড়িয়া যায় অর্থাৎ আমরা চক্ষুদ্বারা যে কার্য্য করি, স্পর্শজ্ঞানদ্বারাই তাহারা তাহা করিতে সক্ষম হয়। এমন কি দৃষ্টিহীন লোকেরা যাহাতে যথারীতি উচ্চ শিক্ষা পাইতে পারে এমন বন্দোবস্তও অনেক দেশে আছে। কেবল ইহাই নহে, অর্থোপার্জ্জনোপযোগী কাজ শিখিয়া ইহারা স্বাবলম্বী হইয়া থাকে।

"বোবার কথা কয়" এই কথা শুনিলেই সাধারণতঃ আমাদের দেশের লোকের হাসি পায়। কিন্তু বাস্তবিক ইহা হাসিয়া উড়াইবার কথা নয়। এটি একটি বৈজ্ঞানিক সত্য। আমাদের চিরন্তন বিশ্বাস যে বোবার জিহ্বা নাই, অথবা অন্য কোন বাক্ যন্ত্রের অভাব আছে। ইহা বাস্তবিক বিজ্ঞানভিত্তিমূলক নহে; কারণ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে তাহাদের বাগযন্ত্র ঠিক আমাদেরই মত। তবে অবশ্য তাহাদের কথা না বলিবার অন্য কোন কারণ আছে। আমরা কেমন করিয়া কথা কহিতে শিখি? এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে পারিলেই আমাদিগের মূল আলোচ্য বিষয়ের মীমাংসা হইবে; কেননা আমরা যে শক্তি অথবা ইন্দ্রিয় থাকাতে আপনা আপনি কথা বলি, মূক-বধিরের অবশ্যই সেই শক্তি অথবা ইন্দ্রিয়ের অভাব থাকিবে, নতুবা তাহারাও অনায়াসেই কথা কহিত। এটি অতি সহজ বোধ্য যে, মানুষ কেবল শুনিয়াই কথা বলিতে শিখে। যে জন্মাবধি যে ভাষা শুনিয়াছে সে সেই ভাষাতেই কথা বলে। সাহেবের ছেলে ইংরাজি এবং বাঙ্গালীর ছেলে বাঙ্গালা ভাষাতেই কথা কহিয়া থাকে। আজ কাল বাঙ্গালা দেশের দুই চারি জন ইঙ্গরেজভাবাপন্ন লোক, সাহেবের তুল্য পদ পাইবার উদ্দেশ্যে, তাঁহাদের পরিবার বিলাতে রাখিয়া থাকেন। ইহাদের ছেলে মেয়েরা অবশ্য অনায়াসেই ইংরাজী বলিয়া থাকে। যে জন্মাবধি যে ভাষা শুনে সে সেই ভাষাতেই কথা বলে, এই কথা যদি সত্য হয়, তবে ইহাও সত্য যে, যে কোন ভাষাই শুনে না, সে কোন ভাষাতেই কথা বলে

না—অর্থাৎ সে মূক হয়। অতএব দেখা যাইতেছে শ্রবণ শক্তি না থাকিলেই, বাগ্‌যন্ত্রের পূর্ণতা সত্ত্বেও, বোবা হইতে হয়, যে জন্মাবধি কালা, সেই বোবা। শ্রবণশক্তির সহিত বাক্‌শক্তির কিরূপ নিকট সম্বন্ধ তাহা অনেক সময়েই আমরা দেখিতে পাই, যদিও কদাচিৎ বিশেষরূপে লক্ষ্য করি। অনেক লোক গুরুতর ব্যাধির আক্রমণে কালা হইয়া যায়। ইহারা জন্ম কালা না হইলেও, ক্রমে ক্রমে ইহাদের স্বর নিতান্ত কর্কশ ও কথা অস্পষ্ট হইয়া যায়। মূক বাস্তবিক মূক নয়, কেবল কালা। পাশ্চাত্য প্রদেশে, বিশেষতঃ আমেরিকায়, অনেক সময় "মূক-বধির বিদ্যালয়" না বলিয়া, কেবল "বধির বিদ্যালয়" বলা হয়।

আমরা সাধারণতঃ বলিয়া থাকি সকল বোবা মানুষই কালা। ইহা যথার্থ নয়; কারণ আমরা এই মাত্র প্রমাণ করিয়াছি জন্ম কালা হইলেই বোবা হয়, কিন্তু বোবা হইলে কালা হইতেই হইবে এমন নহে।

আমরা দেখিয়াছি মূকের কথা না বলাটা কোন বাগযন্ত্রের অভাবজনিত নহে, কেবল শ্রবণশক্তিহীনতার অবশ্যম্ভাবী ফল। এখন প্রশ্ন এই, কানে না শুনিয়া কিপ্রকারে কথা বলিতে শিক্ষা করা যাইতে পারে? আমরা সংক্ষেপে এই প্রশ্নের মীমাংসা করিব। মানুষের কথা বাগ-যন্ত্র নিষ্কাসিত অর্থবোধক শব্দ মাত্র। পক্ষান্তরে এই শব্দ আঘাত-প্রতিঘাত প্রাপ্ত বায়ু বৈ আর কিছুই নয়। এই বায়ু যেমন আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া মধুর অথবা কর্কশ শব্দরূপে আমাদের প্রীতি বা অপ্রীতি সাধন করে, তেমন উহার কম্পন আমাদের স্পর্শজ্ঞানের বিষয়ী-ভূত হয়। এইরূপ স্পর্শজ্ঞানের সাহায্যে মূক বধিরেরা কথা বলিতে শিখে। শিক্ষক বলিলেন "আম"। ছাত্র শিক্ষকের গলদেশে দক্ষিণ হস্ত স্থাপিত করিয়া, ভিতরে বাতাসের কিরূপ ক্রিয়া হইতেছে অনুভব করিয়া লইল। পরে সে তাহার বাম হস্ত নিজের গলার উপর রাখিয়া, ঐরূপ ক্রিয়ার অনুকরণ করিল—অর্থাৎ সে আম শব্দ কহিতে শিখিল। শিক্ষক শব্দটি বড় অক্ষরে বোর্ডের উপর লিখিলেন। ছাত্র তাহার অনুকরণ করিল—অর্থাৎ সে লিখিতে শিখিল। শিক্ষক তাহাকে একটি প্রকৃত আম অথবা একটি মাটির আম দেখাইলেন—ছাত্রের "আম" শব্দের অর্থবোধ হইল। এইরূপে পদ শিক্ষা হয়। বাক্য

শিখাইবারও ঠিক এই প্রণালী। শিক্ষক বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া একটি ছেলেকে কাছে আসিতে বলিলেন। ছাত্র আদর পাইবার আশায় তাঁহার নিকট গেল। অমনি তিনি তাহাকে যত্ন করিয়া বলিলেন "তুমি আমার কাছে এসেছ।" ছাত্র স্থানে গেল। তিনি আবার বলিলেন "তুমি তোমার জায়গায় গিয়েছ।" এইরূপে বাক্যের পর বাক্য অভ্যাস করিয়া তাহার কথা বলিতে, পড়িতে ও লিখিতে শিখে। আমরাও ঠিক এইরূপেই কথা কহিতে শিখিয়াছি। তবে আমাদের ও তাহাদের কথা বলায় এইমাত্র প্রভেদ যে, শুনিতে পাই বলিয়া, আমরা মনের মধ্যে শব্দ ও তদর্থবোধক জিনিষ এই দুইয়ের সমন্বয় করি, কিন্তু মূক-বধিরেরা শব্দ উচ্চারণে বায়ুর (স্পর্শজ্ঞান দ্বারা অনুভূত) ক্রিয়া ও জিনিষ এই দুইয়ের যোগ করে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ইহারা যেন কথাই বলিতে শিখিল, কিন্তু যখন কানে শুনেনা তখন অন্যের কথা বুঝিবে কেমন করিয়া? তাহাও হইবে।

প্রায় প্রত্যেকটি বর্ণের উচ্চারণেই আমাদের মুখমণ্ডল ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। একখানা দর্পন সম্মুখে

রাখিয়া বর্ণগুলি নিজে নিজে পড়িলেই ঐ আকারের বৈষম্য লক্ষিত হইবে। এই আকারের বিভিন্নতা যাহাতে তাহারা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করে, সেইজন্য শিক্ষককে সাতিশয় যত্ন করিতে হয়। এইরূপে মুখের বাহ্যিক ক্রিয়া দেখিয়াই একটি শিক্ষিত মূক-বধির বুঝিতে পারিবে কি বলা হই-তেছে—অর্থাৎ কানে না শুনিয়াও বক্তার মুখের দিকে তাকাইয়াই সে তাহার সমস্ত কথা বুঝিতে পারিবে। তাই লোকে সাধারণতঃ বলিয়া থাকে, "বোবায় চোখে শোনে।" এখানে আরও একটি প্রশ্ন হইতে পারে। প্রত্যেক ভাষা-তেই এমন অনেকগুলি শব্দ আছে, যাহাদের উচ্চারণে মুখ বিভিন্ন আকার ধারণ করে না, অথবা যাহাদের আকা-রের বৈষম্য এত সামান্য যে চক্ষু তাহা সহজে ধরিতে পারে না, যেমন আতা—আদা—হাতা, আটা—আঠা—আনা—হাঁটা ইত্যাদি। এইরূপ শব্দ তাহারা কিপ্রকারে বুঝিবে? কেবল একটা মাত্র শব্দ বলিলে "আতা" ও "আদা" এই দুইয়ের পার্থক্য মূক-বধিরের নিকট পরিলক্ষিত হইবে না; কিন্তু শুধু ভিন্ন ভিন্ন পদ দ্বারা আমাদের চিন্তার কার্য্য সম্পন্ন হয় না। আমরা বাক্য দ্বারা ভাবিয়া থাকি। বাক্যের মধ্যে থাকিলে একাকৃতির শব্দের অর্থবোধে কোনই কষ্ট হইবে না। যখন বলা যাইবে "আদা ঝাল", তখন নিশ্চয়ই সে "আতা ঝাল" মনে করিবে না। *

মূক-বধির যে কেবল কালা বলিয়াই আপাততঃ বাক্ শক্তিহীন এবং তাহারা যে লিখিতে পড়িতে ও কথা বলিতে শিখিতে পারে, আশা করি এই দুইটি কথা সপ্রমান করিতে কথঞ্চিৎ কৃতকার্য্য হইয়াছি। এই স্থলে আর একটি সাধা-রণ আপত্তি খণ্ডন করিতে ইচ্ছা করি। অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, কানে না শুনিয়া ভাষাজ্ঞান কেমন করিয়া হইতে পারে। প্রশ্নটি শুনিলেই মনে হয় প্রশ্নকর্ত্তা শব্দ ও তদর্থবোধক জিনিষের মধ্যে এক প্রাকৃতিক অবি-চ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু একটু ভাবিলেই দেখা যাইবে যে এটি একটি ভ্রমবিশ্বাস। ভাষা যদি মনুষ্যকৃত হয়, তবে অবশ্যই পদ ও তদর্থবোধক জিনিষ এই দুইএর সম্বন্ধও মনুষ্যকৃত। আমরা যাহাকে "আম" বলি সাহেবেরা তাহাকেই মেঙ্গো (Mango) বলে। শব্দ ও বস্তুর সম্বন্ধ যদি অবিচ্ছেদ্য না হইল, তবে কানে না শুনিয়া ভাষা শিক্ষা করা যাইবে না কেন? আমি এমন লোক দেখিয়াছি, যিনি নিজে নিজে পড়িয়া জর্ম্মণ ভাষায় অধিকার লাভ করিয়াছেন কিন্তু ঐ ভাষা উচ্চারণ করিয়া পড়িতে পারেন না। পক্ষান্তরে ভাষা বুঝিবার ক্ষমতা মস্তিষ্কের উপর নির্ভর করে। মূক-বধিরের মস্তিষ্ক ও তাহার ক্রিয়া ঠিক আমাদের মস্তিষ্কেরই মত, কেবল শিক্ষার অভাবে তাহাদের বুদ্ধির বিকাশ হইতে পারে না।

আমরা এই মাত্র দেখিলাম যে, উচ্চারণ করিতে না জানিলেও ভাষা শিক্ষা করা যায়। এমনও বিস্তর মূক-বধির আছে যাহারা কথা বলিতে পারে না, কিন্তু ভাষায় জ্ঞান লাভ করিয়াছে। শূন্যে অঙ্গুলি দ্বারা অক্ষর ((Finger alphabet) কাটিয়া ইহারা সাধারণতঃ একে অন্যের সহিত আলাপ করিয়া থাকে। কেহ কেহ ইঙ্গিতেও কথা বলে। মূক-বধিরের খ্যাতনামা শিক্ষক ডি, লা পে এক সুন্দর সাঙ্কেতিক ভাষা (Sign language) প্রস্তুত করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন।

অনায়াসে কথা বলে এবং মুখ দেখিয়া কথা বুঝিতে পারে, এমন বিস্তর মূক-বধিরের সহিত আলাপ করিয়াছি।

---

* We do not think in words but in sentences, ইংরাজিতেও ঠিক এইরূপ। "It rains" বলিলে বুঝিতে কষ্ট হয় না, কিন্তু কেবল "rain" বলিলে কেহ "rein" কেহ বা "reign" মনে করিতে পারেন।

এই স্থলে একটি প্রকৃত ঘটনার উল্লেখ করিলে কথাটা বেশ সরল হইতে পারে:—

আমেরিকার কোন একটি মূক-বধির বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে যাইয়া, টেলিফোনের আবিষ্কর্ত্তা ডাঃ বেল সাহেব এই কয়েকটি শব্দের শ্রুতলিপি লিখিতে দিয়াছিলেন, Hit—rate—ferry—aren't—hat—four—that—reason—high—knit—donned—co. "তিনি শ্লেটগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন প্রায় সকলেই লিখিয়াছে—It rained very hard, and for that reason I did not go ঐ শ্রেণীর একটি ছাত্রের মাতা তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাহার পুত্র বেল সাহেবের উচ্চারিত শব্দ কয়টি ঠিক করিয়া লিখিতে পারিল না দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন এবং নিজে খুব ধীরে ধীরে শব্দ-গুলি পুনঃ পুনঃ বলিলেন; কিন্তু বালক পূর্ব্ববৎই লিখিল। তিনি যতবার বলিলেন, "hit", ছেলে ততবারই বলিল "it"। বৃদ্ধা মাতা নিতান্ত ক্রোধান্ধ হইয়া বলিলেন "আমার ছেলেকে আর স্কুলে পাঠাইব না।" তখন বেল সাহেব তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ছেলেদের লেখা ঠিক হইয়াছে, কারণ "hit ও "it" এই শব্দদ্বয়ের পার্থক্য কর্ণগোচর হয় বটে কিন্তু চক্ষুগোচর হয় না। Hit বলিতে মুখের যে আকৃতি "it" বলিতেও ঠিক সেইরূপ। তবে তাহাদের "hit—rate—ferry—aren" ইত্যাদি না লিখিয়া "it rained very hard" ইত্যাদি লিখিবার কারণ এই যে, পূর্ব্বেরগুলি কেবল অসামঞ্জস্য পদের সমষ্টি মাত্র, কিন্তু পরেরটি অর্থবোধক যুক্তিপূর্ণ বাক্য।

বধিরদিগের শিক্ষার জন্য পাশ্চাত্যদেশে বিস্তর স্কুল আছে। এখানে কয়েকটি প্রধান প্রধান দেশের মূক-বধির বিদ্যালয়ের তালিকা সন্নিবেশিত হইল :—

দেশের নাম।	স্কুলের সংখ্যা।	ছাত্র সংখ্যা।	শিক্ষকের সংখ্যা।
ফ্রান্স	৭০	৩,৮৪৮	৫১৫
জর্ম্মণি	৯৭	৬,৪১৩	৮০৬
* গ্রেট্‌ব্রিটেন ও আয়র্লণ্ড	৬৩	৩,৬২৫	৩৩৬
ইটালী	৫১	২,১৩৮	২৪২
† ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্	৯৬	৯,৩১২	৯৮৮

এই সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। ইউনাইটেড্‌ষ্টেটের রাজধানী ওয়াসিংটন্ সহরে একটা সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আছে। উহার নাম গেল্‌ডেট্ কলেজ। বর্ত্তমান সময়ে ওখানে এক শত যুবক যুবতী অধ্যয়ন করিতেছে। তথায় মূক-বধিরেরা বি,এ, এম এ, উপাধি পাইয়া থাকে। ঐ কলেজের উপাধি-ধারী লোকদিগের মধ্যে অনেকে খুব পদস্থ হইয়াছেন। কেহ কেহ ব্যবসা করিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন। একজন সুপ্রিম কোর্টে ((Supreme Court) আইনের ব্যবসা করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে মাত্র দুইটি মূক-বধির বিদ্যালয় আছে। ১৮৮৪ সনে বিসপ্ মিউরিণ্ বোম্বাই সহরে একটি স্কুল স্থাপন করেন। সেখানে এখন কুড়িজন ছাত্র আছে। ঐ স্কুলের ভার খৃষ্টানদের হস্তে ন্যস্ত থাকিলেও সকল জাতির ও সকল শ্রেণীর ছেলেই গ্রহণ করা হয়।

* কেবল লণ্ডন মহানগরীতেই ২০টীর অধিক স্কুল আছে।

† ফিলাডেল্‌ফিয়া সহরে যে এক স্কুল আছে, তাহার ছাত্র সংখ্যা ৫০০ শতেরও অধিক।

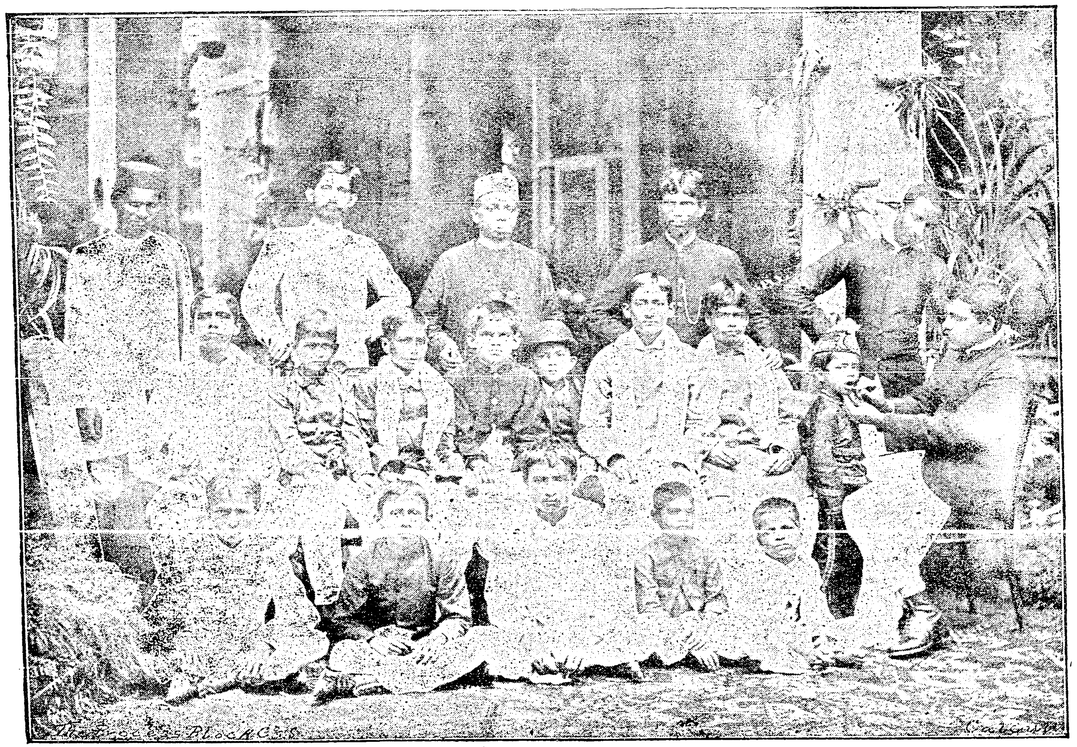

কলিকাতা মূক বধির বিদ্যালয়।

১৮৯৩ সনের মে মাসে, দুইটী মাত্র বালক নিয়া, কলিকাতা-মূক-বধির বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। অল্প সময় মধ্যেই এই স্কুলের ছাত্র সংখ্যা একুশটি হইয়াছে—ইহাদের মধ্যে তিনটি বালিকা। ইহারা সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে লিখিতে, পড়িতে ও কথা বলিতে শিখিয়াছে। অর্থোপার্জ্জনোপযোগী শিল্পবিদ্যাও এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়। অল্প সময় মধ্যেই কয়েকটি ছাত্র সুন্দর ছবি আঁকিতে ও এন্‌গ্রেভিং করিতে শিখিয়াছে।

মূক-বধিরের সংখ্যা নিতান্ত অল্প মনে করিয়া, ইহাদের জন্য ভিন্ন স্কুল চলিতে পারে কি না এই বিষয়ে কেহ কেহ সন্দেহ করিয়াছেন। সঙ্খ্যায় ইহারা যত অল্পই হউক না কেন, পৃথকরূপে না হইলে মূক-বধিরের শিক্ষা পাওয়া অসম্ভব; কারণ সাধারণ ছেলেদিগের আর ইহাদের শিক্ষা-প্রণালী পৃথিবীর দুই মেরুর ন্যায় বিপরীত দিকে অবস্থিত। পক্ষান্তরে গত সেন্‌সাস্ রিপোর্ট দেখিলে ইহাদিগের সঙ্খ্যা সম্বন্ধীয় ভ্রম অপনীত হইবে। তথায় দেখা যায় সমগ্র ভারতবর্ষে প্রায় দুই লক্ষ মূক-বধির আছে!! কেবল বঙ্গদেশেই ইহাদের সঙ্খ্যা সত্তর হাজারেরও অধিক!! এখন বুঝিয়া লউন উহাদের জন্য কতগুলি স্কুল চলিতে পারে।

আসুর বিবাহ।

আসুর বিবাহের অর্থ, বিবাহার্থে কন্যাক্রয়। এই বিবাহ-পদ্ধতির সহিত আমরা অপরিচিত নহি। বংশজদিগের কন্যাবিক্রয়ের কথা সকলেই অবগত আছেন। আজ কাল ইহার প্রাদুর্ভাব অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে, এবং দিন দিন হ্রাস হইতেছে বটে, কিন্তু আজিও একেবারে লোপ হয় নাই। ভারতবর্ষীয় প্রাচীন আর্য্যদিগের মধ্যেও এই প্রণালীর বিবাহ এককালে প্রচলিত ছিল। মানবধর্ম্মশাস্ত্রে যে অষ্ট প্রকার বিবাহের উল্লেখ আছে, আসুর বিবাহ তাহার অন্যতম।

জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্ত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ।
কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরো ধর্ম্ম উচ্যতে॥

মনুসংহিতা।

ইহার অর্থ—কন্যার পিত্রাদিকে এবং কন্যাকে ধন দিয়া স্বেচ্ছাচার মতে যে কন্যাগ্রহণ, তাহাকে আসুর বিবাহ বলে।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

এই প্রকার বিবাহ অধর্ম্মজনক ও সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রবিধান দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু এই নিষেধই ইহার প্রাগস্তিত্বের প্রমাণ।

শুধু ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতি বলিয়া নহে, পৃথিবীর সকল দেশে, সকল জাতির মধ্যে এই প্রণালীর বিবাহের অতি বিস্তৃত ভাবে প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। যে সকল সভ্য জাতির মধ্যে ইহা এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেও যে ইহা এক কালে প্রচলিত ছিল, তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। অনেক সভ্য জাতির আচার ব্যবহারে ও বৈবাহিক অনুষ্ঠানে ইহার পূর্ব্বাস্তিত্বের নিদর্শন অদ্যাবধি দেদীপ্যমান। অসভ্য জাতির ত কথাই নাই। তাহাদের মধ্যে, দুই চারিটি জাতি ব্যতীত আর সকলেই এই বিবাহ-পদ্ধতির অনুবর্ত্তন করে।

আরিস্ততলের গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, প্রাচীন গ্রীকদিগের মধ্যে আসুর বিবাহ প্রচলিত ছিল। এমন কি, হোমরের সময়ে প্রচলিত কুমারী কন্যাবাচক একটি গ্রীক শব্দের অর্থ—যে আপন পাণি প্রার্থীর নিকট হইতে পিতা মাতার জন্য বলিবর্দ্দ-উপহার আনয়ন করে। হেরোদোতস্ বলেন যে, থ্রেসীয়েরা বিবাহ-ব্যাপারে আসুর প্রণালীরই অনুবর্ত্তন করিত। প্রাচীন রোমেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন স্কান্দিনেভিয়ায় কন্যার পিতা জামা-

তার নিকট অর্থ বা অন্যরূপ মূল্য লইয়া কন্যা সম্প্রদান করিত। তাহারা এমন পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিত যে, তাহাদের দেবতারাও কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। জর্ম্মনেরা পূর্ব্বে কন্যাবিক্রয় করিত; মধ্য যুগের শেষ পর্য্যন্ত 'পত্নীক্রয়' কথাটা তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। বিবাহ কালে ক্রীত হইত বলিয়া তাহারা শ্বশুর কুলের সম্পত্তি স্বরূপ পরিগণিত হইত। সেই জন্য তাহাদের মধ্যে বিধবার বিবাহ শ্বশুর শাশুড়ীর অনুমতি সাপেক্ষ ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্য্যন্ত ইংরেজদিগের বৈবাহিক আচারে আসুর বিবাহের নিদর্শন বিদ্যমান ছিল। কাল্‌দিয়া, বাবিলন্, আসিরিয়া, আরব, সর্ব্বত্রই এই প্রকার বিবাহের প্রচলন দেখা যায়। চীনে ও জাপানে কন্যার মূল্য বলিয়া কিছু গৃহীত হয় না বটে, কিন্তু উপহার দিবার যে অবশ্যপ্রতিপাল্য রীতি প্রচলিত আছে, তাহা পূর্ব্ব প্রচলিত আসুর বিবাহেরই রূপান্তর বা লোপাবশেষ। সেমিতিক জাতির সকল শাখাতেই কন্যাবিক্রয়ের নিদর্শন জাজ্জ্বল্যমান; পূর্ব্বে যাহা কন্যার মূল্য স্বরূপ প্রদত্ত হইত, এখন তাহাই 'মহর' নামে অভিহিত। মুসলমানদিগের দেশনিচয়ে বিবাহ অনুষ্ঠানে এবং প্রকৃত ক্রয় বিক্রয়ে প্রভেদ অতি অল্প। আর দৃষ্টান্ত বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন।

ইতিহাস ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠে যত দূর অবগত হওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায় যে, কন্যার জন্য মূল্য প্রদানের ত্রিবিধ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল এবং আছে। প্রথম, অর্থ বা মূল্যবান দ্রব্যাদি প্রদান। যে জাতির যাহা থাকে, তাহারা তাহাই দেয়। স্থলভেদে, অশ্ব, গো, ছাগ, কুক্কুট, ক্রীত দাস, হরিণ, মেষ, বৃষ, মৎস্য, ফল, বন্দুক তিমি মৎস্যের দন্ত, এবং আরও অনেক জিনিষ কন্যার মূল্য স্বরূপ প্রদত্ত ও গৃহীত হইয়া থাকে। অবস্থানুসারে যে মূল্যের তারতম্য হইবে, ইহা সহজেই অনুমেয়। ডামরা জাতি এত দরিদ্র যে, একটি মাত্র গো কন্যার যথেষ্ট মূল্য বলিয়া বিবেচিত হয়। ভ্রমণকারী উইলসন্ সাহেব লিখিয়াছেন যে, উগাণ্ডা দেশে কেহ কেহ একটি কোট্ বা এক জোড়া জুতার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে কন্যা দিতে চাহিয়াছিল। পক্ষান্তরে, ভ্যানকুবর দ্বীপে এবং ইংরেজাধিকৃত কলম্বিয়ায়, তিন শত হইতে ছয় শত পর্য্যন্ত মূল্য দিয়া কন্যাক্রয় করিতে হয়। বলা বাহুল্য যে, কুরূপার অপেক্ষা সুরূপার, দুর্ব্বলার অপেক্ষা সবলার, বিধবার অপেক্ষা কুমারীর মূল্য অধিক হইয়া থাকে।

মূল্য যে সর্ব্বত্রই হাতের উপর দিতে হয়, এরূপ নহে। কোন কোন স্থানে ধারেও বিবাহ হয়; তবে, মূল্য যত দিন সমস্ত পরিশোধ না হয়, তত দিন কন্যা ও তাহার গর্ভজাত সন্তানগুলি পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া স্বামীগৃহে যাইতে পায় না। মধ্য আফ্রিকার উনিয়োরো প্রদেশের সম্বন্ধে এমিন্ পাশা লিখিয়াছেন যে, যে সকল দরিদ্র ব্যক্তি মূল্যের জিনিষ হাতের উপর দিতে পারে না, তাহারা কিস্তিবন্দি করিয়া বিবাহ করে; কিন্তু সম্পূর্ণ মূল্য যত দিন পরিশোধ না হয়, তত দিন কন্যার গর্ভে যে সকল সন্তান জন্মে, তাহারা কন্যার পিতার সম্পত্তি থাকে। তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে প্রত্যেকের জন্য একটি করিয়া গো দিতে হয়।

মূল্য প্রদানের দ্বিতীয় পদ্ধতি—শারীরিক পরিশ্রম আমেরিকা, আফ্রিকা, এসিয়া এবং ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের অসভ্য অধিবাসীদিগের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে। বিবাহার্থী পুরুষ, তাহার বাঞ্ছিত কন্যার পিতৃগৃহে গিয়া ভৃত্যবৎ বাস ও পরিচর্য্যা করে, এবং এই খাটনির দ্বারা মূল্য শোধ হইলে, প্রভুকন্যার পাণি গ্রহণ করিতে পায়। ইহা যে কেবল অসভ্যদিগেরই নিয়ম, এরূপ নহে। খৃষ্টিয়ানদিগের ধর্ম্ম গ্রন্থ বাইবেল হইতে অবগত হওয়া যায় যে, জেকব চতুর্দ্দশ বর্ষ-ব্যাপী দাসত্ব করিয়া লিয়া এবং রাচেল্‌কে পাইয়াছিল। কোথাও এরূপ নিয়মও আছে যে, বিবাহার্থী বর, কন্যার পিতৃ গৃহের নিকটে ঘর বাঁধে, এবং বাস করে। তার পর পরিশ্রমের দ্বারা অবধারিত মূল্য শোধ হইলে প্রভু কন্যাকে লইয়া ঘরে যায়। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহারা অর্থ বা দ্রব্য প্রদানে অসমর্থ, তাহারাই শারিরীক পরিশ্রমের দ্বারা মূল্য শোধ করে; কিন্তু এমনও দেশ আছে, যেখানে অর্থ দিয়াও শারিরীক পরিশ্রম হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। কোন কোন স্থানে এমনও পদ্ধতি আছে যে, বিবাহার্থীকে চিরকালের জন্য শ্বশুর গৃহে বা তাহার নিকটে বাস করিতে হয়।

তৃতীয়—পরিবর্ত্ত। আসুর বিবাহের আর একটা পদ্ধতি এই যে, স্বগোষ্ঠীর কোন কন্যাকে অপরকে দিয়া, তাহাদের কন্যাকে নিজে গ্রহণ করিতে পারা যায়। বহু দূরের কথা বলিবার প্রয়োজন নাই; আমাদের এই ভারতমহাসাগরের সুমাত্রা দ্বীপে এই নিয়ম প্রচলিত আছে যে, নিজের ভগিনী বা কন্যা অপরকে দিয়া তাহার আত্মীয়া কোন কন্যাকে গ্রহণ করিতে হয়। কর্ সাহেব বলেন যে অষ্ট্রেলিয়াতেও এই নিয়ম প্রচলিত আছে।

বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ্ হার্বার্ট স্পেন্সার বলেন যে, আসুর বিবাহ সম্বন্ধে, অর্থ বা দ্রব্যাদি দ্বারা কন্যালাভ অপেক্ষা শারিরীক পরিশ্রমের দ্বারা কন্যালাভ একটু উন্নত সভ্যতার পরিচায়ক। তাঁহার যুক্তি এই যে, সমাজমধ্যে যখন শ্রমসাধ্য ব্যাপারের প্রয়োজন হয়, তখন সেই সমাজ যে প্রাথমিক অবস্থা হইতে, কতকটা উন্নত হইয়াছে ইহা সহজেই অনুমেয়। যে সময়ে মানুষ কেবল মাছ ধরিয়া এবং পশু শিকার করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে, সে সময়ে শারিরীক পরিশ্রমের কোন মূল্য নাই, ইহাই হার্বার্ট স্পেন্সারের মত। হার্বার্ট স্পেন্সারের মত মহাপণ্ডিত ও মহা সমাজ তত্ত্বজ্ঞের সহিত মতভেদ হইলে, তাহার প্রতিবাদও আশঙ্কিত চিত্তে করিতে হয়। সত্য এবং তথ্যের অনুরোধে তাহা আমাদিগকে করিতে হইতেছে। প্রথম আপত্তি এই যে, মাছ ধরাই হউক,—আর পশু শিকারই হউক,—তাহাও ত পরিশ্রম সাধ্য। সুতরাং মানুষ যখন পারিশ্রমিক অবস্থায় উপস্থিত হয়, তৎকালে বা তাহার পূর্ব্বে, এমন কি সকল সময়ই পরিশ্রমের মূল্য আছে। দ্বিতীয়তঃ শ্রমসাধ্য কৃষিকার্য্য বা অন্য কোন প্রণালী উদ্ভাবন হইলে, তজ্জন্য এবং তন্নিবন্ধন অর্থ সঞ্চয়েরও উপায় হয়; সুতরাং পরিশ্রম না করিয়া কেবল অর্থ প্রদানের দ্বারা কন্যা লাভের সুবিধা হয়।

অসভ্য সমাজে স্ত্রী, পুত্র এবং কন্যা সম্পত্তিমাত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এমন কি, পুত্র কন্যার উপর আধিপত্য হইতেই বোধ হয় মানুষের মনে সম্পত্তির ভাবটা আসিয়াছিল। যাহা আমার সম্পত্তি বলিয়া বিবেচনা করি, তাহা ত যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারি। অসভ্যেরা তাহাই করে। বলিতে লজ্জা হয়, সভ্য সমাজও তাহাই করে। অনেক সভ্য সমাজের রীতি এই যে, কন্যার বিবাহ দিতে, কন্যার মতামত চাহিতে হয় না। আশ্চর্য্য কথা এই যে, অতি সভ্য ফ্রান্সে আজিও এই নিয়ম; কিন্তু অর্দ্ধসভ্য ইংলণ্ডে বিবাহের জন্য কন্যার মতামত চাহিতে হয়। এ রহস্যের ব্যাখ্যা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

অনেক সমাজে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাক্ষস বিবাহ এবং আসুর বিবাহ একই সময়ে প্রচলিত। তথাচ বোধ হয় যে, আসুর বিবাহ রাক্ষস বিবাহের পরবর্ত্তী। বল পূর্ব্বক অপহরণের পরে যে বিনিময় নিয়মের প্রচলন হইয়াছে, ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। অন্যান্য সম্পত্তির সম্বন্ধে যাহা নিয়ম, তাহা বিবাহ ব্যাপারেই বা প্রযোজ্য না হইবে কেন?

আসুর বিবাহের যথাসাধ্য আলোচনা করা গেল। এই প্রণালীর বিবাহ হইতে কিরূপে যৌতুকের নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা অন্য প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

লাল পল্টন্।*

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বাঙ্গালীর কলঙ্ক।

"The native Bengalees are generally stigmatised as pusillanimous and cowardly, but it should not be forgotten, that, at an early period of our military history in India, they almost entirely formed several of our battalions, and distinguished themselves as brave and active soldiers."—*Walter Hamilton.* †

বাঙ্গালীর ইতিহাস নাই। সেই জন্য, বাঙ্গালীর বাহুবলের পরিচয় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সচরাচর প্রচলিত ইতিহাসে "ভীরু ও কাপুরুষ" বলিয়া বাঙ্গালীর ললাটে যে কলঙ্করেখা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই জনসমাজে সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে।

যাঁহারা বাঙ্গালীর কলঙ্ক রটনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কোনরূপ প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই। পরনিন্দা

---

* 'প্রদীপের' প্রথম সংখ্যায় আমাকে লক্ষ্য করিয়া যে ঐতিহাসিক তত্ত্বালোচনার জন্য ইঙ্গিতে অনুরোধ জানান হইয়াছে, তদুত্তরে লিখিত।

† 'প্রদীপের' প্রথম সংখ্যায় উল্লিখিত কথাগুলি 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং উহা ওয়াল্‌টার হামিল্টন্ কৃত ১৮১৫খৃষ্টাব্দের 'বৃটীশ ইণ্ডিয়া গেজেটিয়ার' পুস্তকের উক্তি বলিয়া কথিত হইয়াছে। উক্ত নামধেয় কোন পুস্তক আছে কিনা জানি না। উদ্ধৃত বাক্যাবলী ওয়াল্‌টার হামিল্টন্ কৃত ১৮২০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত A Geographical, Statistical and Historical Description of Hindostan and Adjacent countries নামক পুস্তকের প্রথম খণ্ডের সপ্তম পরিচ্ছেদের ৯৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। আমরা উক্ত পুরাতন পুস্তক হইতে উদ্ধৃতাংশ সংকলন করিয়া দিলাম।

স্বভাবতঃই নিতান্ত মুখরোচক; বোধ হয় সেই জন্যই লোকে তাঁহাদের কথা বিনা প্রমাণে গলাধঃকরণ করিয়া আসিতেছে!

এতদিন পরে এই সকল কথার প্রতিবাদ করা নানা কারণে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এখন আর বিনা প্রমাণে একটি কথাও বলিবার উপায় নাই। সে প্রমাণও তেমন অনায়াসলভ্য নহে! যাহা সেকালের মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে জনসমাজে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা কালক্রমে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে;—যাহা প্রকাশিত হয় নাই, তাহা বিলাতে চলিয়া গিয়াছে। অগত্যা বাঙ্গালীকে মাথা পাতিয়া অনেক অলীক কলঙ্ক বহন করিতে হইতেছে!

"ইংরাজে না মানিলে আমাদের যশও মঞ্জুর নয়,"—ইহা সকলেরই ধারণা হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইহা নব্য-বঙ্গের পক্ষে নিতান্ত অস্বাভাবিক কুরুচি বলিয়া ধিক্কার দেওয়া যায় না। এইরূপ হইবারই কথা। পাঠশালা হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিখর পর্য্যন্ত—সকল স্থানে—বাঙ্গালীর কাপুরুষত্বের কথাই বিবিধ ছন্দোবন্ধে কর্ণোপান্তে ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে! বাল্যশিক্ষার সহিত যে সংস্কার তরুণ হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়, তাহা কালক্রমে শত পল্লবে ফুল ফলে বিকশিত হইয়া উঠাই স্বাভাবিক। সুতরাং এখন আর লোকে সর্ব্বকণ্ঠস্বীকৃত ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন নূতন কথা বিনা প্রমাণে গ্রহণ করিতে সম্মত হইবে কেন? সে প্রমাণও ইংরাজের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া দিতে হইবে;—তাঁহারা যদি আমাদের যশ গাহিয়া থাকেন, তবেই তাহা মঞ্জুর!

বাঙ্গালীর কাপুরুষত্বের কলঙ্ক ভঞ্জন করিবার জন্য ওয়াল্টার হামিল্টনের উক্তিই যথেষ্ট হইত। তিনি বাঙ্গালীর প্রশংসাবাদের জন্য গ্রন্থ রচনা করেন নাই। তাঁহার পুস্তকের সর্ব্বত্র বাঙ্গালীর কত কুৎসা কত নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়;—পড়িতে পড়িতে মনে হয় বুঝি তাঁহার পুস্তক অবলম্বন করিয়াই মেকলে বাঙ্গালীকে জাল জুয়াচুরী ও মিথ্যাকথার অবতার বলিয়া রটনা করিয়া গিয়াছেন!*

এরূপ গ্রন্থকার যখন বাঙ্গালীকে ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়া কলঙ্কিত না করিয়া, তাহাদের বীরকীর্ত্তির বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিয়া গিয়াছেন, তখন অন্যান্য প্রমাণ অনুসন্ধান না করিলেও চলিত। কিন্তু ওয়াল্টার হামিল্টন্ যে কথার উপর নির্ভর করিয়া বাঙ্গালীর যশ গাহিয়া গিয়াছেন, তাহা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য কি না, সে বিষয়ে যখন বিতর্ক উপস্থিত হওয়া বিচিত্র নহে, তখন তাঁহার উক্তির মূলানুসন্ধান করাই কর্ত্তব্য।

ভারতভাগ্য-বিধাতা সেনাপতি ক্লাইব যাহাদের সহায়তা লাভ করিয়া আপন নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন, সচরাচর প্রচলিত ইতিহাসে তাহারা ক্লাইবের "লাল কুর্ত্তিওয়ালা" অথবা clive's Red coa's বলিয়াই পরিচিত। তাহাদের বীরকীর্ত্তির ইতিহাস সংকলিত হয় নাই; যাহা কিছু সংকলিত হইয়াছিল, * তাহাও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। এখন নূতন করিয়া তাহাদের ইতিহাস সংকলন করিতে হইলে "ইংরাজ রাজত্বের আদি যুগ" বিশেষ ভাবে অনুশীলন করা আবশ্যক।

"ইংরাজ রাজত্বের আদি যুগ" এখনও নিবিড়-তমসাচ্ছন্ন। আমাদের মত গূঢ়চক্রবন্ধ বাঙ্গালীর পক্ষে তাহা "বিশেষভাবে অনুশীলন" করা সহজসাধ্য নহে। বহুমানাস্পদ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ইংলণ্ডীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতেতিহাসের অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার অমৃতময়ী লেখনী এই কার্য্যে নিযুক্ত হইলে কথঞ্চিৎ আশা পূর্ণ হইতে পারে। ভারতবর্ষে বৃটীশরাজশক্তি কিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহার প্রকৃত ইতিহাস আজিও লিখিত হয় নাই! ইহা আমাদের স্বকপোলকল্পিত অমূলক সিদ্ধান্ত নহে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সি, আর উইল্‌সন্ এম, এ মহোদয় "ইংরাজ রাজত্বের আদি যুগ" অনুশীলন করিতে বসিয়া সম্প্রতি এই কথাই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি বলেন,—"বৈজ্ঞানিক সত্যানুসন্ধান পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইলে, প্রত্যেক কার্য্যের কারণ নির্দ্দেশ করিতে হয়। ইংরাজেরা কিরূপে ভারতবর্ষে অধিকার বিস্তার করিতে সক্ষম হইলেন, তাহা বর্ত্তমান যুগের একটি প্রধানতম ঐতিহাসিক ব্যাপার। কিন্তু এখনও যে

* In the moral Scale the Bengalese Hindus must be allowed to rank very low, being destitute in a wonderful degree of the qualities which contribute to dignify the human race, and in Europe form the Standard by which men are estimated.—*Walter Hamilton's Description of Hindostan, vol. I. 111*

* William's Bengal Native Infantry.

তাহার কার্য্যকারণ শৃঙ্খলাবদ্ধ কোন রূপ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহা কি নিতান্ত বিস্ময়ের বিষয় নহে? বৃটীশাধিকৃত ভারত সাম্রাজ্যের ইতিহাস এখনও সংকলিত হয় নাই। এখনও কেহ বুঝাইয়া দিতে পারেন নাই—পর্ত্তুগীজ, ফরাসি, ওলান্দাজ থাকিতে ইংরাজ ভারতভূপতি হইলেন কেন? বোম্বে মান্দ্রাজ থাকিতে বঙ্গদেশ হইতে ইংরাজরাজশক্তির অভ্যুদয় হইল কেন? *

এই ঐতিহাসিক সমস্যার আলোচনা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গালীর কথাই আলোচনা করিতে হইবে। বাঙ্গালীকে "ভীরু ও কাপুরুষ" বলিয়া ইতিহাস রচনা করিয়া রাখিলে, এই সমস্যার প্রকৃত সিদ্ধান্ত কদাচ আবিষ্কৃত হইবে না। বর্ত্তমান যুগের একজন সুযোগ্য ইংরাজ ইতিহাস লেখক বহুপূর্ব্বে ইহার সংক্ষিপ্ত উত্তর লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমরাই যে ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্ব সংস্থাপন করিবার মূল, ইহাই তাঁহার সিদ্ধান্ত। † প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া এই সিদ্ধান্ত কতদূর সত্য তাহা বুঝাইয়া দিতে পারিলেই বাঙ্গালীর কলঙ্ক মোচন হইতে পারে।

আজ কাল বাঙ্গালী রণভীরু কাপুরুষ বলিয়াই সর্ব্বত্র পরিচিত। ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু বাঙ্গালী যে চিরদিন রণভীরু কাপুরুষ বলিয়া পরিচিত ছিল না,—সে কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাহা প্রমাণ করিবার জন্য বহুআয়াসপূর্ণ ঐতিহাসিক গবেষণার প্রয়োজন হয় না।

হিন্দুরাজত্বের কথা ছাড়িয়া দিলে, বাঙ্গালার সামরিক ইতিহাস প্রধানতঃ পাঁচ অধ্যায়ে বিভাগ করিতে হয়। বর্ত্তমান জ্ঞানোজ্জ্বল নবযুগের অভ্যুদয় হইবার পূর্ব্বে বঙ্গদেশে এরূপ দীর্ঘস্থায়ী শান্তিসুখ দেখিতে পাওয়া যাইত না;—নিত্য কলহ, নিত্য বিদ্রোহ, নিত্য আক্রমণ, নিত্য আত্মরক্ষা,—এইরূপ নিত্য বিপ্লবে বঙ্গভূমি কত না বিপর্য্যস্ত হইত! বাঙ্গালার ইতিহাসের সেই বহুবিপ্লবময় পাঁচটি অধ্যায়,—(১) হিন্দু ও পাঠান সংঘর্ষ, (২) পাঠানশাসন, (৩) পাঠান ও মোগল সংঘর্ষ, (৪) মোগলশাসন, (৫) মোগল ও ইংরাজ সংঘর্ষ,—এইরূপে অভিহিত করিলে অসঙ্গত হইবে না। এই পাঁচ অধ্যায়ের প্রত্যেক পৃষ্ঠাই কত রণকোলাহল কাহিনীতে পরিপূর্ণ!

যে সকল বিজয়োন্মত্ত পাঠান-সেনা বিহার বিপর্য্যস্ত করিয়া অসিহস্তে বঙ্গদেশে প্রথম পদবিক্ষেপ করে, তাহাদের "সপ্তদশ অশ্বারোহী" কটাক্ষে বঙ্গভূমি করতলগত করিতে পারে নাই। বাঙ্গালীরা বহুবার পাঠান সেনার আক্রমণবেগ প্রতিহত করিবার আয়োজন করিয়াছিল; অবশেষে যখন পাঠান শাসন প্রবর্ত্তিত হইল, তখনও সমগ্র বঙ্গভূমি পাঠানের পদানত হয় নাই। পাঠানকে সুবর্ণরেখাপারে চিরনির্ব্বাসিত করিবার জন্য মোগল অশ্বারোহী কতবার পাঠানের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল; অবশেষে যখন মোগল-শাসন প্রতিষ্ঠালাভ করিল, তখনও সমগ্র বঙ্গভূমি মোগলকে যথারীতি কর প্রদান করে নাই। মোগলশাসন উৎখাত করিয়া ফেলিতে,—অর্থাৎ সিরাজদ্দৌলার সিংহাসনে মীরজাফরকে বসাইয়া দিতে, সমধিক সমরকৌশলের প্রয়োজন হয় নাই; তথাপি মোগলরাজ্যে বৃটীশ রাজশক্তি সুসংস্থাপিত করিয়া অরাজকতার মূলোচ্ছেদ করিতে বহু বীর সন্তানকে শত সমরক্ষেত্রে আত্মবিসর্জ্জন করিতে হইয়াছে।

এই ঐতিহাসিক যুগপঞ্চকে বহিঃশত্রুর অভিযানে এবং অন্তর্বিপ্লবের আলোড়নে বঙ্গভূমি বহুধা জর্জ্জরিত হইয়াছে। কখন পার্ব্বত্য-সেনা, কখন মগ্ ফিরিঙ্গি, কখন বা বর্গী আসিয়া, ঘন ঘোর হুহুঙ্কারে বাঙ্গালার স্বর্ণশীর্ষ শস্যসম্পৎ পদদলিত করিয়া চলিয়া গিয়াছে! অন্তর্বিপ্লবের শান্তিসাধন করিতে, বহির্বিপ্লবের গতিরোধ করিয়া শস্যভাণ্ডার সুরক্ষিত করিতে বাঙ্গালীকে বহুবার সামরিক ব্যাপারে লিপ্ত হইতে হইয়াছে।

সে সকল সামরিক ব্যাপারে বাঙ্গালী ভিন্ন কাহারা আসিয়া সম্মুখ সমরে আত্মরক্ষার জন্য দেহ বিসর্জ্জন করিত? বাঙ্গালী কর্ম্মকার ভিন্ন কাহারা আসিয়া তীর, বর্শা, টাঙ্গি, তরবারি, বন্দুক, কামান, বারুদ ও গোলা প্রস্তুত করিয়া দিত?

*It is the duty of the Scientific enquirer to shew the causes of every event. Is it not then strange that we are still without any adequate explanation of one of the greatest events of modern history, the English conquest of India? * * * The history of British India has yet to be written. We have yet to understand why the English conquered India and not the Portuguese, French or Dutch. We have yet to understand why it was from Bengal, not from Madras or Bombay, that the English dominion took its rise.—*Wilson's Early Annals of the English in Bengal, vol. I. Preface.*

† Malleson's Decisive Battles of India.

বাঙ্গালী কেমন নিপুণহস্তে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া পরিখা-পরিশোভিত দুর্গমূল হইতে কামানে অনল বর্ষণ করিতে করিতে শত্রুসেনার মুণ্ডচ্ছেদ করিতে পারিত, মহম্মদপুরের ধ্বংশাবশেষের মধ্যে বাঙ্গালী কায়স্থ কুলভূষণ "বিশ্বাস-ভাষোদ্ভবকুলকমলে ভাসকো ভানুতুল্যঃ" সীতারাম রায়ের দুর্গ প্রাচীরে এখনও তাহার কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।* বাঙ্গালী জনার্দ্দন কর্ম্মকার বাঙ্গালী তত্ত্বাবধায়ক হরবল্লভ দাসের অধীনে কেমন দৃঢ়কায় কামান নির্ম্মাণ করিতে পারিত, "জাহানকোষা" নামক ঐতিহাসিক কামান-ফলকে এখনও তাহা খোদিত রহিয়াছে। †

আজ কাল বাঙ্গালীর পুরাতত্ত্বানুসন্ধানের জন্য কিছু কিছু আয়োজন আরব্ধ হইয়াছে। বোধ হয় সেই জন্য "প্রদীপ" প্রজ্বলিত হইয়াই ঐতিহাসিক গহ্বর মুখে সংস্থাপিত হইয়াছে। তথাপি সত্যানুরোধে বলিতে হইবে,—এই গহ্বর বড়ই ভস্মস্তূপ নিহিত, বড়ই তিমিরাবগুণ্ঠিত, বড়ই দুর্গম,—স্থানে স্থানে দুর্গন্ধ এত অধিক যে, নাসারন্ধ্র জ্বলিয়া যায়!!

বাঙ্গালীরা কি সূত্রে কোন্ সময় হইতে সামরিক ব্যাপার হইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়া কালক্রমে রণপরাঙ্মুখ হলকর্ষণ-নিপুণ নিরন্ন কৃষক সমিতিতে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা সবিশেষ কৌতুহলাত্মক ঐতিহাসিক সমস্যা! বর্ত্তমান শতাব্দির প্রারম্ভেই বাঙ্গালীর বাহুবল বিলুপ্ত হইবার সূত্র-পাত হয়। ওয়াল্‌টার হামিল্‌টন বলেন, কোম্পানী বাহাদুর সিপাহী সংখ্যা হ্রাস করায়, অনেক বাঙ্গালী আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছে যে, কোম্পানীর আমলে পড়িয়াই তাহাদের অন্ন উঠিয়া গেল! ‡

কোম্পানীর আমলে সিপাহী সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াই যে বাঙ্গালী সমর শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়াছে তাহাই একমাত্র কারণ নহে। সেকালে বাঙ্গালীর পক্ষে নায়ক, হাবিল্‌দার, জমাদার, মন্‌সব্‌দার, কিল্লাদার ও সিপাহ্‌সালার প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার সেনানায়কের পদে প্রতিষ্ঠিত হইবারই সম্ভাবনা ছিল। কোম্পানীর আমল পড়িয়া বাঙ্গালী কেন, কালা আদ্‌মী মাত্রেরই, উচ্চপদ পাইবার আশা নির্ম্মূল হইয়া গেল! মাসিক চারি টাকা বেতনের পদাতিক হওয়া অপেক্ষা হলকর্ষণ করাই বাঙ্গালীর নিকট অধিকতর লাভজনক বিবেচিত হইল। ইহা আমাদিগের কথা নহে;—ওয়াল্‌টার হামিলটনের গ্রন্থে ইহারও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।*

বর্ত্তমান শতাব্দির কথা যাহাই হউক, গত শতাব্দির মোগল ও ইংরাজ সংসর্গে যে বাঙ্গালীরা উভয় পক্ষেই অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। নবাব সরকারে বাঙ্গালী সেনা ও সেনানায়কের অভাব ছিল না;—বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ মহারাজ নন্দকুমার, বাঙ্গালী কায়স্থ মহারাজ দুর্ল্লভরাম, বাঙ্গালী বৈদ্য মহারাজ রাজবল্লভ, বাঙ্গালী মুসলমান মহাবীর মীরমদন যে সিরাজদ্দৌলার সরকারে সেনানায়কের কার্য্যে নিযুক্তছিলেন, সচরাচর প্রচলিত ইতিহাসেও তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। "নবাবী আমলের হিন্দু সেনাপতিদিগের" কীর্ত্তি-কাহিনী পৃথক্ সংকলিত হইতেছে; তাহা প্রকাশিত হইলে বাঙ্গালীর ললাটকলঙ্ক কিয়দংশে অপসারিত হইবে। † ইংরাজ সরকারে বাঙ্গালীদিগের পক্ষে সেনানায়কের উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিবার ব্যবস্থা ছিল না; তথাপি ইংরাজ সরকারে বাঙ্গালী সেনা কিরূপ প্রভুপরায়ণতা, অকুতোভয়তা,

* 'সাহিত্যে' প্রকাশিত 'সীতারাম' শীর্ষক ঐতিহাসিকচিত্রে এই দুর্গের মানচিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

† শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি, এ সংকলিত "মুরশিদাবাদ কাহিনী" নামক ঐতিহাসিক চিত্রে এই কামানের চিত্র ও বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

‡ With a particular class of the natives it is a very general complaint, that they can not now procure a livelihood in the British Provinces. They allege that under former governments, the number of troops entertained, and the various description of servants required for state and the revenue collections, afforded means of employment which are now lost; the troops and officers under the British Government being circumscribed to the Smallest possible Scale.—*Walter Hamilton's Description of Hindostan, vol. I. 91*

* No native (of Bengal) has any motive to distinguish himself greatly in the army, as he can not rise higher than a Soubahdar, a rank inferior to an Ensign.—*Walter Hamilton's Description of Hindostan, vol. I. 91*

† বহরমপুর কলেজের সুযোগ্য শিক্ষক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ সংকলিত "নবাবী আমলে হিন্দু কর্ম্মচারী" শীর্ষক একটি সারবান ঐতিহাসিক প্রবন্ধ "সাহিত্য" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁহারই লেখনী সম্প্রতি "নবাবী আমলে হিন্দু সেনাপতি" শীর্ষক আর একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ সংকলনে নিযুক্ত রহিয়াছে। কালীপ্রসন্ন বাবুর প্রগাঢ় ইতিহাসানুরাগ, অতুল অধ্যবসায় ও ঐতিহাসিক লুপ্তোদ্ধারে আন্তরিক যত্ন, বঙ্গসাহিত্যসমাজে সুপরিচিত। তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে অনেক বিলুপ্ত কাহিনী আবার সর্ব্বজনপরিচিত হইয়া উঠিবে।

ও সমর সহিষ্ণুতার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে কেবল তাহাই আলোচিত হইবে। তাহাতেই বিষপ্ হীবর এবং ওয়াল্‌টার হামিল্‌টনের উক্তির যাথার্থ্য প্রকটিত হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বাঙ্গালী বরকন্দাজ।

"Hitherto the native troops employed at Calcutta, when required, designated "*Buxarries*," were nothing more than Barkundaz, armed and equipped in the usual native manner."—*Broome's History of the Rise and Progress of the Bengal Army.*

ইংরাজেরা যখন বাঙ্গালাদেশে প্রথম পদার্পণ করেন, তখন তাঁহারা খাঁটি বণিক; বাণিজ্য ব্যাপারে যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করাই একমাত্র লক্ষ্য ছিল। *

এই লক্ষ্য সাধন করিবার জন্য ১৬৩৩ হইতে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহারা দেশীয় রাজশক্তির আশ্রয় ও অনুকম্পার উপরেই সমধিক নির্ভর করিতেন।

দেশীয় রাজশক্তির অনুগ্রহের মূল্য ছিল। তজ্জন্য ইংরাজবণিককে সময়ে সময়ে বহুবিধ উপঢৌকন হস্তে রাজদ্বারে উপনীত হইতে হইত। কিন্তু এত করিয়াও নিরুদ্বেগ হইবার উপায় ছিল না!

দিল্লীর বাদসাহ অনুকম্পা প্রকাশে বাণিজ্যের অনুমতি প্রদান করিলে, বাঙ্গালার নবাব অনুমতি প্রদান করিতে চাহিতেন না; নবাব সম্মত হইলেও, হুগলীর ফৌজ্‌দার সম্মত হইতেন না! নবাবকে দরবারের পাত্রমিত্রগণের মনস্তুষ্টি সাধন করিতে অনেক অপব্যয় করিতে হইত; এবং তাহাতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিলে, তৎক্ষণাৎ বাণিজ্য বন্ধ হইয়া পড়িত। †

ইংরাজেরা লাভের লোভে বাঙ্গালাদেশের নানাস্থলে বাণিজ্যালয় খুলিয়া অনেক টাকা "দাদন" করিয়া বসিয়াছিলেন। নবাবদরবারের সহিত মনোমালিন্য উপস্থিত হইলে, তাঁহাদের সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইবার উপক্রম হইত।

সেকালের বাঙ্গালী রাজা বা জমিদারবর্গ বাহুবলে বাহুবল পরাস্ত করিবার জন্য সাধ্যমত সেনাপালন করিতেন; এবং সেই জন্য নবাবগণ সহসা তাঁহাদিগকে মুঠার মধ্যে আনিতে পারিতেন না। ইহাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়া, ইংরাজেরাও কথঞ্চিৎ বাহুবলের পরিচয় দিবার সংকল্প করিলেন।

ইংলণ্ডেশ্বরের অনুমতি অনুসারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবাণিজ্যের একাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। কালক্রমে অনেক স্বাধীন ইংরাজ বণিকও ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইহাতে সর্ব্বদা কলহ বিবাদ উপস্থিত হইয়া ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর সমূহ অনিষ্ট হইত। তজ্জন্য তাঁহারা বাহুবলে আত্মরক্ষা করিয়া বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার আশায় ইংলণ্ডেশ্বরের শরণাপন্ন হন।

১৬৬১ হইতে ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতেই কাটিয়া গেল। অবশেষে ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডেশ্বর দ্বিতীয় জেম্‌সের অনুজ্ঞা লাভ করিয়া ইংরাজবণিক-সমিতি বাহুবলে আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া বাণিজ্য বিস্তার করিবার আয়োজন করিলেন। *

ইংলণ্ড হইতে একদল সেনা প্রেরিত হইল; তাহার কতক সমুদ্রপথে নিরুদ্দেশ হইয়া গেল, কতক পথক্লেশে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল, অত্যল্পসংখ্যক "গোরালোগ্" বঙ্গদেশে উপনীত হইতে পারিল;—কিন্তু কোম্পানীর প্রচুর অর্থ অপব্যয় হইয়া গেল!

কোম্পানীর বাণিজ্য বিস্তারের জন্য ইংলণ্ড হইতে যে সেনাদল প্রেরিত হইত, তাহার প্রত্যেক সেনা সংগ্রহ করিতে তিনশত টাকার উপর ব্যয় হইত! † সর্ব্বদা এরূপ বহুব্যয়সাধ্য সেনা সংগ্রহ করা অসম্ভব বলিয়া কোম্পানী বহুসংখ্যক সেনা আনয়ন করিতে পারিতেন না। দশ

* The first period in this history lasts from 1633 to 1660, during which the English take up a position in Bengal, aiming at nothing more than commerce under the protection of the Indian Government.—*Wilson's Early Annals of the English in Bengal, vol. I—Preface.*

† If the Settlements hesitated, or refused to comply with the Nabob's demands, their trade, throughout the Province, was immediately stopped.——Orme's History of Indostan, vol. II. 11.

* The Company in the year 1685 determined to try what condescensions the effect of arms might Produce; and with the approbation of King Tames the Second, fitted out two fleets.——*Orme, vol. II. 11.*

† Every recruit sent from England cost the Company £ 30.——*Bruce's Annalls of the East India Company, vol. III. 162.*

বৎসর এইরূপ উপায়ে বাণিজ্য বিস্তার করিতে গিয়া কোম্পানীর বিস্তর ক্ষতি হইল! এই সময়ে ইউরোপে জনরব হইল যে, ফরাসিরা ভারতবাণিজ্যে একাধিপত্য বিস্তার করিবার জন্য বহুসংখ্যক সেনা প্রেরণ করিতেছেন। ইংরাজকোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ অল্পসংখ্যক গোরা প্রেরণ করিয়া, "কালা আদ্‌মীদিগের সহায়তা গ্রহণের অনুমতি প্রচার করিলেন। এই সূত্রে ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দ হইতে বাঙ্গালীর বাহুবল ইংরাজের স্বার্থরক্ষার সর্ব্বপ্রথম নিয়োগপ্রাপ্ত হইল!

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তৎকালে বাঙ্গালীদিগের মধ্যে সেনা এবং সেনানায়কের অভাব ছিল না। যে সকল হিন্দু মুসলমান মোগল-রাজ-সংসারে সামরিক কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন, তাঁহাদের মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি ভদ্রসন্তানেরাও লাঠি তরবারি ব্যবহার করিতে জানিতেন এবং নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু মুসলমানের মধ্যে হলকর্ষণে জীবিকার্জ্জন করা অপেক্ষা তরবারি চালনায় জীবিকার্জ্জনের প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এরূপ অবস্থায় ইংরাজদিগের পক্ষে 'কালা আদ্‌মীর' বাহু বলের আশ্রয় গ্রহণ করা কঠিন হইল না। ইহারা কোম্পানীর সরকারে ভাত কাপড় এবং মাসে চারি টাকা বেতনে নিযুক্ত হইতে লাগিল; সম সাময়িক কাগজ পত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, "তৎকালে দেশীয় পদাতিক সেনা কুত্রাপি ইহার অধিক বেতন পাইত না।" *

ইংরাজেরা যে সময়ে ব্যয় সংক্ষেপ করিবার জন্য দেশীয় সেনা সংগ্রহের ব্যবস্থা করিলেন, তৎসমসময়ে একটি আকস্মিক বিপ্লব উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের এই অভিনব সামরিক নীতি আরও দৃঢ়বদ্ধ হইয়া গেল।

মোগল রাজশক্তির শাসন-শিথীলতার অবসর লাভ করিয়া সভাসিংহ নামক বর্দ্ধমান অঞ্চলের জনৈক বাঙ্গালী জমিদার উৎকল নিবাসী পাঠান সর্দ্দার রহিম খাঁর সহায়তা গ্রহণ করিয়া স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপন করিবার আশায় ভাগীরথীর উভয় তীরস্থ সম্পন্ন গ্রাম নগরগুলি লুণ্ঠন করিতে করিতে মুরশিদাবাদ, মালদহ বিপর্য্যস্ত করিয়া রাজমহল পর্য্যন্ত করতলগত করিয়া ফেলিলেন। বাঙ্গালার মোগল রাজধানী তখনও ঢাকা হইতে মুরশিদাবাদে উঠিয়া আইসে নাই; সুতরাং সহসা বিদ্রোহ নিবারণের সুবিধা হইল না। কলিকাতার ইংরাজ, চুঁচুঁড়ার ওলন্দাজ এবং চন্দননগরের ফরাসি বণিকগণ আপন আপন বাণিজ্য স্থান সুরক্ষিত করিবার আশায় দেশীয় বরকন্দাজ নিয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং নবাবের অনুমতির উপলক্ষ করিয়া দুর্গ নির্ম্মাণে অগ্রসর হইলেন। এইরূপে চুঁচুঁড়ায়, চন্দননগরে এবং কলিকাতার বিদেশীয় বণিকজাতির দুর্গরচনার সূত্রপাত হইল।

যাহারা ইংরাজের বাণিজ্য রক্ষার জন্য কলিকাতার বৃটীশ দুর্গে প্রথম পদক্ষেপ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে গোরার সংখ্যা অধিক ছিল না। * কেবল কলিকাতা রক্ষার জন্যই বরকন্দাজ নিয়োগ করা হইয়াছিল, এই জন্য কলিকাতা রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু ইংরাজদিগের মালদহের বাণিজ্যালয় লুণ্ঠিত হইয়া গেল। †

ইংরাজেরা কলিকাতার দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার সময় হইতেই নগর রক্ষার ভার তাঁহাদের স্কন্ধে নিপতিত হইয়াছিল। তৎকালে ডিহী কলিকাতা, বাজার কলিকাতা, গোবিন্দপুর ও সুতানটি নামক চারি ভাগে ভারত সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ রাজধানী বিভক্ত হইয়াছিল, এবং প্রত্যেক ভাগে এক একটি স্বতন্ত্র কাছারী সংস্থাপিত হইয়াছিল। এই সকল কাছারীতে নগর রক্ষার জন্য পাইক ও বরকন্দাজ থাকিত এবং তাহাদের মধ্যে বাঙ্গালী গোয়ালাদিগের সংখ্যাই অধিক ছিল। সেকালের বাঙ্গালী গোয়ালাগণ শৌর্য্য, বীর্য্য ও

* The pay of the soldiers were (?) fixed at 4 Rupees per month, independent of their clothing and rations, which Sir John (Goldssborough) "considered to be a more ample allowance, than the troops of any other establishment in India received.—*Broom's Bengal Army, vol. 1. 27.*

* On the commencement of these disturbances, the several European establishments entertained a a number of native soldiers for the protection of their property, and professing themselves friends of the local government, solicited permission to put their factories in a state of defence against the insurgents; to this request the Nawab replied in general terms directing them to defend themselves; when they taking, for granted what was not positively forbidden, hastened to erect walls of masonry with bastions or flanking towers at the angles, around their several factories, and thus originated the fortifications of Chinsura, Chandernagore, and Calcutta.—*Broom's Bengal Army, vol. 1. 28.*

† During all this time, the *insurgents* were gradually gaining head; they had taken possession of Rajemahal and Malda at which latter place the English factory was plundered.—Ibid.

সমর-কৌশলের জন্য এরূপ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল যে, বর্ত্তমান শতাব্দির প্রারম্ভ পর্য্যন্তও গোয়ালা বরকন্দাজ নিয়োগের জন্য ইংরাজদিগের সবিশেষ আগ্রহ ছিল। তাঁহাদের বাণিজ্যবিষয়ক কাগজ পত্রের মধ্যে এখনও তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। *

যুদ্ধকলহের সম্ভাবনা উপস্থিত হইলে, ইংরাজেরা কালাসিপাহীর দল বৃদ্ধি করিতেন, শান্তির সময়ে ব্যয় সংক্ষেপ করিবার জন্য কেবল গোরাদল বাহাল রাখিয়া বাঙ্গালীদিগকে পদচ্যুত করিতেন। কিন্তু শান্তির সময়েও ইংরাজদুর্গে দুই চারিজন বাঙ্গালী সৈনিক না থাকিত তাহা নহে। †

সম্রাট আরঙ্গজীবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ভারত সিংহাসন লইয়া তুমুল গৃহকলহ উপস্থিত হয়। তৎকালে বিদেশীয় বণিকসমিতির কার্য্যকলাপ পরিদর্শন করা কাহারও লক্ষ্য ছিল না; সকলেই আপনাপন পদগৌরব রক্ষা করিবার জন্য ও নূতন বাদশাহের শুভদৃষ্টি লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। দেশ একরূপ অরাজক হইয়া পড়িয়াছিল। ইংরাজেরা সেই সুযোগে তাড়াতাড়ি দুর্গ সংস্কার করিতে আরম্ভ করেন। ‡ দেশে যখন শান্তি সংস্থাপিত হইল, মুর্শিদাবাদের নবাবদরবার তখন পুনরায় ইংরাজদিগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার অবসর প্রাপ্ত হইলেন। নবাব বিংশতিসহস্র মুদ্রা 'নজর' তলব করিয়া পাঠাইলেন, এবং ইংরাজের বাণিজ্য তরণীর গতায়াত রুদ্ধ করিয়া দিলেন। এই উপলক্ষে ইংরাজেরা পুনরায় বাঙ্গালী বরকন্দাজ নিয়োগ করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহারা বাহুবলে নৌকা বন্ধন-মুক্ত করিবার জন্য যে সেনাদল পাঠাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে বাঙ্গালী গোলন্দাজ থাকার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। *

অধ্যাপক সি, আর, উইলসন্ এম্,এ মহোদয় বিলাতের জীর্ণ দপ্তর হইতে এই সকল পুরাতত্ত্ব বহু যত্নে উদ্ধার করিয়া ঐতিহাসিক তত্ত্বালোচনার পথ কিয়দংশে সহজ করিয়া দিয়াছেন; তাঁহার প্রকাশিত পুস্তকগুলি যদি আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজে সমাদর লাভ করে, তাহা হইলে অনেক পুরাতত্ত্ব সংকলিত হইবার সম্ভাবনা আছে।

সেকালের বাঙ্গালীরা যে কেবল স্থল-যুদ্ধেই বাহুবলের পরিচয় প্রদান করিত তাহা নহে; জলযুদ্ধেও তাহাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মোগল রাজ্যের জলযুদ্ধের জন্য শ্রীহট্টে রণতরণী নির্ম্মিত হইত; † ঢাকায় জলযুদ্ধোপযোগী নৌসেনা সুরক্ষিত হইত এবং তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ "জায়গীর নৌয়ারা" নামে পৃথক কতকগুলি পরগণা নির্দ্দিষ্ট হইত। ‡ এই নৌসেনাদলে কতকগুলি বঙ্গজ পর্ত্তুগীজ নাবিকও প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, § এবং অনেক বাঙ্গালী ধীবর বঙ্গোপসাগরসম্মিলনের নিকট নদীমুখ রক্ষার্থ নিযুক্ত হইয়াছিল। বাঙ্গালী ধীবরগণের সহায়তায় ভাগীরথীবক্ষে পোত আনয়ন করা বহুব্যয়সাধ্য ব্যাপার বলিয়া ইংরাজেরা ১৬৬৮খৃষ্টাব্দের সমকালেই 'পাইলট' প্রথার সূচনা করেন; ¶

* It is ordered that one chief peon, and forty five peons, two *chobdars*, and twenty *gowalas* be taken into pay.——*Consultations, 16th February. 1704.*

† Shaw Allum being now entire victor and sole King, and we having a prospect of peaceable times, it is agreed that we reduce the Soldiery to less number, *i. e.*—

1	Captain.
1	Ensign.
60	*Soldiers.*
66	Drummers and Corporals included.
66	The Second Company.
1	Master of Arms.
2	Portuguese Armourers.
2	*Bengal Armourers.*
137	Men in all"

——*Consultations, 31st March, 1709.*

* The Emperor being dead and now being the properest time to strengthen our Fort, whilst there is an interregnum and no one likely to take notice of what we are doing, it is therefore agreed that we make two regular bastions to the waterside to answer those to the land.——*Consultations, 28th April, 1707.*

* Therefore they resolve to write to the Governor of Hugli and "acquaint him that if the boats of goods that are stopped are not cleared, we will not let any of the Moor's ships pass." They also agree that they will send up forty soldiers and thirty black gunners to clear the "boats that are stopped higher up the country," and that Mr. Spencer and Ensign Dalibar go to command them.——*Consultations, 1st December, 1709.*

† Formerly large boats were built here for the Royal Mogal fleet stationed at Dacca.——*Walter Hamilton's Description of Hindostan, vol I. 193.*

‡ Grant's Analysis of Finances of Bengal.

§ For the support of this fleet the land revenue of several Districts was assigned, amounting to 30,000 Rupees per month, being the expence of the boats and their crews, of whom nearly 1000 were country-born Portuguese.——*Walter Hamilton's Description of Hindostan, vol. I. 185.*

¶ Bruce's Annals of the East India Company vol. II.

কিন্তু এই 'পাইলট' দলের মধ্যেও বাঙ্গালীকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। যাহারা তোপখানায় বা 'পাইলট-পোতে' কাজ করিত, ইংরাজের ইতিহাসে তাহারা 'লস্কর' নামে পরিচিত; ইহারা অদ্যাপিও ইংরাজ-জাহাজে নিযুক্ত থাকিয়া পৃথিবীর নানা দেশে গমনাগমন করিতেছে। ইংরাজেরা যে 'পাইলটদল' গঠন করেন, তন্মধ্যে ১৭০৪ খৃষ্টাব্দের কাগজ পত্রেও ২৬ জন লস্করের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। *

বাঙ্গালীর সহায়তা লাভ করিয়া ইংরাজেরা জলে স্থলে বাণিজ্য বিস্তারের সুবিধা পাইয়াছিলেন; এবং বিলাতের 'কোর্ট অব্ ডিরেক্টার' এই প্রথার উৎসাহ বর্দ্ধন করায়, ইংরাজসরকারে অনেক বাঙ্গালী সেনাদলে নিয়োগ প্রাপ্ত হইতেছিল। ইহার পর যখন বর্গীর হাঙ্গামায় বঙ্গদেশে জলস্থল পড়িয়া গেল, তখন ইংরাজেরা পুনরায় সেনাদল বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। আবার বহুসংখ্যক বাঙ্গালী বরকন্দাজ নিয়োগ প্রাপ্ত হইল। এতদুপলক্ষে বিলাতের 'কোর্ট অব্ ডিরেক্টার' হইতে যে পত্র আগত হইয়াছিল, তাহাতেও ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। †

এই সকল বঙ্গীয় বরকন্দাজ বা লস্করগণ যে প্রাণপণে ইংরাজের বাণিজ্য রক্ষা করিত, ইংরাজদিগের সামরিক ইতিহাসে তাহার আনুসঙ্গিক প্রমাণের অভাব নাই। বর্গীর হাঙ্গামায় বাঙ্গালা দেশের অনেক গ্রাম নগর উৎসাদিত হইয়াছিল, কিন্তু কলিকাতার কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই; বরং লোকে নিরাপদ হইবার জন্য কলিকাতায় ধন রত্ন লইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ‡

যাহারা এইরূপে ইংরাজের বাণিজ্য রক্ষা করিত, সেকালের ইতিহাসে তাহারা 'বরকন্দাজ' অথবা *Buxarries*, অথবা 'লস্কর' অথবা 'কালা আদ্‌মী' নামে পরিচিত। ইহারা দেশীয় পরিচ্ছদ পরিয়া, লাঠি, তরবারি ও বন্দুক ধারণ করিয়া দেশীয় প্রথায় কর্ত্তব্যপালন করিত, এবং প্রয়োজন হইলে ইংরাজের লবণের মর্য্যাদা রক্ষার্থ অকাতরে মাথা পাতিয়া দিতেও ইতস্ততঃ করিত না!

সিরাজদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ করিবার সময়ে ইংরাজদিগের সেনাবল অধিক ছিল না; তাহারা ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুন অবগত হইলেন যে, সিরাজদ্দৌলা সত্য সত্যই কলিকাতা আক্রমণ করিবার জন্য সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিতেছেন। তখন তাহারা আত্মরক্ষার্থ অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া ওলন্দাজ ও ফরাসিদিগের নিকট সেনা-ভিক্ষা করেন, এবং তাহাতে বিফলমনোরথ হইয়া নগরবাসী আরমানী ও ফিরিঙ্গিদিগকে সেনাদলে গ্রহণ করেন। তৎকালে আরমানী ও ফিরিঙ্গি সেনা সোলার টুপী মাথায় দিয়া বেড়াইত বলিয়া লোকে তাহাদিগকে 'টুপীওয়ালা' বলিত, ইংরাজেরা বলিতেন—"Topasses" ইহাদের সাহস এবং প্রভুভক্তির উপর কাহারও বিশ্বাস ছিল না। সেইজন্য ইংরাজেরা অবশেষে বাঙ্গালী বরকন্দাজ সেনা বৃদ্ধি করিয়া পোনের শত বাঙ্গালী ঠিকা সিপাহী নিয়োগ করিয়াছিলেন। *

বাঙ্গালীর কলঙ্কের কপাল! পরবর্ত্তী যুগের ইংরাজ ইতিহাস লেখক কাপ্তান ব্রুম্ স্বপ্রণীত সামরিক ইতিহাসে অর্ম্মির ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ডের ৫৯ পৃষ্ঠার দোহাই দিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, "যদিও ১৫০০ ঠিকা পদাতিক নিযুক্ত করা হইয়াছিল তথাপি তাহাতে কি হইবে? তাহাদের সাহস বা প্রভুপরায়ণতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবার উপায় ছিল না!" †

* Professor C. R. wilson's Early Annals of the English in Bengal, vol. I. 347.

† We entirely approve of the necessary precaution taken on the Maratta's invasion, to prevent surprise by hiring a number of *Lascars.*——*Letter from the Court of Directors, dated 21 st March, 1743.*

‡ With the exception to a few instances of plunder at the out factories, and the occasional stoppage of boats coming down the river with goods, the English suffered little by the invasion of the Marhattas; on the contrary, they were in reality gainers, for the security of the Settlement induced members to come and reside in the town.————*Broom's Bengal Army, vol. I. 41.*

* সমসাময়িক ইতিহাস লেখক অর্ম্মি স্বপ্রণীত ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডের ৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়া গিয়াছেনঃ—"No resource therefore remained but in their own force which was indeed very inadequate to the contest; for although the regular garrison consisted of 264 men, and the inhabitants serving as militia were 250. in all, 514 men, yet only 174 of this number were Europeans, and of these not ten had ever seen any other than the service of the parade; the rest were Topasses,——Armenians and Portuguese inhabitants,——on whose faith or spirit no reliance could be placed. The number of Buxarries, or Indian matchlockmen, were *therefore* augmented to 1500."

† Such was the state of the town, and the nature of the preparations for defence; to which, it must be added, that the peons or Buxarries, as they were then generally called, were increased to 1500 in number; ——but little defendance was to be placed on their courage or fidelity.——*Broom's Bengal Army, vol. I. 55.*

বলা বাহুল্য যে এই শ্রেণীর ইংরাজ ইতিহাস লেখকগণ যেরূপ সত্যনিষ্ঠার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের কথার প্রতিবাদ করা নিষ্প্রয়োজন! ইহারা যেখানে কোনরূপ প্রমাণ প্রয়োগ না করিয়া বাঙ্গালীর কলঙ্ক রটনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ করাও অসম্ভব। কিন্তু ইহারা যেখানে প্রমাণ প্রয়োগ করিতে বসিয়াছেন, সেখানেই এইরূপ একটা না একটা "গলদ্" বাহির হইয়া পড়ে!—ইহাতে কি নাসারন্ধ্র সত্যই জ্বলিয়া যায় না? আমাদের ইতিহাস এইরূপ কত দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, কে তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিবে? অথচ সেই সকল অলীক কাহিনী মুখে মুখে বিস্তৃতি লাভ করিয়া সর্ব্বত্র ঐতিহাসিক সত্য বলিয়াই সমাদর লাভ করিয়াছে!

বরকন্দাজদিগের ইতিহাসে ইহাই শেষ যুদ্ধ। ইহার পর কর্ণেল ক্লাইব বঙ্গদেশে শুভাগমন করিয়া বরকন্দাজদলের পদোন্নতির সূত্রপাত করিয়া দিলেন। তাঁহার আদেশে দেশীয় পরিচ্ছদ উঠিয়া গিয়া "লাল কুর্ত্তি" প্রচলিত হইল, লাঠি শোটা তিরোহিত হইয়া সঙ্গীণ্ বন্দুক চিরসহচর হইল,—সেই সঙ্গে বরকন্দাজ নামও উঠিয়া গিয়া "লাল পল্টন্" নাম সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল।*

"লাল পল্টনের" ইতিহাস ইংরাজ-রাজশক্তি বিস্তারের বিচিত্র ইতিহাসের সহিত একসূত্রে গ্রথিত। কলিকাতার পুনরুদ্ধারের পর হইতে "দেওয়ানী সনন্দ" লাভ না করা পর্য্যন্ত, ইংরাজেরা যেখানে যত যুদ্ধে † শত্রুসেনার সম্মুখবর্ত্তী হইয়াছেন, সেখানেই "লাল পল্টন্" বর্ত্তমান! তাহার অধিকাংশ সমরক্ষেত্রেই বামে দক্ষিণে "লাল পল্টন্" দণ্ডায়মান হইয়া মুষ্টিমেয় গোরাদলকে মধ্যস্থলে রাখিয়া বীরবিক্রমে বৃটীশবিজয় বৈজয়ন্তীর গৌরব রক্ষা করিয়াছে; এবং যুদ্ধাবসানে যখন হতাহতের সংখ্যা নির্ণীত হইয়াছে, তখনই দেখা গিয়াছে যে হতাহতের মধ্যে "লাল পল্টনের" সংখ্যাই অধিক!

যাহারা কোম্পানীর লবণ খাইয়া গত সমরক্ষেত্রে আত্মবিসর্জ্জনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া পুণ্যলোকে চিরপ্রস্থান করিয়াছে, তাহাদের বীরকীর্ত্তির ইতিহাস সংকলন করিতে পারিলে কেবল যে বিষপ হীবর এবং ওয়াল্টার হামিল্টনের উক্তির যথার্থ্য প্রকটিত হইবে তাহাই নহে;—তাহাতে কিয়ৎপরিমাণে বাঙ্গালীর অযথা কলঙ্ক, অপসারিত হইয়া বাঙ্গালীরা হৃদয়শোণিত ঢালিয়া দিয়া কত ক্লেশে ইংরাজরাজত্বের ভিত্তিমূল দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছে, তাহাও কিয়ৎপরিমাণে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

* Such was the origin of the First Regiment of Bengal Native Infantry, called from its equipment the "*Lall Pultun*" or "Red Regiment." a name which it long maintained.——*Broom's Bengal Army.*

† 'ভারতী'তে প্রকাশিত 'মীর কাসিম' ও 'সাহিত্যে' প্রকাশিত 'মীরজাফর' শীর্ষক ঐতিহাসিক চিত্রে এই সকল যুদ্ধের আমূল বিবরণ ক্রমশঃ প্রদত্ত হইতেছে।

সীমান্ত সংগ্রাম।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব।)

বর্ত্তমান গোলযোগ।

এদিকে পার্ব্বত্যজাতিরা ভারতগবর্ণমেণ্টের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ভাবিল যে, তাহাদিগের বাসস্থান হইতে ইংরাজসেনাদল অপসৃত করা হইবে। বহুদিন অপেক্ষা করিয়া তাহারা দেখিল—ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন না; তখন তাহারা আপনাদিগকে বিপ্রলব্ধ জ্ঞান করিয়া প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। সুযোগ শীঘ্রই ঘটিল। তাহারা দেখিল, দুর্ভিক্ষে ভারতবাসীরা অন্নাভাবে ক্লিষ্ট, ভারতগবর্ণমেণ্ট ভিক্ষালব্ধ অর্থে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ নিবারণে চেষ্টিত; বোম্বাই বিভাগে মহামারী ভয়ে অধিবাসীরা আশঙ্কিত, স্বাস্থ্যসংরক্ষণের বন্দোবস্তে লোকে অসন্তুষ্ট বলিয়াই অনেকের বিশ্বাস; এই সকল কারণে গবর্ণমেণ্ট ব্যতিব্যস্ত। এই সুযোগে তাহারা ইংরাজাধিকার আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। ১০ই জুন টোচি উপত্যকায় আক্রমণ আরম্ভ হইল, ২৭শে জুলাই সংবাদ আসিল, সোয়াট্ উপত্যকায় আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে, ৮ই আগষ্ট সাবাবাদারে অনল জ্বলিল, তাহার পর ১৫ই আগষ্ট পেসোয়ারের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

পার্ব্বত্যসংগ্রামে ইংরাজের অসুবিধা অনেক। পর্ব্বতবাসীরা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া রীতিমত যুদ্ধ করে না;

ইংরাজ সেনা অল্প দেখিলেই আক্রমণ করে, আবার অধিক-সংখ্যক ইংরাজ সেনা অগ্রসর হইলেই পরিচিত পর্ব্বতপথে কোথায় পলাইয়া যায়। সেই সঙ্কট-সঙ্কুল পর্ব্বতপথে তাহাদিগকে অনুসরণ করা ইংরাজ সেনার পক্ষে দুঃসাধ্য। একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ইংরাজের জয় অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু এই গোলযোগে যথেষ্ট জীবননাশ ও অর্থ ধ্বংশ হইয়া গেল। স্যার অক্‌ল্যাণ্ড কল্‌ভিন স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, লর্ড এল্‌গিনের পক্ষে শত্রুদলকে পরাভূত করা যত সহজ হইবে, ভারতবাসীদিগের অসন্তোষ উৎপাদন না করিয়া এই যুদ্ধে ব্যয় নির্ব্বাহ করা তাঁহার পক্ষে তত সহজ হইবে না।

লর্ড রবার্ট্‌স্ বলিতেছেন যে, আফগানিস্থানের আমীর ইংরাজের শত্রুদিগের পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন। একথা বিশ্বাস করিতে কোন ক্রমেই প্রবৃত্তি হয় না। ইংরাজের সহিত সদ্ভাবরক্ষায় আমীরের লাভ পূরা পাঁচসিকারও উপর। ইংরাজের সহিত শত্রুতা করিয়া বৎসরে বহুলক্ষ টাকার ভাতা বন্ধ করিবার মত মূর্খ হইলে আমীর অত বড় একটা রাজ্য শাসন করিতে পারিতেন না। লর্ড রিপণ বলিয়াছেন যে, আমীর অতি চতুর লোক; ইংরাজের সহিত তাঁহার সদ্ভাবের দৃঢ়তায় সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। লর্ড রবার্ট্‌স্ এখন অবশ্যই অপরের স্কন্ধে সকল দোষ চাপাইবার চেষ্টা করিবেন। "অগ্রসরনীতি" প্রবর্ত্তনে ও সম্প্রসারণে তিনি একজন প্রধান পাণ্ডা; এখন অপরের স্কন্ধে দোষ চাপাইয়া তিনি আপনাকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিতে বিশেষ চেষ্টিত। "স্যাটার্‌ডে রিভিউ" পত্রের লেখক সত্যই বলিয়াছেন, "Not in vain was the astute little man named, of his godfathers and godmothers, Steigh Roberts."

বর্ত্তমান সীমান্ত গোলযোগে আফ্রিদি ও ওরক্‌জাইদিগের নাম বিশেষরূপে বিজড়িত রহিয়াছে। আমরা এই ওরক্‌জাইদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করিলাম।—

পূর্ব্বে যেরূপে পার্ব্বত্য জাতিসকলকে আক্রমণ করা হইত, সেই প্রণালীতে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ও ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ওরক্‌জাইদিগকে আক্রমণ করা হইয়াছিল। ১৮৯১খৃষ্টাব্দে তাহারা প্রথম ইংরাজ সেনাদল প্রদত্ত শাস্তির মর্ম্ম বুঝে। শীতকালের মাঝামাঝি ইংরাজ সেনাদল ওরক্‌জাইদিগের আবাস স্থানে প্রবেশ করিয়া আড্ডা গাড়ে, তাহাদিগের গৃহাদি ভস্মসাৎ করিয়া দেয় ও তাহাদিগের শস্যাদি নষ্ট করে। তাহার পর সামানা গিরিশ্রেণীর অনেক স্থান দখল করিয়া বা সেই সকল স্থানে সেনানিবাস সংস্থাপন করিয়া, তবে সেনাদল চলিয়া আইসে। পর্ব্বতবাসীরা সেনাদিগকে আক্রমণ করে; পরাস্ত হইয়া তাহাদিগকে কঠোর শাস্তিভোগ করিতে হয়। এইখানে এ ব্যাপার শেষ হইলে ওরক্‌জাইদিগের ভয় থাকিত, ইংরাজের মান থাকিত, ভারতগবর্ণমেণ্টেরও এত অর্থ ব্যয় হইত না। কিন্তু শত্রু-দেশে ইংরাজের সেনানিবাস সংস্থাপন করাই স্থির হইল; কাজেই ওরক্‌জাইদিগের মনের আগুন নিবিতে পাইল না। ইহাতে দুই অনিষ্ট হইয়াছে,—প্রথমতঃ শত্রু-দেশে মুষ্টিমেয় ইংরাজ সেনা আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে,—অন্যত্র আবশ্যকের সময় তাহারা অকর্ম্মণ্য অবস্থায় থাকিবে; দ্বিতীয়তঃ ভারতগবর্ণমেণ্টের সৈনিক বিভাগের অতিরিক্ত ব্যয় আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন আর এক মহা অনিষ্ট হইয়াছে—ইংরাজ সেনাদল বুকের উপর বসিয়া থাকাতে ওরক্‌জাইদিগের মনের আগুন নিবিতে পাইতেছে না।

পার্ব্বত্য জাতিদিগের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করাই ভারত-গবর্ণমেণ্টের আবশ্যক। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ হইতে এ পর্য্যন্ত ভারত-সীমান্তে অধিকৃত অনুর্ব্বর প্রস্তরময় ৭৮,০০০ বর্গ-মাইল স্থান অধিকারে রাখিয়া ব্যয় বর্দ্ধিত করা গবর্ণমেণ্টের আবশ্যক নাই। আবার এই ৭৮,০০০ বর্গমাইল অধিকারে রাখিতে হইলে সেই অনুর্ব্বর অস্বাস্থ্যকর স্থানে আবার ৪০,০০০ সেনা সংস্থাপিত করিতে হয়। তাহা হইলে সীমান্তের শিলারাশির উপর বৎসর বৎসর কি পরিমাণ অর্থ ছড়াইতে হইবে, তাহা ভাবিলেও আতঙ্ক উপস্থিত হয়।

বর্ত্তমান গোলযোগের সময় আফ্রিদিরা ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট সোয়াট্ প্রদেশ ও সামানা গিরিশ্রেণী হইতে ইংরাজ সেনাদল অপসৃত করিবার প্রস্তাব করিয়াছে। ইংরাজের সোয়াট্ প্রদেশ অধিকার অল্প দিনের কথা; সামানা গিরিশ্রেণী অধিকারের বিষয় আমরা ওরক্‌জাইদিগের কথায় বলিয়াছি। ভারতগবর্ণমেণ্ট আফ্রিদিদিগের কথায় সম্মত হইবেন কি না সন্দেহ; তবে আফ্রিদিদিগের প্রস্তাবে এই গোলযোগের প্রকৃত কারণ জানা যাইতেছে। তাহাদিগের দেশ মধ্যে ইংরাজ সেনা সংস্থাপিত

হওয়ায় তাহাদিগের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। ইংরাজ তাহাদিগের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করায় তাহারা আপনাদিগকে অপমানিত বোধ করিয়া পদদলিত পন্নগের মত ইংরাজকে দংশন করিতে উদ্যত হইয়াছে। আফগানিস্থানের আমীর বা কোন ধর্ম্মোন্মত্ত মোল্লার স্কন্ধে দোষ চাপাইলে চলিবে না। ইহাতে আমীর নাই; ইহা কোন ধর্ম্মোন্মত্ত মোল্লার উত্তেজনায় হয় নাই;—পুনার ব্রাহ্মণগণ ও পার্ব্বত্য জাতিদিগের মধ্যে এ বিদ্বেষবহ্নি ব্যাপ্ত করে নাই, ইহা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুসৃত, বহু ব্যয়সাধ্য, বিজ্ঞজনের অননুমোদিত "অগ্রসরনীতি"র অবশ্যম্ভাবী ফল।

এখন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে সোয়াট্ প্রদেশের সঙ্গে সঙ্গে সামানা গিরিশ্রেণী হইতে ইংরাজ সেনাদল অপসারণের জন্য আফ্রিদিদিগের সহসা এত মাথা ব্যথা পড়িয়া গেল কেন? ইহার উত্তর অতি সহজ। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ওরক্‌জাইগণ ও ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে সোয়াটিরা যেরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, খাইবার গিরিশঙ্কটের নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য জাতিরাও সেইরূপ ব্যবহার পাইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই আফ্রিদিগণ ইংরাজের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, উমরাখাঁকে দমন বা দলন চেষ্টা কালে ভারতগবর্ণমেণ্ট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সে প্রতিজ্ঞা রক্ষিত না হওয়ায় পার্ব্বত্য জাতিরা আর ভারতগবর্ণমেণ্টকে বিশ্বাস করিতেছে না। যে ইংরাজজাতি সত্যপ্রিয় বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন; যে ইংরাজগণ ন্যায় ও সত্যের অনুরোধে অকাতরে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন; সে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ইহা অল্প লজ্জার কথা নহে। গবর্ণমেণ্ট প্রতিজ্ঞা পালন করিলে আজ এত গোলযোগ, এত অর্থনাশ ও এত শোণিতপাত হইত না।

এবার যে পরিমাণ পার্ব্বত্য জাতির সহিত যুদ্ধ করিতে, ভারতগবর্ণমেণ্টকে যেরূপ ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে, তাহাতে আশঙ্কিত হইবারই কথা। এবার সুশৃঙ্খলাসম্পন্ন ভারতসাম্রাজ্যের চারিদিক হইতে সেনাদল সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য—আবশ্যক হইলে সীমান্তের হৃদয়হীন শিলারাশির উপর হৃদয়ের শোণিত পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে; তাহাদের বীরত্ব দেখিয়া শত্রুমিত্র সকলেই বিস্মিত হইতেছেন। কি ভারতবর্ষীয়, কি ইংরাজ—ভারতগবর্ণমেণ্টের সেনা মাত্রই এবার অসাধারণ সাহস ও শিক্ষা দেখাইয়াছে। ইহাতেও আবার কোন কোন "অ্যাংলোইণ্ডিয়ান" সম্পাদক বড়ই অসন্তুষ্ট। ইংরাজ সৈনিকদিগের মধ্যে হত ও আহতদিগের নাম প্রকাশিত হয়, অথচ এবার যাহারা তাহাদিগের অপেক্ষাও অধিক এবং তাহাদিগের সমান বীরত্ব দেখাইতেছে, তাহাদিগের নাম কেহই জানিতে পারিতেছে না! কেবল তাহাদিগের কষ্টের বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়,—তাহাতেই "অ্যাংলোইণ্ডিয়ান" সম্পাদকগণ বলেন যে, ইহাতে "নেটীভ"দিগের স্পর্দ্ধা বাড়িয়া যাইতেছে;—তাহারা ভাবিতেছে যে, তাহারা নহিলে গবর্ণমেণ্টের চলিবে না!! একই সাম্রাজ্যের গৌরব রক্ষার জন্য যখন তাহারাও প্রাণ দিতেছে, তখন বর্ণের প্রভেদ লইয়া এইরূপ বালোচিত যুক্তি দেখাইয়া তাহাদিগের সম্বন্ধে এরূপ বিচার করা যে কতদূর সঙ্গত, আমরা তাহা বুঝিতে একেবারেই অশক্ত।

আমরা বলিয়াছি—এবার যে পরিমাণ পার্ব্বত্যজাতির সহিত যুদ্ধ করিতে ভারতগবর্ণমেণ্টকে যেরূপ ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে, তাহাতে আশঙ্কিত হইবারই কথা। এবার "বাঘ আসিতেছে," "বাঘ আসিতেছে" বলিয়া মিথ্যা চীৎকার হইয়াছে; কিন্তু যদি সত্যসত্যই একবার বাঘ আসিয়া উপস্থিত হয়—যদি সত্যসত্যই কখনও আমীর ইংরাজের বন্ধুত্ব ত্যাগ করিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে পর্ব্বতবাসী মুসলমান জাতিদিগের সহিত যোগদান করেন, তাহা হইলে ভারতগবর্ণমেণ্টকে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকেও কিরূপ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হইবে তাহা ভাবিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। আমীর ইংরাজের বন্ধু বলিয়া সকল কাবুলী যে ইংরাজের বন্ধু এমন প্রত্যাশা করা বাতুলের কল্পনা। "অগ্রসর নীতি"র অন্যতম প্রধান পাণ্ডা লর্ড রবার্ট্‌সের নিকট কাবুলীরা ভাল ব্যবহার পায় নাই। লর্ড রবার্ট্‌সের আফগান-অভিযান কালে যে সকল কাবুলী পথের উভয় পার্শ্বে স্বদেশীয়দিগের দোদ্দুল্যমান মৃতদেহ দেখিয়া নিস্ফল আক্রোশে দগ্ধ হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে অনেকে এখনও জীবিত আছে; লর্ড রবার্ট্‌সের পৈশাচিক আজ্ঞায় শাণিত কুঠারাঘাতে অধিবাসীদিগের গ্রাসাচ্ছাদনোপায় ফলের গাছ সকল কর্ত্তিত হইলে যে সকল হতভাগ্য গৃহহীন হইয়া অসীম

যাতনা ভোগ করিয়াছিল, তাহাদের সন্তানগণ জনকজননীর মুখে "আংরাজ বাহাদুরের" অখ্যাতি ভিন্ন সুখ্যাতি শুনে নাই,—শৈশব হইতে তাহাদিগের মনে ইংরাজের উপর ঘৃণা উৎপন্ন হইয়াছে। একজন ইংরাজের অবিমৃষ্যকারিতায় ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উপর তাহাদিগের এইরূপ ভাব হইয়াছে। আমরা সকলেই জানি যে ভারতগবর্ণমেণ্টের দানবের মত বল আছে; কিন্তু সেই দানববল যদি কখনও প্রয়োগ করা হয়, তবে দেশের কি অবস্থা হইবে তাহা বর্ণনীয় নহে—অনুমেয়।

প্রকৃত প্রস্তাবে পার্ব্বত্যজাতিরা স্বাধীন, তাহারা ভারতগবর্ণমেণ্টের অধীন নহে; তাহাদিগের সহিত বৃথা গোলযোগ বাধাইয়া সীমান্তে শত্রু বৃদ্ধি করা ভারতগবর্ণমেণ্টের উচিত নহে। "অগ্রসর নীতি" অনুসরণ করিয়া এরূপ ফলভোগ করা অনাবশ্যক ও অন্যায়। যাঁহার নামে ভারতবাসীরা আজিও মুগ্ধ সেই লর্ড রিপণ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারত-ঘৃণক সার লেপেল্ গ্রিফিন্ পর্য্যন্ত অনেকেই এই "অগ্রসর নীতি"র নিন্দা করিয়াছেন। সার লেপেল্ বলিয়াছেন যে, সৈনিকদলের লোকেরাই "অগ্রসরনীতি"র প্রধান পৃষ্ঠপোষক,—অথচ এ সম্বন্ধে মতামত প্রদানের মত অভিজ্ঞতা বা শিক্ষা তাঁহাদিগের নাই। তাঁহাদিগের মত লওয়া কেন? তাঁহাদিগকে ব্যয়ের ভাবনা ভাবিতে হয় না; কিন্তু পদোন্নতি ও পুরস্কারের যাহা কিছু আশা তাঁহাদিগেরই। উদারনৈতিকদলের দুইজন অগ্রণী—মিষ্টার জন্ মর্লী ও মিষ্টার আস্কুইথ প্রকাশ্য সভায় "অগ্রসরনীতি"র নিন্দা করিয়াছেন,—উদারনৈতিক প্রাধান্যকালে ভারতসচিব স্যার হেন্‌রী ফাউলারও বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের সীমান্ত নীতির নিন্দা করিয়াছেন।

দুই তিনটি মাত্র পার্ব্বত্যজাতির আক্রমণ হেতু প্রকৃত সীমান্ত হইতে কেবল ১৬০ মাইল মাত্র দূরবর্ত্তী চিত্রল রক্ষা করা যদি এমন কষ্টসাধ্য হয়, তবে যদি কখনও সত্যই রুশিয়ার সেনাস্রোত ভারতবর্ষের দিকে প্রবাহিত হয়, তবে তখন ব্যাপার যে নিতান্তই জটিল হইয়া উঠিবে, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। আবার প্রকৃত সীমান্ত অর্থাৎ দেশের সীমা ছাড়াইয়া ইংরাজ যে পরিমাণে অগ্রসর হইবেন—ইংরাজের অসুবিধা ততই বর্দ্ধিত হইবে; অপর পক্ষে আবার রুশিয়ার সুবিধা ততই অধিক হইবে। প্রকৃত সীমান্ত হইতে দূরবর্ত্তী স্থানে সমর মত সেনা, রসদ ও আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি প্রেরণ করা কিরূপ কঠিন, তাহা চিত্রল-অভিযানকালেই ভারতগবর্ণমেণ্টের বুঝা উচিত ছিল। সে সময় ডিরের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা ইংরাজের সাহায্য না করিলে অবরুদ্ধ সেনাদল ও "এজেণ্ট," কাহারও উদ্ধারের উপায় হইত কি না সন্দেহ। স্যার রবার্ট নো সেনাদল লইয়া যখন সেখানে উপস্থিত হইতেন, তখন তিনি দেখিতেন—ভারতসাম্রাজ্যের জন্য যাঁহারা জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের অস্থিরাশি তাঁহাদিগের শ্মশানে পরিণত বাসগৃহের চারিদিকে পড়িয়া আছে।

ইংরাজ যদি পার্ব্বত্যজাতি সকলের স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে ভারতগবর্ণমেণ্টের শত্রুতে পরিণত না করেন; তবে যদি কখনও রুশিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে সাহস করে, তখন তাহার সেনাদলের পক্ষে সঙ্কটসঙ্কুল গিরিশ্রেণী অতিক্রম করা যেরূপ দুঃসাধ্য হইবে, এই সকল পার্ব্বত্যজাতির আবাস স্থানের মধ্য দিয়া আসাও তেমনই দুঃসাধ্য হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে, এই সকল পার্ব্বত্য জাতির সহিত শত্রুতা না করিয়া ইহাদিগের সহিত সদ্ভাব সংরক্ষণেই ভারতগবর্ণমেণ্টের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আপাততঃ অনুসৃত "অগ্রসরনীতি"তে ইহার বিপরীত ফল ফলিতেছে। লর্ড লরেন্স প্রমুখ বিজ্ঞ শাসনকর্ত্তারা এই অনিষ্ট বুঝিয়াই "অগ্রসরনীতি" প্রবর্ত্তনের বিরোধী ছিলেন। আজ আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, তাঁহারা দূরদর্শী, বিচক্ষণ শাসনকর্ত্তার মতই কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে পথ দেখাইয়াছিলেন, সেই পথ পরিত্যাগ করিয়াই আজ আমাদিগের এত বিপদ।

যদি সেই পথ পরিত্যাগ করিয়াই আমাদিগের এত বিপদ হইয়া থাকে, তবে সেই পথে ফিরিয়া যাইনা কেন? "অগ্রসর নীতির" পৃষ্ঠপোষক দল হইতে ইহার দুই উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। প্রধান সেনাপতি স্যার জর্জ হোয়াইট বলেন,—"ইংরাজের ফিরিবার আবশ্যক নাই—যেখানেই কোন অসভ্যজাতি সভ্যজাতির সহিত সংস্রবে আসিবে, সেখানেই অসভ্যগণ সভ্য হইবে; পার্ব্বত্য জাতিরা ইংরাজের সংস্রবে আসিয়াছে, তাহারা সভ্য হইবে।" এই

যুক্তিকে হাস্যাস্পদ ভিন্ন আর কিছু বলিতে পারি না; যাহারা তোমাদিগের সভ্যতা চাহে না, যাহাদিগকে "সভ্য" করিবার চেষ্টা করিয়া তোমাদিগের জীবন নাশ ও দরিদ্র ভারতবাসীর অর্থনাশ হইতেছে, জোর করিয়া তাহাদিগকে সভ্য করিবার এত কি প্রয়োজন? তোমাদের সভ্যতা লইয়া তোমরা থাক—তাহাদিগের উপর কৃপাকটাক্ষপাত করিও না। ইহার পর আর এক উত্তর আছে,—রক্ষণশীলদলের অন্যতম নেতা, প্রধান মন্ত্রী লর্ড সল্‌স্‌বেরীর দক্ষিণ হস্ত মিষ্টার ব্যান্‌কোর বলেন—"যেখানে ইংরাজসেনা একবার পদার্পণ করিয়াছে, সেখান হইতে তাহাদিগকে অপসৃত করা হইবে না।" "খ্যাতিনাশের" কল্পিত ভয়ে যথাসম্ভব ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তাহাদিগকে সেখানে রাখিতে হইবে! জীবননাশ, অর্থধ্বংশ, দেশের দারিদ্র্য বৃদ্ধি, এ সকলের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া ইংরাজ সেনাদিগকে শত্রুদল মধ্যে রাখিতেই হইবে? ইহার উত্তরে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, কোন পথে যাইয়া সেপথ অন্যায় পথ বলিয়া বুঝিতে পারিলে সেপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করাই কর্ত্তব্য; তাহাতে অপযশ হওয়া দূরে থাকুক, বরং গৌরব বৃদ্ধি হয়। আবার কেহই ইংরাজকে এপথে যাইতে বলে না। সেনাগণ এই সীমান্ত সম্প্রসারণে সুখী নহে; এই সীমান্ত সম্প্রসারণে তাহাদিগকে যে অস্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিতে হয়, সেখান হইতে আসিতে পারিলে তাহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবে। পার্ব্বত্য জাতিরা এই সীমান্ত সম্প্রসারণের পক্ষপাতী নহে; বরং তাহাদিগের আবাসস্থান হইতে ইংরাজ সেনাদল অপসারিত হইলে তাহারা ইংরাজের সহিত বৈরীভাব ত্যাগ করিবে। ভারতবাসীরা এই সীমান্ত সম্প্রসারণের পক্ষাবলম্বী নহে;—ইহাতে তাহাদিগের দারিদ্র্যপীড়িত দেশ আরও দরিদ্র হইয়া যাইতেছে; ইহাতে তাহাদিগের ক্ষতি ভিন্ন লাভ কিছুমাত্র নাই।

"অগ্রসরনীতি" প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে ইংরাজগবর্ণমেণ্ট পার্ব্বত্যজাতি সকলের কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না; তাহারা কোনরূপ অত্যাচার করিলে তাহাদিগকে শাস্তি দিয়াই নিবৃত্ত হইতেন। ইহাতে পার্ব্বত্য জাতিরাও সন্তুষ্ট ছিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে যখন ভারতবর্ষে বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, তখন পার্ব্বত্য জাতিরাও ইংরাজের বিরুদ্ধাচরণ করিলে ইংরাজের দুর্দ্দশার আর সীমা থাকিত না;—তাহা হইলে পঞ্জাব ইংরাজের দুর্ব্বল হস্তচ্যুত হইত। সে সময় পার্ব্বত্যজাতিরা ইংরাজের সাহায্যই করিয়াছিল। যে সকল বিদ্রোহী সিপাহি পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় লইয়াছিল, ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের অনুরোধে পার্ব্বত্যজাতিরা সেই সকল হতভাগ্যকে বন্দী করিয়া ইংরাজরাজ্যে পাঠাইয়া দিয়াছিল। আবার শেষ আফগান যুদ্ধ কালে গিরিশঙ্কটবাসী একদল আফ্রিদি ভিন্ন অন্য কোন পার্ব্বত্যজাতিই ইংরাজের বিরুদ্ধাচরণ করে নাই; করিলে লর্ড রবার্টস্‌কে বেড়া আগুনে পুড়িতে হইত। "অগ্রসরনীতি" প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত পার্ব্বত্যজাতি সকলের এইরূপ সদ্ভাব ছিল।

আর "অগ্রসরনীতি" প্রবর্ত্তনের পর কি হইয়াছে? ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ করাতে সোয়াটিরা প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছে। সোয়াটিরা ও তাহাদিগের প্রতিবেশীগণ প্রথমে যুদ্ধ করে। শুনা যায় তাহাদিগের মধ্যে ২০০০ লোক নিহত হইয়াছে; ইহা হইতে বোধ হয় যে হত ও আহতের সংখ্যা প্রায় ৮০০০ হইবে। একটি পার্ব্বত্য জাতি স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য এতদূর করিতেছে দেখিয়া অন্যান্য পার্ব্বত্যজাতিরাও তাহাদিগকে সাহায্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে।—সীমান্ত প্রদেশে অনল শিখা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে সীমান্তে "অগ্রসরনীতি"র ইহাই অবশ্যম্ভাবী ফল।

"অগ্রসরনীতি" হইতে বহু অনিষ্ট উৎপাদিত হইয়াছে। সে সকল বিবেচনা করিলে একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, এই বহু অনিষ্টোৎপাদক "অগ্রসরনীতি" যত সত্বর পরিত্যক্ত হয় ততই মঙ্গল।

বর্ত্তমান গোলযোগে পাতিয়ালার মহারাজা, ঢোলপুরের মহারাণা, কুচবিহারের মহারাজা এবং স্যার প্রতাপসিংহ ইংরাজের পক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়া সাহস ও রাজভক্তি দেখাইয়াছেন। কুচবিহারের মহারাজার সাহস ও বীরত্ব কাহিনী বাঙ্গালীর গৌরবের কথা বটে।

কুচবিহারের মহারাজা।

এখন যে সকল দেশীয় ও বিদেশীয় সৈনিক এই সাম্রাজ্যের গৌরব সংরক্ষণের জন্য অকাতরে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতেছেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে পঞ্চ (Punch) পত্রে প্রকাশিত একটি কবিতার কয় ছত্র উদ্ধৃত করিয়া আমরা প্রবন্ধ শেষ করিব—

"Wherever there floats the Empire Flag,
Let the story be told and told.
Of the courage of men, who made no brag,
But died in their frontier-hold!
Died for a Queen they had never seen,
For an Empress who reigned a far.

* * * * *

* * * * *

Put down their lives for the common weal,
That makes all our Empire One.
And gives us the silent pride we feel,
When we speak of the unset sun."

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসুর প্রতি।

বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিম মন্দিরে
দূর সিন্ধুতীরে
হে বন্ধু গিয়েছ তুমি ;—জয়মাল্যখানি
সেথা হ'তে আনি
দীনহীনা জননীর অবনত শিরে
পরায়েছ ধীরে।

বিদেশের মহোজ্জ্বল মহিমাপ্রভায়
মণ্ডিত সভায়
বহু সাধুবাদধ্বনি নানা কণ্ঠরবে
শুনেছ গৌরবে।
সে ধ্বনি গম্ভীর মন্দ্রে ছায় চারিধার
হয়ে সিন্ধু পার।

আজি মাতা পাঠাইছে অশ্রুসিক্ত বাণী
আশীর্ব্বাদখানি
জগৎসভার মাঝে অখ্যাত অজ্ঞাত
কবিকণ্ঠে, ভ্রাতঃ।
এ শুধু পশিবে একা তোমারি অন্তরে
ক্ষীণ মাতৃস্বরে।

৪ঠা শ্রাবণ, ১৩০৪। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু।

ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরবের কথা উত্থাপিত হইলে আমরা সচরাচর আর্য্যঋষিগণের ধর্ম্মোন্নতি এবং আর্য্যমনীষিগণের দার্শনিক জ্ঞানের বিষয়ই ভাবিয়া থাকি। সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য, প্রভৃতির কথাও আমরা ভাবিয়া থাকি বটে, কিন্তু প্রধানতঃ পরমার্থতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব বিষয়ে ভারতের প্রাধান্যই সচরাচর আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের গৌরবের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু বর্ত্তমানকালে পণ্ডিতগণ যাহাকে বিজ্ঞান বলেন, তাহাতেও আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। প্রাচীন গ্রীক ও রোমকেরা পাটীগণিতের কোন উন্নতি করিতে পারেন নাই। কোন সংখ্যাবাচক অঙ্কের দক্ষিণে শূন্য বসাইলে তাহার মান দশগুণ বৃদ্ধি হয়, ইত্যাকার যে দশমিক অঙ্কপাত পদ্ধতি, সভ্যজগৎ তজ্জন্য প্রাচীন হিন্দুগণেরই নিকট ঋণী। এই পদ্ধতি ব্যতিরেকে পাটীগণিতের কোনও উন্নতি হইতে পারিত না। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আরবেরা বীজগণিতসম্বন্ধীয় হিন্দুগ্রন্থ অনুবাদ করেন; এবং পাইসা নিবাসী লিওনার্ডো উক্ত বিজ্ঞান আধুনিক ইউরোপে প্রবর্ত্তিত করেন। ত্রিকোণমিতিতেও হিন্দুগণ জগতের প্রথম শিক্ষাদাতা ছিলেন। জ্যামিতির আবিষ্ক্রিয়াও ভারতবর্ষেই হয়। গ্রীকগণ এই বিদ্যার অধিকতর উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এলাহাবাদ মিওর সেণ্ট্র্যাল কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ ডাক্তার টিব দেখাইয়াছেন যে ভারতবর্ষেই এই বিদ্যার সূত্রপাত হয়। প্রাচীন হিন্দুগণ স্বাধীনভাবে জ্যোতিষেরও অনেক উন্নতি করেন। জড়বিজ্ঞানও তাঁহাদের অনুশীলনের বিষয় ছিল। তাঁহারা নানাবিধ রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিতে জানিতেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে ;—

স্বর্ণমাক্ষিক, সৌবীরাঞ্জন, হরিতাল, তুথং (তুঁতেইতি-ভাষা) পুষ্পকাশীশ, কাশীশ, লৌহভস্ম, মণ্ডূর, রসকর্পূর, রসপর্পটী, স্বর্ণসিন্দূর ও মকরধ্বজ।

হিন্দুগণ দ্রাবণ, বাষ্পীকরণ, ভস্মীকরণ, ঊর্দ্ধপাতন, তির্য্যক্‌পাতন প্রভৃতি রাসায়নিক প্রক্রিয়া অবগত ছিলেন।

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, প্রাচীন হিন্দুগণ যে কেবল ধ্যানপরায়ণ ছিলেন, সংসারকে মায়াময় ভাবিয়া কেবল আত্মস্থ হইয়া বসিয়া থাকিতেন, তাহা নয়। তাঁহারা নানাবিধ বিজ্ঞানের চর্চ্চা ও উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু যেমন একজন ভূমিশূন্য ব্যক্তির পূর্ব্বপুরুষগণ জমীদার ছিলেন বলিয়াই তাঁহার উদরপূর্ত্তি হয় না, তেমনি ভারতের পূর্ব্বগৌরব স্মরণ করিলেই আমাদের মানসিক দরিদ্রতা দূর হইতে পারে না। গৌরবান্বিত নামের উত্তরাধিকারী হইয়া আলস্যে উদ্যমহীন ভাবে কালযাপন করা অতি হেয়; পূর্ব্বপুরুষগণের যশ উজ্জ্বলতর করিতে না পারি, অন্ততঃ উহার ঔজ্জ্বল্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

বহুশতাব্দীর পরাধীনতায় যে জাতীয় স্ফূর্ত্তিহীনতা, নৈরাশ্য ও অনুদ্যমের উৎপত্তি হয়, জাতীয় প্রতিভার অবনতির তাহা একটি প্রধান কারণ। অহার উপর আমাদের

দারিদ্র্য, উপযুক্ত শিক্ষার অভাব এবং শিক্ষা পাইলেও উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্রের অভাব আমাদিগকে আরও প্রতিভা-বিহীন করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু ব্রিটিষ শাসনে শিক্ষা এবং অন্যান্য কোন কোন বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় নানা বিষয়ে আবার ভারতের জাতীয় প্রতিভা পুনরুজ্জীবিত হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে।

আজ আমরা যাঁহার কথা লিখিতে বসিয়াছি, তিনি বিজ্ঞানবিষয়ে জাতীয়-প্রতিভাকাশে উষার রক্তিম রেখার মত। তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহার মূল্য প্রভূত; কিন্তু তিনি যে আশার আলো আমাদের হৃদয়ে জ্বালিয়াছেন, তাহা অমূল্য। তিনি জাতি-সমাজে আমাদের মুখ দেখাইবার পথ করিয়াছেন।

আমরা অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হই নাই। আমাদের ক্ষুদ্র কাগজে তদুপযুক্ত স্থান নাই। তদ্ভিন্ন সমসাময়িক ব্যক্তির জীবনচরিত লেখা বড় কঠিন। তাঁহার কার্য্যের, চরিত্রের ঠিক্ বিচারক এবং গুণগ্রাহী আমরা হইতে পারি না। যেমন চিত্রবিশেষের সৌন্দর্য্য অনুধাবন করিতে হইলে উহা হইতে কিছু দূরে যাইতে হয়, তেমনি কীর্ত্তিমানের কীর্ত্তি ঠিক্ বুঝিতে হইলে অনেক স্থলেই সময়ের দূরত্বের প্রয়োজন হয়। আর এক কথা,—

"History is half-dream—ay even
The man's life in the letters of the man."

সুতরাং প্রকৃত জীবনচরিত লেখা যে কত কঠিন, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে অধ্যাপক বসুর জীবনের কয়েকটি স্থূলস্থূল বিষয়ের উল্লেখ করিব মাত্র।

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু বিক্রমপুরের একটি প্রাচীন পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি পিতার একমাত্র পুত্র। কিন্তু—একচন্দ্রস্তমো হন্তি। তাঁহার ভগিনীগণ সকলেই সুশিক্ষিতা। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষাসমাপনার্থ বিলাত যাত্রা করেন। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে চিকিৎসা শিক্ষা করিয়া ভারতীয় সরকারী চিকিৎসা বিভাগে প্রবেশ করিতে পরামর্শ দেন; কিন্তু তিনি বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের মায়া কাটাইতে না পারিয়া কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন এবং তথায় সুবিখ্যাত ক্যাবেণ্ডিষ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে বিজ্ঞানানুশীলন করেন। তিনি ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কেম্ব্রিজের বি, এ, এবং লণ্ডনের বি, এস্‌সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কেম্ব্রিজে অবস্থান কালে তিনি পরলোকগত মহাত্মা ফসেট্ সাহেবের প্রীতিলাভে সমর্থ হন। ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়া তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে পদার্থ-বিজ্ঞানাধ্যাপক নিযুক্ত হন।

আমি তখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি। তিনি যখন অধ্যাপনা আরম্ভ করেন, তখন হইতেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের যান্ত্রিক প্রমাণ প্রদর্শনে বিলক্ষণ নিপুণহস্ত ছিলেন। সাধারণের মনোরঞ্জক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া প্রদর্শনে তিনি বরাবরই সিদ্ধহস্ত বলিয়া পরিচিত। আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রণালীর একটি দোষ এই যে, ইহাতে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মিবার কোন সুযোগ নাই। এই দোষ দূর করিবার জন্য বসু মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহ আছে। তিনি একদিন আমাদিগকে সন্ধ্যাকালে তাঁহার বাসভবনে যাইতে নিমন্ত্রণ করেন। তখন তিনি বৌবাজার ষ্ট্রীটে থাকিতেন। সেখানে আমাদের জন্য আহার্য্য দ্রব্যের প্রচুর আয়োজন ছিল। তিনি আমাদের সহিত নানা বিষয়ে বন্ধুভাবে অমায়িকতার সহিত কথোপকথন করেন, এবং রস্কিন্, প্রভৃতি গ্রন্থকারের লেখা কিছু কিছু পড়িয়া শুনান। আমার যতদূর মনে পড়ে, তাহাতে বোধ হয়, নিমন্ত্রিত ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই মিষ্টান্নের যথেষ্ট গুণগ্রহণ করিয়াছিল; কিন্তু আমাদের অধ্যাপক যে উদ্দেশ্যে আমাদিগকে ডাকিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম আমরা কতদূর বুঝিয়াছিলাম, তাহা মনে নাই। আমার দুর্ভাগ্য এই যে, তাঁহার বিজ্ঞানোৎসাহ আমার হৃদয়ে সঞ্চারিত হয় নাই।

বসু মহাশয় যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে আগমন করেন, তখন উহাতে পদার্থবিদ্যাবিষয়ক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি সামান্যরূপই ছিল। ইহারই যত্নে ক্রমে ক্রমে অনেক উৎকৃষ্ট যন্ত্র ক্রীত হওয়ায়, এখন তথায় পদার্থবিজ্ঞানের অনেক সূক্ষ্ম গবেষণা সম্ভবপর হইয়াছে।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে জগদীশ বাবু তাড়িত-বিকিরণ সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন। ঐ বৎসর মে মাসে On the Polarisation of the Electric Ray সম্বন্ধে তাঁহার একটি সন্দর্ভ বঙ্গদেশীয় রয়্যাল এসিয়াটিক্ সোসাইটির সমক্ষে পঠিত হয়। বৈজ্ঞানিক জগতে শীঘ্রই এই সকল গবেষণার প্রতি পণ্ডিতবর্গের নজর পড়ে। বর্ত্তমান যুগের প্রধান তাড়িত-তত্ত্বজ্ঞ লর্ড কেল্‌বিন্ আপনাকে "literally filled with wonder and admiration for so much success in these difficult and novel experimental problems" বলিয়া প্রকাশ করেন। লণ্ডনের টাইম্‌স্ পত্র বলেন;—

The originality of the achievements is enhanced by the fact that Dr. Bose had to do the work in addition to his incessant duties as Professor of Physical Science in Calcutta and with apparatus and appliances which in this country would be deemed altogether inadequate. He had to construct for himself his instruments as he went along. His paper forms the outcome of the twofold line of labour—construction and research.

বসু মহাশয়ের দ্বিতীয় সন্দর্ভ লর্ড রেলি কর্ত্তৃক রয়্যাল সোসাইটিতে প্রেরিত হয় এবং উক্ত সমিতির কার্য্যবিবরণের মধ্যে প্রকাশিত হয়। ইহার বিষয় ছিল "The Determination of the Indices of Refraction for the Electric Ray." এই সকল গবেষণার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া রয়্যাল সোসাইটি পার্লেমেণ্ট-প্রদত্ত একটি ফণ্ড হইতে বসু মহাশয়কে তাঁহার কার্য্যসৌকার্য্যার্থ কিছু অর্থসাহায্যের বন্দোবস্ত করেন। বাঙ্গলাগবর্ণমেণ্ট এই সকল গবেষণার সাহায্যার্থ একটি গবেষণা-ফণ্ড স্থাপিত করিয়া বসু মহাশয়কে তাঁহার অধ্যক্ষ করেন। তৎপরে ভারত-গবর্ণমেণ্টের সুপারিশে সেক্রেটরী-অব্-ষ্টেট্ এতদ্দেশে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার উৎকর্ষসাধনার্থ জগদীশ বাবুকে ইউরোপে প্রেরণ করেন। তদনুসারে তিনি সস্ত্রীক ইউরোপ যাত্রা করেন।

ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া জগদীশ বাবু ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের একটি অধিবেশনে "তাড়িত কম্পনের গুণাবলী নির্ণয়ার্থ একটি পূর্ণাঙ্গ যন্ত্র" সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন; এবং তাঁহার গবেষণা-কার্য্যে ব্যবহৃত যন্ত্র প্রদর্শন করেন। ইউরোপের প্রধান প্রধান পদার্থবিদ্যাবিদ্‌গণ তাঁহার শ্রোতা ছিলেন। তাঁহারা তাঁহার প্রবন্ধটি এরূপ আগ্রহের সহিত শুনিয়াছিলেন যে অধিবেশন স্থগিত করিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও তাঁহারা তাঁহাকে পাঠ করিয়া যাইতে নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করেন। অধ্যাপক বসু তাঁহার যন্ত্রের ক্রিয়ার যখন ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তখন লর্ড কেল্‌বিন্-প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ ঘন ঘন করতালি দিয়া আনন্দজ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

গ্লাস্‌গো নগরে লর্ড কেল্‌বিন্ অতিশয় হৃদ্যতা ও আদরের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি আদরের সহিত গৃহীত হন। বিলাতে থাকিতে থাকিতে তিনি আর একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্কার করেন। তিনি এতদ্বিষয়ক একটি প্রবন্ধ রয়্যাল সোসাইটির সমক্ষে পাঠ করেন। প্রবন্ধটির বিষয় "The selective conducdivity exhibited by certain Polarizing substances."

ইহার পর তিনি রয়্যাল ইন্‌ষ্টিটিউশনে শুক্রবাসরিক সান্ধ্য বক্তৃতা করিতে আহূত হন। যে খানে ডেবি, ফারাডে এবং টিণ্ড্যাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সেখানে একজন ভারতবর্ষীয় অধ্যাপক পদার্থবিদ্যার অতি দুরূহ একটি বিষয়ে সমবেত ইউরোপীয় প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর সম্মুখে বক্তৃতা করিতেছেন, ইহাকে একটি বিস্ময়কর ব্যাপার বলা যাইতে পারে।

সোসাইটি অব্ আর্ট্‌স্ নামক সমিতির এক অধিবেশনে তিনি ভারতবর্ষে-বিজ্ঞানশিক্ষা বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি উহাতে নিম্নলিখিত প্রস্তাব সমূহ উত্থাপিত করেন:—বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য বিজ্ঞানের পঠিতব্য বিষয়ের সংখ্যার হ্রাস, বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপন, গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক উচ্চতর বিষয়ের অনুশীলনার্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিগণের জন্য বৃত্তি স্থাপন এবং সরকারী নানা বিভাগে বৈজ্ঞানিকশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের নিয়োগ। উক্ত প্রবন্ধে তিনি ভারতবাসীগণের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার শক্তির প্রমাণ স্বরূপ অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের পারদ সম্বন্ধীয় আবিষ্ক্রিয়াগুলির উল্লেখ করেন। শ্রীযুক্ত জ্যোতিভূষণ ভাদুড়ীর রাসায়নিক গবেষণারও উল্লেখ করেন। উক্ত প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি বলেন:—

"I have not yet said anything of the intellectual hunger that has been created by the spread of education, a hunger which is as imperative as that of the physical body. The *Spectator*, in a recent article, has well remarked that an educated man in my country wants something absorbing to think about. His intellect is at present left to consume itself, there being no vent for his useless energies. If it could be done, he would betake himself "ardently, thirstily, hungrily, to the research into Nature, which can never end, yet is always yielding results, upon which yet deeper inquiries can be based." We have been called a nation of dreamers. There is a necessity for dreamers to think out the great problems of life, and make the world richer by their thoughts. But there is room for workers, too, toilers who by incessant work would increase the

bounds of human knowledge. We want to have our share in this work. Our ancesstors did at one time contribute to enrich the stock of the world's knowledge, but that is so long past, that it is almost forgotten now. It would perhaps not be an unworthy work for England to help us to take our place again among the intellectual nations of the world."

বিলাতী প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে তাঁহার প্রস্তাবগুলি সমর্থিত হয়। লর্ড লিষ্টার, লর্ড কেল্‌বিন্ প্রভৃতি সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ ভারতীয় সেক্রেটরী অব্ ষ্টেটের নিকট ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগৃহ স্থাপনার্থ এক আবেদন করেন। সেক্রেটরী অব্ ষ্টেটের সহিত অধ্যাপক বসুর যখন সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি সেক্রেটরী মহোদয়কে বলেন, যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কার্য্যে পরিণত হইলে ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থার বিস্তর উন্নতি হইতে পারে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক জীবনধারণার্থ কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভর করে। কৃষি বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে; অথচ বৃষ্টির পরিমাণ অনিশ্চিত। অপর দিকে অনেক ভারতবর্ষীয় যুবক বৈজ্ঞানিক শিক্ষা লাভ করিয়া কোন কাজ না পাইয়া আলস্যে কালযাপন করে। নানা প্রকার শিল্পের উন্নতি হইলে, ইহারাও কাজ পাইবে, এবং ভারতবর্ষের অধিকাংশ অধিবাসীকেও কেবল কৃষির উপর নির্ভর করিতে হইবে না।

জর্ম্মনীতেও অধ্যাপক বসুর বিলক্ষণ আদর অভ্যর্থনা হইয়াছিল। কীল্ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি উহার সদস্যগণের সমক্ষে বক্তৃতা করিবার জন্য আহূত হন। বার্লিন নগরে তিনি বহুসংখ্যক বৈজ্ঞানিক শ্রোতার সমক্ষে বক্তৃতা করেন। তৎপরে তিনি হল্ ও হাইডেলবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন। ফ্রান্সেও তিনি অনেক বৈজ্ঞানিক পরিষদের সম্মুখে বক্তৃতা করিতে নিমন্ত্রিত হন। তাঁহার আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলির বৃত্তান্ত ফ্রান্সের প্রধান বৈজ্ঞানিক সভার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। উহার সভ্যগণ তাঁহার অভ্যর্থনা করেন, এবং তৎকৃত কার্য্যের সমুচিত প্রশংসা করেন।

বসু মহাশয় যে যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা দ্বারা অনেক দুরূহ তত্ত্বের অনুসন্ধান হইতে পারিবে। ফরাসি দেশে এবং আমেরিকার মিষিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ যন্ত্র বিবিধ নূতন গবেষণার জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। দূরে সংবাদ প্রেরণ করিবার জন্যও যে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইতে পারিবে, এ সম্বন্ধে দুই বৎসর পূর্ব্বে বিলাতের প্রসিদ্ধ *Electrician* পত্রিকায় এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। *Electrical Engineer*ও এই যন্ত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"It is worth remark that no secret was at any time made as to its construction, so that it has been open to all the world to adapt it for practical and possibly money-making purposes."

ইম্পীরিয়াল ইন্‌ষ্টিটিউটে জগদীশ বাবু যে বক্তৃতা করেন, তাহার পর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার হেন্‌রী রস্কো বলেন :—

"I am sure I express the feelings of all present, when I say that we have been listening to one of the most remarkable and interesting lectures that we have ever heard. * * * I am sure you cannot have listened to what he has said without feeling that the work which he has done has been of the highest order, and it shows that eastern people are equally capable of making great scientific discoveries, and of becoming great experimentalists as those who live in the West. * * Really, if our rulers understood the trend of thought and action in the future, they would be rather more willing to place funds at the disposal of men like Dr. Bose for the purpose of rendering service to Science, and therefore rendering service to their country."

লর্ড রে বলেন :—

"I am quite sure that we shall envy the students of the Presidency College at Calcutta in having a professor who can explain with such extraordinary lucidity the most complicated problems of physical science."

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার জন্য তাঁহাকে ডি, এস্‌সি, উপাধি দিয়াছেন।

অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু সম্বন্ধে বিলাতের বিখ্যাত *Spectator* পত্রে একটি সুন্দর প্রবন্ধ বাহির হয়। আমরা তাহার কোন কোন স্থল উদ্ধৃত করিতেছি।

"There is, however, to our thinking something of rare interest in the spectacle then presented, of a Bengalee of the purest descent possible lecturing in London to an audience of appreciative European savants upon one of the most recondite branches of the most modern of the physical sciences. It suggests at least the possibility that we may one day see an invaluable addition to the great army of those who are trying by acute observation and patient experiment to wring from Nature some of her most jealously guarded secrets."

এস্থলে বলা আবশ্যক যে বিলাতের Spectator ভারতবাসীদিগকে এতকাল অসূয়ার চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। উক্ত পত্রের পূর্ব্বমতের এখন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ভারতবাসীর মানসিক শক্তি সম্বন্ধে এখন লিখিয়াছেন,—

"He has just the burning imagination which could extort truth out of a mass of apparently disconnected facts; a habit of meditation without allowing the mind to dissipate itself, such as has belonged to the greatest mathematicians and engineers and a power of persistence—which is something a little different from patience—such as hardly belonged to any European. We do not know Professor Bose, but if he is like the thoughtful among his countrymen, as of course he must be, we venture to say, that if he caught with his scientific imagination a glimpse of a wonder-working "ray" as yet unknown to man but always penetrating ether, and believed that experiment would reveal its properties and potentialities, he would go on experimenting ceaselessly through a long life, and dying, hand on his task to some successor, be it son or be it disciple. Just think what kind of addition to the means of investigation would be made by the arrival within the sphere of inquiry of men with the *Sunyasee* mind, the mind which utterly controls the body and can meditate or inquire endlessly while life remains, never for a moment losing sight of the object, never for a moment letting it to be obscured by any terrestrial temptation. We can see no reason whatever why such a minds, turning from absorption in insoluble problems, should not betake itself ardently, thirstily, hungrily, to the research into Nature which can never end, yet is always yielding results, upon which yet deeper inquiries can be based. If that happened—and Professor Bose is at all events a living evidence that it *can* happen, that we are not imagining an inapossibility—that would be the greatest addition ever made to the sum of the mental force of mankind."

জগদীশ বাবু বালকবালিকাগণের শিক্ষাকার্য্যে বিশেষ আগ্রহশীল। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার ও আমি তাঁহারই উৎসাহে শিশুদের জন্য "মুকুল" নামক সচিত্র মাসিক পত্র প্রকাশের উদ্যোগ করি। অল্পদিন হইল তিনি এক পত্রে "মুকুলের" উন্নতিকল্পে আমার কয়েকটি কথা লিখিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ আছে। আমার যতদূর মনে পড়ে, তিনি ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রথমে "সঞ্জীবনী" পত্রিকায় একটি বাঙ্গালা প্রবন্ধ লেখেন। উহাতে ফসেট্ পরিবারে তিনি যে আদর ও প্রীতি পাইয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ ছিল। তাহার পর আমি যখন "দাসী"র সম্পাদক ছিলাম, তৎকালে উক্ত পত্রিকায় তিনি "ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে" নামক একটি এবং "কলুঙ্গার যুদ্ধ" সম্বন্ধে আর একটি প্রবন্ধ লেখেন। পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধটি সম্বন্ধে "সাহিত্য" সম্পাদক নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেন :—'"ভাগীরথীর উৎসসন্ধানে" একটি সুন্দর প্রবন্ধ। লেখক কবিতার ভাষায়, গানের ঝঙ্কারে, বিজ্ঞানের গভীর তত্ত্ব গল্পের মত বর্ণনা করিয়াছেন।' এই প্রবন্ধের একটি স্থান এখনও আমার মনে আছে। তাহা এই :—

"সেই দুই দিন বহু বন ও গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া, অবশেষে তুষার-ক্ষেত্রে উপনীত হইলাম। নদীর ধবল সূত্রটী সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া এপর্য্যন্ত আসিতেছিল, কল্লোলিনীর মৃদুগীতি এতদিন কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল; সহসা যেন কোন ঐন্দ্রজালিকের মন্ত্রপ্রভাবে সে গীত নীরব হইল, নদীর তরল নীর অকস্মাৎ কঠিন নিস্তব্ধ তুষারে পরিণত হইল। ক্রমে দেখিলাম, স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড উর্ম্মিমালা প্রস্তরীভূত হইয়া রহিয়াছে; যেন ক্রীড়াশীল চঞ্চল তরঙ্গগুলিকে কে "তিষ্ঠ!" বলিয়া অচল করিয়া রাখিয়াছে। কোন মহাশিল্পী যেন সমগ্র বিশ্বের স্ফটিকখনি নিঃশেষ করিয়া এই বিশাল ক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের মূর্ত্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন।"

তিনি একবার আলমোরা হইতে যে তুষার-নদী (glacier) দেখিতে যান, ইহা তাহারই বর্ণনা। ইহার পর তিনি "সাহিত্যে" "আকাশস্পন্দন ও আকাশসম্ভব জগৎ" শীর্ষক একটি এবং "মুকুলে" "গাছেরা কি বলে" শীর্ষক দুইটি প্রবন্ধ লেখেন। সকলগুলিরই ভাষা মনোজ্ঞ, বিশুদ্ধ ও কবিত্বপূর্ণ। বাস্তবিক কবির কল্পনা ও বৈজ্ঞানিকের কল্পনা সচরাচর লোকে যেরূপ বিভিন্ন প্রকারের মনে করিয়া থাকে, তাহা নয়। কি সৌন্দর্য্য-রচনা, কি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার, উভয়েই কল্পনার প্রয়োজন। কল্পনা ব্যতিরেকে নূতন কিছু গঠিত বা সৃষ্ট হইতে পারে না। জগদীশ বাবুর মুখচ্ছবিও কবিরই মত। শুষ্ক বৈজ্ঞানিকের মত নয়।

তাঁহার বাঙ্গালাসাহিত্যানুরাগের কথা বলিলাম। ইহা বলাও বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন হইবে না যে, তিনি বাঙ্গালা ভাষার কথা কহেন; কারণ, যাঁহারা কখনও জাহাজে উঠেন নাই, এরূপ অনেক ইংরাজীশিক্ষাভিমানী এখনও বাঙ্গালা লিখন, পঠন, এবং উক্ত ভাষায় পত্রালাপ, এমন কি কথোপকথন পর্য্যন্ত, লজ্জাকর, অন্ততঃ সঙ্কোচের কারণ, মনে করেন। অন্যান্য বিষয়েও জগদীশ বাবুর "সাহেবিআনা" কম; কিন্তু ইংরাজ-সুলভ সদ্‌গুণের অভাব নাই।

জগদীশ বাবু গৃহে ধুতি পরেন; কলেজে ইংরাজের পোষাক পরিয়া আসেন না; হ্যাট পরেন না। হ্যাটটী হজমীগুলি বিশেষ। ইহা দ্বারা, বিশেষতঃ রেলের গাড়ীতে, জাতি, জন্ম, বর্ণ, শিক্ষা ও পদগত অনেক "খুঁত" ঢাকিয়া যায়। শুনিয়াছি কোন কোন ব্যবসায়ে ও চাকরীতে ইহা না পরিলে চলে না। অতএব, হ্যাটের অগৌরব করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি কেবল জগদীশ বাবুর পোষাকবিষয়ক রুচির কথা বলিতেছি।

জগদীশ বাবু সৌন্দর্য্যানুরাগী। এ সম্বন্ধে একটি কথা

মনে পড়িল। তাঁহার বাড়ীতে আমি একবার টেনিসনের "নির্ঝরিণী" (The Brook) নাম্নী কবিতার বর্ণনানুযায়ী কতকগুলি চিত্র দেখিয়াছিলাম। আমার যতদূর মনে পড়ে, সেগুলি তিনি কাশ্মীর ভ্রমণকালে নানা দৃশ্য হইতে ফটোগ্রাফ করিয়া তুলিয়া আনিয়াছিলেন।

অধ্যাপক ও ছাত্রের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, তাহার বন্ধন তিনি সর্ব্বদাই স্বীকার করেন। অপর লোকের সহিত ব্যবহারেও তিনি অমায়িক ও নম্রপ্রকৃতি। আমি তাঁহাকে "প্রদীপে" লিখিতে অনুরোধ করায় তিনি এই মর্ম্মে আমায় পত্র লিখিয়াছিলেন ;—"আমি তোমার কাগজে লিখিতে পারিলে বাস্তবিকই সুখী হইতাম, কিন্তু নানা কার্য্যে জড়িত হইয়া আমি এখন অনেক সুখে বঞ্চিত হইয়াছি। আমি যে কার্য্যে বৃত হইয়াছি, তাহার কুল-কিনারা দেখিতে পাইনা—অনেক সময়েই কেবল অন্ধকারে ঘুরিতে হয়। বহু ব্যর্থ প্রযত্নের পর কদাচ অভীষ্টের সাক্ষাৎ পাই।"

পরিশেষে বক্তব্য এই যে "প্রদীপে" যে চিত্র প্রকাশিত হইল, তাহা জগদীশ বাবুর সর্ব্বাপেক্ষা আধুক ছবি।

কলিকাল।

দশম পরিচ্ছেদ।

এই খানে একটু পূর্ব্বাভাষের প্রয়োজন। জয়কালী হইতেছেন, শিবচরণের দ্বিতীয় পক্ষের সংসার। প্রথম পক্ষের পরিচয় আগে দেওয়া হয় নাই, এখন দিতে হইতেছে।

উনিশ বৎসর বয়সে শিবচরণের প্রথম বিবাহ হয়। শিবচরণের প্রথমা স্ত্রীর নাম উর্ম্মিলা, অথবা, এমনই একটা কিছু ; কিন্তু, নাম সংক্ষেপের জন্যই হোক, অথবা আদর করিয়াই হোক, উর্ম্মিলার পিত্রালয়ে সকলে তাহাকে 'উমা' বলিয়া ডাকিত। উমার পাঁচ বৎসর বয়সে তাহার মা ইহলোক ত্যাগ করিয়া যান। উমার পিতা, 'গৌরীদানের' ফল লাভ করিবার জন্য, নয় বৎসর বয়সে, একমাত্র কন্যা উমাকে শিবচরণে সম্প্রদান করিয়া সংসারের সব মায়া কাটাইয়া কাশীবাসী হন। উমা সেই নয় বৎসর বয়সেই কনকাঞ্জলির সঙ্গে সঙ্গে পিত্রালয়ের সমস্ত সম্পর্ক-সূত্র ছিন্ন করিয়া শ্বশুরকুলে 'অচলা' গৃহলক্ষী রূপে বিরাজিতা হইল। শিবচরণের বিবাহের কিছুদিন মাত্র পূর্ব্বে তাঁর অষ্টম বর্ষীয়া ভগ্নি রমা অকালে মার কোল শূন্য করিয়া গিয়াছিল। উমা যখন কচি মুখে 'মা' বলিয়া শিবচরণের শোকসন্তপ্তা জননীর কোলে উঠিল, তখন সেই মধুর কণ্ঠে, সেই কোমল স্পর্শে জননী যেন রমাকেই ফিরিয়া পাইলেন। এত দিনে জননীর সেই শূন্য বক্ষ উমা আসিয়া পূর্ণ করিল। এতদিনে মাতৃহীনা দুঃখিনী কন্যা, কন্যাহারা জননীর কোল পাইল। শিবচরণের বিবাহের পর হইতেই তাঁহার পিতা হরিচরণ রায়ের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল হইতে আরম্ভ হয়। তাই রায় মহাশয়ও পুত্রবধূকে সুলক্ষণাজ্ঞানে, বড়ই স্নেহ করিতেন। এইরূপে শ্বশুরালয়ে, উমা, বড় আদরের আদরিনী হইয়া সুখে কাটাইতে লাগিল। তবে মাঝে মাঝে তার পিতার জন্য মনটা বড়ই অধীর হইয়া উঠিত, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহাও সহিয়া গেল। বিবাহের তিন বৎসর পরে, উমা দারুণ পিতৃশোক পাইল। সে শোকে বালিকা প্রথমে বড়ই অভিভূত হইয়াছিল কিন্তু ক্রমে তাহাও সহিল। সময়ে সব সয়!

* * * *

শিবচরণের বিবাহের পর দশ বৎসর মধ্যে তাহার আর দুইটী সহোদর জন্ম গ্রহণ করে। উমা সেই দেবরদ্বয়কে 'কোলে পিঠে' করিয়া মানুষ করিল। এই দশ বৎসরের পর, আরও দুই বৎসর রায় পরিবারের দিন এক প্রকার সুখে কাটিল। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখে কাহারও দিন কাটে না। সহসা রায় মহাশয় কঠিন পীড়াগ্রস্থ হইয়া গৃহে আসিলেন। সে পীড়া হইতে আর মুক্ত হইতে পারিলেন না। গঙ্গাতীরে সজ্ঞানে ৫১ বৎসর বয়সে, তাহার জীবন দেহবিমুক্ত হইল। রায় পরিবার অপার শোকসাগরে ভাসিল।

রায় মহাশয় 'মোটা ভাত' 'মোটা কাপড়ের' সংস্থানোপযোগী "জোতজমা" এবং গৃহিনীর হাতে কিছু নগদ টাকাও রাখিয়া গিয়াছিলেন!

শিবচরণ, রায় মহাশয় বর্ত্তমানেই তাঁহার চেষ্টায় কোন জমিদারের অধীনে একটী সুবিধামত কাজ পাইয়াছিলেন, কিন্তু রায় মহাশয়ের মৃত্যুর পর নানা কারণে শিবচরণকে সে কাজ ছাড়িতে হইয়াছিল! চাকুরীকে শ্ববৃত্তি বলিয়া ঘৃণা করিয়াই হোক অথবা ব্যবসার দ্বারা লক্ষ্মীর অনুগ্রহ এককালে অধিকমাত্রায় পাইবার আশাতেই হোক, শিবচরণ কোন ব্যবসায় অবলম্বন করাই শ্রেয় জ্ঞান করিলেন। অনেক ভাবনা চিন্তা, যুক্তি পরামর্শের পর কন্‌ট্রাক্টারী করাই স্থির হইল। স্বর্গীয় রায় মহাশয়ের কর্ম্মস্থলে, বেশ পশার প্রতিপত্তি ছিল, অনেক সাহেবসুবাও তাঁহার খুব খাতির করিতেন। সম্প্রতি সে অঞ্চলে রেলওয়ের কার্য্য আরম্ভ হইতেছে জানিয়া শিবচরণ মাতার নিকট হইতে কিছু টাকা লইয়া শুভদিনে শুভক্ষণে বিদেশ যাত্রা করিলেন। এই শুভযাত্রা নিতান্ত নিষ্ফলে যায় নাই। এক বৎসর মধ্যেই শিবচরণ বেশ দুপয়সা লাভ করিলেন। কৃতিত্ব-গর্ব্বিত পুত্রের স্মিতমুখে লাভের কথা শুনিয়া, মা বলিলেন—"বাবা স্ত্রী ভাগ্যে ধন, বৌমার পরে তুই রাজরাজেশ্বর হ'বি।" কর্ত্তা ব'লতেন্ "বৌমাই আমাদের লক্ষ্মী!"

'লক্ষ্মী না হোক তাহার বাহন বটে' মনে মনে একথা ভাবিয়া, চানক্য শিষ্য শিবচরণ একটু হাসিলেন—'স্ত্রী-ভাগ্যে ধন' কি ভ্রম! এই অসার যুক্তির কথা শুনিয়াই, শিবচরণ একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়াছিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

উমা সুন্দরী নহে, তবু তাহার মুখে এমন একটু লাবণ্য ছিল, এমন একটু সরলতা ছিল, যাহাতে সে সহজেই লোকের সুদৃষ্টিতে পড়িত। তাহার নয়নের সে সস্নেহ দৃষ্টি, মধুর অধরের মধুর হাসিটী সকলেরই স্নেহ আকর্ষণ করিত। শাশুড়ী ত দূরের কথা, প্রতিবেশিনী অনেক "ননদিনীর" মুখেও উমার প্রশংসা ধরিত না। শাশুড়ী, আত্মীয়া কুটম্বিনী সকলেরই কাছে বলিতেন, "রূপে কি করে বল, এমন গুণের বৌ কিন্তু কারও হয় না" বাস্তবিক, উমার হৃদয়খানি, ভক্তি, প্রেম ও স্নেহে পূর্ণ! তত সহিষ্ণুতা, তত অমায়িকতা তেমন সরল ও উচ্চমন সংসারে বড় বেশী দেখা যায় না। সে প্রেম ও সহিষ্ণুতাগুণে, শিবচরণের উদ্দাম হৃদয়ও কিছু দিনের জন্য বাঁধা পড়িয়াছিল! উমার গুণে আকৃষ্ট হইয়াই শিবচরণ উমার প্রতি একটু 'কৃপা' করিতেন। প্রেমময়ী উমা, তাহাতেই ধন্যা হইত। সে "অতশত" বুঝিত না—সে কেবল প্রাণভরিয়া ভালবাসিতেই শিখিয়াছিল। সে জানিত স্বামী, স্ত্রী, অভিন্নপ্রাণ, দুই দেহ মাত্র! এযে ভালবাসারই সম্বন্ধ! স্বামী-স্ত্রীর ভিতর যে ভালবাসার ন্যূনতা থাকিতে পারে, উমার ইহা ধারনাই ছিল না। তাই শিবচরণ যে তাহাকে আন্তরিক ভালবাসেন না, এ সন্দেহ তাহার মনে বহুদিন পর্য্যন্ত একদিনের জন্যও উদয় হয় নাই। সে আপন সুখস্বপ্নে আপনি ভোর থাকিত। শাশুড়ীকে ভক্তি করিয়া, দেবরদের অপত্য-নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিয়া, স্বামীকে সমস্ত প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়া সে আপন জীবনকে মধুর করিয়া তুলিয়াছিল। শাশুড়ীঠাকুরাণী উমার গুণে এতটা মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, ঘরসংসার, টাকাকড়ি, ছোট ছেলে দুটী সবই বধূর হাতে সঁপিয়া নিশ্চিন্ত মনে সারাদিন হরিনাম লইয়াই থাকিতেন।

কিন্তু বড় সাধেও বাদ পড়ে। দেখিতে দেখিতে উমার সন্তান হইবার সময় অতীত হইয়া গেল, তবু সন্তান হওয়ার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। শাশুড়ী সদাই দেবতাকে মানিতেন "ঠাকুর, বৌমা আমার যেন শীঘ্রই ছেলের মা হন!" উমার তেইশ বৎসর অতীত হইয়া গেল, সন্তান হইবার আশাও ক্রমে ফুরাইল! প্রবীণা প্রতিবেশিনীগণ রায় গৃহিণীর নিকট বেড়াইতে আসিলেই ঐ কথা উঠিত। উমার সন্তান না হওয়ায় যেন সকলেই বিশেষ দুঃখিত। কেহ বা বলিতেন—"সৃষ্টিধর বড়ছেলে, তার ছেলে না হ'লে কি চলে?" কেহবা উপদেশের মাত্রা একটু বাড়াইতেন। শুনিয়া গৃহিণী অপ্রতিভ হইয়া জিভ কাটিতেন! বলিতেন—"না না অমন কথা বলোনা, অমন সতীলক্ষ্মী বৌ আমার, ওর মনে যাতে কষ্ট হয় তা কি কত্তে আছে ; শিবুর ছেলে নাইবা হ'ল, সুকু, ভুপু বেঁচে থাক্, তাদের ছেলেপিলে হবে!" শাশুড়ীর সহিত প্রতিবেশিনীদের এ সমস্ত কথা যে শাখাপল্লবিত হইয়া উমার কানে উঠিত, একথা না বলিলেও চলে।

যে সকল প্রতিবেশিনী আপনা হইতেই নিষ্কামভাবে, রায়গিন্নিকে শিবচরণের পুনরায় বিবাহ দিবার পরামর্শ দিতেন, তাঁহাদের মধ্যেই কেহ কেহ গিন্নির অসাক্ষাতে অতি গোপনে উমাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতেন, "আহা, এমন বৌ, ছেলে হ'ল না বলেই কি সতীন গলায় বেঁধে দিতে হয় গা, কে জানে বাপু মাগীর কি আক্কেল!" কেহ বা উমার ব্যথার ব্যথী হইয়া তাহার দুঃখে সহানুভূতি করিয়া বলিতেন, "মা, মেয়ে মানুষ বাঁজা হলে সবই মিথ্যে। ছেলে না হলে স্বামী বল, শাশুড়ী বল, কেউ আপনার হয় না। এই বেলা ঠাকুর দেবতাকে মান, ঔষধ পালা ব্যবহার

কর, নইলে সতীনের হাততোলায় থাকৃতে হবে মা।” ইত্যাদি ইত্যাদি। উমা প্রথমে এতটা ভাবে নাই, একটী ছেলে হইলে বড় সুখের হয়, মাঝে মাঝে তার শুধু এইটীই মনে হইত। কিন্তু সন্তান না হইলে যে, স্বামীর স্নেহেও বঞ্চিত হইতে হয়, আগে সে এতটা ভাবিতে পারে নাই! এখন স্বামীকে একটু বিমর্ষ দেখিলেই উমা মনে করিত, বুঝি সন্তান না হওয়াতেই, স্বামী তার এমন বিষণ্ণ! শিবচরণ যদি কখনও কোন শিশুকে কোলে লইয়া আদর করিতেন, উমার তখনই মনে হইত, “হতভাগিনী আমি, আমি ত আমার স্বামীকে এ রত্ন উপহার দিতে পারিলাম না!” উমা এইজন্য সদাই যেন কত অপরাধিনী! দুটী বেলায় গললগ্নীকৃতবাসে, ষষ্ঠীতলায় সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া উমা প্রার্থনা করিত,—“মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর মা! দুঃখিনী বলে যেন পায়ে ঠেল না মা!”

তোমরা শুনিলে হাসিবে, উমা বিড়ালকেও প্রণাম করিত। সে যে ষষ্ঠীর বাহন! কিছু দিন আগে এই উমাই স্বয়ং ষষ্ঠীদেবীরও কোন ধার ধারিত না! আর আজ, আজ পাথর, নুড়ি, “ঢিবি” উমার কিছুই বাদ যায় না, সবই তার প্রণম্য! এক এক করিয়া উমা স্বর্গের তেত্রিশ কোটী দেবতা, মর্ত্ত্যের অসংখ্য দেবদেবী সকলকেই “মানিল।” কিন্তু কই, কেহই ত মুখ তুলিয়া চাহিলেন না!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পাঁচ জনের পাঁচ কথায় উমার প্রফুল্ল মুখ-কমল দিন দিন শুখাইয়া উঠিতে লাগিল। কথা ফুটিবার আগেই যে হাসি শুভ্র জ্যোৎস্নার মত ফুটিয়া উঠিয়া মুখ-কমল বিকাশিত করিয়া তুলিত, সে হাসি দিনে দিনে অধরপ্রান্তে মিলাইতে লাগিল। দিনে দিনে সেই হাস্যময়ী প্রেম প্রতিমায়, ঘোর বিষাদের ছায়া পড়িতে আরম্ভ হইল। সংসারের কাজে উমার আর তেমন মন লাগে না, সদাই যেন অন্যমনা, পদে পদে সব ভুল হইয়া যায়। এই যে এতটা পরিবর্ত্তন, ইহা কি শুধু পাঁচ জনের পাঁচ কথাতেই হইয়াছিল? বুঝি ঠিক তাহা নহে, ইহার ভিতর আরও কথা ছিল! এতদিনে উমা স্বামীর প্রকৃত মনের ভাব কতকটা বুঝিতে পারিতেছিল, সে বুঝিয়াছিল, তাহার অস্তোন্মুখ যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর স্নেহেও ভাটা ধরিয়াছে। যে অপত্য-স্নেহ, এরূপ দাম্পত্য-প্রেমের ভাটার দিনেও হৃদয় জোয়ারে পূর্ণ করিয়া রাখে, এ দম্পতীর সে অমৃত-প্রবাহ ছিল না। তাই উমা দিনে দিনে এখন স্বামীর বিশুষ্ক হৃদয়ের পরিচয় পাইতে লাগিল। উমার কপালগুণে, দেবতা নিষ্ঠুর, সমাজ বিমুখ, স্বামী স্নেহহীন, তাই তার ভবিষ্যৎ বুঝিতে আর বাকী রহিল না! কিন্তু সে ভাবী কল্পনাতেও যে, উমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়! তাহার স্বামী, শৈশব হইতে যে স্বামী বই সে আর কিছু জানে না,—সেই স্বামী, সেই হৃদয়ের দেবতা, তাহার পর হইয়া যাইবে, এ চিন্তাও উমার অসহ্য!

উমার এই পরিবর্ত্তন শ্বাশুড়ী সহজেই লক্ষ্য করিলেন। উমাকে তিনি ‘পেটের মেয়ের’ মতই জানিতেন, সহসা কেন সে সোনার কমল শুকাইয়া উঠিতেছে, জানিতে তাঁহার মাতৃ-হৃদয় বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল!

একদিন একাদশীর রাত্রে উমা শ্বাশুড়ীর পদ সেবা করিতেছিল, সে ঘরে আর কেহ ছিল না, সময় বুঝিয়া গিন্নি ডাকিলেন, ‘বৌ মা’;—‘কেন মা’—বলিয়া যেন উমা একটু চমকিয়া উঠিল। গিন্নি বলিলেন,—“আমাকে ছুঁইয়া আছ, এখন বল দেখি মা তুমি দিন দিন এমন শুকাইয়া উঠিতেছ কেন? আমি তোমার মা, আমার কাছে কিছু লুকাইও না।” সে কণ্ঠে এত স্নেহ, এত সহানুভূতি ছিল যে, উমা আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না; কাঁদিয়া ফেলিল, সোহাগ-কৌমুদি-সম্পাতে সে নয়ন-অমৃত-নদী উছলিয়া উঠিল। বাঁধ মানিল না! তখন ‘গিন্নি’ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বধূকে কোলে লইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন, ‘বল মা, আমার মাথার দিব্য, বল মা।’ তখন উমা স্নেহময়ী শ্বাশুড়ীর বুকে মুখ লুকাইয়া বালিকার মত কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—“মা, আমার যে আর কেউ নেই মা, ছেলে বেলা হ’তে আমি যে কেবল তোমাদেরই জানি, তোমরাই যে আমার সব! কি অপরাধে তোমরা আমায়—” উমার মুখে আর কথা সরিল না, কিন্তু কথাটা শাশুড়ীর বুঝিতে বাকী রহিল না। শাশুড়ী মুখে সান্ত্বনা দিলেন বটে; কিন্তু তাঁর মনের মেঘ কাটিল না। তিনি বুঝিয়াছিলেন, সহিষ্ণুতার প্রতিমা উমা সহজে বিচলিত হয় নাই। তবে শিবু কি আবার বিবাহ করিতে চায়?

INDRA BHUSHON DE
CALCUTTA.
61, BAGH-BAZAR STREET

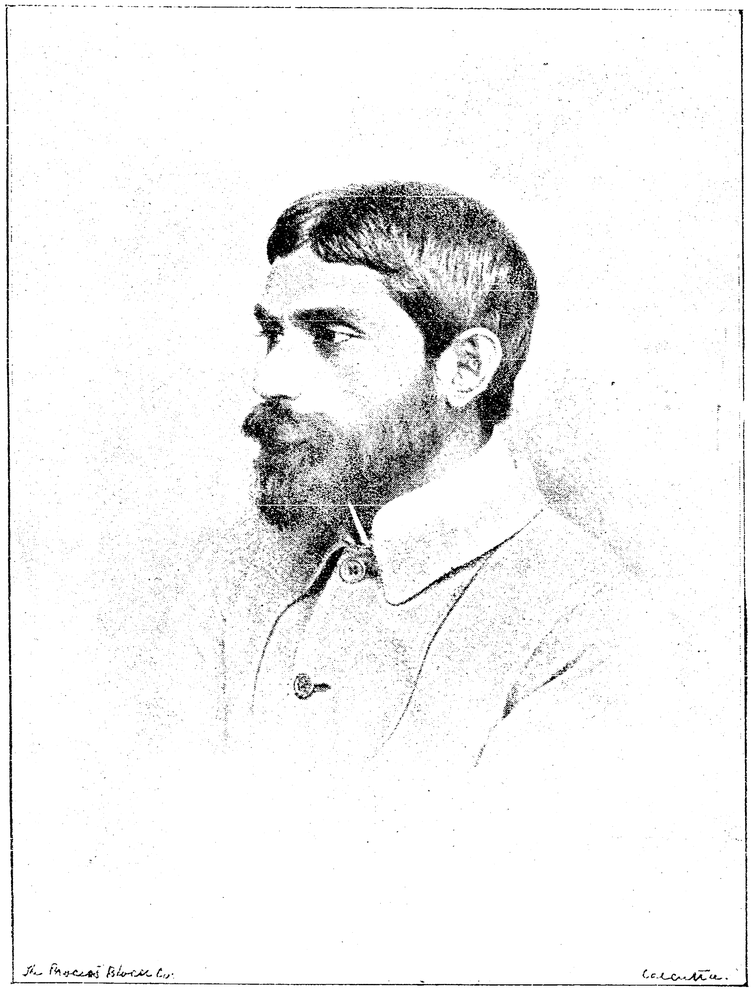

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

প্রদীপ

প্রথম ভাগ। } ফাল্গুন, ১৩০৪। { ৩য় সংখ্যা।

শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী ও তদীয় শিষ্য শ্রীনিবাস আচার্য্য।

(১)

১৪৩৩ শকে শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু সন্ন্যাসিবেশে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন। সেইকালে আষাঢ় মাসের প্রথমে একদিন তিনি কাবেরীনদীতীরবর্ত্তী শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে * উপনীত হইলেন, এবং কাবেরীতে স্নান করিয়া শ্রীরঙ্গনাথ দেবের সম্মুখে প্রেমভরে নৃত্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রের নিকটস্থ বলংগুণ্ডীগ্রামনিবাসী ধর্ম্মনিষ্ঠ এক ব্রাহ্মণ সেই সময় তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই সন্ন্যাসীর অপূর্ব্ব ভক্তিভাবদর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজালয়ে লইয়া গেলেন। এই ব্রাহ্মণের নাম শ্রীবেঙ্কটভট্ট। ইনি শ্রীসম্প্রদায়ভুক্ত একজন গৃহস্থ বৈষ্ণব। ইহাঁরা তিন ভ্রাতা,—বেঙ্কট, ত্রিমল্ল ও প্রবোধানন্দ।† মহাপ্রভু বেঙ্কটগৃহে সমাগত হইবা মাত্র ব্রাহ্মণ পরম সমাদরে প্রভুকে আসনপ্রদানপূর্ব্বক পাদপ্রক্ষালন করিয়া সপরিবারে সেই পাদোদক পান করিলেন। শ্রীগোপাল এই বেঙ্কট ভট্টের পুত্র; বয়স ১০।১১ বৎসর, পরম রূপবান্। শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে দর্শন করিয়া গোপাল প্রেমাবেশে বিহ্বল হইয়া তাঁহার পাদমূলে পতিত হইলেন। প্রভু সস্নেহে গোপালকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। কথিত আছে, মহাপ্রভু এই সময় গোপালকে স্বপ্নযোগে তাঁহার নবদ্বীপলীলা দর্শন করাইয়াছিলেন। পুত্রকে সন্ন্যাসীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত দেখিয়া বেঙ্কটভট্ট অতিশয় সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে সন্ন্যাসীর সেবায় নিয়োজিত করিলেন। ভট্টের একান্ত আগ্রহে মহাপ্রভু তাঁহার গৃহে বাস করিয়া চাতুর্ম্মাস্য করিয়াছিলেন। কর্ণানন্দরচয়িতা কবি শ্রীযদুনন্দন দাস লিখিয়াছেন;—

"বেঙ্কটের বালক শ্রীগোপাল ভট্ট নাম।
নিষ্কপট হইয়া সেবা কৈল গৌরধাম॥
তার পিতা সুচরিত্র তাহারে জানিয়া।
পরিচর্য্যায় নিযুক্ত কৈলা হৃষ্ট হইয়া॥
চারি মাস সেবা কৈল অশেষ প্রকারে।
কহিল না হয় অতি তাহার বিস্তারে॥"
"মহাপ্রভুর মনোরথ মনেত জানিয়া।
না বলিতে করে কার্য্য আনন্দিত হইয়া॥
সেবার বৈদগ্ধ্য দেখি প্রভু তুষ্ট মনে।
মোর মনের কার্য্য ইহোঁ জানিল কেমনে॥
এত বলি মহাপ্রভু তুষ্ট হৈলা মনে।
সগোষ্ঠিকে কৈলা কৃপা দাসদাসীগণে॥"

গোপাল বাল্যকাল হইতেই শিষ্ট ও শান্তপ্রকৃতি, এবং পিতামাতার সেবায় অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। তিনি স্বীয় পিতৃব্য পণ্ডিতবর প্রবোধানন্দের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিতেন। অল্প বয়সেই ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে তিনি অসামান্য ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। গোপাল এই সময় শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিতেছিলেন। মহাপ্রভু একদিন ভট্টকে বলিলেন;—

"গোপাল ভট্ট নাম এই তোমার কুমার।
মোর অতি কৃপা হয় ইহার উপর॥

* এই স্থান মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত। এখানে "শ্রীরঙ্গনাথ" নামে শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত থাকায় ইহার নাম শ্রীরঙ্গক্ষেত্র। কথিত আছে, সুপ্রসিদ্ধ রামানুজাচার্য্য এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

† প্রবোধানন্দের পূর্ব্ব নাম প্রকাশানন্দ সরস্বতী। ইনি পরম বৈদান্তিক ও কাশীধামের দণ্ডি-পরমহংসদিগের নেতৃস্বরূপ ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় ইহাঁর ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত হয় এবং ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া ইনি সুমধুর সংস্কৃত কবিতায় "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত" নামে মহাপ্রভুর লীলাবর্ণনাত্মক এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শেষাবস্থায় ইনি বৃন্দাবনে বাস করিতেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও ভক্তমাল গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

পড়াইয়া সুপণ্ডিত করিবে ইহারে।
বিবা নাহি দিবে ইহা কহিল তোমারে॥"
(প্রেমবিলাস)

অনন্তর কার্ত্তিক মাস সমাগত হইলে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত শেষ হইল। মহাপ্রভু ভট্টগৃহ পরিত্যাগ করিবেন শ্রবণ করিয়া সকলে কাঁদিয়া আকুল হইলেন। প্রভুকে যে একবার দেখিত, সেই তাঁহার চরণে প্রাণ মন উৎসর্গ করিত। ভট্টগৃহে তিনি চারিমাস বাস করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার বিরহচিন্তায় সকলে যে অতিশয় ক্লেশানুভব করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? প্রভু গোপালকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, তুমি পিতামাতার সেবা করিবে, এবং তাঁহাদের অবর্ত্তমানে শ্রীবৃন্দাবন গমন করিয়া শ্রীমৎরূপ ও সনাতন গোস্বামীর সঙ্গলাভ করিবে। পরে প্রবোধানন্দকে তিনি বলিলেন যে, গোপালকে বৃন্দাবন পাঠাইয়া দিও, ইহাঁর দ্বারা আমি বহু প্রয়োজন সিদ্ধ করিব। গোপাল প্রভুর বিচ্ছেদ স্মরণ করিয়া তাঁহার চরণতলে পতিত হইয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

কথিত আছে, প্রভু বিদায় হইবার সময় গোপালকে বলিয়াছিলেন যে, তোমার শিষ্যের দ্বারা বঙ্গদেশে প্রেমভক্তির প্রচার হইবে, কিন্তু তুমি একথা এখন প্রকাশ করিও না। অনন্তর প্রভু প্রসন্ন হইয়া গোপালকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং স্বীয় কৌপীন ও বহির্ব্বাস দিলেন। গোপাল তাহা মস্তকে ধারণ করিয়া প্রণাম করিলেন। প্রভু পুনর্ব্বার বলিলেন,—

"——শুন কিছু তোমারে কহিয়ে।
এই মোর আজ্ঞা তুমি পালহ নিশ্চয়ে॥
গৌড় হইতে আসিবে এক ব্রাহ্মণ কুমার।
নিশ্চয় জানিহ তিহোঁ শক্তি যে আমার॥"
"তবে তুমি বৃন্দাবনে করিবে গমন।
আসন ডোর পাঠাইব তোমার কারণ॥
সে আসনে বসি তুমি গলে ডোর দিবা।
প্রেমমূর্ত্তি শ্রীনিবাসে কৃপা যে করিবা॥
তাহারে কহিবে এই বচনের সার।
তোমার কৃপাতে মোর কৃপা কি কহিব আর॥"
(কর্ণানন্দ—পঞ্চমনির্য্যাস।)

কর্ণানন্দ রচয়িতার উপরি উক্ত কথা, মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী, যেহেতু এখনও শ্রীনিবাসের জন্ম হয় নাই। যাহা হউক, প্রভু ভট্টগৃহ পরিত্যাগ করিলে গোপাল তাঁহার শোকে একান্ত কাতর হইয়া অনেক রোদন করিয়াছিলেন।

ইহার পর গোপাল বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মহাপণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন। গ্রন্থপত্রে লিখিত আছে, গোপাল অটল অধ্যবসায় ও জ্বলন্ত উৎসাহে প্রমত্ত হইয়া বৌদ্ধমতবাদ ও বৈদান্তিক মায়াবাদ খণ্ডনপূর্ব্বক দাক্ষিণাত্য প্রদেশে বিশুদ্ধভক্তিতত্ত্ব প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহিত বিচারে মহা মহা পণ্ডিতও পরাস্ত হইতে লাগিল দেখিয়া পণ্ডিতসমাজে তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি দিন দিন বর্দ্ধিত হইল।

মহাপ্রভু গোপালকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, এজন্য তিনি চিরকৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিলেন। অনন্তর পিতামাতার লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে, মহাপ্রভুর আদেশ স্মরণ করিয়া তিনি ১৪৫৩শকে ৩১ বৎসর বয়সে বৃন্দাবন উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। গোপাল বৃন্দাবনে উপনীত হইলে রূপ ও সনাতন গোস্বামী কর্ত্তৃক পরম যত্নে গৃহীত হইলেন। ইহাঁরা তাঁহাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করিতে লাগিলেন। ক্রমে বৃন্দাবনবাসী লোকনাথ ও রঘুনাথ দাস প্রভৃতি গোস্বামিগণের সহিত গোপালের পরম সখ্যভাব সংস্থাপিত হইল। যথাকালে সনাতন গোস্বামী গোপালের বৃন্দাবন আগমন বার্ত্তা মহাপ্রভুকে নীলাচলে প্রেরণ করিলেন। মহাপ্রভু এই সংবাদে আনন্দিত হইয়া স্বহস্তে সনাতনকে পত্র লেখেন ও গোপালের প্রতি কৃপানিদর্শন স্বরূপ নিজের ব্যবহার্য্য ডোরকৌপীন ও আসন প্রেরণ করেন। গোপাল শ্রীগৌরপ্রদত্ত এই স্নেহোপহার প্রাপ্ত হইয়া ও সনাতন গোস্বামীর মুখে প্রভুর পত্রিকা শ্রবণ করিয়া বিপুল আনন্দাবেশে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন। পরে আসন বুকে করিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

মহাপ্রভু পূর্ব্বে গোপালকে এই আসনে উপবেশন করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু প্রভুর উপহার সামগ্রীকে তিনি পূজ্যভাবে ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করিয়া বলিলেন,—

"প্রভুর আসনে আমি কেমনে বসিব।
আজ্ঞা করিয়াছেন প্রভু কেমনে উপেক্ষিব।"
(প্রেঃ বিঃ।

শ্রীরূপ গোস্বামী অনেক বুঝাইয়া বলিলেন, "প্রভু-আজ্ঞাই বলবতী।" তখন ভট্ট ডোর গলায় দিয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন। ইহার পর হইতে ইনি এই আসনে উপবেশনপূর্ব্বক গলদেশে ডোর বান্ধিয়া প্রতিদিন উপাসনা করিতেন। অতঃপর বৃন্দাবনবাসী গোস্বামিগণকর্ত্তৃক গোপালভট্ট "গোস্বামী" আখ্যায় আখ্যাত হইলেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ যে ছয়জন গোস্বামীকে আদিগুরু বলিয়া স্বীকার করেন, গোপালভট্ট তন্মধ্যে অন্যতম। বৈষ্ণবেরা বলেন, ইনি শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলায় শ্রীঅনঙ্গ ও শ্রীগুণমঞ্জরী ছিলেন। *

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু গোপালভট্টকে নিজের আসন দিয়াছিলেন, এইজন্য তাঁহার শাখাপ্রশাখাভুক্ত বৈষ্ণবগণ বলিয়া থাকেন, প্রভুর শেষগদী তাঁহারাই পাইয়াছেন। গোপালভট্ট বৃন্দাবনে শ্রীরাধারমণবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার বিবরণ অতি অলৌকিক, বাহুল্য ভয়ে তাহা লিখিত হইল না। অদ্যাপি এই শ্রীবিগ্রহ বৃন্দাবনে বিরাজিত আছে। প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমাতে প্রতিষ্ঠাদিনের স্মরণার্থ উৎসব হইয়া থাকে। গোপালভট্ট গোস্বামীই বৈষ্ণবদিগের ব্যবস্থাশাস্ত্র "হরিভক্তিবিলাস" গ্রন্থের সঙ্কলন কর্ত্তা। মহাপ্রভুর আদেশে সনাতন গোস্বামী প্রথমে এই গ্রন্থের সূত্রপাত মাত্র করিয়াছিলেন; পরে গোপালভট্টকে এবিষয়ে উপযুক্ত ও অনুরাগী দেখিয়া স্বীয় সংগ্রহ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করিবার জন্য প্রদান করেন। ভট্ট গোস্বামী বিবিধ শাস্ত্রপ্রমাণ সংযোজিত করিয়া এই গ্রন্থের যথেষ্ট গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। এই গ্রন্থ পাঠে তাঁহার অসাধারণ শাস্ত্রাভিজ্ঞতার প্রমাণ ও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বৈষ্ণবগ্রন্থে লিখিত আছে, মহানুভব কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত রচনার সংকল্প করিয়া বৃন্দাবনের গোস্বামিপাদগণের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কবিরাজ এই নিমিত্ত গোপাল ভট্টের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি বলিলেন, তুমি মহাপ্রভুর লীলা বর্ণনা কর, কিন্তু সেই গ্রন্থের মধ্যে আমার কোন প্রসঙ্গ উল্লেখ করিও না। কবিরাজ এই আজ্ঞা কোনরূপে লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া স্বীয় গ্রন্থে ইহাঁর কোন প্রসঙ্গ বর্ণনা করেন নাই, কেবল নামমাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ভট্টগোস্বামীর জীবন বৃত্তের অনেক কথা জ্ঞাত ছিলেন, অনেক ঘটনা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। ভট্টগোস্বামী নিষেধ না করিলে, কৃষ্ণদাসের গ্রন্থ পাঠে তাঁহার অপূর্ব্ব জীবনের আনুপূর্ব্বিক যথাযথ চিত্র অবগত হইয়া আমরা কৃতার্থ হইতে পারিতাম। ভট্টগোস্বামী কীদৃশ প্রতিষ্ঠাশাশূন্য দীনাত্মা নির্লিপ্তপুরুষ ছিলেন, এই একটীমাত্র ঘটনা হইতে তাহা সুন্দররূপে বুঝিতে পারা যায়। মানুষ ধর্ম্মের জন্য ধনজন সম্পত্তি সমস্ত ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু প্রশংসাপ্রিয়তা সহজে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না। ফলতঃ আপনাকে "তৃণাদপিসুনীচ" জ্ঞান করিয়া অন্যকে মর্য্যাদা প্রদান করাই বৈষ্ণবধর্ম্মের শিক্ষা। শ্রীগৌরাঙ্গভক্তের নিকট "প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা"বৎ পরিত্যজ্য। শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

"প্রতিষ্ঠাশাধৃষ্টশ্বপচরমণী মে হৃদিনটেৎ
কথং সাধুপ্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্ননুমনঃ।"

অর্থাৎ যতদিন আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাশারূপা নির্লজ্জা চণ্ডালিনী নৃত্য করিতেছে, ততদিন নির্ম্মল সাধুপ্রেম এই মনকে কিরূপে স্পর্শ করিবে?

গোপালভট্ট এইরূপে বৃন্দাবনধামে ভক্তবৃন্দের সহবাসে পরমানন্দে বাস করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্যপ্রভু লিখিয়াছিলেন, তাঁহার অপ্রকটে শ্রীনিবাস নামে কোন বিপ্রকুমার বৃন্দাবনে আসিবেন। কিন্তু মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর প্রায় ২৫বৎসর অতীত হইল, তথাপি শ্রীনিবাস আসিলেন না। শ্রীরূপ সনাতন প্রভৃতি সকলেই শ্রীনিবাসের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। প্রভুর আদেশ ছিল, রূপগোস্বামী স্বপ্রণীত সমুদায় গ্রন্থ শ্রীনিবাসকে অধ্যয়ন করাইবেন। কিন্তু শ্রীনিবাস আসিলেন না দেখিয়া রূপ একদিন গোপাল ভট্টকে বলিলেন,—

"——শ্রম কৈলুঁ প্রভুর শক্তিবলে।
শ্রম সার্থক হয় যদি আইসেন সকলে॥
বিদ্যমানে আমি তাঁরে সব সমর্পিব।
পঢ়াইয়া সব গ্রন্থ পণ্ডিত করিব॥" (প্রেমবিলাস।)

ইহার পর রূপসনাতন পরলোক গমন করেন। ইহাঁদের শোকে গোপাল ভট্টের হৃদয় যারপর নাই ব্যথিত হয়। তিনি এখন হইতে অধিকাংশ সময় নির্জ্জনে ধ্যান ও শ্রীরাধারমণের সেবায় কালাতিপাত করিতেন। এই সময় একদিন তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, শ্রীনিবাস বৃন্দাবন আগমন করিতেছেন।

[ক্রমশঃ]

শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়।

* "অনঙ্গমঞ্জরী যাসীৎ সাদ্য গোপালভট্টকঃ।
ভট্টগোস্বামিনং কেচিদাহুঃ শ্রীগুণমঞ্জরীং॥"
শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা, ১৮৪ শ্লোক।

নসীরাম পালের বক্তৃতা।

১

সভ্য ও ভব্য
কতিপয় নব্য
বাঙ্গালীপুঙ্গব রঙ্গে মিলিয়া সকলে
'ডাকিলেন' এক 'মীটিং' এলবার্ট হলে।
দেওয়া গিয়েছে 'নোটিস' ছেয়ে রাস্তাঘাট
স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে
নূতন প্রবন্ধে
বাবু নসীরাম পাল করিবেন পাঠ।
সে বিষয়ে দক্ষ
উদার ও পক্ষ
নানাবিধ মতের হবে আলোচনা, তর্ক।
অনেক বক্তৃতা হবে ভালো এবং বড়
সে কারণ নানা শ্রোতা হইলেন জড়।

২

বাবু নসীরাম পাল অতি সুলেখক
আর্য্য সভার অতিশয় দক্ষ সম্পাদক।
হিন্দু শাস্ত্রে ও বিজ্ঞানে আছে খুব দৃষ্টি,
আর, সভ্যতা লাঠির কাছে
যা'তে হিন্দুসমাজ বাঁচে
সে কারণে কলিকাতায় আর্য্যসভার সৃষ্টি।
সে সভার সভ্য
কতিপয় নব্য
শাস্ত্রজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিক—ডোম এবং চামার
আরও বহু আর্য্য—ঠিক স্মরণ নেইক আমার—
বিজ্ঞানের শরে
হিন্দুধর্ম্ম মরে
দেখে উঠিলেন সব গরীয়ান কার্য্যে
প্রচারিতে হিন্দুধর্ম্ম, জাগাইতে আর্য্যে।

৩

বাজিলে ঠিক দু'টা এলবার্ট হলের ঘড়ি,
কেনারাম কর্ম্মকার প্লাট্‌ফর্ম্মে চড়ি,
করিলেন প্রস্তাব, যে সুপ্রসিদ্ধ বক্তা
বেচারাম তেলী লউন সম্পাদকী তক্তা।
তাতে নিধিরাম সদ্দার
এবং কুড়োরাম পোদ্দার
'দ্বিতীয়' করিলে ও পড়িলে করতালি
বেচারাম 'চ্যারে' গিয়ে বসিলেন খালি।

৪

উঠে তখন বেচারাম একটুখানি কেশে
অতিশয় বড় গোঁফে অতি ছোট হেসে—
"হে ভদ্রসমাজ
যে কারণে আজ
সমবেত সবে, সবাই জানেন সে কাজ।
আজিকার হয়
আলোচ্য বিষয়
স্ত্রীজাতির কথিত যা অবরোধ ও হীনতা,
কিরূপ বিগর্হিত তাদের শিক্ষা ও স্বাধীনতা,
কতদূর অনিষ্টকর পুরুষ ও স্ত্রীর সমতা,
কি কারণে বাড়িতেছে স্ত্রীজাতির ক্ষমতা,
আমি ডাকি, সেই জন্য
মান্য এবং গণ্য
বাবু নসীরাম পাল, সে বিষয় সম্বন্ধে
করুন এখন পাঠ তাঁহার রচিত প্রবন্ধে।

৫

উঠিলেন নসীরাম রক্ষিতে হিন্দুধর্ম্ম
(আমরা আজ দিব শুধু সে বক্তৃতার মর্ম্ম)
—চেয়ারম্যান ও ভদ্রগণ—বিষয়টি শক্ত :
আমি ক্ষীণশক্তি
ও দুর্ব্বল ব্যক্তি ;—
কিন্তু যখন গড়াইছে জননীর রক্ত
শতক্ষত হ'তে ; মাতা গিয়াছেন মোহ ;
রাস্তার প্রস্তর উঠে চীৎকারি' "বিদ্রোহ" ;
(পাঠক, এটি অনুবাদ সেক্ষপীয়র থেকে।)
ধর্ম্মভ্রষ্ট দুরাচার পাপাত্মাদের দেখে
যখন ন্যায় কাঁদে, ধর্ম্ম ও শাস্ত্র লুকায়
অরণ্যে লজ্জায় ; যখন স্নেহ ও প্রেম শুকায়
তীব্রতাপে ; আর যবে নীতি হয় শীর্ণ ;
অজ্ঞান ঢাকে বিদ্যায়, করি তমসা বিকীর্ণ ;
তখন হয় উচিত এবং নিতান্ত কর্ত্তব্য
এ বিষয়ে মন দেন প্রতি হিন্দু সভ্য।

৬

ভদ্রগণ আজ
এ হিন্দুসমাজ
ক্ষীণবল, হীনপ্রভ, নাহি কিছু শক্তি
কেন ?—কারণ আর্য্যের নাই আর্য্যধর্ম্মে ভক্তি।
পুরাতন প্রথা
ঋষিগণের কথা
এ সবে হিন্দুর আর নাহিক মমতা।
একবার আঁখি মেলি' দেখুন আর্য্যসভ্য
উঠে যায় বাল্যবিয়ে, বিধবার বৈধব্য ;
ছেড়ে কৃষ্ণে আস্থা,
নিয়ে বাঁকা রাস্তা,
পাকাচ্ছে খিচুড়ি নিয়ে খৃষ্ট স্পেন্সার বুদ্ধ
তা'তে আবার জড়াচ্ছে এ হিন্দুধর্ম্ম শুদ্ধ।

৭

ভদ্রগণ, আমাদের দেশেতে অবলা
ক্রমশই হচ্ছে সব দুর্দ্দান্তা, প্রবলা।
স্ত্রীশিক্ষার নামে
সমাজ সংগ্রামে
ক্রমে নিচ্ছে কেড়ে তা'রা পুরুষদের রাজ্য
ছেড়ে রন্ধনাদি তাদের উচিত যে সব কার্য্য।

৮

কতিপয় চাষায়,
জানি না কি আশায়,
যত কালভুজঙ্গম পুরুষদের বাসায়
—কতিপয় বিদ্রোহী সেনা সোণার এ বঙ্গে
দিয়াছে সমরে যোগ স্ত্রীজাতির সঙ্গে।

৯

যত মূর্খ ঘোর
কোরে অতি জোর
বড় কল্লে বাড়ীর সব জানালা ও দোর ;
অন্তঃপুরের পুরাতন সব পাচিলগুলো ভাঙ্‌লো,
আঁস্তাকুড় কল্লে বাগান, চালায় কল্লে 'বাঙ্‌লো',
মেয়েদের পরালো জুতো, সাড়ীর বাড়ালো বহর,
জ্যাকেট দিইয়ে গায়ে বেড়ায় দেখিয়ে নিয়ে সহর,
স্ত্রীদের ছাড়িয়ে পাল্কী, বেড়ায় নিয়ে 'ফিটনে',
মেয়েদের চড়িয়ে 'ওমনিবসে' পাঠায় স্কুল বিটনে ;
দিচ্ছে তাদের শিক্ষা,
দেওয়াচ্ছে পরীক্ষা,
স্ত্রীশিক্ষার নামে তাদের বাড়াচ্ছে ক্ষমতা
গোল্লাই দিচ্ছে হিন্দুধর্ম্ম—সনাতন প্রথা।

১০

"স্ত্রীর স্বাধীনতা" ?
কি রকম কথা ?
তাঁ'রা কি চলে যাবেন এখন যথা ইচ্ছা তথা ?
স্ত্রীরা ত স্বাধীনই সব—প্রাচীর ভিতরে ;
তাঁদের অপ্রতিহত রাজত্ব অন্দরে ;
তাঁরাই ব্রাহ্মণী ঝির রক্ষক বা হর্ত্তা ;
তাঁরাই ত স্বামীদের সর্ব্বকার্য্যে মন্ত্রী।
শুধু মন্ত্রী ?—অনেক সময় স্বামীদের প্রভু ;
কখন দেন খেতে [হাস্য] নাহি দেন কভু।
বিনা স্ত্রীর সাহায্য
হয় না কোন কার্য্য ;
শয়ন ঘরে তাঁহাদের ত সুবিস্তীর্ণ রাজ্য ;
ভাঁড়ার ঘরে তাঁহাদের ত অসীম ক্ষমতা ;
রান্নাঘরে আইনই ত তাঁহাদের কথা।

১১

তাঁদের দাপোটে
বকুনির চোটে
মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত সদাই কেঁপে ওঠে :
ঘরের মধ্যে অবিলম্বে আগ্নেয়গিরি ছোটে।
স্ত্রীদের জ্বালায়
অনেকে ত পালায়
শুনেছি ও দেখেছিও গো ও অশ্বশালায়
মাঠে বনে [শোন শোন] পগারে ও নালায়।
তাঁরা আবার অধীন ?—বাপ্—হায়রে অধর্ম্ম
পুরুষ তাঁদের সেবায় ব্যস্ত ছেড়ে সব কর্ম্ম।
গহনাটি দিতে দিতে তাঁদের চারু অঙ্গে
নাকের জল মিশে যায় চখের জলের সঙ্গে।
তাঁদের জন্য ব্যস্ত
তাঁদের ভয়ে ত্রস্ত
ভবার্ণবে যুরপাক খায় পুরুষ সমস্ত।

১২

স্ত্রী স্বাধীনতা কি
আছে কিছু বাঁকি ?
তারা ঘাড়ের উপর ছেড়ে মাথায় চড়্‌বেন নাকি ?
তাঁরাই ত প্রভু, আর আমরাই ত দাস,
খেতে দিলে খাই নইলে রহি উপবাস,
তাঁরাই 'খান দান' শয্যা—পুরুষদের গতি
আমরাই ত ভার্য্যা—তাঁরাই ত পতি ;

১৩

কতিপয় নব্য
বাঙ্গালী অসভ্য
স্ত্রীদের আরও স্বাধীনতা ভাবেন কর্ত্তব্য।
ভাবেন এখন পুরুষ করুক স্ত্রীদের পরিচর্য্যা—
ভাবেন স্ত্রীরা দেবতা—ওঃ—[কি লজ্জা কি লজ্জা]
আর পুরুষ ?—এসেছেন তাঁরা বঙ্গদেশে
কোন দ্বীপ থেকে যেন বন্যায় টন্যায় ভেসে।
ভাবেন যে পুরুষগণ সবাই থাকুক ঘরে
আর স্ত্রী 'ফিটনে' চ'ড়ে বেড়ান সহরে ;
এইরূপ যদি স্ত্রীরা দেখেন বাইরের আলো,
সেটা কি সুবিধার হবে, হবে কি তা ভালো ?

১৪

ভদ্রগণ, এইত গেল স্ত্রীদের স্বাধীনতা।
সঙ্গে সঙ্গেই আসিতেছে স্ত্রীশিক্ষার কথা।
স্ত্রীজাতিটা—বল্‌তে বেশী হবেনাক আমাকে—
অতিশয় ফাজিল এবং ফক্কড় এবং ড্যামাকে।
তাঁদের মেজাজ হবে কড়া
শিখ্‌লে লেখা পড়া,
মাথায় উঠ্‌বে রাঁধাবাড়া হয়ায় নিঃসন্দ'
স্বামীদের হবে ক্রমে খাওয়া দাওয়া বন্ধ।

১৫

এখনও ও তবু
তারা রাঁধে কভু ;
কিন্তু যদি তারা জেনে ফেলে অকস্মাৎ
যে, পৃথিবীটা জোরে
ভোঁ ভোঁ কোরে ঘোরে,
কিম্বা, চাঁদে রাহুছায়া
পৃথিবীর ছায়া,
কিম্বা শুধু বাষ্প বলে
রেলগাড়ি চলে,
কিম্বা যদি জেনে ফেলে ও আর ২য়ে ৭,
তা হ'লে কি ভাব তারা রেঁধে দেবে ভাত
তা হ'লে সব চুলোয় যাক স্বামীর 'খান দান
পড়্‌বে তারা অঙ্কশাস্ত্র দর্শন ও বিজ্ঞান ;
হাঁড়িকুড়ি ছুড়ে
ফেলে আস্তাকুড়ে
তিন কথায় স্বামীদিগের দিয়ে দেবে তুড়ে ;
হাতা বেড়ি রেখে
পাউডার মেখে
পোরে মোজা বুট
কোরে সবায় হুট
পুরুষদের রাজ্যমাজ্য কোরে সব লুঠ
অনায়াসে ও নির্ব্বিঘ্নে দিয়ে এক ছুট
নির্ব্বিবাদে ও নির্ভয়ে সটাং, অবিলম্বে
চলে যাবে হিল্লী দিল্লী কলম্বো ও বম্বে।

১৬

ভদ্রগণ এক্ষণ
করি পর্য্যবেক্ষণ
শিক্ষিতাদের বাড়ী মধ্যের অবস্থাটা দেখ্‌খুন।
স্ত্রীরা এখন প্রাতে উঠে, রান্নাবান্না ছেড়ে
স্বামীর হস্ত থেকে নেয় খবর কাগজ কেড়ে।
ছেড়ে লুচি ভাজা
পান টান সাজা
ছেড়ে মেঝে ঝাঁট এবং বাসন কুশন মাজা
গৃহিণীরা এখন এক এক নবাব কিম্বা রাজা।
বাজান কেউ পিয়ানো; কেউবা গান "পেয়ালা
মুখে ভরে দে,"—আবার কেউবা বাজান বেহালা।
কেউবা আছেন মাইকেলে কেউ সেক্ষপীয়রে মেতে,
কাউকে আন্‌তে ঘরে, হয় Civil Courtএ যেতে।

১৭

ঢাকাই কাপড় ছেড়ে এখন পরেন বম্বে সাড়ি,
পরেন কোমরে বেল্ট ও ফিতে, চন্দ্রহার ছাড়ি।
ব্যাং মল ছেড়ে দেন জুতো মোজা পায়ে,
সোণার গহনা ছেড়ে এখন জ্যাকেট পরেন গায়ে।
চাবির ভরে যে অঞ্চল ঝুলত তাঁদের কাঁধে,
সে চারু অঞ্চল এখন ব্রোচ দিয়ে বাঁধে।
নাকের নথ রেখে
রুজ পাউডার মেখে
বাইরের ঘরে বোসে খাসা আরাম চ্যারে বেঁকে
কাজকর্ম্ম ছেড়ে চক্ষু মুদিত করে অল্প
পড়েন উপন্যাস কিম্বা করেন মিলে গল্প।

১৮

প্রাচীর গেল উড়ে
চারিদিক জুড়ে,
দালানে বারান্দা হোল বাগান আঁস্তাকুড়ে;
রান্নাঘর চলে গেল দুই ক্রোশ দূরে,
দূরে থাক্‌ত যেই স্থান এল তা শিউরে,
ভিতর বাইরের তফাৎ হ'ল দুয়োর পর্দ্দা মাত্র,
তা ফুঁড়েও স্ত্রীরা বাইরে আসে দিবারাত্র;
যথায় ঝুল্‌ত উর্ণনাভ সেথায় ঝোলে পাখা,
দেওয়াল থেকে উঠে গেল কৃষ্ণ রাধিকা আঁকা;
গদিমোড়া খাট ছেড়ে আনে স্প্রিঙের খাটে,
তপ্তার পাটি মেঝের পেতে তার উপরে হাঁটে;
ছেড়ে খাসা মেঝে
স্ত্রীরা বিবি সেজে
মিলে সব এয়ারে
বসেন এখন চেয়ারে;
ছেড়ে খাসা পা ছড়ান—হোলরে কি দশা—
হয় এখন গিন্নীদের পা ঝুলিয়ে বসা।
যেন এক এক রাণী কিম্বা যেন এক এক দেবী—
আমরা যেন কৃতার্থ হই তাঁদের পদ সেবি'।

১৯

বাহিরে বেরিয়েও স্ত্রীদের মনে নাহি আঁটে
বেড়াতে যান ফেটিন কোরে হাটে ঘাটে মাঠে।
তাঁদের সে চির অসূর্য্যম্পশ্য রূপরাশি
দেখে যায় সব রাস্তার লোকে পাড়াপ্রতিবাসী।
ঘোমটা গেল উঠে—হায় রে—প্রাণে হয় ক্রোধ;
ঘৃণা দয়া লজ্জা
পশে যেন মজ্জা,
নাহি কিরে নব্যবঙ্গের হিতাহিত বোধ?"—
বসিলেন নসীরাম পড়ি' উক্ত গদ্যে
ভয়ঙ্কর কালাকারী প্রশংসার মধ্যে।

২০

অবশেষে চেয়ার খান পশ্চাতেতে ঠেলি,
উঠিলেন চেয়ারম্যান বেচারাম তেলী—
"বক্তৃ চূড়ামণি
নসীরাম এখনি
পড়িলেন যেই অতি 'বিদ্বান' প্রবন্ধ
তাহা অতি সুন্দর ও বিশদ নিঃসন্দ।
এই বিষয়ে আমার
এর পরে আর
সবিশেষ এমন কিছু নাহি বলিবার।

২১

ভদ্রগণ বিষয়টি অতিশয় রঙিন,
কিন্তু হোয়ে দাঁড়াচ্ছে এ ঘোরতর সঙিন।
স্ত্রীজাতির ক্রমে
শক্তি যাচ্ছে জমে'
স্ত্রীদের তেজ যাচ্ছে বেড়ে', পুরুষদের কমে'।
হয়ে উঠ্‌ছে স্ত্রীজাতিটা অতিশয় ফক্কড়—
আমাদের সঙ্গে এসে দিতে চায় টক্কর।
সেদিন বল্লাম আমি "দেখ গিন্নী খুলে দোর,
সূর্য্যটা উঠিল কি না,—হয়েছে কি ভোর?"
—বলে "সূর্য্য উঠেছে কি !!! বল এতক্ষণ—
হল কি না শেষ ধরার দৈনিক আবর্ত্তন।"

২২

শুন্‌লেন ব্যাপার খানা?—তা সে যাক্—স্ত্রীদের স্বভাব
ঐরূপই—সুবুদ্ধিরও তাঁদের বিশেষ অভাব।
সে বিষয়ে বিশেষ কিছু নাহি বলিবার।
কিন্তু একটি সঙিন কথা স্ত্রীস্বাধীনতার
বিষয়ে বলেন নি বক্তা—স্ত্রীজাতিটা অতি
খল ও ক্রুর—[শোন শোন]—ও কপটমতি
এই কথায় সেক্ষপীয়র এবং পোপ্ আদি
কবিরাও সর্ব্বথা সম্মত সর্ব্ববাদী।
আরও, স্ত্রীজাতির কর্ম্ম
স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম
স্বামিসেবা—সতীত্বই রমণীর ধর্ম্ম—
স্ত্রীস্বাধীনতায়, কিছু নাহিক বিচিত্র,
হবে কলঙ্কিত সেই অমূল্য চরিত্র।
পর পুরুষের সঙ্গে স্ত্রীদের কইলে কথা,
পাতিব্রত্যের অবধারিত হইবে অন্যথা।
স্ত্রীজাতির হৃদয়
প্রতারণাময়,
তাহাদের কিছুমাত্র নাহিক বিশ্বাস"
—ছাড়িলেন হেথা বক্তা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস।

২৩

"ভদ্রগণ ইহার যদি উদাহরণ চা'ন,
দেখবেন ইয়ুরোপে ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

আর আমার এ বিষয়ে সুদৃঢ় বিশ্বাস
স্ত্রীরা করেনা মোটেই স্বামীর সঙ্গে বাস
ইয়ুরোপখণ্ডে;
বরং দণ্ডে দণ্ডে—
স্বামীদের সব মারে চাবুক কর্ত্তে চায় গুলি;
বেড়ায় তাদের ঘুরিয়ে নিয়ে চখে'দিয়ে ঠুলি।
আমি এটি জানি অতি ধ্রুব এবং সত্য
ইংরাজি ভাষায়ই নাই কথা—'পাতিব্রত্য';
এটি শুধু আছে—
হিন্দুর সমাজে—
আরও বোধ হয় কিছু কিছু মোসলমানদের মাঝে।
কেন?—কারণ শুধু তাদের স্ত্রীরা রহে বন্ধ,
কারণ তারা শোকে শুধু আঁস্তাকুড়ের গন্ধ,
কারণ তারা অবরুদ্ধ নবছর থেকে,
কারণ তাদের বিধবারা ব্রহ্মচর্য্য শেখে,
কারণ নাইক, লুকিয়ে ভিন্ন, পুরুষের পানে চাওয়া,
লাগে নাক মুখে বেশী আলো কিম্বা হাওয়া।

২৪

কেউবা বলেন স্ত্রীদের দাও ধর্ম্মনীতি শিক্ষা,
পরে দাও স্বাধীনতা—বিষম পরীক্ষা!
স্ত্রীজাতিকে ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দেওয়াও যা,
গরুটাকে হরিনাম শিক্ষা দেওয়াও তা।
[ভয়ংকর প্রশংসা ও ভয়ঙ্কর হাস্য]
অতএব ভদ্রগণ স্ত্রীদের কার্য্য দাস্য;
স্ত্রীদের উচিত বাসস্থান জানালাহীন ঘরে,
স্ত্রীদের যোগ্য বিহারভূমি প্রাচীর ভিতরে,
স্ত্রীদের বাক্যালাপ শুধু স্বামীর সঙ্গেই সাজে,
স্ত্রীদের উচিত ব্যায়াম শুধু রান্নাঘরের মাঝে।
পেলে বেশী আলো
তাঁদের রং হবে কালো—
বেশী হাওয়াও নয়ক তাঁদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো।
স্ত্রীস্বাধীনতা স্ত্রীশিক্ষা—ভয়ঙ্কর কার্য্য,
বিষম বন্ধুগণ ইহা পরিহার্য্য।
দেখিতে পাবেন সবে মনোরূপ চক্ষে
ইহা ন্যায়ের বিবেকের ও ধর্ম্মেরও বিপক্ষে।"

২৫

বসিলেন বেচারাম সংজ্ঞাহীন প্রায়
ভাবোন্মাদে চ্যারো'পরি—পড়িল সভায়
বজ্রসম করতালি!—স্থির হ'লে' পরে—
সভাস্থলে—ক্রমে উঠে বলিলেন তবে
কেনারাম কর্ম্মকার—"এ সভার অতি
ধন্যবাদপাত্র মাননীয় সভাপতি।"
তা'তে নিধিরাম সর্দ্দার
এবং কুড়োরাম পোদ্দার
'দ্বিতীয়' করিলে,—উঠি' চ্যারখানি ঠেলি
সভাভঙ্গ করিলেন বেচারাম তেলী।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

স্থপতি-রমণী।

১

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ডন এঁরিক ডি ট্রাষ্টামারা টলিডো অবরোধ করেন। কিন্তু টলিডোর রাজা "নিষ্ঠুর" আখ্যায় আখ্যাত হইলেও টলিডোবাসিগণ রাজভক্তির পন্থা হইতে কখনও বিচলিত হয় নাই।

ডন এঁরিকের সৈন্যগণ সিগারেল নামক স্থানে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিল। রাজভক্ত, সাহসী টলিডোবাসিগণ বহুবার সেই হর্ম্ম্যমালাশোভিতা নগরীর সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনকারী স্যান মার্টিনের সেতু পার হইয়া ডন এঁরিকের সেনাদলের শিবির আক্রমণ করিয়াছে এবং বহু সেনা বিনাশও করিয়াছে। এইরূপ আক্রমণ হইতে নিস্তার পাইবার আশায় ডন এঁরিক ঐ সেতু ধ্বংস করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

সিগারেল প্রকৃতির প্রিয়ভূমি, সেস্থানের উর্ব্বরা ভূমি উদ্যানমালা এবং গ্রীষ্মাবাসরাজিতে সুশোভিতা। টির্সো প্রভৃতি স্প্যানিষ কবিগণ কবিতায় সেস্থানের সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। একদিন নিশীথে ডন এঁরিকের সৈন্যগণ সিগারেলে অনেক বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিল এবং সেই কাষ্ঠ স্তূপাকারে সেতুর উপর আনিয়া ফেলিল। ঊষাকালে সেতুর উপর ভীষণ অনল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; সেই অনলশিখার অস্পষ্ট আলোকে সেই সেতু, টেগাস নদীর জলধারা, ডন্‌রড্‌রিগোর প্রাসাদ এবং দূরস্থিত ক্ষুদ্র আরবীয় স্তম্ভ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। অসীমসৌন্দর্য্যসম্পন্ন আল্‌হাম্ব্রানির্ম্মাতা শিল্পীদিগের শিল্পকৌশলে গঠিত, কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ সেই সকল সেতু স্তম্ভ ভীষণ শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল; যেন বর্ব্বরতা কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া চারুশিল্প আর্ত্ত চীৎকারে গগন বিদীর্ণ করিতেছে।

সুপ্তোত্থিত টলিডোবাসিগণ ধ্বংস হইতে সেই সুন্দর সেতু রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে সেই দিকে ছুটিয়া চলিল। কিন্তু হায়, তাহাদিগের সকল চেষ্টাই বিফল হইল। নদীতীরস্থ সকল গিরিগহ্বরে ও উপত্যকায় প্রতিধ্বনিত এক ভীমনাদে তাহারা বুঝিল, যে সেতু ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। যখন নবোদিত সবিতার কনককিরণ নগরের হর্ম্ম্যচূড়াবলির উপর নিপতিত হইল, তখন টলিডোবাসিনী রমণীগণ জল আনয়নার্থ নদীতে যাইয়া শূন্যপাত্রহস্তে বিফলশ্রম

হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল; নদীর স্ফটিকোপমের স্বচ্ছ নির্ম্মল জলধারা সেতুর ভগ্নাবশেষ ও ভস্মপাতে আবিল হইয়া গিয়াছে; অর্দ্ধপ্রজ্বলিত ধূমায়িত সেতুভগ্নাবশেষ সকল তখনও নদীবক্ষে ভাসিয়া যাইতেছে।

প্রিয় ভূমি সিগারেলে যাইবার একমাত্র পথ স্যানমার্টিনের সেতু ধ্বংস হওয়ায় টলিডোবাসিগণ মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। সেনাদল একত্রিত করিয়া তাহারা আর একবার শত্রুদিগকে আক্রমণ করিল। শোণিতধারা প্রবাহিত হইল; শত্রুগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল।

২

স্যানমার্টিনের সেতু ধ্বংস হইবার পর বহু বৎসর বহিয়া গিয়াছে। নৃপতি ও প্রধান ধর্ম্মযাজকগণ সেইরূপ দৃঢ় এবং সুন্দর আর একটি সেতু গঠনের সঙ্কল্প করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই। প্রথিতযশ স্থপতিদিগের কৌশল ও অধ্যবসায় তাঁহাদিগের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে সমর্থ হয় নাই। বড় বড় খিলান গঠন সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই খরতোয়া স্রোতস্বতী ভারা ও সেতুর পূর্ব্বগঠিত অংশ ভাসাইয়া লইয়া যায়।

প্রধানধর্ম্মযাজক ডনপিড্রো টিনোরিয়ো নগরের গৌরবরক্ষার্থ নৃপতির সমান যত্নই করিতেন। ঐ সেতু পুনর্নির্ম্মাণার্থ সর্ব্বদেশের শিল্পীদিগকে আহ্বান করিবার জন্য তিনি লোক পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু কেহই ঐ দুরূহ কার্য্য সাধন করিতে অগ্রসর হয় নাই। সকলেই উহা অসাধ্য বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল।

পরিশেষে একদিন একজন অপরিচিত পুরুষ ও একজন অপরিচিতা রমণী "কেন্দ্র নদ্বার" দিয়া টলিডো নগরে প্রবেশ করিল। তাহারা সেতুর ধ্বংসাবশেষ বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিল; তাহার পর তৎসন্নিকটে একটা বাড়ী ভাড়া লইয়া সেখানে অবস্থিতি করিল।

তাহার পরদিবস ঐ পুরুষ প্রধান ধর্ম্মযাজকের গৃহে গমন করিল। তখন তিনি তাঁহার গুণমুগ্ধ অন্যান্য ধর্ম্মযাজক, বিদ্বান নগরবাসী এবং জ্ঞানিগণের সহিত কথোপকথনে ব্যাপৃত ছিলেন। একজন স্থপতি তাঁহার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিতেছেন শুনিয়া তিনি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে গমন করিলেন। সম্ভাষণান্তে তিনি তাঁহাকে বসিতে বলিলেন।

শিল্পী বলিল "আমার নাম বোধ হয় আপনি কখনও শুনেন নাই; আমার নাম জুয়ান ডি আরিভেলো। আমি ব্যবসায়ে স্থপতি।"

ধর্ম্মযাজক বলিলেন "সিগারেল এবং নগর এতদুভয়ের মধ্যে গমনাগমনের পথ স্যানমার্টিনের সেতু পুনর্নির্ম্মাণার্থ আমি শিল্পিদিগের যে আহ্বান ঘোষণা করিয়াছিলাম, আপনি কি তাহাই শুনিয়া এখানে আসিয়াছেন?"

"সেই আহ্বানেই আমি টলিডোয় আসিয়াছি।"

"সেতু নির্ম্মাণে যে সকল বিঘ্ন আছে, আপনি কি সে সকল অবগত আছেন?"

"আমি সে সকল অবগত হইয়াছি। আমি সে সকল অতিক্রম করিতে পারিব।"

"আপনি কোথায় স্থপতিবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন?"

"সালামান্কায়।"

"আপনার শিল্পকৌশলের পরিচায়ক কি কি কার্য্য আপনি আমাকে দেখাইতে পারেন?"

"কোন কার্য্য দেখাইতে আমি অসমর্থ।"

ধর্ম্মযাজকের বদনে অবিশ্বাস ও অধৈর্য্যব্যঞ্জক ভাব লক্ষিত হইল।

শিল্পী বলিতে লাগিল, "যৌবনে আমি সৈনিক ছিলাম; পীড়িত হইয়া বাধ্য হইয়া অস্ত্র ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া জন্মস্থান ক্যাসটাইলে প্রত্যাবর্ত্তন করি। সেখানে আমি স্থপতিবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলাম।"

"কিন্তু আপনি যে আপনার শিল্পবিদ্যার পরিচায়ক কোন কার্য্যই দেখাইতে পারিলেন না।"

"টরমেস এবং ডুরো নদীর উপরিস্থিত অনেক সেতু নির্ম্মাণের যশ বাস্তবিক আমারই প্রাপ্য।"

"আমি আপনার কথা বুঝিতে পারিতেছি না।"

"আমার দারিদ্র্য নিবন্ধন কেহ আমাকে চিনিত না। আমি কেবল জীবিকা উপার্জ্জনেই সমর্থ হইয়াছিলাম; যশ অন্যের ভাগ্যে পতিত হইয়াছিল।"

"কিন্তু আমরা যে আপনার কথায় বিশ্বাস করিয়া হতাশ হইব না, তাহার প্রমাণ কি?"

"আমি সন্তোষজনক অঙ্গীকার করিব।"

"আপনি কি অঙ্গীকার করিবেন?"

"আমার জীবন।"

"বুঝাইয়া বলুন।"

"যখন মধ্যখিলানের ভারা সরান হইবে, তখন আমি সেতুভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া থাকিব। যদি সেতু পতিত হয়, তবে আমি নিষ্পেষিত হইব।"

"আপনার অঙ্গীকারে আমি সম্মত হইলাম।"

"আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করুন। আমি সেতু নির্ম্মাণ করিতে পারিব।"

জুয়ান বিদায় লইয়া আনন্দোচ্ছ্বসিত হৃদয়ে গৃহে ফিরিল। তাহার পত্নী উদ্বেগান্দোলিত হৃদয়ে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। শিল্পিসীমন্তিনী অল্পবয়স্কা এবং দারিদ্র্য ও দুঃখের কশাঘাত সহ্য করিয়াও অনিন্দ্যসুন্দরী।

পত্নীকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া শিল্পী বলিল, "ক্যাথারিন, টলিডোর সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনকারী স্তম্ভসমূহের মধ্যে জুয়ান ডি আরিভেলোর নাম বংশপরম্পরায় খ্যাত করিবার জন্য একটা কীর্ত্তি স্তম্ভ এবার নির্ম্মিত হইবে।"

৩

বহুদিন গিয়াছে। নির্জ্জন বন্ধুর গিরিচূড়াবলি অতিক্রম করিয়া টেগাস্ তীরে যেখানে পূর্ব্বে ফ্লোরিন্ডার উদ্যান ছিল, সেখানে দাঁড়াইয়া টলিডোবাসিগণ বিষণ্ণভাবে এখন আর বলে না, "পূর্ব্বে এই স্থানে স্যানমার্টিনের সেতু ছিল।" যদি এখনও সেতুর ভারা সরান হয় নাই, তথাপি মধ্যখিলান নির্ম্মাণ প্রায় শেষ হইয়াছে। নবনির্ম্মিত সেতু পুরাতন সেতুর ভগ্নাবশেষের উপর দৃঢ়ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে।

নদীর প্রখর স্রোত সত্ত্বেও মধ্যখিলান নির্ম্মাণ করায় নগরবাসিগণ ও প্রধান ধর্ম্মযাজক শিল্পীর প্রভূত প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

স্যান ইল্ডিফোন্সোর উৎসবের পূর্ব্বাহ্নে জুয়ান বিনীত ভাবে প্রধান ধর্ম্মযাজককে জানাইল যে সেতু নির্ম্মাণ শেষ হইয়াছে, কেবল ভারা সরাইলেই হয়। সেই সকল বৃহৎ বৃহৎ ভারা সরান বড় সহজ ব্যাপার নহে; তবে শিল্পী ভিত্তিমূলে দাঁড়াইয়া যশ বা মৃত্যু লইবার অঙ্গীকার করায় সকলেই তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়াছিল।

স্থির হইল যে পর দিবস সমারোহের সহিত সেতু খোলা হইবে। এই সংবাদ প্রচার করিবার জন্য টলেডোর সকল গির্জ্জায় আনন্দসূচক ঘণ্টাধ্বনি হইতে লাগিল। টেগাস-তীরে গিরিশিখরে দাঁড়াইয়া টলিডোবাসিগণ পূর্ব্বসেতু-ধ্বংসে পরিত্যক্ত সিগারেলের কথা ভাবিতে লাগিল, আর পর দিবস হইতে সেখানে যাইতে পারিবে ভাবিয়া আনন্দোৎফুল্ল হইতে লাগিল।

সেতু খোলার বন্দোবস্ত শেষ হইয়াছে কি না দেখিবার জন্য সন্ধ্যার প্রাক্কালে জুয়ান সেতুর উপর উঠিল এবং সেতু পরীক্ষা করিতে লাগিল। সহসা শিল্পীর বদনে নিরাশার ছায়া পতিত হইল, মন চিন্তা-তরঙ্গ-সঙ্কুল হইয়া উঠিল; তাহার শরীর সিহরিয়া উঠিল; শিরার শোণিত শীতল হইয়া গেল! সেতু হইতে অবতরণ করিয়া শিল্পী দ্রুতপদে গৃহে গেল।

দ্বারদেশে শিল্পিসিমন্তিনী স্বামীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। সহাস্যবদনে রমণী স্বামীকে আহ্বান করিল; কিন্তু শিল্পীর যাতনাব্যঞ্জক মুখ দেখিয়া তাহার মুখ ম্লান হইয়া গেল। ভীতিপ্রকাশকস্বরে স্থপতিরমণী বলিল, "প্রিয়তম জুয়ান, তুমি কি পীড়িত হইয়াছ?"

হৃদয়ের ভাব মুখে অপ্রকাশিত রাখিবার চেষ্টা করিয়া জুয়ান বলিল, "আমি পীড়িত হই নাই।"

"আমাকে প্রতারণা করিও না! তোমার মুখ দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিতেছি, তুমি হৃদয়ে ব্যথা পাইয়াছ।"

"আজ শীত বড় প্রবল ; আর আজ আমার পরিশ্রমও কিছু গুরুতর হইয়াছে।"

"তবে ঘরে আসিয়া অগ্নির পার্শ্বে উপবেশন কর। আমি ততক্ষণ খাদ্য প্রস্তুত করিয়া আনি। আহারান্তে বিশ্রাম করিলে তুমি সুস্থ হইতে পারিবে।"

ক্লিষ্ট হৃদয়ে কাতর অস্ফুটস্বরে শিল্পী বলিল, "আমি আবার সুস্থ হইব !!!" সে অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বেই উপবেশন করিল। তাহার স্ত্রী অগ্নিকুণ্ডে কতকগুলা কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিয়া আহার প্রস্তুত করিতে গেল।

জুয়ান আনন্দিত হইতে অনেক চেষ্টা করিল ; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইল না। তাহার পত্নীকে প্রতারিত করা অসম্ভব।

শিল্পিরমণী বলিল, "আমাদিগের বিবাহিত জীবনে এই প্রথমবার তুমি, আমার নিকট তোমার দুঃখ গোপন করিতেছ। আমি কি আর তোমার প্রেম ও বিশ্বাসের উপযুক্ত নহি ?"

ক্লিষ্টস্বরে শিল্পী বলিল, "ক্যাথারিন, তোমার প্রতি আমার ভালবাসায় সন্দেহ করিয়া আমায় যাতনা দিয়ো না।

কাতরকণ্ঠে রমণী বলিল, "যেখানে বিশ্বাস নাই, সেখানে প্রকৃত প্রেম নাই।"

"তোমার এবং আমার হিতের জন্য আমার কষ্টের কারণ আর জানিতে চাহিয়ো না।"

"তুমি কোন যন্ত্রণা পাইয়াছ, আমি তাহা জানিতে ও তাহা লাঘব করিতে চাহিতেছি।"

"তাহা লাঘব করা অসম্ভব।"

"আমার প্রেমের মত প্রেমের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে।"

"তবে শুন। কাল আমার জীবন ও যশ উভয়ই শেষ হইবে। কাল সেতু নদীতে ভাঙ্গিয়া পড়িবে। আর এত আশা ভরসা করিয়া আমি যে সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম, সেই সেতুভিত্তির উপর আমিও নিষ্পেষিত হইব।"

রমণীহৃদয় কম্পিত হইল। গভীরপ্রেমে পতিকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া শিল্পিরমণী বলিল, "না ! তাহা হইবে না।"

"প্রিয়তমে, তাহাই হইবে। যখন আমি কৃতকার্য্য হইয়াছি ভাবিয়াছিলাম, তখনই দেখিলাম যে আমার হিসাবে ভুল হইয়াছে। কাল সেতু ভাঙ্গিয়া পড়িবে, আর তাহার সহিত যে শিল্পী তাহার কল্পনা করিয়াছিল, সেও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।"

"সেতু ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে, কিন্তু তোমার কিছুই হইবে না। আমি ভূমিসংলগ্ন জানু হইয়া সহৃদয় ধর্ম্মযাজকের নিকট তোমার প্রতিজ্ঞা অপূর্ণ রাখিবার আজ্ঞা ভিক্ষা করিব।"

"তোমার ভিক্ষায় কোনও ফল হইবে না। আর ধর্ম্মযাজক সম্মত হইলেও আমি যশোহীন জীবন রাখিব না।"

শিল্পীরমণী বলিল, "তুমি যশ এবং জীবন উভয়ই পাইবে।"

৪

গভীর রাত্রি। যাতনা এবং পরিশ্রমে কাতর হইয়া জুয়ান নিদ্রিত হইয়াছে। তাহার এ নিদ্রা শান্তিদায়িনী, যন্ত্রণামোচনকারিণী নিদ্রা নহে, ইহা দুঃস্বপ্নসঙ্কুল। এতক্ষণ তাহার স্ত্রী নিদ্রার ভাণ করিয়াছিল, এবং উদ্বিগ্নহৃদয়ে স্বামীকে লক্ষ্য করিতেছিল। ক্যাথারিন যখন নিশ্চয় বুঝিল যে শিল্পী নিদ্রাভিভূত, তখন সে ধীরে ধীরে শয্যা পরিত্যাগ করিল। নিঃশব্দে রুদ্ধশ্বাসে রমণী রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল এবং সতর্কভাবে ধীরে ধীরে বাতায়নমুক্ত করিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিল,—গগনমণ্ডল গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ; মধ্যে মধ্যে সেই ঘনান্ধকার মধ্যে মেঘের বিকশিত বিদ্যুদ্দণ্ড দৃষ্ট হইতেছে। টেগাস নদীর জলস্রোতের গর্জ্জন

এবং সেতুর ভারা মধ্য দিয়া প্রবাহিত পবনের শব্দ ভিন্ন আর কোন শব্দই শ্রুতিগোচর হয় না।

ক্যাথারিন নিঃশব্দে বাতায়ন রুদ্ধ করিল, তাহার পর অগ্নিকুণ্ড হইতে একখানা অর্দ্ধপ্রজ্বলিত কাষ্ঠ লইয়া স্কন্ধে একটা গরম কাপড়ের আবরণবস্ত্র ফেলিয়া সেই ঘনান্ধকার-ব্যাপ্ত পথে বাহির হইল। তাহার হৃদয় বেগে আঘাত করিতে লাগিল।

স্থপতিরমণী এই অন্ধকারে কোথায় যাইতেছে ?—অপহৃত জ্যোৎস্নাশ্রী রজনীতে আপনার পথ দেখিবার জন্য কি সে অর্দ্ধপ্রজ্বলিত কাষ্ঠখণ্ড লইয়াছে ? পথ বড়ই বন্ধুর, আবার প্রস্তরখণ্ড সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত—কাজেই অন্ধকারে সে পথে গতায়াত করা সহজ নহে, তথাপি শিল্পিরমণী সেই কাষ্ঠখণ্ড লুকাইতেই চেষ্টা করিতেছে !

রমণী সেতুর পাদদেশে উপনীত হইল। তখনও পূর্ব্বের মত শব্দে বায়ু বহিতেছে, আর বাধা অতিক্রমে অসমর্থ হইয়া টেগাসের তরঙ্গমালা যেন ক্রোধাবেগেই সেতুস্তম্ভমূলে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। রমণীর হৃদয় ভয়ে কম্পিত হইল। টেগাসের তীব্রবেগে প্রবাহিত স্রোতকূলে দাঁড়াইয়াছিল বলিয়াই কি রমণী ভয়ে কম্পিতা হইল ? এ ভীতি কি তাহার সৎকার্য্য-ব্যাপৃত করে ধ্বংসের আলোক দেখিয়াই উৎপন্ন হইতেছিল ? তাহা নহে, সেই সময় দিগন্তধ্বনিত করিয়া বজ্রপাত শব্দে রমণীহৃদয় কম্পিত হইল।

ভাল করিয়া জ্বালাইয়া লইবার জন্য কাষ্ঠখণ্ড ঘুরাইয়া লইয়া ক্যাথারিন ভারায় অগ্নিপ্রয়োগ করিল। ভারার শুষ্ককাষ্ঠ শীঘ্রই প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। বায়ুবেগে বহিতেছিল, সুতরাং অগ্নি শীঘ্রই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। অতি সত্বর স্তম্ভ, খিলান প্রভৃতি সমস্তই অগ্নিময় হইয়া উঠিল।

রমণী দ্রুতপদে সেতুমূল পরিত্যাগ করিল, গগনবক্ষভেদকারী চপলার ক্ষণস্থায়ী আলোকে ও অগ্নিময় সেতুর অনলশিখার অস্পষ্ট আলোকে পথ দেখিয়া ক্যাথারিন শীঘ্রই পথ অতিক্রম করিয়া গৃহদ্বারে উপনীত হইল। গৃহে প্রবেশ করিয়া সে নিঃশব্দে দ্বার রুদ্ধ করিল এবং নিদ্রার ভাণ করিয়া শয্যায় শয়ন করিয়া রহিল ; যেন সে একবারও শয্যাত্যাগ করে নাই। ইতিমধ্যে জুয়ান জাগ্রত হয় নাই, কাজেই পত্নীর অনুপস্থিতির বিষয় কিছুই জানিতে পারে নাই।

অল্পক্ষণ পরেই নগরে এক মহা কোলাহল উত্থিত হইল। প্রত্যেক ঘণ্টাঘর হইতে বিপৎসূচক ঘণ্টাধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। ভীষণশব্দে সেতু ভাঙ্গিয়া পড়িল, বহুদিন পূর্ব্বে শত্রুগণ কর্ত্তৃক সেতু ধ্বংসকালে টলিডোবাসিগণ যেরূপ আর্ত্তনাদ করিয়াছিল আবার সেইরূপ আর্ত্তনাদ শ্রুত হইল।

কোলাহলে জুয়ানের নিদ্রাভঙ্গ হইল। যত সত্বর সম্ভব বেশপরিবর্ত্তনান্তে জুয়ান কোলাহলের কারণ নির্ণয়ার্থ গৃহের বাহিরে আসিল। সেতুর ধ্বংসাবশেষের উপর অগ্নি জ্বলিতেছে দেখিয়া যে বাস্তবিক সে আনন্দিত হয় নাই এমন কথা বলিতে পারি না।

টলিডোবাসিগণ এবং প্রধান ধর্ম্মযাজকও স্থির করিলেন যে বজ্রপাতে মধ্য খিলানে বিদ্যুৎ স্পর্শ বশতঃই এদুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। সাধারণের শোক যে অত্যন্ত গভীর হইল, তাহা বলাই বাহুল্য, কিন্তু হতাশ শিল্পীর জন্য লোকের সহানুভূতিও কম হয় নাই। বিদ্যুৎ কি কোন মানবহস্ত সংযোজিত অগ্নি এই দুর্ঘটনার কারণ টলিডোবাসিগণ, তাহা জানিতে পারিল না। জুয়ান ধর্ম্মপরায়ণ এবং ঈশ্বরের দয়ায় দৃঢ়বিশ্বাসী—তাহার বিশ্বাস হইল যে বিদ্যুৎ সংস্পর্শেই এ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

সেতুধ্বংসে জুয়ানের যশোলাভ এক বৎসরের জন্য স্থগিত রহিল মাত্র। পর বৎসর স্যান ইল্‌ডিফোন্‌সোর উৎসবের দিন তাহার নবনির্ম্মিত সেতু প্রধান ধর্ম্মযাজক কর্ত্তৃক উৎসবের সহিত মুক্ত করা হইল। সেই দিন ধর্ম্মযাজকের গৃহে একটা বৃহৎ ভোজের আয়োজন হইল। ধর্ম্মযাজক স্থপতি ও স্থপতিরমণীকে আপনার দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইয়া, সম্মানিত করিলেন। নগরবাসিগণ মহানন্দে জুয়ান ও তাহার পত্নীকে গৃহে লইয়া গেল।

তাহার পর পাঁচ শত বৎসর হইয়া গিয়াছে। আজিও জুয়ানের সেতু টেগাসের তরঙ্গভঙ্গভীষণ জলধারার উপর স্থিরভাবে দণ্ডায়মান। তাহার দ্বিতীয় বারের হিসাবে কোনও ভূল ছিল না। *

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

তুষলা।

বঙ্গদেশে অগ্রহায়ণ ও পৌষমাসে বালিকাদের মধ্যে দুইটী উৎসব হইয়া থাকে। অগ্রহায়ণ মাসে যে উৎসব হয়, তাহা ইয়তী বা ইতুদেবের পূজা উপলক্ষে; এবং পৌষ মাসে যে উৎসব হয়, তাহা তুষলাদেবীর পূজা উপলক্ষে। ইয়তী দেবের পূজার কথা পরে বলিব। অদ্য তুষলাদেবীর পূজার কথা কিছু বলা যাউক।

তেত্রিশকোটি দেবতার মধ্যে তুষলা দেবীর নাম নাই। কিন্তু, তাহা হইলেও, তাঁহার পূজার মন্ত্র বা ছড়া আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছি যে, তুষলা দেবী লক্ষ্মী দেবীরই নামান্তর মাত্র। পাঠকবর্গও ছড়া পাঠ করিয়া তাহাই বুঝিবেন, সন্দেহ নাই। এখন পৌষমাসে তুষলা বা লক্ষ্মী দেবীর পূজা হয় কেন, তাহাই আলোচনা করা যাউক।

ধরিতে গেলে, পৌষমাসটিই লক্ষ্মী দেবীর "খাস্" মাস। আর কোনও মাসে গৃহস্থের ঘরে এমন আর লক্ষ্মীশ্রী দেখা যায় না। পৌষমাসে ধান্য পাকিতে আর বাকী থাকে না। গৃহস্থ মাঠ হইতে ধান্য কাটিয়া গৃহে আনিল। ঘর ধন-ধান্যে বা ধান্য-ধনে পরিপূর্ণ। অন্নের আর অভাব নাই। যত দিন মাঠের ধান মাঠেই ছিল, ততদিন গৃহস্থের মনে কত আশঙ্কা, কত বিভীষিকা! সে আশঙ্কা তিরোহিত হইয়াছে। গৃহস্থ এখন সপুত্রপরিবারে একবৎসরকাল প্রত্যহ দুইবেলা পবিত্র অন্ন ভোজন করিতে পারিবে এবং অতিথি অভ্যাগতকেও এক মুঠা খাওয়াইতে পারিবে। ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে? গৃহস্থ ধান্যাদি ঘরে তুলিয়া এখন নিশ্চিন্ত মনে ও স্বচ্ছন্দচিত্তে দুই এক মাসের মধ্যেই অবিবাহিত পুত্র কন্যাদের বিবাহ দিতে পারিবে। একে "চমৎকারা অন্নচিন্তা" নাই, তাহার উপর আবার পুত্র কন্যাদের পবিত্র বিবাহোৎসবের প্রত্যাশা! এই দুই আনন্দের সম্মিলনে বৃদ্ধ বৃদ্ধাদেরও যৌবন ফিরিয়া আইসে, যুবক যুবতী এবং বালক বালিকাদের কথা এস্থলে তো না ধরিলেও চলে। যাঁহার কৃপায় গৃহস্থ-পরিবার এরূপ আনন্দের অধিকারী হইতে সমর্থ হয়, সেই লক্ষ্মীদেবীর পূজা তাহারা কায়মনোবাক্যে করিয়া থাকে। যখন জননী যথোপচারে লক্ষ্মীদেবীর পূজা করিবেন, তখন কন্যারাই বা না করিবে কেন? গৃহের বালিকারা অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তি দিনে মাটীর একটী নূতন খোলাতে কিঞ্চিৎ তুষ দিয়া তাহার উপর গোবরের তিনটি পিণ্ড বা ঢেলা রাখে এবং সেই ঢেলাগুলির উপরে এক একটী কড়ি বসাইয়া তাহা সিন্দূরে মণ্ডিত করে। অনন্তর সেই সংক্রান্তি দিবস হইতে আরম্ভ করিয়া পৌষমাসের সংক্রান্তি পর্য্যন্ত বালিকারা প্রত্যহ সেই খোলা পুষ্পদ্বারা সজ্জিত করে এবং সন্ধ্যার সময় সকলে একত্র হইয়া তুষলার ছড়া গাহিতে থাকে। এ দৃশ্যটি দেখিতে অতিশয় সুন্দর। কেবল যে ছোট ছোট বালিকারাই তুষলা দেবীর মন্ত্র বা ছড়া গাহিয়া থাকে, তাহা নহে। আমরা দেখিয়াছি, সুযোগ ও সুবিধা দেখিয়া গৃহস্থের যুবতী কন্যা এবং পুত্রবধূরাও সময়ে সময়ে বালিকাদের সহিত যোগদান করিয়া থাকেন! তুষলার ছড়ার এমনই আকর্ষণী শক্তি যে, অনেক সময় বৃদ্ধারাও সেই ছড়া-গায়িকা বালিকাদের মাঝখানে আসিয়া পড়েন!

খোলার মধ্যে তুষ থাকে বলিয়া দেবীর নাম "তুষলা" হইয়া থাকিবে। কিন্তু নামটি বড়ই সুন্দর। লক্ষ্মীদেবীর তুষ্টিসাধনের জন্যই তুষলার পূজা। এ সংসারে কোন্ ব্যক্তি না তুষলাদেবীর তুষ্টিসাধনে যত্নবান্ থাকেন? তাই বলিতেছিলাম, লক্ষ্মীদেবীকে "তুষলা" বলিলে বোধ হয় কোনও আভিধানিক দোষ হয় না।

* অ্যাণ্টোনিয়োট্রুইবারের স্প্যানিষগল্পের ইংরাজী অনুবাদ হইতে অনূদিত। লেখক।

পৌষমাসের শ্রী বা লক্ষ্মীদেবীই "পৌঝুরী" বা তুষলা। বালিকারা গাহিয়া থাকে :—

"পৌষ মাসের পৌঝুরী।
ধানে কাপাসে ঘর করি॥
এঁড়ে গরুর সারে।
তুষলা এল ঘরে॥
তিনটি সারের ঢেলা।
তুষলা গো এলা॥
ধান সব মাঠে গোঠে।
চল তুষলা ঘরে উঠে॥

এস পৌষ যেও না।
জনম জনম ছেড়ো না॥
যদিবা ছাড়িবে তুমি।
পুরাণে মরিব আমি॥
পৌঝুরী গো এস।
পিঁড়ের উপর বস॥
হব তোমার দাসী।
আনন্দেতে ভাসি॥

* * * * *

কি সুন্দর করুণ গীতি! হে তুষলে, পৌষ মাসে তোমার কৃপায় আমরা "ধানে কাপাসে" ঘর করিতেছি। তোমার আশীর্ব্বাদে আমাদের অন্নবস্ত্রের আর অভাব নাই। হে পৌষের লক্ষ্মী শ্রী, যদি তুমি কৃপা করিয়া আমাদের ঘরে আসিয়াছ, তবে আর যাইও না এবং তুমি আমাদিগকে জন্মে জন্মেও পরিত্যাগ করিও না। যদি তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে আমরা "পরাণে মরিব।" তুমি আসিয়াছ; তুমি ঐ পিঁড়ের উপর বস। আমরা তোমার চরণের দাসী হইয়া থাকিব।

বাঙ্গালী অন্নের জন্য,—লক্ষ্মীদেবীর কৃপালাভের জন্য,—কিরূপ ব্যাকুল, তাহা বালিকাদের পূর্ব্বোক্ত করুণ গীতিটিতেই স্পষ্ট পরিব্যক্ত হইতেছে। অনেক করুণগীতি ও কাতরোক্তি পাঠ ও শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু

"এস পৌষ, যেও না।
জনম জনম ছেড়ো না॥
যদি বা ছাড়িবে তুমি।
পরাণে মরিব আমি॥"

বঙ্গবালাদের এই মধুর করুণ গীতি শ্রবণ করিয়া প্রাণের মধ্যে যে অবসাদ, হুতাশ ও ঔদাস্য আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা ভাষায় প্রকাশিত করিতে পারা যায় না। হায় বাঙ্গালী, তুমি চিরকাল অন্নের জন্য লালায়িত, এবং জীবনসংগ্রামের [illegible] দোষের [illegible] আড়ষ্ট! তোমার ভয় ও নৈরাশ্যের ছায়া [illegible]চিত?—নগৃহের দুগ্ধপোষ্যা সুকুমারী বালিকাদের মধ্যেও আ[illegible]জন বাদ[illegible]ড়িয়াছে, তখন কি আর তোমার দুঃখ কাহিনী [illegible] বিদ্য[illegible]কিছু বাকী থাকে?

[illegible]াছি, কে
[illegible] লে
[illegible]রর ত
[illegible]ত স

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

স্বাধীন ও পরাধীন নারীজীবন।

ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডে যেমন অসীম প্রভেদ—ভারত ও ব্রিটন মহিলার মধ্যেও সেইরূপ মহা বিভিন্নতা দেখা যায়। একজন দুর্ব্বল, ভীরু ও পরপ্রত্যাশী—অন্য জন বলিষ্ঠ, সাহসী ও আত্মনির্ভর। একটি কর্ম্মভূমিতে স্বামি-পুত্রদের জীবনে অন্তরায় স্বরূপ—অন্যটী সকল কাজেই পুরুষদের সহায়। এই দুটী নারীজীবনের এ অসীম প্রভেদের কারণ কি, তাহাই আমি সাধ্যমত দেখাইবার চেষ্টা করিব।

পূর্ব্বে আমি ভাবিতাম—লেখা পড়া শিখিলেই আমাদের চোক ফুটিবে—আমরা সাহসী, আত্মনির্ভর ও ভালমন্দ বিবেচনায় সক্ষম হইব। কিন্তু এখন দেখিতেছি সে ধারণা আমার ভূল। আমাদের মাতা ও মাতামহীরা যতদূর আত্মনির্ভর ও সদসৎ বিবেচনায় পারগ ছিলেন, আমাদের কন্যারা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পর-প্রত্যাশী ও ভালমন্দ নির্ণয়ে অক্ষম হইয়া এক সিঁড়ি নীচে নামিয়া পড়িয়াছে। ইহা যে বিদ্যাশিক্ষা অভাবে হইয়াছে, তাহা কখনই বলিতে পারা যায় না। এই পঞ্চাশ বৎসরে ভারতবর্ষে যেরূপ স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলন ও উপায় হইয়াছে, পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বে কিছু আর এ সব কিছুই ছিল না। আমাদের দিদিমায়েরা লেখাপড়ার নামমাত্র জানিতেন না, আমাদের জননীরা বাঙ্গালা শিখিয়াছিলেন মাত্র—কিন্তু আমাদের কন্যারা ইংরাজী পর্য্যন্ত শিখিয়াছে—অথচ তাহাদের মন অধিকতর সংকীর্ণ ও তাহাদের জীবনের কর্ম্মস্থান অধিকতর অপ্রশস্ত হইয়া উঠিতেছে—ইহার কারণ কি? সেকাল হইতে একালের হিন্দুনারীর জীবনের গতি ক্রমশঃ উচুঁ দিকে না গিয়া নীচগামী হইতেছে কেন?

আমি এখন স্পষ্ট দেখিতেছি ও দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করিতেছি—হিন্দু নারীদের এই নীচগামী অবস্থার প্রথম ও প্রধান কারণ—সম্পূর্ণরূপে অবরোধপ্রথা ও পরনির্ভরতা! ইংরেজ মহিলাদের বাদ দিলেও এই ভারতবর্ষের মধ্যেই আমরা দেখিতে পাই, যে, যে জাতির মধ্যে অপেক্ষাকৃত স্ত্রীস্বাধীনতা চলিত আছে, তাহাদের স্ত্রীলোকদের অবস্থাই অধিকতর উন্নত, আর সেই স্বাধীন নারীদের জীবন অধিকতর কর্ম্মক্ষম, সাহসী ও আত্মনির্ভর। অনেকেই জানেন, পার্সীদের মধ্যে অবরোধপ্রথা হিন্দুদের ন্যায় অত দৃঢ় নহে,

সে জন্য পার্সী নারীরাও তাঁদের হিন্দু ভগিনীদের অপেক্ষা অধিক সাহসী, বলিষ্ঠ ও আত্মনির্ভর। যিনি একবার বোম্বাই প্রদেশে গিয়াছেন, তিনিই তাহাদের সতেজ বদন ও কর্ম্মিষ্ঠ জীবন দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছেন। পার্সীগৃহে স্ত্রীলোক সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্রই পূজিতা হইয়া থাকে—জননী, তাঁর অবর্ত্তমানে স্ত্রীই, সংসারের প্রকৃত রাণী—তাঁর উপর জোর চালাইবার পুরুষ রাজারও অধিকার নাই। শত শত বৎসর পূর্ব্বে পার্সীরা আচার ব্যবহার সম্বন্ধে যেরূপ ছিল এখনও সেইরূপই আছে। তাহাদের স্ত্রীকন্যারা এখন পূর্ব্বাপেক্ষা বিদ্যাশিক্ষা করিবার অধিক উপায় ও অবসর পাইয়াছে সত্য—কিন্তু উহার সঙ্গে তাহারা সেই পূর্ব্বের স্বতন্ত্রতা টুকু হারায় নাই বলিয়া উহাদের জীবন এখন সংসারে অধিকতর উজ্জ্বল ও অধিকতর উপকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আবার দেখ, কাশ্মীর, সিকিম, ভুটান প্রভৃতি হিমালয় প্রদেশের পাহাড়ী স্ত্রীদের জীবন যে কত মার্জ্জিত, কর্ম্মিষ্ঠ ও স্বতন্ত্র, তাহা দেখিলে হৃদয়বান্ ব্যক্তি মাত্রেই আহ্লাদিত হন। তাহাদের পরিচ্ছদ অতি ভদ্র, চালচলন অতি সুমার্জ্জিত—আর তাদের জীবন সংসারে পুরুষদের অপেক্ষাও অধিক উপকারী। তাহারা বিদ্যার নাম মাত্র জানে না; কিন্তু বাল্যকাল হইতে পুরুষজাতির সঙ্গে সমানে স্বাধীনতা ভোগ করিয়া তাহাদের জীবন এতদূর সাহসী, সতেজ ও কর্ম্মক্ষম হয় যে, দেখিলে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

পূর্ব্বে স্ত্রীশিক্ষার কোন উপায় ছিল না বটে, কিন্তু সংসারে স্ত্রীজাতির উপর পুরুষদের একটা সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর ছিল—তাঁহারা অন্যান্য স্বতন্ত্র স্ত্রীদের ন্যায় গৃহের প্রকৃত রাণীস্বরূপ ছিলেন। বড় বড় কর্ম্মে স্বামিপুত্রদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ও তাঁহাদের মত বা অনুমতি লইয়া কাজ করা সকল নারীরই কর্ত্তব্য—কিন্তু ছোট ছোট বিষয়ে নারীজাতিকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রতা দেওয়াই উচিত। প্রকৃত বিশ্বাস ও দায়িত্ব তাহাদিগকে বুঝিতে না দিলে তাহারা কি প্রকারে উহাতে অভ্যস্ত হইবে? আমাদের মা, দিদি-মারা আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করা, কাহারও অসুখ দেখিতে যাওয়া, অতিথি সৎকার পরসেবা করা ও লোকজনকে নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ বিষয়ে যে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন, তাহা আমরা স্বচক্ষেই দেখিয়াছি। কিন্তু এখনকার হিন্দু নারীদের জীবনের বেড় এতদূর সংকীর্ণ ও পরনির্ভর হইয়া পড়িয়াছে যে পিত্রালয়ে ভাইবোনদের পীড়া দেখিতে যাওয়ার ক্ষমতাও তাঁদের নাই। আমরা এখন ঘরে বসিয়া ইংরেজী পুস্তক সকল ও অনেক মনোহর বাঙ্গালা গল্প পড়িয়াও আনন্দিত হইতেছি—সংবাদপত্র পড়িয়া দেশ বিদেশের খবর জানিতে পারিতেছি। আর আমরা পৃথিবীকে 'তিনকোনা' ভাবি না, ভূমিকম্প বাসুকির কাষ পরিবর্ত্তনের ফল মনে করি না সত্য—অথচ বঙ্গনারীর জীবনের কার্য্যতঃ উন্নতি কিছুমাত্রই হয় নাই। আমাদের সে পুঁথিগত বিদ্যা অন্দরমহলের চারিটি দেওয়ালের মধ্যেই বদ্ধ আছে! হঠাৎ বাড়ীর বাহির হবার দরকার হ'লে—মনে কর গত জুলমাসের ভূমিকম্পে যেরূপ হ'য়েছিল পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের হিন্দু মহিলারা নিজেদেরকে যেরূপ রক্ষা করিতে পারিতেন, এখনকার স্ত্রীলোকেরা সেরূপ কিছুতেই পারিবেন না নিশ্চয়। শুনিয়াছি আমাদের পিতামাতামহীরা ভাঁড়ার ঘরে কত সাপ মারিতেন, কিন্তু এখন আমাদের একটা বিছা মারাও দূরে থাক, একটা আরসুলা দেখিয়াই চীৎকার করিয়া উঠি! এই সব দেখিয়াই কি স্বাধীন জীবনের সাহস ও উপকারিতা, আর পরাধীন জীবনের ভীরুতা ও অপকারিতা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারা যায় না?

পূর্ব্ব পশ্চিম সকল দেশ, ও সভ্য অসভ্য সব জাতি খুঁজিয়া দেখিলে আমার বোধ হয় বাঙ্গালার মেয়ের পরাধীন অবস্থার ন্যায় এরূপ নিরবচ্ছিন্ন দুর্ভাগ্য আর কাহারও জীবনে দেখা যায় না। আসিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার মার্জ্জিত জাতিদের বাদ দিয়া, ভারতেরই অন্যান্য ও পাহাড়ী জঙ্গলী জাতি প্রভৃতির নারীর সঙ্গে হিন্দু মহিলাদের মিলাইয়া দেখিয়াছি—বর্ত্তমা[illegible] বঙ্গনারীদের অবরোধ-জীবন অতীব শোচনীয় ও কুক[illegible]রিক। কে[illegible] বৃদ্ধারাও অবস্থা বিশেষরূপে জানিতে হ'লে অ[illegible]ন আসিয়া পড়েন! সাধারণ লোকদের আচার ব্যবহার [illegible]ীর নাম "তুষলা" থাকি। পিতারা কন্যাদের প্রতি কিরূ[illegible]। লক্ষ্মীদেবীর পুত্রেরা মার উপর কি রকম শ্রদ্ধা ভক্তি করে[illegible]রে কোন্ ব্যক্তি মধ্যে কি প্রকার সম্বন্ধ চলিত, ভ্রাতারা ভ[illegible] তাই বলিতে[illegible] মান্য করিয়া চলে, আর সমস্ত সাধারণ পুরুষ স[illegible] হয় কোনও দিগকে কিরূপ চক্ষে দেখে, এই সব রীতি-নীতি প[illegible]

দ্বারা আমরা সেই জাতির প্রকৃত সাংসারিক ও সাধারণ জীবনের সুখ, স্বচ্ছন্দতা ও উন্নতির নির্ণয় করিতে পারি। সুতরাং হিন্দু মহিলাদের স্বাধীনতা আলোচনাকালে প্রথমে আমরা তাদের গার্হস্থ্য জীবন দেখিব।

আমি দুঃখের সঙ্গে জানাইতেছি, দুচারিটী পরিবার বাদ দিলে, প্রায় সমস্ত বাঙ্গালী গৃহেই স্ত্রীজাতি হীনভাবে আচরিত হয়। আর, সকল দিক দেখিয়া ইহাও স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, বাঙ্গালী স্ত্রীদের অবস্থা দিন দিন আরো মন্দ হইয়া দাঁড়াইতেছে! হয় ত আমার এ কথা পড়িয়া কোন পাঠক বলিয়া উঠিবেন—বাপ্ রে! ঠাকুরুণদের আর কিছুতেই মন উঠে না!—আমাদের মা ঠাকুরমারা পচা নারিকেল তৈল মাখিয়া ও মেটে জমিতে বসিয়া দিন কাটাতেন, এখন এঁদের এসেন্সের গন্ধে ও চেয়ার সোফার ভিড়ে ঘর জম্ জম্ করে, তবু কিনা বল্‌ছেন, বর্ত্তমান নারীদের জীবন আরো শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে!! কিন্তু বাস্তবিক এ হাসি তামাসার কথা নয়; আর যিনি গন্ধদ্রব্য ও আরামের জিনিসে প্রকৃত সুখ ও উন্নতি মনে করেন, তাঁর জন্যও আমি এ প্রবন্ধ লিখিতেছি না।

যে নারীজাতির উপর হিন্দুজাতির ভবিষ্যৎ উন্নতি ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে, সেই স্ত্রীলোকদের অবস্থা এদেশে যে ক্রমশঃ আরো শোচনীয় হইতেছে, তাহা কি বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই অস্বীকার করিতে পারেন? মূর্খ, বিদ্বান্, আমরা যে লোকদের সংসারে যাই, সেইখানেই দেখি—জননীর প্রতি পুত্রের অভক্তি, কন্যাদের প্রতি পিতার অবহেলা, ভগিনীদের উপর ভ্রাতাদের অনাস্থা, স্ত্রীর উপর স্বামীর ঘৃণা—ঘরে ঘরে থাকিয়া মনান্তর নামে গর্জ্জন করিতেছে। পুরুষদের তুলনায় বাঙ্গালীর মেয়েরা অতি অল্প শিক্ষিত, তাহা আমি স্বীকার করি; কিন্তু সেই সামাজিক দোষের জন্য নারীজাতির অপমান করা কি ভদ্রের উচিত?—না জ্ঞানীর কর্ম্ম? আমেরিকা ও ইংলণ্ডের দুদশজন বাদ দিলে কোন দেশের স্ত্রীলোকরাই পুরুষের সমান বিদ্যাশিক্ষা করে না। আর আমি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, কেবল বিদ্যাতেই মানুষের মন দৃঢ় ও চৌকোস হয় না। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যতঃ জ্ঞান চাই, বাহিরের অভিজ্ঞতা চাই, তবে ত মানবজীবন সম্পূর্ণরূপে শিক্ষিত, সাহসী ও কর্ম্মক্ষম হইতে পারে। কিন্তু যেখানে প্রকৃত জ্ঞান পাইবার উপায় বন্ধ, সে দেশের স্ত্রীলোকদেরকে আমরা কি প্রকারে সাহসী, বলিষ্ঠ ও আত্মনির্ভর হইবার আশা করিতে পারি?

অনেকে বলিবেন, আজকাল ভারতবর্ষের ব্রাহ্মদের মধ্যে ত স্ত্রীস্বাধীনতা অনেকটা চলিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে ত তেমন সুফল দেখা যাইতেছে না। যাঁহারা স্বাধীনতার ব্যবহার জানেন না, তাঁহাদের পরবশ থাকাই শ্রেয়। অবশ্য, যখন আমাদের ব্রাহ্ম ভ্রাতারা স্ত্রীস্বাধীনতার জন্য বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছেন ও নিজ নিজ স্ত্রীকন্যাদিগকে উহার ফল ভোগ করিতে দিতে উৎসুক, তখন একদিন না একদিন আমরা উহার সুফল পাইবই। কিন্তু সকলের ইহাও মনে রাখা উচিত যে, যে স্বাধীনতা ইংরেজ মহিলারা শত শত বৎসরের পরিশ্রম, চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের বলে পাইয়াছে, আমরা এই পঞ্চাশ ষাট বৎসরের মধ্যেই সেরূপ অবাধ স্বাধীনতা পাইবার উপযুক্ত হই নাই। মানুষ এক দিনে চলিতে শিখে না, পাখীরা একবারে উড়িতে পারে না। চলিবার বা উড়িবার আগে জননীরা শিশুশাবকদিগকে যে কত যত্নে ও কত কষ্টে দাঁড়াইতে বা পাখা মেলিতে শিখায়, তাহা বুদ্ধিমান লোক মাত্রেই জানেন। সেইরূপ স্বাধীনতা পাইবার উপযুক্ত করিয়া হিন্দু মহিলাকে সংসারক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিন—দেখিবেন, তাহারা আর পড়িয়া যাইবে না। তাহাদের জীবন সংসারের ঠিক উপযুক্ত স্থানে অটল, অচল পাহাড়ের ন্যায় থাকিয়া গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে, সন্তানদের শিক্ষক হবে ও স্বামীপুত্রদের সহায় হবে।

আবার এই বহুকাল আটকজীবনের ফলে ভারতে কেবল নারীজাতিই যে দুর্ব্বল, ভীরু ও নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে, শুধু তাহা নহে। হিন্দুদের এই অর্দ্ধক্ষয়প্রাপ্ত জীবনের মূলেও আমরা এই পরাধীনতার শিকড় দেখিতে পাই। অনেকেই নজর করিয়া থাকিবেন, হিন্দুজাতি ক্রমে ক্রমে অধিকতর দুর্ব্বল ও ভীরু হইয়া যাইতেছে। তাহাদের শরীরে সে জোর নাই, মনে সে স্ফূর্ত্তি নাই, জীবনে সে উদ্যম নাই। সকল কাজেই তাহারা অনাস্থা দেখায়, সকল বিষয়েই যেন অবহেলা করে। এরূপ নিরুদ্যম, নিঃসাহস অবস্থায় আর কতকাল আমরা জীবন-যুদ্ধ করিতে পারিব?

দেশের অকালমৃত্যুর মূলেও আমরা হিন্দুনারীর এই

পরাধীন জীবনের প্রভাব দেখিতে পাই। জন্মমৃত্যুর তালিকা দেখিয়া জানিয়াছি, এদেশে যত শিশু জন্মায়, তার অর্দ্ধেক পাঁচ বৎসরের মধ্যেই মারা পড়ে! ইহা কি শোচনীয় বিষয়! যেমন একটী সুন্দর গোলাপ-চারা কোন মন্দ ভূমিতে রোপিলে তাহা শীঘ্রই মরিয়া যায়, সেইরূপ গৃহাবদ্ধ জননীর দূষিত দুগ্ধপানে শিশুফুলটি অচিরেই শুকাইয়া যায়। এরূপ হাজার হাজার উদাহরণ আমি দেখাইতে পারিতাম, কিন্তু তাহার কোন প্রয়োজন নাই। অকালমৃত্যুর রোদনে কোন্ গৃহ না আকুলিত হইয়াছে?

এখন আমরা এই সব উদাহরণ ও প্রমাণ দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি, স্বাধীন-জীবন জগতের যেমন কল্যাণকর, পরাধীন জীবন সেইরূপ অপকারী। স্ত্রীলোক ও পুরুষ এই দুই জাতি লইয়াই মানব-সংসার গঠিত। পরমপিতা জগদীশ্বর জগতের এই দুই জাতিকে এরূপভাবে সৃজিয়াছেন ও পরস্পরকে এরূপ সাহায্যসাপেক্ষ করিয়াছেন যে একটির অভাবে অন্যটি ফুটিতে বা বাড়িতে পারে না, এমন কি খাটিতেও অপারগ। যে জাতির মধ্যে সমাজের এই দুটি অঙ্গই সম্পূর্ণ মিলিয়া কাজ করে—সেই জাতিই শীঘ্র সকলের উপর উঠিতে পারে। আর যাহাদের মধ্যে কেবল একটি অঙ্গ অবাধে খাটিবার অবসর পায়, কিন্তু অন্যটি কোন কাজেই অগ্রসর হ'তে অপারগ—সে জাতি খোঁড়া মানুষের ন্যায় সকলের নীচে বা শেষেই পড়িয়া থাকে। পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকেরও সংসারে অসীম অধিকার ও প্রশস্ত কর্ম্মভূমি আছে—দুজনে সমভাবে খাটিবে সত্য—অথচ দুজনের কাজ এরূপভাবে বন্দোবস্ত করা, যে, তাহাতে বিবাদ কলহ আসিয়া বিশৃঙ্খলা আনিবার যো নাই।

আমার আশা ছিল, সমাজ-বিবর্ত্তনের গতির সঙ্গে ক্রমে হিন্দুনারীদের অবরোধপ্রথাও একেবারে দূর না হয়, কিছু শিথিল হইয়া আসিবে ও তাহারা জীবন-ক্ষেত্রে খাটিবার অবসর পাইবে। আর ঐ কার্য্যের সঙ্গে তাহাদের মন অধিকতর মার্জ্জিত ও উন্নত হবে, হিন্দু স্ত্রী আবার সর্ব্বত্র পূজিত হবে। কিন্তু পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি আমাদের দেশের নারীজীবনের গতি ক্রমশঃ সুমুখে না চলিয়া আবার পিছু হাঁটিতে আরম্ভ হইয়াছে। সেজন্য আমার বড়ই আশঙ্কা হইয়াছে—এ সঙ্কটকালে কেহ হাতেকলমে লাগিয়া তাদের এ উল্টাগতি ফিরাইয়া না দিলে আর আমাদের উপায় নাই।

শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দাস।

সিমলা-শৈল।

পূর্ব্বে যখন কাল্‌কা অবধি রেলওয়ে খুলে নাই, তখন অম্বালা দিয়া সিমলা আসিতে হইত। এখন অনেকটা সময়, কষ্ট ও অসুবিধা বাঁচিয়া গিয়াছে। কলিকাতা হইতে পঞ্জাব-ডাকগাড়ীতে আরোহণ করিলে তৃতীয় দিবস বেলা দশটায় কাল্‌কা এবং সন্ধ্যার সময় সিমলায় পৌছান যায়।

কাল্‌কা ষ্টেশন কাশৌলি পাহাড়ের পাদমূলে। কাশৌলি হিমালয়েরই পরিবারভুক্ত। হিমালয় সম্বন্ধে অনেকের বোধ হয় একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে। লোকে মনে করেন, হিমালয় প্রস্তরময় হইলেও তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বরফে এমন আচ্ছন্ন, যে প্রস্তর কোথাও দেখিবার যো নাই। হিমালয়ের প্রচণ্ড শৈত্যবশতঃ সেখানে পাখীটিও উড়িতে পারে না; কেবল লোকে দূর হইতে স্তোত্র পড়িয়া এবং প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিয়া থাকে। হিমালয়ের উচ্চতা সম্বন্ধেও বোধ হয় অনেকের ধারণা যে তিনি জমি হইতে বিনা নোটিসে এক নিশ্বাসে সটান উচ্চ হইয়া উঠিয়াছেন। আর কাহারও না হউক, অন্ততঃ নিম্নস্বাক্ষরকারী মূর্খের প্রায় ঐরূপ ধারণাই ছিল। সুতরাং আমি যখন কাল্‌কায় নামিয়া প্রথম হিমালয় দর্শন করিলাম, তখন অনেকটা নিরাশ হইলাম। কোথায় বা বরফ, আর কোথায় বা উচ্চতা! মধুপুর বা জামালপুর অঞ্চলের পাহাড়ের মতই। কিন্তু ভৌগোলিকেরা প্রবঞ্চনা করেন নাই। পাহাড়ের গায়ে পাহাড়, তাহার গায়ে পাহাড়, এইরূপ করিয়া হিমালয় উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং হিমালয়ের মহোচ্চ চূড়াগুলি, ভূমি হইতেই খুব উচ্চ,—আপন আপন পাদমূল হইতে নহে। অথচ কাছে দাঁড়াইয়া সম্মুখের পাহাড়টা মাত্রই দেখা যায়;—যেমন কলিকাতায় কোনও বাড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া মনুমেণ্টের দিকে মুখ ফিরাইলেও বাড়ীটাই দেখা যায়, বহুগুণ উচ্চ মনুমেণ্ট ঢাকা পড়িয়া থাকে।

আর বরফের কথা,—এই সিমলা সহর হিমালয়ের বুকের ভিতর; আজ ২৩শে পৌষ; চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছি, নিকটে পর্ব্বতগাত্রে কোথাও একটু শাদা রঙও নাই। কেবল উত্তরে অনেক দূরে একটা তুষারমণ্ডিত গিরিমালা দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তাহাও চিরতুষার নহে, গ্রীষ্মতাপে গলিয়া যায়। চিরতুষার হিমালয়ের কোথাও কোথাও আছে বটে, কিন্তু সমগ্র হিমালয়ের কলেবরের তুলনায় সে স্থানগুলি কিছুই নহে। হিমালয়ের গাত্রময় মনুষ্যের বাস; রীতিমত কৃষিকার্য্য চলিতেছে; আদা, গোধূম, হলুদ, আলু, তামাক ইত্যাদি প্রচুর জন্মিয়া থাকে; এবং নানাদিকে গিরিবর্ত্ম আছে। এই সকল সঙ্কীর্ণ ও অসমতল পথে গাড়ী চলিতে পারেনা বটে, কিন্তু ব্যবসায়িগণ ভারবাহী পশুশ্রেণী লইয়া অনায়াসে যাতায়াত করে। সিমলা হইতে তিব্বৎদেশ অবধি একটা পথ গিয়াছে; দুরন্ত শীতেও সে পথ বরফে দুর্গম হয় না।

কালকা হইতে সিমলা ৫৮ মাইল; সুতরাং এই দীর্ঘ পথের একটা সংক্ষিপ্ত কাহিনী পাঠকগণের প্রীতিকর হইতে পারে।

কালকা-সিমলা পথের নাম কার্ট-রোড। ডাকবিভাগ এই পথে যান-ব্যবসায় করিয়া থাকে। যান তিন প্রকার আছে,—টোঙ্গা, ফিটন্ ও ইন্‌ভ্যালিড্ হিল্ ক্যারেজ্। টোঙ্গা,—এক্কা এবং বগিগাড়ীর মাঝামাঝি একটা পদার্থ। সম্মুখে দুইজন এবং পশ্চাতে দুইজনের বসিবার স্থান আছে। ইহা দুইটা ঘোড়ায় টানিয়া থাকে। ফিটনের বর্ণনা অনাবশ্যক। ইন্‌ভ্যালিড্ হিল্ ক্যারেজে রোগী মানুষ শুইয়া যাইতে পারে। ইহা ছাড়া দেশীয় লোকের এক্কা ও ঝাঁপানের ব্যবসা করে। ঝাঁপান ডুলির মত।

কাল্‌কা হইতে সিমলা ৪৭০০ ফীট্ উচ্চ। কার্ট-রোড এই ৪৭০০ ফীট্ "চড়াই" উঠিয়াছে। কিন্তু ৫৮ মাইল এই চড়াই উঠিয়াছে বলিয়া, ইহার ক্রমোন্নতি অত্যন্ত মৃদুভাবে হইয়াছে। এই জন্য সকল প্রকার গাড়ীই এপথে যাইতে পারে। দার্জ্জিলিঙ্গে রেলওয়ে হইয়াছে; এখানে এত দিন হইল না কেন, এ প্রশ্ন কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। এখানে হয় নাই তাহার কারণ এই যে গবর্ণমেণ্ট এতদিন অনুমতি দেন নাই। রেলওয়ে আসিলে সিমলায় জনতাধিক্য হইবার সম্ভাবনা;—তাহা সাহেবরা পছন্দ করেন না। এখন নাকি অনুমতি হইয়াছে; বৎসর দুই পরে নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইবে শুনিতেছি।

কার্ট-রোড প্রস্থে অধিক নহে। দুইখানি গাড়ী পাশাপাশি যাইতেপারে মাত্র। বড় ধূলা। কাল্‌কা সহর ভেদ করিয়া এই পথ ক্রমে পাহাড়ের গায়ে উঠিয়াছে। পাহাড়ের গায়ে কি ভাবে পথ রচিত হয়, তাহা সকলের জানা না থাকিতে পারে। কেহ না মনে করেন যে পথ নিম্নদেশ হইতে চূড়া লক্ষ্য করিয়া উপরদিকে উঠিয়াছে। ইস্ক্রুপের গায়ে পেঁচ যেমন করিয়া উঠে, পার্ব্বত্য পথও সেই প্রকার উঠিয়া থাকে। বলিয়াছি, পাহাড়গুলি গায়ে গায়ে সংলগ্ন। পথ এক পাহাড় ছাড়িয়া অন্য পাহাড়, এইরূপ করিয়া ক্রমাগত চলিয়াছে। ঢালু পাহাড়ের গাত্র কাটিয়া এই পথ প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া, ইহার এক পার্শ্বে যেন উচ্চ পাষাণ প্রাচীর উঠিয়াছে, অন্য পার্শ্বে ভয়ঙ্কর গভীর "খদ্দ" নামিয়া গিয়াছে। এই খদ্দের দিকে প্রস্তরখণ্ড দিয়া দুই হাত উচ্চ "আল" গাঁথা আছে।

এপথে বৈচিত্র্যপূর্ণ দৃশ্যাবলী অধিক নাই। যথাপূর্ব্বস্তথা পরঃ—ক্রমাগতই পাহাড়, পাহাড়ের পর পাহাড়; মাঝে মাঝে একখানি এক্কা বা টোঙ্গার সহিত, অথবা উষ্ট্রশ্রেণীর সহিত চকিত সাক্ষাৎ;—উষ্ট্রের শ্রেণী না বলিয়া বরং ট্রেণ বলা উচিত, কারণ সর্ব্বত্রই দেখিলাম এক একটি উষ্ট্রের পুচ্ছের সহিত পরবর্ত্তীর নাসিকা রজ্জুসম্বদ্ধ। এইরূপ দশ পনেরোটিতে যেন এক একখানি রেলওয়ে ট্রেণ হইয়া চলিয়াছে। পর্ব্বতগাত্র কোথাও শ্যামকান্তি, আবার কোথাও মরুবৎ। এখানে ওখানে উচ্চদেশে পাহাড়ী কৃষকের একখানি ক্ষুদ্র কুটীর; তাহার পরম নির্জ্জনতা কবিজন-লোভনীয়। নিম্নে খদ্দের দিকে শস্যক্ষেত্র; দূর হইতে দেখিতে যেন কতকগুলি লম্বা লম্বা সিঁড়ি তৈয়ারি করা রহিয়াছে। এই প্রকার সিঁড়ির মত নির্ম্মাণ করিয়া পর্ব্বতগাত্রে চাষ করা হয়। মাঝে মাঝে অতি ক্ষুদ্র জলধারা পাহাড়ের গা বহিয়া ঝিরি ঝিরি করিয়া পড়িতেছে। সে জল কি স্বচ্ছ, আর কি সুশীতল! আমি অকারণ শীতবিভীষিকাবশতঃ পথে পিপাসা নিবারণের জন্য বোতল ভরিয়া চা সঙ্গে লইয়াছিলাম; সে চা ফেলিয়া রাখিয়া অঞ্জলি পূরিয়া হিমালয়ের এই স্নেহধারা পান করিয়া বাঁচিলাম; পাহাড়ের গায়ে কত সহ্য [illegible]

বা তাহাদের নাম জানে! বেলা পড়িয়া আসিলে একস্থানে দেখা গেল, পাহাড়গুলি গায়ে ঘাস জন্মিয়া তাহা পাকিয়াছে; সে বড় চমৎকার দেখিতে; যেন পাহাড় একখানি বাঘছাল গাত্রে দিয়া বসিয়া আছে। একটা বিস্ময়ের কথা এই যে সারা পথে একটিও বন্যজন্তু দৃষ্টিগোচর হইল না।

কাল্‌কা-সিমলা পথের বিবরণ ইহার অপেক্ষা অধিক কিছু বলিবার নাই। সিমলা সহরটির বর্ণনা দিবার পূর্ব্বে ইহার একটু ইতিহাস দেওয়ার প্রয়োজন। ভিখারীর ছেলে যদি ক্রমে রাজসিংহাসনে আরোহণ করে, তবে তাহার জীবন-চরিত জানিতে সকলেরই আগ্রহ হইবার কথা। সিমলার ভাগ্যপরিবর্ত্তন ইহার অপেক্ষা অল্প বিস্ময়কর ব্যাপার নহে। এখানে কি ছিল? গাছ ছিল আর পাথর ছিল, অসভ্য পাহাড়ী চাষীর কুঁড়ে ঘর ছিল। আর এখন? এখন সিমলা দ্বিতীয় কলিকাতা হইয়াছে; সুবিপুল ভারতবর্ষের অন্যতম রাজধানী হইয়াছে। সুতরাং সিমলার একটু পূর্ব্ব ইতিহাসে, আশা করি, নিতান্ত মধুকর-জাতীয় পাঠক ভিন্ন অন্য কাহারও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে না।

সিমলা-পরগণা পূর্ব্বে পাতিয়ালার রাজা ও কেঁওথলের রাণা, এই দুইজনের "সাজা"র জমিদারী ছিল। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে যখন ইংরাজের "নেপাল-যুদ্ধ" চলিতেছিল, সেই সময়ে গুর্খা জাতি যমুনা ও শৎলেজ (শতদ্রু) নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত ভূমি অধিকার করিয়া বসিয়া ছিল। ইংরাজ বিবেচনা করিলেন, এ স্থান হইতে ইহাদিগকে না তাড়াইতে পারিলে যুদ্ধে মঙ্গল সম্ভাবনা নাই। সুতরাং দেশীয় রাজন্যকের সাহায্য লইয়া ইংরাজ গুর্খাগণকে তাড়াইলেন। ইংরাজের উদ্দেশ্যও পূর্ণ হইল, দেশীয় রাজগণও স্বীয় স্বীয় অধিকার পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন। সিমলা-পরগণা পাতিয়ালা ও কেঁওথলেরই রহিল। ইংরাজ এই প্রথম এ পার্ব্বত্য প্রদেশের সংশ্রবে আসিলেন।

লেফ্‌টেন্যাণ্ট রস্ তখন পার্ব্বত্য রাজ্যের সহকারী পলিটিক্যাল এজেণ্ট। কি দিনে এবং কি ক্ষণে বলিতে পারি না, ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সিমলায় কাঠ, মাটি আর খড় দিয়া একখানি কুটীর নির্ম্মাণ করেন। ইহার তিন বৎসর পরে, রস্ সাহেবের কর্ম্মে উত্তরাধিকারী লেফ্‌টেন্যাণ্ট কেনেডি একখানি স্থায়ী রকমের গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। পিছু হাটিতে আরম্ভ হইয়াছে। সেজন্যী গৃহ। ইহা আজিও দণ্ডায়মান থাকিয়া, সিমলার গৃহসমাজে অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের সম্মানিত উচ্চাসন অধিকার করিয়া রহিয়াছে। অতঃপর সাহেবেরা, বিশেষতঃ যাঁহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে, তাঁহারা, পাতিয়ালা ও কেঁওথলের অনুমতি লইয়া একে একে এখানে আসিয়া বাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বিনা করে গৃহ নির্ম্মাণ করিবার স্থান পাইতেন; কেবল এই সর্ত্ত থাকিত, যে তাঁহারা গোবধ করিতে পাইবেন না এবং প্রধানদ্বয়ের বিনা অনুমতিতে কোনও গাছ কাটিতে পারিবেন না। (সিমলায় এখনও কেহ গাছ কাটিতে পায় না; কিন্তু হায় পাতিয়ালা! গোবধ সম্বন্ধে—থাক্ আর কাজ নাই; এখনি "সিডিয়্যন" হইয়া দাঁড়াইবে।)—পাঁচ ছয় বৎসরে ধীরে ধীরে এইরূপ অধিবাসীর সংখ্যা বাড়িয়া উঠিল, এবং সিমলা অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিল। এতদূর প্রসিদ্ধি লাভ করিল যে ১৮২৭ সালে বড়লাট আমহর্ষ্ট, ভরতপুরযুদ্ধান্তে উত্তর পশ্চিম ভ্রমণ সমাধা করিয়া গ্রীষ্মের কয়টা মাস সিমলায় যাপন করিলেন। এই বৎসর হইতে সিমলার মহত্ত্বের সূচনা। ইহার তিন বৎসর পরে কেনেডি সাহেবকে (ইনি তখন স্বয়ং পলিটিক্যাল এজেণ্ট হইয়াছেন) গবর্ণমেণ্ট আদেশ পাঠাইলেন, যে অন্যত্র ভূসম্পত্তি বিনিময় দিয়া, সিমলায় একটি রীতিমত সহর নির্ম্মাণের উপযোগী স্থান লইতে পারিলে ভাল হয়। কেনেডি সাহেব প্রধানগণের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া গবর্ণমেণ্টের আদেশ প্রতিপালন করিলেন। সিমলার সীমানায় তখন ষোলখানি ক্ষুদ্র গ্রামের অস্তিত্ব ছিল। বারোখানি ছিল কেঁওথলের রাণার,—বাৎসরিক জমিদারী আয় ৯৩৭৲; ইহার বিনিময়ে কোম্পানি রাণাকে রায়েন নামক একটি পরগণা দিলেন; তাহার বাৎসরিক আয় তখন ১২৮৯৲। বক্রী চারিখানি গ্রামের বিনিময়ে পাতিয়ালার রাজাকে বারৌলি পরগণার কিয়দংশ দেওয়া হইল;—তাহার বাৎসরিক আয় ২৪৫৲ টাকা।

এখন হইতে বড়লাটগণ বৎসরে বৎসরে সিমলায় আসিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথম প্রথম অবস্থিতিকাল কয়েক সপ্তাহ করিয়া হইত, ক্রমে বাড়িয়া বাড়িয়া কয়েক মাস করিয়া হইতে লাগিল। চারিদিকের পার্ব্বত্য রাজ্যের প্রধানগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার পক্ষে এখানে নিতান্ত সুযোগ ছিল। তাহা ছাড়া, তখন বড়লাটগণ শীত ঋতুতে

ভ্রমণে বাহির হইতেন; কলিকাতার অপেক্ষা সিমলা হইতেই এই ভ্রমণ আরম্ভ করা অধিক সুবিধাজনক ছিল। প্রথম প্রথম অল্পসংখ্যক কর্ম্মচারিবর্গ বড়লাটের সঙ্গে আসিত; সার জন লরেন্‌সের সময় হইতে সিমলা ভারতেশ্বরের রীতিমত নিদাঘ-রাজধানীতে পরিণত হইয়াছে।

এইবার সিমলা সহরের একটি বর্ণনা দিতে প্রয়াস করিব। সিমলা কলিকাতার সমতলতা হইতে প্রায় ৭০০০ ফীট উচ্চে অবস্থিত। সিমলা সহরের—পার্ব্বত্য সহর মাত্রেরই—প্রধান বিশেষত্ব তাহাদের অসমতলতা। সিমলার উচ্চতম স্থান নিম্নতম স্থান হইতে হাজার ফীটেরও অধিক উচ্চ হইবে। এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে হইলে প্রায়ই চড়াই উঠিতে হয়, নহেত উৎরাই নামিতে হয়। যাঁহারা নূতন আসেন, তাঁহাদের এই চড়াই উৎরাই প্রথম প্রথম বড়ই কষ্টকর হয়। সিমলায় পদার্পণ করিবামাত্রই চড়াই ব্যাপারে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছিল। টোঙ্গা হইতে নামিয়াই, বাড়ীতে পৌঁছান সংবাদ প্রেরণ করিবার জন্য টেলিগ্রাফ আফিসে যাইবার প্রয়োজন হয়। কে জানিত যে টেলিগ্রাফ আফিস সেখান হইতে ভয়ানক চড়াই! একে দুই দিনের পথকষ্ট এবং প্রায় অনাহার, তাহার উপর অতি সাবধানতাবশতঃ দেহখানির উপর পর্ব্বতপরিমাণ গরম কাপড় চাপান—(আর দেহখানিও নিতান্ত লঘু নহে), তাহার উপর সেই চড়াই। আমার যে কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহা আমার অন্তরাত্মাই অবগত আছেন,—আর কাহাকেও বুঝাইবার প্রয়াস বৃথা। টেলিগ্রাফ আফিসে পৌঁছিয়া কুড়ি মিনিট কাল আমার কথা কহিবার ক্ষমতা থাকে নাই। টুপী ফেলিয়া, সকল জামার বোতাম খুলিয়া দিয়া, অনাবৃত বক্ষে ও মস্তকে সেই রাত্রি নয়টার সময় হিমালয়ের ডিসেম্বর মাসের বায়ু লাগাইয়া তবে আমি সুস্থ হই!

সিমলার পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমায় দুইটি গিরিশৃঙ্গ দাঁড়াইয়া আছে। পূর্ব্ব প্রান্তে Peak of Jakko—পাঠকের আপত্তি না থাকিলে ইহাকে আমি "যক্ষচূড়া" নামে অভিহিত করিব। কালিদাসের বিরহী-যক্ষ যে রামগিরি হইতে মেঘকে দূত করিয়া প্রিয়াসমীপে প্রেমবার্ত্তা পাঠাইয়াছিলেন, তাহা সম্ভবতঃ এখান হইতে অনেক দূরে। তথাপি Jakkoকে যক্ষ করিলে কোনও ক্ষতি দেখি না; বরং নামের গুণে ইহার পাষাণস্তূপ হইতে কিঞ্চিৎ কাব্যসৌরভ পাওয়া যাইতে পারিবে। পশ্চিম সীমায় Prospect Hill—একটা সুদীর্ঘ গিরিপৃষ্ঠ (ridge) এই চূড়া দুইটির পাদমূল যোজিত করিয়াছে। যক্ষচূড়ার মূল হইতে আর একটি গিরিপৃষ্ঠ (ridge) উত্তর দিকে গিয়া ইলিষীয়ম্ নামক চূড়ায় শেষ হইয়াছে। ইহাই হইল সিমলা সহর।

যক্ষচূড়াকে প্রদক্ষিণ করিয়া পাঁচ মাইল পরিমিত একটি পথ গিয়াছে। ঘোড়া ছুটাইয়া অথবা পদব্রজে যক্ষচূড়া প্রদক্ষিণ করা এখানকার সাহেব ও বাঙ্গালীদের একটা প্রধান আমোদ। কিন্তু ঘোড়া ছুটান এখন বন্ধ আছে; কারণ এই পথের এক অংশে এখন বরফ জমিয়া রহিয়াছে; ঘোড়ার পা পিছলাইয়া যায়। কয়েক বৎসর হইল এই পথে যে একটি বিভীষিকাপূর্ণ অপমৃত্যু ঘটিয়াছিল, তাহা এখানে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। একদিন শীতের বৈকালে তুষারপাত হইতেছিল। পথে তুষার গভীর হইয়া জমিয়া রহিয়াছে। এমন সময়ে তিনটি অতি সাহসী বাঙ্গালী বাবু যক্ষচূড়া প্রদক্ষিণ করিবার জন্য বাহির হইলেন। দুইজন ফিরিলেন, একজনের আর উদ্দেশ পাওয়া গেল না। ভ্রমণ কালে তিনজন পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে দূরে পড়িয়াছিলেন। যিনি সকলের পশ্চাতে ছিলেন, তিনি পা পিছলাইয়া পড়িয়া যান; বোধ হয় পূর্ব্ব হইতে শীতে তাঁহার হাত পা অসাড় হইয়া আসিয়াছিল,—এ জন্মের মত আর উঠিতে পারেন নাই। সঙ্গীরা ইহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। সেই প্রচণ্ড শীতরজনী ক্রমে মৃতদেহকে তুষার সমাধির মধ্যে লুক্কায়িত করিল। পরদিন বরফ কতকটা গলিলে শবদেহ বাহির হইল। কি শোচনীয় পরিণাম! আজিও সেই স্থান দিয়া পথ চলিবার সময় লোকে পরস্পর এই দুর্ঘটনার উল্লেখ করিয়া থাকে।

যক্ষচূড়ার উত্তরাভিমুখী ও পশ্চিমাভিমুখী অংশ দুইটিই বহু গৃহাকীর্ণ। এই অংশ দুইটির সংযোগ স্থলে গির্জ্জা ঘর। এই স্থান হইতেই প্রদক্ষিণ আরম্ভ করা যাউক। বাম দিকে অগ্রসর হইলে প্রথমেই লক্কড় বাজার। সিমলার যে অংশগুলিতে লোকের বাস, তাহাদের মধ্যে লক্কড় বাজারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শীতল। ইহার কারণ এই যে যক্ষচূড়ার অন্তরালবশতঃ শীতকালে বেলা দুইটা তিনটার কমে আর এখানে রৌদ্র আসে না। একটা তুষার

পাত হইলে অন্যখানে তাহা গলিয়া যাইতে যত সময় লাগে, লক্কড় বাজারে তাহার দুইগুণ বা তিনগুণ সময় লাগিয়া থাকে। এইস্থানে কাঠের কাজ খুব ভাল। অনেক শিল্প-চতুর ছুতার মিস্ত্রী এখানে বাস করে। একটু উপরে লক্কড় বাজার শেষ হইয়াছে। এখন কেবল সাহেবদের বাসগৃহ। এ অংশ আরও অধিক শীতল! এক মাস হইল একটা তুষারপাত হইয়াছে, সেই তুষার এখনও এখানে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এক একটা গৃহছাদ একেবারে শাদা হইয়া রহিয়াছে,—যেন অনেক বস্তা বিলাতী লবণ ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। এদিকে যক্ষচূড়ার গাত্রেও স্থানে স্থানে তুষার লাগিয়া আছে। পথের উপর—তাহা আর তুষার নহে, বরফের আকার ধারণ করিয়াছে। তুষার ও বরফের পার্থক্য এইখানে নির্দ্দেশ করা উচিত। সকলেই জানেন যে তুষার আকাশ হইতে পড়ে এবং জল জমিয়া বরফ হয়। তুষার বিলাতী লবণের মত চূর্ণাকার—সেই প্রকার শুভ্র এবং ঠিক তাহারি মত উজ্জ্বলতার পালিশবিহীন; অত্যন্ত মোলায়েম, যেন পেঁজা তুলার মত। বলা বাহুল্য, বরফ প্রস্তরবৎ কঠিন, কাচের মত মসৃণ এবং উজ্জ্বলতার পালিশযুক্ত। তুষারের উপর চাপ পড়িলে তাহা বরফের আকার ধারণ করে। সেই জন্য বলিলাম, পথের উপর পতিত তুষার এখন বরফ হইয়া গিয়াছে। পথের বরফের উপর ধূলি ঢাকা পড়িয়াছে। এ স্থান দিয়া অত্যন্ত সাবধানে চলিতে হয়, নচেৎ মনুষ্যের নৈতিক জীবনের অসাবধানতার মতই, পদস্খলন অবশ্যম্ভাবী। আমি ত রেলিং ধরিয়া ধরিয়া এ পথে চলিয়া সঙ্গীদের পরিহাসভাজন হইয়াছি। নৈতিক জীবনেও এইরূপ রেল ধরিয়া চলিতে লোকে অনেকের বিদ্রূপ সহিয়া থাকে।—কিছু পরে বাম দিকে ভারত সেনাপতির আবাসগৃহ। এই অট্টালিকার বাহ্যিক আকারে মহত্ত্ব বা বীরত্ব কিছুরই চিহ্ন নাই। এমন বাড়ী কলিকাতার পথে পথে আছে। ইহার কিঞ্চিৎ দূরে Mayo Orphanage। এইবার গৃহাবলী বিরল হইয়া আসিল, তুষারও আর দেখা যায় না। কারণ এস্থানে সূর্য্যদেবের প্রবেশ-নিষেধ নাই। ক্রমে যক্ষচূড়ার যে অংশ পূর্ব্বাভিমুখী, আমরা সেই অংশের নিকট দিয়া যাইতেছি। আমাদের দক্ষিণ পার্শ্বে যক্ষচূড়ার গাত্রাশ্রিত অসংখ্য গাছপালা, বামপার্শ্বে সুগভীর "খদ্দ"। খদ্দের ভিতরের পাহাড়ীদের কুটীর এবং শস্যক্ষেত্র দেখা যায়।—অগ্রসর হইতে হইতে আমরা ক্রমে ছোট সিমলার নিকটে উপস্থিত হইলাম। যক্ষচূড়ার এই অংশ পশ্চিমাভিমুখী। ছোট সিমলায় অনেক বাঙ্গালী বাসা করিয়া থাকেন। এখানে একটি হরিসভা আছে, আশ্বিন মাসে তাহার বৎসরিক উৎসব হইয়া থাকে। ছোট সিমলা ছাড়িয়া আবার সাহেবদের আবাসগৃহের সংখ্যা অধিক হইতে লাগিল। ক্রমে সেই গির্জ্জা ঘরের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম। এখানে সাহেব সওদাগরদিগের অনেকগুলি দোকান। কলিকাতা ও লাহোরের বড় বড় য়ুরোপীয় দোকানদারগণ প্রায় সকলেই এখানে শাখা খুলিয়াছেন। এখন সিমলায় ভাঙ্গা হাট। ক্রেতার অভাবে এ সব দোকান-পাট বন্ধ। আমরা সেই গির্জ্জা ঘরের নিকট পৌছিলাম। যক্ষচূড়া প্রদক্ষিণ শেষ হইল।

গির্জ্জা ঘরের সম্মুখে অনেকটা স্থান খোলা। এখানে দাঁড়াইয়া উত্তরদিকে দৃষ্টিচালনা করিলে, অনেক দূরে পূর্ব্বকথিত তুষারাবৃত গিরিমালা দেখা যায়। অত্যন্ত শুভ্র—"রজতগিরিনিভ"-ই বটে! বলিয়াছি, ইহা চিরতুষার নহে, চিরতুষার সিমলা হইতে দেখা যায় না। এই পর্ব্বতগুলি অনেক দূরে। চেরুচূড়া, যেটি সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে, সেইটিই ২৭ মাইল দূরে, অথচ দেখিলে ভ্রম হয় যেন জোর ১০ মাইল, আজই ওখানে পৌছান যায়।

গির্জ্জা ঘর হইতে একটা সুপ্রশস্ত পথ পশ্চিমাভিমুখে গিয়াছে, এই স্থানকে উপর বাজার কহে। প্রথমেই টাউন্ হল্। এই বিদ্যুৎ-আলোকিত গৃহে সাহেবদের নৃত্যগীত ও সকলপ্রকার আমোদ-প্রমোদ হইয়া থাকে। বাঙ্গালীরা কখন কখন থিয়েটার বা অপেরা করিবার জন্য এক রাত্রের মত ইহা ভাড়া করিয়া লন। ইহার পর বামদিকে বড় বড় দোকান—অধিকাংশই দেশীয় লোকের অধিকৃত। সিমলার জেনেরাল পোষ্ট আফিসের সম্মুখে উপর বাজার শেষ হইয়াছে।

গির্জ্জার কাছ হইতে কিছু নামিয়া, নীচু বাজার বা বড় সিমলা আরম্ভ হইয়াছে। ইহা উপর বাজার অপেক্ষা সমধিক জনতাপূর্ণ। সমস্তই দেশীয় দোকান, এবং দেশীয় লোকের ব্যবহার্য্য জিনিষের দোকান। সস্তা জিনিষপত্র, তরকারি মশ্‌লা, সব এই বাজারে মিলে। এই বাজারের শেষভাগে অনেক ছুতোর মিস্ত্রীর দোকান; ইহাদের কাষ

লক্কড় বাজার অপেক্ষা অনেক হীন। একটু অগ্রসর হইয়া দক্ষিণদিকে নামিয়া গেলে, সরকারি আফিস সমূহ। এই খানে পথ চড়াই উঠিয়া, পোষ্ট আফিসের সম্মুখে উপর বাজারের পথে মিলিয়াছে। এই মিলিত পথ সিমলার পশ্চিম-সীমা পর্য্যন্ত গিয়াছে। কিছু দূরে অগ্রসর হইয়া ইহার এক শাখা কাইথু চলিয়া গিয়াছে। কাইথুতে অনেক "য়ুরেশিয়ান্" এবং "ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান" বাস করেন।—আরও কিছু দূর যাইলে, দক্ষিণ পার্শ্বে "হিমালয় ব্রহ্ম-মন্দির"। কিছু দূরে পূর্ব্বে উল্লিখিত "কেনেডি হাউস"। কুচবেহারের মহারাজ এখন ইহার অধিকারী। দক্ষিণ, ভাগে যে খদ্দ নামিয়াছে, তাহাতে Annandale Garden। ইহা একটি সুসজ্জিত উদ্যান; বেষ্টন করিয়া ঘোড়া ছুটিবার পথ। সাহেবদের ঘোড়দৌড়, ফুটবল-প্রভৃতি এইখানে হইয়া থাকে। কখন কখনও বড়লাট ও ভারত-সেনাপতি এই সকল আমোদ-প্রমোদে উপস্থিত থাকেন।—কিছু দূরে Peterhoff নামক একটি অনুচ্চ চূড়া। ইহাতে পূর্ব্বে "ভাইস্‌রিগ্যাল লজ্" ছিল, এখন finance Departmentএর কার্য্যালয় ইহার কিছু দূরেই Observatory Hill—পূর্ব্বে ইহার উপর একটি ছোট-মানমন্দির ছিল। এখন ইহা মর্য্যাদার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। ইহার উপরেই "নিউ ভাইস্‌রিগ্যাল্ লজ"—ভারতেশ্বরের মন্দির। এই অট্টালিকা কলিকাতার "গভর্ণমেণ্ট হাউস্" অপেক্ষা অনেক ছোট, কিন্তু সুন্দরতর। Observatory Hillটিতে অনেক গাছপালা। ভাইস্‌রিগ্যাল্ লজটি যেন গাছপালার ভিতর সমাহিত।

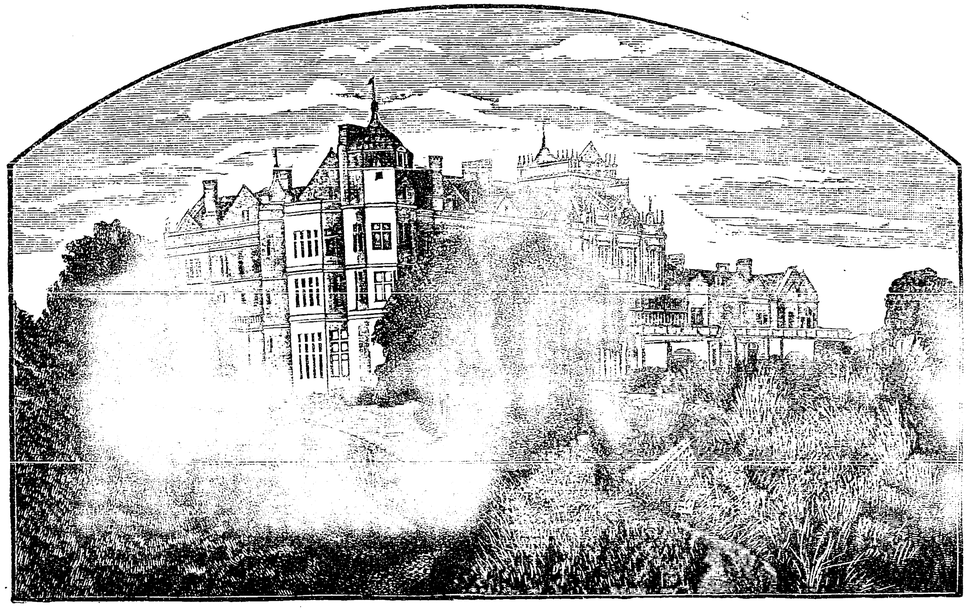

ইহার পর বালুগঞ্জ। ইহা দেশীয় লোকের বসতিপূর্ণ। বালুগঞ্জে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই। এইবার Prospect Hill। ইহার উচ্চতা যক্ষচূড়ার অপেক্ষা অল্পতর। জোর পাঁচশত ফীট্ হইবে। দূর হইতে Prospect Hill রমণীয়দর্শন নহে, কিন্তু নিকটে যাইলে ইহাকে লতাপাতায় ভূষিত পরম মনোহর দেখায়। এই শৃঙ্গে উঠিবার পথে তক্তা টাঙ্গান আছে; তাহাতে দর্শকগণকে অনুরোধ করা হইতেছে যেন কেহ লতা কিম্বা ফুল না ছেঁড়েন। ইহা পড়িয়া "সোনার তরী"তে রবীন্দ্রনাথের "বৈষ্ণব-কবিতা" মনে পড়িল। এই পাহাড়ের অজস্র পত্রপুষ্পভূষণ যেন বৈষ্ণবকবিতা, এবং নিষেধাজ্ঞা প্রচারক মিউনিসিপ্যালিটির বড় সাহেব যেন সাধু-পণ্ডিত।" ক্ষুদ্র বাগান নহে, কিছু নহে; একটা পাহাড়ের অগাধ সম্পত্তি; কেহ যদি "প্রিয় গৃহ তরে" তাহা হইতে দুইটা লইয়াই যাইত! তাহাতে,

TORN PAGES

হে সাহেব, "তোমার কি তাঁর [পাহাড়ের], বন্ধু, তাহে করি ক্ষতি ?

যাঁর ধন তিনি ঐ অপার সন্তোষে
অসীম স্নেহের হাসি হাসিতেছেন বসে।"

এখন Prospect Hill এর সৌন্দর্য্য অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া রহিয়াছে। বর্ষার পর নব নব পত্রপুষ্পের অলঙ্কার পরিয়া ইহা আবার যৌবনশ্রী ধারণ করিবে। এই শৃঙ্গের উপর একটি হিন্দু মন্দির আছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয় নিজ ব্যয়ে ইহার জীর্ণ সংস্কার করাইয়া দিয়াছেন! মন্দিরে বসিয়া দুই একজন "বাবাজি" অত্যন্ত মনোযোগের সহিত ধূমপান করিয়া থাকেন। এখান হইতে সমস্ত সিমলা সহরটি ছবিখানির মত দেখা যায়।

সিমলা সহর শেষ হইল। এইবার এস্থানের শীত গ্রীষ্মের কথা বলিব। দার্জ্জিলিঙ যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন সেখানে কেমন সর্ব্বদা বৃষ্টি হইয়া থাকে। রৌদ্র চম্ চম্ করিতেছে, হটাৎ মেঘ করিল, বৃষ্টি হইল, আবার রৌদ্র দেখা দিল; পনেরো মিনিটের মধ্যে এসকল হইয়া গেল! "দেবচরিত্রে"র খামখেয়ালির চূড়ান্ত নমুনা দার্জ্জিলিঙে। এখানে সে সব বালাই নাই। সেই জন্য শীতও দার্জ্জিলিঙ অপেক্ষা অল্প।

জানুয়ারি ও জুন চূড়ান্ত শীত ও গ্রীষ্মের মাস। নিম্নে গত ইংরাজি বৎসর এই দুই মাসে কলিকাতা ও সিমলায় প্রতি সাত দিনের তাপবৈচিত্র্যের একটা তালিকা* দিতেছি। ইহা হইতে পাঠকেরা সিমলায় শীততাপের ধারণা করিতে পারিবেন।

		কলিকাতা।		সিমলা।	
		উচ্চতম ডিগ্রী	নিম্নতম ডিগ্রী	উচ্চতম ডিগ্রী	নিম্নতম ডিগ্রী।
জানুয়ারি	১	৭৬	৬০	৪৪	৩৫
,,	৮	৮০	৫৪	৪৮	৪২
,,	১৫	৮৮	৬৪	৩৪	৩২
,,	২২	৮১	৫৮	৪৪	৩৯
,,	২৯	৮০	৫৫	৪৭	৪০
জুন	১	৯৪	৭৩	৬৪	৫৮
,,	৮	৯৫	৮১	৮০	৬৬
,,	১৫	৮৪	৭৬	৬৮	৫৮
,,	২২	৯০	৮০	৭৫	৬৪
,,	২৯	৯০	৮২	৭৬	৬২

* Meteorological Department কর্ত্তৃক প্রকাশিত Indian Daily Weather Report এর ফাইল হইতে এই তালিকাভুক্ত বিবরণগুলি সংগৃহীত হইল। লেখক

পাঠকগণ এই তালিকা হইতে দেখিতেছেন, গত ২৯শে জুন কলিকাতায় যখন উত্তাপ ৯০ ডিগ্রী ছিল, সেই দিন সেই সময়ের উত্তাপ এখানে ৭৬ ডিগ্রী। ১লা জানুয়ারি কলিকাতায় উত্তাপ ঠিক ঐ ৭৬ ডিগ্রী ছিল। সুতরাং উক্ত ২৯ তারিখে যদি কোনও কলিকাতাবাসী যাদুবিদ্যাবলে নিমেষ মধ্যে সিমলায় স্থানান্তরিত হইতেন, তবে জুনকে তাঁহার জানুয়ারি বলিয়া ভ্রম হইত। সহসা পাখা ও বরফের গেলাস ফেলিয়া তাঁহাকে শীতবস্ত্রের অন্বেষণ করিতে হইত। ফল কথা, এখানকার বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ কলিকাতার পৌষ মাঘ মাসের অনুরূপ।

কয়েক বৎসর এখানে শীতের প্রকোপ কম হইতেছে। ঘটনাবশাৎ উপরের তালিকায় গত ইংরাজি বৎসরের নিম্নতম উত্তাপের দিন সন্নিবিষ্ট হয় নাই। গত বৎসর তাপমানের পারদ ২৭ ডিগ্রী পর্য্যন্ত নামিয়াছিল। সকলেই জানেন, ৩২ ডিগ্রী নামিলেই জল জমিয়া যায়। কয়বৎসর শীত ঋতুতে অধিক দিন ৩২ ডিগ্রীর নীচে নামিতেছে না। একবার এখানে ১৯ ডিগ্রী পর্য্যন্ত নামিয়াছিল। তাপমান ৩২ ডিগ্রী পর্য্যন্ত না নামিলেও বাহিরে ধরাপৃষ্ঠের উপর যে জল থাকে, তাহা জমিয়া যায়। এবার আমরা বেলা দশটার পরও অনেকদিন পথের জলপ্রণালীতে জমা জল দেখিয়াছি। জলের উপরিভাগটা মাত্র জমিয়াছে, তুলিয়া লও, যেন সাসিভাঙ্গা কাঁচখানি। অথচ পূর্ব্বরাত্রে তাপমান ৩২ ডিগ্রী পর্য্যন্ত নামে নাই। ইহার কারণ এই যেজমি বায়ুর অপেক্ষা অধিক শীতল হইয়া যায়; তাপমান বায়ুরই উত্তাপ নির্দ্দেশ করে মাত্র।

শীতকালে এখানে আট দশটা তুষারপাত হইয়া থাকে। প্রথম তুষারপাত প্রায়ই ডিসেম্বর মাসে হয়; একবার নবেম্বর মাসের মাঝামাঝিই হইয়া গিয়াছিল। এবার ১১ই ডিসেম্বর রাত্রে প্রথম তুষারপাত হইয়াছে। সে আজ এক মাস হইল, এখনও দ্বিতীয় পাত হয় নাই। এত দেরী নাকি কখনও হয় না। লোকে (গরীব লোকে নহে) আগ্রহের সহিত দ্বিতীয় পাতের প্রতীক্ষা করিতেছে। ১১ই ডিসেম্বর সমস্ত দিন মেঘ করিয়াছিল। প্রবল বাতাসও বহিয়াছিল। রাত্রে মাঝে মাঝে অল্প অল্প বৃষ্টি হইল। প্রভাতে উঠিয়া দেখি, বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তুষার পড়িতেছে। সকল বাড়ীর ছাদ শাদা হইয়া গিয়াছে। জীবনে এইপ্রথম

তুষারপাত দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিলাম। কতকটা তুলিয়া লইয়া ভক্ষণ করিলাম। কৃত্রিম বরফের অপেক্ষা অনেক অধিক সুস্বাদু। "ভারতী"—তে শ্রীযুক্ত জলধর সেনের যে ধারাবাহিক ভ্রমণবৃত্তান্ত বাহির হইয়াছিল, তাহাতে তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন যে, তিনি তুষাররাশির উপর দিয়া চলিতে চলিতে একমুঠা তুলিয়া লইয়া "গালে" ফেলিয়া দিয়াছিলেন। ইহা পাঠ করিয়া জলধর বাবুকে একজন অসাধারণ বীর বলিয়া মনে হইয়াছিল। সেই শীতে বরফ খাওয়া! কি ভয়ানক কথা। এখন দেখিতেছি ইহাতে বীরত্ব কিছুই নাই। কৃত্রিম বরফের মত তুষার অত অধিক শীতল নহে। বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া, পিপাসা পাইলে এবং না পাইলেও, কতবার যক্ষ্মচূড়ার গাত্র হইতে তুষার খসাইয়া লইয়া সুখে চর্ব্বণ করিয়াছি;—কোনও কষ্ট হয় না। প্রেমিক আক্ষেপ করেন, হায় যদি বিরহের অশ্রুজল তরল না হইত, তবে তাহার মালা গাঁথিয়া প্রিয়তমাকে উপহার দিতাম। আমরা আক্ষেপ করি, হায় যদি তুষার তরল হইয়া না যাইত, তবে এমন উপাদেয় ভক্ষ্যসামগ্রী পার্শেল করিয়া প্রিয় আত্মীয় বান্ধবকে পাঠাইয়া দিতাম। এখানে বাঙ্গালীর ছেলে মেয়েরা তাহাদের পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত Charlie ও Katieর অনুকরণে তুষার-গোলক (Snow ball) লইয়া খেলা করিয়া বাঙ্গালীজন্ম সার্থক করে। আমার একটি বন্ধু বলিলেন যে তাঁহার ছেলেরা বাড়ীর সম্মুখে তুষার দিয়া একটা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিল; পাঁচসাত দিনে সেটা গলিয়া যায়।

একটা তুষারপাতের পর সিমলার বড় সুন্দর শ্রী হয়। সকল গৃহছাদে ঘন হইয়া তুষার পড়িয়া রহে। পথগুলি তুষারে ডুবিয়া যায়। শীতেও যাহাদের পাতা ঝরে না, সেই সকল গাছের পাতায় পাতায় তুষার জড়াইয়া যায়। যেমন কেল্ গাছ। মহাতুষারেও ইহার পত্রশোভা হরণ করিতে পারে না। আর আর সমস্ত গাছ উক্ত বীরের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়াই পরাজয়স্বীকারের চিহ্নস্বরূপ পত্রাভরণ মোচন করিয়া দীনভাবে দাঁড়াইয়া থাকে।

যখন সদ্য তুষার পড়ে, তখন পথ চলিতে কোনই কষ্ট নাই। শীতও তখন অত্যধিক থাকে না। পথে বাহির হইলে তুষারের ভিতর জুতা অদৃশ্য হইয়া যায়, অথচ ভিজিয়া যায় না। তাহার পর যখন সেই তুষাররাশি পদভরে জমিয়া বরফ হইয়া যায়, তখন বড় কষ্ট। শীতও তখন কন্‌কনাইয়া পড়ে। পথ চলিতে বরফের লাঠি (Hill stick) ব্যবহার করিতে হয়। ইহা এক খণ্ড বংশদণ্ড, প্রায় মাথা সমান উচ্চ, নিম্নমুখে একটা লৌহফলক লাগান, সড়কি বলিলেই হয়। কাচমসৃণ বরফের উপর দিয়া চড়াই উৎরাই সাধন করা কিরূপ নিরাপদ, তাহা পাঠকগণ কল্পনা করিয়া লইবেন। লাঠি ঠুকিয়া বরফে পুঁতিয়া, তাহাতে ভর দিয়া চড়াই উৎরাই পথ অতিক্রম করিতে হয়। ইহাতেও মধ্যে মধ্যে বিনামূল্যে বিতরিত "আছাড়" নামক সেই সুমিষ্ট পদার্থ আহার লাভ ঘটে।

বড়লাট সাহেবের শুভ-অবস্থিতিকালে এখানে অন্যূন পাঁচ শত বাঙ্গালী কর্ম্মচারী থাকেন। ইঁহাদের একটি সখের থিয়েটার ও একটি অপেরার দল আছে। গত ইংরাজি বৎসর থিয়েটারে "সরলা" ও "সীতার বনবাস" এবং অপেরায় "রাম-বনবাস" অভিনীত হইয়া গিয়াছে। একটি ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয় আপনাদের এখানে এত বনবাসের ধূম কেন? তিনি বলিলেন, রামসীতা আমাদিগকে এই হিমালয় পাহাড়ে বনবাস দিয়াছেন, সেই রাগে আমরা তাঁহাদের উভয়কে বনবাস দিয়া প্রতিশোধ লইতেছি। ছোট সিমলা ও বড় সিমলায় দুইটি হরিসভা আছে। তাহাদের উৎসব উপলক্ষে অনেক বাঙ্গালী একত্র হইয়া থাকেন। এই আমোদ প্রমোদ ও ধর্ম্মসভা ছাড়া অন্যপ্রকার সামাজিক ক্রিয়াকলাপে দশজন একত্র হইবার সুযোগ হয় না। পূজার সময় সকল বাঙ্গালীই এখানে থাকেন, অথচ এই পাঁচ শত উপার্জ্জনশীল হিন্দুবাঙ্গালীর প্রবাসে একখানিও দুর্গাপূজা হয় না! ইহা প্রথম শুনিয়া আমি অত্যন্তই বিস্মিত হইয়াছিলাম। আজ পর্য্যন্ত ইহার সন্তোষজনক কারণ স্থির করিতে পারি নাই। অন্যপ্রকার সামাজিক ক্রিয়া কর্ম্মও এখানে প্রায়ই অনুষ্ঠিত হয় না। বেহার বা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে যে সকল বাঙ্গালী বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে অবস্থিতি করেন, তাঁহারা অনেকটা প্রবাসকেই গৃহ মনে করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং পুত্রকন্যার অন্নপ্রাশন, বিবাহাদি প্রবাসেই সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এখানকার বাঙ্গালীরা বৎসরে সাত মাস এখানে থাকিয়া পুনর্ব্বার প্রিয় জন্মভূমিতে উপনীত হন। সুতরাং সিমলাকে তাঁহারা কিছুতেই গৃহ বলিয়া মনে করিতে পারেন না। সেই

জন্য সমস্ত ক্রিয়াকলাপ তাঁহারা দেশেই সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

একটা দুঃখের কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। এখানে এত সুশিক্ষিত ও কৃতী বাঙ্গালী থাকিতেও, একটিও রীতিমত বাঙ্গলা সাধারণ পাঠাগার নাই। কতিপয় যুবকে মিলিয়া "অমরাবতী লাইব্রেরি" নাম দিয়া নিজেদের মেসের বাসায় একটি ক্ষুদ্র আলমারিতে খানকতক বাঙ্গলা বহি রাখিয়াছেন বটে, কিন্তু এই লাইব্রেরির "অমরত্বের" কোন লক্ষণই দেখা যায় না। অন্তর্জ্জলী রোগীর মত ইহার নাড়ী বহিতেছে কি না বুঝা যায় না। সাহেবদের অনুকরণ করিয়া অনেকে ইংরাজি লাইব্রেরিতে উচ্চ হারে চাঁদা দিয়া থাকেন, এবং চক্‌চকে পুরু কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত, অসংখ্য ছবিযুক্ত বহুবিধ গল্পপূর্ণ বিলাতী ম্যাগ্যাজিন্ আফিস হইতে ফিরিবার সময় গৃহে লইয়া যান বটে, কিন্তু পড়েন কি না, তাহা তাঁহারাই জানেন। ছাপার অক্ষরে অনেকবার বাঙ্গালা সাহিত্যসেবীরা আক্ষেপ করিয়াছেন যে আমাদের প্রিয় বঙ্গসাহিত্য বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে নির্ব্বাসিত হইয়াছে; ভাল, বাবুরা ইংরাজি পড়িয়াই সুখ হউন, কিন্তু অন্তঃপুরেও কি বাঙ্গলা সাহিত্যের জন্য সুমধুর তাগাদা করিবার লোক নাই? রবীন্দ্র বাবু একবার পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন,—"বাঙ্গালীর মেয়েরা যে এখন ইংরাজি শিখিতে আরম্ভ করিতেছেন, ইহা আমাদের পক্ষে শুভ লক্ষণ নহে। এখন পূজার সময় লোকে স্ত্রীর জন্য আমাদের বহি কিনিয়া লইয়া যায়। স্ত্রীরা ইংরাজি শিখিলে আর তাহা হইবে না।"—তবে কি সিদ্ধান্ত করিব যে সিমলার পুরমহিলাগণ সকলেই ইংরাজি ভাষায় সুশিক্ষিতা হইয়াছেন?—হয় নাই, হয় নাই তবুও এখন বাঙ্গলা সাহিত্যের যথেষ্ট আদর হইয়াছে। কলিকাতা অঞ্চলে দেখিয়াছি কোনও সাধারণ বাঙ্গলা লাইব্রেরিতে সন্ধ্যার সময় জনতা ঠেলিয়া প্রবেশ করা দুষ্কর। একখানি ভাল বহি বাহির হইলে তাহা লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। সেই বাঙ্গালীরা সিমলায় আসিয়া কেন যে এমন বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছেন, বুঝিতে পারি না। ইহা কি চিরবৈরাগ্যযোগী হিমালয়ের সংস্পর্শগুণে? ইতি। পৌষ সংক্রান্তি, ১৩০৪।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

পিতৃহীনা।*

এক ফোঁটা অশ্রু তুই দগ্ধ যাতনার পরে,
একটি শিশির কণা বিশুষ্ক কুসুম থরে!
কণক আলোক ল'য়ে রবি অস্তমিত হলে,
ফুটিলি তারকাবিন্দু সন্ধ্যার আঁধার কোলে!
দারুণ হিমানীপাতে পত্র পুষ্প ঝরে' যায়;
কে তুই রে কুন্দকুঁড়ি মুকুলিত হলি তায়?
এলি যদি গৃহ-কোণে, বরষার চাঁদ আলো!
যেটুকু পারিস্ সরা এ মলিন ছায়া কালো।
থাক্ থাক্ বিধাতার শেষ আশীর্ব্বাদ পারা,
তপ্ত বালুকার বক্ষে নির্ঝরের ক্ষীণ ধারা!

শ্রীবিনয়কুমারী ধর

বুদ্ধদেব।

হায় কেন এ অশান্তি অন্তরে আমার,
কিসের অভাব তরে, করে হাহাকার
এ রাজনগরে? নরনারী হেরি সব
সুখেতে মগন; নৃত্যগীতে রত সবে;
শুধু হাস্যালাপে করে এরা দিবানিশি
সময় ক্ষেপণ; কিন্তু শুধু মোর প্রাণ,
হেরি এই মানবের হীন আকিঞ্চন,
হয় আরো ঘোররূপে বিষাদে মগন।
পিতা মোর সদা, হায় মায়াজাল পাতি,
বনের বিহগে চান ধরিতে পিঞ্জরে।
কিন্তু, পিতা, ইহা তব বৃথা আকিঞ্চন;
বিলাস-সাগরে পশি, বাসনার জালে
কভু নাহি দিবে ধরা, সিদ্ধার্থ তোমার।
অন্তরের অন্ত হ'তে, সুগভীর স্বরে,
কে যেন সতত মোরে করিছে আহ্বান;
নিশীথে স্বপনে শুনি সে আহ্বান ধ্বনি,
অধীর পরাণ মোর উঠে গো কাঁদিয়া।
সে স্বর সতত যেন বলিছে ডাকিয়া,—
"হে সিদ্ধার্থ, নির্ব্বাপিত সত্যালোক জ্বালি,
অসত্যের অন্ধকার কর বিদূরিত।
করুণার বারি বর্ষি, শুষ্ক মরুভূমে
দয়ার নির্ঝর-ধারা কর প্রবাহিত।
অসহায়, হায়! এই দীন নরগণে
ল'য়ে যাও নিত্যোজ্জ্বল অমৃতের পথে।"

শ্রীলজ্জাবতী বসু।

* পূজনীয় মহাত্মা ৺ মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের কনিষ্ঠ কন্যার [illegible]।

অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে খুলনা জেলার অন্তর্গত রাড়ুলী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ও সম্পন্ন কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রাম অমর কবি মধুসূদনের জন্ম-গ্রাম সাগর দাঁড়ি হইতে ৮ মাইল দূরে "কপোতাক্ষ" নদের কূলে অবস্থিত। মধুসূদন এই কপোতাক্ষকেই উদ্দেশ করিয়া সুদূর ফরাসী দেশ হইতে লিখিয়াছিলেনঃ—

সতত হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়ামন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে
জুড়াই এ কাণ আমি ভ্রান্তির ছলনে।
বহুদেশে দেখিয়াছি বহুনদদলে,
কিন্তু এস্নেহের তৃষা মিটে কার জলে?
দুগ্ধস্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমিস্তনে।"

প্রফুল্লচন্দ্রের পিতা ৺ হরিশ্চন্দ্র রায় কৃষ্ণনগর কলেজে কাপ্তেন ডি,এল্, রিচার্ডসনের নিকট ইংরাজী শিক্ষা করেন। তিনি আরবী ও পারসী ভাষাতেও ব্যুৎপন্ন ছিলেন। বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার একান্ত অনুরাগ ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, মধুসূদন দত্ত, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, প্রভৃতি সুলেখকগণের বন্ধুর বঙ্গসাহিত্যানুরাগী হইবারই কথা। প্রথমোক্ত দুই মহাত্মার সংসর্গে পড়িয়া তিনি সর্ব্ববিধ সামাজিক সংস্কারের পক্ষপাতী হন। তিনি বার্ষিক ৪।৫ হাজার টাকা আয়ের পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি চাকরী কখনও করেন নাই, করিতে ইচ্ছাও করেন নাই। নিজ গ্রামে নিজ ব্যয়ে একটি বিদ্যালয় স্থাপন পূর্ব্বক প্রায় ২৫ বৎসর উহা চালাইয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ের জন্য তাঁহার মাসে ৪০।৫০ টাকা ব্যয় হইত, সরকারী সাহায্য হইতে অবশিষ্ট ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। উহাতে প্রথমে মধ্যবাঙ্গালা, পরে মধ্যইংরাজী ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পর্য্যন্ত পড়ান হইত। তিনি স্বগ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপন করেন। তিনি অনেক ধনী ও বিলাসী লোকের সঙ্গে মিশিতেন; তাঁহাদের অনেকের চরিত্র বড় ভাল ছিল না। কিন্তু হরিশ্চন্দ্র আজীবন পবিত্রচরিত্র ছিলেন। তিনি পরিচ্ছদ সম্বন্ধে বড় উদাসীন ছিলেন। এবিষয়ে প্রফুল্লচন্দ্র "বাপ্‌কা বেটা"—a chip of the old block। তিনি নিজ সন্তানগণকে সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতেন; কখনও তাহাদিগকে তিরস্কার পর্য্যন্ত করিতেন না। বোধ হয় তিনি ভাবিতেন ছেলে মেয়েদিগকে বাচনিক উপদেশ দেওয়া বা ভৎর্সনা করা অপেক্ষা নিজ জীবনে সদৃষ্টান্ত প্রদর্শনই শ্রেয়ঃ।

দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রফুল্লচন্দ্র নিজ গ্রামের মাইনর স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। তাহার পর হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি হন। চারি বৎসর পরে তিনি অ্যালবার্ট স্কুলে যান। সেখানে তিনি নিজ শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ ছাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার পঠদ্দশার এই সময়টি স্মরণ করিলে এখনও তাঁহার হৃদয়ে আনন্দের উদ্রেক হয়। এখানেই তাঁহার শিক্ষক স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেন মহাশয়ের সহিত তিনি বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন। শিক্ষক ও শিষ্যের সাহিত্যানুরাগ এই বন্ধুত্বের একটী প্রধান কারণ। প্রফুল্লচন্দ্রের পিতার একান্ত অভিলাষ ছিল যে, তাঁহার একটি সন্তান বিলাতে শিক্ষালাভ করে। কিন্তু জীবনের শেষ ভাগে নানাপ্রকার আর্থিক গোলযোগে পড়ায় তাঁহার এই ইচ্ছা পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু পিতার এই অভিলাষ প্রফুল্লচন্দ্রের হৃদয়ে নিরন্তর জাগরূক ছিল। এইজন্য তিনি অ্যালবার্ট স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে থাকিতে থাকিতেই গোপনে কাহারও সাহায্য না লইয়া ফরাসী ও লাটিন ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন;—উদ্দেশ্য গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি লইয়া বিলাত যাত্রা। তিনি এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউষ্যনে ভর্ত্তি হন; তথায় ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। প্রফুল্লচন্দ্র মেট্রোপলিটানে অন্যান্য বিষয় এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে বিজ্ঞান-শিক্ষা করিতেন।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি লাভ করিয়া প্রফুল্লচন্দ্র বিলাত যাত্রা করেন। তিনি গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষা দেওয়ার কথা বরাবর পিতার নিকট গোপন করিয়া আসিয়াছিলেন; কারণ, কৃতকার্য্য হইলে পিতা বিস্মিত ও আনন্দিত

হইবেন। বিলাত যাত্রা সম্বন্ধে প্রফুল্লচন্দ্রের জননী দেবীর কোন কুসংস্কার বা আপত্তি ছিল না। তিনি আহ্লাদের সহিত পুত্রকে বিলাত যাইতে অনুমতি দেন। প্রফুল্ল বাবু এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। রসায়ন তাঁহার বিশেষ অনুশীলনের বিষয় ছিল। অবশ্য পদার্থবিজ্ঞানও তিনি সম্যক্‌রূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি তথায় ছয় বৎসর কাল অধ্যয়ন করেন; এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ডি, এস্ সি উপাধিলাভ করেন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাভার্থ তাঁহাকে যে রাসায়নিক প্রবন্ধ রচনা করিতে হইয়াছিল, তাহা এডিনবরার রয়্যাল সোসাইটির কার্য্যবিবরণের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। এডিনবরায় অবস্থিতিকালে তিনি India before and after the mutiny নামক একটি পুস্তক রচনা করেন। ইহার সম্বন্ধে প্রিন্সিপ্যাল স্যার উইলিয়ম মিওর বলেন "The Essay bore marks of rare ability।" বিখ্যাত স্কট্‌স্‌ম্যান পত্রিকা বলেন :—

"It is a most interesting little volume, and we do not profess to wonder in the least that it has earned a considerable amount of popularity. It contains information in reference to India which will not be found elsewhere, and it is deserving of the utmost notice"—*Scotsman, Oct. 28, 1886.*

মহাত্মা জন ব্রাইট্ বলেন :—

"You write what is true on the Indian question and trust your effort will yield some fruit"

বিলাত প্রবাস কালে প্রফুল্লচন্দ্র অভিনিবেশপূর্ব্বক তদ্দেশবাসিগণের রাজনৈতিক জীবন পর্য্যবেক্ষণ করিতেন।

রায় মহাশয়, ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজের অন্যতর রসায়নাধ্যাপক নিযুক্ত হয়েন। তিনি ১৮৮৮ হইতে ১৮৯৭ পর্য্যন্ত ৯ বৎসরে নানা সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সভায় পঠন ও তাহাদের কার্য্যবিবরণের মধ্যে প্রকাশ করিবার জন্য ৯টি অভিনবগবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রেরণ করেন। সমস্ত গুলিই প্রকাশিত হইয়াছে। গত দুই বৎসরের গবেষণা বিশেষ ফলবতী হইয়াছে। এই দুই বৎসরে তিনি পারদঘটিত তেরটি নূতন যৌগিক পদার্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার আবিষ্ক্রিয়া সম্বন্ধে অধ্যাপক পেড্‌লার বলেন :—

"Dr. P. C. Ray by his discovery of the method of preparation of this compound (Mercurous Nitrite) has filled up a blank in our knowledge of the Mercury Series." * * * *

অধ্যাপক এড্‌বার্ড ডাইবর্স অধ্যাপক রায়কে লিখিয়াছেন :—

"Mr. Haga and myself prepared Mercurous Nitrite 11 years ago without knowing its composition * * * a fact which does not lessen your own right to claim its discovery." "You have discovered a very remarkable reaction in the oxidation in solution of potassium cyanide by mercuric nitrite becoming hyponitrite."

কলিকাতা রিবিউ পত্রে একটী প্রবন্ধে নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলি প্রকাশিত হয় :—

"Although Lefort, Gerhardt, Marignac, and other chemists have been for a long time engaged in the study of the action of nitrite acid on mercury under varying circumstances, yet they could not discover or prepare mercurous nitrite, the existence of which was indicated by the laws of chemical analogy. Mercury has been known to yield almost all the different classes of compounds known to chemists, such as sulphides, oxides, sulphates nitrites, &c., but the nitrite series of the element were found wanting. There is scarcely any information worth the name to be found about mercurous nitrite in Fremy's *Encyclopedie Chimique*. Even Roscoe and Schorlemmer, in their well known treatise, do not so much as mention this compound, nor is there any reference to it to be found in the latest edition of Watt's *Dictionary of Chemistry*. It was reserved for Dr. P. C. Ray to discover this 'missing link,' in the series of the compounds of mercury, which had hitherto baffled all the efforts of the European chemists either to discover or prepare."

স্থানাভাবে আমরা Chemist and Druggist প্রভৃতি পত্রিকা এবং বার্টলো (Berthelot), বিক্টর মাইয়ার রস্কো প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ রাসায়নিকগণের মত উদ্ধৃত করিলাম না।

প্রেসিডেন্সী কলেজে রাসায়নিক গবেষণাগার স্থাপিত হওয়ায় অধ্যাপক রায়ের মত ব্যক্তির গবেষণা ও আবিষ্ক্রিয়ার সুবিধা হইয়াছে। এখানে শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ ও জ্যোতিভূষণ ভাদুড়ী ভ্রাতাদ্বয়ও রাসায়নিক গবেষণা কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। ইতিমধ্যেই তাঁহাদের পরিশ্রমের ফলও কিছু কিছু দৃষ্ট হইয়াছে। জ্যোতিভূষণ "On the transformation of the Hypochlorites into Chlorates" নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া মৌলিক গবেষণার জন্য প্রদত্ত ইলিয়ট পুরস্কার প্রাপ্ত হন। সম্প্রতি ইহারা দুই ভ্রাতায় মিলিয়া এসিয়াটিক সোসাইটীতে অধ্যবসায় ও কঠোর পরিশ্রমের ফলস্বরূপ একটি সন্দর্ভ প্রেরণ করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রসংযোগে কোন তত্ত্বের প্রমাণ প্রদর্শনে চন্দ্রবাবুর মত নিপুণহস্ত লোক আমাদের দেশে অধিক দেখা যায় না। যন্ত্র রচনা ও নির্ম্মাণে তাঁহার হস্তের অসাধারণ কুশলতা

দেখা গিয়াছে। সুযোগ অভাবে ইঁহার রাসায়নিক প্রতিভা সম্যক্ বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে না। প্রেসিডেন্সী কলেজের রাসায়নিক গবেষণাগার সংস্থাপনের জন্য অধ্যাপক পেড্‌লার আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতার পাত্র। তাঁহারই যত্নে ইহা স্থাপিত হইয়াছে।

অধ্যাপক রায় ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত সতীশচন্দ্র সিংহ এম্ এর সহকারিতায় বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল্ ওয়ার্কস্ নামক রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানা স্থাপন করেন। ভারতবর্ষে রাসায়নিক এবং অপরাপর দ্রব্যজাত প্রস্তুত হয়, ইহা অধ্যাপক রায়ের একটি জীবনব্যাপী অভিলাষ। সেই মনোরথ কিয়ৎপরিমাণে পূর্ণ করিবার জন্য তিনি এই কারখানা স্থাপন করেন। এবিষয়ে তাঁহার মূলমন্ত্র—সুইফ্‌টের সেই সুপরিচিত কথা—

Whoever could make two ears of corn, or two blades of grass, to grow upon a spot of ground where only one grew before, would deserve better of mankind, and do more essential service to his country than the whole race of politicians put together.

মূলধন না থাকায় এবং সাধারণের সহযোগিতার অভাবে তাঁহাকে বহু অর্থসাপেক্ষ যন্ত্র ও প্রক্রিয়াদির পরিবর্ত্তে অনেক সহজ ও অল্পব্যয়সাধ্য প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন করিতে হইয়াছে, এবং প্রথমে আরও নানাবিধ বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছে। এক্ষণে এই কারখানাটি দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছে বলিতে পারা যায়। কিন্তু এজন্য প্রফুল্ল বাবুকে অনেক আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছে। প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে অনেক কোটি টাকার ঔষধ, নৈল রং, (ani line dyes) দিয়াশেলাই, বাতী, সাবান, এবং নানাবিধ রাসায়নিক দ্রব্য আমদানী হয়। এই সমস্তই ভারতবর্ষে প্রস্তুত হইতে পারে। এতদ্দ্বারা যে কেবল হাজার হাজার লোকের অন্নের সংস্থান হইতে পারে, তাহা নয়; কারখানার অধ্যক্ষগণও প্রভূত লাভবান হইতে পারেন। জর্ম্মাণীকে অধুনা রাসায়নিক দ্রব্যের আকর বলিলেও চলে। ইহার বাণিজ্যিক উন্নতির প্রধান কারণ রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করণ বিষয়ে জর্ম্মণ গবর্ণমেণ্টের উৎসাহ লাভ। নানাবিধ নৈল রং এবং কয়লার আল্‌কাতরা হইতে উদ্ভূত ফেনাসিটিন, আণ্টিপাইরিন, সাল্‌ফোনেল প্রভৃতি সংশ্লেষিক (Synthetical) ঔষধ প্রস্তুত করিয়া জর্ম্মানেরা আজ ধনশালী জাতি হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের দেশের প্রত্যেক রাসায়নিক কারখানায় গবেষণা ও আবিষ্ক্রিয়া চলিতেছে। আর, আমাদের দেশের ধনী লোকেরা এবিষয়ে উদাসীন, গবর্ণমেণ্টও সহানুভূতিহীন। ইহার ফল যেরূপ শোচনীয় হইবার তাহাই হইয়াছে। কত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী বৈজ্ঞানিক শিক্ষা পাইয়াও চাকরীর জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছে। এবিষয়ে আমাদের দেশের গবর্ণমেণ্ট যদি জাপানী গবর্ণমেণ্টের মত হইতেন, তাহা হইলে আমাদের দশা এমন হইত না। জাপানী গবর্ণমেণ্টের বৃত্তির সাহায্যে অনেক জাপানী যুবক ইউরোপ ও আমেরিকার পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া আসিয়া স্বদেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং ইংরাজী ভাষায় একখানি বৈজ্ঞানিক কাগজ চালাইতেছেন। আমাদের বুদ্ধি আর কিছু জাপানীদের বুদ্ধি অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয়। সুযোগের অভাবে আমরা জাতিসমাজে হীন হইয়া রহিয়াছি। গবর্ণমেণ্ট না করুন, দেশের ধনীদিগকে ত কেহ দিব্য দিয়া বলে নাই যে তোমরা বিজ্ঞান শিক্ষার্থ যুবকগণকে পাশ্চাত্য দেশে পাঠাইও না; কারখানা খুলিয়া আপনাদের স্বদেশের ধনবৃদ্ধি করিও না!

চারি বৎসর হইল অধ্যাপক রায় "সরল প্রাণিবিজ্ঞান" নামে একখানি সুন্দর প্রাণিবিদ্যাবিষয়ক সচিত্র পুস্তক লিখিয়াছেন। এই জন্য তাঁহাকে অনেক শ্রম ও অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে। প্রাণিবিদ্যা বিষয়ে বঙ্গভাষায় ইহাই একমাত্র বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে শিক্ষাবিভাগে বা সাধারণ পাঠক সমাজে এরূপ পুস্তকের সমুচিত আদর হয় নাই।

বিখ্যাত ফরাসী রাসায়নিক বার্টলো * ইহাকে একটি পত্রে যে যে পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থে রাসায়নিক দ্রব্যজাত

* M. Barthelot, Perpetual Secretary of the Acadamy of Sciences, Paris. সংশ্লেষিক রসায়নে (Synthetical Chemistry) পৃথিবীতে ইঁহা অপেক্ষা পণ্ডিত কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইনি Journal des Savants নামক পত্রে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ডাক্তার রায়ের নাম উল্লেখ করিয়া ফরাসী ভাষায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহার ইংরাজী অনুবাদ প্রদত্ত হইতেছে;—

"However it is necessary to examine certain documents indicated to me by a recent letter of Ray, Professor, Presidency College, Calcutta. According to this Savant (D'apres ce Savant), there exist treatises on alchemy in Sanskrit, * * *. The subject is worthy of the most profound attention of those who are interested in the history of chemistry."

ডাক্তার রায়কে Savant বলায় অত্যুক্তি হয় নাই।

প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়াদি আছে, তৎসম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তদুত্তরে প্রফুল্ল বাবু একটি সারগর্ভ পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন। ইহা এখনও মুদ্রিত হয় নাই; সম্ভবতঃ অচিরে পরিবর্দ্ধিত আকারে লণ্ডন ও পারিসে প্রকাশিত হইবে। এই পুস্তিকার নাম Materials for a neglected chapter in the History of Chemistry. ইহার প্রথম খণ্ডে—সংস্কৃত চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ সকলের যে যে শ্লোকে রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়াদি বর্ণিত আছে, তৎসমুদয়ের ইংরাজী অনুবাদ আছে। দ্বিতীয় খণ্ডে ভারতীয় রসায়ন বিদ্যার উৎপত্তি ও ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। এই পুস্তিকা হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, বাগ্‌ভট্ট কৃত অষ্টাঙ্গহৃদয়, গোপালকৃষ্ণ কৃত রসেন্দ্রসারসংগ্রহ, রামচন্দ্র কৃত রসেন্দ্র চিন্তামণি, শার্ঙ্গধরসংহিতা, চক্রদত্তসংগ্রহ, রসরত্ন সমুচ্চয়, এবং ভাবমিশ্র কৃত ভাবপ্রকাশ, এই কয়েক খানি গ্রন্থে নানাবিধ রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া বর্ণিত আছে। গ্রন্থগুলি একাদশ হইতে ষোড়শ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রণীত। এতন্মধ্যে রসরত্নসমুচ্চয় বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। কারণ ইহাতে নানাবিধ পারদঘটিত ঔষধ প্রস্তুত—প্রক্রিয়া ব্যতীত, ঊর্দ্ধপাতন, তির্য্যক্‌পাতনাদি প্রক্রিয়ার উপযোগী যন্ত্রের বর্ণনা আছে। অধ্যাপক রায়ের পুস্তিকায় উহাদের ছবি মুদ্রিত হইবে। বার্টলো মহোদয়ের ধারণা এই যে ভারতীয় রসায়ন পরোক্ষভাবে গ্রীকদিগের নিকট হইতে গৃহীত। প্রফুল্ল বাবু নানা সুযুক্তি দ্বারা দেখাইয়াছেন যে ভারতবাসীগণ স্বাধীনভাবে রাসায়নিক জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক রায়ের দেহ সুস্থ ও সবল নহে। প্রায় কুড়ি বৎসর হইল, তিনি অজীর্ণ রোগে ভুগিতেছেন। তাহার উপর প্রায় ছয় বৎসর পূর্ব্বে অনিদ্রা রোগে কষ্ট পান। এখনও এই রোগ হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। এই সকল কারণে প্রফুল্ল বাবুকে রাত্রে, এমন কি সন্ধ্যাকালেও কঠোর জ্ঞানানুশীলন ত্যাগ করিতে হইয়াছে। সময় সম্বন্ধে এইরূপ বাঁধাবাঁধির মধ্যে থাকিয়াও যে তিনি এত কঠিন শ্রম সাপেক্ষ আবিষ্ক্রিয়া করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা কেবল কার্য্যের শৃঙ্খলা এবং কঠোর নিয়মাধীনতার গুণে। প্রাতঃকালের ২ ঘণ্টা (গ্রীষ্মকালে ৬॥০ হইতে ৮॥০টা এবং শীতকালে ৭টা হইতে নয়টা) তিনি নিয়মিতরূপে বিদ্যাচর্চ্চায় যাপন করেন। অধ্যাপনার জন্য ১ কি ২ ঘণ্টা বাদ দিয়া ১১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত তিনি কলেজে বৈজ্ঞানিক অভিনব গবেষণায় যাপন করেন। এক্ষণে নানাবিধ গবেষণায় তাঁহার হস্ত পূর্ণ। গত বৎসর হইতে তিনি, অপরাহ্নে মুক্ত বাতাসে অনেকক্ষণ ভ্রমণের পর, সন্ধ্যার সময় এক বা দেড় ঘণ্টা লঘু সাহিত্য পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাই তাঁহার কাজের নিয়ম। সমস্ত বৎসর—কলেজের ছুটির সময়ও—তিনি ঠিক এই নিয়ম অনুসারে কাজ করেন। ছুটির সময়েই তিনি প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া স্বাধীন গবেষণা কার্য্যে সময়ক্ষেপণ করেন। তিনি আমাকে বলিয়াছেন, জন মর্লী অধ্যয়ন সম্বন্ধে একটী বক্তৃতাতে যে পরামর্শ দিয়াছেন, তিনি তাহারই অন্তর্নিহিত সঙ্কেতানুসারে কাজ করিতে চেষ্টা করেন।

"Now in half an hour I fancy you can read fifteen or twenty pages of Burke; or you can read one of Wordsworth's masterpieces—Say the lines on Tintern; or say, one-third * * of a book of the Iliad or the Æneid * * But try for yourselves what you can read in half an hour. Then multiply the half hour by 365, and consider what treasures you might have laid by at the end of the year; and what happiness fortitude, and wisdom they would have given you for a life time."*

একটি কথা আছে—"ছাত্রাণামধ্যয়নম্ তপঃ।" প্রফুল্ল চন্দ্র অধ্যাপক, কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ উপাধিধারীর মত তাঁহার শিক্ষাকাল উত্তীর্ণ হইয়া যায় নাই। এখনও জ্ঞানান্বেষণই তাঁহার প্রধান কার্য্য। কিছুদিন পূর্ব্বে একখানি পত্রে কথা প্রসঙ্গে তিনি আমায় লিখিয়াছিলেন—I was never a more *bona fide* student than to-day. বাস্তবিক পুরাকালে শিক্ষার্থীদের যেরূপ ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা ছিল, প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন তাহার একটী দৃষ্টান্ত স্থল। ইনি এখনও অবিবাহিত আছেন। ইহার বাসভবনে, আহারে, পরিচ্ছদে, বিলাসিতার লেশমাত্র নাই। ইনি চালচলন ও কথাবার্ত্তায় এরূপ সাদাসিদে ও আড়ম্বরবিহীন যে, "বিলাত ফেরত" বলিয়া কেহই ইহাকে সন্দেহও করিতে পারে না। এ সকল বিষয়ে তিনি বেহদ্দ বাঙ্গালী; কিন্তু ধর্ম্মভাবে চরিত্রের পবিত্রতায় ও জ্ঞানস্পৃহায় বিদ্যার্থী মাত্রেরই, এবং অপরের অনুকরণ

* *University Extension Addresses*, pp. 69-70.

যোগ্য। দেশহিতকর নানাবিধ কার্য্যে ইহার যোগ আছে। গরিব দুঃখীর সেবায় ইনি মুক্ত হস্ত। দানশীলতা ইহার চরিত্রের অন্যতম ভূষণ। বিখ্যাত Sir Isaac Newton বলিতেন: "those who gave nothing before death never, in fact, gave at all" অর্থাৎ যাঁহারা জীবদ্দশায় কিছুই দান করেন না তাঁহাদের দান দানই নহে। প্রফুল্লচন্দ্র এই মহাজনবাক্য সদা স্মৃতিপথে জাগরূক রাখিতে চেষ্টা করেন। ভাল সাজিবে বলিয়াই বিধাতা বুঝি ইহার মত জ্ঞানলিপ্সুদিগকে বিনয়ভূষণে অলঙ্কৃত করেন। ইহার সরলতা বালকোপম।

পঠদ্দশায় প্রফুল্লচন্দ্র ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস ও ও জীবনচরিত পাঠে একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। এখনও তিনি গোল্ডস্মিথ, আর্বিং, থ্যাকারে, ডিকেন্স্ ও জর্জ্জ ইলিয়টের গ্রন্থাবলী পড়িতে ভাল বাসেন। জীবিত ঔপন্যাসিকগণের মধ্যে তিনি কেবল এড্‌নালায়েলের গ্রন্থাবলীর পক্ষপাতী, বিশেষতঃ তাঁহার "We Two" এবং "Donovan" এর। বাইবেলের নূতন অংশ, এমার্সন, টেনিসন (কেবল In Memoriam, Enoch Arden, এবং Guinevere), মার্টিনো (Endeavours after the Christian Life এবং Hours of Thought), এপিকটীটস এবং মার্কস অরীলিয়স্ তাঁহার অনুরাগভাজন। তাঁহার জীবনে শেষোক্ত দুই জনের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। ঐশ্বর্য্য যে ধনের প্রাচুর্য্যে হয় না, কিন্তু অভাবের অল্পতাতেই হয়, ইহা তিনি বিশেষভাবে অনুভব ও উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুর সংখ্যা যেমন কম, প্রিয় গ্রন্থকারের সংখ্যাও তদ্রূপ। কিন্তু তিনি তাঁহার প্রিয় পুস্তকগুলি পুনঃ পুনঃ পাঠ করেন। তিনি আমাকে বলিয়াছেন, কখন কখন উপন্যাস বর্ণিত অনেক নরনারীর সহিত তিনি দিবস রজনী ঘনিষ্ঠভাবে যাপন করেন। তত্ত্ববোধিনী, বিবিধার্থ সংগ্রহ, রহস্য সন্দর্ভ, বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, বান্ধব, প্রভৃতি মাসিকপত্রের অধিকাংশ প্রবন্ধ তিনি পাঠ করিয়াছেন। মধুসূদন, দীনবন্ধু, প্রভৃতি গ্রন্থকারের লেখাও তিনি পাঠ করিয়াছেন। বাঙ্গলা সাহিত্যের সহিত তাঁহার যে পরিচয় নাই, তাহা নয়; কিন্তু উহাতে তাঁহার বিশিষ্ট অনুরাগ নাই। তিনি বলেন যে পাশ্চাত্য গ্রন্থকারেরাই জ্ঞানপিপাসা নিবারণ করিতে পারেন। সে যাহা হউক, বঙ্কিম বাবুর বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল তিনি খুব ভাল বাসেন। কিন্তু তিনি বলেন, "স্কট Count Robert of Paris ও Castle Dangerous লেখায় যেমন তাঁহার যশের লাঘবই হইয়াছিল, আনন্দ মঠ, সীতারাম ও রাজসিংহ লেখায় বঙ্কিম বাবুরও তেমনি অগৌরব হইয়াছে।"

অধ্যাপক রায় ফরাসী, জর্ম্মাণ ও লাটিন ভাষা জানেন। জর্ম্মাণ ও ফরাসীভাষা না জানিলে রসায়নবিজ্ঞানে বিশিষ্ট জ্ঞানলাভ করা যায় না। বিখ্যাত রাসায়নিক বুর্টস্ (Wurtz) বলেন—La Chimie est Une Science francaise—রসায়ন ফরাসী বিজ্ঞান। প্রফুল্ল বাবু বলেন তাঁহার রাসায়নিক জ্ঞানের চৌদ্দ আনা ফরাসী ও জর্ম্মাণগ্রন্থ হইতে লব্ধ।

অধ্যাপক রায়ের ছবি ইতিপূর্ব্বে কোন পত্রে মুদ্রিত হয় নাই। "প্রদীপে"ই ইহা প্রথম প্রকাশিত হইল।

লাল পল্টন।*

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বাঙ্গালীর বাহুবল।

বাঙ্গালী স্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয়। কিন্তু তাহা বলিয়া বাহুবলের নিতান্ত অভাব ছিল না। হিন্দু ও পাঠান সংঘর্ষের সূচনা হইতে ইংরাজ রাজত্বের আদিযুগ পর্য্যন্ত তাহার পর্য্যাপ্ত প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়।

সপ্তদশ পাঠান অশ্বারোহী কটাক্ষে বঙ্গবিজয় সুসম্পন্ন করিয়াছিল,—ইহাই বাঙ্গালীর কাপুরুষত্বের নিদর্শনস্বরূপ সর্ব্বত্র উদ্ধৃত হইয়া থাকে। কিন্তু এই জনাপবাদ সম্পূর্ণ অমূলক; অন্যের কথা দূরে থাকুক, মুসলমান ইতিহাস লেখকেরাও এরূপ কথা লিখিয়া যান নাই। তাঁহারা কেবল এই পর্য্যন্তই বলিয়া গিয়াছেন যে, এক বৎসরের মধ্যেই বঙ্গদেশ মুসলমানের পদানত হইয়াছিল। কিন্তু

* "প্রদীপের" ২য় সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পর কলিকাতার পুরাতন ঐতিহাসিক পুস্তকবিক্রেতা আর, বি, মিত্র আমাকে "হামিল্টনের ইষ্ট ইণ্ডিয়া গেজেটিয়ার" নামধেয় দুই খণ্ড পুস্তক পাঠাইয়া দিয়াছেন। ইহা আমার পূর্ব্বকথিত পুরাতন পুস্তকেরই পুনর্মুদ্রাঙ্কিত বিবরণে পরিপূর্ণ।

তাঁহাদের এই উক্তিকেও ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

এক বৎসর কেন,—১২০৩ হইতে ১৫৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনশত সাতাত্তর বৎসরেও পাঠানেরা সমগ্র বঙ্গভূমির হিন্দু সাম্রাজ্যের উপর অধিকার বিস্তার করিতে পারেন নাই। বঙ্গদেশের একাংশ মাত্রেই পাঠান শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল; অপরাংশে বাঙ্গালীর বাহুবল অক্ষুণ্ণ প্রতাপে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল।*

পাঠানশাসন সময়ে বাঙ্গালা দেশ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল; একভাগে হিন্দু, অপর ভাগে মুসলমান শাসনক্ষমতা পরিচালনা করিতেন, কিন্তু পাঠানেরা যে অংশ করতলগত করিয়াছিলেন, তাহার কোন স্বতন্ত্র নামকরণ না করায়; ইতিহাসে সেই একাংশ মাত্রই সমগ্র বাঙ্গলারাজ্যের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। ইহাতে লোকের মনে এমন ভ্রম জন্মিয়া গিয়াছে যে, নব্যবঙ্গের কত সুলেখক কবিতা বা উপন্যাস রচনাকালে স্বদেশপ্রীতি জাগাইয়া তুলিবার জন্য ১২০৩ খৃষ্টাব্দ হইতে সমগ্র বঙ্গভূমির স্বাধীনতা ধ্বংসের কালগণনা করিয়া কত না অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন!

১২০৩ হইতে ১৫৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্তই সাধারণতঃ পাঠান শাসনকাল গণিত হইয়া থাকে। এই সুদীর্ঘ কালেও বাঙ্গালার অধিকাংশ জনপদে হিন্দু-স্বাধীনতা বর্ত্তমান ছিল; পাঠানেরা কেবল মধ্যবঙ্গের সংকীর্ণ জনপদে অধিকার বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

পাঠানেরা বাঙ্গালাদেশের যে সকল জনপদে অধিকার বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহার ইতিহাসও দুই ভাগে বিভক্ত। ১২০৩ হইতে ১৩৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাঠান বিজিত অংশ দিল্লীর পাঠান সম্রাটদিগের রাজ্যভুক্ত থাকিয়া পাঠান রাজপ্রতিনিধি দ্বারা শাসিত হইত। পাঠান শাসনের পূর্ব্বার্দ্ধকালকে সেই জন্য প্রকৃত পাঠানশাসন বলা যায় না; তখনও হিন্দুর সহিত পাঠানের সংঘর্ষ নিরস্ত হয় নাই।

* After the capture of Gour, the Mahomedans were unable to extend their dominion over the whole Hindoo Kingdom of Bengal, not only towards the North and East, but even towards the West; nor did they obtain possession of the whole, as it is constituted at present, until a late period of the Mogul Government.—*Walter Hamilton's Description of Hindoostan, vol. 1, 115.*

কালক্রমে এই যুদ্ধকলহ শান্তিলাভ করিয়া বঙ্গভূমি হিন্দু মুসলমানের জন্মভূমি বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল; কিন্তু তখন আর বাঙ্গালাদেশের পাঠানবিজিত অংশও দিল্লীশ্বরের অধিকারভুক্ত রহিল না, তাহা স্বাধীন হইয়া উঠিল। দিল্লীশ্বর এই রাজ্যচ্যুতির গতি রোধ করিতে আসিয়া বাঙ্গলার হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত বাহুবলের নিকট নতশির হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন!

এইরূপে বঙ্গদেশে স্বাধীন পাঠান-শাসন প্রবর্ত্তিত হইলে কেবল যে পাঠান ভূপতিগণই নিরন্তর সিংহাসনে উপবেশন করিয়া হিন্দু মুসলমানের উপর রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন, তাহাও সত্য নহে। যখন যাঁহার বাহুবল প্রবল হইত, তিনিই তখন গৌড়াধিপতি হইয়া সিংহাসনে আরোহণ করিতেন। এইরূপে কখন হিন্দু, কখন মুসলমান, কখন বা হাব্‌শী ক্রীতদাস পর্য্যন্তও গৌড়াধিপতির রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। ১৩৮৫ হইতে ১৪০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ত্রয়োবিংশ বর্ষ বাঙ্গলা দেশের পাঠান বিজিতাংশ হিন্দু রাজা কংস ও তৎপুত্র চেৎমল্লের শাসনাধীন হইয়াছিল। চেৎমল্ল মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বাঙ্গলার ইতিহাসে জালালুদ্দীন নামে অদ্যাপি পরিচিত হইয়া রহিয়াছেন।*

মোগলগৌরবরবি মহাত্মা আকবর শাহের শাসন সময়ে মহারাজ টোডরমল্লের প্রতিভাগুণে বাংলাদেশের কিয়দংশে মোগলশাসন প্রবর্ত্তিত হয়; কিন্তু টোডরমল্ল স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করায় মোগলপতাকা উৎখাত হইয়া পড়িয়াছিল। মহারাজ মানসিংহ পুনরায় মোগলশাসন প্রবর্ত্তিত করিয়া: ১৫৮৯ হইতে ১৬০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সপ্তদশ বর্ষ বঙ্গদেশ শাসন করিয়াছিলেন।

মানসিংহকেও অনেক যুদ্ধ যুঝিতে হইয়াছিল, এবং তাঁহার সময়েও বঙ্গদেশের উত্তরপূর্ব্বাংশের অধিকাংশ জনপদ মোগলের পদানত হয় নাই। মানসিংহ বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমানের বাহুবলের পরিচয় পাইয়াছিলেন; বাঙ্গালী কায়স্থকুলতিলক মহারাজ প্রতাপাদিত্য বাঙ্গালীর বাহুবলের যেরূপ পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি অনেকের বিস্ময়ের বিষয় হইয়া রহিয়াছে।

মোগল শাসনে বাঙ্গালীর বাহুবল অবসন্ন না হইয়া

* Stewarts' History of Bengal.

নানা কারণে উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। যে সকল মুসলমান বীরপুরুষেরা বাঙ্গালা দেশে জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের এবং মহারাজ মানসিংহের ক্ষত্রিয় সেনার বংশধরগণ বাঙ্গালা দেশে বসতি করিয়া বাঙ্গালীর বাহুবল বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন।

বাঙ্গালাদেশের মধ্যে বিষ্ণুপুর ও বীরভূমি বাহুবলের জন্য সবিশেষ বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। মোগল শাসনের অধঃপতন দিনে বাঙ্গালী রাজা ও জমিদারবর্গ বাহুবলে আত্মরক্ষা করিবার জন্য বহুল পরিমাণে সেনাপোষণ করিতেন। বর্গীর হাঙ্গামায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া নবাব আলিবর্দ্দী এই সকল সেনার সহায়তা গ্রহণ করিতেন এবং বাঙ্গালীর বাহুবল সম্বল করিয়াই অনেকবার মহারাষ্ট্রদলনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।*

সিরাজদ্দৌলা কলিকাতা অধিকার করিবার পর কিছুদিন পর্য্যন্ত ইংরাজদিগকে যৎপরোনাস্তি নাস্তানাবুদ হইতে হইয়াছিল। তাঁহাদের বাণিজ্য ব্যবসায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল; কলিকাতা ও মফস্বল কুঠির ইংরাজ কর্ম্মচারীগণ ফল্‌তার বন্দরে সম্মিলিত হইয়া নিরন্তর হা হুতাশে কালযাপন করিতেছিল।

এই সময়ে ফরাসি সমরশঙ্কায় ইংরাজেরা এতদূর ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, মান্দ্রাজের ইংরাজমণ্ডলী কলিকাতার ধ্বংসবার্ত্তা শ্রবণ করিয়াও সহসা কোন প্রতিকারের পথ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। অবশেষে অনেক তর্কবিতর্কের পর বাঙ্গালার বাণিজ্য ব্যবসায় পুনঃ সংস্থাপনার্থ সেনাপতি ক্লাইব এবং ওয়াট্‌সনের উপর কার্য্যভার ন্যস্ত হয়। †

ক্লাইব এবং ওয়াটসন ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর ৯০০ গোরা এবং ১২০০ তেলেঙ্গা সিপাহী লইয়া মান্দ্রাজের বন্দরে পোতারোহণ করেন। তৎকালে মান্দ্রাজের ইংরাজ দরবার পুনঃ পুনঃ বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, ফরাসিসমরশঙ্কা প্রবল হইয়া উঠিতেছে; যত শীঘ্র সম্ভব বাঙ্গালার গোলযোগের মূলোচ্ছেদন করিয়া ক্লাইবকে সসৈন্যে মান্দ্রাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে।

প্রতিকূল পবন পীড়নে "কম্বরল্যাণ্ড" এবং 'মারলররা' নামক দুইখানি রণপোত বঙ্গোপসাগরে নিরুদ্দেশ হইয়া গেল; অবশিষ্ট রণপোতারোহী অত্যল্প সেনার সমভিব্যাহারে ক্লাইব এবং ওয়াটসন বঙ্গদেশে উপনীত হইলেন।

এই সকল কারণে ক্লাইব বঙ্গদেশে পদার্পণ করিবা মাত্র সেনাবল বৃদ্ধি করিতে সমুৎসুক হন। ইহাতে তাঁহারা ভবিষ্যদ্দৃষ্টির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া ইংরাজ লেখকগণ তাঁহাকে অজস্র ধন্যবাদ প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

ক্লাইব কিন্তু নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই বাঙ্গালা দেশে সেনা সংগ্রহের সংকল্প করিয়াছিলেন। এরূপ উপায় অবলম্বন না করিলে তাঁহাকে অচিরে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে হইত। ক্লাইবের একখানি পত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কলিকাতা দুর্গ রক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিলেই তিনি মান্দ্রাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন বলিয়া স্থির সংকল্প করিয়াছিলেন! †

কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে যুদ্ধব্যবসায়লোকের অভাব ছিল না। ক্লাইব ইহাদিগের মধ্যে মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া তিন চারি শত লোক লইয়া ১৭৫৭খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে প্রথম দল "লাল পল্টন" গঠন করেন। ইহারা শৌর্য্যে বীর্য্যে কাহারও নিকট হীন না হইলেও, সমর-কৌশলে সুশিক্ষিত গোরাসৈন্যের নিকট দাঁড়াইতে পারিত না। এই অভাব দূর করিবার জন্য ক্লাইব ইহাদিগকে ইউরোপীয় প্রথায় সমরকৌশল শিক্ষা দিবার আয়োজন করেন।

স্বাভাবিক শৌর্য্যবীর্য্যের সহিত শিক্ষালব্ধ সমরকৌশল মিলিত হইয়া ক্লাইবের "লালপল্টনকে" অল্পদিনের মধ্যেই দেশবিখ্যাত করিয়া তুলিয়াছিল। ইহাদের দৃষ্টান্তের অনু-

* At the time when the Nabab was engaged in conflict with the Marhattas he requested his dependent kings to give him every support in their power. Accordingly the Raja of Bishnupur despatched a band of his bravest heroes to the assistance of the Nabab. By their valour the Marhattas were subdued; and from that time, the Rajah of Bishnupur was the most renowned of the tributary kings of the Nabab.—W. W. Hunter's *Statistical Accounts of Bengal*, vol. IV. 233

† Orme's *Indostan*, vol. II.

* Another point to which Clive turned his attention, with that wonderful discrimination and foresight which peculiarly marked his character, was the organisation of an efficient Native regular force.—Broome's *Bengal Army*, vol. I. 92.

† Sir John Malcolm's *Lord Clive*, vol, I.

করণ করিয়া বোম্বাই এবং মান্দ্রাজ প্রদেশেও উত্তরকালে বহুসংখ্যক দেশীয় সিপাহী সেনা সংগৃহীত হইয়াছিল।*

এই লাল পল্টন দলে যাহারা প্রবেশ লাভ করিয়াছিল তন্মধ্যে দুই চারি জন জাঠ এবং রাজপুতেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। † ইহা হইতেই কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছেন যে, "লাল পল্টনে" একজনও বাঙ্গালী প্রবেশ লাভ করে নাই। এরূপ একদেশদর্শী সঙ্কীর্ণ মতের প্রতিবাদ করা শোভা পায় না। যে সময়ে "লালপল্টনের" অভ্যুদয় হয়, তৎকালে ইংরাজদিগের পক্ষে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে সেনা সংগ্রহ করিয়া আনিবার সম্ভাবনা ছিল না। তাঁহারা সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে খড়্গধারণ করিবার সময়ে তাঁহার অগোচরে কলিকাতায় বসিয়াই তাড়াতাড়ি "লাল পল্টন" সংগ্রহ করিয়াছিলেন; বাঙ্গালী ভিন্ন আর কাহারা আসিয়া সেই অত্যল্প সময়ের মধ্যে পল্টনদল বৃদ্ধি করিবে?

লাল পল্টনের সিপাহী সেনার শৌর্য্যবীর্য্য ও সমরকৌশলের কথা ইতিহাসে সমুচিত সমাদর লাভ করে নাই। তাহার প্রধান কারণ বাঙ্গালী সাহিত্য-সেবকদিগের ঐতিহাসিক তত্ত্বালোচনায় অপরিসীম ঔদাস্য! সদাশয় বৃটিশ বণিকসমিতি কিন্তু তাহাদের বীরকীর্ত্তির সমুচিত পুরস্কার প্রদান করিবার জন্য উত্তরকালে হতাবশিষ্ট জরাপলিত রুগ্ন সিপাহীগণকে মালদহ প্রদেশ ৩৩৮০বিঘা নিষ্করভূমি প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন; এখন তাহা মসীজীবী কুসীদব্যবসায়ী দুর্ব্বল বাঙ্গালীর বিলাস বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য নীরবে হলচালনা সহ্য করিতেছে! *

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

* This system which was soon found to answer admirably, was speedily imitated at the other Presidencies of Bombay and Madras.—Broome's *Bengal Army* Vol. 1 93.

† In the corps then and subsequently raised in and about Calcutta, were to be found Pathans Rohillas a few Jaths, some Rajpoots and even Brahmins—Captain Broome's *Bengal Army*, Vol. 1 93.

‡ * A plot of ground Mouza Mohunpur, within Pergana Shikarpur, containing abont 3380 bighas or 1127 acres, was assigned in the time of Lord Cornwalis for the support of an invalid Sepoy establishment. The lands were thus apportioned :—1 Jamadar 200 bighas 2 habildars at 120 bighas, 3 Naiks at 120 bigas, 33 Sepoys at 80 bigas.—W. W. Hunter's *Statistical Account of Bengal*, vol. VII. 83.

লেখকবর্গের প্রতি নিবেদন।

লেখকগণ কৃপা করিয়া নিম্নলিখিত কথাগুলি মনে রাখিলে ভাল হয়।

১। হস্তলিপি পরিষ্কার না হইলে ছাপাতে ভুল থাকে।

২। অপ্রকাশিত লেখা সাধারণতঃ ফেরত দেওয়া হয় না। নূতন লেখকগণ রচনা পাঠাইবার পূর্ব্বে নকল রাখিবেন।

৩। রচনার অপকৃষ্টতাই যে লেখা প্রকাশিত না হইবার একমাত্র কারণ, তাহা নয়। অন্যান্য কারণও আছে।

৪। কোন রচনা প্রকাশিত হইবে কি না, এই প্রশ্নের উত্তর সাধারণতঃ দেওয়া হয় না। সময়াভাবই উত্তর না দিবার কারণ; লেখকমহোদয়গণের প্রতি অবজ্ঞা ইহার কারণ নয়।

৫। দীর্ঘ কবিতা ছাপিবার সুবিধা প্রায় ঘটে না।

৬। গদ্য প্রবন্ধও দীর্ঘ হইলে ছাপিতে অসুবিধা হয়। সাধারণতঃ একটি প্রবন্ধের জন্য ৪।৫ পৃষ্ঠার অধিক স্থান সহজে দিতে পারা যায় না।

৭। বিষয় এবং ভাষা চিত্তাকর্ষক না হইলে কোন রচনা ক্রমশঃ প্রকাশিত হয় না। ক্রমশঃ প্রকাশ্য রচনা একবারে আদ্যোপান্ত সম্পাদকের হস্তগত হওয়া আবশ্যক।

৮। বাঙ্গলা মাসের প্রথম সপ্তাহে "প্রদীপ" প্রকাশ্য, এবং সম্পাদক প্রবাসী, এই দুটি কথা স্মরণ রাখিয়া লেখকগণ দয়া করিয়া সময় থাকিতে লেখা পাঠাইবেন। বাঙ্গালা মাসিক পত্রগুলি যাহাতে যথা সময়ে প্রকাশিত হয় তজ্জন্য যে কেবল ছাপাখানা ও সম্পাদক দায়ী, তাহা নয়, লেখকবর্গের অনুগ্রহেরও প্রয়োজন আছে।

প্রদীপ

১ম ভাগ। } চৈত্র, ১৩০৪। { ৪র্থ সংখ্যা।

সঙ্গিনী।

[১]

মা বাপের আর দ্বিতীয় সন্তান না থাকায় চারুবালা পিতৃগৃহে যে রকম স্নেহ ও যত্নের সহিত প্রতিপালিত হইতে লাগিল, এ কা[illegible] হিন্দুর ঘরের মেয়েরা ততখানি স্নেহ বা যত্ন আ[illegible] করিতে পারে না। আজকাল আমাদের [illegible] জন্মিলেই সমস্ত পরিবারের পুঞ্জীভূত অর্থাগমের সুযোগ ভ[illegible]ধ্য বিষাদ-ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে; জিরেত আছে, আর [illegible]ন্যার পিতাকে সেই দিন হইতেই পেকে গেল, কিন্তু কখন [illegible] অর্থ সংগ্রহের পরামর্শ দান না। তুমি এত পড়া শুনা [illegible]ত কন্যাপ্রসব করিয়া গ্রামস্থ বৃত্তি পছন্দ কল্লে!" [illegible]ধিনী বলিয়া পরিগণিত হন। অশ্রান্ত উপদেশে নরেন্দ্রনা[illegible]ও কালের অতীত থাকিয়া হইয়াছিল। তিনি সবিন[illegible]র পূর্ব্ব হইতেই তাহার জন্য মত অর্থ এবং ওকালতি[illegible] মাতৃহৃদয়ে অপার্থিব স্নেহরস আমার নাই। এদিকে দে[illegible] তাঁহার সমদৃষ্টির নিকট পুত্র শিখে ওকালতি ধ'রে ত[illegible]র্থিব পার্থক্য অনুভূত হয় না। থাকে না; আমার পরে[illegible] যখন চারুবালার সুকুমার [illegible] নারীজীবন অত্যন্ত অগৌরবের সহিত উদাসীনভাবে উপেক্ষা করিতেছিল, তখন তাহার স্নেহময়ী জননী তাহাকে বক্ষের অতি সন্নিকটে আকর্ষণপূর্ব্বক অজস্র অতৃপ্ত চুম্বনে তাহার ওষ্ঠে মাতৃস্নেহের সুধাময় মহিমা অঙ্কিত করিয়া সমগ্র পল্লীর অকারণ উপেক্ষাকে ব্যাহত করিতে বিরত হন নাই।

চারুবালার পিতা নরেন্দ্রনাথ আধুনিক লোক। পল্লীগ্রামের মধ্যে তাঁহার অবস্থা মন্দ ছিল না; তাই পিতার অভাবসত্ত্বে এবং গৃহে অন্য কোন পুরুষ অভিভাবক না থাকিলেও প্রেসিডেন্সী কালেজ হইতে বি, এ, পর্য্যন্ত পাশ করিয়াছিলেন। সে গ্রামে এপর্য্যন্ত আর কেহ বি, এ পাশ করে নাই; তাই গেজেটে সংবাদ বাহির হইলে গ্রামের মধ্যে একটা বিষম হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছিল। পরদিন ঘাটে স্নান করিতে গিয়া প্রৌঢ়ারা বলাবলি করিতে লাগিল, "ওপাড়ার মধু দিদির কি কপাল, ছেলে নয়ত যেন হীরের টুক্‌রো; এই বয়েস, এরই মধ্যে তিন চার্‌টে পাশ দিলে; ছেলে এখন যুগ্যি হয়ে উঠ্‌ল; বুড়োর অদেষ্টে নেই, দেখে যেতে পাল্লে না। যাহোক বৌটার অদেষ্টে সুখ আছে।" নরেন্দ্রনাথের বাল্যকালের সহপাঠী নীলাম্বরের স্ত্রী তখন ঘাটে স্নান করিতেছিল। নীলাম্বর বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তির ক্লাস হইতেই 'আউট্'। এখন সে এক পাঠশালার পণ্ডিতি করে এবং গৃহে প্রতিবৎসর একটি করিয়া শিশুর আবির্ভাব হয়।—কথাটা নীলাম্বরের স্ত্রী হরিমতির ভাল লাগিল না; সে জনান্তিকে তাহার 'দেখন হাসিকে' বলিল, "মানুষের কি আর সকলই সুখ হয়; বৌটা বুঝি বাঁজা; বয়স ত বিশেষ কম নয়! আমাদের বছর দুয়ের বড়ই হবে।" 'দেখনহাসি' হাসিয়া উত্তর করিল, "আমাদের কামিনী ঠাকুরজির বারো বছর বয়সের সময় আমাদের কালাচাঁদ হয়েছিল; আর ওর ছেলেপিলে হয়েছে!" নয়নতারা চোখ ঘুরাইয়া বলিল, "তা কুলীন বামন আছে, টাকাকড়িরও ভাবনা নেই, আর একটা বিয়ে করুক না কেন; বৌটারই যেন ছেলে হ'বার বয়েস গিয়েছে, ছোট বাবুর ত আর বিয়ে করিবার বয়স যায়নি। আমাদের ননীর মামা যে সেবার তিনকুড়ি বারো বছর বয়সে ঝিঁকরাগাছি হ'তে একটা ন'বছরের মেয়ে বিয়ে করে নিয়ে এল। শেষকালে তারই আব্দারে বুড়োকে নাকের জলে চোখের জলে হ'তে হয়েছিল।" চাটুয্যেদের সুরি সকলের চেয়ে বয়সে ছোট হইলেও তাহার কথাগুলি তীক্ষ্ণ অস্ত্রের মত ধারাল। সে

তাহার ক্ষুদ্র নোলকটি আন্দোলিত করিয়া বলিল, "দেববালা কিন্তু বড় শক্ত মেয়ে দিদি, স্বামিটিকে মুঠোর মধ্যে রেখেচে; তবু রঙ্গটি যদি আর একটু ধবধবে হ'তো। ঐ যে একটা গানে আছে 'যে যার মনে লেগেছে সৈ লো';—তা' ভাই তোমার আমার কথায় কি হবে?" রঙ্গিনী রঙ্গিল গামছাখানি উভয় স্কন্ধের উপর দিয়া বক্ষপর্য্যন্ত বিলম্বিত করিয়া দুই হস্তে কাপড় কাচিতে কাচিতে বলিল, "কিন্তু বৌটার কি ঠ্যাকার,একটু লেখাপড়া জানে কি না, মানুষকে আর মানুষ ব'লে মনে করে না। আমরাও মেয়েস্কুলে বোধোদয় পর্য্যন্ত প'ড়েছিলাম; সংসারের কাজই শেষ কর্ত্তে পারিনে, তা পড়াশুনা!—এতক্ষণ হয় তো ছেলে উঠে কাঁদ্‌চে, চল্ ভাই শীগ্‌গির যাই।"—যুবতীরদল উঠিয়া চলিয়া গেল। একটি বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী অঞ্চলে পিত্তলের ভাসমান কলসটি আচ্ছাদনপূর্ব্বক দুই অঞ্জলিতে জল লইয়া ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে সূর্য্যের স্তব করিতেছিলেন; দৈবাৎ একটি যুবতীর গামছার জল ছিটকাইয়া তাঁহার গায়ে পড়িল। একবার তিনি সকোপে যুবতীর দিকে চাহিলেন, অনন্তর স্তব শেষ হইলে তাঁহার সমবয়স্কা আর একটি বৃদ্ধাকে বলিলেন, "ছুঁড়িগুলো একেবারে ধিঙ্গিপদ পেয়েছে, মানুষকে একেবারেই গ্রাহ্যি কর্‌তে চায় না; মরণ আর কি!" তখন বৃদ্ধারদলে যুবতীগণের আচরণের, গমনভঙ্গীর এবং কথাবার্ত্তার সমালোচনা আরম্ভ হইল। তাঁহাদের দুই একগাছি কেশ পাকিয়াছে, চক্ষুর দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়াছে, দেহের মাংস শিথিল হইয়া পড়িয়াছে এবং ক্রোধ অপর সকল রিপুকে পরাহত করিয়া একাকী সকলের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। সুতরাং যৌবনের উন্মত্ততা, প্রণয়ের আবেগ, রূপের অপরূপ স্পর্দ্ধা, বিরহ ও মিলনের মেঘরৌদ্রময় হিল্লোল এখন তাঁহারা উপলব্ধি করিতে অক্ষম; অবসাদলাঞ্ছিত জীবনোপান্তে দাঁড়াইয়া, যুবতীগণের হৃদয়ভাবের বিচিত্র পরিবর্ত্তন,মান অভিমানের চপল মোহ, এবং বাসনা ও বিভ্রমের উদ্দীপনাপূর্ণ মিশ্র ঝঙ্কারকে তাঁহারা নারীজীবনের পুরুষকলুষিত অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা বলিয়াই মনে করেন।

কিন্তু সময়ের সেদিকে লক্ষ্য নাই; অনাদি অনন্ত বৃদ্ধ কাল অশ্রান্তহস্তে অতি নিপুণভাবে জগতের সমস্ত দ্রব্যের উপর নানাবর্ণের তুলিকা বুলাইয়া যাইতেছে। নদী কলকল শব্দে বহিয়া যাইতেছে, উভয়তীরে বিস্তীর্ণ প্রান্তর শস্যে ভরিয়া উঠিতেছে, শস্য পাকিতেছে, কৃষকেরা কাটিয়া লইয়া যাইতেছে, আবার বীজ বপন করা হইতেছে। গাছে গাছে হরিৎ পত্র বিকশিত হইতেছে, আবার সে গুলি ঝরিয়া পড়িতেছে—মানুষের সুখ দুঃখ নিয়মিতক্রমে বাড়িতেছে কমিতেছে। এমনি করিয়া পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল।

[২]

এই পাঁচ বৎসরের পরের ঘটনা হইতে আমাদের গল্প আরম্ভ হইতেছে। নরেন্দ্রনাথের জননী ইতিমধ্যে ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন। গৃহে পরিবারের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ এবং তাঁহার পত্নী দেববালা। যাহারা আশা করিয়াছিল নরেন্দ্রনাথ একটা বড় রকমের উকীল হইয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিবেন ও জেলায় গিয়া ওকালতির দোকান খুলিবেন, তাহাদিগের আশা বিদূরিত হইয়া গেল। যাহারা মনে করিয়াছিল সরকারে একটা [illegible] রকম চাকরী লইয়া তিনি পাঁচজন আত্মীয় স্বজনকে প্র[illegible] করিবেন, তাহাদের কামনাও পূর্ণ হইল না। [illegible] ঘটে না। অনুসারে জলিবোট রূপী স্ত্রীটিকে [illegible] অসুবিধা হয়। সাগরে জীবনপোত ভাসাইয়া দূর[illegible] পৃষ্ঠার অধিক স্থান যাওয়া নরেন্দ্রনাথের পোষাইয়া [illegible] না হইলে কোন পাশ করার পর গ্রামে আসিয়া [illegible] প্রকাশ্য রচনা স্বগ্রামে যে সকল জোত জমা [illegible] হওয়া আবশ্যক। লাঙ্গল গরু কিনিয়া কৃষকের [illegible]দীপ" প্রকাশ্য, ওকালতি বা চাকরী অপেক্ষা [illegible] রাখিয়া লেখক- মনে করিলেন। এই অভিনব [illegible] ইবেন। বাঙ্গালা দেখিয়া গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তিগণ [illegible] গেল; কেহ বলিল, "ঐ বৌটার [illegible] ক'রে বয়ে গেল। তা ন'লে ওর বিদ্যে সাদ্ধি ছিল, চেষ্টা কল্লে একটা মানুষ হতে পারতো।"—কেহ বলিল, "রাম বল, আমি গোড়াগুড়ি জানি ওটা একেবারে নিরেট, মুখস্তোর জোরে কোন রকমে ফাঁড়া কাটিয়ে উঠেছে, ভিতরে কিচ্ছু নেই।" গ্রামস্থ মাতব্বর ব্যক্তিরা তাঁহাদের বিস্ময় ও বিরক্তি অবশেষে আর আপনাদের হৃদয়ের মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে পারিলেন না। তাই নরেন্দ্রনাথের হিতাকাঙ্ক্ষী বৃদ্ধ বসু মহাশয় একদিন তাঁহার গৃহে আসিয়া বলিলেন, "বাপুহে, বাঁড়ুয্যে মশায় আমার পরমাত্মীয় ছিলেন; আমি যখন পলাশবেড়ের জমাদারী পদটি পাই,

তখন তিনি সাড়ে সাত আনির পত্তনি মহাল হাট জোড়াদিঘীর নায়েব হন; সেই হতে আমরা কেউ কারো পরামর্শ না নিয়ে কাজ কত্তাম না; আর তুমি এতটা লেখা পড়া শিখে আমাদের একটা কথাও জিজ্ঞাসা না করে শেষে কিনা ফস্ করে চাষা হ'লে! বড় অন্যায় করেছ কথায় বলে 'যেমন তেমন চাকরী দুধ ভাত'; তা চাকরী, ওকালতি, ব্যবসা এ সকল অতি উত্তম পেশা, এর কোনটা তোমার পছন্দ হল না?" পেন্‌সনপ্রাপ্ত জমাদার বৃদ্ধ বসু মহাশয়ের কথাটি শেষ না হইতেই গ্রামের সাড়ে তের আনা লোকের পুরোহিত এবং সাড়ে পনের আনা লোকের উপদেশ দাতা তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন, "হাঁহে নাতি, লেখাপড়া শিখে দিন দিন তোমাদের কি রকম পছন্দই হচ্ছে! ডাকের কথায় বলে বটে, বাণিজ্য বসতে লক্ষ্মী, তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি' কিন্তু আজকাল রাজসেবাটাতেই অর্থাগমের সুযোগ ভাল। এই দেখ আমারো দুবিঘে জমী জিরেত আছে, আর পৌরোহিত্য কর্ত্তেই ত মাথার চুল পেকে গেল, কিন্তু কখন এক সঙ্গে দুটি টাকা হাতে থাকে না। তুমি এত পড়া শুনা ক'রে শেষে এই রকম একটা বৃত্তি পছন্দ কল্লে!" গ্রামের মুরুব্বিগণের অযাচিত অশ্রান্ত উপদেশে নরেন্দ্রনাথের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল। তিনি সবিনয়ে উত্তর দিলেন, "ব্যবসা করার মত অর্থ এবং ওকালতিতে পসার করার মত বিদ্যাবুদ্ধি আমার নাই। এদিকে দেশের সকল লোকই যদি লেখাপড়া শিখে ওকালতি ধ'রে তাহলে মক্কেল হবার আর লোক থাকে না; আমার পরের দাসত্ব করাও পুষিয়ে উঠিবে না; নানা কারণে ওটা আমি বিড়ম্বনাজনক ব'লেমনে করি; অনেক বিবেচনা করেই আমি একাজে প্রবৃত্ত হয়েছি।"

সুতরাং কাহারো পরামর্শ কোন কাজে লাগিল না। আমাদের গ্রামের মুরুব্বিগণ যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কাহারো প্রতি উপদেশ দানের উদার ব্রত গ্রহণ করেন, সে সময় সেই নির্ব্বোধ যদি মোহবশতঃ পথের ধূলির ন্যায় শুষ্ক উপদেশস্তূপকে পদদলিত করিয়া আপনার অভীষ্ট পথে অগ্রসর হয়, তাহাহইলে মুরুব্বিমহাশয়গণের প্রবল আত্মাভিমান অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া আহত সর্পের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠে। হরিরামপুরের মুরুব্বিগণও অনেকটা সেই ভাব ধারণ করিলেন। এদিকে নরেন্দ্রনাথের আচার ব্যবহারও কিছু স্বতন্ত্র ধরণের। তাঁহারহৃদয়ের মধ্যে যে একটা বলিষ্ঠ মনুষ্যত্ব ছিল,তাহারই বলে তিনি চিরাচরিত প্রাচীন রীতি নীতির অন্ধ অনুসরণের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই আচরণ অনেকের নিকট উদ্ধত যথেচ্ছাচার বলিয়া অনুমিত হইত। বাস্তবিক তাঁহারা দুটি স্বামীস্ত্রীতে ক্ষুদ্র হরিরামপুরে একটা নূতন স্রোত আনয়ন করিলেন। অপরিবর্ত্তিত, অব্যাহত, চিরপুরাতন জীবন সঙ্গীতের মধ্যে এমন একটি নূতন রাগিণীর সঞ্চার করিলেন যে, তাহাতে পুরুষ ও রমণী সমাজের মধ্যে বিষম হট্টগোল পড়িয়া গেল। কিন্তু তাঁহারা দুজনেই অদ্ভুত প্রকৃতির লোক; কাহারো নিন্দা, তোষামোদ কিম্বা প্রশংসার তোয়াক্কা রাখেন না। গ্রাম্য রমণীগণ সবিস্ময়ে দেখিত, দেববালা নরেন্দ্রনাথের শুধু দাসী কিংবা পাচিকা ব্রাহ্মণী নহেন, তিনি তাঁহার স্বামীর বন্ধু, সখা, মন্ত্রী সকলই; তদ্ভিন্ন তিনি কলিকাতা হইতে অনেক খবরের কাগজ ও বই আনাইয়া পড়েন, কোথাও কোন সাধারণের হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইলে নিজে মণিঅর্ডার করিয়া সাহায্য করেন, স্বহস্তে চাষের হিসাবপত্র রাখেন, সংসারের অধিকাংশ কাজ স্বহস্তে সম্পন্ন করিলেও নিজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকেন এবং পল্লীরমণীগণ কোন কর্ম্মহীন, অলস মধ্যাহ্নে কোথাও পরনিন্দার বৈঠক বসাইলে অনুরোধ সত্ত্বেও তাহাতে যোগ না দিয়া ঘরে বসিয়া স্বামীর সহিত সাহিত্য আলোচনা করেন;—এই সকল অনার্য্যোচিত আচরণ দেখিয়া শুনিয়া কেহ তাঁহাকে বিবি, কেহ বেগম, কেহ খৃষ্টানী, কেহ বা মেম সাহেব বলিয়া উপহাস করিত কিন্তু তাঁহার অন্তরমধ্যবর্ত্তী কর্ত্তব্যনিরত, মহিমান্বিত, সমুন্নত নারীভাব ও রাণীভাবের মধুর সম্মিলনের প্রভাব তাহারা হৃদয়ের মধ্যে প্রবলরূপে অনুভব করিত, কেবল স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার বশবর্ত্তী হইয়াই তাঁহার কার্য্যের কঠোর সমালোচনা করিত। এরূপ সমালোচনা আমাদের চারিদিকে সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়।

একদিন মধ্যাহ্নে গাছষষ্ঠী পূজা; নদীতীরবর্ত্তী প্রাচীন বটবৃক্ষমূলে গ্রাম্যপুরোহিত ষষ্ঠীপূজা করিতে বসিয়াছেন, আর পল্লীরমণীগণ বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া পূজা দেখিতে চলিয়াছে। কয়েকজন যুবতী ইতিমধ্যে নরেন্দ্রনাথের বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। দেববালা তখন স্বামীর

স্নানের জন্য জলগরম করিতেছিলেন। দত্তদের মেজ বৌ বলিল, "কি কোচ্চ ভাই? কাপর চোপড় পরে নেও, বৎসরকার দিন আজ ষষ্ঠীপূজা দেখ্‌তে যাবে না?"—দেববালা বলিল, "না ভাই সংসারের কাজই সারতে পারিনি, আর বুড়োবয়সে ষষ্ঠীপূজা না-ই দেখ্‌লাম?"—বোসেদের ছোট বৌ বলিল, "সেকি কথা, ষষ্ঠীকে প্রণাম কর্ত্তে যাবে, তার কি আর সময় অসময় আছে? পূজো আর্চ্চায় তোমার এত অবিক্ষে! সংসারর কাজেই কি আগে হ'লো?" দেববালা হাসিয়া বলিলেন, "বুঝেছ সুরাজ, সংসারের কাজ সকলের আগে, সংসারের কাজ যে বেশীমনদিয়ে করে, দেবতা তার প্রতি বেশী সদয় হন।"—আমরা ত কিছুই বুঝিনে, আমরা সবাই বোকা" বলিয়া রমণীগণ অভিমানে অলঙ্কারের ঝঙ্কার তুলিয়া সেস্থান পরিত্যাগ করিল। সুরবালা বলিল," আমিত তখনি বলেছিলাম, কাজনেই ওকে ডেকে; মাগীর কি দেমাক, ষষ্ঠীপূজো দেখতে চান না, বলেন আমার সংসারের কাজ আগে! মা ষষ্ঠীর অকৃপা হলে সংসারের আগুন লাগবে না?" কিরণশশী বলিল, "ও যে খুব লেখাপড়া শিখেছে, জেয়ান যে আমাদের চেয়ে ওর খুব জেয়াদা! তা ভাই লেখাপড়া শিখলে কি ষষ্ঠী সুষচনীতে মন লাগেনা।"—কাদম্বিনী বলিল, "আমরা কি লেখাপড়া করিনে? ওদের যে মেলেচ্চোর মত ব্যবহার, বামণ হ'লে কি হয়, দেবতা ব্রাহ্মণে কি আর ওদের ভক্তি আছে? হাতে কুড়ি পড়বে! কথায় বলে 'অতি বাড় বেড়োনা—ঝড়ে ভেঙ্গে যাবে'। বাড়টে বড় বেশী হয়েছে।" বিনোদিনী বলিল, "তা ভালটাই বা কি হচ্ছে? বিশবছর বয়স হলো একটা ছেলে হলোনা। মা ষষ্ঠী কি ভক্তি শ্রদ্ধা ছাড়া দয়া করেন?" সেনেদের হরিদাসীর বয়স সবে বার বৎসর, কিন্তু বিবাহের পর হইতেই সে যুবতীদের দলে ভর্ত্তি হইয়াছে এবং অকালপক্কতা বিষয়ে অনেককে অতিক্রম করিয়াছে। সেও একটা মত প্রকাশ করিবার প্রলোভন ছাড়িতে পারিল না; কচি মুখ খানিতে প্রৌঢ়ার গাম্ভীর্য্য সঞ্চয়পূর্ব্বক বলিল, "আমি নবৌর কাছে শুনেছি, ওরা লুকিয়ে লুকিয়ে পাঁউরুটি না কি খায়; সেগুলা মোছলমানে তৈয়ারী করে, তাতে নাকি কুক্‌ড়োর ডিম দেয়! মাগো, ওদের যদি কিছু জাত বিচের থাকে।" কমলিনী বলিল, "দেখ্‌চোনা গেরোস্তর বৌ, কত ফিটফাট, বাবুর গায়ে একটু ধুলো কাদা লাগবার যো নেই। আমরাই কি বাবুগিরি কর্ত্তে পারি নে। তা আমরাত আর বুড়ো বয়সে স্বামীকে ভুলাতে বসি নি; কাজেই আমাদের কাপড়ে তেলের দাগ, হাতে খয়ের চুণের দাগ, পায়ে ধুলো কাদা লেগে থাকে।"—পরনিন্দার সুমধুর আলোচনায় নদীতীরবর্ত্তী সংকীর্ণ গ্রাম্যপথ প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে ভূষণশিঞ্জনে তরুঅন্তরালে উপবিষ্ট বিহঙ্গমকুলকে সচকিত করিয়া গ্রাম্যকুলবধূগণ ষষ্ঠীতলায় আসিয়া উপস্থিত হইল। এইরূপ এক একদিনের এক একটা ঘটনায় দেববালার প্রতি তাহাদের কঠোর আক্রোশ, তীক্ষ্ণ পরিহাস, কণ্টকের ন্যায় ফুটিয়া উঠিত, কিন্তু দেববালার আত্মসম্মান ও কর্ত্তব্যের সুদৃঢ় ধর্ম্মে প্রতিহত হইয়া তাহাদের প্রত্যেকটিই ব্যর্থ হইতে লাগিল।

[৩]

ষষ্ঠীর অনুগ্রহে কি নিগ্রহে বলা যায় না, ইহার কিছুদিন পরে চারুবালার জন্ম হইল। তখন হরিরামপুর গ্রামে সেই নিরীহ মানবশিশুর আবির্ভাব লইয়া রমণীসমাজে যে সমালোচনা আরম্ভ হইল, গল্পারম্ভেই আমরা তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি। কেহ বলিল, "বৌটার যেমন ঠ্যাকার, এবার তেমনি দর্প চূর্ণ হয়েছে," কেহ বলিল, "আর শুনেছ দিদি, ঐ মেয়েরই কত আদর, সাত দিন যেতে না যেতে গায়ে ফেলানার (ফ্লানেল) জামা উঠেছে। বেটাছেলে হ'লে নাজানি আরও কত কি করতো!" দত্তদের বড়গিন্নি রাইমণি বলিলেন, "বুড়োবয়সে মেয়ে হয়েছে, কাজেই একটু আদর যত্ন হচ্ছে; তা দুধের তৃষ্ণা কি ঘোলে মেটে?" মজুমদারদের মেজ বৌ বামাসুন্দরী নাসিকার্দ্ধ ঊর্দ্ধে তুলিয়া বলিলেন, "ওদের বাচবিচের কিছু নেই। আঁতুড়ে মেয়ে, তাকে ঘরের মধ্যে চৌকীর উপর তুলে বৌটা সকল ঘরেই ঘটঘটাচ্ছে। আমার তারাচাঁদ যখন আঁতুড়ে, তখন একমাস অশুচ যাবার আগে আমার শাশুড়ী আমাকে ঘরের ছায়া মাড়াতে দেয় নি, পৌষ মাসের শীতে কাঁচা স্যাঁত সেঁতে কুঁড়েখানিতে সারাটামাস কাটাতে হয়েছে; এমন নইলে কি বামনের জাত থাকে?"

দেববালা গৃহে বসিয়াই রমণীগণের সকল যুক্তি শুনিতে পাইতেন, কিন্তু তাঁহার নবজাত কন্যার কোন অপরাধই খুঁজিয়া পাইতেন না। অধিকাংশ সময়ই তিনি কাহারো

কোন কথায় কর্ণপাত করিতেন না বটে, কিন্তু কখন কখন হৃদয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ কষ্ট বোধ করিতেন; তাঁহার মনে হইত, মানুষ এমন করিয়া অনর্থক পরনিন্দা করে কেন? পরের হৃদয়ে অকারণ বাক্যবাণ বিদ্ধ করিয়া মানুষের একি নৃশংস খেলা!—কখন কখন তিনি তাঁহার শিশুকন্যাটিকে বক্ষের উপর চাপিয়া ধরিয়া স্বামীর পাশে আসিয়াবসিতেন। নরেন্দ্রনাথ সকল কথা শুনিয়া দেববালার হৃদয়ে সান্ত্বনা দান করিতেন। তিনি বলিতেন, "দেখ, রমণীর জীবন পুরুষের জীবনের অপেক্ষাও গৌরবপূর্ণ; মনুষ্যত্বের বিকাশের অর্থ রমণী-জীবনের সার্থকতা, কিন্তু আমাদের দেশের পুরুষেরা ক্রমাগত রমণীর উপর আশৈশব অনাদর উপেক্ষা, অবিচার দেখাইয়া আসিতেছে, তাই আমরা এতখানি অধঃপাতে গিয়াছি; কিন্তু আমরা আমাদের সে ত্রুটী বুঝিতে পারি না। মেয়ে হওয়াত আমার কাছে কখন অসুখের বিষয় বলিয়া মনে হয় না। সুপাত্রে কন্যা সম্প্রদান সর্ব্বত্র সহজ না হইতে পারে, কিন্তু সেই আশঙ্কায় আশৈশব তাহাকে তাচ্ছিল্য করিতে হইবে?—আমি এযুক্তির পক্ষপাতী নহি। এসো আমরা আমাদের হৃদয়ের সকল স্নেহ যত্ন দিয়া আমাদের এই স্নেহের ধনটিকে মানুষ করিয়া তুলি।"—স্বামীর এই সহৃদয়তাপূর্ণ স্নেহার্দ্র কথাগুলিতে দেববালার হৃদয়ের সকল বেদনা বিদূরিত হইয়া যাইত।

দেববালা স্বামীর নিকট হৃদয়দ্বার যে পরিমাণে উন্মুক্ত করিয়া দিতেন, কোন পল্লীরমণীর নিকটই তিনি আপনার হৃদয় সেরূপ ভাবে ব্যক্ত করিতেন না। স্বামীর সহিত কোন বিষয়ে মতভেদ হইলে, দেবরের সহিত বচসা হইলে, কিম্বা শাশুড়ী কোন প্রকার কটূক্তি প্রয়োগ করিলে, যাহারা পথে ঘাটে ঘরের রহস্য শতমুখে ব্যক্ত করিয়াও পরিতৃপ্ত হইত না, তাহারা অবাক্ হইয়া দেখিত—দেববালার মুখে কোন দিন ঘরের একটি কথাও প্রকাশ হয় না। অগত্যা তাহারা এই অপরূপ দুর্লভ ব্যবহারটি দেববালার উদ্ধত দাম্ভিকতার পরিচায়ক বলিয়াই মনে করিত।

চারুর একটি ছোট বিড়ালছানা ছিল, ছানাটি অন্ধ, মাতৃহীন। কে একদিন সকালবেলা এই অন্ধ শাবকটিকে চারুদের বাড়ীর কাছে ফেলিয়া গিয়াছিল। খুব মহৎ উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া সে যে এই কাজ করিয়াছিল, তাহা বোধ হয় না; কিন্তু অসহায়ের চিরসহায় বিশ্বপিতা একটি স্নেহময়ী বালিকাকে তাহার চক্ষুহীন একক জীবনের আশ্রয় করিয়া দিলেন! অন্ধ বলিয়াই হউক বা শৈশব সরলতার বশবর্ত্তী হইয়াই হউক, চারু সেটাকে সর্ব্বদা কাছে কাছে রাখিত, রাত্রে তাহাকে কোলে লইয়া ঘুমাইত, সকালে তাহাকে খাওয়াইবার জন্য দুধ খাওয়ার বাটিতে খানিক দুধ রাখিয়া দিত; এবং প্রভাতে সূর্য্যের মধুর আলোক বকুল গাছের পাশ দিয়া তাহাদের জানালার ভিতর দিয়া প্রবেশ করিবার আগেই সে বিছানা হইতে উঠিয়া তাহার শিশু সঙ্গিনীটিকে দুধের বাটির কাছে লইয়া যাইত। সেই অন্ধ পশুশাবকও চারুর আশ্চর্য্যরকম বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। চারু কোথায় আছে, তাহা সে তীব্র ঘ্রাণশক্তি দ্বারা অনুমান করিয়া লইত। যেদিন সকালবেলা চারু তাহার পিতার পড়িবার ঘরখানিতে গিয়া বড় বড় ছবির বইগুলি খুলিয়া বসিত, কেবল সেই দিন কিছুক্ষণের জন্য তাহার সহচরীর সহিত বিচ্ছেদ ঘটিত। সে স্নানাহার বন্ধ করিয়া তাহার বাপের চেয়ারখানার উপর ক্ষুদ্র পা দুখানি তুলিয়া উঁচু হইয়া বসিয়া নতমস্তকে দুই হাতে টেবিলের উপর রক্ষিত প্রকাণ্ড বহির পাতা উল্টাইয়া যাইত। তাহার ছোট ছোট কোঁকড়ান কুন্তলগুচ্ছ বিশৃঙ্খলভাবে চারিদিকে লতাইয়া পড়িয়াছে, অঞ্চলখানি চেয়ারের নীচে লুটাইতেছে এবং মা 'চারু, ভাত খাবি আয়' বলিয়া রান্নাঘর হইতে ক্রমাগত ডাকাডাকি করিতেছেন, কিন্তু সেদিকে তাহার কিছুমাত্র লক্ষ্য নাই; সে তাহার নির্নিমেষ, নির্ম্মল প্রশান্ত দৃষ্টিতে অবাক্ হইয়া দেখিতেছে—কোথাও কোন যুদ্ধক্ষেত্রে একটি সুসজ্জিত অশ্বারোহী স্বীয় বিক্রমে অন্য একজন অশ্বারোহীকে আক্রমণ করিয়াছে, অস্ত্রে অস্ত্রে ঝঞ্জনা পড়িয়া গিয়াছে, বীরদ্বয়ের সর্ব্বশরীর হইতে দুর্জ্জয় সামর্থ্যের একটি অব্যাহত চঞ্চলগতি অনুভূত হইতেছে; কোথাও কোন লতাকুঞ্জে কাষ্ঠাসনে প্রণয়ীযুগল বিশ্রব্ধালাপে ছায়াচ্ছন্ন স্তব্ধ সন্ধ্যা অতিবাহিত করিতেছে, চারিধারে কুসুমরাশি ফুটিয়া রহিয়াছে, পদতলে ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী হইতে জলধারা উৎসারিত হইতেছে, সান্ধ্য আকাশে হীনজ্যোতি দুই একটি তারকা ম্লানদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে এবং পূর্ব্বগগনের অনেক ঊর্দ্ধে ক্ষীণ শশিকলা তখনো সেই নিকুঞ্জকাননের লতাবিতানে আপনার শুভ্রপ্রভা বিকীর্ণ করে নাই; কোন ছবিতে সে দেখিতে পাইত

সমুদ্রের মধ্যে জাহাজগুলি শ্বেতবর্ণের পা'ল উড়াইয়া দিগন্তর হইতে দূরান্তরে ভাসিয়া যাইতেছে, তাহাদের বহু ঊর্দ্ধ দিয়া একদল পাখী উড়িয়া চলিয়াছে,তীরে আঙ্গুরের ক্ষেতে গুচ্ছ গুচ্ছ আঙ্গুর ফলিয়া আছে, বিস্তীর্ণ প্রান্তর বিবিধ শস্যের প্রীতি উপহার লইয়া একেবারে সমুদ্রের কোলের কাছে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এবং দূরে একটা সমুন্নত শ্বেত গির্জ্জা নীলাম্বরের নীচে বিশ্বদেবতার আরাধনার জন্য স্তব্ধভাবে সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছে।

পুস্তকের কোন কথা সে পড়িতে পারিত না, কিন্তু এই সকল ছবির মর্ম্ম সে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিত। বর্ণমালার রহস্যময় সংকীর্ণ পরিধির অভ্যন্তরে সে প্রবেশ করিতে না পারুক,কিম্বা এই অপরিচিত ভাষার অন্তরালে মানবের সুখদুঃখময় জীবনের যে বিচিত্র হিল্লোল প্রতিনিয়ত প্রবাহিত হইতেছে, তাহার প্রত্যেকটি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার তাহার ক্ষমতা না থাক্,তথাপি সে অনুভব করিত—এই ক্ষুদ্র গৃহ,এই বাতায়ন, এই বাগান ও পুষ্করিণীর বহির্ভাগে এমন একটি বৃহৎ সংসার আছে, এই ছবিগুলি যাহার আংশিক দর্পণমাত্র। এইরূপে ছবির ভিতর দিয়া কল্পনা-নেত্রে সে মানবজীবনের রহস্যময় ইতিহাস পাঠ করিত। অবশেষে তাহার অন্ধ বিড়ালশাবক যখন অতি ব্যগ্রভাবে তাহার নিকটে আসিয়া চেয়ারখানার চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে লেজ নাড়িত ও ব্যাকুলকণ্ঠে ডাকিয়া ডাকিয়া তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিত,তখন সে পুস্তক বন্ধ করিয়া সস্নেহে তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহাকে সোহাগ করিতে করিতে মায়ের কাছে যাইত; যেন সে বহির্জ্জগতের বিপুল কর্ম্মক্ষেত্রের কঠোর পরিশ্রমের অবসানে কর্ম্মশ্রান্ত অবসন্ন ক্ষীণতনুখানি এবং হৃদয়ভরা ক্ষুদ্র আশাটুকু লইয়া আপনার স্নিগ্ধ গৃহে প্রবেশ করিতেছে।

এক একদিন অপরাহ্নে সে মোজা ও জুতায় সজ্জিত হইয়া ফ্রকের উপর কাপড়খানি ভাল করিয়া আঁটিয়া বেণী দুলাইতে দুলাইতে বাপের সঙ্গে মাঠে যাইত। পাড়ার ছেলে মেয়েরা ধূলিধুসরিত অঙ্গে পথে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া থাকিত,কেহবা সাহসে ভর করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত,"চারি,কোথা যাচ্ছিস্ লো!—চারু পিতার হাতখানি বামহস্তে ধরিয়া দক্ষিণ হস্তের ক্ষুদ্র তর্জ্জনী দূরবর্ত্তী মাঠের দিকে প্রসারিত করিয়া বেণীসমেত ক্ষুদ্র মাথাটি নাড়িয়া বলিত, "ঐ—মাঠে, বাবার সঙ্গে মাঠ দেখ্‌তে যাচ্ছি।" একদিন মুখুয্যেদের মাতু দৌড়িয়া মায়ের কাছে গিয়া বলিল, "মা, মা, চারু তার বাপের সঙ্গে মাঠে বেড়াতে যাচ্ছে—আমি যাব।" মাতুর মা তখন কলসীকক্ষে ঘাটে বাহির হইয়াছেন, কন্যার কথা শুনিয়া তিনি 'তৈলবার্ত্তাকু' সংযোগের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন; কণ্ঠস্বর সপ্তমে তুলিয়া মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "মাঠে আর বেড়াতে যেতে হবে না; ছিষ্টি ছাড়া যত আবদার; ও গেছো মেয়ের সঙ্গে কার কথা? মিন্‌সের আবার মেয়ে নিয়ে মাঠে বেড়াতে যাওয়া হয়; মর্দ্দের মত জামা জুতা পরান হয়েছে, মেয়ে ছেলের অত সোহাগ কেন?" নরেন্দ্রনাথ তখন অধিক পথ অতিক্রম করেন নাই সকল কথাই তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল।

সহৃদয়া পাঠিকা, তোমরা পাঁচ জন মাতুর মার এই প্রকার উচ্চ সমালোচনা শুনিয়া তাঁহাকে লজ্জাহীনা, অশিষ্টা রমণী ভাবিয়া তাঁহার নিন্দা করিও না। গ্রামের সকলেই তাঁহার প্রশংসা করে। হরিরামপুরে তাঁহার ন্যায় লজ্জাশীলাই বা কয়জন আছে? তিনি উচ্চৈঃস্বরে শাশুড়ী ননদের সঙ্গে ঝগড়া করিলেও অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে কেহ তাঁহার মুখখানি দেখিতে পায় না, এতই তাঁহার লজ্জা! গৃহকর্ম্মে তাঁহার এতদূর যত্ন যে, সে জন্য তাঁহার ছেলেমেয়েগুলোর গায়ে মাসের মধ্যে একটী দিন 'তেলজল' দিবার অবসর হয় না; মাসের মধ্যে ত্রিশদিন তাহারা ময়লা নোংরা কাপড় পরিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু সাধু অনুষ্ঠানে মাতুর মার কি প্রবল অনুরাগ! কলিকাতায় অনাথ আশ্রমে যেদিন দেববালা দশটাকা সাহায্য পাঠাইয়াছিলেন, তাহার কয়েক দিন পরে সরকার বাড়ীর মাধ্যাহ্নিক বৈঠকে মাতুর মা-ই সর্ব্বপ্রথম তাহাকে 'নির্লজ্জ বেহায়া মেয়ে' বলিয়া ব্যাখ্যাত করেন; অথচ বোসেদের ছোট মেয়ের বিবাহের রাত্রে বাসরঘরে'ঝুমুর' গাহিয়া বর এবং সমাগত রমণীবৃন্দের মনোরঞ্জন করা তিনি অকর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন নাই। তাঁহার এত গুণ ছিল বলিয়া সকলে তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিত; মাতুর মা হরিরামপুরের রমণীসমাজের একটি জীবন্ত আদর্শ। তোমার আমার কি ক্ষমতা যে তাঁহার নিন্দা করি?

চারু প্রায়ই বৈকালে মাঠে বেড়াইতে আসিত; কিন্তু

বসন্তকালে মাঠে বেড়াইতে আসিয়া তাহার মন যেমন আনন্দে নাচিয়া উঠিত এমন আর কখন হইত না। তখন প্রকৃতির কি মধুর শোভা! সুপক্ক গোধূমশীর্ষগুলি বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের উপর ধরিত্রীর কারুকার্য্যশোভিতবসনাঞ্চলের ন্যায় প্রসারিত; দূরে অড়হর ক্ষেত্রে গোরু ছাড়িয়া দিয়া রাখালেরা ছোলার জমীতে পরিপুষ্ট ছোলা তুলিতেছে; মাঠের মধ্যে একটা ঝাঁকড়া কুলগাছ; সুপক্ক কুলগুলি প্রবালের মত গাছ শোভিত করিয়া রাখিয়াছে; ছেলেরা 'এড়ো' মারিয়া কুল পাড়িতেছে, আর পাঁচ সাত জনে দৌড়িয়া হুড়াহুড়ি করিয়া তাহা কুড়াইতেছে। দিঘীর পাড়ে একটা প্রকাণ্ড শিমুল গাছ, লালফুলে আচ্ছন্ন; একটিও পাতা নাই। একটা কোকিল লোহিত পুষ্পস্তবকের মধ্যে নিজের কালো শরীর সংগুপ্ত করিয়া 'কুহু' স্বরে ধরাতলে প্রথম বসন্তের আগমন কাহিনী ঘোষণা করিতেছে। তাহার স্বর উচ্চতর হইয়া শান্তিপূর্ণ, ছায়াচ্ছন্ন, স্তব্ধ প্রান্তরের প্রশস্ত বক্ষ পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে, আর দিঘীর অন্য পাড়ে অপরাহ্নের লোহিত রৌদ্রে সুরঞ্জিত বাঁশবনের অগ্রভাগে নিবিড় পত্রের মধ্যে বসিয়া একটা ঘুঘু ঘাড় ফুলাইয়া মাথা নাড়িয়া সাদরে তাহার প্রিয়তমাকে আহ্বান করিতেছে—'ঘুঘু—ঘু''ঘুঘু—ঘু, ও তাহার কাছে সরিয়া সরিয়া যাইতেছে।

অবশেষে শুক্লপক্ষের আধখানা চাঁদ মধ্যাকাশে ক্রমে স্ফুটতর হইলে চারু চ্যুতমুকুলগন্ধবিকীরিত বনপথ দিয়া পিতার সঙ্গে বাড়ী ফিরিয়া আসিত। রাত্রের সঙ্গিনী তাহার সেই বিড়াল শাবক এবং বৃদ্ধা পরিচারিকা ক্ষান্তর মা। মা হয়ত ভাত রাঁধিতেছেন, কি অন্য কোন গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত আছেন; সে সময় চারু তাহার অন্ধ সঙ্গিনীটিকে ক্রোড়ে লইয়া চৌকীর উপর শয়ন করিয়া ক্ষান্তর মার কাছে 'সুয়োরাণী দুয়োরাণী'র,'সোনার কাটী রূপোর কাটীর' ও 'সাতভাই চম্পা'র গল্প শুনিত; প্রতিদিনের অভ্যস্ত, নিয়মবদ্ধ, পুরাতন সংসারের বাহিরে একটা অতি লঘু,বিশ্বনিয়মের অনায়ত্ত, বিপুল শিশুকাব্যজগতের অসীম সুখ এবং অনন্ত দুঃখের সুমধুর কাহিনী তাহার হৃদয়ের মধ্যে প্রপাতের জলস্রোতের মত অবিরল কলকল শব্দে ঝরিয়া পড়িত এবং তাহার আবর্ত্তময় ফেণিল তরঙ্গ রাশিতে তাহার হৃদয়ের ক্ষুদ্র উপকূল বিক্ষোভিত হইয়া উঠিলেও, সেই সকল রূপ কথার উপসংহারের আনন্দ ও শান্তি কুহকিনী নিদ্রার মায়াবরণের মত অতি ধীরে তাহার দেহ ও মন সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত। সংসারে চারুর সহচরীর সংখ্যা অধিক নহে; কিন্তু এমনি করিয়া তাহার দিন কাটিতে লাগিল এবং বাহিরে তাহার কোমল শিশুভাব অব্যাহত থাকিলেও তাহার অন্তরবাসিনী মহিয়সী নারীভাব এই সকল প্রচ্ছন্ন প্রভাবে তাহার হৃদয়ের মধ্যে ক্রমে বিকশিত হইয়া উঠিল।

[৪]

সময় কাহারো হাতধরা নহে। নরেন্দ্রনাথ বাল্য-বিবাহের পক্ষপাতী না হইলেও বারোবৎসরের পর আর কন্যার বিবাহসম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারিলেন না। গ্রামস্থ হিতৈষী সুহৃদ্‌বর্গই তাঁহাকে অধিক পরিমাণে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। অষ্টমবর্ষে গৌরী এবং নবমে রোহিণী দানের ফললাভ করিয়া গ্রামের যে সকল অধিবাসী আপনাদিগের জীবন ধন্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছিলেন, তাহারা দ্বাদশবর্ষবয়স্কা কন্যার বিবাহে নরেন্দ্রনাথের অমনোযোগ দেখিয়া একটা আন্দোলনের বিষয় পাইলেন। গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী নদীতে আবার কিছুদিনের জন্য রমণীকণ্ঠেরকলকূজন আরম্ভ হইল; কেহ বলিল, "মাগো, অতবড় মেয়ে ঘরে রেখে মেয়ের মায়ের মুখে অন্ন উঠ্‌চে কেমন করে?" 'অমনি তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর হইল,"তা ওদের কি ধর্ম্মভয় আছে? ওরা মেয়ের বিয়ে দেবে না। ঘোর কলি কি না!" তারার মা বলিলেন, 'আমার তারা যাঠের কোলে একটু হাঁকালো হ'য়ে উঠেছিল; সাতবছর বয়সের সময় তাকে ডাগরডোগরটি দেখে মুখে আর ভাত যেতোনা। বাড়ীর মিন্‌সেকে দিনে তিনবার করে বর খুঁজতেবলতাম। আট বছরে পড়তে না পড়তে তারার বে দিলাম। বাড়ীর পুরুষের উপর মেয়েদের শাসন না থাকলে ত এতবড় ধেড়ে মেয়ে ঘরে থাকবেই।" একদিন সকালবেলা চারু বাড়ীর বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে; নরেন্দ্রনাথ চাকরদের লইয়া একখানা বাঁশ ফাড়াইতেছিলেন; এমন সময় সার্ব্বভৌম মহাশয় গাড়ু-গামছা হাতে সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "বাবাজী, আমাদের নাতনীটির ত বিয়ের বয়স উৎরে গেল; মেয়েকে স্বয়ংবরা করবার মৎলব আছে না কি?" এই রসিকতায় নরেন্দ্রনাথ কিঞ্চিৎ বিরক্ত, কিছু লজ্জিত হইলেন, কিন্তু সবিনয়ে উত্তর দিলেন, "একথা আপনার

মত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের মুখে শোভা পায় না। প্রাচীনকালের কথা মনে করুন দেখি, শকুন্তলা, ইন্দুমতী, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, দ্রৌপদী কেহই বাল্যকালে বিবাহিতা হন নি। আমার এই বালিকা কন্যার বিবাহে এক আধ বৎসর বিলম্ব হ'লে সেটা এমন কি দোষের কাজ হয়, তা বুঝ্‌তে পারিনে; মানুষের শাস্ত্র নিত্য বদলান 'সহজ বটে কিন্তু সেই পরম পুরুষের চিরসত্যপূর্ণ শাস্ত্রত কোনদিন মর্ত্ত্যশাস্ত্রকারের মতলব অনুসারে বদ্‌লাতে পারে না। তিনি স্ত্রী পুরুষেরও বিবাহের একটা উপযুক্ত সময় নির্দ্দেশ ক'রে দিয়াছেন।" নরেন্দ্রনাথের এই উত্তর শুনিয়া সার্ব্বভৌম যে যুক্তির অবতারণা করিলেন, একালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের তাহা একটা প্রবল এবং অকাট্যযুক্তি। তিনি নাসারন্ধ্রে একমুঠো নস্য প্রবেশ করাইয়া আবেগের সহিত বলিলেন, "তোমরা একালের কালেজের ছোকরা, তোমাদের কোন কথা বলা ঝকমারি। তোমরা নিজের দোষ শাস্ত্রের ঘাড়ে ফেলতে কিছুতে পশ্চাৎপদ নও। বাপুহে, সত্যযুগে যেটা করণীয় ছিল, কলিতেও কি তা কর্ত্তব্য ব'লে ধরতে হবে? তখন মানুষ ছিল একুশ হাত, ব্রাহ্মণের মুখে ছিল অগ্নি; এ যুগে যে তোমরা সাড়ে তিনহাতের বেশী উঁচু নও; নিন্দুকেরা বলে ব্রাহ্মণের মুখের অগ্নি একালে উদরে আশ্রয় নিয়েছে; তা অগস্ত্যের মত গণ্ডূষে সমুদ্র শোষণ দূরের কথা, আজ কাল পুরো ফলারের উপর কজন ব্রাহ্মণ দু'সের রসগোল্লা হজম্ করতে পারে? তোমরা বাপু যা ইচ্ছে করতে পার; তোমরা সকলেই হয়েছ স্ব স্ব প্রধান, সমাজ-টমাজ কিছু গ্রাহ্য করতে চাও না; কিন্তু সমাজ কি ছাড়তে পারবে? তা যদি পার ত কোন ল্যাঠা নেই। একালের কালেজের ছোকরাদের দোষই ঐ, নিজের বুদ্ধিটাই খুব প্রবল ব'লে মনে করে। তোমাদের পিতা পিতামহ কিছু অজ্ঞান ছিলেন না। তারা বিশ পঁচিশ বছর বয়সের বুড়ো মেয়ের কখন বিয়ে দিয়ে গিয়েছেন?"—নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সমাজ ত্যাগে অবশ্য আমার কিছু আগ্রহ নাই, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আপনাদের ব্যবস্থার কোন অর্থ বুঝিতে পারিনে। কুলীন কন্যাদের অনেকে ত বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকে। কেহ বা অন্তর্জ্জলী বরের গলে বরমাল্য পরাইয়া চিরকৌমার্য্য হ'তে অব্যাহতি লাভ করে, কেহ কেহ ত্রিশ চল্লিশটি রমণীর স্বামী ঠাকুরদাদার বয়সী বৃদ্ধকে পতিত্বে বরণ কর্ত্তে বাধ্য হয়; এসকল কি রকম শাস্ত্রোক্ত বিধান তা যে আমি কোনকালে বুঝতে পারবো সে আশা নেই।" পাণ্ডিত্য কিম্বা যুক্তি কিছুতেই নরেন্দ্রনাথকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া ক্রুদ্ধ সার্ব্বভৌম তাঁহার গৃহ ত্যাগ করিলেন; ক্রোধে তাঁহার মুখ হইতে এত অধিক ইতর কথা নির্গত হইতে লাগিল যে তাহা সংস্কৃত শাস্ত্রবচন বলিয়া কোন মূর্খেরই ভ্রম হইল না।

কিন্তু মুখে যতই তর্ক করুন, নরেন্দ্রনাথ উপযুক্ত পাত্রের অভাবে সত্যই কিছু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর নবগ্রামের আশুতোষ বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র ভূপেন্দ্রকুমারের সহিত চারুর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইল। পল্লীরমণীগণের এই একটা প্রধান বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা তোমার যতই নিন্দা করুক, তোমার সুখ সৌভাগ্য দেখিয়া যতই বিদ্বেষ প্রকাশ করুক, সুখ দুঃখ বা উৎসব বিপদের সময় একবার উচ্ছ্বাসভরে তাহাদিগকে আহ্বান করিলে আর তাহারা উদাসীন থাকিতে পারে না। দুর্দ্দিনে চিরসহিষ্ণুতাময়ী জননীর ন্যায়, বিপদের মধ্যে পরমস্নেহময়ী ভগিনীর মত তাহারা মন প্রাণ সমর্পণপূর্ব্বক সেবা করে, সুখসম্পদের দিনে হর্ষোৎসবের মধ্যে আনন্দ কোলাহলে তাহারা প্রমোদমত্ত গৃহ ঝঙ্কারিত করিয়া তুলে। তাই বিবাহের তিন দিন পূর্ব্বে দেববালা যখন তাঁহার স্বাভাবিক বিনয়ের বশবর্ত্তিনী হইয়া পাড়ার রমণীগণকে কন্যার বিবাহ উপলক্ষে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইবার জন্য অনুরোধপূর্ব্বক বলিলেন, "দিদি, আর ত আমার কেউ দেখবার শুনবার কি কাজকর্ম্ম করে দিবার লোক নেই, তোমরা পাঁচজন যদি আমার চারুর বিয়েতে গিয়ে আমোদ আহ্লাদ না কর ত আর কে করবে?"—তখন তাহাদের সকলের হৃদয় নারীসুলভ কোমলতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, সকলেই চারুর বিবাহে যোগদানের আগ্রহ জানাইল।

পরদিন হরিরামপুরে চারুবালাদের বাড়ী নারীকণ্ঠে ভরিয়া উঠিল। একদল 'এয়ো' হুলুধ্বনি সহকারে ঢেঁকিতে হরিদ্রাচূর্ণ করিতে আরম্ভ করিল, চিড়া কুটিবার, মুড়ি ভাজিবার ধূম পড়িয়া গেল। গায়ে হলুদের দিন গ্রাম্যরমণীগণ দলে দলে বাড়ুয্যে বাড়ী প্রবেশ করিতেছে। প্রাঙ্গণে

কয়েকখানি মাদুর বিছানো, তাহার উপর বসিয়া এক গামলা হরিদ্রা লইয়া রমণীগণ পরস্পরের গাত্রে ও মুখে লিপ্ত করিতেছে এবং হরিদ্রা লেপন শেষ হইলেই কেহ কাহারো নিবিড়-কৃষ্ণ-কেশপাশ তৈলনিষিক্ত করিয়া দিতেছে, কেহ কাহারো-সুন্দর মুখকমল গামছা দিয়া অতি যত্নের সহিত মুছাইতেছে, বালাতে চুড়ীতে টুংটাং করিয়া শব্দ হইতেছে, কাণের দায়নগুকাটা আট্‌টা মাকড়ীতে প্রভাত রৌদ্র ঠিকরাইয়া পড়িতেছে, অবগুণ্ঠন-মুক্তা ঊষার সীমন্তমূলে লোহিত অরুণরাগের ন্যায় নব-বিবাহিতা অস্ফুট যৌবনা কিশোরীদিগের সিঁথিতে সিন্দূর-বিন্দু ডগডগ করিতেছে, ঊষার ন্যায় তাহারাও অনবগুণ্ঠিতা—অকুণ্ঠিতা। কেহ ঘুরিতেছে, কেহ ফিরিতেছে, কেহ উঠিতেছে, কেহ বসিতেছে, তাহাদের হরিদ্রালিপ্ত, পীতাভ, পুলকচঞ্চল দেহের মধ্যে যেন একটা কোলাহল পড়িয়া গিয়াছে। সহসা বোসেদের মালতী একঘটি 'চুনহলুদ গোলা' আনিয়া তাহার সখী বিন্দুর মাথায় ঢালিয়া দিল। বিন্দু বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল "হ্যাঁলো সই, তোর এ কিরকম আক্কেল বল্ দেখি! আমি ভাব্‌চি আজ নাবোনা, আমার একরাস চুল ভিজিয়ে দিলি, দাঁড়া তুই!"—অনন্তর কোপান্বিতা বিন্দু কুন্দদন্তে স্ফুরিত বিম্বাধর দংশনপূর্ব্বক [illegible] গিয়া তাহার সখীর অঞ্চল চাপিয়া ধরিল। অমনি মালতীর হাত হইতে ঘটিটা পড়িয়াগেল, তাহার চুলের ঝাড়টা খসিয়া পড়িল, অঞ্চলের প্রান্ত মাটিতে লুটাইতে লাগিল, এবং চারগাছি মলের ঝন্‌ঝন্ শব্দ ধরণীর মূকবক্ষে সুখস্বপ্নময় গীত-ঝঙ্কারের ন্যায় বাজিয়া উঠিল। অত্যাচারের প্রতিশোধ স্বরূপ বিন্দু মালতীর উভয় হস্ত চাপিয়া ধরিয়া দৃঢ় আলিঙ্গন-পাশে তাহাকে নিপীড়ন পূর্ব্বক তাহার ওষ্ঠে শিরীষকোমল গাঢ়চুম্বনরেখা অঙ্কিত করিয়া দিল। মালতী এই প্রেমচুম্বনস্পর্শে তাহার পুলককম্পিত তনুখানি সখীর বাহুপাশ হইতে মুক্ত করিয়া খল খল করিয়া হাসিয়া বলিল, "ঘাট্ হয়েছে, ছেড়েদে ভাই। তুই বড় দুষ্টু। ছি, কে হয়ত আবার কোথা হ'তে দেখ্‌তে পাবে।" বিন্দু সখীকে ছাড়িয়া সহাস্যে উত্তর দিল, "দুষ্টু আমি না তুই, আমার এত সাধের বাঁধা খোঁপা তুই ভিজিয়ে দিলি!" তখন চুল খুলিয়া সখীতে সখীতে গল্প করিতে করিতে নদীতে স্নান করিতে চলিল; ক্রমে এক দুই করিয়া বালিকা, যুবতী, প্রৌঢ়া হরিদ্রালিপ্ত দেহে রঞ্জিত বস্ত্রে তাহাদের অনুগমন করিল।

অধিবাসের রাত্রে আবার সকলে মিলিয়া নগেন্দ্রনাথের বাড়ীতে বিপুল হুলুধ্বনি ও আনন্দ কোলাহল আরম্ভ করিয়াছিল। চারুবালা ঘুমাইতেছিল, কুলবধূরা তাহাকে শয্যা হইতে টানিয়া তুলিল, পরিহাসরসিকা গাঙ্গুলিদের নূতন বৌ বলিল, "কিলো, ঘুম যে আর ছাড়ে না; সারা-বছরের ঘুম বুঝি একদিনে ঘুমিয়ে নিচ্ছিস্; চোখে এখন জল দিয়ে ঐ পিঁড়িখানার উপর বোস্; কথায় বলে 'যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়াপড়সীর ঘুম নেই'।" অনন্তর তাহাকে আলিপনা-বিচিত্র পিঁড়ির উপর বসাইয়া তাহার ব্রীড়া-বিমণ্ডিত নতমুখখানি ধরিয়া নয়জন 'এয়ো' হুলুধ্বনি সহকারে তাহার মুখে 'চিঁড়াদই গুঁজিয়া দিল এবং এইরূপে দধিমঙ্গলের কাজ শেষ করিয়া 'এয়ো'গণ একত্র বসিয়া সেই নিশীথরাত্রে চিঁড়াদই, মিঠাই মণ্ডার সদ্ব্যবহার করিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া ঘরের মধ্যে একটা হাঁড়ির উপর গোময়ের আসনে মাটির প্রদীপ জ্বলিতেছে; সেই প্রদীপের ক্ষীণালোকে বিবাহানুষ্ঠানের জন্য সংগৃহীত দ্রব্যরাজী বঙ্গগৃহে বিবাহোৎসবের স্নিগ্ধমধুর মঙ্গলবার্ত্তা প্রকাশ করিতেছে। মধ্যস্থলে সিন্দূর-চর্চ্চিত সহকারশাখা-শোভিত জলপূর্ণ মঙ্গলঘট। একপাশে দুই খানি পিঁড়ি, লাল, পীত, সাদা আলিপনায় সুচিত্রিত। বিবাহ-সভায় এই দুইখানির উপর বরকনে উপবেশন করিবে বলিয়া ওপাড়ার সেনেদের ছোট বৌ সুলোচনা অতি সাবধানে তাহার উপর চিত্রগুলি অঙ্কিত করিয়াছে। একখানি ছোট ডালার উপর বরণের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সাজান, তাহাতে যেজোড় একছড়া পাকাকলা হইতে, ধান, দূর্ব্বা, আয়না, চিরুণী, আধ পয়সা দামের রাঙ্গা ছোট একটা কৌটা, লৌহবলয়, কাজললতা প্রভৃতি পৃথিবীর অধিকাংশ দ্রব্যই বর্ত্তমান। মালীরা মুকুট দিয়া গিয়াছে; একখানি নূতন গোময়লিপ্ত বিশুদ্ধ কুলার উপর লাল রেশমী বস্ত্রে আবৃত হইয়া তাহা একটা পোর্টম্যাণ্টোর উপর শোভা পাইতেছে এবং এক কোণে কতকগুলি ছোট বড় বিচিত্র ছোবা, এয়োসরা, ঝাঁঝরি শৃঙ্খলাক্রমে সজ্জিত রহিয়াছে। বিভিন্ন গ্রামের নিমন্ত্রিতা আত্মীয়াগণ এক একটা কক্ষে মেজের উপর ঢালাবিছানায় শয়ন করিয়া আপনাদের সুখ দুঃখের কাহিনী বলিতে বলিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

[৫]

বিবাহের দিন সকালবেলা হইতে উৎসবগৃহে জনসমাগম আরম্ভ হইল। নরেন্দ্রনাথ একামানুষ, অন্দরে দেববালা একা স্ত্রীলোক, কিন্তু আজ অনেকে এই কার্য্য সম্পাদনে তাঁহাদের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহারা মিষ্টবাক্যে সাদরে সকলের অভ্যর্থনা করিতেছেন; যাঁহারা যে বিষয়ের উপযুক্ত, তাঁহাদের প্রতি সেই সকল কার্য্যের ভার অর্পণ করিতেছেন। দাওয়ায় বসিয়া প্রৌঢ়া বিধবা পল্লীরমণীগণ বড় বড় বঁটি লইয়া তরকারী কুটিতেছে, আর চারুর শ্বশুরবাড়ী সম্বন্ধে নানাকথার আলোচনা করিতেছে। সর্ব্বসাধারণের সরকারী মাসী মুক্তাঠাকুরাণী একবার এখানে পদক্ষেপ করিলেন, এবং তরকারীর ঝুড়ির প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক সবিস্ময়ে বলিলেন, "ওমা, ভাজবার বেগুন এক ঝোড়াতে কি হবে! তারা খুব বড়লোক; দুশো বরযাত্রী সঙ্গে আসবে; এযে 'হাতীর মুখে দুর্ব্বোঘাস' হবে। আরও দুঝোড়া বেগুণ কোট; আর তরকারীর মধ্যে আলু সবগুলো কুটে দেও; আমার নরেনের ঘরে ত দিব্যসামগ্রীর অভাব নেই, তবে দেখবার শুনবার লোক নেই এই যা কথা।" কতকগুলি যুবতী রান্নাবাড়ীতে বসিয়া নিজেরাই মাছ কুটিতে লাগিয়া গিয়াছেন, দুই তিনটি বিড়াল লোলুপ দৃষ্টিতে অদূরে বসিয়া কিঞ্চিৎ শিকারের প্রতীক্ষা করিতেছে, একটা চীল সজনে গাছের উঁচু ডালের উপর হইতে নিম্নের পুঞ্জীকৃত মৎস্যরাশিতে একবার ছোঁ মারিবার অভিপ্রায়ে স্থির লক্ষ্যে বসিয়া আছে, কিন্তু পাঁচ বৎসর বয়সের একটা উলঙ্গ ছেলে মাছের কাছে বসিয়া একখানা কঞ্চি লইয়া ক্রমাগত ঘুরাইতেছে, তাই আপাততঃ তাহার সাধু উদ্দেশ্য সিদ্ধির কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। আঁস্তাকুড়ে কতকগুলি দধিলিপ্ত উচ্ছিষ্ট পত্রের উপর একপাল কুকুর প্রবল কলরব করিতেছে। ঢেঁকিশালে দুটো বড় বড় উনান জ্বলিতেছে। গোয়ালারা সজোরে দুই হস্তে ময়দা দলিতেছে। কেহ নেচি কাটিতেছে, কেহ বেলিতেছে, টিকিওয়ালা দুজন ব্রাহ্মণ ঝরণা ও কাটির সাহায্যে ঘৃতপূর্ণ কড়া হইতে লুচি ভাজিয়া তুলিতেছে এবং অগ্নির প্রবল উত্তাপ হইতে কিঞ্চিৎ মুক্তিলাভের আশায় ক্রমাগত পান চিবাইতেছে। বহির্ব্বাটীর এক কোণে অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে; চাকরেরা কেহ তামাক সাজিতেছে, কেহ আলোর আয়োজন করিতেছে; পাড়ার ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা সামিয়ানার নীচে সানন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, বেলোয়ারি ঝাড়ের দোলক গুলা পরস্পরের আঘাতে টুং টাং করিয়া বাজিতেছে, মধ্যাহ্নের রৌদ্রচ্ছটা প্রতিফলিত হইয়া তাহাতেই সপ্তবর্ণের আলোক-রশ্মি বিকীর্ণ হইতেছে। বিজ্ঞ বৃদ্ধেরা চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া গম্ভীর ভাবে তামাক টানিতেছেন এবং প্রসঙ্গ ক্রমে দুই একটা কথা বলিতেছেন। দু'তিনটে বয়াটে ছেলে দৌড়িয়া একবার বাড়ীর মধ্যে যাইতেছে, একবার বাহিরে আসিতেছে, কাহাকেও গালাগালি করিতেছে এবং অকারণে বা সামান্য কারণে চীৎকার করিয়া বাড়ী কাঁপাইয়া তুলিতেছে; ইহাদের বিশ্বাস এই প্রকার লম্ফঝম্ফ উদ্বেগ উদ্দীপনা ব্যতীত আজিকার শুভকার্য্যটী অসম্পন্ন থাকিয়া যাইবে।

বেলা তিনটের সময় পাত্রপক্ষের নাপিত ডালা লইয়া উপস্থিত হইল। লোহিত পট্টবস্ত্র, একবাটি চাঁচি, সোণার কঙ্কণ প্রভৃতি উপহার দ্রব্যে ডালা সজ্জিত। তিনজন 'এয়ো' হুলুধ্বনি দিয়া নাপিতের হাত হইতে ডালা নামাইয়া ছাঁদলা তলায় রাখিলেন। বৃদ্ধ পুরোহিত নরেন্দ্রনাথকে লইয়া আভ্যুতিক ক্রিয়া আরম্ভ করিলেন। বেলা পড়িয়া আসিল দেখিয়া যুবতীর দল চারুকে সাজাইতে বসিল। আমাদের বঙ্গদেশের শুধু মুনি গণেরই মতভেদের দৃষ্টান্ত জাজ্জ্বল্যমান নহে, কেশবিরচন কার্য্যে বঙ্গললনাকুলের মধ্যেও মতভেদের আধিক্য বর্ত্তমান দেখা যায়। কিন্তু হরিরামপুরের মধ্যে চাটুর্য্যেদের সুরবালাই আজকাল প্রধান 'অথরিটি'। কারণ হরিরামপুরের 'বিএ' পাশ খোঁপার বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইলে সুরি শ্বশুর বাড়ী হইতে 'পাঁচগুছি' খোঁপা বাঁধিবার প্রণালী শিখিয়া আসিয়া 'বি এ পাশ' কে ফেল করিয়া দিয়াছে। এই 'পাঁচগুছি' খোঁপাই আজকাল এ অঞ্চলের 'লেটেষ্ট ফ্যাশন'। সুরভি তৈলে চারুর সুন্দর খোঁপা বাঁধিয়া কপালে একটি টিপ দিয়া, মুখে চন্দনের অলকা তিলকা কাটিয়া এবং বস্ত্রালঙ্কারে তাহাকে সজ্জিত করিয়া রমণীগণ নরেন্দ্রনাথকে অন্দরের মধ্যে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। নরেন্দ্রনাথ উজ্জ্বল দীপালোকিত কক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক চারুর মুখখানির দিকে দুই একবার চাহিয়া দেখিলেন। নববধূর বেশে সজ্জিত হইয়া বাপের মুখের দিকে চাহিতেও চারুর বড় লজ্জাকরিতে লাগিল; সে তাহার লজ্জারক্তিম

মুখখানি ধীরে ধীরে অবনত করিল। এই নূতন ভাব দেখিয়া মৃদু হাস্যে নরেন্দ্রনাথের ওষ্ঠ সুরঞ্জিত হইয়া উঠিল। কিন্তু কি এক অজ্ঞাত বেদনা তাঁহার মর্ম্মতন্ত্রী ধরিয়া সজোরে নাড়া দিয়া গেল। তাহা আনন্দের কি বিষাদের তাহা অনুভব করিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহার স্নেহপ্রদীপ্ত প্রশান্ত চক্ষু দুটি অশ্রুপূর্ণ হইল, এবং সেই উজ্জ্বল দীপালোক, কামিনীকণ্ঠকূজিত কক্ষ ও কন্যার কমনীয় মুখকান্তি সমস্ত অশ্রুরুদ্ধ নেত্রের সম্মুখে ঝাপ্‌সা দেখাইতে লাগিল; তিনি কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিলেন।

রাত্রে শুভলগ্নে বিবাহ হইয়া গেল। পরদিন অতি প্রত্যূষ হইতে করুণ রাগিণীতে সানাই বাজিতে লাগিল। তাহার মর্ম্মস্পর্শী সুরে বিদায়ভরা বেদনা পরিব্যক্ত হইতেছে। বাড়ী আনন্দপূর্ণ হইলেও সেই সুরে নরেন্দ্রনাথ ও দেববালার হৃদয়ে বিষাদ ঝঙ্কারিত হইয়া উঠিতেছে। বেলা একটু বেশী হইলে বরযাত্রীদল বিদায় গ্রহণ করিল। কন্যা, জামাতাকেও এই বেলাতেই বিদায় করিতে হইবে।

তখন নরেন্দ্রনাথ স্ত্রী-আচার অনুসারে কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার ক্ষুদ্র পদদ্বয় হরিদ্রা ও ইঙ্গুরের মাটি সংমিশ্রিত দধির মধ্যে ডুবাইয়া গৃহ-প্রাচীরে তাহার ছাপ দিয়া লইলেন। চারু কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার পদমূলে একটি টাকা রাখিয়া প্রণাম করিল। একজন প্রৌঢ়া প্রতিবেশিনী তাহাকে বলিলেন, "চারু বল, এতদিন তোমার যা খেয়েছি পরেছি তার দাম দিচ্ছি।" হায়, নিষ্ঠুর প্রথা! হৃদয় যখন বিদীর্ণ হইয়া যায়, তখন লোকাচারের কঠোর অনুষ্ঠান পাষাণভারের ন্যায় সেই পীড়িত হৃদয়ের উপর চাপিয়া বসিলে নিশ্বাস রোধ হইয়া আসে এবং অশ্রুরাশি বাষ্পাকারে কণ্ঠনালী আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। এই জীবনব্যাপী স্নেহযত্ন, মাতৃহৃদয়ের এই সুগভীর স্নিগ্ধ প্রেম কি সামান্য রজতচক্রের বিনিময়ে—কোন পার্থিব রত্নের পরিবর্ত্তে—পরিশোধনীয়? চারুবালা দ্বিগুণ আবেগে নতমস্তকে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল, নরেন্দ্রনাথের চক্ষে হৃদয় ফাটিয়া অশ্রু ফুটিয়া উঠিল, দেববালা অদূরে বাতায়নের পাশে দাঁড়াইয়া অবগুণ্ঠনের ভিতর অশ্রু ত্যাগ করিতে লাগিলেন। অনেকে অনেক কথা বলিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু এই বিদায়দৃশ্যের মধ্যে কোন প্রবোধবাক্যই হৃদয়ে সান্ত্বনা দান করিতে পারে না; চারুর স্নেহপূর্ণ মধুর কথা, তাহার সুমিষ্ট হাসি, তাহার মমতাপূর্ণ কোমল ব্যবহার ঘুরিয়া ফিরিয়া সহস্রবার তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল।

বেলা ক্রমে বাড়িয়া উঠিল। বেহারারা আর কিছুতে বিলম্ব করিতে চাহে না দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ কন্যাকে পাল্কীর উপর তুলিয়া দিয়া আসিলেন। তাহার পর বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে মৃদুস্বরে তাহাকে বলিলেন, "মা, যেখানে তুমি যাইতেছ, সেই তোমার আপন বাড়ী; শ্বশুর শাশুড়ীকে ভক্তি করিও, ননদ জায়েদের কথা শুনিও; কেহ যেন আমার মা চারুর কোন দোষ ধরিতে না পারে। সেখানে গিয়া কাঁদাকাটি করিও না, আবার আটদিন পরে তোমাকে লইয়া আসিব।" চারুর চোখ দিয়া অবিরলধারে জল পড়িতে লাগিল; তাহার সবুজ বারাণসী সাড়ীর অবগুণ্ঠন মস্তক হইতে খসিয়া পড়িল, যেন বায়ুস্পর্শে পত্রাবরণবিমুক্ত শিশিরসিক্ত অর্দ্ধস্ফুট গোলাপের সজলদলগুলি স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া উঠিল। তাহার একরাত্রির সিঁথির সিঁদুর ডগডগ করিতে লাগিল। এমন সময় কোথা হইতে চারুর সেই ক্ষুদ্র অন্ধ সঙ্গিনী অতি করুণস্বরে ডাকিতে ডাকিতে তাহার পাল্কীর কাছে আসিয়া ব্যাকুলভাবে ঘুরিতে লাগিল। চারু দুইদিন তাহাকে দেখে নাই তাহার যত্ন করিতে পারে নাই, আজ এই বিদায় কালে তাহাকে একবার কোলে লইতে চাহিল। চারুর এই অসম্ভব প্রার্থনা শুনিয়া শুভাকাঙ্ক্ষিণী পুরমহিলাগণ আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। কেহ বলিলেন, "শুভযাত্রার সময়, এমন অলুক্ষণে কাণা বিড়ালটা কোথা হ'তে মরতে এলো, দূর ক'রে দেও ওটাকে।" একজন বলিলেন, "এখন ওটাকে ছুঁসনে চারু।" চারু কাহারো কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলয়ালঙ্কৃত উভয় হস্তে সাগ্রহে তাহাকে টানিয়া বুকে তুলিয়া লইল। বিড়ালটা তাহার দৃষ্টিহীন চক্ষু দুটি চারুর মুখের উপর স্থাপন করিয়া অতি কাতরস্বরে ডাকিতে লাগিল। এই অসহায়া অন্ধ সঙ্গিনীটীকে ছাড়িয়া যাইতে তাহার কিছুতে ইচ্ছা হইতেছিল না, কিন্তু তথাপি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইল। বেহারারা পাল্কী উঠাইল, অল্পক্ষণের মধ্যে উৎসব মুখর পল্লীগৃহ বিজয়া দশমীর রাত্রে পূজাবাড়ীর ন্যায় নিরানন্দময় হইয়া গেল। পথেঘাটে অনেকে চারুর বিবাহের আলোচনা করিতে

লাগিল, কিন্তু চারুর মা গৃহকোণে বসিয়া নীরবে অশ্রু-মোচন করিতে লাগিলেন; তাঁহার হৃদয় তাঁহার গৃহ শূন্য বলিয়া মনে হইল। আজ তাঁহার মনে পড়িয়া গেল, চারু তাহার পুতুলের মিছামিছি বিবাহ দিয়া কতদিন এমনি করিয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়াছে, কিন্তু তখন কি তিনি একবারও ভাবিতেন সেই অকারণ বিসর্জ্জিত অশ্রু এমনি বিরহবেদনাময়? হায় মায়া, যখন তাঁহার বয়স একাদশ বৎসর, সে সময় তাঁহাকে প্রথম বিদায় দিয়া তাঁহার স্নেহময়ী জননীও এমনি বিদীর্ণহৃদয়ে শূন্যমনে তাঁহার বিরহে রোদন করিয়াছিলেন। সে কতদিনের কথা! কিন্তু আজ তাহা স্বপ্নের মত বোধ হইতেছে এবং স্বপ্ন ও সত্য একাকার হইয়া গিয়াছে; কেবল অনাদি অনন্ত কাল এক অপরিবর্ত্তনীয় উপায়ে ধরাতলে জীবস্রোত অব্যাহত রাখিয়াছে।

দেববালা যখন কন্যাকে বিদায় দিয়া মনের মধ্যে এই প্রকার সান্ত্বনা লাভের নিমিত্ত কুহক রচনার প্রয়াস পাইতেছিলেন, তখন চারুর পরিত্যক্ত সঙ্গীহারা সেই বিড়াল-শিশুর মনে কোন সান্ত্বনার সঞ্চার হয় নাই; সে শুধু তাহার সঙ্গিনীর অভাব অনুভব করিয়া অতি কাতর চীৎকারে [illegible] কিন্তু [illegible] ঘরে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল, কোথাও তাহার সন্ধান না পাইয়া অবশেষে নরেন্দ্রনাথের পাঠগৃহে যেখানে চারুবালা এক একদিন চেয়ারের উপর বসিয়া বই খুলিয়া ছবি দেখিত, সেই চেয়ারের চারি ধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া একটি কোমল স্পর্শ এবং দুটি স্নেহপূর্ণ সম্ভাষণের আশায় ঊর্দ্ধমুখে কাঁদিতে লাগিল, কিন্তু আজ আর কেহ তাহাকে ক্রোড়ে লইল না, শূন্য চেয়ার হইতে একবারও সে সেই স্নেহময় পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল না, শুধু তাহার মর্ম্মপীড়িত কাতর আর্ত্তনাদে সেই স্তব্ধ গৃহ ধ্বনিত হইতে লাগিল।

ঠিক সেই সময়ে অপরিচিত, বৃক্ষচ্ছায়া বর্জ্জিত, ধূলিময় মেঠোপথে বেহারাবাহিত পাল্কীর অন্তর্লীন মাতৃক্রোড়-বিচ্যুতা অভিমানিনী চারুবালার কর্ণে ক্ষান্তর মার কণ্ঠ-নিসৃত কর্ম্মহীন স্তব্ধসন্ধ্যার সেই পুরাতন তুচ্ছ ছড়াটা নব-ভাবে পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল;

"আগে যায় রে চৌপাল, পাছে যায় রে ডুলি,
'কাহার' ভাই দাঁড়াও রে মাকে আসি বলি,—
মা বড় নির্বুদ্ধি কেঁদে কেন মর
আপুনি ভাবিয়ে দেখ কার ঘর কর।"

কিন্তু তখনই তাহার অন্ধ অসহায় বিড়ালশিশুর বিদায় কালের সেই সুগভীর ব্যাকুলতা তাহার মনে পড়িয়া গেল; সমস্ত ছড়া ও সকল সান্ত্বনা তাহার নিকট মুহূর্ত্তের মধ্যে নিতান্ত নিষ্ফল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল এবং সেই তীব্র রবিকর-প্রদীপ্ত বসন্ত-মধ্যাহ্নে বিরহতপ্ত সুদীর্ঘ প্রান্তরপথে একটি নিঃসঙ্গ অবোলা পশু-শিশুর অব্যক্ত বেদনা রুদ্ধ যাতনারূপে তাহার ব্যথিত বক্ষঃস্থলের মধ্যে আবেগভরা অতৃপ্ত মাতৃস্নেহের ব্যর্থ কামনা পরিস্ফুট করিয়া তুলিল; এবং পরদিন তাহার শ্বশুরগৃহের উচ্ছ্বসিত হর্ষ-কোলাহল-মিশ্রমঙ্গলা বাদ্যনিনাদ ও মিলনানন্দের উচ্চ হুলুধ্বনি, তাহার বিজন কুমারীজীবনকুঞ্জের অজ্ঞাত নেপথ্যবর্ত্তিনী সেই অবজ্ঞাত অন্ধ সঙ্গিনীর নিরানন্দময় ক্ষুব্ধ আর্ত্তনাদটিকে কোন মতে তাহার হৃদয় হইতে বিলুপ্ত করিতে সক্ষম হইল না।

(সমাপ্ত)

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

লাল-পল্টন্।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

বাঙ্গালীর প্রভুভক্তি।

Whilst the Bengal Army continues in existence, so long should his (Clive's) name be mentioned by its members, with reverence and affection, as its founder, supporter and best friend. *Captain Arthur Broome.*

কার্য্যোদ্ধার করিতে হইলে কার্য্যসাধনোপযোগী পাত্র নির্ব্বাচন করিতে হয়। ইহাতেই প্রতিভার প্রকৃত শক্তি প্রকাশিত হইয়া থাকে। * লাল-পল্টনের গঠনকার্য্যে ক্লাইবের প্রতিভা এইরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল।

* In nothing does the power of genious more strikingly display itself than in the selection of persons most fit to be employed, and in the application of their peculiar talents to the work for which they are suited.—Sir John Malcolm's Memoirs of Lord Clive, vol I. 323.

ক্লাইব অত্যল্প সেনা সমভিব্যাহারে বঙ্গদেশে উপনীত হইয়াছিলেন। "মারল্‌বরা" নামক পথভ্রষ্ট রণপোত কলিকাতায় উপনীত হইবার পরেও তাঁহার সেনাদল সমধিক পুষ্টিলাভ করিতে পারে নাই। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ৭০০ ইউরোপীয় পদাতি, ১০০ ইউরোপীয় গোলন্দাজ এবং ১৫০০ কালাসিপাহী ভিন্ন ক্লাইবের পৃষ্ঠরক্ষার্থ আর কোন সেনাদল বর্ত্তমান ছিল না। ইহাদের মধ্যে তিনশত লোক নবসংগৃহীত লাল-পল্টনভুক্ত বাঙ্গালী সিপাহী; তাহারা তখন ইউরোপীয় সমর-কৌশল শিক্ষা করিতেছিল।

কলিকাতার পুনরুদ্ধার সাধন করিবামাত্র ইংরাজেরা বাহুবলের পরিচয় দিবার জন্য হুগলী লুণ্ঠন করিয়া আসিয়াছিলেন। সিরাজদ্দৌলা তাহাতে উত্যক্ত হইয়া ইংরাজদিগকে শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে সসৈন্যে কলিকাতা আক্রমণ করেন। ২রা ফেব্রুয়ারী সিরাজবাহিনী কলিকাতার নিকটবর্ত্তী হইলে, ক্লাইব তাঁহার গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে চেষ্টা ফলবতী হইল না; বরং সেনাপতি ক্লাইবের ক্ষুদ্র সেনাদল এবং পার্শ্বচরদিগের মধ্যে অনেকে পঞ্চত্ব লাভ করিলেন।

অতঃপর নিশারণে সিরাজদ্দৌলার সর্ব্বনাশ করিবেন বলিয়া ক্লাইব আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছিলেন। ইহাতেও তাঁহার মনস্কামনা সফল হইল না; বহুসংখ্যক ইংরাজ-সেনা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল; অবশেষে বৃটীশ-বাহিনীকে দুর্গাভিমুখে পলায়ন করিতে হইল!*

এই উভয় যুদ্ধেই বঙ্গীয় লাল-পল্টন উপস্থিত ছিল না; তাহারা তখনও সংখ্যায় নগণ্য এবং রণকৌশল শিক্ষায় নিযুক্ত ছিল। নিশারণে লাল-পল্টনের উপর ইংরাজ শিবির রক্ষার ভার নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল; সেই জন্য তাহারা কাশীপুরে ইংরাজশিবিরে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিল।

সিরাজবাহিনীর গতিরোধ করিতে না পারিয়া ক্লাইব সিরাজদ্দৌলার সহিত সন্ধি সংস্থাপন করেন। ইহারই নাম "আলিনগরের সন্ধি।" ইহার জন্য সমসাময়িক ইংরাজদিগের নিকট ক্লাইবকে নানারূপ গঞ্জনা লাভ করিতে হয়।

আলিনগরের সন্ধির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইংরাজগণ যে বাহুবলে বলীয়ান বলিয়া অহঙ্কার করিতে পারেন নাই, এই সকল ঐতিহাসিক ঘটনাই তদ্বিষয়ের প্রধান প্রমাণ। অতঃপর আত্মপক্ষ সবল করিবার জন্য ক্লাইবের বিলক্ষণ উৎকণ্ঠা উপস্থিত হইয়াছিল। মান্দ্রাজ হইতে সেনাবল প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা ছিল না; বিলাত হইতেও বহুসংখ্যক গোরা পল্টন আসিবার আশা ছিল না। অগত্যা বঙ্গদেশে সেনা সংগ্রহ করা ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিলাতের অধ্যক্ষ সভার সভাপতি মিঃ পেইন ক্লাইবকে যে পত্র লিখেন, তাহাতে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোম্পানী বাহাদুর ইংলণ্ড, স্কট্‌লণ্ড, আয়র্লণ্ড এবং জর্ম্মণি দেশে সেনা সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হইতে পারেন নাই; অবশেষে তাঁহাদের দুর্গতি দর্শনে ইংলণ্ডেশ্বর কৃপা-পরবশ হইয়া এক সহস্র গোরা পদাতিক সংগ্রহ করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন।* এই গোরা পদাতিক ও ভারতবর্ষে শীঘ্র উপনীত হইবার সম্ভাবনা ছিল না!

এই সকল কারণে ১৭৫৭ এবং ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে ক্লাইব, চারিদল "লাল-পল্টন" গঠন করেন। ইহার প্রথম, দ্বিতীয় এবং চতুর্থ দল কলিকাতায় সংগৃহীত বঙ্গবাসী সিপাহী এবং তৃতীয় দল পাটনায় সংগৃহীত ভোজপুরিয়া সিপাহী। পলাশির যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রথম দল এবং পলাশির যুদ্ধের পরে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দল "লাল পল্টন" গঠিত হইয়াছিল।

ক্লাইব প্রথম সংখ্যক "লাল-পল্টন" গঠন করিবার পর হইতে ইংরাজেরা উত্তরোত্তর সকল যুদ্ধেই জয়যুক্ত হইতে লাগিলেন। চন্দননগর অধিকারে এবং পলাশির যুদ্ধাভিনয়ে বঙ্গীয় লাল-পল্টন বীরত্ব প্রদর্শনে ত্রুটি করে নাই।

কোন কোন ইতিহাস-লেখক পলাশির যুদ্ধকে যুদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করেন নাই; তাঁহারা বলেন, উহা যুদ্ধাভিনয় মাত্র। যাহাই হউক, উক্ত যুদ্ধাভিনয়ক্ষেত্রে যাহারা ইংরাজ পক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, তন্মধ্যে বঙ্গীয় প্রথম সংখ্যক লাল-পল্টন বর্ত্তমান ছিল বলিয়া আজ পর্য্যন্তও বঙ্গীয় প্রথম সংখ্যক কালা সিপাহীরা রণপতাকায় "পলাশির" নাম ব্যবহার করিয়া আসিতেছে!

* ইহার বিস্তৃত বিবরণ 'সিরাজদ্দৌলা' শীর্ষক ঐতিহাসিক চিত্রে প্রদত্ত হইয়াছে।

* After being disappointed in various attempts for raising recruits in Germany, Ireland, Scotland and England, His Majesty has been pleased to order us a battalion of about 1000 men out of the new regments.—Mr. Payne's letter to Clive, dated 11 November, 1757.

পলাশির যুদ্ধের পর ইংরাজদিগের কপাল ফিরিয়া গেল; তাঁহারা সিরাজদ্দৌলার আমলে যে সকল পাত্র, মিত্রের কৃপা কটাক্ষের আশায় সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইতেন তাঁহারাই ইংরাজের কৃপাভিক্ষার জন্য ক্লাইবের কণ্ঠলগ্ন হইয়া পড়িলেন। অবস্থা-বিবর্ত্তনে ইংরাজের স্কন্ধে গুরুতর কর্ত্তব্যভারও নিক্ষিপ্ত হইল। পশ্চিমে পাটনা অঞ্চলে রাজা রামনারায়ণ, দক্ষিণে মেদনীপুর অঞ্চলে রাজা রামরাম সিংহ, উত্তরে পূর্ণিয়া অঞ্চলে অখিল সিংহ এবং পূর্ব্বে ঢাকা অঞ্চলে আহ্‌মানী খাঁ বাহুবলে বলীয়ান হইয়া মীর জাফরের অধীনতা স্বীকার করিতে অসম্মত হওয়ায়, পলাশির যুদ্ধের পরিণাম ফল নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল। এই সময়ে ক্লাইব অনন্যোপায় হইয়া (১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে) দ্বিতীয় দল "লাল-পল্টন" গঠন করিলেন।

প্রথম এবং দ্বিতীয় সংখ্যক "লাল-পল্টন" ক্লাইবেরই দক্ষিণ ও বাম বাহুর ন্যায় তাঁহার আজ্ঞাকারী হইয়া যে সকল বীরকীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছিল তাহা দুই ভাগে বিভক্ত। অন্তর্ব্বিপ্লবের শান্তিসাধন করিয়া মীর জাফরের সিংহাসন আপন্মুক্ত করিতে যে সকল ইংরাজসেনা জীবন-বিসর্জ্জন করে, তন্মধ্যে প্রথম এবং দ্বিতীয় সংখ্যক "লাল-পল্টন"ই প্রধান; ফরাশিশক্তি চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া সমুদ্রোপকূলে মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত যাহারা ইংরাজ-রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেয়, তন্মধ্যেও প্রথম এবং দ্বিতীয় সংখ্যক "লাল-পল্টন" প্রধান।

দ্বিতীয় সংখ্যক লালপল্টন ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসেই যুদ্ধোপযোগী শিক্ষালাভ করে। তখন হইতে প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যক বঙ্গীয় সিপাহীদল বাংলার ইতিহাসে সর্ব্বত্র গৌরবান্বিত হইয়া উঠিল।

নবাব আলিবর্দ্দী যখন সরফরাজ খাঁকে নিহত করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন, তৎকালের সরফরাজের দুইটি শিশু সন্তান বর্ত্তমান ছিল। তন্মধ্যে কনিষ্ঠের নাম আহ্‌মানী খাঁ। তিনি পলাশির যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই বাহুবলে ঢাকার সিংহাসন অধিকার করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টা সফল হইলে মীরজাফর এবং ইংরাজগণকে সমূলে বিনষ্ট হইতে হইত। আহ্‌মনী খাঁ গোপনে গোপনে ঢাকা আক্রমণ করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন। তৎকালে ঢাকায় দুই শত মাত্র সিপাহী থাকিত। তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া সিংহাসন অধিকার করা কিছুমাত্র কঠিন হইত না। কিন্তু ইংরাজেরা ইহার সন্ধান লাভ করিবামাত্র প্রথম সংখ্যক লাল-পল্টনের এক-দল সিপাহী ঢাকা অঞ্চলে প্রেরণ করায় ঢাকার বিদ্রোহ সহজেই শান্তিলাভ করিল।

পাটনার বিদ্রোহ সহজে নিবারিত হইল না; তজ্জন্য ক্লাইবকে স্বয়ং সসৈন্যে পাটনা যাত্রা করিতে হইল। এই বিদ্রোহ নিবারিত না হইলে যে ইংরাজেরা বহুদিন বাংলা দেশে তিষ্ঠিতে পারিবেন না, দুর্ভাগ্যক্রমে অল্প লোকেই সে কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইলেন। ক্লাইবের অধীনে যে সকল রাজকীয় গোরাদল ছিল তাহারা পাটনা যাত্রা করিতে একবারেই অসম্মত হইল!

আডমিরাল ওয়াট্‌সন্ তাঁহার জাহাজি গোরাদল পাটনায় পাঠাইবার অনুমতি করিয়াছিলেন; কিন্তু ক্লাইব তাহা গ্রহণ করিলেন না। তিনি বীরোচিত দৃঢ়তার সহিত রাজকীয় গোরাদলকে প্রত্যাখ্যান করিয়া কোম্পানীর বেতনভোগী সেনা লইয়া পাটনা যাত্রা করিলেন। এই সময় ক্লাইব ওয়াট্‌সন্‌কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে কোম্পানীর সেনাদলের প্রভুভক্তির পরিচয় প্রদত্ত হইয়া ছিল। ক্লাইবের পত্রখানি এইরূপ:—

"Notwithstanding your offer of putting the k.ng's detachment under my command on this expedition, I am sorry to inform you I can not accept it without prejudicing the service; for all the officers (Captain Weller and Captain Coote excepted) had expressed by a letter a disinclination to go upon it. Under these circumstances, I think it is better for the Company to be served by those who are willing and may be attached to their service, than by persons who seem to have lost all remembrance of what they owe to them." *

ক্লাইব যে ক্রোধান্ধ হইয়া এইরূপ পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহার ক্রোধেরও বিশেষ কারণ ছিল। সিরাজদ্দৌলার পরাজয় সাধনের পর ফরাশি সেনানায়ক মসিয় লাসের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য মাদ্রাজী কালা সিপাহী ও গোরা পল্টন লইয়া মেজর কূট পাটনা অঞ্চলে গমন করিয়াছিলেন। তৎকালে গোরা এবং মাদ্রাজী কালা সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইয়া মেজর কূটকে বিলক্ষণ বিপদে ফেলিয়া দিয়াছিল। † মেজর সাহেব গোরাদলের

* Clive's letter to Admiral Watson.

†During the whole of this march the Europeans had expressed great discontent, and utterly began to evince a very mutinous spirit,—Broome's Bengal Army, vol. I. 170.

মতি পরিবর্ত্তনের কোন সুলক্ষণ না দেখিয়া তাহাদিগকে পথিমধ্যে বিশ্রামের আদেশ প্রদান করিয়া মাদ্রাজী কালা সিপাহী লইয়াই অগ্রসর হইয়াছিলেন; কিন্তু তাহারাও আর অগ্রসর হইবে না বলিয়া সকলে একবাক্যে অস্ত্রত্যাগ করিয়াছিল!*

ক্লাইব এই সকল কারণে রাজকীয় গোরাদল এবং মাদ্রাজী সিপাহী পরিত্যাগ করিয়া কোম্পানীর বেতনভোগী প্রভুভক্ত সেনাদল লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। যাহারা এই যুদ্ধযাত্রায় ক্লাইবের অনুগমন করে তাহারা কোম্পানীর গোরাপল্টন এবং প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যক বঙ্গীয় লাল-পল্টন। সামরিক ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে এই উপলক্ষে ৫৫০ গোরা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যক লাল পল্টনভুক্ত ১৫০০ সিপাহী ক্লাইবের অনুগমন করিয়াছিল! †

১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পাটনা প্রদেশে শান্তি সংস্থাপিত হইবা মাত্র ক্লাইব পাটনা রক্ষার্থ তৃতীয়সংখ্যক লাল-পল্টন গঠন করিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যক লাল-পল্টন সমভিব্যাহারে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ‡ তৃতীয় সংখ্যক লাল-পল্টনে সিপাহী ছিল না; ভোজপুর অঞ্চলের লোক লইয়া এই পল্টনদল গঠিত হইয়াছিল। এই পল্টনদল মীরকাসিমের আমলে পাটনা অঞ্চলেই বিনাশ-প্রাপ্ত হয়।

ক্লাইব লাল পল্টনের প্রভুভক্তি ও সমর-নিপুণতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে চতুর্থদল লাল-পল্টন গঠন করেন।§

অতঃপর তৃতীয় দল লাল-পল্টন পাটনায় এবং চতুর্থদল বঙ্গদেশে নিযুক্ত রাখিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যক লাল-পল্টনকে মাদ্রাজ অঞ্চলে প্রেরণ করা হইয়াছিল। তাহারা কোম্পানীর লবণের মর্য্যাদা রক্ষার্থ সমুদ্রপথে মাদ্রাজযাত্রা করিতেও ইতস্ততঃ করে নাই।*

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

* Having determined to continue his pursuit of the French party, Major Coote had paraded the troops in the afternoon, preparatory to a march, when the Sipahis in a body laid down their arms, and refused to proceed further,—Broome's Bengal Army, vol. I. 173.

† The detachment under his command now consisted of little more than 550 Europeans, including the company of Artillery. With a detail of Lascars attached, and the 1st and 2nd Battalions of Sipahis, amounting to about 1500 men.—Broome's Bengal Army, vol, I. 191.

‡ Broome's Bengal Army, vol. I. 199.

§ Ditto, vol. I. 205.

* Orme's Idostan, vol. II.

কলিকাল।

—:○:—

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

মনোহরপুর ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামে এক অনাথা বিধবা বাস করিত। বিধবার এক কিশোরী কন্যা ও দুইটী শিশু পুত্র। কন্যাটী নামেই কেবল সুশীলা নহে, স্বভাবেও তাহাই। মায়ের যত্নে সুশীলা কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছিল। আর গৃহস্থালির কাজকর্ম্ম? তা সে পরিচয় না দিলেও চলে; সে যে গরীবের মেয়ে। ঘর সংসারের কাজ বল, কারুকার্য্য শিল্পকার্য্য বল, সকল কর্ম্মেই সুশীলা মায়ের শিক্ষায় নিপুণ হইয়াছিল। সুশীলা যে কেবল গুণবতী তাহা নহে, তাহার রূপও ছিল। কিন্তু এত রূপগুণসত্ত্বেও, সুশীলা এ পর্য্যন্ত পাত্রস্থা হয় নাই! তাহার জননীর এমন অর্থবল নাই, লোক বল নাই, কেমন করিয়া সুপাত্র জুটিবে বল? সুশীলা ক্রমে তের বৎসরে পদার্পণ করিল। মুকুলিত যৌবন তাহার দেহের সুষমা ও কান্তি, এবং মাতার হৃদয়ের উৎকণ্ঠা ও ভীতি বৃদ্ধি করিতে করিতে দিনে দিনে বিকশিত হইতে লাগিল।

দেড় বৎসর পূর্ব্বে সুশীলার উপযুক্ত একটী পাত্র জুটিয়াছিল। সে পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করা সুশীলার মায়ের নিতান্তই বাসনা হইয়াছিল। কিন্তু সে যে দরিদ্রের মনোরথ! পাত্রটীও সুশীলাকে দেখিয়া এবং তাহার গুণের কথা শুনিয়া এ বিবাহে নিরতিশয় ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু পাত্রের পিতা কিছুতেই এ বিবাহ হইতে দেন নাই। তাঁর এম্, এ পাশ করা সোনার চাঁদ ছেলে, আজ বাদে কাল ডেপুটী হইবে। কোথায় সে অর্দ্ধেক রাজত্ব রাজকন্যা পাইবে, তা নয়,—সর্ব্বনাশ! সে কিনা একটা গরীবের মেয়েকে ঘরের কড়ি খরচ করিয়া বিবাহ করিতে চায়? কি কলিকাল! ছেলের এমন দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিবে জানিলে (কোন্—বিষ্ণু!) কে এত খরচপত্র করিয়া ছেলেকে

ইংরাজী শিখাইত? যাই হোক, সে সম্বন্ধ যথা সময়ে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তারপর দুই একটী তৃতীয় পক্ষের পাত্র দয়াবসে সুশীলার পাণী-পীড়নে সমুৎসুক ছিলেন, কিন্তু সে পীড়নে সুশীলার মা কিছুতেই "রাজী" হন নাই।

এদিকে, ক্রমে দিন যাইতে লাগিল। মেয়ের বিবাহ যে আর না দিলে চলে না! জাতি কুল মান কিছুই যে থাকে না! সুশীলার মা যখন এই বিপদে কূল কিনারা দেখিতে পাইতে ছিলেন না, তখন সহসা একদিন, স্মিতমুখে দ্রুতচরণ ষষ্টিবর্ষ ঘটক-কুলচূড়ামণি মাধবভাট উচ্চকণ্ঠে 'মেয়ে' কি বাড়ীতে আছ বলিতে বলিতে সুশীলার জননীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন! ঘটকালি উপলক্ষে ভাট মহাশয়ের, বহুদিন হইতেই এবাটীতে ঘন ঘন গমনাগমন, তৎসূত্রে ঘনিষ্টতা সংস্থাপন, সুতরাং অবারিত দ্বার! তার উপর ভাট মহাশয় আবার সুশীলার মাকে মেয়ে সম্বোধনে আপ্যায়িত করিতেন। তিনি খাঁটি নিঃস্বার্থভাবে, কেবল মেয়ের খাতিরেই সুশীলার সম্বন্ধের জন্য এত চেষ্টিত! কিন্তু তাঁর এত যত্ন, এত পরিশ্রম, এত বাক্য, এত আড়ম্বর সত্ত্বেও কিছুতে কিছু হইয়া উঠিতেছেনা! তিনি যে কয়টা সম্বন্ধ আনিয়াছিলেন, সে কয়টাতেই সুশীলার মা কোন মতেই মত দিতে পারে নাই। এবার তাই তিনি বাছিয়া বাছিয়া একটী পাত্ররত্ন বাহির করিয়াছেন! তাঁহার বিশ্বাস এবারকার সন্ধান অব্যর্থ; সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই এবার তিনি অনেকটা অগ্রসরও হইয়াছেন!

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াই ভাট মহাশয় সম্মুখে সুশীলাকে দেখিলেন! একে ঘটক, তায় 'নাতনি' সংযোগ; সুশীলাকে সম্মুখে দেখিয়াই তিনি আরম্ভ করিলেন "দেহি পুরস্কার ঘটকালি!" সুশীলা একটু অপ্রতিভ হইয়া, মুখখানি নামাইয়া মনে মনে বৃদ্ধের শমন-সদনের পথ সুগম করিতে করিতে বাহিরের দিকে যাইতেছিল; ঘটক মাথা নাড়িয়া নিষেধ করিয়া একটী পদ আওড়াইলেন—

না যাইও যমুনার জলে, তরুয়া কদম্ব মূলে,
চিকন কালা বাঁধিয়াছে থানা!

রহস্যের অর্থ সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও সুশীলা তখনই গতি ফিরাইয়া, দ্রুতচরণে, গৃহমধ্যে যেখানে মা আহারান্তে একটু বিশ্রাম করিতেছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

ঘটক মহাশয় সংক্ষেপে পাত্রের রূপ, গুণ, ঐশ্বর্য্যের অতি-পরিচয় 'মেয়ে'কে দিয়া, "মা তুমি মেয়েকে শীঘ্র সাজাও, আমি পাত্রকে সঙ্গে করিয়া আনিতেছি", বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছিলেন। তখন সুশীলার মা ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমার মেয়েকে আর সাজাতে হয় না বাবা, কিন্তু!"—

"আরে বেটী কিন্তু কি! সে ভাবনা কিছু নেই! মাধব শর্ম্মা কি আদি অন্ত না জেনে এ কাজে হাত দিয়েছে! যদি তোমার মেয়ের শিবপূজার জোর থাকে, তবেই সে এমন বর পাবে! কি-ই বা বল তুমি, মেয়েটা সুখে থাক্‌বে, ছেলে দুটা মানুষ হবে, তোমারও কোন ভাবনা থাক্‌বে না, তার উপর এমন ছেলেমানুষ—(অর্থাৎ চল্লিশ বৎসরের কম বয়স)—পাত্র; এতে কি আর 'কিন্তু' করতে আছেরে বাছা"; বলিতে বলিতে উত্তরে অপেক্ষা না করিয়া শিখা দুলাইয়া ভাট মহাশয় রায়েদের বৈঠকখানায়, যেখানে তাঁহার পাত্রকুলধুরন্ধর আসর জমাইয়া বসিয়াছিলেন, সেই অভিমুখে প্রয়াণ করিলেন।

সুশীলার মা তখন আর ভাবনা চিন্তার অধিক সময় না পাইয়া, ভট্টরাজের উপদেশ মত মেয়ে দেখাইবার উদ্যোগে ব্রতী হইলেন এবং প্রতিবেশিনী মহলে খবর পাঠাইলেন! দেখিতে দেখিতে ক্ষুদ্র মনোহরপুরের 'ঘরণী'র দল বৌঝি সমেত বিধবার ক্ষুদ্র গৃহটীকে কাকসমাকুল বটবৃক্ষের মত ছাইয়া ফেলিলেন। কলরবে গৃহ নিনাদিত হইয়া উঠিল।

সুশীলা গরীবের মেয়ে, তাই প্রতিবেশিনী অনেকেই আপন আপন বারাণসী সাড়ী, "জড়াও বডি" "বাউটী সুট" অলঙ্কার দিয়া তাহাকে সাজাইবার প্রস্তাব করিলেন। কেহ বা গহনাদি আনিতে ছুটিলেন। কিন্তু সুশীলার মা তাহাতে কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া ধীরভাবে সকলকে আপ্যায়িত করিয়া বলিলেন, "বেশী জাঁক জমকের সাজে কি কাজ? মোটামুটি সাজিয়ে দেও, তাহাতেই হবে। সুশীলার মার এই উক্তিতে সকলে যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন তাহা নহে। বসন-ভূষণ-গর্ব্বিতা গরবিনীদের গর্ব্বে বরং তাহাতে কিছু আঘাতই লাগিল। পরস্পরের মধ্যে "টেপাটেপি" আরম্ভ হইল। শেষ সুশীলার মা কার্য্যান্তরে একটু অন্তরালে গেলে কেহ বলিললেন, "মর! গিদের দ্যাখ।

সুন্দরী মেয়ে যেন কারু থাকে না!" আর একজন বলিলেন, "ঐ অহঙ্কারেই ত গেলেন; তবু যদি এমন পোড়া কপাল না হ'ত!" এইরূপে সুন্দরীগণের সমালোচনার তরঙ্গ ক্রমেই উদ্বেলিত হইতেছিল, সহসা সুশীলার মার আগমনরূপ তৈল-নিক্ষেপে সে তরঙ্গভঙ্গ থামিয়া গেল! সুশীলার যাহারা সমবয়স্কা, তাহারা এবং কয়েকটী যুবতী বৌ এবং ঝি, এই সমালোচনার গণ্ডী হইতে দূরে সুশীলার নিকট ঘরের ভিতর বসিয়া বোধ হয় নানাপ্রকার রহস্যালাপ করিতেছিল। সুশীলার মা মেয়ে সাজাইবার ভার তাহাদিগের উপর ন্যস্ত করিয়া স্বয়ং প্রবীণাদের নিকটে গিয়া বসিলেন! কিরূপ ভাবে সাজাইতে হইবে তাহা লইয়া নবীনা মহলে মহা বাক্-বিতণ্ডা, বিচার, মীমাংসা হওয়ার গুরুতর সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু সুশীলার মা একখানি টিয়া রঙ্গের কাপড় বাহির করিয়া দিয়া বলিয়া গেলেন, "শুধু চুল ক'গাছা বেঁধে এই কাপড়খানি পরিয়ে দাও।" কাজেই আর বেশী কোন আয়োজন হইল না! তবু সেই সামান্য আয়োজনেই কিছু কিছু "খুঁটিনাটি" বাধিয়া গেল! সুশীলার এক "সমবয়েসী," সে বুঝি সুশীলার অভিকলম—(তখনও কুন্তলীন আবিষ্কৃত হয় নাই) এক ছুটে কোথা হইতে একটী গোলাপ ফুল সংগ্রহ করিয়া আনিল! সুশীলার সই বিনোদিনী, চুল বাঁধায় তার বড় নাম ডাক, সে চুল বাঁধিতে বসিল। কিন্তু সুশীলার "গঙ্গাজল" তাঁহার তিলফুল-লাঞ্ছিত নাশার গতি ঊর্দ্ধদেশে কিঞ্চিৎ সঞ্চালিত করিয়া, মাথা নাড়িয়া সুশীলার সইয়ের উদ্দেশে বলিলেন, "ওলো বেগুণ ফুল, জানিস্ এখন আর তোর সেকেলে "বিউনি" কেউ পছন্দ করে না, আজ কাল ফিরিঙ্গি খোঁপারই চলন!" নে লো নে, তুই বড় জানিস্, উনি আবার আজ এলেন আমায় শিখুতে!" এই বলিয়া বিনোদিনী একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া, বিম্বাধর খানি অবহেলে একটু ফুলাইয়া সকলেরদিকে একবার গর্ব্ববিস্ফারিত লোচন-বিক্ষেপ করিল! সুশীলার গঙ্গাজলও সহজে হটিবার পাত্র নহে, বিশেষ সে সম্প্রতি মাত্র তাহার শ্বশুরালয় খাস্ কালিঘাট হইতে আসিয়াছে, সুতরাং হালের চাল্‌চলন সম্বন্ধে সে একটা প্রকাণ্ড নজির, এই তার বিশ্বাস। সে তার 'পাড়াগেঁয়ে' বেগুণ ফুলের এই প্রকার বিদ্রূপে জ্বলিয়া উঠিয়া কলিকাতার মেয়ে রায়েদের মেজ বধূকে শালিস মান্য করিল, কিন্তু এমন সময় ঘটক মহাশয়, "আর কত দেরী গো মেয়ে; পাত্র যে এখনি যাবেন, না গেলে তাঁর বড়ই লোকসান" ইত্যাদি বলিয়া তাড়া দিয়া গেলেন। তাড়া খাইয়া সুশীলার মা শীঘ্র শীঘ্র সাজাইবার জন্য "অকু" স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাজেই তখনকার মত এ দ্বন্দ্বটা ধামা চাপা রহিল। তবু গোলাপ ফুলটী কিরূপ ভাবে খোঁপায় দিতে হইবে, এই লইয়া আর একবার একটু আলোচনা হইয়াছিল, কিন্তু এস, পি, চাটুর্য্যের কেরাণীর পিসতুত ভাইয়ের "মাসতুত" ভগ্নী শ্রীমতী অনঙ্গমঞ্জরী "গোলাপ ফুলের ব্যবহার তোরা কোথা হতে জান্‌বি বল" বলিয়া সদর্পে উঠিয়া ফুলটী সুশীলার খোঁপার ঠিক মধ্যস্থলে গুঁজিয়া দিয়া গম্ভীর ভাবে স্বস্থানে বসিলেন! এইরূপে অতি সংক্ষেপে সুশীলার প্রসাধন ক্রিয়া সম্পন্ন হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ভট্টরাজ ভাবী পাত্রটীকে বলিতে বলিতে চলিতেছেন, "চক্ষু কর্ণের বিবাদ ত ভাঙ্গল, মশায়! এমন মেয়ে কিন্তু যা বলুন এদেশে মেলা ভার। মেয়ের মা কি স্বীকার হয়, আমি যেই মাধব শর্ম্মা, তাই ছলে কলে কোনরূপে রাজি করিয়েছি, যো সো ক'রে যেন তেন প্রকারেণ সাতপাক্‌টা দিতে পাল্লে হয়। কিন্তু খাঁইটে বড় বেশী, আর তাত হ'তেও পারে; কি জানেন,"—ভাট মহাশয়ের কথায় বাধা দিয়া পাত্র বলিলেন, "তা সে জন্য কিছু বাধছে না!" "হ্যা, হ্যা, তাই বল্‌চি, তা, তা সঙ্গে সঙ্গে আমার ব্যবস্থাটাও—""সবই হবে, ব্যস্ত কেন?" এই বলিয়া পাত্র ঘটক মহাশয়কে বলিলেন, "আমি বল্‌ছিলাম কি, কাজ কর্ম্ম ফেলে বার বার যাওয়া আসাটা বড় মুস্কিল। এ কাজটা কাল পরশ্বই সম্পন্ন করে ফেল্লে হতো না, যোগাড় ত সবই আছে! আর জানেন কি, শুভস্য শীঘ্রম্। শস্তঞ্চ গৃহমাগতঃ।" "তাত বটে, তা সে চেষ্টাও কি আমি করিনি, কিন্তু মেয়ের জন্মমাস বলে কিছুতেই রাজি হ'ল না। আর ২রা ফাল্গুনেরই বা কয়দিন বিলম্ব, মাঝে ত আর আটটা দিন বই নয়। এ কয়টা দিন,"—ঘটকের কথায় পাত্র যেন কিছু অপ্রতিভ হইয়া, "না না, তা বল্‌চিনে, তা বেশ, তাই হবে," বলিয়া আত্মসম্বরণ করিয়া লইলেন।

পথে পথেই ঘটককুলচূড়ামণি আর একটী ঘটকালি

জুটাইবার সুবিধা পাইলেন। সুধাংশুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাতুলাশ্রম এই মনোহরপুর গ্রামে। তাঁহার বয়স চব্বিশ উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত বিবাহ করেন নাই। বিবাহের সমস্ত সুস্থির হওয়ার পরেই, তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়, সে জন্য তখন সে স্থিরীকৃত সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া, তিনি নাগপুর কালেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া যান। তারপর আর প্রায় এক বৎসর দেশে আসেন নাই। সম্প্রতি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী পরীক্ষা দিয়া মাতুলাশ্রমে আসিতেছিলেন। সুধাংশুনাথকে দেখিয়াই ঘটক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভায়া যে, অনেক দিনের পর! এপর্য্যন্ত দারপরিগ্রহ করা হয় নি কি?" ইত্যাদি আলাপে সুধাংশুনাথকে আপ্যায়িত করিয়া এবং অতি সত্বরেই তাঁহার জন্য স্বর্গের অপ্সরী কুবের দুহিতা সুস্থির করিয়া দিবেন, আশ্বাস দিয়া, বিদায় লইলেন। সুধাংশুনাথের সহিত কথাবার্ত্তায় এত বড় একটী পাত্র এখনও হাতছাড়া হয় নাই জানিয়া, তিনি বড়ই উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং সহযাত্রী পাত্রটীকে এম, এ সুধাংশু নাথের গুণগ্রামের পরিচয় দিতেছিলেন; সঙ্গীর কিন্তু সেটা তেমন ভাল লাগিতেছিল না। কেন জানি না সুধাংশুনাথকে দেখিয়াই তাঁহার বুকটা যেন কাঁপিয়া উঠিয়াছিল।

ঘটক ও পাত্র বিদায় হইয়া গেলে মনোহরপুরে মেয়ে মহলে এই সম্বন্ধের ও পাত্রের সমালোচনার বড় ধুম পড়িয়া গেল। সুশীলার মার মনটাও কেমন খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল। হইলেই বা কুৎসিতা, বন্ধ্যা, চিররুগ্না, পরিত্যক্তা, তবু সতীন ত বটে? সতীনের উপর সহজে কি মায়ে প্রাণ ধরিয়া মেয়ে দিতে পারে? কিন্তু আর যে উপায় ছিল না। জাতি, ইজ্জতের ভয়, বিধবার যে বড় ভয়!

দেখিতে দেখিতে দিন চলিয়া গেল, আজ সুশীলার গাত্র-হরিদ্রা।

গায়ে হলুদ আরম্ভ হইয়াছে, এমন সময়ে বিধবার কোন পরমাত্মীয়ের নিকট হইতে পত্রসহ লোক আসিয়া উপস্থিত। সুশীলার মা ত পত্র পড়িয়াই অবাক্! তাঁহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল! বিধবা তখন মনের কষ্ট চাপিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন! তাঁহার কাতর ক্রন্দনে প্রতিবেশিগণ কারণ অনুসন্ধানে ব্যগ্র হইয়া ক্রমে তাঁহার গৃহে সমাগত হইলেন। গাত্র হরিদ্রার উদ্যোগ পণ্ড হইবার উপক্রম হইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

নির্দ্দিষ্ট দিনে যথাসময়ের কিঞ্চিন্মাত্র পূর্ব্বে সপাত্র মাধব ভাট মনোহরপুরের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। পাল্কি বেহারা, লোক লস্কর, বাদ্যভাণ্ড সংগ্রহ করিতে তাঁহাদের কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। তাই একটু দূর হইতেই পাত্রীর বাটীতে সংবাদ পাঠান হইল। প্রথম লগ্নের এক ঘণ্টা পরেই আরও একটা লগ্ন ছিল, সেই যা ভরসা! পাত্রের বরাবরই কিন্তু ইচ্ছা ছিল, গোধূলি লগ্নেই সম্প্রদান হয়, বিবিধ চেষ্টাসত্ত্বেও তাহা না হওয়ায় পাত্র মহাশয় প্রথমে বড়ই অস্থির হইয়া উঠিলেন! পদে পদে তাঁহার বিরক্তি প্রকাশ পাইতে লাগিল। শেষ যখন দেখিলেন, গোধূলির পূর্ব্বে কন্যা গৃহে, তাঁহাদের পদধূলি পড়া এক প্রকার অসম্ভব, তখন পাল্কির ভিতর কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া বসিয়া দর্পণে ঘন ঘন মুখ দেখিতে, চুল ফিরাইতে ও পান চিবাইতে চিবাইতে ভাবিতে লাগিলেন, বয়স এমনি বা কি বেশী হয়েছে, এ বয়সে কতজন যে অবিবাহিতই থাকে। সেই সেদিন যে দেখিলাম, কি নাম তার, সুধাংশু, হ্যাঁ সুধাংশুনাথই বটে—আবার সুধাংশুনাথ! সে নাম স্মরণ মাত্র তাঁর মনটা কেমন যেন হইয়া গেল! তখন চিন্তা স্রোত অন্যদিকে ফিরাইয়া; তিনি গহনার বাক্সটী খুলিলেন! অলঙ্কারের চাক চিক্যে নয়ন ঝল্‌সিয়া গেল। অর্থে অলঙ্কারে কি সুশীলার মন ভুলিবে না? তাহার পর তাঁহার কল্পনা নানা পথে ধাবিত হইয়া, শেষ বাসর গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইল! সেখানে কিরূপে আসর মাতাইতে হইবে, মনে মনে তাহার একটা খসড়া করিয়া লইলেন। সেবার বাসর ঘরে কিন্তু বড়ই,—সহসা কোথা হইতে একটী বালিকার করুণ মুখচ্ছবি তাঁহার চিত্তপটে ফুটিয়া উঠিল, চিন্তাসূত্র ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল! মুহূর্ত্তের জন্য তিনি কিছু অন্যমনস্ক হইলেন! কিন্তু সে মুহূর্ত্তেরই জন্য!

ক্রমে দ্বিতীয় লগ্নেরও সময় উপস্থিত, অথচ কন্যাপক্ষ হইতে, সংবাদ দেওয়া সত্ত্বেও এ পর্য্যন্ত কেহ তাঁহাদের আদর অভ্যর্থনায় অগ্রসর হইল না দেখিয়া পাত্র স্বয়ং এবং ঘটক পর্য্যন্তও বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন! দুই চারিবার হাই তুলিয়া ঘড়ি খুলিয়া, যখন দেখিলেন, আর আধঘণ্টা মাত্র সময় আছে, তখন পাত্র মহাশয় পাল্কী তুলিতে হুকুম দিলেন! পর্ব্বত যখন নিতান্তই নিকটে আসিল না, তখন মহম্মদই

পর্ব্বতের নিকটে যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। আর কন্যাপক্ষের কেইবা আছে, তাই আসিবে? এ কথাটাও এতক্ষণ মাথায় আসে নাই, ভাবিয়া নিজের বুদ্ধিকে স্বগতে নিন্দা করিয়া ঝাড় জ্বালাইয়া, হাউই ছুটাইয়া, তুবড়ির ফুল খেলাইয়া, ব্যোম ফুটাইয়া, ব্যাণ্ড বাজাইয়া, ক্ষুদ্র গ্রামখানিকে তোলপাড় করিতে করিতে টোপর মাথায় পাত্রপ্রবর, নদী যথা ধায় সিন্ধুপানে, পাল্কী হাঁকাইয়া কন্যার গৃহাভিমুখে ছুটিলেন! পাল্কী দ্বারে পৌছিল। ঘটক মাধব ভট্ট, 'আথি বিথি' গৃহে প্রবেশ করিতেছিলেন, সম্মুখে, যে বসিয়াছিল, সে বলিল, "কে? ঘটক ঠাকুর যে, আর কেন?"

কথাটা পাত্রের কাণেও গেল! সঙ্গে সঙ্গে "সালঙ্কারাং—কন্যাং * * * তুভ্যমহং সম্প্রদদে" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণও শুনা গেল। আর একটা পরিচিত নাম, এই বর-বেশী আগন্তুকের শ্রবণ-বিবর বিদীর্ণ করিয়া মরমে পশিল। হায়! সুধাংশুনাথ! তখন বর-বেশী, আকুলকণ্ঠে, জড়িতস্বরে ডাকিলেন—"ঘ—ট—ক!"

শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী ও তদীয় শিষ্য শ্রীনিবাস আচার্য্য।

অতঃপর গোপালভট্টসহ শ্রীনিবাসের মিলনবৃত্তান্ত লিখিত হইতেছে। শ্রীনিবাস বৈশাখী পূর্ণিমার সন্ধ্যাকালে শ্রীবৃন্দাবনে সমুত্তীর্ণ হইয়া জীবগোস্বামিপ্রভুর কুটিরে রাত্রি যাপন করেন। অনন্তর রজনী অবসান হইলে প্রাতঃস্নান করিয়া তিনি জীব গোস্বামীর চরণে প্রণাম করিলেন। জীব, শ্রীনিবাসকে সপ্রেমে আলিঙ্গন পূর্ব্বক শ্রীর[illegible]মোদর বিগ্রহ দর্শন করাইয়া শ্রীরূপ গোস্বামীর [illegible]স্থানে লইয়া গেলেন।

"শ্রীনিবাস শ্রীসমাধি দর্শন করিয়া।
নেত্রজলে ভাসে ভূমে পড়ে প্রণমিয়া॥
ভক্তি রত্নাকর।

অনন্তর তাঁহারা শ্রীগোপালভট্টের কুটীরে উপনীত হইলেন। যথা ভক্তি রত্নাকরে;—

"শ্রীভট্ট গোস্বামী বসি আছেন নির্জ্জনে।
নিরন্তর অশ্রুধারা বহে দুনয়নে॥
শ্রীনিবাস শ্রীভট্ট গোস্বামী পানে চাইয়া।
হইলা অধৈর্য্য ভূমে পড়ে লোটাইয়া॥
পুনঃ পুনঃ প্রণময়ে নেত্রে ধারা বয়।
শ্রীজীব দিলেন শ্রীনিবাস পরিচয়॥
যদ্যপি দগ্ধয়ে ভট্ট বিচ্ছেদ অগ্নিতে।
তথাপি আনন্দ শ্রীনিবাস নিরখিতে॥"

শ্রীনিবাস গোস্বামীর চরণতলে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। ভট্ট গোস্বামী শ্রীনিবাসের পৃষ্ঠদেশে হস্ত ও মস্তকে চরণ প্রদান করিয়া বলিলেন, বাবা শ্রীনিবাস! এত বিলম্ব করিয়া কি আমাকে ক্লেশ দিতে হয়? আমি যে বৃদ্ধ হইলাম, তবু তুমি আসিলে না। রূপ সনাতনের বিরহে আমার হৃদয়ে দারুণ শেলবিদ্ধ হইয়াছে, দেহ অস্থিমাত্র সার হইয়াছে। বাবা! তোমাকে দেখিবার জন্য সকলেরই একান্ত ইচ্ছা ছিল। হায়! তোমার ভাগ্যে রূপসনাতনের দর্শন লাভ ঘটিল না। মহাপ্রভু তোমার বিষয়ে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, এই দেখ, তাহা সযত্নে রক্ষা করিয়াছি। এই দেখ মহাপ্রভুর ডোর ও আসন। এই আসনে বসিয়া তোমাকে মন্ত্রদীক্ষা দিব মনে করিয়া তোমার অপেক্ষা করিতেছি।" শ্রীনিবাস মহাপ্রভুর হস্তাক্ষর এবং তাঁহার ডোর ও আসন দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন। এবং কেন এতদিন আসিতে পারিলেন না, সেই সমস্ত বিবরণ আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলেন। ভট্ট গোস্বামী বলিলেন;—

"বাপু তুমি ভাগ্যবান মুঞি ভাগ্য হত।
সেই সব অপরাধে দুঃখ পাই এত॥
না হইল নিত্যানন্দ চরণ দর্শন।
না দেখিনু অদ্বৈতচন্দ্র বিফল জীবন॥
ঈশ্বরীর পদযুগ না দেখিল আর।
সরকার ঠাকুর দয়া না করিল একবার॥"
"এবে অদর্শন দুই রূপ সনাতন।
কাষ্ঠ পাষাণ করি বিধি গড়ল মোর মন॥"
প্রেমবিলাস।

জীব গোস্বামী শ্রীনিবাসের দীক্ষার কথা উত্থাপন করিলে ভট্ট গোস্বামী বলিলেন, আগামী কল্য দ্বিতীয়া তিথিতে শ্রীনিবাসের দীক্ষা হইবে। তদনন্তর শ্রীনিবাস জীব গোস্বামীর সমভিব্যাহারে শ্রীরাধা চরণ দর্শনার্থ যাত্রা করিলেন। অতি মনোহর শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে শ্রীনিবাসের চিত্ত পুলকিত হইল। পরে জীব, শ্রীনিবাসকে লোকনাথ ও ভূগর্ভ গোস্বামীর সন্নিধানে উপস্থিত করিলেন।

"শ্রীনিবাস বন্দিলেন দোঁহার চরণ।
দোঁহে অতি বাৎসল্যেতে কৈল আলিঙ্গন॥
কোলে হৈতে ছাড়িতে নারয়ে প্রেমাবেশে।
নেত্রজলে সিক্ত করিলেন শ্রীনিবাসে॥"
ভক্তিরত্নাকর।

এখান হইতে শ্রীনিবাস শ্রীরাধাবিনোদ, শ্রীগোপীনাথ ও মদনমোহন বিগ্রহ দর্শন করিলেন; এবং ক্রমে ক্রমে

ব্রজবাসী বৈষ্ণব সাধুগণের সঙ্গে মিলিত ও পরিচিত হইয়া আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিলেন। পরে ভক্তগণের সঙ্গে তিনি সনাতন গোস্বামীর সমাধিভূমি দর্শনে গমন করিলেন।

জীব গোস্বামী এখান হইতে শ্রীনিবাসকে স্বীয় আশ্রমে লইয়া আসিলেন, এবং কল্য শ্রীনিবাসের দীক্ষা হইবে, এই কথা সকলকে জ্ঞাপন করিলেন।

পরদিন দ্বিতীয়া, শ্রীনিবাসের দীক্ষার দিন। তাঁহার হৃদয় সুবিমল আনন্দ এবং উৎসাহে পরিপূর্ণ। তিনি আপনার এই সৌভাগ্যের দিন স্মরণপূর্ব্বক আনন্দাশ্রুতে পরিষিক্ত হইয়া প্রাতঃস্নান করিলেন। তৎপরে জীব গোস্বামীর সঙ্গে যথাকালে ভট্ট গোস্বামীর সমীপস্থ হইয়া তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন, এবং তথা হইতে সকলে শ্রীরাধারমণের মন্দিরাভিমুখে চলিলেন। শ্রীনিবাস শ্রীমন্দিরের সম্মুখে ভট্টের বামভাগে যথাবিধানে উপবেশনপূর্ব্বক তাঁহার পদযুগল ধারণ করিয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিলেন। পরে তুলসীমঞ্জরী ও মাল্যচন্দন দ্বারা শ্রীরাধারমণের অর্চ্চনা করিলেন। অনন্তর ভট্ট গোস্বামী তাঁহাকে মন্ত্রদীক্ষা প্রদান করিয়া সাধনপ্রক্রিয়া সকল শিক্ষা দিলেন, এবং শ্রীরাধারমণ ও শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, তোমার সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হউক। এই সময় ভট্ট গোস্বামী শ্রীনিবাসকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, প্রেমবিলাস গ্রন্থে তাহা এইরূপে লিখিত হইয়াছে ;—

"এই সব মন্ত্র তুমি করিবে স্মরণ।
সেই কালে তদাশ্রয়ে করিবে মনন॥
গুণমঞ্জরিকাশ্রয়ে মণিমঞ্জরিকা তুমি।
তোমার যথের বিবরণ কহি সব আমি॥
রূপগুণ রাগ [illegible] ফুল।
এই সব সঙ্গে সঙ্গী এই অনুকূল॥
সেবা রাগাত্মিকা রাগ ভজনের মত।
শ্রীরূপ গোসাঞির বাক্য আছয়ে সম্মত॥
সেবা নাম সাধকের যত বড় আর্ত্তি।
তাহা সিদ্ধ হৈলে হয় এই সব প্রাপ্তি॥
সাধন করয়ে দেহ সাধক নাম হয়।
সখীর আশ্রয় সিদ্ধি জানিহ নিশ্চয়॥
চতুঃষষ্টি অঙ্গ সাধন কহিল অনেক।
আনুকূল্য প্রাতিকূল্য বুঝিবে পরতেক॥
প্রাতিকূল্য যে হয় তারে করিবে বর্জ্জন।
আনুকূল্য সেবা হয় প্রাপ্তির কারণ।
সেবা নামাপরাধ যত রক্ষার কারণ।
অন্তরে প্রবেশি হানি করয়ে ভজন॥
কৃষ্ণভক্তির অঙ্গ হয় সাধনের প্রাপ্তি।
অন্যমত করিলে সাধন উড়ি যায় কহি।
কৃষ্ণে মন কৃষ্ণপ্রাপ্তি হবার কারণ।
সেই অঙ্গ করে তাহে প্রাপ্তি নিরূপণ॥
কিসে অপরাধ হয় শুন শ্রীনিবাস।
বিস্তারিয়া কহি আমি করিয়া প্রকাশ॥
না করে ভক্তির অঙ্গ নিন্দয়ে আপনে।
প্রাপ্তি নাহি হয় তার যায় অন্য স্থানে॥
বটবীজ ক্ষুদ্র অতি বৃক্ষ অতি হয়।
অপরাধ দিনে দিনে বাড়িয়া পড়য়॥
দেবতা নিন্দন জীবে দুঃখ আদি যত।
ইথে না লুব্ধচিত্ত যার ভক্তি হয় তত॥
যখন দেখিবা শাস্ত্র তখনে জানিবা।
সেইক্ষণে মোর বাক্য সত্য করি লবা॥
এই পথে পথী হৈলে হৈও সাবধান।
কৃষ্ণভজন সাধু শাস্ত্রে ইহার প্রমাণ॥"

দীক্ষা লাভ করিয়া শ্রীনিবাস যেন প্রজ্ঞাচক্ষু প্রাপ্ত হইলেন এবং আপনাকে কৃতার্থন্মন্য জ্ঞান করিয়া প্রেমানন্দে বিস্ফারিত হইলেন। চন্দনচর্চ্চিত ও পুষ্পমাল্যশোভিত হইয়া তাঁহার দিব্য শ্রীলাভ হইল। প্রেম-পুলকে গদগদ হইয়া শ্রীনিবাস অতি দীনভাবে প্রথমতঃ গুরুদেব ও পরে জীব গোস্বামীর চরণরেণু গ্রহণ করিলেন। এই দীক্ষা উপলক্ষে ব্রজবাসী বহুসংখ্যক বৈষ্ণবের সমাগমে শ্রীরাধারমণ মন্দিরে মহামহোৎসব হইয়াছিল।

দীক্ষার পর শ্রীনিবাস গুরুদেবের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কোন কোন দিন তিনি রন্ধন করিয়া ভট্টকে ভোজন করাইতেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, ১৫০৯।১০ শক পর্য্যন্ত গোপাল ভট্ট জীবিত ছিলেন। কবিরাজ গোস্বামী "গোপাল ভট্ট সূচকে" এই মহাত্মার অনেক গুণগরিমা গান করিয়াছেন।

"নিরবধি হরিভক্তিখ্যাপনে বস্তু শক্তিঃ
সতত সদনুভূতিনশ্বরার্থে বিরক্তিঃ।
প্রভুবরগতি সৌভাগ্যেন বিখ্যাত পটুঃ
স্ফুরতু হৃদি মে গোস্বামিগোপালভট্টঃ॥১
ব্রজভূমি গুণমঞ্জর্যাখ্যায়া যঃ প্রসিদ্ধঃ
কলিজন করুণাবির্ভাবকেন প্রযুক্তঃ।
মধুররস বিশেষাহ্লাদ বিস্তারণায়
স্ফুরতু স হৃদি মে গোস্বামিগোপালভট্টঃ॥২
অবিরল গলদশ্রুঃ স্বেদধারাভিরামঃ
প্রচুর পুলক কম্পস্তম্ভ উচ্চার্য্যনাম।
হরি-হ হ হ হরীত্যদ্যক্ষরাদ্যোঽন্তচেতাঃ
স্ফুরতু স হৃদি মে গোস্বামিগোপালভট্টঃ॥৩
ব্রজগর্ভনিজভাবাস্বাদনাস্বাদ্যমাদ্যন্
নটতি হসতি গায়ত্যুন্মদং বিভ্রমাঢ্যঃ।
কলিত কলিজনোদ্ধারাজ্ঞয়া বাহ্যদৃষ্টঃ
স্ফুরতু স হৃদি মে গোস্বামিগোপালভট্টঃ॥৪
বিদিত পদপদার্থঃ প্রেমভক্তেরসার্থঃ
শ্রিতরতিরসভেদাস্বাদনে যঃ সমর্থঃ।
ইদমখিলতমোঘ্নং স্তোত্ররত্নং প্রধানং
পঠতি ভবতি সোঽয়ং মঞ্জরী যূথলীনঃ॥৫"

শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়।

হোলি-কাহিনী।

—:○:—

(গাথা)

ফিরিয়া আসিছে মথুরাপ্রসাদ,
ব্যবসা করিয়া।
বহুদিনান্তে হোলির সময়
আর কি প্রবাসে তিষ্ঠে হৃদয়?
সে যে করিয়াছে দিবস-গননা
বরষ ধরিয়া।

গৃহে তার লাগি প্রণয়িণী-বালা
চাহিয়া আছে পথ।
কখন্ হেরিবে মুখ খানি তার,
শুনিবে কণ্ঠবীণা-ঝঙ্কার,
তনুলতা খানি বাঁধিবে হৃদয়ে;
পূরিবে মনোরথ!

অশ্বারোহণে ক্ষিপ্রগমনে,
গিয়াছে দশদিন।
একদিন আর ;—পথ হবে শেষ,
ঘুচিবে দীর্ঘ প্রবাসের ক্লেশ ;
বিরহ-আঁধার, সুখ-মিলনের
আলোক হবে লীন।

দিবাশেষে যুবা উপনীত হয়
শোণ-নদের তীর।
বিস্তৃত বালু'ভূমি সমতল,
তারি মাঝখানে শীর্ণ শীতল
সবুজ একটি মন্দ প্রবাহ
ক্ষুদ্র-লহরীর।

ওপারে দাঁড়ায়ে মলিন-বসন
কৈলোয়ার গ্রাম।
সেখানে বন্ধু কিষণপ্রসাদ,
ভাবিল মথুরা—"বিষম প্রমাদ,
প্রভাতে কল্য নাহি ছাড়ে যদি,—
বিপদে পড়িলাম।"

রজনী আগত, বন্ধুগৃহেই
অতিথি হ'তে যায়।
বহু দিন পরে বন্ধু পাইয়া
কিষণপ্রসাদ উলসিত হিয়া ;
কত আনন্দে হসিত বদনে
সম্ভাষে তাহায়।

কাটে দুজনার গল্প আলাপে
অর্দ্ধ-যামিনী।
গল্প কেবল মথুরাপ্রিয়ার,
স্নেহ ভালবাসা নবীন-হিয়ার,
সামান্য কথা, তুচ্ছ ঘটনা,—
তাহারি কাহিনী।

কিষণপ্রসাদ ঘুমাইয়া পড়ে ;
মথুরা জাগিয়া ;
হৃদয় তাহার দুরু দুরু করে,
শোণিত-প্রবাহ ছুটে বেগভরে,
কাটে না রজনী ক্ষণ গণি গণি
প্রভাত লাগিয়া।

পোহাইল নিশা এইরূপে ক্রমে,
গেল অন্ধকার।
মথুরাপ্রসাদ মাগিল বিদায়,
কিষণ শুনিয়া হাসিয়া লুটায় ;—
"আজি যাবে তুমি? ইহার অধিক
পারিবে কেন আর!

"বিবাহ করেছ বলে কি বন্ধু
এমনি হ'তে হয় ?
নব-প্রণয়নী পেয়েছ বলিয়া,
সকল কিছু কি যাইবে দলিয়া ?
আমাদের সেই শৈশব-প্রেম,
তাহা কিছু কি নয় ?

"আজি নহে, কাল ;—এইত ব্যাপার—
মিলিবে প্রিয়াসাথ।
একটি দিনে কি হৃদয় তোমার
বিরহ-বজ্রে হবে চুরমার ?
সেই কি পড়িয়া মরিয়া যাইবে
ডাকিয়া—'কোথা নাথ !'

উৎসব আজি, হোলির এদিনে
ছাড়ি কি হে তোমায় ?
এত সঙ্গীত, এত পরিহাস,
আতর গোলাপ, সুখ-উচ্ছ্বাস,
আবির অভ্র, মিঠাই মসালা
যাইবে কি বৃথায় ?"

কাতর মথুরা কহিলা যা কিছু,
ভেসে গেল সকল।
চতুর কিষণ করিল প্রমাণ,
নব প্রণয়ীরা বাতুল সমান,—
তাহাদের শত বেদনা-উৎস
কল্পিত কেবল।

বিষণ্ণমন মথুরাপ্রসাদ
করিবে কিবা আর ?
সারা দিনমান উৎসব মাঝে
উল্লাস-প্রাণ বন্ধু-সমাজে,
হাসিহীন মুখে দিল যোগদান,
নয়নে জলভার।

সে যে হায় তারে বলে এসেছিল
নিশ্চিত বচন ;—
"বৎসর কাল থাকি না যেথায়,
হোলির রাত্রে, সখি, পুনরায়
আসিব ফিরিয়া, চুম্বিব তোর
চন্দ্রসুধানন।"

সারা বৎসরের আশা তাহার
চূর্ণ হবে আজ !
ভাবিল "প্রিয়া গো কোমল হৃদয়,
আমি নিতান্ত পাষাণ নিদয় ;
তোমারে বক্ষে ব্যথা দিয়ে, হেথা
হইকরিতেছি বিরাজ।"

* * *

যবে রজনী তৃতীয় প্রহর
পূর্ণ হ'ল প্রায় ;
কাল-বিসূচিকা, ব্যাঘ্রের মত,
আসিয়া ধরিল নিদ্রাবিরত,
উৎকণ্ঠিত, গমনোদ্‌যোগী,
ব্যাকুল মথুরায়।

প্রবীণ বৈদ্য করিল গ্রহণ
চিকিৎসার ভার।
কখনো মৃত্যু, কখনো ভিষক্,
মনে হল বুঝি হবে পলাতক ;—
তিনটি প্রহর যুদ্ধ করিল
সাধ্য যত যার।

যখন সূর্য্য উচ্চ গগনে
করিল আরোহণ,
মৃত্যু হাসিল রক্তনেত্র,
আস্ফালি করে লৌহবেত্র,
বাজিল তাহার বিজয় ডঙ্কা,
জিনিল ঘোর রণ।

* * *
* * *

পর বৎসর আসিল আবার
বসন্ত নবীন।
হোলির বাদ্য আবার বাজিল,
কিষণপ্রসাদ নীরবে কাঁদিল,
আপন কক্ষে যাপিল গোপনে
দীর্ঘ সারাদিন।

ক্রমে দিনমণি ঢলিয়া পড়িল,
দিবস আসন।
উৎসব-গৃহে সাহানার সুর
বাজিতে লাগিল দ্রুত সুমধুর,
আসিল সন্ধ্যা বাধি অঞ্চলে
কনক শশী খান।

রজনী হইল দ্বিতীয় প্রহর,
নিতান্ত নীরব।
কিষণ একাকী তখনো জাগিয়া,
অনুতাপানলে দহিতেছে হিয়া ;
চমকি উঠিল শুনি যেন কোন
দূরোত্থিত রব।

খুলি গবাক্ষ দেখিল চাহিয়া,
শোণের কিনারে,
জ্বলেছিল যেথা চিতা মথুরার,
সেখানে কে যেন করি চীৎকার,
ফিরিছে ছুটিয়া বলিতে বলিতে
"যেতে দিলে না রে।"

কিষণপ্রসাদ শুনিতে লাগিল
"যেতে দিলে না রে।"
চন্দ্রতারকা অশ্রুনয়ানে
চাহি চাহি যেন তারি মুখ পানে,
শতবার করি বলিতে লাগিল,
"যেতে দিলে না রে।"

সকল রাত্রি থামিল না সেই
"যেতে দিলে না রে।"
আজিও সেখানে প্রতি বৎসর
হোলিরজনীতে জাগে সেই স্বর,
তীব্র-কাতর আর্ত্তনিনাদ—
"যেতে দিলে না রে।"

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

মিষ্‌মী জাতি।

মিষ্‌মী নামক অসভ্য জাতি আসামের উত্তর পূর্ব্ব অংশে বাস করে। দক্ষিণে ইরাবতী নদীর শাখা নেম্‌লাং পর্য্যন্ত ইহাদের বসতি দেখা যায়। ইহাদের উপনিবেশ সকল দাফাভূম নামক বৃহৎ পর্ব্বতের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গিয়া তৎপরে ব্রহ্মপুত্র নদের উপত্যকা দিয়া পর্ব্বতের সীমান্তে পৌছিয়াছে। পশ্চিমে তাহাদের বাসস্থান দিগারু নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ব্রহ্মপুত্রের শাখা দু নদীর পশ্চিমে স্থিত মিষ্‌মীগণ ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য করে; উক্ত নদীর উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত মিষ্‌মীগণ কেবল তিব্বতীয়দিগের সহিত বাণিজ্য করে। প্রথমোক্ত মিষ্‌মীরা ধীর ও নিরীহ প্রকৃতি ; কিন্তু অতিশয় চতুর ব্যবসায়ী। শেষোক্তেরা ইংরাজের শত্রুতাচরণ করে।

মিষ্‌মীদের দেশ পার্ব্বত্য। উহার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর। পার্ব্বত্য নদী সকল পার হইবার জন্য ইহারা একপ্রকার ঝুলান সেতু ব্যবহার করে। যেখানে নদীটি উভয়তীরস্থ শৈলরাজি দ্বারা অতি সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ, সেইখানেই এই সকল সেতু নির্ম্মিত হয়। তিন চারিটি বেত একত্র জড়াইয়া রজ্জু রচনা করিয়া উহা নদীর উভয় পার্শ্বে বৃক্ষ বা শৈলে বাঁধিয়া ফেলা হয়। রজ্জুটি যতদূর সম্ভব জোরে টানিয়া সোজা করিয়া বাঁধা হয়। এই রজ্জুতে একটি বেত বৃত্তাকারে ঝুলাইয়া রাখা হয়। তিতীর্ষু ব্যক্তি ঊর্দ্ধমুখে ইহার মধ্যে শরীরটি রাখিয়া বৃত্তটিকে রজ্জুর উপর পিছলিয়া যাইতে দেয়। বৃত্তটি শীঘ্রই রজ্জুর মধ্যস্থলে উপনীত হয়। তাহার পর পথিককে হাত ও পায়ের দ্বারা বৃত্তটিকে রজ্জুর উপর সরাইয়া সরাইয়া তীরে পৌছিতে হয়।

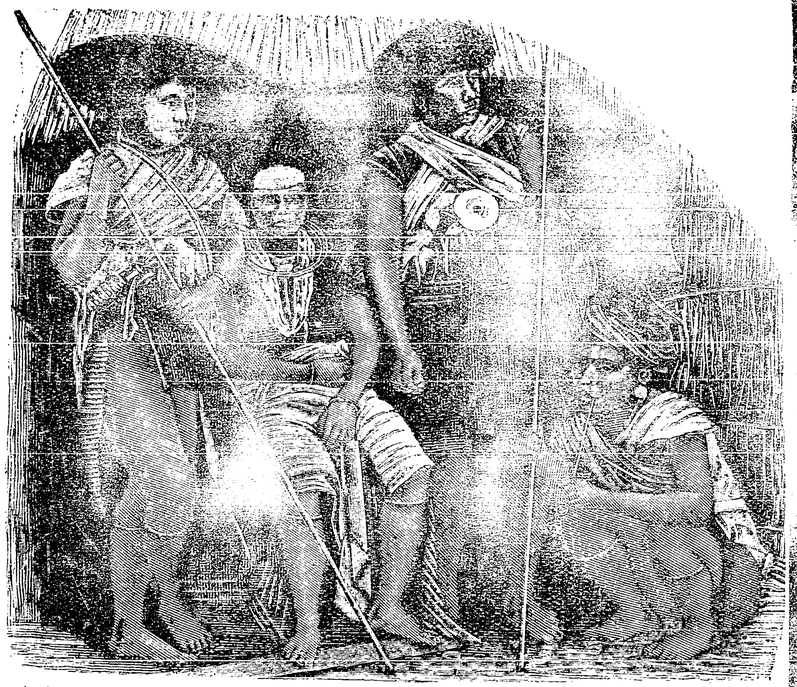

মিষ্‌মীদের বস্তিগুলিতে কয়েকটি করিয়া গৃহ থাকে, কখন কখন একটি মাত্র গৃহ থাকে। কিন্তু এই গৃহগুলি এত বড় যে,একটিতেই এক পরিবারের সমুদয় লোক এবং তাহাদের দাস এবং অনুচরগণ বাস করিতে পারে। ডাক্তার গ্রিফিথ্‌স্ গালোম্ গাম্ নামক এক দলপতির গৃহের নিম্নলিখিত রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা দৈর্ঘ্যে ৮৮ হাত এবং প্রস্থে ৮ হাত। ইহা মাটী হইতে উঁচুতে বাঁশ দ্বারা নির্ম্মিত এবং বারটী কক্ষে বিভক্ত। ইহাতে ১০০ স্ত্রীলোক, পুরুষ ও বালকবালিকা বাস করে। ক্রোষা নামক আর একজন দলপতির গৃহ আরও বড় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহা কুড়িটি কক্ষে বিভক্ত। সমুদয় গৃহে প্রবেশ করিবার জন্য একটি দীর্ঘ বারাণ্ডা আছে। ইহার দক্ষিণে ক্রোশা কর্ত্তৃক স্বহস্তে [illegible] মিথুন, হরিণ ও শূকরের মাথার খুলি এবং বামে গৃহস্থালীর বাসনকুসন। পূর্ব্বতন দলপতিগণ কর্ত্তৃক নিহত জন্তুর মস্তক রক্ষা করাটা সম্ভ্রান্ত রীতি বলিয়া বিবেচিত হয় না। প্রত্যেক কক্ষে একটি করিয়া উনান আছে এবং তাহার উপর ধূমযোগে সংরক্ষণার্থ একটি পাত্রে মাংস ঝুলান থাকে। এই গৃহটি বস্তির প্রধান আড্ডা। শস্য রাখিবার জন্য গোলাঘর সকল ইহা হইতে দূরে অবস্থিত।

বাণিজ্য ব্যবসায়ের জন্য মিষ্‌মীরা প্রায়ই ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহারা তাহাদের প্রতিবেশীদের মত চাষবাসে অধিক মন দেয় না; কিন্তু তাহাদের অনেক পশুপাল আছে। তাহারা প্রতি বৎসর আসামে গরু ক্রয় করে, তদ্ভিন্ন তাহাদের মিথুন নামক পার্ব্বত্য গরু আছে। মিথুনকে তাহারা "চা" কহে। পত্নীসংখ্যার পরেই প্রধানতঃ মিথুনের সংখ্যাতেই মিষ্‌মীদের ধনশালিতার পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষিকার্য্যে অথবা দুগ্ধের জন্য মিথুন ব্যবহৃত হয় না। পর্ব্ব বা ঘটা উপলক্ষে মিথুন বধ করিয়া তাহার মাংসাহার করা হয়; এবং বিবাহের সময় মিথুনের বিনিময়ে কন্যা ক্রয় করা হয়। মিথুনগুলি প্রায় বন্য অবস্থায় জঙ্গলে চরিয়া বেড়ায়; কিন্তু তাহাদের প্রভুরা তাহাদিগকে লবণ খাওয়ায়, এবং ডাকিলে তাহারা মনিবের স্বর চিনিতে পারে।

মিষ্‌মীদের ধনাগমের প্রধান উপায়, বন্য একোনাইট মূল, ঔষধরূপে ব্যবহৃত মিষ্‌মীতিতা নামক তিক্ত উদ্ভিদ্, এবং কস্তূরীমৃগের মৃগনাভি বিক্রয়। এই সমুদয় সামগ্রী এবং তিব্বত হইতে আনীত কয়েক প্রকার বাসন ও পশমী জিনিষ লইয়া তাহারা প্রতিবেশী পার্ব্বত্যজাতি এবং আসামীদিগের সহিত বাণিজ্য করে। মিষ্‌মী ব্যবসায়ীরা সঙ্গে যাহা কিছু লইয়া বেড়ায়, সমুদয়ই, এমন কি পরিধেয় বস্ত্রটী পর্য্যন্ত, দরে পোষাইলে বিক্রয় করে।

ইহাদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। প্রত্যেক পুরুষে যতগুলি স্ত্রী ক্রয় করিতে পারে, ততগুলিকে বিবাহ করিতে পারে। পণ একটি শূকর হইতে ৩০টি বৃষ পর্য্যন্ত। কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার স্ত্রীগণ উত্তরাধিকারীর সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হয়; কেবল উত্তরাধিকারীর মাতা নিকটতম সম্পর্কীয় পুরুষের অধিকারে আইসে।

যখন কোন স্ত্রীলোকের প্রসবকাল আসন্ন হয়, তখন

তাহার জন্য গৃহের নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে একটি কুঁড়েঘর নির্ম্মিত হয়। প্রসব হইয়া অশৌচকাল গত হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে সেই কুঁড়েঘরে থাকিতে হয়। পুত্র জন্মিলে অশৌচকাল ১০ দিন, কন্যা জন্মিলে ৮ দিন।

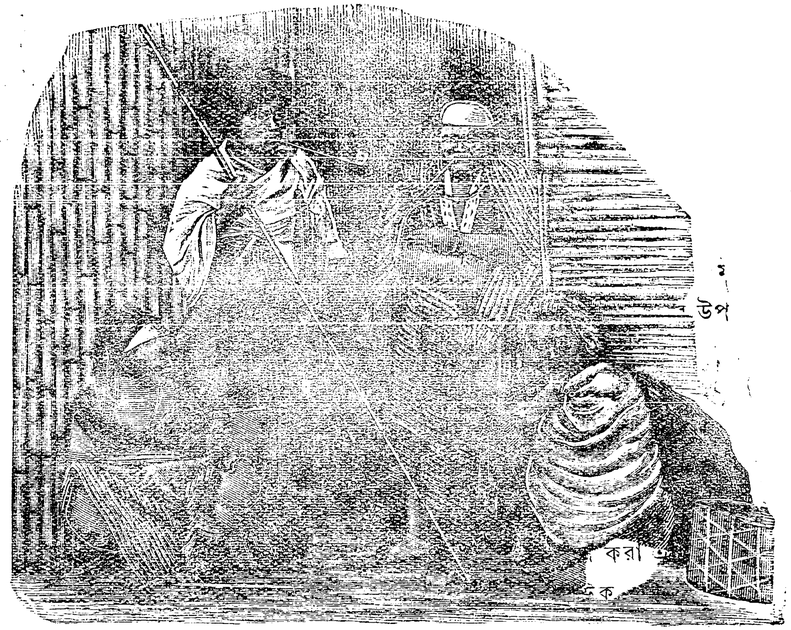

পীড়া বা বিপদের সময় ভূতের তুষ্টিসাধনেই তাহাদের ধর্ম্মাচরণ পর্য্যবসিত। এই প্রকার ধর্ম্মাচরণ উপলক্ষে গৃহদ্বারে একটি পল্লব রক্ষিত হয়। উহা দেখিলেই আগন্তুকেরা বুঝিতে পারে যে আপাততঃ উক্ত গৃহে প্রবেশ বা গৃহবাসীদিগের সহিত মিশামিশি নিষিদ্ধ। দয়ালু সর্ব্বাধীন কোন দেবতার জ্ঞান তাহাদের নাই। তাহারা সংহর্ত্তা "মুজিদাগ্রাঃ", জ্ঞান ও শিকারের দেবতা "দামি পাওঁ", রোগ ও ধনের দেবতা "তাব্‌লাঃ" এবং অনামা আরও অনেক দেবতার পূজা করে। তাহাদের পুরোহিতের সংখ্যা অতি কম। ক্রিয়াকলাপ উপলক্ষে অনেক দূর হইতে উহাদিগকে আনিতে হয়।

তাহাদের একজন দলপতির স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কিরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহার নিম্নলিখিত বর্ণনা হইতে মিষ্‌মীদিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা হইবে। মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই স্ত্রীলোকটি মৃত্তিকাতে প্রোথিত হয়। তাহার তিনমাস পরে "শ্রাদ্ধ" হয়। কবরটি গৃহের নিকটেই ছিল। উহার উপর একটি ছাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ছাদের নীচে মৃতনারীর পরিচ্ছদ এবং পানপাত্র রক্ষিত হইয়াছিল। পুরোহিতের আগমনের কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই একটি ক্ষুদ্র ঘণ্টাধ্বনি সহযোগে বিষাদসূচক একটি ধর্ম্মসঙ্গীত গাহিবার জন্য একজন লোক নিযুক্ত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত এক জোড়া লাল কুক্কুট কুক্কুটীর প্রারম্ভিক বলিদানও হইয়াছিল। ইহাদের রক্ত আংশিক ভাবে অন্য একপ্রকার তরল পদার্থপূর্ণ একটি পাত্রে ধৃত এবং মিশ্র পদার্থটি সাবধানে পরীক্ষিত হয়। কারণ তাহাদের বিশ্বাস এই যে, এতদ্দ্বারা ফলের শুভাশুভত্ব নির্ণীত হইতে পারে। পরিশেষে সাধারণ একজন দলপতির মত পোষাক পরিয়া পুরোহিত উপস্থিত হইলেন। অধিকন্তু তিনি গলদেশে কড়ির মালা এবং শিরশ্ছদের সম্মুখে দুইটি শৃঙ্গের মত জিনিষ পরিয়াছিলেন; থাকিয়া থাকিয়া দুইদিন ধরিয়া পুরোহিত ও তাঁহার পুত্র তালবৃন্ত ব্যজন ও ঘণ্টাধ্বনিসহকারে গান করিতেছিলেন। তৃতীয় দিবসে পুরোহিত দলপতির বেশ পরিত্যাগ করিয়া পুরোহিতের বেশ ধারণ করিলেন। পোষাক কতকটা এইরূপ,—গায়ে একটি আঁট রঙ্গীন কার্পাসসূত্রের কোট, চোগার মত পরিহিত একটি হরিণচামড়া, দক্ষিণস্কন্ধ হইতে বিলম্বিত

রক্তবর্ণে রঞ্জিত ছাগলোমের একটি লম্বা ফিতারমত জিনিষ, এবং বামস্কন্ধের উপর দিয়া পরিহিত একটি চৌড়া বেল্ট। বেল্টটি ৪সারি বাঘের দাঁত দ্বারা বিভূষিত ছিল এবং ১৪টি ক্ষুদ্র ঘণ্টা ইহাতে লাগান ছিল। পুরোহিত মাথায় কড়ি দ্বারা ভূষিত একটি ফিতা এবং মাথায় ঝুঁটিতে বায়ুভরে ঘূর্ণ্যমান একটি পাখীর পালক পরিয়াছিলেন।

অতঃপর পৈশাচিক তাণ্ডব। এই নৃত্যের উদ্দেশ্য যতটা সম্ভব কোলাহল করিয়া ভূত তাড়ান। ইহার পর সমুদয় আলোক নির্ব্বাপিত হইল। সকলেই অন্ধকারে কিয়ৎক্ষণ যাপন করার পর, ছাদ হইতে শূন্যে দোদুল্যমান একব্যক্তি চক্‌মকি পাথর দ্বারা নূতন আলোক জ্বালিল। আলো জ্বালিবার সময় যাহাতে মাটি ছোঁয়া না যায়, তদ্বিষয়ে এই ব্যক্তিকে বিশেষ সাবধান থাকিতে হয়; কারণ এবম্প্রকারে প্রাপ্ত আলোক সাক্ষাৎভাবে স্বর্গ হইতে প্রাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হয়।

যখন কোন সম্পন্ন ব্যক্তির [illegible] হয়, তখন অনেক জন্তু নিহত হয় এবং তাহাদের মা[illegible] কবরের চারিদিকে সাজাইয়া রাখা হয়। কবরের উপর নির্ম্মিত ছাদের নীচে প্রেতাত্মার জন্য পক্ক ও আম মাংস, শস্য এবং সুরা স্থাপিত হয়; এতদ্ব্যতীত মৃতব্যক্তির সমুদয় পরিচ্ছদ ও অস্ত্রশস্ত্রাদিও তথায় রাখিতে হয়। দরিদ্র লোকেরা বিশেষ কোন ধর্ম্মাচরণ না করিয়া মৃতব্যক্তির দেহ পুড়াইয়া ফেলে বা নদীতে নিক্ষেপ করে।

মিষ্‌মী পুরুষেরা বঙ্গদেশীয় নিম্নশ্রেণীর লোকের মত একটা ছোট কাপড় কোমরে জড়াইয়া কাছা দিয়া পরে, এবং গলা হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বা একটা আস্তীন বিহীন কোট গায়ে দেয়। এই কোট প্রস্তুত করিবার প্রণালী সহজ। একটুকরা নীল এবং লাল বা কটা ডোরাযুক্ত লম্বা কাপড় দুভাঁজ করিয়া থলির মত তাহার দুই পার্শ্ব সেলাই করা হয়। কেবল হাত গলাইবার জন্য দুই পার্শ্বে কিছু যায়গা ছাড়িয়া দেওয়া হয়। গলা প্রবেশ করাইবার জন্য কাপড় বুনিবার সময়ই মাঝখানটা একটু চেরা থাকে।— খাসিয়াপর্ব্বতে আমার এক ধর্ম্মপ্রচারক বন্ধু আছেন। তিনি একবার আমাকে এইরূপ একটী মোটা সাদা কাপড়ের কোট উপহার দিয়াছিলেন। উহা আমি যত্নপূর্ব্ব কয়েক বৎসর গায়ে দিয়াছিলাম।— ঘাড়ের উপর দিয়া একটি বেল্ট

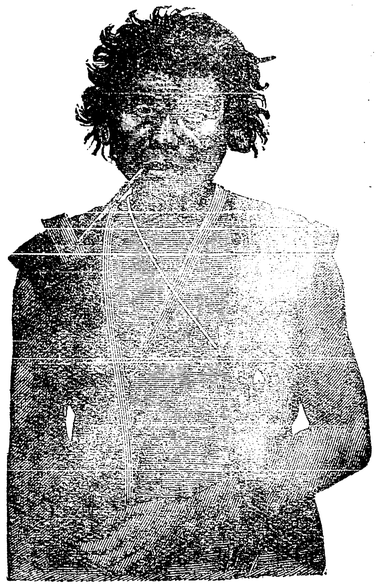

পরিয়া মিষ্‌মীরা তাহাতে দুটি পশমাচ্ছাদিত থলি ঝুলাইয়া রাখে। থলির দুই পিঠে করতালের মত দুটা পিতলের থালা সংলগ্ন থাকে। ঠিক পিঠের সঙ্গে লাগিয়া থাকে, এরূপ একটি সাগুবৃক্ষের ছাল দ্বারা আচ্ছাদিত ব্যাগ; তাহার উপর তিব্বতীয় গাভীর লেজের বাহার; একটি লম্বা তিব্বতীয় তরবারি, কয়েকটি ছুরি ও ছোরা এবং সুন্দর হাল্কা বর্শা; এইগুলি হইলেই মিষ্‌মী পুরুষের সজ্জা সম্পূর্ণ হয়। তাহারা মাথায় কখনও পশমের টুপি, কখনও বা ঝুড়ির মত একটা শিরস্ত্রাণ পরে।

স্ত্রীলোকেরা একখানা কাপড় আল্‌গা ভাবে কোমরে জড়ায়; উহা হাঁটু পর্য্যন্ত পৌঁছে। গায়ে তাহারা যে ছোট একটি কাঁচুলি বা আঙ্গিয়া পরে, তাহাতে স্তনদ্বয় আটক থাকে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত হয় না। তাহারা প্রচুর পরিমাণে কাচ, চীনেমাটি বা মূল্যবান্ প্রস্তরের মালা পরে। তাহারা মাথায় একটি ফিতা পরে। উহা কপালের উপর খুব চৌড়া থাকে; তাহার উপর ক্রমে সরু হইয়া মাথা বেষ্টন করিয়া থাকে। মাথার পশ্চাদ্ভাগে উহাতে এক সারি ছোট কড়ি ঝুলান থাকে। স্ত্রী-পুরুষ উভয়জাতি লম্বা চুল রাখে এবং উহা চারিদিক হইতে উঠাইয়া কপালের উপর একটা খোঁপা বাঁধিয়া একটা কাঁটা দিয়া আটকাইয়া রাখে। ছোট ছোট বালিকারা উলঙ্গ

থাকে। কেবল কোমরের ঘুন্সি হইতে সম্মুখে একটা ছোট কাঠের তক্তি ঝুলিতে থাকে। ঠিক যেন বিক্রয়ের জন্য তাহাদের গায়ে টিকিট মারিয়া রাখিয়াছে।

কি স্ত্রীলোক, কি পুরুষ, মিষ্‌মীরা "বদ্ধ" তামাকখোর। তাহারা অতি শৈশবেই তামাক খাইতে আরম্ভ করে, এবং নিদ্রা ও ভোজনের সময় ব্যতীত সর্ব্বদাই তামাক খায়। তাহারা পিতলের নলে তামাক খায়।

মিষ্‌মীরা খর্ব্বাকৃতি, দৃঢ়কায়, গৌরবর্ণ এবং বানরের মত ক্ষিপ্রগতি ও কর্ম্মঠ। তাহাদের মুখাবয়ব মঙ্গোলীয় ও আর্য্যজাতির মাঝামাঝি।

এই প্রবন্ধটি ডাল্টন্ সাহেবের জাতিবিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক হইতে সঙ্কলিত।

রাজদ্রোহ আইন ও সমাজনীতি।

লেখা ও বলার স্বাধীনতা লইয়া এতদিন তুমুল আন্দোলন হইল। যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। বাক্ ও লিপি-স্বাধীনতা যেন একটী সুকুমার শিশু। গবর্ণমেণ্টের যত্নে ইহা ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইতেছিল। বালকসুলভ চাপল্য বশতঃই হউক, অথবা লেখকদিগের অদূরদর্শিতা বশতঃই হউক, অথবা ভারতের দুরদৃষ্ট বশতঃই হউক, এই শিশুর কার্য্যকলাপ গবর্ণমেণ্টের অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। এমন কি গবর্ণমেণ্টের মনে হইল যে, শিশুটি বিকারপ্রাপ্ত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। ভারতবাসিগণ বলিলেন, শিশুর বিকার হয় নাই, কোনও পীড়া হয় নাই, সুতরাং কোন ঔষধের প্রয়োজন নাই; বরঞ্চ যে ঔষধের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা শিশুকে সেবন করাইলে, শিশু হয় অচিরে পঞ্চত্ব লাভ করিবে, না হয় জীবন্মৃত হইয়া থাকিবে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সে কথা স্বীকার করিলেন না, ব্যবস্থার ঔষধ তাহাকে খাওয়াইলেন। দেশের লোক মনে করিলেন, শিশুটি মরিয়াছে, না হয় মরিবে। দেশীয় লেখক ও বক্তাদিগের উপরে যেন আশঙ্কার একটা ছায়া পড়িল। কেহ বলিতেছেন, রাজনীতি সম্বন্ধে রসনা আর নির্ভয়ে সত্য কথা বলিতে পারিবে না, হস্ত আর নির্ভয়ে সত্য কথা লিখিতে পারিবে না। গবর্ণমেণ্ট অভয় দিতেছেন, বাক্ ও লিপি-স্বাধীনতা পূর্ব্বেও যেমন ছিল, এখনও তেমনি থাকিবে। এই দুইটি মতের মধ্যে কোন্‌টি সত্য, তাহা বিচার করা এই প্রবন্ধের লক্ষ্য নহে। তবে ধরিয়া লওয়া যাউক, আইনের ভয়ে অধিকাংশ দেশীয় লেখক রাজনীতি আলোচনায় পরাঙ্মুখ হইবেন। দেখা যাউক, এইরূপ অনুমান করিয়া লইলে দেশীয় সংবাদপত্রের পক্ষে অন্য কোন হিতকর ও প্রয়োজনীয় আলোচ্য বিষয় থাকিতে পারে কি না। দেখা যাউক, আমাদিগের দেশে লেখক ও বক্তৃগণ যাহা প্রভূত অমঙ্গল মনে করিয়াছেন, সেই অমঙ্গলের ভিতর হইতে কোন মঙ্গলের আবির্ভাব হইতে পারে কি না। তাঁহারা যেন মনে করিতেছেন যে, বাক্‌লিপি-স্বাধীনতার সূর্য্য অস্ত যাইল, নৈরাশ্যের রজনী সমাগত হইল। দেখা যাউক, এই রজনীর অন্ধকার দূর করিবার নিমিত্ত কোন চন্দ্রমা উদিত হইতে পারে কি না।

আমরা অধীন জাতি। আমাদিগের পক্ষে রাজনীতি এক প্রকার নাই বলিলেই হয়; অন্ততঃ রাজনীতির ক্ষেত্র নিতান্ত সংকীর্ণ ও অনুর্ব্বর। আমাদিগের পক্ষে প্রজানীতি প্রশস্ত, প্রধান ও প্রকৃষ্টরূপে অবলম্বনীয়। রাজনীতি সম্বন্ধে আমরা আমাদিগের শাসনকর্ত্তাদিগকে যে উপদেশ দিতে এত ব্যস্ত, গবর্ণমেণ্ট সেটা লইতে তত ব্যস্ত নহেন। যেখানে আমাদিগের স্বার্থ এবং গবর্ণমেণ্টের স্বার্থ ভিন্ন, সেখানে আমাদিগের পক্ষে গবর্ণমেণ্টকে উপদেশ দেওয়া যত সহজ, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সেই উপদেশ গ্রহণ করা তত

সহজ নহে। অথবা অন্যের স্বার্থের জন্য নিজের স্বার্থ বিসর্জ্জন দেওয়া মনুষ্য মাত্রেরই পক্ষে কঠিন। যেখানে আমাদিগের যাহা স্বার্থ, গবর্ণমেণ্টেরও তাহাই স্বার্থ; সেখানে গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের উপদেশের অপেক্ষা না করিয়াই নিজের গন্তব্য পথ অধিকাংশ স্থলেই স্থির করিয়া লইতে পারেন। সুতরাং রাজনীতি বিষয়ে আমাদিগের রচনা যদি এদেশে কতকটা আপাততঃ সঙ্কুচিত হয়, তাহা হইলেও আমরা সহসা যে বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত হইব, এরূপ না হইলেও হইতে পারে এবং অপর পক্ষে কোন কোন বিষয়ে পরোক্ষে লাভ হওয়া অসম্ভব নহে।

এদেশীয় লোকের রাজনৈতিক রচনার ভঙ্গী যে ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অপ্রিয় ও অসন্তোষজনক হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সম্প্রতি ইংরাজ ব্যবস্থাপকগণের বক্তৃতাতে স্পষ্টতঃ প্রতিভাত হইয়াছে। প্রবল শাসকেরা অপ্রসন্ন হইলে দুর্ব্বল প্রজার পদে পদে বিপদ। এই কথাটি রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদিগের নিয়ত মনে রাখা উচিত। রাজার যেখানে বিপুল ক্ষমতা, প্রজার সেখানে বিপুল অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। এই অভিজ্ঞতার অভাবে পরাজিত প্রজার স্বাধীন উক্তিতে উপকার না হইয়া অনেক সময় অপকার হয়, সাহস প্রকাশ না হইয়া পরিণামে ক্ষমা প্রার্থনার ভীরুতা লক্ষিত হয় এবং রাজশাসন কঠিনতর ও উগ্রতর ভাব ধারণ করে। তাই বলি, যাহাতে রাজা রুষ্ট হন, তাহা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া, কখনই বলা বা করা উচিত নহে। আশা করা যাইতে পারে, প্রজার তীব্র ভাষা প্রশমিত হইলে, রাজাও প্রশমিত ও প্রশান্ত হইবেন এবং নিজ গুণে প্রজারঞ্জন করিবেন।

এখন যাঁহারা দেশের প্রথম শ্রেণীর লেখক বা বক্তা, রাজনীতি তাঁহাদিগের যেন একমাত্র, অন্ততঃ প্রধান, কার্য্যক্ষেত্র হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু দেশীয় লোকের চরিত্র উন্নত না হইলে, দেশের স্থায়ী ও প্রকৃত উন্নতির কোনও ভরসা নাই। চরিত্রের উন্নতি হইলে, দেশের লোক সত্যবাদী, সাহসী, সাধু ও ধার্ম্মিক হইলে, রাজনীতির পথ অবশ্যই প্রসারিত হইবে; দেশের চরিত্রে এমন একটী শক্তির সঞ্চার হইবে, যাহা রাজা কখনই ঘৃণা করিবেন না, বরঞ্চ আদর ও সম্মান করিবেন। আর, আমাদিগের রাজনৈতিক আন্দোলনে অথবা স্বতঃই ইংরাজগণ আমাদিগের প্রতি যতই অনুগ্রহ করুন না কেন, আমাদিগের চরিত্রের যদি উন্নতি না হয়, তাহা হইলে সেই অনুগ্রহ, হয় আমরা রক্ষা করিতে পারিব না, না হয় আমরা সেই অনুগ্রহ ভোগ করিয়াও আশানুরূপ সুখী হইতে পারিব না। আমাদিগের পতন কিসে হইয়াছে, তাহা অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে,—চরিত্রের অবনতি, মনের জড়তা, সঙ্কীর্ণতা, বিশ্বাসের অলীকতা, তাহার প্রধান কারণ। একজন চিন্তাশীল ইংরাজ বলিয়াছেন যে, যখন কোন জাতির চরিত্র এরূপ অসার হইয়া পড়ে যে, সেই জাতি অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রথা পদ্ধতি প্রয়োজন মত আর পরিবর্ত্তন করিতে পারে না, তখনই সেই জাতির নিশ্চয়ই পতন হয়। যত দিন কোন জাতির ভিতর উদ্যম, চিন্তাশীলতা, পরার্থপরতা, সাহস থাকে, তত দিন সেই জাতির মহাপুরুষগণ প্রচলিত প্রথা ও পদ্ধতি পরীক্ষা করেন ও প্রয়োজন মতে, বহুশ্রমে ও বহু বিপদে, সংস্কার করেন। কিন্তু যখন সেই জাতির অধঃপতন হয়, তখন কেহই আর দেশের জন্য চিন্তিত হয় না, সকলেই স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া ধ্বংসের সাগরে ভাসিয়া যায়। আবার যখন জাতীয় চরিত্রের সংস্কার আরম্ভ হয়, তখনও সেই দুস্তর সাগরের কুল দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদিগের ব্যাধি প্রধানতঃ আভ্যন্তরিক। যতদিন আমাদিগের অন্তঃকরণে সংস্কারের পবিত্র শিখা প্রজ্বলিত না হইতেছে, যতদিন স্বার্থপরতা, কপটতা, ভীরুতা দগ্ধ না হইতেছে, ততদিন আমাদিগের জাতীয় উন্নতির কোনই আশা নাই।

প্রাচীন প্রথা পদ্ধতি সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা এখন অধিকাংশস্থলে অসাধ্য এবং করিতে চাহিলেও তাহাতে সমাজের উদ্ধার হইবে না। বর্ত্তমান সমাজের সংস্কার প্রয়োজন।

সম্প্রতি অমরাবতীতে যে জাতীয় সামাজিক মহাসমিতির অধিষ্ঠান হইয়াছিল, তাহাতে মাননীয় জজ রাণাডে বলিয়াছিলেন :—

The plan of reviving the ancient usages and customs will not work our salvation and is not practicable."

ইহার অর্থ অবশ্য এমন নহে যে, আমাদিগের প্রাচীন দেশাচার ও প্রথার ভিতরে যাহা ভাল আছে, তাহা ত্যাগ করিতে হইবে, অথবা ইউরোপের যে মন্দ প্রথা আছে, তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার মর্ম্ম এই যে, আমাদিগের প্রাচীন প্রথা বা অভ্যাসের ভিতর যাহা অনিষ্টজনক তাহা ত্যাগ করিতে হইবে। প্রাচীন বলিয়া তাহাতে মমতা করিলে চলিবে না। শ্রীযুক্ত রাণাডে আরও বলিয়াছেন যে,—

It is not the outward form, but the inward form—the thought and the idea which determines the outward form that has to be changed if real reformation is desired. Now, what have been the inward forms or ideas which have been hastening our decline during the past three thousand years? These ideas may be cheifly set forth as isolation, submission to outward force of power more than the voice of the inward conscience, perception of factitious differences between man and man, and, due to heredity and birth, a passive acquiescence in evil or wrong-doing and a general indifference secular well-being almost bordering on fatalism. These have been the root ideas of our social system.

আমরা কূপ-ভেকের ন্যায় কত দিন থাকিব? বাহ্যশক্তির নিকট বিবেককে আর কত দিন দমিত রাখিব? অদৃষ্টের দোহাই দিয়া কত দিন আর নিশ্চেষ্ট [illegible] রেন। ধর্ম্মজ্ঞান ও বিবেক আমাদিগের জীবনের একমা[illegible] চালক হউক। প্রাচীন প্রথা নহে।

দেশীয় সংবাদপত্রগণ বলিতেছেন যে, রাজদ্রোহের নূতন আইনের শাসনে তাঁহারা নির্ভয়ে রাজনীতি-কথা আর লিখিতে পারিবেন না। এ কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে সম্ভবতঃ, দেশীয় লেখক ও বক্তৃগণ, রাজনীতির চর্চ্চা ছাড়িয়া, অন্য বিষয়ের চর্চ্চা করিবেন। সুতরাং তাহাতে ভরসা করা যাইতে পারে, এতদিন যে বিদ্যা বুদ্ধি শ্রম ও দেশহিতৈষিতা রাজনীতির দুর্গম পাহাড় জঙ্গলে উদ্‌ভ্রান্ত ও প্রতিহত হইতেছিল, তাহা সমাজনীতির ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে এবং যে সমাজক্ষেত্র এতদিন পরিত্যক্ত ছিল, তাহা আবার দক্ষ, স্বদেশবৎসল কৃষকগণের দ্বারা কর্ষিত হইবে; যে সকল স্থান কণ্টকে আবৃত হইয়াছে; তাহা পরিষ্কার হইবে, বিগতসার প্রাচীনক্ষেত্রে আবার সার দিয়া নূতন সজীবতা সঞ্চার করা হইবে; উন্নতিশীল দেশসমূহের সমাজতত্ত্ব পরীক্ষা ও ভিন্ন ভিন্ন প্রথার গুণাগুণ বিচার করিয়া, নিজের দেশের প্রথা সংস্কার করা হইবে; এবং এই বিদ্যা বুদ্ধি ও শ্রমে সমাজক্ষেত্রে সোণার ফসল ফলিবে, সমাজ সাধুতা, বল বিশুদ্ধতা ও পরোপকারিতায় পরিব্যাপ্ত হইবে।

বস্তুতঃ, রাজনীতি ছাড়িয়াও স্বদেশভক্ত নেতৃগণের চিন্তা করিবার অনেক বিষয় রহিয়াছে। এক্ষণে ইউরোপীয় সভ্যতার নিকট হইতে আমাদিগের সমাজ কি গ্রহণ করিতেছে? যাহা অকিঞ্চিৎকর বা অনিষ্টকর, মন্দ, তাহাই অনুকরণ করিতেছে। যাহা হিতকর তাহা লইতে শিখে নাই। ইউরোপীয় পোষাক, মদ্যপান ইত্যাদি আমাদিগের সমাজে প্রবেশ করিতেছে। কিন্তু ইউরোপীয় সাহস, ইউরোপীয় উদ্যম, ইউরোপীয় স্বাবলম্বন, কার্য্যপটুতা এদেশের লোক গ্রহণ করিতেছে না।

প্রাচীনকালে এদেশে অতিথিশালা, ধর্ম্মশালা ও ঘরে ঘরে যে অন্নদান ছিল, এখন তাহা উঠিয়া যাইতেছে। কিন্তু এদেশে দুঃখীদিগের দুঃখ মোচনজন্য কোনও বুথ বা মূলার বা বার্ণাডো বা ফাদার ডেমিয়ানের আবির্ভাব হইতেছে না। এদেশের জমীদারগণ ইংরাজের নিকট সভা করিতে শিখিয়া বৃটিষ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েষান্ গঠন করিতে পক [illegible]য়াছেন, কিন্তু লর্ড ষ্যাফ্‌টস্‌বেরী বা ডিউক অব্ ডিবন-তাঁহা[illegible]রের মত রায়তগণের উপকার বা জমীদারির উন্নতি [illegible]তে শিখেন নাই। এমন কি, এতগুলি শিক্ষিত জমীদার আছেন, কৃষিকার্য্যের উন্নতিকল্পে একখানিও উল্লেখযোগ্য পত্রিকা নাই।

দেশে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে সকল প্রাচীন নিয়ম ধর্ম্মবন্ধনে দৃঢ় ছিল, এক্ষণে তাহা বিসর্জ্জন দেওয়া হইয়াছে। অথচ ইউরোপীয় নব্য স্বাস্থ্যতত্ত্বের ব্যবস্থাগুলি অধিকাংশ দেশের লোকের নিকট অজ্ঞাত। ইউরোপীয় বিলাসের ঢেউ এদেশের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। অথচ ধনবৃদ্ধি নাই, বরঞ্চ নিত্য দুর্ভিক্ষ। পণ্ডিত, সাধু ও সমাজের প্রাচীন পরিচালক ব্রাহ্মণগণকে সম্মান বা নমস্কার করা নবীন সাম্যের নিকট কু-সংস্কার প্রতিপন্ন হইয়াছে। অথচ মূর্খ ও অসাধু ধনীদিগের চরণেও সমাজ লুণ্ঠিত হইতেছে। পূর্ব্বে গ্রামে যাঁহারা পুরুষানুক্রমে পুষ্করিণী খনন, বৃক্ষ রোপণ, ও নিষ্করভূমি দান ইত্যাদি সদনুষ্ঠানে ধন্য হইয়াছিলেন, তাঁহারাই সমাজের নেতা, সম্মানার্হ বলিয়া পরিগণিত হইতেন। এখন সহরে যাঁহাদিগের বৃহৎ অট্টালিকা, বা ল্যাণ্ডো ও ওয়েলার ঘোড়া আছে, তাঁহারাই নমস্য হইয়া উঠিয়াছেন।

সমাজের দুঃখের কাহিনী লিখিয়া শেষ করা যায় না

এই সকল লক্ষণ সমাজের আন্তরিক ব্যাধির লক্ষণ মাত্র। এই ব্যাধি চরিত্রের অবনতি, হৃদয়ের বিকার। তাই বলি, দেশীয় নেতৃগণ বিদ্রোহের আইন শাসনে হতাশ্বাস না হইয়া, রাজনীতির ভিতর যে রাজনীতি, হৃদয়ের যে রাজনীতি, বিবেকের যে রাজনীতি, তাহার প্রতি লক্ষ্য করুন। সকল কার্য্যেরই উৎস হৃদয়; জাতীয় হৃদয় সংশোধন করিবার জন্য পবিত্র ব্রত ধারণ করিয়া, একবার পবিত্র শোণিতহীন সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন। দেখিবেন, শনৈঃ শনৈঃ অপূর্ব্ব রাজ্যের ভিত্তি সংস্থাপিত হইবে। চরিত্রের রাজ্য, ধর্ম্মের রাজ্য যাহা পরিণামে মনুষ্যকে দেবতা করিবে, সেই রাজ্যের প্রজা আমরা। সেই রাজ্যের নেতা শাসক রাজার প্রতি লক্ষ্য করিতে চাই। সত্য, সাহস, সাধুতা ও পরোপকার সেই রাজ্যের ভিত্তি, এবং ঈশ্বরের আদেশ সেই রাজ্যের একমাত্র শাসন।

নূতন ভাবে ও চিন্তায় সমাজ পরিচালিত হউক। সেই নূতন চিন্তা, নূতন ভাব কি? আবার রাণাডের চিত। বলি;— বিপুল

"Not the idea of rebellion and independen পরা- overthrow of all authority, but that of freedom responsible to God alone." "Reverence all human authority, pay your respects to all prophets and revelations, but subordinate reverence to all to the divine command in us."

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ২৯এ জুন ভবানীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভবানীপুরের একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন। তিনি স্বীয় পুত্রদ্বয়ের শিক্ষার জন্য যেরূপ ঐকান্তিকযত্নশীল ছিলেন, এরূপ অতি অল্প পিতাই হইয়া থাকেন। আশুতোষ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র। কনিষ্ঠ হেমন্তকুমার প্রেসিডেন্সী কলেজে আমার সহপাঠী ছিলেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে হেমন্তকুমার পরলোক গমন করেন। তাহার প্রায় দুই বৎসর পরে তাঁহার শোকসন্তপ্ত পিতা কালগ্রাসে পতিত হন।

শৈশবে আশুতোষের শরীর বড় রুগ্ন ছিল। এইজন্য নয় বৎসর বয়সে তিনি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে প্রসিদ্ধ মথুরানগরীতে কয়েকমাস যাপন করেন। তখন পর্য্যন্ত তিনি কোন বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন নাই; নিজ গৃহে পিতার তত্ত্বাবধানে সুন্দররূপে শিক্ষিত হইতেছিলেন। নয় বৎসর বয়সেই তিনি বীজগণিতের বর্গসমীকরণ অনায়াসে কষিতে পারিতেন। এত অল্প বয়সেই তিনি ইউক্লিডের জ্যামিতির চারি অধ্যায় শিখিয়াছিলেন, এবং উক্ত চারি অধ্যায়ের অনুশীলনী সকলও অনায়াসে প্রমাণ করিতে পারিতেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে পাটীগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতিবিষয়ক সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থসমূহ কিনিয়া দিতেন। বাল্যকাল হইতে এই সকল পুস্তকের নানাপ্রকার প্রশ্ন সমাধানপূর্ব্বক তৎসমুদয় পরিষ্কার করিয়া খাতায় লিখিয়া রাখিতে তিনি ভাল বাসিতেন। এই খাতাগুলি এখনও যত্নের সহিত রক্ষিত আছে। বাল্যকাল হইতেই তিনি সময়ের মূল্য ও সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষা পাইয়াছিলেন। সুপ্রণালী মতে ও সুশৃঙ্খলা অনুসারে কাজ করিলে যে কত কাজ করা জাতির তাহা তিনি বাল্যকাল হইতেই শিখিয়াছিলেন। চিন্তিত পিতা তাঁহার বালক হৃদয়ে গভীর জ্ঞানানুরাগের সঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি পুত্রের নিকট জগতের বড় লোকেরা কি কি মহৎ কার্য্য করিয়াছেন এবং কেমন করিয়া তৎসমুদয় করিয়াছেন, তাহার বর্ণনা করিতেন। তাহাতে বালক আশুতোষের কল্পনা সতত মহৎকীর্ত্তিক্ষেত্রে বিহার করিত। এণ্ট্রেন্স পাশ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার জীবনের কার্য্য সম্বন্ধে তিনি একটা সংকল্প স্থির করিয়াছিলেন। এমন দিন তাঁহার যাইত না, যে দিন তিনি প্রতি দিবসের কার্য্য সম্বন্ধে আত্মপরীক্ষা না করিতেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে এণ্ট্রেন্স পাশ করিবার পূর্ব্বেই তিনি ইংরাজী অনেক সুলেখকের গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং গণিত বিষয়ে প্রভূত জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। তিনি ভবানীপুরস্থ সাউথসুবর্ব্বন স্কুল হইতে এণ্ট্রেন্স পাশ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর বাৎসরিক পরীক্ষার পূর্ব্বেই তিনি এম্. এ পরীক্ষার জন্য গণিতের জ্ঞাতব্য অংশ সমগ্র শিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি একটি উচ্চ টেবিলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিতেন। এই প্রকার কঠোর অধ্যয়নে নিরত থাকায় এফ্, এ পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে তাঁহার কঠিন পীড়া হয়। এজন্য তিনি স্বাস্থ্য লাভার্থ আবার উত্তর পশ্চিম প্রদেশে

গমন করেন। তিনি ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এফ্,এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং গুণানুসারে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। এফ্.এ পরীক্ষায় প্রথম হইতে না পারায় তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হইয়াছিলেন। বিএ পড়িবার সময় তিনি লাপ্লাস ও লাগ্রঁস্ প্রভৃতি গণিতবিদ্যাবিশারদগণের গ্রন্থ মূলে পাঠ করিবার জন্য ফরাশি ভাষা শিক্ষা করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে আশু বাবু বিএ পাশ করেন এবং পারদর্শিতানুসারে প্রথমস্থানীয় হন। পর বৎসর তিনি গণিতে এম্.এ পাশ করেন। ইহাতেও তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন।

অত্রান্তরে তাঁহার গণিতবিদ্যাবিষয়ক খ্যাতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল। তিনি গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ার্লণ্ডের অনেক বিদ্বৎসভার সভ্য নির্ব্বাচিত হন এবং এডুকেষ্যনাল টাইম্স্, ম্যাথেম্যাটিক্যাল মেসেঞ্জার প্রভৃতি পত্রে গণিতবিষয়ক প্রবন্ধ লিখিয়া ইয়ুরোপ ও আমেরিকার অনেক বিখ্যাত গণিতজ্ঞের সহিত পরিচিত হন। তাঁহারা তাঁহার সহিত সমকক্ষভাবে পত্র বিনিময় করিতে আরম্ভ করেন। তিনি ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে পদার্থ বিদ্যায় এম্,এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি বরাবর সংস্কৃতের চর্চ্চা করিতেন। সিটি কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিত বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি, আশু বাবুর সংস্কৃতে বেশ দখল আছে। তিনি সংস্কৃত ভাষায় সমুদয় উৎকৃষ্ট গদ্য ও পদ্য সাহিত্য ও নাটক এবং অলঙ্কার শাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন তিনি হিন্দু-আইনসম্বন্ধীয় সমুদয় মূল প্রামাণিক সংস্কৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন।

তিনি ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ২৩ বৎসর বয়সে এম্-এ পরীক্ষায় গণিতের পরীক্ষক নিযুক্ত হন। ইহার পর ক্রমাগত চারি বৎসর এবং ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দেও তিনি এম্-এ পরীক্ষায় গণিতের পরীক্ষকের কার্য্য করেন। ১৮৯০ ও ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পরীক্ষাতেও গণিতের পরীক্ষক নিযুক্ত হন। এম্-এ ও প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষায় বাঙ্গালীদের মধ্যে কেবল তিনিই এ পর্য্যন্ত গণিতের পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে বি-এল্ পরীক্ষায় ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ না হইবার কারণ, ইহার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু এবং অন্যান্য পারিবারিক দুর্ঘটনা। তিনি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে অনার্স ইন্ল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডি-এল্ উপাধি লাভ করেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য নিযুক্ত হন। সভ্য নিযুক্ত হইবার দুই মাস পরেই তিনি সিণ্ডিকেটের সভ্য নির্ব্বাচিত হন। ক্রমান্বয়ে সাত বৎসর তিনি সভ্য নির্ব্বাচিত হন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে যে কারণে ইনি এবং আর কয়েকজন বাঙ্গালী ইংরেজ সভ্যগণের ষড়যন্ত্রে সিণ্ডিকেটে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, তাহা সংবাদপত্রের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। ১৮৯৭ ও ৯৮ খৃষ্টাব্দে আবার তিনি সিণ্ডিকেটের সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতবিদ্যাবিষয়কপাঠ্য নির্দ্ধারণসমিতির সভাপতির কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। অনেক বৎসর ধরিয়া তিনি আগ্রহ, ঐকান্তিক যত্ন ও বুদ্ধিমত্তার সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের হিতার্থ পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান বৎসরে তিনি ঠাকুর আইন অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। হাইকোর্টে ওকালতী ব্যবসায়ে তাঁহার পসার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

তাঁহার অধ্যয়নানুরাগ বিন্দুমাত্রও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। তিনি ওকালতীর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যানুশীলনও করেন। তাঁহার পুস্তক-সংগ্রহ যেরূপ, এদেশে অল্প লোকেরই তদ্রূপ দেখা যায়। তাঁহার পুস্তকগুলির মূল্য চল্লিশ হাজার টাকার কম হইবে না। তিনি ইহার উপর অবিরত আরও পুস্তক ক্রয় করিতেছেন।

তিনি কনিক্সেক্ষ্যন সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। উহা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এবং ইংলণ্ড ও আমেরিকার কোন কোন স্থানেও পাঠ্যপুস্তকরূপে ব্যবহৃত হয়।

আশু বাবু স্বাস্থ্যসম্বন্ধে আজকাল খুব সাবধান। প্রাতঃকালে অনেকক্ষণ ভ্রমণ না করিয়া তিনি দিবসের কার্য্য আরম্ভ করেন না। তিনি প্রায় ১৪ বৎসর নিরামিষভোজী ছিলেন।

আমি যখন প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রথমবার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হই, তখন আশু বাবু বিএ শ্রেণীতে পড়েন। তখন তিনি একজন প্রসিদ্ধ ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়া উঠিয়াছেন। তৎকালে তিনি কলেজের সম্মিলনী সভার সম্পাদক ছিলেন। ভাল বক্তা বলিয়া তাঁহার যশ ছিল। আমার মনে আছে, তিনি তখন একটি চায়নাকোট গায়ে দিয়া

কলেজে আসিতেন। চাদর ব্যবহার করিতেন না।—তাঁহার চেহারা দৃঢ়তাব্যঞ্জক ও কর্ম্মিষ্ঠতাসূচক, এবং চক্ষু তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচায়ক; মুখাবয়বে উৎসাহ, এবং বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিবার দৃপ্ত ইচ্ছা ও ক্ষমতার লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চগণিতের কোন চর্চ্চা হয় নাই। এজন্য আশু বাবুর গণিতবিষয়িণী প্রতিভার পরিচয় দিতে হইলেই ইংরাজীর আশ্রয় লইতে হয়। ইংরাজীতে লিখিলেও তাহা গণিতবিদ্যায় অনভিজ্ঞ সাধারণ পাঠক-বর্গের বোধগম্য না হইবারই সম্ভাবনা। যাহা হউক, এ বিষয়ে আমরা বাঙ্গালা ও ইংরাজীতে দুই একটী কথা মাত্র লিখিবার চেষ্টা করিব। তিনি ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ষোলবৎসর বয়সে কেম্ব্রিজ মেসেঞ্জার অব্ ম্যাথেম্যাটিক্স্ পত্রে ইউ-ক্লিডের জ্যামিতির ১ম অধ্যায়ের ২৫শ প্রতিজ্ঞার একটি নূতন প্রমাণ প্রকাশিত করেন। উহা তিনি তাহার ৪ বৎসর পূর্ব্বে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। দ্বাদশবর্ষবয়স্ক বালকের পক্ষে ইহা অদ্ভুত প্রতিভার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। বিখ্যাত গণিতজ্ঞ পণ্ডিত বূল ডিফারেন্‌য্যাল ক্যালকুলসেরা একটি কঠিন বিষয় সম্বন্ধে বলেন যে উহার জ্যামিতিক ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু আশু বাবু উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এড্‌বার্ডস্ প্রণীত ডিফারেন্‌য্যাল ক্যালকুলস্ গ্রন্থের ৪৩৬পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে নিম্নলিখিত কথাগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। মিওর সেন্ট্র্যাল কলেজের অন্যতর গণিতাধ্যাপক আমার বন্ধু উমেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এস্থানটি আমায় দেখাইয়া দেন:—

Dr. Boole, in his *Differential Equations*, P. 20, remarked: 'But here our powers of geometrical interpretation fail, and results such as this can scarcely be otherwise useful than as a registry of integrable forms." A remarkable interpretation which calls for notice has, however, been recently offered by Mr. A. Mukhopadhyay who has observed," &c. &c.

অর্থাৎ "বূল বলিতেছেন, এখানে আমাদের জ্যামিতিক ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতা হার মানে; কিন্তু মিষ্টার এ, মুখোপাধ্যায় ইহার একটি চমৎকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যাহার উল্লেখ করা উচিত" ইত্যাদি। উচ্চগণিতে এই প্রকার গৌরব লাভ সামান্য কথা নয়।

আশু বাবুর আর কয়েকটি গণিতবিষয়ক অভিনব সমাধানাদির বৃত্তান্ত নিম্নে পাদ টীকায় দেওয়া গেল।*

এবম্বিধ নানাপ্রকার গবেষণার জন্য তিনি ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে এডিনবরা রয়্যালসোসাইটির সদস্য (Fellow) মনোনীত হন। বিখ্যাত গণিতজ্ঞ অধ্যাপক কেলীর পোষকতায় তাঁহার মনোনয়ন সংসাধিত হয়। এতদ্ব্যতীত তিনি আরও বহুসংখ্যক গণিত সভার সভ্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ের হিতার্থ তিনি যে বহু বৎসর হইতে প্রভূত পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন, আমরা পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে তাঁহার এতদ্বিষয়ক কার্য্যের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি। আশু বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধানতঃ যে কয়টি মূলসূত্র বা নীতির সমর্থন করিয়া আসিতেছেন, তাহা এই। (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সমূহের, বিশেষতঃ উচ্চ পরীক্ষাগুলির, আদর্শের উচ্চতা অক্ষুণ্ণ রাখা। ইহার অর্থ—এ নয় যে পরীক্ষার বিষয় অনেকগুলি হইবে ও কঠিন হইবে, এবং প্রত্যেক বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকের তালিকা দীর্ঘ হইবে; ইহার অর্থ এই যে অধীত প্রত্যেক বিষয়ের মূলতত্ত্বগুলি সম্বন্ধে তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা লওয়া হইবে। (২) একই পরীক্ষা ভিন্ন ভিন্ন বৎসরে যাহাতে সমান কঠিন হয়, তাহার চেষ্টা। স্যার চার্লস এলিয়ট্ এ বিষয়ের যে সমালোচনা করেন, সিণ্ডিকেট তদুত্তরে আশু বাবুর মন্তব্যটি প্রেরণ

* (1) *The Cambridge Messenger of Mathematics* for 1883 contains a paper by Dr. Mukhopadhyay which gives an important generalization of a theorem of Dr Salmon on Conic Sections. (2) *The Quarterly Journal of Mathematics* for 1885 contains a geometrical proof of a fundamental theorem on Elliptic Functions. This theorem had hitherto been proved by mathematicians by very complicated methods, and the new proof was described by the late Prof. Cayley as remarkably simple." (3) *The Journal of the Asiatic Society* for 1886 contains a paper on Trajectories which gives a generalization of a theorem particular cases of which had been proved before, after great labour in England and in Italy. This theorem with Dr. Mukhopadhyay's name attached to it now appears in Forsyth's *Differential Equations*. (4) *The Journal of the Asiatic Society* for 1889-90 and the Volumes of *Nature* for the same year contain papers on the geometrical interpretation of Differential Equations. They contain the geometrical meaning of Differential Equation, some of which had baffled the attempts of the great French Mathematician Monge and the great English Mathematicians Boo e and Sylvester during the last 80 years. The substance of Dr, Asutosh's theorem now appears with his name in Edwards's *Differential Culculus*. A German translation of the Doctor's papers has appeared in Berlin. (5) *The Indian Engineering* for 1894 contains 3 papers, one of which deals with the problem of the Intersection of Curves which had never been completely solved before. The geometrical method given in this paper has been described as "remarkably clear" and a translation has been published in paris.

করেন। (৩) পরীক্ষার বিশুদ্ধতা রক্ষা। যিনি যে বিষয়ের অধ্যাপনা করেন, তিনি সে বিষয়ে প্রশ্ন দিতে পারিবেন না, এইরূপ নিয়ম করাতে পরীক্ষার বিশুদ্ধতা রক্ষিত হইয়াছে। (৪) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযুক্ত উপাধিধারিগণের পরীক্ষকরূপে নিয়োগ। পূর্ব্বে প্রধানতঃ ইংরাজেরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক নিযুক্ত হইতেন। ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বের পরীক্ষক-তালিকার সহিত আজিকালকার পরীক্ষক-তালিকার তুলনা করিলেই এই চেষ্টা কতদূর সফল হইয়াছে, তাহা বুঝা যাইবে। (৫) স্বাধীন গবেষণার উৎসাহ দান। আশু বাবুর প্রস্তাবেই প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি সম্বন্ধে এই নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয় যে, বৃত্তিধারী স্বাধীন গবেষণা করিতেছেন ইহা দেখাইতে পারিলে তবে তাঁহার বৃত্তি বজায় থাকিবে। (৬) স্বতন্ত্র ইংরাজী রচনার উৎসাহ দান। আশু বাবুর প্রস্তাবে ইংরাজী প্রবন্ধ রচনা এফ্-এ ও বি-এ পরীক্ষার অঙ্গীভূত হইয়াছে। (৭) কলেজে ছাত্রগণের মধ্যে নিয়মের শাসন রক্ষা এবং কলেজগুলিকে সর্ব্বতোভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মাধীন রাখা। (৮) তিনি যদিও বরাবর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম রক্ষা বিষয়ে যত্নশীল, তথাপি তিনি সর্ব্বদাই ছাত্রগণের বন্ধু বলিয়া পরিচিত। যখনই কোন নিয়ম ছাত্র-বিশেষের পক্ষে স্থলবিশেষে কঠোর বলিয়া বোধ হইয়াছে, তখনই তিনি তাহার কঠোরতা হ্রাস করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। (৯) দেশের প্রচলিত ভাষাসমূহ যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক যথোচিত উৎসাহ প্রাপ্ত হয়, তদর্থে চেষ্টা। সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা বা পারসীর পরিবর্ত্তে উর্দ্দূর প্রচলন ইহার অভিপ্রেত নয়। ইনি বলেন যে, যেসকল ছাত্র সংস্কৃত বা অপর কোন উৎকৃষ্ট প্রাচীন ভাষায় পরীক্ষা দেন, তাঁহাদিগকে তৎসংসৃষ্ট প্রচলিত কোন ভাষাতেও ব্যুৎপত্তি দেখাইতে বাধ্য করা উচিত। এই নিয়ম এণ্ট্রেন্স হইতে এম্-এ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত। আশু বাবু ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ফ্যাকল্টি অব্ আর্টসের সমক্ষে এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব উত্থাপনের পূর্ব্বে ঘণ্টাধিকব্যাপী একটি বক্তৃতা করেন। উপস্থিত একজন প্রাচীনতম ইউরোপীয় সভ্য বক্তৃতাটি শুনিয়া বলেন যে, তিনি সেনেটহলে যত বক্তৃতা শুনিয়াছেন, উহা তাহার মধ্যে উৎকৃষ্টতম বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য ("the finest he had ever heard within the walls of that Hall")। কিন্তু প্রচলিত ভাষাসমূহের বিরুদ্ধে প্রতিকূল ভাব সভ্যগণের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল থাকায় আশু বাবুর প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। (১০) সিণ্ডিকেটের সভ্যরূপে তিনি সর্ব্বদাই নূতন স্কুল ও কলেজ স্থাপনের পক্ষ সমর্থন করিয়া আসিতেছেন; অবশ্য যেখানে এরূপ নূতন শিক্ষালয় স্থাপিত হইলে ছাত্রগণের প্রকৃত শিক্ষা ও শাসনের ব্যাঘাত হইবে, সেখানে নয়।

আশু বাবুর সংস্কৃতজ্ঞান পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি উচ্চগণিত অধ্যয়নের জন্য যে ফরাসি ভাষা শিক্ষা করেন, আমরা তাহাও বলিয়াছি। ফরাশি ভাষার জ্ঞান ব্যবস্থাবিজ্ঞান (Jurisprudence) এবং রোমক আইন পাঠে তাঁহাব খুব কাজে লাগিয়াছে। আশু বাবু জর্ম্মান ভাল করিয়া জানেন না; তবে যাহা জানেন, তদ্দ্বারা উক্ত ভাষায় লিখিত সাধারণ গণিতবিষয়ক পুস্তক বুঝিতে পারেন। চর্চ্চা না থাকায় লাটিন তিনি অনেক ভুলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তথাপি রোমক ব্যবস্থাপকগণের মূল গ্রন্থগুলি লাটিন ভাষায় অধ্যয়ন করিতে পারেন। মাতৃভাষা ব্যতীত ভারতপ্রচলিত ভাষার মধ্যে তিনি কেবল উর্দ্দু শিখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্য পড়িতে তিনি প্রায়ই সময় পান না। কিন্তু তিনি কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস ও মধুসূদন দত্তের গ্রন্থাবলী পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াছেন। ইংরাজী শ্রেষ্ঠ সাহিত্য গ্রন্থকারগণের প্রায় সকলেরই উৎকৃষ্ট গ্রন্থাবলী আশু বাবু পাঠ করিয়াছেন। আধুনিক ইংরাজ গ্রন্থকারগণের মধ্যে বর্ক্, কার্লাইল এবং রস্কিন ইহার প্রিয়। রস্কিন ইহার মতে শুধু যে সুকুমারশিল্পবিষয়ে একজন প্রধান শিক্ষক, তাহা নয়; নীতিবিষয়েও তিনি একজন শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা। কিছুদিন হইতে ডাক্তার মুখোপাধ্যায় ইংরাজী অনুবাদের সাহায্যে গ্রীস, রোম, ফ্রান্স, জর্ম্মাণী, ইটালী এবং স্পেনদেশের উৎকৃষ্ট সাহিত্য গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করিতেছেন।

ওকালতীবৃত্তি অবলম্বন করায় আজ কাল তিনি সাধারণতঃ সাহিত্য ও বিজ্ঞানচর্চ্চার অবকাশ পান না। প্রত্যূষে ৪টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত (আহারাদির সময় বাদ দিয়া) সমুদয় সময় তাঁহাকে ওকালতীর জন্য ক্ষেপণ করিতে হয়; অতি প্রত্যূষে এবং গভীর রাত্রে বিদ্যানুশীলনের যাহা কিছু সময় পান। অবশ্য হাইকোর্টের পূজাবকাশ খুব দীর্ঘ;

রাসায়নিক আসিয়া বলিতেছেন, মনটা ওজন করিতে পারিলাম না, ওটার ভার নাই; জড়বিজ্ঞানবিদ্ বলিতেছেন, আমার জ্ঞাত শক্তিগুলার সঙ্গে উহার সাদৃশ্য নাই; জীব-বিজ্ঞানবিদ্ বলিতেছেন, তোমার মনটা তোমার মস্তিষ্কের সঙ্গে জড়িত বটে, অথচ স্বতন্ত্র। সকলেই বলিতেছেন, তোমার মনটা আছে, কিন্তু কেহই ধরিতে পারিতেছেন না। সকলেই সেই মনের খেলা দেখিতেছেন, অথচ জানিতে পারিতেছেন না। কিন্তু যে খেলা দেখিতেছেন, তাহাতেই বলিতেছেন, কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং। প্রত্যেক বিষয়েই এইরূপ।

এ দৃষ্টান্তে যদি ভাল বুঝিতে না পার, তবে আর একটা দিই। তুমি নদীর ধারে বেড়াইতে গিয়া কেবল খানিকটা জল দেখিয়া এস। আমি কিন্তু তাহার কেবল ঢলঢলে জলটুকু দেখি না। তটিনীকে দেখিলে তাহার অতীত ও ভবিষ্যৎ ইতিহাস মনে পড়ে। কোন্ পাহাড়ে তটিনীর জন্ম হইয়াছে, কোন্ উপলখণ্ডকে সে গিরিদেহ হইতে বিচ্যুত করিয়াছে, কোন্ উপত্যকা সে পায়ে দলিয়া ছুটিয়াছে! বাল্যজীবনে সে কত কি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিয়াছে, কত শিলাখণ্ডকে সে টানিয়া আধ রাস্তায় ফেলিয়া আসিয়াছে, কত শৈল হইতে শৈলান্তরে লাফাইয়া পড়িতে পড়িতে সে ঝর্ ঝর্ শব্দে লোককে মোহিত করিয়াছে। বর্ষাকালের তটিনীকে তুমি নব-যৌবন-সম্পন্না মনে করিতেছ, এবং ভরাগাঙ্গের একটানা স্রোত বই তাহাতে আর কিছু দেখিতেছ না। কিন্তু আমি দেখিলে আরও কত কি দেখিতে পাই। কেমন ধনধান্য-সমন্বিত সুখের গ্রাম খানি ছিল, তটিনী তাহার বুকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, সেখানে এখন কেবল নিরাশার বালুকা-স্তূপ ধূ ধূ করিতেছে। বহু পূর্ব্বকাল হইতে স্থায়ী প্রকাণ্ড মহীরুহকে সে নিমেষে উৎপাটিত করিয়াছে, সারাজীবন আশা করিয়া যে সুখের অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়াছে। কত আশায় বণিক্ তটিনীর স্রোতে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিল, এক আবর্ত্তে তটিনী তাহাকে অন্তর্হিত করিয়াছে। তুমি তটিনীর উপরটা দেখ, উপরের সমান স্নিগ্ধ তারল্য দেখিয়া মোহিত হও। কিন্তু তারই ভিতরে কত নক্র কত মকর তোমায় গ্রাস করিবার জন্য সতত মুখ ব্যাদান করিয়া আছে, তাহার সংবাদ লইয়াছ কি? তাহার বুকের ভিতরে যে কত চোরাবালি, কত [illegible] শৈল লুকাইয়া রাখিয়াছে, তাহার সন্ধান [illegible] কি? তাহার খেলার কথা বলিও না। সে লোককে লোক জ্ঞান করে না, বালির মধ্যে পুঁতিয়া ফেলে। কতকাল লোকগুলা সেখানে পড়িয়া থাকে, শেষে প্রত্নতত্ত্ববিদেরা তাহাদের কঙ্কাল খুঁজিয়া বাহির করেন, এবং তাহাদের অতীত ইতিহাস প্রকটন করিতে প্রয়াসী হন। তুমি ভাবুক, তাই তুমি তাহার তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতে সঙ্গীত শুনিতে পাও; সেটা সঙ্গীত বটে, তবে কিনা সে সঙ্গীতে হর্ষ কই? সে যে পর্ব্বত-দুহিতা, পাষাণ লইয়া তাহার খেলা। তুমি কোমল-প্রাণ, তাহার নিকট যেও না; কঠিন শৈলময় তটকেই সে পাথর ছুঁড়িয়া রগড়াইয়া চূর্ণ করিয়াছে।

তুমি যেখানে তটিনীকে পূর্ব্বে দেখ নাই, এখন সে সেখানে আপন মনে দিন রাত তরঙ্গ তুলিয়া ছুটিয়াছে। নূতন দেশে অপরের আশা ও আশঙ্কার কারণ হইয়াছে। তুমি ভাবুক, তাই তুমি তাহার চঞ্চল জলের উপরে চাঁদের শতবিম্ব দেখিয়া মুগ্ধ হও; কিন্তু তাহার যে চাঞ্চল্যে চন্দ্র শতধা বিভিন্ন হইয়াছে, সে চাঞ্চল্যের কারণ কি? তাহার জলের উপরে রক্তিম সূর্য্যের লাল আভা পড়ে, কখনও কাল মেঘের সঙ্গে তটিনী কালিমা মাখিয়া বসে; তুমি ভাবুক, কেবল উপরটা দেখ, কিন্তু তোমার মন ভুলাইবার এ ক্ষমতা তটিনীর কিসে হইল?

তটিনীর কি রূপপরিবর্ত্তনের বিরাম আছে? এই সে কিঞ্চিৎ অনতিকৃশাঙ্গী, কিন্তু ততটুকু দেহ কি পূর্ব্বে ছিল? সে যে অনন্ত সাগর-মাঝে ডুবিতে যাইতেছে, "গেছে সুখ, গেছে দুঃখ" বলিয়া বিষাদ স্বরে সৈকত-পুলিনে আপনাকে লুকাইতে চাহিতেছে, সেখানেই কি সে স্থির থাকিতে পারিবে? রবি তাহাকে দেখিতে পাইয়া হাতে ধরিয়া আপনার দিকে টানিয়া লইবে, পবন তাহাকে খেলার সঙ্গিনী করিয়া দূর দেশান্তরে বহিয়া লইয়া যাইবে, পথের মাঝে কোথায় কোন্ অজ্ঞাত দেশে তাহাকে নামাইয়া দিয়া চলিয়া যাইবে, তাহার সন্ধানও পাইবে না। তখন তুমি খিন্নমনে তটিনীর পূর্ব্ব-স্মৃতিটুকু অনুভব করিবে, সে আনন্দের ধারার পরিবর্ত্তে বন্য [illegible]ক্ষর কণ্টকের [illegible] বেদনাই তোমার সম্বল হইবে।

বৈজ্ঞানিক তাহার জলের পরিমাণ [illegible]

তাহার বন্ধের ব্যবস্থা করুন, ব্যবসায়ী তাহার স্রোতে বাণিজ্য বিস্তারের উদ্যোগ করুন; আমার কাছে তটিনী দুর্ব্বোধ্য। আমি তার একটা আবর্ত্তের কারণ বুঝিতে পারিলাম না, সমুদয় ত দূরের কথা। বৈজ্ঞানিকসিংহ অনন্ত সমুদ্রকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়াছিলেন, ছোট বড় কয়েকটা উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। আমি একটা ক্ষুদ্র তটিনীর ক্ষুদ্র জীবনই বুঝিতে পারিলাম না, বালুকাকণা সঞ্চয় ত দূরের কথা।

সহায় ভিন্ন সংসারে কাজ হয় না। তুমি যদি আমার সহায় হও, একবার বালুকা সংগ্রহের চেষ্টায় যাইতে চাই। তটিনী যে তোমায় ভালবাসে; তোমার সঙ্গে তাহার তীরে বেড়াইতে যাইতে চাই। আমায় লইয়া যাইবে? ইতি।

(৩)

প্রিয় নলিনী,

বিজ্ঞানের প্রথমটা একটু নীরস বই কি? কিন্তু তুমি যতটা মনে করিয়াছ, ততটা নহে। দেখিতেছি, তোমার নিজের দোষ কিছু পড়িয়াছে, শিখিবার দোষও কিছু আছে। তুমি সাগরমাঝে যাইতে চাও, অথচ একটা ক্ষুদ্র তটিনীর ক্ষুদ্র তরঙ্গ দেখিয়াই ভয় পাইলে!

জগতে যদি কিছু সুখ থাকে, তাহা সংগ্রামে জয়ী হইবার চেষ্টাতেই আছে। হইলে কি হয়, তা আমি নিজেই জানি না, তোমায় বলিব কি ক'রে? কিন্তু জয়ী হইবার জন্য যে উদ্যম ও অধ্যবসায় চাই, তার অভাব হয় নাই ত? তুমি মনে করিয়াছ বুঝি প্রকৃতি সহজেই দেখা দিবেন বা তোমার সঙ্গে কথা কহিবেন? তিনি যে কুলবধূ অপেক্ষাও লজ্জাবতী, নবোঢ়া অপেক্ষাও মৃদুভাষিণী, কহিনূর অপেক্ষাও দুষ্প্রাপ্যা, বিলাসিনী অপেক্ষাও চতুরা। অনেক আরাধনা ক্লেশ চাই, অনেক সাধ্য সাধনা চাই। কিন্তু তোমায় এইটুকু বলি, তাহার মনের মত হইতে চেষ্টা কর, নতুবা এই বেলাই সরিয়া পড়; শেষে কি বৃথা কতকগুলা শব্দরূপ আড়ম্বরের ভার বহিয়া মরিবে?

ব্যাকুলতা নইলে কি সামান্য একটা কাজও হয়? যখন তুমি শুইতে বসিতে, কথা কহিতে, চলিতে প্রকৃতিকে তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে দেখিবে, তখন তুমি একটু আশা করিতে পারিবে। যখন তুমি সাংসারিক লোকের মত সংসারের কাজে সুখ পাইবে না, একাগ্রচিত্তে তাঁহারই ভাবনায় বিভোর থাকিবে, তখন তুমি তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছ বলিয়া জানিবে। যখন তুমি না খাইয়াও মনে করিবে খাইয়াছ, ঘুমাইয়াও মনে করিবে ঘুমাও নাই, তখন তুমি তোমার চেষ্টা কিঞ্চিৎ সফল হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করিবে। তখন তুমি যে দিকে চাহিবে, সেই দিকে তোমার প্রিয় আরাধ্যাকে দেখিতে পাইবে, তাঁহার অনুচর্য্যায় যে আনন্দ, তাহারই জন্য সর্ব্বদা লালায়িত থাকিবে।

প্রাচীনেরা প্রকৃতিকে অবিদ্যা বলিয়া ঘৃণা করিতেন, প্রকৃতি যে কেবল লুকোচুরী খেলে, ধরা দেয় দেয়, আবার তখনই কোথায় অন্তর্হিত হয়। তাঁহারা প্রকৃতিকে দেখিতে পারিতেন না। সরল লোকে সারল্য চায়, ছলনা দেখিতে পারে না। আমার মনে হয়, তাঁহারা একটু ভুল বুঝিয়াছিলেন। প্রকৃতি ছাড়িয়া কি পুরুষ খুঁজিতে পারা যায়? যাই হউক আজকালকার লোকে প্রকৃতিকে অনাদর করে না। সে কত ফাঁকি দিতে পারে, কত খেলা খেলিতে পারে, ইহাই দেখিবার জন্য সকলে সজাগ হইয়া থাকে। ইহারা বৈষম্য বাহির করিয়া সাম্যের অনুসন্ধান করে। এইরূপে প্রকৃতির সঙ্গে খেলা করিতে গিয়া অনেকে প্রাণ হারাইয়াছে, অনেকে চিরজীবন বিকলাঙ্গ হইয়াছে। কিন্তু এত দেখিয়া শুনিয়াও লোকে তাহার সঙ্গ ছাড়িতেছে না!

এক এক বার প্রকৃতির উপর চটিয়া যাই, তাহাকে নিষ্ঠুর ভাবিয়া পশ্চাদ্পদ হই, এমন কুহকিনীর চর্চ্চায় সময় কাটাইয়াছি বলিয়া নিজকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু একটু আশার কথা, একটু হাসির রেখা দেখিলে আবার ঘুরিয়া বসি, সমুদয় ক্লেশ ভুলিয়া যাই। তাহাকে দুর্ব্বোধ্য ভাবিয়া কতবার মনে করিয়াছি তাহার চর্চ্চা ছাড়িয়া দিব, মনে করিয়াছি অজ্ঞানই ভাল, বিজ্ঞানের কূলকিনারা নাই; কিন্তু আবার কি মায়ার ছলনায় ঘুরিতে ঘুরিতে তাহারই দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি। শুনিয়াছি, যে তাহার তত্ত্বে ফিরিয়াছে, তাহারই নাকি এ দশা ঘটিয়াছে।

লোকে বলে প্রকৃতি হাস্যময়ী। সেটা কবির কল্পনা। সে যে সরলা নয়, তা বেশ জানিয়াছি। আর তার হাসিটাও কি সারল্যের হাসি? সে হাসি কি রকম জান? লোকে, বিজ্ঞ বিজ্ঞ লোকে, প্রবীণ পলিতকেশ, সংসার

#144 to 151. FOLIOS ARE TOO MUCH BRITTLE,

ভুলিয়া তার অনুগমন করিতেছে, এই দেখিয়া প্রকৃতির হাসি পায়। তাহার কি রূপ দেখিতে চায়, সে আর এক রূপ দেখাইয়া ভুলাইয়া রাখে; এই আত্মক্ষমতা প্রকাশেই প্রকৃতি হাসে। সম্ভ্রান্ত বিজ্ঞ ব্যক্তিকে পথের মাঝে সং সাজিতে দেখিলে লোকে যেমন হাসে, প্রকৃতিরও তেমনই হাসি।

কিন্তু তা বলিয়া সে সকলের কাছে তেমন হাসি হাসে না। তার প্রিয় অনুচরদিগের কাছে না কি সে অন্য হাসি বাহির করে। এই শুনিতে পাইয়া অপরে সে হাসি দেখিতে দৌড়াদৌড়ি করে। কিন্তু প্রকৃতি এমনই চতুরা, তাহাদিগকে আসিতে দেখিলেই কেবল বচনশীলা হয়, মায়া বিস্তার করিয়া আন্তর হাসি লুকাইয়া ফেলে।

তুমি যখন সে পথে যাইবে বলিয়া মনে করিয়াছ, তখন এসব কথাও স্মরণ রাখিও। হয়ত জন্মটা কাটিয়া যাইবে, প্রকৃতি তোমার উপর প্রসন্ন হইবেন না। কিন্তু একথাও মনে রাখিবে, যদি কখনও তাঁহার সাগরে ডুবিতে পার, সেখানে যে মহামূল্য মণিমাণিক্য দেখিবে, তাহাতেই তুমি কৃতার্থ মনে করিবে, তাহাদের দীপ্তিতে তোমার চক্ষুর তৃপ্তি হইবে না। ইহাও মনে রেখো, বিজ্ঞানচর্চ্চাটা মদের নেশা, একটু নেশা করিতে জানিলে আরও করিতে ইচ্ছা হইবে।

তোমাকে প্রকৃতি ভালবাসেন। নতুবা তোমায় তিনি এত ভাল করিবেন কেন? তুমি তাঁহার দুই একটা কথা নিশ্চয় শুনিতে পাইয়াছ; সে কথাগুলি আমায় শুনাইবে না? ইতি।

তোমার স্নেহের
প্রলাপী।

বৃহস্পতির কলঙ্ক।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার যে স্বাভাবিকত্ব আছে, তাহা অনেকে বিশ্বাস করেন না. বিজ্ঞান প্রাকৃতিক জ্ঞানের একটি ধারাবাহিক সমষ্টিমাত্র! ইহার অভিব্যক্তি আকস্মিক অথবা অস্বাভাবিক নহে; অতি স্বাভাবিক অবস্থায় স্তরে স্তরে সোপান হইতে সোপানান্তরে পদার্পণপূর্ব্বক বিজ্ঞান উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। বৈজ্ঞানিক এবং সাধারণ লোকের মধ্যে এই একটী বিশেষ পার্থক্য যে, বৈজ্ঞানিক ব্যক্তি বিজ্ঞানবিষয়ক আবিষ্ক্রিয়াকে অস্বাভাবিক বা আকস্মিক মনে করিয়া অপ্রত্যাশিতভাবে তাহাকে গ্রহণ করেন না; কিন্তু সাধারণ লোকের নিকট তাহা সম্পূর্ণ আকস্মিক, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যাঁহারা বিজ্ঞান পর্য্যালোচনা করেন, তাঁহারা স্পষ্টতঃ দেখিতে পাইয়া থাকেন যে, মানুষের জ্ঞান স্বতঃই এমন এক সীমানায় আসিয়া উপনীত হয়, যাহার পর একপদ অগ্রসর হইলেই কোন না কোন একটী আবিষ্ক্রিয়াতে হাত পড়ে। এই হাত পড়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না, তাই আবিষ্কর্ত্তার জগতে এত সমাদর!

নিউটন যখন মাধ্যাকর্ষণশক্তি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তখন তিনি একটা নূতন শক্তির সৃষ্টি করিয়াছিলেন না। জগতে ঐ শক্তি সৃষ্টির আদি হইতে বিদ্যমান ছিল, এমন কি উহাই যে মূল সৃজনশক্তি, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। নিউটনের সমকালে মানব-জ্ঞান এমন এক সীমানায় উপনীত হইয়াছিল, যে স্থলে কতকগুলি কার্য্যের কারণ নির্দ্দেশ অবশ্যম্ভাবী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তখনই নিউটন হাত বাড়াইলেন এবং উপরোক্ত মহাশক্তির আবিষ্কার হইল! নিউটন দেখাইলেন যে, বৃক্ষ হইতে ফল পড়িতেছে, পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া চন্দ্র ঘুরিতেছে, সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া পৃথিবী এবং অপরাপর গ্রহগণ ঘুরিতেছে,—এ সমস্ত প্রক্রিয়াই এক বিধানের অবশ্যম্ভাবী ফলমাত্র। চন্দ্রকে যদি অপেক্ষাকৃত নিকটে আনা যায়, তবে তাহা পৃথিবীকে বেষ্টন না করিয়া একটা বৃক্ষস্থিত ফলের ন্যায় একেবারে পৃথিবীর পৃষ্ঠে আসিয়া পড়িবে। এবম্বিধ আবিষ্ক্রিয়াতে নূতনত্ব অথবা আকস্মিকত্ব কিছুই নাই, কেবল কতকগুলি পুরাতন পরিজ্ঞাত ঘটনার হেতু বোধ মাত্র।

আবিষ্ক্রিয়ার আকস্মিকত্বে অবিশ্বাসী বলিয়া বৈজ্ঞানিক-সমাজে প্রত্যেক আবিষ্ক্রিয়ার পরীক্ষা হইয়া থাকে। মনীষিশ্রেষ্ঠ লাপ্লাশের হাতে নিউটনের আবিষ্ক্রিয়ার অতি কঠোর পরীক্ষা হইয়াছিল; তাঁহার বিস্তারিত ফল "Traite de Mecanique Celeste" নামক গ্রন্থে বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থ সম্বন্ধে জনৈক সুবিখ্যাত ইংরাজ জ্যোতিষী এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, "উক্ত গ্রন্থ মানব মনোবিকাশের চরম কীর্ত্তিস্তম্ভ" (The most stupendous monument of the human intellect)!!! ঐ গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ে ইহা দর্শান হইয়াছে যে, আবিষ্ক্রিয়াতে আকস্মিকত্ব না থাকিলেও, তাহার পরীক্ষা গ্রহণার্থ যে সকল ঘটনাবলীর অবতারণা করিতে হয়, তাহাদের আকস্মিকত্ব অতীব প্রয়োজনীয়। অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে কোন একটী ঘটনা ঘটিলে তাহাকে কোনও আবিষ্কৃত বিধানের অন্তর্ভূত করিতে পারিলেই উক্ত বিধানের সত্যতা বিষয়ে একটী জীবন্ত সাক্ষী পাওয়া গেল। এই কারণে বৈজ্ঞানিক সমাজে ঘটনাবিষয়ক আকস্মিকত্বের অত্যন্ত আদর।

আমরা এস্থলে উক্ত প্রকার ঘটনাবিষয়ক আকস্মিকত্বের একটী দৃষ্টান্ত দিতে বসিয়াছি;—

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে লেক্সেল নামক জনৈক জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত একটী ক্ষুদ্রকায় ধূমকেতু আবিষ্কার করেন। (এস্থলে ইহা জানা আবশ্যক যে, 'আবিষ্কার' শব্দের অর্থ প্রথম দর্শন মাত্র; ইহা জ্ঞানজনিত আবিষ্ক্রিয়া নহে, কেবল ইন্দ্রিয়জনিত প্রাথমিক জ্ঞান!) গণনাদ্বারা প্রতিপন্ন ও অবশেষে প্রত্যক্ষতঃ জ্ঞানগোচর হইল যে, উক্ত বর্ষের ১৪ই আগষ্ট তারিখে উক্ত ধূমকেতু সূর্য্যের সর্ব্বাধিক নিকটবর্ত্তী হইয়া পরিভ্রমণ করিয়াছিল।

নিউটনের আবিষ্ক্রিয়া হইতে ইহা জ্ঞাত হওয়া যায় যে, ধূমকেতুগণ সাধারণতঃ তিন বিভিন্ন প্রকারের পথে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে,—(১ম) "সমক্ষেত্র" পথে (অর্থাৎ Parabolic orbit); (২য়) "অবক্ষেত্র" পথে (অর্থাৎ Elliptic orbit); এবং (৩য়) "অতিক্ষেত্র" পথে (অর্থাৎ Hyperbolic orbit)। এই সকল ক্ষেত্রবিপর্য্যয়ের একমাত্র কারণ কৈন্দ্রিকাকর্ষণের তারতম্য। উপরোক্ত ধূমকেতুর পর্য্যবেক্ষণ ফল পর্য্যালোচনা করিয়া লেক্সেল সাহেব এই সমস্যায় উপনীত হইলেন যে, উক্ত ধূমকেতু একটী "অবক্ষেত্র" পথে প্রতি ছয় বৎসরে একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলিতেছে। এই গণনানুক্রমে ১৭৭৬ খৃঃ অঃ উক্ত ধূমকেতুর পুনরাবির্ভাব হইবার কথা ছিল, কিন্তু লেক্সেল সাহেব তাহার পূর্ব্বে উপরোক্ত গণনা প্রকাশিত না করাতে কেহই উক্ত ধূমকেতু পর্য্যবেক্ষণ করিতে প্রত্যাশা করেন নাই। ক্রমে আরও ছয় বৎসর অপেক্ষা করিয়া ১৭৮২ খৃঃ অঃ লেক্সেল স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন; কিন্তু বিধির বিধানের বিচিত্রতাবশতঃ ঐ ধূমকেতু আর নেত্রগোচর হইল না। বহু পর্য্যালোচনা করিয়া ইহাও দেখা গেল যে, ১৭৭০ খৃঃ অঃ র পূর্ব্বে ঐ ধূমকেতু আর কখনও নেত্রগোচর হয় নাই। এক্ষণে এই সমস্যা উঠিল যে, উক্ত ধূমকেতুর গতিবিধি বিষয়ে নিউটনের আবিষ্কৃত বিধান খাটিল না কেন? গণনার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ পুনরাবৃত্তি হইল, কিন্তু কিছুতে কিছু হইল না। শেষ সমস্যা এই দাঁড়াইল যে, নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিলে তাহার সত্যতাতে সন্দেহারোপ অবশ্যম্ভাবী!

পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই জ্ঞাত আছেন যে, বৃহস্পতিগ্রহ, তাহার পাঁচটী উপগ্রহ-(ইতিপূর্ব্বে ৪টী মাত্র উপগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল, পঞ্চম উপগ্রহটী ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়) সহকারে সূর্য্য হইতে প্রায় ৫০ কোটী মাইল ব্যবধানে থাকিয়া দ্বাদশ বৎসরে একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। উপরোক্ত ধূমকেতুর কক্ষপথের লম্বমান পরিসর প্রায় ৫০ কোটী মাইল গণনা হইয়াছিল। অতএব দেখা গেল যে, ধূমকেতু যখন সূর্য্য হইতে অত্যধিক দূরবর্ত্তী হয়, তখন তাহা বৃহস্পতির কক্ষপথের অতি সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকে। সমগ্র গ্রহমণ্ডলীর মধ্যে বৃহস্পতি সর্ব্বাপেক্ষা গুরু; একারণ ইহা অনুমিত হওয়া স্বাভাবিক যে, যখন ধূমকেতু বৃহস্পতিকক্ষের নিকটবর্ত্তী হয়, তখন যদি বৃহস্পতি ঐ সন্নিধানে আপন কক্ষে বিরাজ করে, তাহা হইলে বৃহস্পতির বিপর্য্যয় আকর্ষণ ধূমকেতুতে প্রলয় উৎপাদন করিতে সক্ষম হইবে। গণনা দ্বারা দেখা গেল যে, ১৭৬৭ খৃঃ অঃ বৃহস্পতি, স্বীয় কক্ষের যে স্থলে, ধূমকেতুর কক্ষসন্নিহিত হইয়াছে, সেস্থলে অবস্থিত ছিল, এবং ধূমকেতুও ঐ সময় উক্ত স্থলে উপস্থিত ছিল। আবার ইহাও দেখা যায় যে, বৃহস্পতি একবার স্বীয় কক্ষাবর্ত্তন করিতে করিতে ধূমকেতু দুইবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া পুনরায় সেই স্থানে উপনীত হইয়াছে। অতএব গণনা দ্বারা সিদ্ধান্ত হইল যে, একবার ১৭৬৭ খৃঃ অঃ ও পুনরায় ১৭৭৯ খৃঃ অঃ বৃহস্পতি এবং ধূমকেতু পরস্পরের সাহচর্য্য উপভোগ করিয়াছে।

লাপ্লাশ প্রণীত পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের নবম খণ্ডের দ্বিতীয়

অধ্যায়ে ইহার সবিশেষ গণনাসম্বলিত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। লাপ্লাশ তাহা হইতে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, উপরোক্ত ধূমকেতু কদাচ সৌর পরিবারের অন্তর্ভূত ছিল না। ১৭৬৭ খৃঃ অঃ একদা তাহা কোন অনির্দ্দিষ্ট পথে বিচরণ করিতে করিতে বৃহস্পতির কবলে পতিত হয় এবং তাহার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া স্বধামভ্রষ্টা অভিসারিকার ন্যায় সৌরপরিবারের আশ্রয় গ্রহণ করে। পরিশেষে ১৭৭৯ খৃঃ অঃ যখন পুনরায় দুর্দ্দান্ত বৃহস্পতির সন্নিহিত হয়, তখন বৃহস্পতিদেব তাহাকে আপন অন্দরমহলে লুক্কায়িত করিয়া রাখেন। (লাপ্লাশ দেখাইয়াছেন যে, ধূমকেতু পুনরায় বৃহস্পতির সন্নিধানে আসিলে, বৃহস্পতির আকর্ষণ তাহার উপর এত প্রবল হয় যে, তাহার বলে ধূমকেতু পুনরায় আপন পরিলব্ধ কক্ষপথ ছাড়িয়া বৃহস্পতিকে প্রদক্ষিণ করিতে আরম্ভ করে।) কিন্তু ধূমকেতুর যেন লজ্জাবোধ হঠাৎ জাগরিত হইয়া উঠিল,—বৃহস্পতিকে বেষ্টন করিয়া এক আবর্ত্তনপূর্ণ করিয়াই একেবারে মহাবেগে ছুটিয়া সৌরপরিবার ছাড়িয়া পুনরায় অপর কোন অনির্দ্দিষ্ট পথে অনন্তবিমানপথে চলিয়া গেল।

বৈজ্ঞানিকের হাতে পড়িয়া এই আকস্মিক ঘটনাটী নিউটনাবিষ্কৃত বিধানের একটী অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে প্রকটিত হইয়াছে। কিন্তু অবৈজ্ঞানিক পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে, দেবগুরু বৃহস্পতির পক্ষে ইহা কিরূপ কলঙ্কের কথা!

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

(পুনশ্চ) পাঠকদিগের ভিতরে এমন কেহ আছেন কি, যিনি সাহস করিয়া বলিতে পারেন যে, বৃহস্পতির পঞ্চম উপগ্রহটী (১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণের ভারতী দ্রষ্টব্য।) লেক্ষেলের ধূমকেতু "ঘনীভবন" সমুৎপন্ন নহে?

চুলকাটা মিষ্‌মী।

আসামের সীমান্তে দিগারু ও দিবংনদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে চুলকাটা মিষ্‌মীদিগের বাস। তাহাদের প্রকৃত নাম মিধি। কিন্তু তাহারা মিষ্‌মীদিগের নিকটসম্পর্কীয় বলিয়া এবং সম্মুখের চুল কপালের উপর খাট করিয়া কাটে বলিয়া আসামবাসিগণ তাহাদিগকে চুলকাটা মিষ্‌মী বলেন। চুল কাটিবার এই ফ্যাষণটি ইংরাজদের মধ্যে এবং ইংরাজের "হনূকারী" কোন কোন বাঙ্গালী পরিবারে দৃষ্ট হয়। কিন্তু মিধিরাই এই ফ্যাষণটির স্রষ্টকর্ত্তা। তাহাদের প্রতিবেশীরা তাহাদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা, অবিশ্বাস ও ভয় করে। কারণ, তাহারা সুযোগ পাইলেই অপর জাতীয় স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে চুরি করিয়া লইয়া পলায়। তাহারা বড় ধূর্ত্ত ও প্রতারক। তাহারা নিজ পার্ব্বত্য দেশ হইতে সমতল ভূমিতে দলে দলে নামিয়া আসে। দেখিলে মনে হয় যে তাহারা বড়ই নিরীহ। আসিবার সময় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঝুড়ি বহন করিয়া আসে। মনে হয় পণ্যদ্রব্যপূর্ণ ঝুড়িগুলির ভারে যেন তাহারা অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু যখনই তাহারা কোন অরক্ষিত গ্রামে উপস্থিত হয়, অমনি নিজ নিজ মিথ্যা বোঝা ফেলিয়া দিয়া গ্রামস্থ বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক ও শিশুকে ধরিয়া পাহাড়ে লইয়া পলায়।

ইহাদের এক একটি গ্রামে ১০ হইতে ৩০টি পর্য্যন্ত গৃহ থাকে। গৃহগুলির কাঠামো অতিশয় হাল্‌কা। প্রত্যেকটি প্রায় ৮ হাত চওড়া ও ৪০ হাত লম্বা। গৃহের একটি পার্শ্ব ব্যাপিয়া কেবল একটি যাতায়াতের পথ থাকে। অপর পার্শ্বটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষে বিভক্ত। এই কক্ষ গুলিতে দুই চারিটি বসিবার চৌকী থাকে। সভ্যতার এই চিহ্নটি ভারতবর্ষের অনেক কুটীরেই দৃষ্ট হয় না।

ইহাদের দলপতিগণের নাম গাম্। গামেরা আলুন্দী, আলুঙ্গা প্রভৃতি সুশ্রাব্য নাম ভালবাসে। নিজের দলের উপর ইহাদের বেশ প্রভাব আছে, কিন্তু দলস্থ লোকদের সম্পত্তির উপর ইহাদের কোন ক্ষমতা নাই। ইহারা অপরাধীকে দণ্ড পর্য্যন্ত দিতে পারে না। যদি একজাতির কোন লোক অপর জাতির কাহারও অনিষ্ট করে, তাহা হইলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির দল ইহার প্রতিশোধ লওয়াটা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি স্বজাতীয় কাহারও অনিষ্ট করে, তাহা হইলে অপরাধীর দণ্ডবিধান, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

পত্নীর সংখ্যা চুলকাটা মিষ্‌মীদের ধনশালিতার একটা চিহ্ন। কোন কোন দলপতির ষোলটী পর্য্যন্ত পত্নী থাকে। এ বিষয়ে ইহারা কিন্তু আমাদের দেশের কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মত ঐশ্বর্য্যশালী নহে। ডাল্টন সাহেব বলেন, ইহাদের মধ্যে বৈবাহিক ক্রিয়াকলাপ কিছুই নাই। ইহা কেবল ক্রয়ের ব্যাপার। ইহাদের মধ্যে সতীত্বের আদর

নাই। স্বামী এরূপ প্রত্যাশা করে না যে, তাহার ক্রীত স্ত্রীলোকগুলি সতী হইবে বা থাকিবে। যদি তাহারা তাহার দাসীত্ব করে, তাহাতেই সে সন্তুষ্ট।

মিধি বা চুলকাটা মিষ্‌মীরা বণিকের জাতি। তিব্বৎ দেশের সহিত তাহারা প্রায়ই দলে দলে বাণিজ্য করিতে যায়। পুরুষেরা নিজে বাণিজ্য করিতে যাইতে না পারিলে পত্নীগণকে পাঠাইয়া দেয়।

মিধিদের রং কৃষ্ণাভ কপিশবর্ণ হইতে গৌর পর্য্যন্ত নানা রকমের দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক মিধি যুবতী বেশ সুন্দরী; কিন্তু তাহাদের সম্মুখের চুল কপালের উপর

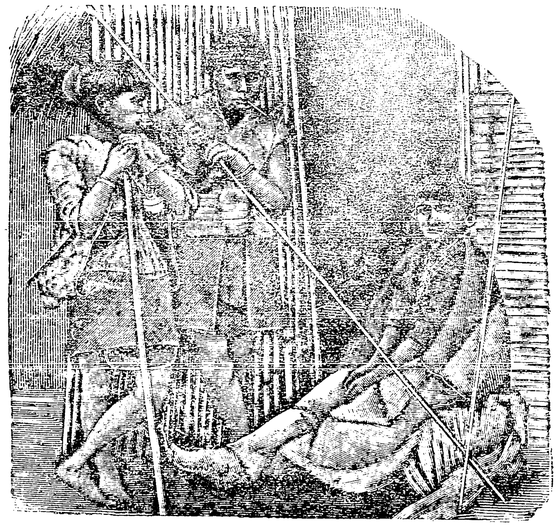

খাট করিয়া কর্ত্তিত হওয়ায় তাহাদিগকে বড় কুৎসিত দেখায়। তাহারা পশ্চাতের চুলে খোঁপা বাঁধিয়া তাহা একটা সজারুর শল বা হাড়ের কাঁটা দিয়া আটকাইয়া রাখে। পুরুষেরা বৈদল শিরস্ত্রাণ পরিধান করে। তাহাতে তাহাদের ভ্রূর উপর পর্য্যন্ত ঢাকা থাকে, মাথাটা প্রকাণ্ড দেখায় এবং মুখাবয়ব অতিশয় ভ্রূকুটিকুটিল প্রতীয়মান হয়। তাহাদের মুখাবয়ব কদর্য্য মঙ্গোলীয় ছাঁচের; মুখ চেপ্টা ও চওড়া, নাসারন্ধ্র বিস্তৃত ও গোল এবং চক্ষু ছোট ও টেরা। পুরুষদের চেয়ে স্ত্রীলোকেরা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকায় ও সুশ্রী।

মিষ্‌মীদিগের যত শাখা আছে, তন্মধ্যে চুলকাটারাই সর্ব্বাপেক্ষা শিল্পনিপুণ। তাহারা কাপাস ও পশমের কাপড় বুনিতে পারে; তদ্ভিন্ন পার্ব্বত্য নানাবিধ তন্তুমান্ উদ্ভিদ্ হইতেও কাপড় বুনে। বিছুতিজাতীয় এক প্রকার গাছ হইতে তাহারা এমন শক্ত কাপড় তৈয়ার করে যে, তাহার জামা তাহাদের এবং আরবদিগের মধ্যে বর্ম্মরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহারা প্রধানতঃ নানাপ্রকারের কাপড় আসামে বিক্রয় করিতে আসে। ইহাদের ক্রয়বিক্রয় প্রথা বড় অদ্ভুত। ইহারা প্রধানতঃ লবণের বিনিময়ে বস্ত্রাদি বিক্রয় করে। কোনপ্রকার প্রচলিত ওজন অনুসারে ইহারা লবণ লয় না। লবণ-বিক্রেতার দোকানের সম্মুখে বসিয়া তাহারা সতর্কতার সহিত নিজ সুরক্ষিত ঝুড়ি হইতে বিক্রেয় একটি জিনিষ লয়। জিনিষটি পায়ের আঙ্গুলের নীচে বা হাঁটুদ্বয়ের মধ্যে দাবিয়া রাখিয়া, তাহারা দুটা ময়লা হাত সাদা চক্‌চকে নুনের ঝুড়িতে ডুবাইয়া, যতটা দুহাতে উঠে, আপনাদের ঝুড়িতে লইয়া যাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু ইত্যবসরে লবণ-বিক্রেতা হাতের এক ঘা মারিয়া অর্দ্ধেক লবণ তাহাদের হাত হইতে কাড়িয়া লয়। তাহার পর উভয়পক্ষে ঘোরতর বচসা আরম্ভ হয়! সাধারণতঃ লবণ-বিক্রেতা আরও কিছু লবণ দিলেই বিবাদ মিটিয়া যায়। বস্ত্রব্যতীত চুলকাটারা বাজারে মোম, আদা ও লঙ্কা প্রচুর পরিমাণে লইয়া আসে।

শিরস্ত্রাণব্যতীত অপরাপর বিষয়ে ইহাদের পরিচ্ছদ অন্যান্য মিষ্‌মীদিগের মত। কিন্তু ইহাদের স্ত্রীলোকেরা অন্যান্য মিষ্‌মীদিগের অপেক্ষা বৃহদায়তন কাঁচুলী বা আঙ্গিয়া পরে। অধিকন্তু তাহাদের আঙ্গিয়াগুলি নানাবিধ সুন্দর সূচীকার্য্যে বিভূষিত। ঋজু তিব্বতীয় তরবারি, ধণুর্ব্বাণ এবং ছোরা ইহাদের প্রিয় অস্ত্র। মিষ্‌মীদিগের মধ্যে কেবল ইহারাই বিষাক্ত তীর ব্যবহার করে। তাহারা মহিষচর্ম্মনির্ম্মিত চারিকোণা ঢাল ব্যবহার করে। যোদ্ধারা অস্ত্রবিনিময় দ্বারা শপথ পূর্ব্বক বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হয়। যদি যুদ্ধে একজনের পতন হয়, তবে অপর ব্যক্তি আপনাকে প্রতিশোধ লইতে এবং মৃত বন্ধুর মস্তকটির পুনরুদ্ধার করিতে বাধ্য মনে করে।

চুলকাটারা গ্রাম হইতে দূরে অরণ্যে মৃতব্যক্তিগণের দেহ প্রোথিত করে। জঙ্গলের মধ্যে এক স্থানের বৃক্ষাদি কাটিয়া পরিষ্কার করা হয়। সেই খানে গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহাতে মৃত ব্যক্তির দেহ, অস্ত্রশস্ত্র ও পরিচ্ছদ রাখিয়া

মাটি দিয়া গর্ত্তটি ভরাট করা হয়। তাহার পর সকলে কবরের উপর নৃত্য করে।

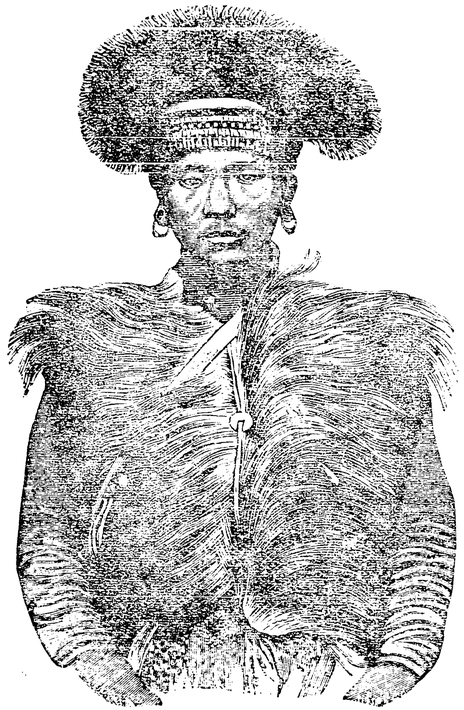

"পদোচিত পরিচ্ছদ-পরিহিত মিধি দলপতি।"

ডাণ্টন বলেন যে, তিনি চুলকাটাদের মত সম্পূর্ণ ধর্ম্ম-ভাববিবর্জ্জিত আর কোনও জাতি দেখেন নাই। তাহারা তাহার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় পরলোক বা আত্মার অমরত্বে বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস প্রকাশ করে নাই। তাহারা বলে যে, যে সকল ভূতের অনুগ্রহ লাভের তাহারা চেষ্টা করে, তাহারাও তাহাদেরই মত মরণশীল। তাহারা যদিও বলে যে একজন সৃষ্টিকর্ত্তা নিশ্চয়ই ছিলেন, কিন্তু ইহা কিছুতেই মানিতে চায় না যে তিনি এখনও বাঁচিয়া আছেন। তাহাদের বিশ্বাস, মানুষ মরে ও পোকায় তাহাকে খাইয়া ফেলে। ডাণ্টনসাহেব বলেন, "যখন আমি তাহাদিগকে বলিলাম, তোমরা যে কবরের মধ্যে খাদ্যদ্রব্য ও অস্ত্রশস্ত্রাদি দাও, সে প্রথাটা বোধ হয় এই ধারণা হইতে উৎপন্ন যে প্রেতাত্মারা এই সকল জিনিষ আবার পাইবে; তখন তাহারা তদুত্তরে বলিল, আদৌ না; আমরা কেবল আমাদের মৃতজ্ঞাতির প্রতি প্রীতির চিহ্নস্বরূপ এই সকল জিনিষ কবরে রাখিয়া দি। মৃতব্যক্তি যে জিনিষ ব্যবহার করিয়াছে, তাহা ব্যবহার করিতে আমাদের ইচ্ছা হয় না; আমরা তাহার মৃত্যু দ্বারা লাভবান্ হইতে চাই না।"

ডাণ্টন সাহেব চুলকাটাদের ভাষা কিরূপ বুঝিতেন, তিনি কতকাল তাহাদের মধ্যে যাপন করিয়াছিলেন এবং কত ভিন্নশ্রেণীস্থ লোকের সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা না জানিলে, তাঁহার কথা কতদূর প্রামাণিক তাহা বলা যায় না।

আকাশ কেন নীল?

অনুবাদ।

Why does azure deck the sky, &c.

—Thomas Moore.

আকাশ কেন নীল?
সে, হইতে চাহে তব নয়ন-প্রায়।
গোলাপ কেন লাল?
সে, অনুকারে ও কপোল-রক্তিমায়।
যা কিছু আছে সুন্দর, প্রিয়া,
রচিত তাহা তোমারে দেখিয়া।

তুষার কেন শুভ্র অতিশয়?
সে কি, হতে না চাহে বক্ষের সমান?
অরুণবিম্ব কেন এত উজল্?
সে, লভিতে চাহে তব কেশের মান।
যা কিছু আছে উজ্জ্বল, প্রিয়া,
রচিত তাহা তোমারে দেখিয়া।

প্রকৃতি-রূপ কেন এত মোহন?
সে যে, তোমারি রূপ নেহারি তার গায়।
হৃদয় গলে সঙ্গীতে কেন?
সে, কথা কহে যে তোমারি কণ্ঠপ্রায়।
যা কিছু আছে মনোজ্ঞ, প্রিয়া,
রচিত তাহা তোমারে দেখিয়া।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

বিদ্রোহ।

এবার ডেকোনা মোরে, কুমতি রূপসি,
অয়ি মায়াবিমণ্ডিতা, থাক মানে বসি'
বিষম ছলনা ভরে; আমি এর মাঝে,
শুনে আসি, ধীর-মন্দ্রে নিরন্তর বাজে
কোথা হেন মহান্ সঙ্গীত! খুঁজি ল'ব পথ;
নবীন সাধনাপানে ছুটাইব রথ।
রাখিয়াছ জড়াইয়া মৃদু-অন্ধ-প্রেমে,
ঝঙ্কারিত, কণ্টকিত মণি-মুক্তা-হেমে
শুধু জর্জ্জরিত করি; সোহাগ-পরশে
হের, রক্ত ঝলসিছে অলস উরসে!
ধূসর ধরণীক্রোড়ে ছেড়ে দেও মোরে,
উদার গগনতলে চিরমুক্ত ক'রে।
—যবে মিষ্টস্তব কাণে করিব গুঞ্জন,
করিও না, অনাদৃতা, এ মান ভঞ্জন!

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

শ্রীবিলাসের দুর্ব্বুদ্ধি।

শ্রীবিলাস বাবুর বিবাহিত-জীবন সুখের ছিল কি দুঃখের ছিল, তাহা তিনি ঠিক বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহার স্ত্রী সরোজবাসিনী যে তাঁহাকে যথেষ্ট ভালবাসেন, তাহার পরিচয় শ্রীবিলাস শত সহস্র বার পাইয়াছেন। কিন্তু এই ভালবাসার মধুরাশির মধ্যে, মাঝে মাঝে মধুমক্ষিকার হুলের দংশনজ্বালা অনুভব করিয়া তিনি অস্থির হইয়া পড়িতেন। আসল কথাটা এই যে, তাঁহার স্ত্রীটি কিছু মুখরা ছিল। আর শ্রীবিলাসও বোধ হয় একটু অযথা পরিমাণে অভিমানী ছিলেন। তাই মাঝে মাঝে তাঁহাদের দাম্পত্যজীবনের ঐকতানবাদনে সুর সহসা কাটিয়া গিয়া আগাগোড়া খাপছাড়া হইয়া যাইত।

পূর্ব্বের কথা এই। শ্রীবিলাসের শ্বশুর হরিগোপাল বাবু—লক্ষ্ণৌয়ের সেই প্রসিদ্ধ হরিগোপাল বাবু। ও অঞ্চলের লোক, কে না তাঁহার নাম শুনিয়াছে; এবং—ধনী হউক, দরিদ্র হউক, পরিচিত হউক, অপরিচিত হউক,—কোন্ বাঙ্গালী তাঁহার বাড়ীতে অন্ততঃ একটি বারও পাত পাড়ে নাই? তিনি বাসায় রাখিয়া, খাওয়াইয়া, পরাইয়া, কত লোকের যে চাকুরি করিয়া দিয়াছেন তাহার কি সংখ্যা আছে? আহা, ওদিককার গরীব লোকে আজিও তাঁহার নাম করিয়া কাঁদিয়া মরে! সে কথা যাউক;—তাঁহাদের মেয়ের বিবাহ দেওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার ছিল। সারা বাঙ্গলা দেশে দুই তিনখানি মাত্র গ্রামে তাঁহাদের "ফের্‌তা ঘর"—অর্থাৎ যাহাদের সঙ্গে বিবাহ চলে—ছিল। পাত্র যুটানই মুস্কিল ছিল;—কিন্তু যদি পাত্রও বা যুটিল, তবে হয় সে একটি হস্তিমূর্খ, নয় ত একেবারে নিঃস্ব। একবার তিনি পূজার সময় সপরিবারে কাশীতে আসিয়াছিলেন, সেই সময় পিতৃমাতৃহীন দশ বৎসর বয়স্ক শ্রীবিলাস তাঁহার আশ্রয়ে পতিত হইল। তাঁহাকে স্বজাতীয় এবং "স্বঘরের" দেখিয়া হরিগোপাল বাবু আগ্রহের সহিত কুড়াইয়া লইলেন; এবং লক্ষ্ণৌয়ে লইয়া গিয়া বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। ছেলেটির সৎ স্বভাব ও বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া, তখন হইতেই তাহাকে স্বীয় ভাবী জামাতা বলিয়া স্থির করিয়া রাখিলেন। সেইভাবেই লালনপালন এবং শিক্ষার বন্দোবস্ত করিলেন। আঠার বৎসর বয়সে শ্রীবিলাস প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল; তখন কন্যার বয়ঃক্রম বারো বৎসর হইয়াছে দেখিয়া হরিগোপাল বাবু দুই জনকে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে বাঁধিয়া দিলেন। এই শুভ ঘটনার পর তিনি এক বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন।

শ্রীবিলাস তখন এফ্‌এ পড়িতেছেন। হঠাৎ তাঁহার শ্বশুর মহাশয়ের বসন্তরোগে মৃত্যু হইল। এই আকস্মিক দৈবদুর্ঘটনায় শ্রীবিলাসের পড়া বন্ধ হইল। শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে তাঁহার শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী বলিলেন,—"চল বাছা, আমরা দেশে গিয়া থাকি। এই যমপুরী লক্ষ্ণৌ সহরে আমি আর একদিনও টিকিতে পারিব না।"

তাহাই হইল। লক্ষ্ণৌয়ের ত্রিতল বাড়ীটা একপ্রকার বিনা মূল্যেই বিক্রীত হইল। জিনিষপত্র কতক বিক্রীত, কতক বিতরিত, এবং অবশিষ্ট গোলমালে অপহৃত হইল। দিন পোনর কুড়ির মধ্যে সমস্ত পরিষ্কার। তখন সেই পরিবার চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে বঙ্গদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শ্রীবিলাসের স্ত্রী হরিগোপাল বাবুর সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা ছিলেন। সরোজবাসিনীর আর দুই ভগ্নী এবং একটি

ভ্রাতা ছিল। ভগ্নী দুইটি নিজ নিজ শ্বশুরালয়ে ছিল। ভ্রাতাটির নাম সতীশ, সাত আট বৎসর বয়স। সুতরাং শ্রীবিলাসই এখন এ পরিবারের অভিভাবক। দেশে বাস করিতে লাগিলেন। বৎসর খানেক ধরিয়া চতুর্দ্দিক হইতে আত্মীয় কুটুম্বগণ একে একে আসিয়া বিগত দুর্ঘটনার জন্য সমবেদনা জানাইয়া গেলেন। সকলেই গৃহিণীকে কহিলেন,—"জামাইটিকে বসাইয়া রাখা ভাল হইতেছে না। ইহাকে কলিকাতার কলেজে পাঠাইয়া দাও। ঈশ্বরেচ্ছায় তোমাদের ত কোন বিষয়ের অভাব নাই!"—বিধবা এই পরামর্শ যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন। শ্রীবিলাস কলিকাতায় গিয়া এফ্ এ, বি এ, এবং দুইবার অনুত্তীর্ণ হইবার পর আইন পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হইলেন। এইরূপে সাত আট বৎসর অতীত হইল।

শ্রীবিলাসের এখন ২৭।২৮ বৎসর বয়স হইয়াছে—কিন্তু এ পর্য্যন্ত সন্তানাদি কিছুই হয় নাই। স্বামীর উপর সরোজবাসিনীর আরও অসন্তোষের কারণ ছিল যে, তাঁহার এত খানি বয়স হইল, তথাপি তিনি সিকি পয়সাও উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইলেন না। এই সকল কারণে শ্রীবিলাস স্ত্রীর নিকট কিছু অপ্রতিভ হইয়া থাকিতেন। এই সময় তাঁহার আইন পরীক্ষার শেষ ফল বাহির হইল। এখন হইতে নিজেকে আর নিতান্ত অপদার্থ জীব বলিয়া মনে হইত না। সরোজবাসিনী তাঁহার অকৃতিত্ব সম্বন্ধে কোন কথা বলিলে, আর মৌনভাবে সহ্য না করিয়া একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিতেন। বলা বাহুল্য ইহাতে সরোজবাসিনীর সর্ব্বাঙ্গটা জ্বলিয়া যাইত। এইরূপে আরও কয়েক মাস কাটিল।

বঙ্গদেশের দূষিত জলবায়ুর প্রভাবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় রূপ ষ্টীমহ্যামারের সুদীর্ঘকালব্যাপী ক্রিয়ায় শ্রীবিলাসের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। তাই তিনি পরামর্শ করিলেন, পাটনায় গিয়া ওকালতীর ব্যবসা করিবেন। শ্বশ্রূ বলিলেন,—"সেই ভাল, তুমিও সেখানে ওকালতী কর, আর সতীশও স্কুলে পড়ুক।" শুভ দিনে দুই জনে পাটনা যাত্রা করিলেন। পাটনার আদালত ইত্যাদি বাঁকীপুরে। সেইখানেই বাসা করা হইল।

(২)

দুই বৎসর অতীত হইয়াছে। শ্রীবিলাস এখনও ভাল পসার জমাইতে পারেন নাই। কোনও মাসের আয়ে বাসাখরচটার সঙ্কুলান হয়—কোনও মাসে তাহাও হয় না। প্রথম উকিলী পাস করিয়া শ্রীবিলাসের মনে যে আত্ম-মর্য্যাদার উন্নত ভাব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা এখন সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত। সরোজবাসিনী আসিয়াছেন। সতীশ স্কুলে পড়িতেছে। শাশুড়ী ঠাকুরাণী এ পর্য্যন্ত বরাবর শ্রীবিলাসকে টাকা যোগাইয়া আসিয়াছেন; কিন্তু এখন ভারি অসন্তোষের ভাব। তিনি দেশে প্রায়ই আত্মীয় প্রতিবেশীদের কাছে স্বীয় মৃত স্বামীর বুদ্ধির দোষ দিয়া বলিতেন,—"দেখদেখি, এমন জামাই করিয়া গেলেন যে, তাহার টাকা যোগাইতে যোগাইতে আমাকে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যাইতে হইল। খতাইয়া দেখ, যে টাকা খরচ হইয়াছে, ইহার অর্দ্ধেক টাকা বিবাহে ব্যয় করিলে একটা রাজা জামাই পাওয়া যাইতে পারিত। এত টাকা খরচ করিলাম, তবুও জামাইটি মানুষের মত হইল না।"—ইদানীং শ্রীবিলাসও নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত শাশুড়ীর সাহায্য গ্রহণ করিতেছিলেন, কারণ "গতিরন্যথা" ছিল না।

যখনকার যাহা, ঠিক সেই সময়ে মানুষের যদি তাহা হয়, তবে আর কোনই গোল থাকে না। কিন্তু শতকরা নিরানব্বই জনের অদৃষ্টে তাহা ঘটে না। একে ত শ্রীবিলাসের ত্রিংশ বৎসর বয়স হইলেও সন্তান হইল না;—হিন্দু, বিশেষতঃ বাঙ্গালীর ঘরে ইহা একটা সামান্য দুর্ভাগ্যের কথা নহে। তাহার উপর উপার্জ্জন আশানুরূপ ত নহেই—প্রয়োজনানুরূপও নহে। এই দুইটি কারণে তাঁহার জীবনটা দুর্ব্বহ বলিয়া মনে হইত। এ সমস্ত বেশ সহ্য হয়, যদি পত্নী অনুকূলা হয়েন। এমন কোন্ সাংসারিক কষ্ট আছে, যাহা দাম্পত্য প্রণয়ের স্নিগ্ধমধুর স্পর্শে নিতান্ত লঘু হইয়া না যায়? কিন্তু শ্রীবিলাসের স্ত্রী প্রণয়বতী হইলেও এই দুইটি ত্রুটি ক্ষমা করিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

সেদিন রবিবারের সন্ধ্যা। সকাল হইতে বৃষ্টি হইতেছিল। আমাদের উকীল বাবুর বৈঠকখানা ঘরে একটিও মক্কেলনামক সেই প্রিয়দর্শন জীব উপস্থিত ছিল না। শ্রীবিলাস এই বর্ষাপ্রদোষে একাকী বসিয়া সুর করিয়া ঋতুসংহারের দ্বিতীয় সর্গ পড়িতেছিলেন। ক্রমে এই স্থানে আসিলেন:—

শ্রুত্বা ধ্বনিং জলমুচাং ত্বরিতং প্রদোষে
শয্যাগৃহং গুরুগৃহাৎ প্রবিশন্তি নার্য্যঃ।

এই স্থানটি পড়িয়া তাঁহার মনে দাম্পত্যভাব অত্যন্ত ঘনীভূত হইয়া আসিল। তিনি পুস্তক বন্ধ করিয়া উপন্যাস-লোকবাসী নবপ্রণয়ীর ন্যায় ধীরমন্থরগতিতে অন্তঃপুর-অভিমুখে চলিলেন। শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সেখানে স্ত্রী নাই। দাসী জানাইল, "ঠাকুর পলাইয়া গিয়াছে, সেই জন্য "মা-জী" স্বয়ং রন্ধনশালায় উপস্থিত আছেন। ইহা শুনিয়া শ্রীবিলাস বাহিরে ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন—এমন সময় সরোজবাসিনী প্রবেশ করিলেন। আজ অকস্মাৎ ব্রাহ্মণ ঠাকুরের তিরোভাবে সরোজা যে অন্নপূর্ণা-পদাভিষিক্তা হইয়াছেন, এই মর্ম্মে একটা পরিহাস করিলেন, কিন্তু সরোজবাসিনী মুখমণ্ডলে একটা ঘৃণার ভাব প্রকাশ করিয়া মুখ ফিরাইলেন। শ্রীবিলাস নাকি এই সরোজার সহিত অনেক দিন হইতে ঘর করিতেছেন—এই কারণে তিনি এরূপ আচরণে কিছুমাত্র বিস্মিত হইলেন না। তখন কাব্যলব্ধ নায়কভাব বিস্মৃত হইয়া নিতান্ত সাধারণ সাংসারিকজনোচিত প্রশ্ন করিলেন—"আজ আবার বাবাজীর কি হইল?"

সরোজবাসিনী নিরুত্তর। শ্রীবিলাস দাঁড়াইয়াছিলেন, পালঙ্কের উপর বসিয়া বলিতে লাগিলেন—"আর পারাও যায় না। এমন ক'রে তিন দিন অন্তর ঠাকুর পালালে—"

সরোজবাসিনী বাধা দিয়া বলিলেন,—"সস্তার ঠাকুর ঐ রকমই হয়ে থাকে। তিন টাকা মাহিনায় কি আর ভাল ঠাকুর হয়?"

শ্রীবিলাস স্ত্রীর এই কয়টি সামান্য কথাতেই নিতান্ত আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। মনে হইল, স্ত্রী এই উক্তিতে তাঁহার অকৃতিত্বের প্রতি-লক্ষ্য করিলেন। স্মরণ হইল, সেই বাল্যকালে সরোজবাসিনীর পিতা কি শোচনীয় অবস্থা হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন;—তিনি ত এক প্রকার পথের ভিক্ষুক হইতেই চলিয়াছিলেন। সরোজবাসিনী বাল্যকাল হইতে শ্রীবিলাসকে স্বীয় পিতার অন্নদাস বলিয়াই জানিতেন—এখন সংস্কৃত মন্ত্র বলিয়া বিবাহ হইয়াছে বলিয়াই কি ঘৃণার ভাব তিরোহিত হইবে? তিনি নিঃসংশয়িত ভাবে স্থির করিলেন, এই উক্তিতে তাঁহার "গ্লীবিয়ন্ অরিজিনের" প্রতিও বক্রকটাক্ষপাত আছে—অর্থাৎ তাঁহার নজর ছোট, তাই তিনি তিন টাকার রসুয়ে বামুন রাখিয়াছেন। কিন্তু শ্রীবিলাস এই কল্পিত অপমানে সম্পূর্ণভাবে আত্ম-সম্বরণ করিতে সমর্থ হইলেন—ইহা তাঁহার বহুদিনের অভ্যাসের ফল। বলিলেন—

"আজ আর থাক্। বাজার থেকে জলখাবার আনিয়ে নেওয়া যাবে এখন। তুমি বস।"

সরোজবাসিনী যেমন দাঁড়াইয়াছিলেন, তেমনই রহিলেন। শ্রীবিলাস কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া সরোজার হস্তধারণ করিয়া সাদরে বলিলেন—"চল"। সরোজবাসিনী একটা যন্ত্রণাসূচক উহুহু শব্দ করিয়া হাত টানিয়া লইলেন। শ্রীবিলাস সভয়ে দ্রুত জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হয়েছে?"

সরোজবাসিনী বলিলেন—"হয়েছে আমার মাথা ও মুণ্ড" (যেন মাথা ও মুণ্ড দুইটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ।)

শ্রীবিলাস হাত টানিয়া দেখিলেন—অনেকটা স্থান পুড়িয়া গিয়াছে। তাহাতে সাদা সাদা ঔষধ লেপিত রহিয়াছে দেখিয়া মনে বড় দুঃখ হইল;—বলিলেন—

"আহাহা, বড় কষ্ট হয়েছে ত! কেন তুমি রান্নাঘরে গেলে? ছিঃ—এমন অসাবধান!"

বেশ চলিতেছিল এবং সম্ভবতঃ নিরাপদে সমস্ত গোলমাল চুকিয়া যাইত; কিন্তু এই শেষের কথাটিই মাটি করিয়া ফেলিল। "এমন অসাবধান!"—সরোজবাসিনী আহতা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিল। সে চিরকাল ধনী পিতা-মাতার আদরের মেয়ে ছিল;—তাহাকে কখনও কোন গৃহকার্য্য করিতে হয় নাই। রন্ধনাদি সম্বন্ধে তাহার একবারেই কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। সুতরাং সরোজবাসিনী রন্ধনশালায় অসাবধান, একথা তাহার পক্ষে কোন দোষেরই নয়। তথাপি তাহার সহ্য হইল না, যে স্বামী তাহাকে অসাবধান বলিয়া তিরস্কার করিবেন। সে ক্রোধ ও ক্রন্দনের মিশ্রিত স্বরে শ্রীবিলাসকে কতকগুলি চোখা চোখা বাক্যবাণ হানিয়া দিল। স্বামী মহাশয়ও নিতান্ত নীরব রহিলেন না। ফলকথা সে রাত্রে শ্রীবিলাস বৈঠকখানা-গৃহে শয়ন করিলেন। সেই বালক সতীশ অনেক জিদ করিয়া দুইজনকে কিছু খাওয়াইল, নহিলে অভুক্ত অবস্থাতেই উভয়ের রাত্রি কাটিত।

(৩)

রাত্রি কাটিল। প্রভাতে শ্রীবিলাস শাশুড়ী ঠাকুরাণীর নিকট হইতে এক পত্র পাইলেন, তাহাতে লেখা ছিল,—"এক নিকট আত্মীয়ের বাটীতে বিবাহের নিমন্ত্রণ হইয়াছে, অতএব সরোজবাসিনীকে পাঠাইয়া দিলে ভাল হয়।" শ্রীবিলাসের আর্থিক অবস্থার উল্লেখ করিয়া ইহাও লেখা ছিল যে,—"যতদিন ভালরূপ পসার না হয়, ততদিন সপরিবারে কর্ম্মস্থানে থাকিয়া অনর্থক খরচ বাড়াইবার প্রয়োজন কি?"—শ্রীবিলাস নিশ্চয়ই স্ত্রীকে পিত্রালয়ে পাঠাইতেন, যদি এ আর্থিক অসচ্ছলতার কথাটার উল্লেখ না থাকিত। ইহা তীরের মত আসিয়া তাঁহার সম্প্রতি ক্ষতবিক্ষত আত্মাভিমানকে বিদ্ধ করিল। তিনি যথাসময়ে বালক সতীশের হাতে এই পত্রখানি স্ত্রীকে পাঠাইয়া দিলেন। সরোজবাসিনী বলিয়া পাঠাইলেন—"আমি যাইব, সকল বন্দোবস্ত করিয়া দিতে বল।" শ্রীবিলাস ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর পাঠাইলেন—এখন কোন মতেই যাওয়া হইতে পারে না। তাহার প্রত্যুত্তরে আর সরোজবাসিনী কোনও কথা বলিয়া পাঠাইলেন না; পরন্তু জননীর সেই পত্রখানি লইয়া যে অংশে শ্রীবিলাসের অর্থকষ্টের উল্লেখ ছিল, সেই অংশটি মোটা পেন কলম দিয়া লাল কালীর দাগ করিয়া ফিরিয়া পাঠাইলেন।

শ্রীবিলাস অন্যমনস্কভাবে সে পত্র লইয়া পকেটে ফেলিয়া রাখিলেন,—তখন আর খুলিয়া দেখিলেন না। আহারাদি করিয়া কাছারি চলিয়া গেলেন। কাছারি হইতে প্রায়ই তাঁহাকে খালি পকেটে ফিরিতে হইত। সেদিন দৈবাৎ পকেট্‌টা কিছু ভারী করিয়া ফিরিলেন। আসিয়া দেখিলেন, পাখী উড়িয়া গিয়াছে। শুনিলেন, তিনটার প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে সতীশকে লইয়া "মা-জী" প্রস্থান করিয়াছেন!

শ্রীবিলাসের একজন বৃদ্ধ প্রতিবেশী প্রায়ই তাঁহার বৈঠকখানায় আসিয়া তাম্রকূটসেবা করিতেন। তাঁহাকে তাঁহার বিশেষ অনিচ্ছাসত্ত্বেও শ্রীবিলাস ও পাড়ার অন্য সকলে ঠাকুরদাদা পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ঠাকুরদাদার সংস্কৃতটা কিছু পড়া ছিল;—ইংরাজিও অল্প জানিতেন; এ কালের লোক জন, আচার ব্যবহার, এ সকলের উপর তিনি হাড়ে চটা ছিলেন। তাঁহার একটা মস্ত বড় ঐতিহাসিক ভ্রম ছিল—তিনি বছর ত্রিশ পয়ত্রিশের ভুল করিয়া এ পর্য্যন্ত এই ভারতবর্ষটাকে কোম্পানীর রাজা বলিয়া উল্লেখ করিতেন। এই ঠাকুরদাদা মহাশয়, শ্রীবিলাসের স্ত্রীর পলায়ন সংবাদ পাইবামাত্র, হেলিতে দুলিতে বৈঠকখানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তিনি একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রীলোকগণের এই প্রকার যথেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে ওজস্বিনী বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া দিলেন। দুই চারিটা শাস্ত্রবচন আওড়াইয়া প্রমাণ করিলেন, স্ত্রীলোকেরা এইরূপ প্রবলা ও উচ্ছৃঙ্খলা হইয়া উঠিলে সমাজের আর ভদ্রস্থতা নাই;—এমন কি, কলির শেষ অবস্থা ঘনাইয়া আসিয়াছে বুঝিতে হইবে। শ্রীবিলাসের এখন এই সমস্ত কথা নিরতিশয় যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন—"আমার শাশুড়ীঠাকুরাণী এমন কিছু জিদ করিয়া লেখেন নাই যে, পাঠাইতেই হইবে—এমন কোনও বিশেষ প্রয়োজন ছিল না;—এই দেখুন না পত্রখানা।" বলিয়া পত্রখানা বাহির করিয়া বৃদ্ধের হস্তে দিলেন। পত্র খুলিবামাত্র লাল কালীর মোটা মোটা দাগ উভয়ের চক্ষে পড়িল। ঠাকুরদাদা বলিলেন—"এ কালীর দাগ কে দিলে?" শ্রীবিলাসের বুঝিতে বাকী রহিল না, দাগ কে দিয়াছে। ক্ষোভে, অপমানে তাঁহার সর্ব্বশরীর সর্পদষ্ট মনুষ্যের মত ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। স্বর বন্ধ হইয়া আসিল; চক্ষু দিয়া যেন আগুন বাহির হইতে লাগিল। তিনি আত্মগোপন করিবার জন্য বিপুল চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। ঠাকুরদাদা এতক্ষণ পত্র পাঠ করিতেছিলেন। পাঠ শেষ হইলে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কালীর দাগ কে দিয়াছে হে?" শ্রীবিলাস প্রথমবারে কথা কহিতে পারেন নাই বলিয়া ঠাকুরদাদার প্রশ্নের উত্তর দেন নাই; এইবার বলিলেন—"যখন আমি পত্র খুলি, তখন এ দাগ ছিল না।" আমার স্ত্রী এ দাগ দিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৃদ্ধ বলিলেন—"দেখিলে একবার! স্ত্রীলোকের স্পর্দ্ধা দেখিলে! স্বামী—যে স্বামী গুরুর গুরু—তাহার এমন করিয়া অপমান! হায় রে কলিকাল! এই বয়সে (ষষ্টি বৎসরের কম ত নহে) কত দেখিলাম, আরও কত দেখিতে হইবে! এমন শয়তানী স্ত্রীলোকের নরকেও স্থান হইবে না। মনুর আইন—

ভর্ত্তারং লঙ্ঘয়েদ্ যা তু স্ত্রী জ্ঞাতিগুণদর্পিতা।
তাং শ্বভিঃ খাদয়েদ্রাজা সংস্থানে বহুসংস্থিতে॥

—অর্থাৎ কি না যে স্ত্রী আপনাকে ধনিকন্যা বা রূপবতী মনে করিয়া ভর্ত্তারং—নিজ পতিকে লঙ্ঘয়েৎ—অর্থাৎ অপমানিত করে, রাজা তাহাকে বহুসংস্থিতে—কিনা অনেক লোকের সমক্ষে আনিয়া শ্বভিঃ বল্‌তে কুক্কুর দিয়া খাওয়াইবেন।—কিন্তু এখন মনুর আইন চলে না—এখন হনুর রাজ্য। কিন্তু শ্রীবিলাস, তুমি যদি এই অপমান, এই নারীপদাঘাত সহ্য কর, তবে ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোমাকে। তোমায় ধিক্, তোমার পুরুষত্বে ধিক্, তোমার লেখাপড়ায় ধিক্। তুমি আবার বিবাহ করিয়া ও স্ত্রীকে বাড়ী থেকে দূর করে তাড়িয়ে দাও।"

শ্রীবিলাস চুপ করিয়া মনের মধ্যে কথাটা তোলাপাড়া করিতে লাগিলেন।

তাঁহাকে নীরব দেখিয়া ঠাকুরদাদার বক্তৃতার স্রোত পুনরায় খুলিয়া গেল। বলিলেন,—"আজকাল ইংরাজি পড়িয়া লোকে স্ত্রীগুলোকে আদর দিয়া দিয়া—মাথায় চড়াইয়া চড়াইয়াই ত এই সর্ব্বনাশটা করিল। সাহেব বেটাদের মত স্ত্রৈণ জাত আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নাই—ইষ্টেশনে দেখেছি—বেটারা বেটীদের মাথায় ছাতা ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে যায়—যেন খানসামা! সেই সাহেবের শিষ্য ত তোমরা! তুমি যদি স্ত্রীর এই অতি গর্হিত আচরণ ক্ষমা কর—প্রশ্রয় দাও—তবে তাহার দেখাদেখি দশটা ভাল প্রকৃতির স্ত্রীলোকও বিগড়াইয়া যাইবে। আর যদি তুমি যথার্থ পুরুষ হও—ইহার উপযুক্ত শাস্তিবিধান কর, তবে ভয় পাইয়া দশটা বজ্জাৎ স্ত্রীও শান্ত হইয়া আসিবে। এটা একটা সামাজিক কর্ত্তব্য ব'লে জান্‌বে শ্রীবিলাস! কোম্পানী বাহাদুর যে খুনীর ফাঁসী দেন, সে কেন? খুন হল, কোম্পানীর একটা প্রজা গেল। আর একটা প্রজার প্রাণ বধ ক'রে রাজস্ব কমাবার প্রয়োজন কি? না—দশ জনে দেখে শিউরে উঠবে—বাপ্‌রে, খুন কর্‌লে ত ফাঁসী যেতে হয়! সুতরাং তুমি আর ইতস্ততঃ করিও না। এই ১৭ই দিন আছে, বিবাহ ক'রে ফেল। আমি পাত্রী স্থির করিবার ভার লইলাম।"

অবস্থা বিশেষে প'ড়িয়া মানুষের মন যে কি ভয়ানক পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ঊনবিংশতি শতাব্দীর এই শেষভাগে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত যুবক শ্রীবিলাস,—মিল, বেকন্, কারলাইলের ছাত্র শ্রীবিলাস,—মিল্টন—সেক্সপিয়র—শেলি—মাইকেল বঙ্কিম—রবীন্দ্রের কাব্যোদ্যানের মধুর রসগ্রাহী শ্রীবিলাস, অম্লান বদনে বলিল,—"আমি বিবাহ করিব!"

পঞ্জিকার মতে শুভদিনে ও শুভক্ষণে, এই পরম অশুভকর বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল।

আশা করি, আমার পাঠকেরা না বলিলেও বুঝিতে পারিতেন যে, কন্যাটী সেই বক্তৃতাকারী ঠাকুরদাদার অতি নিকটসম্পর্কীয়া।

(৪)

এই ঘটনার পর এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। শ্রীবিলাসের একটু পসার বাড়িয়াছে, কিন্তু মনের শান্তি বহুদূরে নির্ব্বাসিত।

সরোজবাসিনী পিত্রালয়ে। তাহার যে কি অবস্থা হইয়াছে, তাহা আর লিখিবার প্রয়োজন কি? সেই গর্ব্বিতা, মদোদ্ধতা সরোজবাসিনী এখন "ধরার ধূলির চেয়ে নীচে" হইয়া গিয়াছে। লোকগঞ্জনায় তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। বাড়ীর লোক, পাড়ার লোক, গ্রামের লোক, আত্মীয় কুটুম্বালয়ের লোক, তাহাকে একবাক্যে নিন্দা করিতেছে। দিন নাই, রাত্রি নাই, গ্রামে যেখানে সেখানে সরোজবাসিনীর কথা উঠিলেই অমনি পাঁচজনে বলে—'ছি ছি ছি—এমন বুদ্ধি! আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারিল! একটা সামান্য জিদের জন্য চিরজীবনটার দুঃখ কিনিল! গলায় দড়ি!"—ইত্যাদি! এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া সরোজার মরিবার ইচ্ছা করিত।

এই সময়ে সরোজার মাতা মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে সরোজার হস্ত ধারণ করিয়া তিনি বলিয়া গেলেন—"মা, আমার এই শেষ অনুরোধ। এটি রাখিয়ো। পুরুষ স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোকের স্বামী ভিন্ন আর গতি নাই। তুমি স্বয়ং বাঁকীপুরে যাইয়া স্বামীর পায়ে ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিবে। সতীন হইয়াছে, তার জন্য আর কি করিবে মা? সতীন ত কত লোকের থাকে। আজকালই কমিয়াছে—নহিলে সে কালে, সতীনের জ্বালা ভোগে নাই এমন কয়টা স্ত্রীলোক ছিল? তুমি পূর্ব্ব-

জন্মে কোনও গুরুতর পাপ করিয়াছিলে, তাহার ফলে এই কষ্ট পাইতেছ। এই জন্মে ভাল করিয়া ভক্তি করিয়া পতিসেবা কর, পরজন্মে আবার ভাল হইবে। আমি চলিলাম—তুমি পিতৃহীন ছিলে, মাতৃহীনও হইলে। এখন আর কে তোমার আশ্রয় রহিল মা? আমার এ অনুরোধ না রাখিলে পরলোকে আমি শান্তি পাইব না।"

সরোজা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"মা, অত করিয়া বলিতে হইবে না। আমি তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব।"

সরোজার মাতার মৃত্যু হইল। শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া যথাসময়ে এক রকম করিয়া সম্পন্ন হইল।

* * * * *

কিছুদিন পরে বাড়ীঘরের বন্দোবস্ত করিয়া, সতীশকে লইয়া সরোজবাসিনী বাঁকীপুর যাত্রা করিলেন। পৌঁছিয়া একবারে গিয়া শ্রীবিলাসের বাসায় উঠিলেন। শ্রীবিলাস তখন কাছারিতে। চাকর-বাকরেরা, "মা—জী" আসিয়াছেন দেখিয়া সসম্ভ্রমে প্রণাম করিল। তিনিও তাহাদিগকে যথাযোগ্য কুশল প্রশ্নাদি করিয়া আপ্যায়িত করিলেন। বাড়ী ঘর দুয়ারের আর সে শ্রী নাই—দেখিয়া সরোজার চক্ষে জল আসিল। কোথাকার জিনিষ কোথায় পড়িয়া আছে, তাহার ঠিকানা নাই। বিছানাগুলার আচ্ছাদন নাই। আলমারি টেবিল সিন্ধুক, বাক্স ধূলায় বুজিয়া গিয়াছে। দেওয়ালের ছবিগুলায় মাকড়ার জাল। ঘরের কোণে তামাকের গুল, ছাই ছড়ান। উঠানে ঘাস গজাইয়াছে। একদিকটা ত একেবারে জঙ্গল বলিলেই হয়। দাসদাসীরা আপনা হইতে এ সব করে না;—কেহ তাহাদিগকে করিতে বলেও না। সরোজবাসিনী তাহাদিগকে লইয়া কাজ করিতে লাগিয়া গেলেন। সমস্ত ঝাড়িয়া, ধুইয়া, মুছিয়া, সাজাইয়া যথাসম্ভব পারিপাট্যবিধান করিলেন। ঘটী বাটী ইত্যাদি ব্যবহারের জিনিষগুলা মাজাইয়া ঘসাইয়া তকতকে ঝক্‌ঝকে করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর বেলা পড়িলে রসুই ঘরে গিয়া স্বহস্তে নানাপ্রকার জলখাবার প্রস্তুত করিলেন। পাণ সাজিয়া, কাপড় বদ্‌লাইয়া স্বামী সম্ভাষণের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। মনে হইল, সে সব দিনে মিলনের এইরূপ অনতিপূর্ব্বে কি উৎকণ্ঠা, কি হর্ষ, কি চঞ্চলতা আসিয়া বুকের ভিতর দৌরাত্ম্য করিত। আর আজ এ কি ভাব! ভাবিতে ভাবিতে সরোজার মুখখানিতে যেন মেঘ করিয়া আসিল।

শ্রীবিলাস কাছারি হইতে ফিরিলেন! প্রথমেই বাহিরে সতীশের সাক্ষাৎ পাইয়া সমস্ত অবগত হইলেন। বাড়ীতে প্রবেশ করিবেন—পা যেন উঠে না!

সরোজার সঙ্গে দেখা হইল। উভয়ের তখনকার মনের ভাব কে বর্ণনা করিবে? অনেক পুরাতন কথা মনে আসিয়া উভয়ের চক্ষে জল বহাইল। সেই রাত্রি সে দম্পতির কি ভাবে কাটিল কে বলিতে পারে? দিনের পর দিন গেল, সংসার চলিতে লাগিল; কাহারও মনে সুখ নাই, মুখে হাসি নাই; অথচ উভয়ে স্বামী স্ত্রী সাজিয়াই সংসার করিতে লাগিল।

আমার পাঠকেরা না হউন, পাঠিকারা নিশ্চয়ই শ্রীবিলাসের কৃত দুষ্কর্ম্মের প্রতিফলস্বরূপ তাহার জীবনব্যাপী যন্ত্রণার চিত্র দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। কিন্তু তাহা হইতে পাইল না। শ্রীবিলাসের নবপরিণীতা বধূটি বঙ্গদেশের এক নিভৃত গ্রামে, জ্বর ও প্লীহায় ভুগিতেছিল। হঠাৎ একদিন তাহার মৃত্যু সংবাদ আসিল।

শ্রীবিলাস বিবাহ করিয়া অবধি শুভদৃষ্টির বস্ত্রাবরণ মধ্যে ভিন্ন সে স্ত্রীর সাক্ষাৎ পান নাই। ফুলশয্যার রাত্রে কম্প দিয়া তাহার ত ভারি জ্বর আসিয়াছিল। তাহার মৃত্যুতে শ্রীবিলাসের কোনও কষ্ট হইবার কথা নহে। আমাদের সরোজবাসিনীও আদর্শ রমণী নহেন; তিনি সপত্নীর মৃত্যু-সংবাদে খুসী হইয়া দাস দাসীকে বক্‌সিস্ এবং দেবতাকে 'হরিলুট' দেন নাই বটে,—কিন্তু তাহার পর হইতে হাসিতে গল্পেতে মনের প্রফুল্লতা ও লঘুভাবের যথেষ্ট পরিচয় দিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। ইহা দেখিয়া শ্রীবিলাসেরও অনুতাপক্লিষ্ট মুখমণ্ডলের বিবর্ণতা দিন দিন দূর হইতে লাগিল।

এখন হইতে এই দম্পতি, প্রত্যেক উপকথার নায়ক নায়িকার মতই, সুখে ঘর সংসার করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রভেদ এই যে, শ্রীবিলাস এখনও রাজ্যলাভ করিতে পারেন নাই; এবং শত পুত্রের একটি মাত্র এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর আলোক দর্শন করিতে পাইয়াছে।

শ্রীমতী রাধামণি দেবী।

"সিরাজদ্দৌলা"।*

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য দুই চারিখানি ক্ষুদ্র ইতিহাস এক সময়ে পড়িয়াছিলাম। তাহার পর ইতিহাসের চর্চ্চা করি নাই বলিলেই হয়। সুতরাং ঐতিহাসিক গ্রন্থের সমালোচনা করিবার ক্ষমতা ও অধিকার আমার নাই। এই প্রবন্ধে "সিরাজদ্দৌলার" ঐতিহাসিক তত্ত্ব সমূহের সমালোচনা করা আমার অভিপ্রেত নয়। আমি কেবল পুস্তকখানির কিছু পরিচয় দিব, এবং প্রসঙ্গক্রমে অপর দুই চারিটি কথার উল্লেখ করিব। বস্তুতঃ "সিরাজদ্দৌলা" পড়িয়া একজন ইতিহাসানভিজ্ঞ পাঠকের কি মনে হইয়াছে, ইহা তাহারই বিবৃতি।

আমি গ্রন্থখানি উপন্যাসের মত আগ্রহের সহিত পড়িয়াছি, এবং উপন্যাসেরই মত শীঘ্র পড়িয়া শেষ করিয়াছি। অনেক কাব্যনামাভিহিত গ্রন্থ অপেক্ষা আমি ইহাতে অধিক কাব্যরস পাইয়াছি। বাস্তবিক সিরাজের জীবন একটি বিষাদান্ত নাটক। বৈশাখ মাসে প্রভাত সমীরণ কেমন সুখসেব্য! ঊষার দৃশ্য কেমন রমণীয়! মধ্যাহ্ন কিন্তু রৌদ্রতাপদগ্ধ, অশান্তিপূর্ণ। আবার অনেক দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঝড় উঠিয়া নাবিকগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে; বায়ুভরে অনেক ক্ষুদ্র তরণী জলমগ্ন হয়। যে দিনের প্রভাত দেখিয়া মনে হইয়াছিল, বুঝি বা ইহা বিলাসীর বিলাসলালসা চরিতার্থ করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার একি ভীষণ, শোচনীয় পরিণাম! সিরাজের জীবন এমনই একটি বৈশাখী দিন। সত্য বটে প্রভাতবায়ুর পবিত্রতা তাঁহার বাল্যেও ছিল কি না সন্দেহ, কিন্তু তাঁহার মাতামহের স্নেহ প্রাতঃসমীরণের মতই স্নিগ্ধ ছিল। বিলাসবাসনা পূর্ণ করিবার চেষ্টায় তাঁহার যৌবনের প্রারম্ভকাল অতিবাহিত হয়। সিংহাসনে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ ও ষড়যন্ত্রে তাঁহার জীবন নিদাঘক্লিষ্ট পথিকের মত অশান্তিপূর্ণ হইয়া উঠে। তাঁহার জীবনতরণীর অন্তিম দশার বর্ণনায় নিতান্ত লঘুচিত্ত ব্যক্তির হৃদয়ও বিষাদ ও সংসাররহস্য-চিন্তার গুরুভারে অবনত হইয়া পড়ে।

পুস্তকখানির ভাষা সুললিত, বিশুদ্ধ ও মার্জ্জিত। পড়িবার সময় মনে হয় যেন লেখকের লেখনী অবাধে অবিরাম চালিত হইয়াছে। শব্দদারিদ্র্য, লিখিতব্য বিষয়ের জ্ঞানাভাব, প্রভৃতি নানা কারণে ভাষাস্রোতে বাধা পড়ে। এবম্বিধ বাধা "সিরাজদ্দৌলায়" লক্ষিত হয় না। গ্রন্থখানির বিষয়বিন্যাসও সুপ্রণালীসঙ্গত হইয়াছে।

গ্রন্থকার এই পুস্তকখানি লিখিবার জন্য প্রভূত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়াছেন। তাঁহাকে এতদর্থে অনেক ইংরাজী, ফারসী, উর্দ্দু ও বাঙ্গলা গ্রন্থ পড়িতে হইয়াছে, অপ্রকাশিত, হস্তলিখিত ইংরাজী কাগজ পত্রেরও সাহায্য লইতে হইয়াছে। তন্মধ্যে অনেকগুলি দুষ্প্রাপ্য। অনেক ঘটনাস্থলও লেখককে স্বচক্ষে দেখিতে হইয়াছে। তদ্ভিন্ন পরস্পরবিসংবাদী নানাজনের লিখিত বৃত্তান্ত হইতে সত্য নির্ণয়ের জন্য তাঁহাকে মস্তিষ্কচালনাও যথেষ্ট করিতে হইয়াছে। তিনি যাহা যাহা লিখিয়াছেন, তাহার প্রমাণ যথাস্থানে পাদটীকায় লিখিত আছে। কর্ণেল ম্যালেসন্ বলেন, সিরাজ-জীবনের শোকান্ত নাটকে যাঁহারা সংসৃষ্ট ছিলেন, তন্মধ্যে কেবল সিরাজই কাহাকেও ঠকাইতে চেষ্টা করেন নাই। বেভারিজ সাহেব গ্রন্থকারকে লিখিয়াছেন—সিরাজদ্দৌলাকে যতটা দুরাচার বলা যায়, তদপেক্ষা অধিক হতভাগ্যই বলিতে হয়। গ্রন্থকার এই দুইটি উক্তিরই সত্যতা প্রমাণ করিয়াছেন।

গ্রন্থকার সিরাজদ্দৌলার যথার্থ দোষগুলি উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করেন নাই। তজ্জন্য তাঁহার যথেষ্ট নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি, ইংরাজ বণিক্, রাজকর্ম্মচারী ও ঐতিহাসিক, এবং বাঙ্গালী কবি ও জনশ্রুতি কর্ত্তৃক সৃষ্ট অনেক অযথা কলঙ্ক হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে অন্ধকূপহত্যার কথা সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ অলীক, সত্য হইলেও সিরাজকে তজ্জন্য দোষ দেওয়া যায় না; সিরাজ শোণিতলোলুপ ছিলেন না। তিনি রাজ্যলাভের পূর্ব্বে বিলাসী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ থাকিলেও ভীরু, নির্ব্বোধ বা অকর্ম্মণ্য ছিলেন না, এবং রাজ্যলাভের পূর্ব্বেই সুরাপান ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইংরাজের সহিত তাঁহার শত্রুতা ইংরাজের দোষেই হয়। তথাপি তিনি পূর্ব্বাপর তাহাদিগের সহিত ধীর ও বিবেচকের মত ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহার পতনের মূলে সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহার

---

* "সিরাজদ্দৌলা।" ঐতিহাসিক চিত্র। শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রণীত। মূল্য কাপড়ে বাঁধা ২, কাগজের মলাট ১॥০। কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে, "প্রদীপ" কার্য্যালয়ে এবং এলাহাবাদে কর্ণেলগঞ্জ ইণ্ডিয়ান্ গুড্‌স্ সাপ্লাই এসোসিয়েষ্যনের দোকানে প্রাপ্তব্য।

অপেক্ষা তাঁহার অধীনস্থ জমীদার, সেনাপতি ও বণিক্‌দিগের এবং তাঁহার আশ্রিত ইংরাজবণিক্‌দিগেরই দোষ অধিক ছিল। অকালে ঘটনার চক্রে তাঁহার মৃত্যু না ঘটিলে তিনি সম্ভবতঃ রাজকার্য্যকুশল প্রজারঞ্জক রাজা হইতে পারিতেন।

প্রাগুল্লিখিত উমাচরণ ("উমিচাঁদ"), জগৎশেঠ, মীর জাফর প্রভৃতি ব্যক্তিগণের চিত্রও বেশ স্পষ্ট হইয়াছে। সিরাজদ্দৌলার সময়ে বঙ্গদেশের সামাজিক অবস্থার বৃত্তান্তও বেশ উজ্জ্বল হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে, তৎকালে দেশে বাঙ্গালী সৈনিক ও সেনাপতি, শাসনকর্ত্তা এবং রাজনীতি-বিশারদের অভাব ছিল না। বাঙ্গালীর এখন আর যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই। এখন শোণিত-বিহীন যুদ্ধের সময়। কিন্তু বাঙ্গালীর ভীরুতাপবাদ দূর হইলে, বাঙ্গালী যে অদূরবর্ত্তী অতীতে শৌর্য্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, এই বিশ্বাস জন্মিলে, আমাদের জাতীয় প্রতিভা নূতন স্ফূর্ত্তির সহিত উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

"পলাশির যুদ্ধ" কাব্য বাঙ্গালা পাঠকের সুপরিচিত। এই কাব্যে বর্ণিত অনেক কথাই যে ইতিহাস-বিরুদ্ধ, গ্রন্থকার তাহা দেখাইয়াছেন। কবি নবীনচন্দ্র বলেন, কবির পথ নিষ্কণ্টক; তিনি সুতরাং ইতিহাস মানিতে বাধ্য নহেন। ঐতিহাসিক কিন্তু এইজন্য তাঁহার কাব্যের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। এই জন্য আমার বোধ হয়, ইতিহাসের সহিত ঐতিহাসিক কাব্যাদির সম্বন্ধ বিষয়ে দুই চারিটি কথা বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ঐতিহাসিক উপন্যাস, নাটক বা কথা, কাব্য গল্পাংশে ইতিহাসের সহিত একই সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। সুতরাং সেক্সপিয়র তৎপ্রণীত ঐতিহাসিক নাটকসমূহে ইতিহাসের প্রতি কিরূপ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিলে হয় ত, আমরা কিছু আলোক পাইতে পারি। শ্লেগেল (Schlegel) বলেন, সেক্স্‌পিয়র ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর স্থূলস্থূল বিষয়ের ঈদৃশ যথার্থ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাদের গূঢ় কারণ এরূপ বিশদভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, আমরা তাঁহার নাটক পড়িয়া ইতিহাসের প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারি। হড্‌সন (Hudson) বলেন, আমরা ঐতিহাসিক গবেষণায় যতই অগ্রসর হই, ততই দেখিতে পাই যে, সেক্স্‌পিয়রের বিবরণগুলি মোটের উপর ঠিক্ সত্যানুসারী। অনেক স্থলে ইংরাজ মহাকবি তৎপরিজ্ঞাত প্রামাণিক ইতিহাসসমূহের অনুসরণ করেন নাই। হড্‌সন বলেন, এরূপ কোন কোন স্থলে কবির মৃত্যুর পর ঐতিহাসিক গবেষণা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, কবি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত। গের্বীনুস্ (Gervinus) বলেন, সেক্স্‌পিয়রের ঐতিহাসিক নাটকগুলির ঐতিহাসিক মূল্য খুব বেশী মনে করা উচিত নয়। তিনি বাহ্য সত্যের দিকে বেশী দৃষ্টি রাখিতেন না, নিগূঢ় আন্তর সত্যেরই অনুসরণ করিতেন। [অর্থাৎ যুগবিশেষের ইতিহাস হইতে যে নৈতিক বা অন্যবিধ শিক্ষা বা জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা স্পষ্টতর করিবার জন্য তিনি প্রয়োজন মত কল্পনার আশ্রয় লইতে দ্বিধা করেন নাই। এইজন্য তাঁহার নাটকগুলিতে কোন কোন স্থলে দেশকালপাত্র সম্বন্ধে ইতিহাসের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়।] কবি একটি নিয়ম মানিতেন; তিনি জর্ম্মান কবি শিলরের মত ঐতিহাসিক চিত্রপটে এমন কোন কাল্পনিক ঘটনার সন্নিবেশ করিতেন না, যদ্দ্বারা ঘটনাবলীর ঐতিহাসিক পরম্পরাগত সম্বন্ধ ভগ্ন হয়। এল্‌ট্‌সঃ (Elze) বলেন—কবির চিত্রগুলি তত্ত্বতঃ যথার্থ এবং অনুকরণের অতীত। উল্‌রীট্‌সী (Ulrici) বলেন—সেই কাব্যই প্রকৃত-প্রস্তাবে ঐতিহাসিক নাটক নামের যোগ্য, যাহাতে ঐতিহাসিক উপাদানসমূহের যথেচ্ছ ব্যবহার করা হয় না, স্বাধীনভাবে প্রয়োজন মত পরিবর্ত্তন করা হয় না, কিন্তু প্রকৃত ইতিহাসের সারতঃ অপরিবর্ত্তিত সত্য চিত্র অঙ্কিত হয়; সেক্স্‌পিয়রে এইরূপ চিত্রই দৃষ্ট হয়। এই সকল সুবিখ্যাত সমালোচকের মধ্যে কিছু কিছু মতভেদ আছে। কিন্তু সকলেই ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে, ইংরাজমহাকবি বর্ণিত ঘটনাবলী ও চরিত্রসমূহের সারাংশে ঐতিহাসিকতা রক্ষা করিয়াছেন।

এখন আর এক কবির লেখার আলোচনা করা যাক্। টেনিসন্ তিনখানি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার "রাণী মেরী" (Queen Mary) লিখিবার পূর্ব্বে তিনি যে সকল ঐতিহাসিক গ্রন্থ পাঠ করেন, তাহার প্রথম তালিকা এই :—

"Collier's *Ecclesiastical History*. Fuller's *Church History*, Burnet's *Reformation*, Foxe's *Book of Martyrs*, Hayward's *Edward*, Cave's *P. X. F.*, Hooker, Neale's *History of the Puritans*, Strype's *Ecclesiastical Memorials* Strype's *Cranmer*, Strype's *Parker*, Philips' *Pole Primitive Fathers No Papists*. Lingard's *History of England*. *Church Historians of England*, *Zurich Letters*, and *Original Lettere and Correspondence of Archbishop Parker* (published by the Parker Society)," in addition to Froude Ho ished and Camden.

টেনিসন নিজের পথ নিতান্ত নিষ্কণ্টক ভাবিলে প্রথমেই এতগুলি ঐতিহাসিক পুস্তক পাঠ করিতেন না; পরে আরও অনেক পড়িয়া তবে নাটক লিখিয়াছিলেন। আমাদের জানিতে কৌতূহল হয়, কবি নবীনচন্দ্র কতকগুলি ইতিহাস পড়িয়া তবে "পলাশির যুদ্ধ" লিখিয়াছিলেন। সময়ে তাঁহার কোন জীবনবৃত্তলেখকের প্রসাদে হয়ত আমরা ইহা জানিতে পারিব। টেনিসনের "মেরী" পাঠ করিয়া বিখ্যাত ঐতিহাসিক ফ্রুড তাঁহাকে লেখেন, "You have reclaimed one more Section of English history from the wilderness" গ্লাডষ্টোন ইহাকে একটি careful historic study বলেন। টেনিসন্‌কে স্যার হেন্‌রী বেডিংফীল্ড্ নামক একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পত্র লেখেন যে, আপনি "রাণী মেরী"তে আমারই নামধারী আমার এক পূর্ব্বপুরুষের অযথা নিন্দা করিয়াছেন। টেনিসনের এমন ন্যায়নিষ্ঠা যে, তিনি ইতঃপর তাঁহার নাটক হইতে বেডিংফীল্ডের নাম একবারে তুলিয়া দেন। সিরাজদ্দৌলার বা উমাচরণের কোন বংশধর থাকিলে হয় ত তিনি বাঙ্গালী কবি সেনমহাশয়কেও এইরূপ পত্র লিখিতে পারিতেন!

টেনিসনের আর একটি ঐতিহাসিক নাটক "বেকেট" পড়িয়া বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রীন্ বলেন—দ্বাদশশতাব্দীর ইতিহাস সম্বন্ধে আমার সমুদয় গবেষণা দ্বারা দ্বিতীয় হেন্‌রীর চরিত্র ও পারিষদগণের বিষয়ে আমার তদ্রূপ উজ্জ্বল জ্ঞান জন্মে নাই, যেমন টেনিসনের বেকেট পড়িয়া হইয়াছে। বাস্তবিক কাব্যরচনা বিষয়ে টেনিসনের ধর্ম্মবুদ্ধিপ্রণোদিত সত্যনিষ্ঠা বড়ই চমৎকার। তাঁহার বেকেটের ভূমিকা স্বরূপ তিনি একটি চতুর্দ্দশপদী কবিতা লেখেন, তাহার শেষ কয়েকটি পংক্তি এই :—

"And on me
Frown not, old ghosts, if I be one of those
Who make you utter things you did not say,
And mould you all awry and mar your worth;
For whatsoever knows us truly, knows
That none can truly write his single day,
And none can write it for him upon earth."

তাৎপর্য্য—যদি আমি তোমাদিগকে এমন কথা বলাই, যাহা তোমরা বল নাই, যদি তোমাদিগের সদ্‌গুণ বিলুপ্ত করিয়া ফেলি, এবং তোমাদিগকে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে গঠিত করি, তাহা হইলে, হে প্রাচীন প্রেতাত্মাগণ, আমার উপর ক্রুদ্ধ হইও না। কারণ যিনি আমাদিগকে ঠিক জানেন, তিনিই জানেন, যে কেহই নিজের একদিনের জীবনেরও যথার্থ বৃত্তান্ত লিখিতে পারে না, এবং পৃথিবীতে আর কেহও তাহার জন্য তাহা লিখিয়া দিতে পারে না।"

বিদেশের কথা ছাড়িয়া স্বদেশে আসিলে দেখি, বঙ্কিম বাবু তাঁহার রাজসিংহের চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপনে লিখিয়া গিয়াছেন :—

"ইতিহাসের উদ্দেশ্য কখন কখন উপন্যাসে সুসিদ্ধ হইতে পারে। উপন্যাসলেখক, সর্ব্বত্র সত্যের শৃঙ্খলে বদ্ধ নহেন। ইচ্ছামত অভীষ্ট সিদ্ধি জন্য কল্পনার আশ্রয় লইতে পারেন।"

তিনি বলিয়াছেন, "আমি পূর্ব্বে কখন ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই।" সুতরাং রাজসিংহে তিনি যে নিয়মানুসারে চলিয়াছিলেন, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে, তাঁহার মতে কবি বা উপন্যাস-লেখক কোথায় কোথায় সত্যের শৃঙ্খলে বদ্ধ নহেন"। তিনি বলেন :—

"স্থূল ঘটনা, অর্থাৎ যুদ্ধাদির ফল, ইতিহাসে যেমন আছে, প্রায় তেমনই রাখিয়াছি। কোন যুদ্ধ বা তাহার ফল কল্পনা-প্রসূত নহে। * * * ঔরঙ্গজেব, রাজসিংহ, জেব উন্নিসা, উদিপুরি, ইহারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ইহাদের চরিত্রও ইতিহাসে যেরূপ আছে, সেইরূপ রাখা গিয়াছে। তবে তাঁহাদের সম্বন্ধে যে সকল ঘটনা লিখিত হইয়াছে, সকলই ঐতিহাসিক নহে। উপন্যাসে সকল কথা ঐতিহাসিক হইবার প্রয়োজন নাই।"

"সিরাজদ্দৌলা" হইতে অনেকদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন প্রত্যাবর্ত্তন আবশ্যক।

"পলাশির যুদ্ধে" চক্রান্তকারিগণ "বঙ্গ মাতা উদ্ধারের" কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের মূলমন্ত্র প্রতিহিংসা—অপমান ও উৎপীড়নের প্রতিশোধ দান। কিন্তু অক্ষয় বাবু দেখাইতেছেন, যে, ষড়যন্ত্রকারিগণ সিরাজের ইন্দ্রিয়লালসায় সন্ত্রস্ত ও অর্থপিপাসায় ভীত হইয়া থাকিলেও, তাহাদের ষড়যন্ত্রের প্রধান কারণ, নিজ নিজ প্রভুত্ব লোপের ভয়। সুতরাং নবীন বাবু কেবল যে ঘটনা বা দেশকালপাত্র সম্বন্ধে ইতিহাস হইতে দূরে গিয়াছেন, তিনি যে সিরাজের চরিত্রে কতকগুলি অযথা কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন, (সেরূপ কলঙ্কের কার্য্য বস্তুতঃ তিনি না করিয়া থাকিলেও তাঁহার পক্ষে তৎসমুদয় করা হয়ত অসম্ভব ছিল না।) তাহা নয়; কাব্যে তাহা তত দোষের বিষয় না হইতেও পারে; পরন্তু তিনি ঐতিহাসিক নিগূঢ় সত্যেরও মর্য্যাদা রক্ষা করেন নাই। জাতীয় উন্নতি বা অবনতি, স্বাধীনতা

লাভ বা লোপ, এবং রাষ্ট্রবিপ্লব, এই সকলের মূলে এক একটি ভাব বা শক্তি কাজ করে। ঘটনাবলী সম্বন্ধে ব্যতিক্রম হইলেও ঐতিহাসিক কাব্যে এই ভাব বা শক্তিটির প্রকৃতি যথাযথ ভাবে বর্ণিত হওয়া উচিত। সিরাজের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে যে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়াছিল, তাহার মূলে কোন্ ভাব বা শক্তি কার্য্য করিতেছিল?—আমরা এখানে মুসলমান সাম্রাজ্যের পতনের কারণ অনুসন্ধান করিতেছি না। তাহার কারণ, শেষ মুসলমান রাজাদিগের ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও ভিন্নধর্ম্মীর উৎপীড়ন, বলিয়াই বোধ হয়।—"পলাশির যুদ্ধে" দেখি, এই বিপ্লবের কারণ, সিরাজের যথেচ্ছাচার এবং তদ্ধেতু বাঙ্গালী নেতাদের প্রতিহিংসা বৃত্তির উদ্দীপন। অক্ষয় বাবুর চিত্রে দেখিতেছি, বাঙ্গালী নেতাদের আত্ম-মাত্রহিতৈষণা এবং প্রভুত্বলোপভয়ই চক্রান্তের ও তজ্জনিত বিপ্লবের প্রধান কারণ। নেতাদের অদূরদর্শিতার পরিচয় উভয় চিত্রেই পাওয়া যায়। কিন্তু "পলাশির যুদ্ধে" সিরাজের পতন সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহার নিজ পাপের ফল; অপর দিকে ঐতিহাসিক চিত্রে তাঁহার পতন (পরোক্ষভাবে তাঁহার পাপের সহিত কিয়ৎ পরিমাণে সংসৃষ্ট হইলেও) সাক্ষাৎ ভাবে ও প্রধানতঃ ঘটনাচক্রের ফল। ঐতিহাসিক সিরাজ হ্যামলেটের মত বলিতে পারিতেন ঃ—

The time is out of joint : O cursed spite,
That ever I was born to set it right.

বাস্তবিক তৎকালীন প্রতিকূল অবস্থাসমষ্টির সহিত যুদ্ধ করিতে না পারাই, তাঁহার পতনের প্রধান কারণ। সেন মহাশয় যদি ইতিহাসের অনুসরণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি অন্ততঃ তাঁহার বর্ত্তমান কাব্যের সমান মর্ম্ম-স্পর্শী একখানি কাব্য লিখিতে পারিতেন।

"সিরাজদ্দৌলাতে" কয়েকটী চিত্র ও যুদ্ধাদির নক্সা আছে। ইহার ছাপা বেশ হইয়াছে। কাগজও ভাল। বাধান বইগুলি বাস্তবিকই দেখিতে সুন্দর হইয়াছে। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী প্রায় ৪৫০ পৃষ্ঠা পরিমিত এরূপ সুন্দর পুস্তকের ১॥০ মূল্য সস্তাই হইয়াছে।

এখন আমরা পুস্তকখানির কয়েকটি সামান্য দোষের কথা লিখিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। পুস্তকের প্রথম সংস্করণে এরূপ দোষ কিছু না কিছু থাকিয়া যায়। মূল পুস্তকে যে সকল ইংরাজী বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার স্থলে বাঙ্গালা অনুবাদ বা তাৎপর্য্য দিয়া পাদটীকায় ইংরাজীটুকু দিলেই ভাল হইত। গ্রন্থকার গ্রন্থের শেষদিকে এই রীতি অবলম্বন করিয়াছেন। দুই এক স্থলে তিনি টীকায় প্রমাণ স্বরূপ বহুগ্রন্থলেখক গ্রন্থকারের নাম মাত্র দিয়াছেন; এরূপস্থলে গ্রন্থেরও নাম দিলে ভাল হইত। ৮৬ পৃষ্ঠায় "দ্বাদশনারী" প্রমাণস্বরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ খানির ঐতিহাসিক প্রামাণ্য কিরূপ বলিতে পারি না। গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে যে সামাজিক চিত্রটি দেওয়া হইয়াছে তাহা সত্যানুরূপ বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু ইহার কোন কোন অংশের (যেমন ৬ ও ৭ পৃষ্ঠার) প্রমাণের উল্লেখ থাকিলে ভাল হইত। জনশ্রুতি, ঐতিহাসিক যুক্তি-মূলক অনুমান, সমসাময়িক বা অদূরসাময়িক ইতিহাস বা কাব্য অবলম্বন পূর্ব্বক কিংবা অন্যবিধ উপায়ে এই অংশটি লিখিত হইয়াছে, তাহা আমাদের জানিতে কৌতূহল হয়। চিত্রটি চক্ষুর সমক্ষে যেন ভাসিতেছে। এই জন্য এত কথা লিখিলাম। ২১ পৃষ্ঠার ১ম প্যারাগ্রাফ্‌টি সম্বন্ধেও এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়।

কেম্ব্রিজের রেজিয়স ইতিহাসাধ্যাপক লর্ড একটন্ এক সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিকের কথা বলিয়াছেন, যাঁহারা ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের সমস্ত দোষ তৎকালপ্রচলিত নৈতিক আদর্শের দোহাই দিয়া উড়াইয়া দেন। তাঁহারা বলেন, অমুক যুগে ঘুষ দেওয়া দোষের ছিল না, বা ব্যভিচার দোষের ছিল না, বা নরহত্যা সামান্য দোষ বলিয়া বিবেচিত হইত; অতএব অমুক রাজা বা গ্রন্থকার, বা রাজনৈতিককে, বর্ত্তমান আদর্শ অনুসারে বিচার করিয়া, দোষী স্থির করা উচিত নয়। কিন্তু তিনি নিজে এরূপ রীতির পক্ষপাতী নহেন। তিনি ইতিহাসানুশীলন বিষয়ক বক্তৃতায় নিজমত সমর্থনার্থ বর্ক্, ফ্রুড্, গোল্ডবিন্ স্মিথ প্রভৃতি লেখকগণের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি বলেন, পাপ সর্ব্বদাই ও সর্ব্বদেশেই পাপ বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। অক্ষয় বাবু সিরাজদ্দৌলার সময়ের উচ্ছৃঙ্খলতার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু উহার দোহাই দিয়া সিরাজদ্দৌলাকে সাধু সাজান নাই। বরং মৈত্রেয় মহাশয় সকলেরই চরিত্রের সমালোচনা যথোচিত কঠোর ভাবেই করিয়াছেন। কিন্তু এক আধ যায়গায় তাঁহার নৈতিক বিচারণার অপপ্রয়োগ হইয়াছে, বোধ হইল। ১৯ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন ঃ—"সে হীরাঝিল

নাই, সে রাজপ্রাসাদও নাই; মহাপাপের জ্বলন্ত হুতাশনে দগ্ধ হইয়া তাহার শেষ ভস্মরাশিও ভাগীরথী-স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে।" গ্রন্থকার বোধ হয় বিশ্বাস করেন না যে নদীর স্রোতে বা কালের প্রভাবে পাপের ক্রীড়াস্থলগুলিই আগে ভাসিয়া যায়; যে সকল প্রাচীনতর দুর্গ প্রাসাদাদি এখনও পৃথিবীতে বর্ত্তমান আছে, তাহাতে ত অনেক পাপের অভিনয় হইয়াছে। ইহা বোধ হয় লেখনীর মুখে অতর্কিতে বাহির হইয়া গিয়াছে।

"পলাশির যুদ্ধে"র সমালোচনায় একটু তীব্রতা লক্ষিত হইল। এটুকুর পরিহার প্রার্থনীয়। আর একটি অনুরোধ জানাইয়া লেখনীকে বিশ্রাম দি। দ্বিতীয় সংস্করণে অক্ষয় বাবু পাঠকবর্গের সুবিধার্থ একটি বর্ণানুক্রমিক সূচী দিলে ভাল হয়। ইতি। ৭ই চৈত্র, ১৩০৪।

কলিকাল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

যে বর-বেশী বাবু শিশুপালের দশা প্রাপ্ত হইয়া বিষণ্ণ-মুখে ভগ্নহৃদয়ে ফিরিলেন, তাঁহার পরিচয় বোধ হয় আর না দিলেও চলে।

মাধব ঘটক তাহার এই সাধের ও লাভের ঘটকালির এরূপ শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া প্রথমে একেবারে অপ্রতিভ ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ভট্টরাজের এ ভাব কতক্ষণ? সে কি সহজে দমিবার পাত্র? ঘটক-কুলচূড়ামণি মুহূর্ত্তে আত্ম-সম্বরণ করিয়া শিবচরণের নিকট কি উপায়ে আপনার প্রতিপত্তি ও প্রাপ্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবে মনে মনে তাহার একটী মুশাবিদা করিয়া ফেলিল; কিয়ৎক্ষণ এদিক ওদিক করিয়া এক আধটু সত্য, মিথ্যা সন্ধান লইয়া "তাইত বলি মশায়, সহজে কি মাধব শর্ম্মার ঘটকালি ভাঙ্গে" ইত্যাদি ভূমিকা ফাঁদিয়া শিবচরণকে এক অভূত ও অশ্রুত-পূর্ব্ব কল্পিত কাহিনী শুনাইল। এই যে দুর্ঘটনা ইহা যে শিবচরণেরই প্রথমা স্ত্রীর ষড়যন্ত্রের ফল, ইহার অকাট্য প্রমাণও সে দেখাইল। সুধাংশুনাথ—সে যে শিবচরণের প্রথমা স্ত্রীর মাসীর কিরূপ দেবরের সম্বন্ধীর পুত্র! ইহাতেও কি আর সন্দেহ থাকে? নিশ্চয়ই তবে ইহা উমারই চক্রান্ত! শত্রু হইতে নহে, অন্য কাহা হইতে নহে, পত্নী হইতে, হিন্দু পত্নী হইতে স্বামীর এই অপমান! হায় কলিকাল!

তখন ব্যর্থমনোরথ শিবচরণ শীকারভ্রষ্ট ব্যাঘ্রের ন্যায়, পদদলিত আশীবিষের ন্যায়, ক্রোধে, লজ্জায়, ক্ষোভে, জর্জ্জরিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, যদি এ অপমানের প্রতিশোধ না লইতে পারি, তবে,—সে এক ভীষণ প্রতিজ্ঞা! পুত্র-হারা ধনঞ্জয় যেমন অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়াই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, হয় সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে পুত্রহন্তার নিধন, নয় প্রাণত্যাগ। শিবচরণও মনে মনে তেমনই একটা দারুণ প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিলেন! দ্বাপরে পার্থের প্রতিজ্ঞা ও প্রাণরক্ষায় সহায় হইয়াছিলেন, স্বয়ং মাধব—আর কলিতে, শিবচরণের শিবাশিবের ভরসা রহিলেন মর্ত্ত্যের মাধব ঘটক।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

শিবচরণ অনেক ইতস্ততঃ করিয়া শেষ গৃহে গমনই স্থির করিলেন। ব্যবসা স্থানে বন্ধুবান্ধব, বিবাহ যাত্রা সকলেই শুনিয়াছেন, কেহ কেহ বা দেখিয়াওছেন, সুতরাং কোন্ মুখে, কি সুখে, সেখানে আর যাওয়া যায়? তাই সেদিকে আর শিবচরণের চরণ উঠিবার সম্ভাবনা রহিল না! দেশে এ সংবাদ পৌছিতে বিলম্ব হইবে, ততদিন কি ঘটক একটা কিছু করিয়া উঠিতে পারিবেন না? ঘটক যে প্রকার আশা দিয়া গিয়াছে, তাহাতে ত সাত দিনের ভিতর শুভকার্য্য সম্পন্ন হইবারই কথা। ঘটকের আশ্বাস-বাক্যে শিবচরণের বিশেষ ভরসা থাকিলেও মাঝে মাঝে কিন্তু মৃতবৎসার সন্তান আশার ঘোর আশঙ্কার মত শিবচরণেরও কেমন একটা আতঙ্ক থাকিয়া গেল! আরও একটা উদ্বেগে শিবচরণকে কিছু উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিল! বিগত ঘটনার কোন কথা যদি কোন সূত্রে, গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া থাকে! ভগবান্ এতই কি নিদয় হইবেন?

শিবচরণ গ্রামে প্রবেশ করিতেই তাহার এক বাল্য-বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। বাল্যবন্ধু হাসিমুখে, শিবচরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভায়া? হঠাৎ যে? খবর ভাল ত?" শিবচরণ যেন সে স্বরে, একটু বিদ্রূপের চাপা আভাস পাইলেন! বন্ধুকে কেবলমাত্র "হুঁ" বলিয়া একটু দ্রুতপদ হইলেন, কিন্তু নিরাপদ হইতে পারিলেন না। পদে পদে

তাঁহার প্রতি প্রশ্ন বর্ষিত হইতে লাগিল, সকল প্রশ্নই যেন শ্লেষময়! তখন শিবচরণের হৃদয়ে একটা বিপ্লব বাধিয়া গেল! মনের সেই অসংযত উদ্দীপ্ত অবস্থাতেই তিনি গৃহে প্রবেশ করিলেন। অন্দরে উপস্থিত হইয়াই শিবচরণ প্রথমে উমাকে দেখিলেন—চারি চক্ষে এক হইবামাত্র উমা এক মুখ হাসিয়া, একটু ঘোমটা টানিয়া, একটু অন্তরালে দাঁড়াইয়া, হাসিমুখে স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিল। প্রথম দর্শনে এমন হাসি উমা চিরদিনই হাসে, এ হাসিতে একটু বৈচিত্র্য ছিল! বিনামেঘে বৃষ্টির মত সহসা, বহুদিনের পর প্রিয়জন-সমাগম, বড় আনন্দের! সে আনন্দ যেন বর্ষার ভরা নদীর মত দুকূল ভাসাইয়া উছলিয়া পড়ে! কিন্তু উমার এই মধুর হাসিতে, মানসিক বিকারগ্রস্ত শিবচরণ বুঝিলেন, অন্যরূপ! লজ্জায় তাঁহার গম্ভীর মুখ গম্ভীরতর হইয়া গেল, ক্রোধে সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল, সেই ভীষণ মূর্ত্তিতে হাসির প্রতিদানে শিবচরণ রাগকষায়িত লোহিত লোচনে উমার মুখের দিকে চাহিলেন! সরলহৃদয়া উমা প্রথমে বুঝিয়াছিল, বুঝিবা পথ-শ্রান্তিতেই স্বামীর মূর্ত্তি এমন হইয়াছে, তাই বহুদিনের পর প্রথম সাক্ষাতের হাসির বিনিময়ে বিরক্তিতে সে তেমন ব্যথা পায় নাই, কিন্তু অল্পক্ষণেই উমা বুঝিল, ব্যাপার কিছু গুরুতর। তবু কমলিনী যেমন, মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের প্রখর তেজে তাপিত হইয়াও, অশ্রান্তে প্রফুল্ল মুখে ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে সেই প্রচণ্ড রবির পানেই চাহিয়া থাকে, উমাও তেমনই, স্বামীর পানে চাহিয়া রহিল। জলভরা কমল চক্ষু দুটী ছল ছল করিতে লাগিল।

স্নেহময়ী জননী আসিয়া শিবচরণের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন—শিবচরণ কিন্তু বড় অন্যমনস্ক, তাকে প্রণাম করিতে ভুলিয়া গেল!

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

উমার সহিত শিবচরণের যে সকল কথা বার্ত্তা হইয়াছিল, আমরা আর তার বিস্তারিত আলোচনা করিতে ইচ্ছুক নহি। সে প্রসঙ্গে পাঠক পাঠিকাও প্রীতি পাইবেন না। তবে এই মাত্র বলিয়া রাখি, কর্দ্দম যেন পদদলিত হইলেও চরণ ছাড়ে না, উমাও তেমনি অপমানে অবহেলায় শিবচরণের চরণ ধরিয়া রহিল। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তাহার স্বামীর মুখে শুনিল, উমারই জন্য তাঁর স্বামীর বিবাহ করা ঘটিয়া উঠিতেছে না, যে মুহূর্ত্তে শুনিল উমাই তাহার স্বামীর সুখের ও আশার কণ্টক, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। ইহার উপর, উমার রোগবিশেষের বেদনাটা সেদিন বড়ই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। চিকিৎসকের পরামর্শে সে বেদনা নিবারণের জন্য উমা সরিষা প্রমাণ আফিং ব্যবহার করিত, তাহাতে বেদনার কিছু উপশমও হইত! কিন্তু তাহার হৃদয়ের এ দারুণ বেদনা কিসে ঘুচিবে, উমা কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহাই ভাবিতে লাগিল! আজ কোথায় তুমি স্নেহময়ী জননী,—কোথায় তুমি স্নেহময় জনক! তোমরা আজ কোথায়!

সেই দিন গভীর রাত্রে সহসা রায়েদের গৃহিণীর শোক-উচ্ছ্বাস নিশীথ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া, শ্রোতার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া দিগ্বিদিক্ প্রতিধ্বনিত করিল! গৃহিণী বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতেছেন, "সোণার প্রতিমা জলে ভাসালি রে বাবা!"

পরদিন প্রাতে শুনা গেল, শিবচরণের স্ত্রী সহসা কলেরায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে!

পুত্রবধূর শোকে রায়-গৃহিণী উন্মাদিনীপ্রায় হইয়াছেন।

প্রবাসের সুখ।

বাঙ্গালীর দুর্ব্বল মস্তকে অনেক দোষ, অনেক অপবাদের বোঝা চাপান আছে; সত্য মিথ্যা অনেক লাঞ্ছনাও ভোগ করিতে হয়; কিন্তু শত্রু হউক আর মিত্র হউক, এ কথা কাহারও বলিবার যো নাই যে, বাঙ্গালী বিদেশ গমনে ভীত বা কাতর; শরীরে বল নাই, কিন্তু বিদেশ গমনে যে টুকু মনের বলের দরকার বাঙ্গালীর হৃদয়ে তাহার অভাব নাই। চাকুরীর উদ্দেশে বাঙ্গালী এখন সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া আফ্রিকায় পর্য্যন্ত যাইতেছে; যেখানে চাকুরী মিলে বাঙ্গালী সেখানেই যাইতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। ভারতবর্ষের মধ্যে, বিশেষতঃ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ও পঞ্জাবে এমন বড় সহর অতি কমই আছে যেখানে উলঙ্গশির বাঙ্গালী দেখিতে না পাওয়া যায়। বাঙ্গালী দাসত্বব্রতে উৎসর্গীকৃত-জীবন, সুতরাং বিদেশ গমন বাঙ্গালীর অদৃষ্টের সর্ব্বত্র লিখিত আছে।

আমিও বাঙ্গালী, বাঙ্গালা দেশের এক অতি ক্ষুদ্র গ্রামের, ততোধিক ক্ষুদ্র কুটীরে প্রতিপালিত; দাসত্বের

পসরা মস্তকে লইয়া জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম; পরের দাসত্বেই জীবন কাটিয়া যাইত, কিন্তু ভগবান্ আমার অদৃষ্টের এক নিভৃত কোণে দিন কয়েকের জন্য দাসত্ব-মুক্ত জীবন যাপনের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন; তাই আমি একদিন আমার জীবনমধ্যাহ্নে ছিন্নরজ্জু পশুর মত ছুটিয়া বাহির হইয়াছিলাম। কোথায় যাইব তাহার কোনই ঠিকানা ছিল না, উদ্দেশ্য কি তাহার স্থির ছিল না।

এই অবস্থায় একদিন আমি প্রবাসী। অপরাহ্ণ চারিটার সময়ে বন্ধু-বান্ধব হীন বাঙ্গালী আমি উত্তর-পশ্চিম রেলপথের সাহারণপুর ষ্টেসনে গাড়ী হইতে নামিলাম। ষ্টেসন তখন লোকারণ্য, কিন্তু সেই লোক রাশির মধ্যে আমার পরিচিত বা দেশস্থ একখানি মুখও দেখিতে পাইলাম না। এই সাহারণপুর হইতেই আমি হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যে যাইবার মনস্থ করিয়াছিলাম। ষ্টেসনে কতলোক দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, কেহ গাড়ী হইতে নামিতেছে, কেহ বা গাড়ীতে উঠিতেছে, কেহ বা আত্মীয়গণকে তুলিয়া দিতে আসিয়াছে; কোন কর্ম্ম নাই, সুধু সুধু লোক সমারোহ দেখিবার জন্যও হয়ত কেহ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করেনা যে আমি কোথায় যাইব। আমি ত মোটেই হিন্দী জানি না, আমিও সাহস করিয়া কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারি না যে এই লোকারণ্য হইতে বাহিরে যাইবার পথ কোন্ দিকে। শেষে যে দিকে সকলে যাইতেছে সেই দিকেই গেলাম, এবং ষ্টেসনের টিকিট কলেক্টর সাহেবের হস্তে আমার টিকিট খানি সমর্পণ করিয়া ষ্টেসনের বাহিরে আসিলাম। সেখানেও অতিশয় জনতা। আমার সঙ্গে সামান্য কিছু জিনিস পত্র ছিল, সেগুলি মাটিতে নামাইয়া ভাবিতেছি এখন কোথায় যাই। এমন সময়ে ৪।৫ জন প্রকাণ্ডকায় হিন্দুস্থানী আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল এবং সকলেই আমাকে দেরাদুন, রাজপুর প্রভৃতি স্থানে লইয়া যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিল। ইহারা সকলেই এক্কাওয়ালা। সাহারণপুর হইতে দেরাদুন কি রাজপুরে যাইতে কত ভাড়া দিতে হয় তাহা আমার জানা ছিল না, কাজেই দর দস্তুর করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে; আর ভাড়া জানা থাকিলেও আমার যে প্রকার হিন্দী ভাষায় বিদ্যা তাহাতে তাহাদের সঙ্গে দর দস্তুর করিতে গেলে হয়ত তাহারা আমার গায়ে ধূলি নিক্ষেপ করিত। সুতরাং তাহারা যখন বলিল যে, যাহা দস্তুর আছে তাহাই দিতে হইবে, তখন বাক্যব্যয় না করিয়া সেই অনিন্দ্যসুন্দর এক্কায় সওয়ার হইলাম। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে অন্য দেশের কথা থাকুক, আমাদের এই ভারতবর্ষেরও সব বিষয়ে উন্নতি হইতেছে; রাস্তাঘাট যান বাহন সকলেরই উন্নতি হইয়াছে; কিন্তু পশ্চিমদেশীয় এই এক্কা গাড়ীগুলি সেই উন্নতির মধ্যে honourable exception; তাহারা তাহাদের সেই আদিম আকার ও পরিচ্ছদ বদল করিল না; তাহাদের সৃষ্টিকাল হইতে এ পর্য্যন্ত তাহারা একই ভাবে একই পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া প্রকাণ্ড সুদৃশ্য রাজপথ আলো করিয়া চলিতেছে।

গাড়ীতে আসিতে মিরট ষ্টেসনে কিছু জলখাবার লইয়া খাইয়াছিলাম; এখানে আর কিছুই খাইলাম না। গাড়ীতে বসিলে গাড়ী চলিতে লাগিল, কিন্তু অল্পদূর যাইতে না যাইতেই আমার পক্ষে গাড়ীতে বসিয়া থাকা মহা কষ্টকর ব্যাপার হইল। এক্কার ক্রমাগত ঝাঁকুনীতে আমার সমস্ত শরীর বেদনাযুক্ত হইয়া পড়িল; এক সেকেণ্ডের জন্যও স্থির হইয়া থাকিবার যো নাই। কিন্তু কি কষ্ট, এখানে অল্প ব্যয়ে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যান আর মিলে না। বিশেষ সাহারণপুর হইতে রাজপুর পর্য্যন্ত ডাকের গাড়ী চলে, সে সংবাদ আমার জানা ছিল না; এক্কা ব্যতীত দেরাদুন গমনের অন্য যান নাই ভাবিয়াই আমি এক্কায় উঠিয়াছিলাম।

অশ্বপ্রবর দৌড়াইতে লাগিল, বামে দক্ষিণে দূরে দূরে দুই চারি খানি গ্রাম দেখা যাইতে লাগিল। প্রশস্ত রাজপথের ধূলিরাশি উড়াইয়া আমাদের এক্কা অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে গ্রাম ছাড়িয়া আমরা প্রান্তরে আসিয়া পড়িলাম। দুই দিকে শুধু প্রকাণ্ড মাঠ, তাহার মধ্য দিয়া দেরাদুনগামী রাজপথ অজগর সর্পের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া যাইতেছে, রাস্তার দুই পার্শ্বে বড় বড় গাছ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সেই বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে মধ্যে প্রকাণ্ডদেহ আম্র বৃক্ষ সকলও আছে। তখন আষাঢ় মাস, গাছে আম আছে। যে গাছ যত বড়, তার ফল তত ক্ষুদ্র দেখিলাম। এক্কা থামাইয়া আমি এক পয়সার আম কিনিলাম; এক পয়সায় অনুমান ২০।২৫টা আম দিল। আমি গাড়ীতে বসিয়াই সে গুলির সদ্ব্যবহার আরম্ভ করিলাম। আমগুলি

মিষ্ট বটে, কিন্তু তাহার ক্ষুদ্র শরীরের পনর আনাই আঁটিতে পূর্ণ। যাহা হউক এক্কার ক্রমাগত আন্দোলনে—আমার প্রাতের জলখাবার বহু পূর্ব্বেই জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এখন এই কয়েকটী আম খাইয়া একটু ক্ষুধা নিবৃত্তি হইল।

এদিকে সন্ধ্যা প্রায় আগত। এক্কাওয়ালা বলিল, সম্মুখের পাহাড়ের নীচেই গাড়ীর আড্ডা—সেখানেই আমাদিগকে রাত্রি যাপন করিতে হইবে; নিশাকালে কোন এক্কাওয়ালাই শিভালিক পর্ব্বতের মধ্যে প্রবেশ করে না। আর ঘণ্টা খানেক গেলেই আমরা শিভালিক পর্ব্বতের পাদমূলে পৌঁছিব বলিয়া এক্কাওয়ালা আশা দিল। ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল; আমার অগ্রে অথবা পশ্চাতে একখানি এক্কাও দেখিলাম না; সেই নির্জ্জন রাজপথে সুধু আমাদের এক্কা তখন ধীর মন্থর গমনে চলিতেছে এবং থাকিয়া থাকিয়া এক্কাচালক তাহার অশ্বকে নানাপ্রকার প্রলোভন প্রদর্শন করিয়া দ্রুত যাইতে উৎসাহিত করিতেছে। আমি বসিয়া বসিয়া সেই অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম; মনের অবস্থা এমন খারাপ ছিল যে, সন্ধ্যার সময়ে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে আর আমার ইচ্ছা হয় নাই।

জীবনে কোন দিন এমন নির্ব্বান্ধব বিদেশে যাই নাই, এমন লক্ষ্যহীন জীবনও কোন দিন যাপন করিতে হয় নাই; আজ এই অন্ধকার রজনীতে দূরদেশে পর্ব্বতপাদতলে কোন্ এক মায়ারাজ্যের দিকে যাইতেছি; অদৃষ্টদেবী আরও কি করিবার জন্য আমাকে হাতে ধরিয়া এই পর্ব্বতক্রোড়ে আনিলেন তিনিই জানেন। আমি সমস্ত আশা ভরসা ভয় ভাবনা সেই অখিল-নির্ভরের উপরে সমর্পণ করিতে যাই, কিন্তু কোথা হইতে যেন "আমি" নামে প্রকাণ্ড একটা জীব নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিয়া নিজের প্রাধান্য স্থাপন করিতে বদ্ধপরিকর হয়। যখনই ভাবনা চিন্তায় অধীর হইয়া আমি নির্ভাবনার দ্বারে উপস্থিত হইবার সুযোগ করি, সেই সময়েই সেই প্রকাণ্ড দৈত্য নিজ অধিকার স্পর্দ্ধার সহিত জানাইয়া দেয়। তখন আবার সব ভুলিয়া নিজের ক্ষুদ্র শক্তিসামর্থ্যের উপর দণ্ডায়মান হইতে যাই, ক্ষীণ দুর্ব্বলপদের উপর ভর দিয়া জীবনের দুর্গম পথে অবতীর্ণ হই। এমনই করিয়া জীবনের দীর্ঘদিন সকল কাটিয়া গিয়াছে; এমনই করিয়া একাকী আমি প্রবাসের সুখ ভোগ করিয়াছি; আশা নিরাশা, সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ, বিশ্বাস অবিশ্বাস লইয়া আমি বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। প্রবাসে কোন দিন আমার সুখ মিলিবে না তাহা আমি জানিতাম; সুখের অন্বেষণে আমি প্রবাস যাত্রা করি নাই, আমি তন্ন তন্ন করিয়া শান্তি খুঁজিয়াছি, বৃক্ষের অবিরাম মৃদু, মর্ম্মর শব্দের মধ্যে, শৈবাল-পরিপূরিতা পূতসলিলা নির্ঝরিণীর অশ্রান্ত গীতধ্বনির মধ্যে আমি শান্তি খুঁজিয়াছি। সুখ আমার ভাগ্যে নাই তাহা জানিতাম, "সুখের লাগিয়া" ঘর বাঁধিয়াছিলাম, তাহা যে "আগুনে পুড়িয়া গেল"; আমার যে "নগরে উঠিতে লাগে বাজারে আগুন।"

এই আমার প্রবাসের সুখ। এই সুখ লইয়া আমি সেই অন্ধকার রজনীতে গিরিক্রোড়ে শিভালিক পর্ব্বত শ্রেণীর শীতল পাদমূলে ক্ষুদ্র গাড়ীর আড্ডায় উপস্থিত হইলাম।

ক্রমশঃ—

শ্রীজলধর সেন।

রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর।

শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর একজন বিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত, প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও সমাজ-সংস্কারক। তিনি অতি ধার্ম্মিক পুরুষ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার যথেষ্ট আদর ও সম্মান হইয়াছে।

তাঁহার পিতা মালবানের মামলেদারের * অধীনে কেরাণীগিরি করিতেন। তথা হইতে তিনি রাজাপুরের মামলেদারের কার্য্যালয়ে বদলী হন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি রত্নগিরি জেলার খাজাঞ্চিখানায় বদলী হওয়ায় নিজ পুত্রগণকে ইংরাজী শিক্ষা দিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন। রামকৃষ্ণ সময়ে সময়ে বোম্বাইয়ের এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ কলেজের অনেক প্রসিদ্ধ ছাত্রের প্রশংসা শিক্ষা-বিভাগের বার্ষিক কার্য্যবিবরণে পাঠ করিতেন। এইজন্য বোম্বাই গিয়া নিজ শিক্ষা সমাপনের ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়ে বলবতী হইয়া উঠে। কিন্তু তখন রত্নগিরির লোকের পক্ষে বোম্বাই অতি দূরদেশ। সুতরাং তাঁহার পিতা মাতা প্রথমে তাঁহাকে বোম্বাই পাঠাইতে সম্মত হন নাই। তদ্ভিন্ন অর্থাভাবও আর এক বিঘ্ন ছিল। কিন্তু রামকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা টলিল না। পরিশেষে যখন তাঁহার পিতা দেখিলেন যে, তিনি সম্মত না হইলে, তাঁহার সম্মতি ব্যতিরেকেও রামকৃষ্ণ বোম্বাই যাইবে, তখন তিনি পুত্রকে বোম্বাই প্রেরণ করিলেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ ইন্‌ষ্টিটিউষ্যনে ভর্ত্তি হন। শ্রীযুক্ত দাদাভাই নাওরোজি তাঁহার অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন। রামকৃষ্ণ জ্ঞানোপার্জ্জনে নিজের সমুদয় শক্তি নিয়োগ করিলেন। দিবসে তিনি সহপাঠিগণের সহিত নানাবিধ পাশ্চাত্য মতের সমালোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন; সুতরাং রাত্রিকালে অল্পক্ষণ নিদ্রা গিয়া অবশিষ্ট সময় অধ্যয়নে ক্ষেপণ করিতেন। টিকি বাঁধিয়া পাঠ করা একটা পরিহাসের কথা হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু এই সময়ে রামকৃষ্ণ সত্য সত্যই চেয়ারে নিজের টিকি বাঁধিয়া পাঠ করিতেন। নিদ্রালুতাপরিহারের এই উপায়টী অবশ্য অতিশয় বালকোচিত, কিন্তু ইহাতে ভাণ্ডারকরের জ্ঞানস্পৃহার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস, গণিত ও প্রাকৃতবিজ্ঞান তিনি সমান অনুরাগের সহিত অনুশীলন করিতেন, কিন্তু গণিতেরই বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার গণিতানুরাগ এরূপ অধিক ছিল যে, এক সময়ে তাঁহার কলেজে গণিতের অধ্যাপনা ভাল না হওয়ায় তিনি অধ্যাপককে বলিয়াছিলেন, আমি গণিতবেত্তা হইব বলিয়া এই কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছিলাম, কিন্তু আমার আশা পূর্ণ হইল না। একদিকে তিনি যেমন অনুরাগী ছাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তেমনি অধীত বিষয়ের সূক্ষ্ম বিশুদ্ধ জ্ঞানের জন্যও তাঁহার খ্যাতি ছিল। একদা অধ্যাপক দাদাভাই নাওরোজি তাঁহার উত্তরগুলি ভ্রান্তিশূন্য বলিয়া বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। রামকৃষ্ণ নিজ কলেজের সমুদয় বৃত্তিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি (Fellowship) প্রাপ্ত হন এবং পরে পুনার ডেকান কলেজে বদলী হন। এই প্রকার পরীক্ষোত্তীর্ণ বৃত্তিভোগী ছাত্র বা ফেলোদিগকে শিক্ষকের কার্য্য করিতে হয়। এই সময়ে তিনি সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করেন। আজকাল বোম্বাই অঞ্চলে ভাণ্ডারকর মহাশয়ের সংস্কৃত পুস্তকাবলীর সাহায্যে সংস্কৃত শিক্ষা যেরূপ সহজ হইয়াছে, তৎকালে তদ্রূপ ছিল না। কিন্তু তিনি শিক্ষকের নানাবিধ কর্ত্তব্যের মধ্যেও উৎসাহের সহিত সংস্কৃত শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন।

যখন বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তখন বোম্বাইয়ের তদানীন্তন শিক্ষাকার্য্যাধ্যক্ষ হাউয়ার্ড সাহেব এই নিয়ম করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহে উত্তীর্ণ না হইলে কলেজের ফেলোগণ বৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইবেন। তদনুসারে ভাণ্ডারকর মহোদয় ক্রমান্বয়ে প্রবেশিকা হইতে এম, এ পর্য্যন্ত সমুদয় পরীক্ষা দেন ও সকলগুলিতেই উত্তীর্ণ হন। তাঁহার বি, এ পরীক্ষায় একটি প্রতিকূল ঘটনা ঘটে। ভ্রমক্রমে একজন সহপরীক্ষার্থীর নম্বর তাঁহার নামের পার্শ্বে লিখিত হওয়ায় তিনি "ফেল্" হন। সুতরাং তিনি নিজের বৃত্তি পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে একজন পরীক্ষক তাঁহার অকৃতকার্য্যতায় বিস্মিত হইয়া বলেন,—"আমি নিজে ভাণ্ডারকরের উত্তর-পত্রের যে অংশ পরীক্ষা করিয়াছি, তাহাতেই তাঁহার যত নম্বর পাওয়া উচিত, সমস্ত উত্তর-পত্রের জন্য তিনি তদপেক্ষা কম নম্বর পাইয়াছেন।" এই প্রকারে ভুলটি ধরা পড়ে এবং ভাণ্ডারকর বি,এ উপাধি লাভ করেন। তিনি ইংরাজী ও সংস্কৃতে এম,এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার পর তিনি আইন পড়িতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু সিন্ধু প্রদেশে হায়দরাবাদ ইংরাজী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ তাঁহাকে প্রদত্ত হওয়ায় তিনি শিক্ষা-কার্য্যেই ব্রতী হন। হায়দরাবাদের পর তিনি তাঁহার বাল্যের শিক্ষাস্থল রত্নগিরি ইংরাজী স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন। তাঁহার অধীনে এই স্কুলের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। ডেকান কলেজে তিনি যখন ফেলো থাকেন, তখন তাঁহার প্রথম সংস্কৃত শিক্ষাপুস্তক লিখিত হয়। রত্নগিরিতে দ্বিতীয় পুস্তক লিখিত হয়। উভয় পুস্তকেরই অনেক সংস্করণ হইয়াছে। ভারতবর্ষের নানা স্থানে এবং ইউরোপেও প্রথমশিক্ষার্থিগণের মধ্যে উক্ত পুস্তকদ্বয়ের বহুল প্রচলন দৃষ্ট হয়। তাঁহার গভীর সংস্কৃতজ্ঞানের সম্মানস্বরূপ বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে সংস্কৃতের অন্যতম পরীক্ষক নিযুক্ত করেন। ইহার পর তিনি বহুবৎসর ধরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকতা করেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক ডাক্তার বুলরের পরামর্শানুসারে তাঁহারই অনুপস্থিতিকালে প্রতিনিধি সংস্কৃতাধ্যাপক নিযুক্ত

* মহকুমার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী।

হন। বোম্বাইয়ে আসিয়া শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকর আবার আইন পড়িতে আরম্ভ করেন, কিন্তু ক্রমান্বয়ে পুনা ও সিন্ধুদেশে বদলী হওয়ায় তাঁহার আইন অধ্যয়ন বন্ধ হইয়া যায়।

ডাক্তার ভাণ্ডারকর প্রত্নতত্ত্ববিৎ বলিয়া সুপরিচিত। একটি আকস্মিক ঘটনায় ভারতীয় পুরাতত্ত্বানুসন্ধানে তাঁহার শক্তি নিয়োজিত হয়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার মানেকজি আদরজি নামক এক পার্সি ভদ্রলোক মৃত্তিকায় প্রোথিত একটী তাম্র ফলক প্রাপ্ত হন। উহার লেখা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিবার জন্য উহা ডাক্তার ভাণ্ডারকরকে প্রদত্ত হয়। উহা প্রাচীন দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত ছিল। ডাক্তার ভাণ্ডারকর তখন উক্ত বর্ণমালার একটী অক্ষরও জানিতেন না। যাহা হউক, তিনি শীঘ্রই প্রিন্সেপ, টমাস প্রভৃতি লেখকগণের পুস্তকাবলী সংগ্রহ করিয়া তৎসাহায্যে তাম্রপত্রটি পাঠ করিলেন; এবং রয়্যাল্ এষিয়াটিক্ সোসাইটির বোম্বাই শাখার জন্য তদ্বিষয়ে একটী প্রবন্ধ লিখিলেন। ইহাই তাঁহার প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রথম গবেষণা। ইহার পর তিনি অনেক বৎসর ধরিয়া নিয়মিতরূপে উক্ত সমিতির সমক্ষে প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধীয় অনেক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৮৭৩ সালে ডাক্তার ভাণ্ডারকর বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সভ্য নিযুক্ত হন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে পুনাস্থ ডেকান কলেজে বদলী হওয়া পর্য্যন্ত তিনি প্রতি বৎসরই সিণ্ডিক নিযুক্ত হন; তিনি ঐকান্তিক যত্ন ও অনুরাগের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য করিতেন। যখন বর্জ্জেস্ সাহেব ইণ্ডিয়ান্ এণ্টিকোয়্যারী "(ভারত-প্রত্নতত্ত্ববিৎ)" নামক পত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন, তখন প্রথম কয়েক বৎসর নানা প্রবন্ধে ইহার কলেবর পূর্ণ করিবার জন্য তিনি ডাক্তার ভাণ্ডারকরের উপর অনেকটা নির্ভর করিতেন। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপকের পদ শূন্য হওয়ায় ডাক্তার পীটারসন অধ্যাপক এবং শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকর তাঁহার সহকারী নিযুক্ত হন। তৎকালে তাঁহার প্রত্নতত্ত্বজ্ঞানের খ্যাতি সর্ব্বত্র প্রসারিত হইতেছিল। ডাক্তার ভাণ্ডারকর যে যে বিভাগে কার্য্য করিয়াছেন, সর্ব্বত্রই তাঁহার এই একটি সদ্‌গুণ লক্ষিত হয়, যে, তিনি সর্ব্বদাই নূতন যোগ্য লোকের কার্য্যে প্রবেশের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। এই জন্যই তিনি নিজে দীর্ঘকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিক ও পরীক্ষক থাকিতে অসম্মত হন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌গণের অন্তর্জাতিক সমিতির (The International Congress of Orientalists) এক অধিবেশন হয়। ডাক্তার ভাণ্ডারকর এই অধিবেশনে সভ্যরূপে উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রিত হন। কোনও পারিবারিক অবস্থাবশাৎ তিনি যাইতে পারেন নাই; কিন্তু সমিতিতে পঠিত হইবার জন্য মাসিক শিলালিপি সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ রচনা করেন। কঠোরায়াসসাধ্য গবেষণা ও বহুবিষয়ণী বিদ্যাবত্তার জন্য সমিতিতে উহা বিশেষ প্রশংসা লাভ করে। তিনি ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে মালতী-মাধব নামক সংস্কৃত নাটকের একটী সংস্করণ প্রকাশ করেন। উহাতে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও গুণাগুণ বিচার ক্ষমতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৭৮ সালে তিনি লণ্ডনস্থ রয়্যাল্ এসিয়াটিক্ সোসাইটির সম্মানিত সভ্য মনোনীত হন। যখন ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে "উইলসন শব্দশাস্ত্রীয় অধ্যাপকত্ব" প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তিনিই প্রথম অধ্যাপক নিযুক্ত হন। যেমন অপর কার্য্যে তেমনই ইহাতেও তিনি নিজ সমগ্র শক্তি নিয়োগ করেন। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা সমূহ সম্বন্ধে তিনি যে সকল বক্তৃতা করেন, তাহাতে তাঁহার প্রাকৃতভাষাতত্ত্ব এবং ভারতের প্রচলিত ভাষাসমূহ সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান পরিলক্ষিত হয়। ইহার মধ্যে কয়েকটী বক্তৃতা বোম্বাই রয়্যাল্ এষিয়াটিক সোসাইটির পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার ভাণ্ডারকর সরকারী শিক্ষাবিভাগে স্থায়ী রূপে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সংস্কৃত হস্তলিখিত গ্রন্থ অনুসন্ধানের ভার প্রাপ্ত হন। তাঁহার কার্য্যের ৫ খণ্ড বৃত্তান্ত বাহির হইয়াছে। ইহার শেষ দুই খণ্ডে অনেক পুরাতত্ত্ববিষয়ক গবেষণার ফল লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ভায়েনা নগরে প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌গণের সমিতির যে অধিবেশন হয়, তাহাতে তথায় উপস্থিত থাকিবার জন্য তিনি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বোম্বাই প্রেসিডেন্সির প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন। এই বার তিনি সমিতির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি জর্ম্মণীর গটিঞ্জেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর্ অব্ ফিলসফি অর্থাৎ "দর্শনাচার্য্য" উপাধি প্রাপ্ত হন। এই জন্যই তিনি ডাক্তার ভাণ্ডারকর বলিয়া পরিচিত। ইহার পর তিনি ইউরোপ ও আমেরিকার অনেকগুলি সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত-সমিতির সভ্য

মনোনীত হন। * আমরা যতদূর জানি ডাক্তার ভাণ্ডারকরই ফ্রেঞ্চ একাডেমীর একমাত্র ভারতীয় সভ্য। ইহা অতি উচ্চসম্মান। লোকশিক্ষা ও সংস্কৃত বিদ্যার প্রচারার্থ তিনি যাহা করিয়াছেন, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে সি, আই, ঈ উপাধি দেন। সেই বৎসর তিনি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ৫৫ বৎসর বয়স হইবামাত্র তিনি বিশ্রামলাভার্থ এবং শিক্ষা বিভাগের অধস্তন কর্ম্মচারীদের পদোন্নতির জন্য অবসর গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের নির্ব্বন্ধাতিশয়প্রযুক্ত আরও এক বৎসর কার্য্য করেন। সরকারী কার্য্য হইতে অবসর লইয়া তিনি পুনায় নিভৃতে কালযাপন করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু যোগ্য লোকের অদৃষ্টে বিশ্রাম প্রায়ই ঘটে না। সাধারণের হিতার্থ তাঁহাদিগকে আমরণ খাটিতে হয়। তাই ইহার পরও ডাক্তার ভাণ্ডারকর গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইস্ চ্যান্সেলার মনোনীত হন।

উপরে তাঁহার যে সকল গ্রন্থের উল্লেখ করা গিয়াছে, তদ্ভিন্ন তিনি বোম্বাই গেজেটিয়রের জন্য ইংরাজী ভাষায় একখানি দাক্ষিণাত্যের পুরাবৃত্ত রচনা করেন। যে সকল ঐতিহাসিক বিবরণ নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত ছিল, ইহাতে তৎসমুদয় সংগৃহীত ও কালানুসারে সুশৃঙ্খলার সহিত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মুসলমান শাসনকালের পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক, সামাজিক, ও আর্থিক অবস্থা কিরূপ ছিল, ইহা হইতে তাহার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। তাঁহার অন্যান্য অনেক রচনাতেও প্রাচীন ভারতের সামাজিক অবস্থা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। ডাক্তার ভাণ্ডারকর প্রকৃত জ্ঞানান্বেষী। পল্লবগ্রাহীর মত তিনি কখনও কোন বিষয়ের গাঢ় জ্ঞানে সন্তুষ্ট হন না। তিনি যাহা বুঝিতে বা জানিতে চান, তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করেন। কলেজে যখন তিনি অধ্যাপনা করিতেন, তখনও তাঁহার রীতি এইরূপ ছিল।

প্রত্নতত্ত্ব এবং সংস্কৃত সাহিত্য ব্যতীত তিনি ইংরাজী সাহিত্যেরও, বিশেষতঃ ইংরাজী কাব্য ও দর্শনের, চর্চ্চা করেন। ওয়ার্ডস্বার্থ তাঁহার প্রিয় ইংরাজ কবি। এতদ্ভিন্ন কার্লাইল ও মার্টিনোর গ্রন্থাবলীও তাঁহার প্রিয়। জর্ম্মাণ দার্শনিক ক্যাণ্টও তাঁহার অনুরাগভাজন। তিনি জর্ম্মাণ ভাষা জানেন। সংস্কৃত সাহিত্যে উপনিষৎ সমূহ এবং ভগবদ্‌গীতা তিনি বড় ভালবাসেন। এই গ্রন্থগুলির শ্রেষ্ঠ অংশসমূহ তাঁহার কণ্ঠস্থ আছে। প্রাতঃকালে পারিবারিক ভগবদুপাসনার পর তিনি এইগুলি আবৃত্তি করেন। তিনি মহারাষ্ট্রীয় সাধুকবি তুকারামের রচনাবলীর বড় ভক্ত। পারিবারিক উপাসনার পর তিনি ইঁহার অনেক কবিতাও প্রায় আবৃত্তি করেন। কোন কোন বৌদ্ধ গ্রন্থও তিনি ভালবাসেন। তিনি যে প্রাকৃতসমূহ এবং তদুদ্ভব প্রচলিত ভারতবর্ষীয় ভাষাগুলি জানেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

তিনি যত দিন শিক্ষাকার্য্যে লিপ্ত ছিলেন, তত দিন ছাত্রদিগের বন্ধু, নেতা ও উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি বরাবর ভাল ছাত্রদিগকে আর্থিক ও অন্যবিধ সাহায্য দিয়া আসিয়াছেন। কি দিবসে, কি রাত্রিকালে, নিদ্রাদির সময় বাদ দিয়া সর্ব্বদাই তাঁহার দ্বার ছাত্রদিগের জন্য উপদেশ বা পরামর্শ লাভার্থ মুক্ত থাকিত। ছাত্রজীবনে যত প্রকার বিঘ্ন, মনান্তর বা বিবাদ উপস্থিত হয়, সমুদয়ই ছাত্রগণ তাঁহার নিকট ইচ্ছাপূর্ব্বক উপস্থিত করিত। তাহারা প্রফুল্ল চিত্তে দ্বিধাশূন্য হৃদয়ে তাঁহার পরামর্শের অনুসরণ করিত। এই প্রকারে ছাত্রগণ তাঁহার সংসর্গে থাকিয়া সাধুজীবন যাপন সম্বন্ধে অনেক উপদেশ লাভ করিত। অধ্যাপনাগৃহে শিক্ষিতব্য বিষয়ে তাঁহার তদ্‌গতচিত্ততা ছাত্রদিগের হৃদয়েও সংক্রামিত হইত। তাঁহার ঘণ্টাগুলি কখন চলিয়া যাইত, কেহই বুঝিতে পারিত না।

পুরাতত্ত্বানুসন্ধান ব্যতিরেকে, ধর্ম্মপ্রচার, সমাজসংস্কার এবং শিক্ষাদান ও চিন্তার, এই কয়েকটি বিষয়েই তিনি প্রধানতঃ মনোনিবেশ ও শক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি রাজনৈতিক কোন আন্দোলনে যোগ দেন নাই। কিন্তু এ বিষয়ে উদাসীন নহেন। তবে তিনি এ বিষয়ে সবিশেষ সংযতভাব অবলম্বনের ও মিতভাষিতার পক্ষপাতী। তিনি অতিশয় স্বাধীনচেতা; সিণ্ডিকেটে ও অন্যত্র, স্বাধীন ও পক্ষপাতশূন্যভাবে কাজ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি কাহারও অনুগ্রহ প্রার্থনা বা গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার

* Honorary Member of the American Oriental Society, and of the Italian Asiatic Society; Corresponding member of the German Oriental Society, and of the Imperial Academy of Science, St. Petersburg; Member of the French Academy, &c.

বিদ্যানুরাগ, সাধুতা, এবং আড়ম্বরবিহীন জীবন সকলেরই অনুকরণ-যোগ্য। অনেকে কেবল রাজনৈতিক অধিকার লাভ করিতে ব্যগ্র, নৈতিক ও সামাজিক সংস্কার বিষয়ে উদাসীন, কিম্বা হয়ত এগুলিকে রাজনৈতিক আন্দোলন অপেক্ষা কম গুরুতর মনে করেন। ডাক্তার ভাণ্ডারকর এই প্রকার মতের প্রকাশ্য বিরোধী। তাঁহার স্বদেশবাসী-দিগের দোষ ও ত্রুটির কথা তাঁহাদের মনে মুদ্রিত করিয়া দিতে তিনি সর্ব্বদাই সচেষ্ট। তিনি বলেন এবং বিশ্বাস করেন যে, হিন্দুগণ তত দিন পর্য্যন্ত অদৃষ্টের দাস ও জাত্যভিমান শৃঙ্খলিত থাকিবেন, একটা জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবেন না, যত দিন পর্য্যন্ত তাঁহারা নানা জাতি, বর্ণ, উপজাতি ও উপবর্ণে বিভক্ত থাকিবেন এবং নানা কুসংস্কার ও কুপ্রথার দাসত্ব করিবেন। তিনি নিজে স্বীয় বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়া, মুখে যাহা বলেন, কার্য্যেও তাহা করিয়াছেন।

তিনি বোম্বাই ও পুনা প্রার্থনাসমাজদ্বয়ের সভ্য। যখন যেখানে থাকেন, উপাসনা গৃহে উপাসনা করেন, উপদেশ ও বক্তৃতা দেন, এবং কীর্ত্তন করেন। আমরা যাহাকে কীর্ত্তন বলি, ইহা তা নয়। ইহা কতকটা আমাদের দেশের কথকতার মত। পূর্ব্বে তিনি বোম্বাইয়ের সাপ্তাহিক "সুবোধ পত্রিকা"য় অনেক প্রবন্ধ লিখিতেন। পুনা প্রার্থনামন্দিরে একটি সাপ্তাহিক সমিতিতে তিনি শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার পরিবারে প্রাতঃকালে ভোজনের পূর্ব্বে নিত্য ভগবানের আরাধনা হয়। এতদ্ব্যতীত রাত্রিকালে শয়নের পূর্ব্বেও তিনি কিয়ৎকাল একাকী পরব্রহ্মের ধ্যানারাধনায় যাপন করেন।

ইংরাজীতে মানুষের জীবন সম্বন্ধে দুটা কথা আছে, পব্‌লিক্ ও প্রাইবেট। ঠিক্ ইহার সমার্থ দুটা বাঙ্গলা কথা এখনও চলিত হয় নাই। একজন মানুষ, আত্মীয় অনাত্মীয় এবং বন্ধু ও অপরিচিত নির্ব্বিশেষে, সাধারণের সংশ্রবে আসিয়া যে সকল কাজ করেন, তাহাই তাঁহার পব্‌লিক্ বা সর্ব্বপ্রকাশ জীবন; আর তিনি, স্বগৃহে বা অন্যত্র, আত্মীয়-কুটুম্ব বা বন্ধুবান্ধবের মধ্যে বা নির্জ্জনে যাহা করেন, তাহাই তাঁহার প্রাইবেট বা অপ্রকট, প্রচ্ছন্ন জীবন। মোটামুটি পব্‌লিক্ ও প্রাইবেট জীবনের অর্থ এই। অনেকে বলেন, মানুষের জীবনটাকে এরূপে দ্বিখণ্ড করা ভাল নয়। ইহাতে ভণ্ডামি ও কপটাচার বৃদ্ধি পায়। সে যাহাই হউক, এটা ঠিক্ কথা যে, মানুষের এই উভয়বিধ জীবনে একটা ঐক্য, একটা সামঞ্জস্য রক্ষিত হওয়া উচিত। কারণ, আমাদের সমালোচনার, দোষ গুণ বিচারের সুবিধার জন্যই হউক, কিম্বা আইনের ভয়েই হউক, আমরা জীবনটাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেও জীবনটা বাস্তবিক এক। যাহা প্রকাশ্য, তাহা বস্তুতঃ অপ্রকাশ্যেরই ফল। গাছের পাতা ফুল ফল আমরা দেখিতে চাই ও পাই; কিন্তু এটাও মনে রাখা উচিত যে, মাটির নীচে অন্ধকারে নিস্তব্ধতার মধ্যে শিকড়গুলি যে রস শোষণ করে, শাখায় পত্রে, ফুল ফলে আলোকের সংস্পর্শে তাহাই ইন্দ্রিয়গোচর হয়। তাই আমাদের বড়লোকদের প্রচ্ছন্ন জীবন দেখিতে ইচ্ছা হয়। জানিতে ইচ্ছা হয়, তাঁহারা কোথা হইতে শক্তিসঞ্চয় করেন। কিন্তু আমাদের কৌতূহলেরও একটা সীমা থাকা উচিত। আমরা জানি, এবং ইহা জানিয়াই আপাততঃ আমাদের সন্তুষ্ট হওয়া উচিত যে, ডাক্তার ভাণ্ডারকরের সর্ব্বপ্রকাশ ও অপ্রকট জীবনে সামঞ্জস্য আছে। এবিষয়ে তাঁহার কোন আত্মীয় আমাকে ইংরাজীতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই:—"আমি আপনাকে তাঁহার পারিবারিক জীবনের একটা সুন্দর বর্ণনা দিতে পারিতাম। তাঁহার প্রচ্ছন্ন সদ্‌গুণাবলী সাধারণের পরিলক্ষিত গুণাবলী অপেক্ষা কম ত নয়ই, বোধ হয় বেশী। কিন্তু তিনি নিজ জীবদ্দশায়, নিজ জীবনের একটা গূঢ়তম প্রকোষ্ঠ সাধারণের নিকট উদ্ঘাটিত করিতে দিবেন বলিয়া বোধ হয় না।"

ইংরাজদের মধ্যে সকল কাজেরই একটা নির্দ্দিষ্ট সময় থাকে। দেখা করিবারও একটা সময় থাকে। আমাদের দেশে এ রীতি প্রচলিত নাই। সময়-বিভাগে কাজের সুবিধা হয় বটে, কিন্তু যাহারা এই পাশ্চাত্য রীতির খবর রাখেন না এবং ইহার উপকারিতাও বুঝেন না, তাঁহাদের ইহাতে অসুবিধা ও অসন্তোষ হয়। এইজন্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের দেশের কোন কোন অবসরশূন্য, নানাকার্য্যে ব্যাপৃত বড়লোক সর্ব্বদাই বন্ধুবান্ধব বা অপরিচিত আগন্তুকগণকে দর্শন দিতে এবং তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে প্রস্তুত থাকেন। বঙ্গের কৃষ্ণদাস পাল এই শ্রেণীর বড়লোক ছিলেন। ডাক্তার ভাণ্ডারকরও এই প্রকারের লোক। যখন যাহার ইচ্ছা যান, গৃহে থাকিলে দেখা হইবে। সাক্ষাৎকারীর সংখ্যাও বড় কম নয়। তদ্ভিন্ন তাঁহাকে এত সভায় উপস্থিত হইতে হয়, এত ভিন্ন ভিন্ন রকমের কাজ করিতে হয় যে, পড়াশুনা বা গ্রন্থরচনাদি কার্য্যের কোন সময় নির্দ্দেশ করা তাঁহার পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব বলিলেও হয়। যখন অবসর পান, তখন কাজ করেন, এই তাঁহার নিয়ম। ইহা তবু ভাল। কৃষ্ণদাস পালের নিকট এত লোক যাইতেন যে, শেষে তাঁহাকে অপরের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে প্রবন্ধলিখন ও অন্যান্য কার্য্য সম্পাদন অভ্যাস করিতে হইয়াছিল! স্বাস্থ্যরক্ষার্থ ডাক্তার ভাণ্ডারকর প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে ভ্রমণ করেন। এটি প্রায়ই বাদ যায় না।

ডাক্তার ভাণ্ডারকর মহারাষ্ট্রীয় জাতীয় পরিচ্ছদ পরিধান করেন। তিনি কালাপানি পার হইয়া ইউরোপ গিয়াছিলেন, কিন্তু বেশ পরিবর্ত্তন করেন নাই। তাঁহার মুখাবয়ব তেজস্বিতা, আর্জ্জব ও আত্ম-নির্ভরসূচক।

জীর্ণ বীণা।

বহুদিন বীণা তুই, আছিস্ নীরব;
বহু সাধনার ধন, বুঝি ভুলে গিয়াছিস্
পুরাতন প্রিয়তম সে সঙ্গীত সব;—
সে সঙ্গীত সব, আহা! উচ্ছ্বাসে যাহার
হইত বিদগ্ধ চিত্তে বসন্ত সঞ্চার।
জীর্ণতনু বীণা তুই, জীর্ণ তোর তার;
যৌবন-জলন্ত সূর্য্য পশ্চিম গগন প্রান্তে
ধীরে ধীরে গড়াইয়া পড়েছে আমার;
বাহুতে সে বল নাই, অঙ্গুলিতে গতি,
চিন্তায় চঞ্চল চিত্ত স্ফূর্ত্তিহীন মতি!
কিন্তু বীণা, তুই মোর বাল্য-সহচর।
বিপদ-সম্পদ-সখা, মরুভূমে শান্তি তরু!
লইতে চির-বিদায় চাহে কি অন্তর!
পিপাসিত ভক্তি সদা চাহে জল পানে,
শোকাতুর ভোলে শোক সুমধুর গানে।
আয় তবে যাই বীণা, সাহিত্য কাননে,
প্রকৃতির লীলাভূমি, কল্পনার কেলিকুঞ্জ,
ছায়াময় শান্তিময় প্রমোদ উদ্যানে;
নবীন বসন্ত যথা নব অনুরাগে
চুমে প্রকৃতিরে, বীণা শিহরে সোহাগে!

শ্রীদীনেশচরণ বসু।

নূতন লেখকবর্গের প্রতি।

প্রায় প্রতিদিনই কোন না কোন নূতন লেখক অনুগ্রহ করিয়া "প্রদীপে"র জন্য রচনা প্রেরণ করিয়া থাকেন। স্বতন্ত্র পত্র লিখিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার সময় নাই। সুতরাং এই প্রকারে সাধারণভাবে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। সকলের রচনা "প্রদীপে"র উপযোগী হয় না। হইলেও, "প্রদীপ" যেরূপ ক্ষুদ্র, তাহাতে সমুদয় প্রাপ্ত রচনা প্রকাশ করা অসম্ভব। আর একটি কথা এই যে, প্রাপ্ত রচনাগুলির অধিকাংশই পদ্যে লিখিত। বাকী প্রায় সমস্তই গল্প। এই লেখকগণের মধ্যে কেহ কেহ যদি পদ্য ও গল্প না লিখিয়া আর কিছু কাজের কথা লেখেন, তাহা হইলে হয়ত প্রকাশের সুবিধা হইতে পারে। শিক্ষা, বাণিজ্য, কৃষি, অর্থব্যবহার, সমাজনীতি, ভাষাতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, নানাবিধ বিজ্ঞান এবং আরও কত লিখিবার বিষয় আছে। তৎসমুদয়ের নাম করিবার প্রয়োজন নাই। এতদ্ব্যতীত অস্মদ্দেশের প্রাচীন ও আধুনিক নানাবিধ ব্যায়াম ও পুরুষোচিত অন্যান্য নির্দ্দোষ আমোদের কথা লেখা যাইতে পারে। আমাদের দেশের নানাবিধ জীবজন্তুর স্বভাব, খাদ্য, নীড়-নির্ম্মাণ-প্রণালী, প্রভৃতি নিজে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লিখিবার অভ্যাস অল্প লোকেরই আছে। অথচ এই কার্য্যটি অতিশয় প্রয়োজনীয় ও গুরুতর; কিন্তু আয়াসসাধ্য। এই সকল বিষয়ে মন না দিয়া কেবল কবিতা ও গল্প লিখিয়া যশস্বী হইবার চেষ্টা করা শুভ লক্ষণ নহে। চেষ্টা করিলে সকলেই সুকবি বা উৎকৃষ্ট গল্প-লেখক হইতে পারেন না। কিন্তু চেষ্টা করিলে সকল শিক্ষিত লোকেই চলনসই গদ্য প্রবন্ধ লিখিতে পারেন। অনেকে পদ্য সংশোধন করিয়া ছাপিতে বলেন। উত্তরে বক্তব্য এই যে, পদ্য সংশোধন সহজ নয়; তাহাতে আবার সম্পাদক কবিত্বশক্তিহীন।

অনেকেই তাঁহাদের রচনা প্রকাশিত করিয়া তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিতে অনুরোধ করেন। ইহাতে আমাদের বিশেষ আপত্তি ছিল না। কিন্তু "প্রদীপ" কেবল নূতন-লেখকদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য প্রকাশিত হইতেছে না। তদ্ভিন্ন, এইরূপে যোগ্যতার বিচার না করিয়া, উৎসাহ দিলে, গ্রাহকগণ, বোধ হয়, আমাদিগকে উৎসাহ দিবেন না! পরিশেষে একটা আক্ষেপের কথা লিখিয়া শেষ করি। কোন কোন ব্যক্তি, তাঁহাদের রচনা প্রকাশিত হইলে প্রদীপের গ্রাহক হইবার লোভ দেখাইয়া পত্র লেখেন। অবশ্য, আমাদের অপমান করা ইঁহাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু ভরসা করি, তাঁহারা আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন।

সমুদয় রচনা এলাহাবাদে সম্পাদকের নিকট প্রেরিতব্য।

পুস্তক প্রাপ্তি স্বীকার।

১। সরল রসায়ন। (তেজঃ সহিত)। কটককলেজের বিজ্ঞানাধ্যাপক এবং কটক মেডিক্যাল স্কুলের রসায়ন-শিক্ষক শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, এম, এ, প্রণীত। ইণ্ডিয়ান ডিপজিটরী, কলিকাতা। মূল্য ১।০।

২। নূতন ভূগোল-প্রবেশ (প্রথমশিক্ষার্থীদিগের জন্য) শ্রীবগলারঞ্জন দাস প্রণীত। বেথুন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত। শ্রীঅমূল্যরতন কুণ্ডু ব্রাদার্স, কলিকাতা। মূল্য ৵১০।

৪। মালা (কাব্য), এবং ৫। অশ্রুমালা (কাব্য)। শ্রীকৃষ্ণগোপাল চক্রবর্ত্তি প্রণীত। এস্, সি, বসু, কলিকাতা। প্রত্যেকের মূল্য ।৵০।

৬। নীহারমালা, শ্রীমতী বিনোদিনী দেবী। বঙ্কিম-লাইব্রেরী—হুগলী, মূল্য ৵০।

৭। তুলসী-মালা বা হিন্দুধর্ম্মের আলোচনা, মেদিনীপুর কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ, এম, এ, প্রণীত। স্কলার্স ডিপজিটরী, কলিকাতা। মূল্য চারি আনা।

৮। মর্ম্মগাথা। শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী প্রণীত। সাবিত্রী যন্ত্র, হুগলী। মূল্য ৸০।

৯। প্রীতি ও পূজা। শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা প্রণীত। বামাবোধিনী ডিপজিটরি, কলিকাতা। মূল্য ॥০।

১০। ভারতবর্ষের ইতিহাস। (বালক বালিকাদের জন্য) শ্রীহেমলতা দেবী কর্ত্তৃক রচিত। ২২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ॥০ আনা।

বিশেষদ্রষ্টব্য।—সমালোচ্য গ্রন্থাদি "প্রদীপ" কার্য্যালয়ে না দিয়া ডাকযোগে সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করাই নিয়ম। সকল পুস্তকেরই উল্লিখিতরূপ প্রাপ্তিস্বীকার করা যাইবে। কিন্তু পুস্তক বিশেষের সমালোচনা করা না করা সম্পাদকের বিবেচনা সাপেক্ষ।

প্রদীপ

প্রথম ভাগ। } জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৫। { ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

নবদ্বীপ।

গঙ্গাজলাঙ্গী সঙ্গমে নবদ্বীপপুর।
এইখানে গৌরাঙ্গের গম্ভীরমধুর
উঠেছিল সঙ্কীর্ত্তন;—কোথায় অকূল
বাত্যোৎক্ষিপ্ত সমুদ্রের সুনীল বিপুল
প্রমত্ত প্রচণ্ড এক তরঙ্গের মত
আসি, ছেয়েছিল বঙ্গদেশ;—শত শত
আবর্জ্জনাপূর্ণ গৃহাঙ্গন, পথ, মাঠ,
জীর্ণগৃহ, ভগ্নচূড় মন্দির, বিরাট
শ্মশান, বিধৌত করি, পবিত্র নির্ম্মল
নীলজলরাশি দিয়া; করি সমুজ্জ্বল
অভিনব, সুপবিত্র, স্নিগ্ধ, শান্তিময়,
প্রেমপূর্ণ, ভক্তিনম্র, মানব-হৃদয়;
কাম ক্রোধ দ্বেষ হিংসা লোভ করি দূর;—
প্রিয়তমে!—এই সেই নবদ্বীপপুর।

অবিশ্বাস করিতেছ?—এই ক্ষুদ্র স্থান!
নদীতীরে কাঁচা পাকা বাড়ী কয়খান—
অধিকাংশ চালা ঘর! ময়লার খনি—
শীর্ণ গলি! ওই সব সন্দেশ-বিপণি!
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকানে বিলাতি দ্রব্যঘটা—
লণ্ঠন (তাহার মধ্যে হিঙ্কেরও ক'টা),
জুতা (চটী, বুট, আর বোধ হয় তায়
খুঁজিলে দুজোড় ডসনেরও পাওয়া যায়),

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় এম,এ।

কাঁচি ছুরি, পেনসিল, পেন, দেশলাই—
ঘাঘরা ও প্যাণ্ট টুপি (যা'র যাহা চাই)—
পমেটম, নানাবিধ ফিতের প্যাকেট—
আর সর্ব্বনাশ!—কুলবালার জ্যাকেট—
কোন ঘরে চ্যার, বেঞ্চি, টেবিল, বিলাতি
আলমারি, আয়না, বুরুষ, ছড়ি, ছাতি;

গৃহাঙ্গনে কোপি—আরো দুই এক ঘরে
—হরি হরি—একি দেখি—মুরগীও চরে !!!

পুরবাসীদেরই হায় একি ব্যবহার !
ধর্ম্ম কর্ম্ম ছাড়ি' করে সুখে নিদ্রাহার ;
ভুলিয়া গৌরাঙ্গদেবে ভুলিয়া ঈশ্বরে
গাঁজা, গুলি, তাড়ি খায় ; কেনাবেচা করে।
ছেলে পিলে নদী জলে স্নান করে বটে,
কিন্তু পূজা করা দূরে থাক্, নদীতটে
দন্তসম্মার্জ্জন সহ কেহ ধরিয়াছে
অতীব অশ্লীল গান, যাহা কারো কাছে
বলিতেও লজ্জা করে। কেহ মিথ্যা দ্বন্দ্বে
করিছে চীৎকার। কেহ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে
রটাইছে কুৎসা আর মর্দ্দিছে স্বগাত্র।
(সম্ভব ছেলেটা কোন কালেজের ছাত্র)
কেহবা পড়িয়া জলে করে সন্তরণ
কুটিল কটাক্ষ সহ স্বল্পাবগুণ্ঠন
খর্ব্ব, পীন, স্নানরত কুলবধূপ্রতি।
কেহ দূরে কারো সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে অতি
করিছে সুবিস্তৃত কুৎসিত আলাপন।
কেহ অর্চ্চনানিরত মুদ্রিতনয়ন
বৃদ্ধের পশ্চাতে গিয়া ভেঙচায় তারে,
বক্ষে পাণিযুগ রাখি ; তার ব্যবহারে
সম দুষ্ট, কিন্তু কম মৌলিক শিশুরা
করে হাস্য ; চমকিয়া চক্ষু মেলি বুড়া
শিক্ষাদান তরে তাহাদের পানে ধায় ;
ক্ষিপ্রতর পদক্ষেপে তাহারা পলায়॥

সত্য বটে ; কিন্তু প্রিয়ে তবু সত্য এই—
এই সেই নবদ্বীপ ধাম ; এই সেই
তীর্থ ভূমি ; এই সেই চিরস্মরণীয়,
পঙ্কিল পবিত্র, কুৎসিত সুন্দর, প্রিয়
অক্ষয় স্মৃতির মঠ, —চির অভিরাম,
প্রেমের জনম ক্ষেত্র—নবদ্বীপ ধাম।

—শ্রীগৌরাঙ্গ যে প্রেমের উন্মত্ত অধীর
দুর্নিবার টানে ; কৃষ্ণ স্তব্ধ রজনীর
অন্ধকারে ; উদ্‌ভ্রান্ত চরণ ক্ষেপে ; ছাড়ি
মাতা দারা পুত্র বন্ধুবর্গ, ঘর বাড়ি ;
—যাহা কিছু জগতের প্রিয় মনোরম
মনুষ্যের,—যাহার কারণে করে শ্রম ;
বহে দাসত্বের হল, সহে ক্ষুরধার
শত অপমানজ্বালা ; চ'হিয়া যাহার
পানে—একবার শুদ্ধ চাহিয়া কেবল,
ভুলে এই দুঃখরাশি ; এই হলাহল
পান করে হাস্যমুখে লঘুপ্রাণে হায় ;
মনুষ্যের সে আরাধ্য প্রিয় দেবতায়
ঠেলি ফেলি পায়ে অনাদরে ; করি দূর
ফেনিল বিম্বিত তীব্র তিক্ত সুমধুর
সুরাপাত্র অধর হইতে—দীনবেশে
নগ্নপদে, মুণ্ডিত মস্তকে—যেন ভেসে
চলিয়াছিলেন কোন্ অজানিত স্রোতে
বৃন্দাবন পানে;—এই নবদ্বীপ হ'তে !

বহুদিন আগে, একবার, মনে পড়ে,
ভারত সীমান্তে দূর—সুদূর উত্তরে,
শৈলবনচ্ছায়ে, গিরিনির্ঝরপ্রপাতে,
রাজপুত্র এক, ঘন অন্ধকার রাতে;
এইমত পরিবার পুত্র পরিজন
ত্যাগ করি, তুচ্ছ করি রাজভোগ্য ধন ;
রত্নরাশি, গজবাজী, প্রাসাদ, বিভব ;
—নিত্য নৃত্যগীত ; নিত্য স্তাবকের স্তব ;
রমণীর কলহাস্যপূর্ণ অন্তঃপুরে
নিত্য ক্রীড়া ; নিত্য ভোগ ছুড়ে ফেলি দূরে ;
এমনিই পদব্রজে, এমনি বিনিদ্র,
এমনিই অনশনে, এমনি দরিদ্র,
অতি দীনচিত্তে, অতি দীনতম বেশে
চলিয়াছিলেন দূর বন্ধুহীন দেশে।

কিন্তু সে বৈরাগ্যভরে ;—জটিল চিন্তার
কঠোর প্রচ্ছন্ন বিষে নিত্য অনিবার
জর্জ্জরিত চিত্তে ; ক্ষুব্ধ অশান্ত অন্তরে
সংশয়ের অঙ্কুশ তাড়নে ; শান্তি তরে ;—

মস্তক উপরে ঘোর ঝঞ্ঝা, চারিদিক
অন্ধকার ;—যন্ত্রণায় ক্ষিপ্ত দার্শনিক
ছুটিয়াছিল সে অন্ধ অধীর আগ্রহে
অস্থির আবেগ ভরে, কিন্তু প্রেমে নহে।

মানব মাতিয়াছিল শুধু একবার
এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল অন্ধ একাকার
দুর্নিবার প্রেমে ;—মুগ্ধ ক্ষিপ্ত হরিনামে ;
আর তাহা শুদ্ধ এই নবদ্বীপ ধামে।
সেদিন এ নবদ্বীপে জীবন্ত জাগ্রত
ছিল মনুষ্যের আত্মা ; নিত্য ও নিয়ত
বাণীর বীণায় মৃদুমধুর অস্থির
উঠিত ঝঙ্কার ; স্বচ্ছ, শ্যাম জাহ্নবীর
হিল্লোল কল্লোল সম। বিদ্যার অর্চ্চনা—
শাস্ত্রচর্চ্চা, তর্ক, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা,
স্বাধীন চিন্তার স্রোত মৃদুল তরঙ্গে
বহেছিল নবদ্বীপে প্রিয়ে—এই বঙ্গে—
এই চিন্তাশুষ্ক মরুভূমে। অহরহ
সুদূর প্রয়াগ কাশী, দাক্ষিণাত্য সহ
বহেছিল ভাবের বাণিজ্য ; অবিরত
আসিত বিদ্যার্থী জ্ঞানী, গুণী শত শত
নদীয়ায়। প্রতি শীর্ণ গলি বিদ্যালয়
পান্থশালা, ছিল এই নবদ্বীপময়।

পরে এক দিন এই পণ্ডিত সমাজে ;
এই স্মৃতি শ্রুতি ন্যায় নীতি চর্চ্চামাঝে ;
এই কূট তর্কের আবর্ত্তে ;—এক অতি
সুন্দর গৌরাঙ্গ যুবা, ভক্তির মহতী
দুর্দ্দাম বন্যার মত পড়িল আসিয়া
ভৈরব মধুর স্বনে ; দিল ভাসাইয়া
ভাঙিয়া, বিচূর্ণ করি,—নিয়ম, আচার,
সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি ও প্রথার
পুরাতন জীর্ণ বাঁধ। অমনি অধীর
পূর্ণবিকম্পিত বক্ষে ফিরিল নদীর
প্রবল চিন্তার স্রোত ; আসিল উন্মত্ত
উচ্ছৃঙ্খল উপদ্রবে প্রেমের রাজত্ব,
নব যৌবনের মত, কোথা হতে নেমে ;
অমনি উঠিল নৃত্য—মহানৃত্য প্রেমে ;
আর সেই সঙ্কীর্ত্তন—মধুর মৃদঙ্গে
উঠিল এ নদীয়ায়, ছাইল এ বঙ্গে।

আর তাও বেশীদিন নয়। কিন্তু হায়
সে আগ্রহ, প্রেমোন্মাদ, সে ধর্ম্ম কোথায়
আজি প্রিয়তমে—তাহা বঙ্গভূমি হ'তে
কোথায় গিয়াছে ভাসি ঘটনার স্রোতে।
তার স্থলে ভাবহীন প্রাণহীন সব
শুনিছনা বৈষ্ণবের শূন্য কলরব ?
সেই প্রেমরাশি আজ ভিক্ষাব্যবসার
মূল্য মাত্র।—আবার সে কঙ্কাল আচার
ধর্ম্মের মুখস পরি বিবেকের শূন্য
সিংহাসনে বসিয়াছে। ধর্ম্ম, নীতি, পুণ্য,
ভক্তি, স্নেহ, দয়া, ন্যায়—বিনম্র লজ্জায়
রক্তিম—নোয়ায় শির গিয়া তার পা'য়।
তার স্থলে দীর্ঘ ফোঁটা, দীর্ঘতর শিখা,
গলায় হরির মালা ; কৃষ্ণ ও রাধিকা
বেচারির পথে ঘাটে অপমান নিত্য—
ভণ্ডামীর ভাণ্ড, বেশ্যাব্যবসার বিত্ত,
জুড়ি, চৈতন্যেরই সেই পুণ্য বঙ্গধাম।
—অহো কি ধর্ম্মের এ কি ঘৃণ্য পরিণাম !

তবু এই সেই নবদ্বীপ ; ধৌত করে
সেই গঙ্গা সে জলাঙ্গী আজও ভক্তিভরে
তার পদরজ। প্রিয়ে, শিরে লও তুলি
প্রেমে সুপবিত্র আজো তার স্বর্ণ ধূলি,
হোক সে পঙ্কিল আজি,—বিলুপ্ত বিভব,
বিহীন সৌন্দর্য্য জ্ঞান প্রতিভা গৌরব,
তবু চির পুণ্যময় তাহা, স্বর্গসম—
অবনত কর শির—প্রেয়সি, প্রণম।

আজকালকার স্কুলের ছেলেরা।

যিনিই অধিক দিন শিক্ষা বিভাগে কাজ করিয়াছেন, তিনিই এই বলিয়া আক্ষেপ করেন যে, আমাদের দেশের ছেলেরা ক্রমশঃ খারাপ হইয়া যাইতেছে। আমি সাধ্যমত এই বালকচরিত্রের অধোগতির কারণ দর্শাইতে চেষ্টা করিব।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কতকগুলি স্বদেশীয় ও বিদেশীয় উদার লোকের বহু আয়াসে ও যত্নে এদেশে যখন ইংরেজী শিক্ষা প্রথম প্রচলিত হয়; পরে ৺ বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন দেশীয় ছাত্রদিগকে সুলভ শিক্ষাদানের জন্য ৩৲ টাকা বেতনের স্কুল ও কলেজ খুলেন; তখন কেহই স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই যে, সেই অমূল্য বিদ্যারত্ন আজকালকার বালকমণ্ডলীর কাছে সামান্য পণ্যের ন্যায় গৃহীত ও অবহেলিত হইবে।

আমাদের দেশে প্রথম যখন ইংরেজী শিক্ষা হিন্দুবালকদের আয়ত্তে আসে, তখনকার অধিকাংশ ছাত্রই তাঁহাদের সেই বহু আয়াস ও পরিশ্রমলব্ধ শিক্ষা দ্বারা প্রগাঢ় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লভিয়া দেশের ও দেশবাসীদের মহা কল্যাণ সাধিয়া গিয়াছেন। ৺ অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, প্যারীচরণ প্রভৃতি মহাত্মাদের পুস্তকগুলি এখনও আমাদের বিদ্যালয় সমূহে পঠিত হইয়া থাকে, কিন্তু হায়! তাঁহাদের ন্যায় কষ্টসহিষ্ণু, অধ্যবসায়ী ও জ্ঞানপিপাসু ছাত্র সব এখন কোথায়?

হিন্দু, বিশেষতঃ বঙ্গ বালকদের কাছে বিদ্যালয় এখন যেন দোকান মাত্র—সেখানে কয়েক বৎসর কিছু কিছু অর্থ দিয়া (সাধ্যমত যত সস্তায় হয়) দুই একটি 'পাশ' কিনিতে পারিলে কোন আফিসে একটি চাকরী মিলিবে—এই তাদের স্কুলে পড়ার প্রথম ও শেষ উদ্দেশ্য। অবশ্য, আমাদের এ অবনত অবস্থার মধ্যেও দু একটী পরিশ্রমী ও জ্ঞানোৎসাহী ছাত্র এখনও দেখা যায়, কিন্তু আমি সে দুচারজনের কথা বলিতেছি না—হাজারের মধ্যে যে নয়শত নিরনব্বই জন ছাত্রের বিদ্যায় আলস্য, অনাস্থা ও অবহেলাতে দেশের মহা অপকার হইতেছে, তাহাদেরই বিষয় লিখিয়া হৃদয়বান্ ব্যক্তিমাত্রকেই স্বদেশের একটি অন্তর্ব্যাধির কারণ দেখাইতেছি।

প্রাইভেট স্কুল বাদ দিয়া গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় সমূহেও দেখা গিয়াছে, যেখানে শিক্ষকেরা ছাত্রদেরকে যথার্থ বিদ্যা শিখাইতে ও নিয়মে রাখিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, সেইখানেই ছাত্র সংখ্যা ক্রমে হ্রাস হইয়া গিয়াছে। আর যে যে শিক্ষালয়ে বালকদের প্রশ্রয় দেওয়া হয়, সেই সেই স্কুলেই ছেলের ভিড় হয়ে থাকে। বালকদের এইরূপ শিথিল অভ্যাস দেখিয়া আজকাল অধিকাংশ স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষরা বিদ্যালয়ের নিয়ম সব শিথিল করিয়া দিয়াছেন। ছেলেরা যখন ইচ্ছা স্কুলে যায়, যখন ইচ্ছা চলিয়া আসে, পড়া করুক বা নাই করুক, বিদ্যালয়ে আচরণ যেরূপই হউক—প্রহার বা কোনরূপ শাস্তির ভয় নাই। আমাদের দেশের গৃহগুলি ছোট ছেলেদের পক্ষে যে রকম শৃঙ্খলাশূন্য ও অশিক্ষার স্থান, সেখানে শৈশবকাল থেকেই তারা কোনরূপ শাসন বা দমনে অভ্যস্ত হয় না; সে কারণে বিদ্যালয়গুলিকেও তারা সেইরূপ উচ্ছৃঙ্খল ও অনাটক দেখিতে ইচ্ছা করে। যে যে শিক্ষালয়ের কর্ত্তব্য-পরায়ণ কর্ত্তৃপক্ষরা তাদের এই শিথিল অভ্যাসে প্রশ্রয় না দেন, সেই সেই পাঠাগারের প্রতি তাদের মহা কোপ ও বিদ্বেষ দেখা যায়। কোন গুরুতর অপরাধের জন্য যদি কোন বালক দণ্ডিত হয়, তাহলে সে তৎক্ষণাৎ অভিভাবকের কাছে স্কুলের নামে অভিযোগ করে, আর সে, সে স্কুলে আর পড়িবে না, এরূপ প্রতিজ্ঞাও করে। দুর্ব্বলহৃদয় অভিভাবকও তাকে অমনি ট্রান্সফরের (transfer) চিঠি দিয়া জন্মের মত ছেলেটির বিদ্যার দফা রফা করিয়া দেন!

ইহা কার্য্যতঃ জীবনে দেখা গিয়াছে যে, কোন ভাল কাজই বিনা পরিশ্রমে, বিনা শিক্ষায় বা বিনা কষ্টে লাভ করা যায় না। সামান্য মুটে মজুরের কাজ ছাড়া সকল কর্ম্মেই প্রথমে কঠোর পরিশ্রম, শিক্ষা ও শাসনের প্রয়োজন; নহিলে প্রতি পদে পড়িয়া যাইতে হয়। সেই জন্যই গবর্ণমেণ্ট ও অধিকাংশ মার্চেণ্টের আফিসে তিন বৎসর অ্যাপ্রেন্টিস্ (apprentice) খাটাইয়া তবে নিযুক্ত করে। আর আমাদের বঙ্গবালকেরা মনে করেন যে—বিনা শিক্ষায়, বিনা পরিশ্রমে ও বিনা শাসনে,—কেবল মাসে মাসে তিনটী করিয়া টাকা দিয়াই দশ বৎসর পরে তাঁরা এক একটি বিদ্যাদিগ্‌গজ হইয়া স্কুল হতে বাহির হবেন।

এখনকার অধিকাংশ ছাত্রই কি প্রকারে শিক্ষিত হইয়া থাকে দেখুন। অতুলের বয়স সাত বৎসর, সে বাড়ীতে বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ শেষ করিয়াছে, তাকে এখন স্কুলে ভর্ত্তি না করিলে আর চলে না। তার পিতা কোন আফিসে ১০০ টাকা বেতন পান। তিনি পুত্রটীকে লইয়া পাড়ায় দুই তিনটী স্কুলে ঘুরিলেন—বিদ্যালয় অনুসারে আট আনা থেকে দুই টাকা পর্য্যন্ত ইন্‌ফ্যাণ্ট ক্লাসের মাহিনা। তিনি আট আনার স্কুলেই তাকে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন—এত ছোট ছেলের জন্য বেশী মাহিনা দেওয়া পয়সা নষ্ট মাত্র।

চার পাঁচ বৎসর মাঝামাঝি পরীক্ষা দিয়া অতুল ক্লাসে উঠিল। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার পড়ায় মন কমিয়া আসিল। ফিফ্‌থ ক্লাসের বাৎসরিক পরীক্ষায় সে একেবারেই ফেল। স্কুলের হেডমাষ্টার তাকে প্রমোশন দিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু সে মায়ের কাছে অনেক কাঁদাকাটি করিয়া পিতার কাছ থেকে এক চিঠি হাজির করিল। মাষ্টার বাবু কি করিবেন, অভিভাবকের উপর দায়িত্ব দিয়া তাকে ক্লাসে উঠাইয়া দিলেন। সে হাসিতে হাসিতে চতুর্থ শ্রেণীতে গিয়া বসিল ও সমপাঠীদের উপহাস থেকে এযাত্রা রক্ষা পাইল।

পর বৎসর সে শিক্ষায় আরও অমনোযোগী হইয়া স্কুল কয়েদখানার মত ভাবিল, আর মাসের মধ্যে ১৫ দিন কোন না কোন অছিলায় অনুপস্থিত থাকিল। তাহার এই আলস্য ও অনুপস্থিত থাকার কথা অভিভাবক শুনিলেও তিনি তার কোন প্রতিবিধান করিলেন না। এবার পরীক্ষায় সে সব বিষয়েই অতি কম নম্বর রাখিয়া সব নীচে পড়িল ও অনেক মিনতি করিয়াও প্রমোশন পাইল না। তখন সে অভিভাবকের কাছে স্কুলের নিন্দা আরম্ভ করিল। আজ পাঁচ ছয় বৎসর যিনি পুত্রের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করেন নাই বা সন্তানকে শাসেন নাই, আজ তাহারই বাক্যে তাহার চোক ফুটিল! তাই ত তাঁর এমন পরিশ্রমী ও শিক্ষায় মনোযোগী ছেলে বৎসর বৎসর ফেল হচ্ছে, ইহার কারণ কি? নিশ্চয় ও স্কুলের দোষ। যাক্ ও স্কুলে আর পড়িয়া কাজ নাই। যাও বাবা, তুমি ট্রান্সফর লইয়া অন্য স্কুলে যাও।

ভ্রমান্ধ অভিভাবকের কাছে তিরস্কার বা প্রহারের পরিবর্ত্তে এইরূপ প্রশ্রয় পাইয়া এ জন্মের মত অতুলের প্রকৃত বিদ্যা শিক্ষা উঠিয়া গেল। সে প্রতিবৎসর পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হয়েও বিদ্যালয় পরিবর্ত্তন দ্বারা প্রমোশন পাইতে লাগিল। ক্রমে এণ্ট্রেন্স ক্লাসে উপস্থিত। এখানে ত আর চালাকি খাটে না, ও কাহারও চোকে ধূলা দিবারও যো নাই। ফিফ্‌থ ক্লাস থেকে যে অতুল শিক্ষক ও অভিভাবককে ফাঁকি দিয়া আসিয়াছে, এখন সে নিজেই ফাঁকে পড়িল। তিন চারবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ফেল হয়ে পঁচিশ বৎসর বয়সে অতুল বাবু এক আফিসে ১৫৲ টাকায় আপ্রেণ্টিস্ খাটিতে প্রবেশ করিল।

পিতার কত আশা ভরসা ও উৎসাহ যে পুত্রের শিক্ষা ও উপার্জ্জনের উপর ছিল; নিজের দৃঢ়তা ও উপযুক্ত শাসন অভাবে সে সব মাটি হয়ে গেল! বড় জোর ৩০৲ টাকার কেরাণীগিরি অতুলের ভাগ্যে জুটিবে।

এখনকার বালকদের, বিশেষতঃ কলিকাতার অধিকাংশ ছাত্রদেরই শিক্ষা ও জীবন এইরূপে শেষ হয়। ক্রমে তাঁরাই আবার অভিভাবক হন, ও পুত্রদের উপর আরও অনাস্থা দেখাইয়া থাকেন! এরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত বালকদের হ'তে আমরা আর কি আশা করিতে পারি? আমরা কি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি না যে দেশীয় লোকদের নৈতিক চরিত্র কত নীচ সোপানে নামিয়া পড়িয়াছে? ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যে বালকেরা একটী মিথ্যা কথা বলিতে সঙ্কুচিত হত, এখন তাঁদেরই সন্তানেরা প্রত্যহ কত মিথ্যা কথা বলিয়া পাঠ ও প্রহার হতে অব্যাহতি লাভ করে। শিক্ষালয়ের তত্ত্বাবধায়ক ও মাষ্টারদের প্রতি আর তাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা নাই; এমন কি, অনেক সময়ে তাহারা শিক্ষকদের অপমান পর্য্যন্ত করিয়া থাকে।

এখন মনে করুন, অতুলের বিদ্যা শিক্ষার এই পরিণাম কি কেবল তার নিজের দোষেই হইল? অবশ্য তাহা নয়। সে বালক মাত্র! সে নিজের ভাল মন্দ কি জানে? প্রহারের ভয় ও পরিশ্রমে অবহেলা সব দেশের ছেলেদেরই ত দেখা যায়। তবে অন্যান্য স্থানের বালকেরা ত বঙ্গবালকদের মত এরূপ শিথিল, দুর্ব্বল ও চরিত্রহীন মানুষ হয়ে দাঁড়ায় না। ইউরোপ, আমেরিকা ত দূরের কথা; আমাদের প্রতিবেশী মুসলমান ও খৃষ্টান বালকেরা ত হিন্দু ছাত্রদের ন্যায় এত অদম্য হয়ে উঠে নাই—ইহার কারণ কি?

কারণ—খ্রীষ্টান ও মুসলমান অভিভাবকেরা আমাদের বঙ্গপিতাদের মত এত দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক নহেন; আর খৃষ্টান ও মস্‌লেম বিদ্যালয় সমূহের কর্ত্তৃপক্ষরা ছাত্রদেরকে অত প্রশ্রয় দেন না। তাদের মধ্যে সমস্ত স্কুলেই এক রকম শিক্ষা, নিয়ম ও শাসন প্রচলিত; সকল গুলির মধ্যেই একটা অন্তর্গত একতা ও সহকারিতা (Co-operation) আছে। যে বালক কোন নিয়ম ও শাসনের বশীভূত থাকিতে না পারে, সে কোন স্কুলেই ভর্ত্তি হতে পারে না, সুতরাং দায়ে পড়িয়াও সে বিদ্যা শিখিতে ও দমনে থাকিতে বাধ্য হয়। তা ছাড়া, ফিরিঙ্গী ও মুসলমান অভিভাবকদের নিজ নিজ জাতীয় শিক্ষালয়গুলির উপর শ্রদ্ধা ও উহার কর্ত্তৃপক্ষদের উপর বিশ্বাস আছে। তাঁরা জানেন, স্কুল থিয়েটার নয়—শিক্ষার স্থান; সেখানে নিয়মে ও শাসনে না থাকিলে ছেলেটি কোন ক্রমেই চৌকষ মানুষ হতে পারিবে না। সে কারণে তাঁরা বিদ্যালয়ের শাসনের উপর কর্ত্তৃত্ব চালাইয়া পুত্রের বিদ্যা শিক্ষার সর্ব্বনাশ করেন না।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের মধ্যে পরস্পরের উপর এ ভক্তি ও বিশ্বাস নাই। হিন্দু অভিভাবকেরা আজকাল মনে করেন—স্কুল সকল দোকানের মত—বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষরা দোকানদার স্বরূপ—তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি করা দূরে থাকুক, তাচ্ছল্য ভাব দেখানই যেন উপযুক্ত কাজ। ক্রমে এই ভাবটা অভিভাবক হতে ছাত্রদের মনে আসিয়াছে, এবং ইহাতেই আমরা বালকমণ্ডলীর অধোগতির প্রধান কারণ দেখিতে পাই। বাস্তবিক কোন উৎকৃষ্ট দ্রব্যই অধিক বা অতি সস্তা পাইলে কেহই উহার মূল্য বুঝিতে পারে না ও উহার আদরও করে না। কয়লার দামে হীরা লভিলে কেহ কি আর যত্ন করিয়া উহাকে মুকুটে তুলিবে, না লোহার সিন্দুকে রাখিবে? তখন উহা ছাইয়ের সঙ্গে ফেলিয়া দেওয়া সম্ভব। আমাদের দেশের স্কুলগুলিও এখন সেইরূপ কয়লার দামে হীরার অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে।

বিদ্যালয় ছাত্রদের শিক্ষার স্থান; সেখানে উপযুক্ত বিদ্যা শিখাইয়া ও শাসনে রাখিয়া ছেলেদেরকে 'মানুষ' করা উহার উদ্দেশ্য। ঐ কার্য্য যে কত গুরুতর, ও ঐ উদ্দেশ্য যে কত মহৎ, তাহা আজকাল স্কুলের অনেক কর্ত্তৃপক্ষরাই যেন ভুলিয়া গিয়াছেন। নিজেদের ঐ মহৎ কার্য্যের যোগ্য জ্ঞান, শক্তি ও অভিজ্ঞতা আছে কি না তাহা না ভাবিয়াই যার ইচ্ছা এক এক খেয়ালের বাধ্য হয়ে স্কুল খুলিয়া বসেন। আর ছাত্র জুটাইবার জন্য বাড়ী বাড়ী দালাল পাঠাইয়া ছেলে যোগাড় করেন। অনেক ফ্রি ও হাফ ফ্রি ছাত্রে স্কুল ভরিয়া যায়। অধিক কি, শিক্ষক ও কর্ত্তৃপক্ষরা পর্য্যন্ত অভিভাবকদের নিকটে গিয়া মিনতি করিতে লজ্জাবোধ করেন না; আবার এরূপও দেখা যায়—এক স্কুলের শিক্ষকেরা অন্য স্কুলের কুৎসা গাইয়া অভিভাবকদের মন ভাঙ্গাইয়া দেন—ইহা কি দোকানদারী অপেক্ষাও নীচ ও ঘৃণার কাজ নয়?

এরূপে ছাত্র সংগ্রহ করিয়া যে সকল স্কুল চালিত হইতেছে, সেখানে বালকদের মধ্যে নিয়ম ও শাসন কখনই রাখা যাইতে পারে না। স্কুল বিদ্যাশিক্ষার জন্য—সেখানে সন্তানকে পাঠাইয়া শিক্ষিত করুন, ভবিষ্যতে আপনারই ভাল হবে; না করুন, আপনারই মন্দ——প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রভাবে বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষরা নিজেদের মহৎ উদ্দেশ্য ভুলিয়া অভিভাবকদের মন থেকে ঐ উচ্চ ভাবটিও তাড়াইয়া দিয়াছেন। কাজেই উহার সঙ্গে সঙ্গে অভিভাবকদের স্কুলের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসও চলিয়া গিয়াছে। তাঁরা মনে করেন নিজ নিজ সন্তানদেরকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া তাঁরা কর্ত্তৃপক্ষদেরকে চির ঋণে বদ্ধ রাখেন—এস্থলে তাঁদের কাজের উপর ক্ষমতা চালানতে গার্জ্জেনদের যেন স্বাভাবিক অধিকার আছে। বালকদের শিক্ষা দেওয়ার পরিবর্ত্তে শুধু অর্থলাভই যে স্কুলের উদ্দেশ্য, সে স্কুলের প্রতি ছাত্র ও অভিভাবকদের সহজেই অভক্তি ও অবজ্ঞা জন্মিবার সম্ভাবনা। আজকাল অধিকাংশ বিদ্যালয়ই যখন এরূপে শিক্ষালয় নামে কলঙ্ক দিতেছে, তখন দুএকটি উচ্চ আদর্শের বিদ্যালয়ের বহু যত্ন ও পরিশ্রমেও কোন ফল দর্শিতেছে না।

আমি শুনিয়াছি, কলিকাতার স্কুল সকলের ন্যায় মফস্বলের বিদ্যালয় সকল এতদূর অধোদিকে আসিয়া পড়ে নাই। সেখানে শিক্ষালয়গুলিতে বালকদের বিদ্যাশিক্ষা ও শাসন কিছু ভালরূপে চলিয়া থাকে। কিন্তু দু এক স্থানের রিপোর্ট দেখিয়া জানা যায়, আজকাল মফস্বলের বালকেরাও কলিকাতার ছাত্রদের অনুকরণ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অদম্য হইয়া উঠিয়াছে। সময়ে দমিত না হলে তারাও যে সহরের ছেলেদের মত অধঃপাতে যাবে তার সন্দেহ নাই!

বিদ্যালয় ও ছাত্রসমূহকে এ অধোগতি হতে উদ্ধার করিতে হলে, এখন আমাদের দেশের সমস্ত প্রাইভেট স্কুল গুলি একজোট হইয়া উহার সংশোধন ও সংস্কার করা একান্ত আবশ্যক। সকল স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষরা যদি এক হইয়া সবগুলিতেই এক রকম নিয়ম, শিক্ষা ও শাসন চলিত করেন, তাহলে আর বালকেরা স্কুলকে দোকান ভাবিয়া ক্রমাগত এক স্কুল হতে অন্য স্কুলে যাইতে পারিবে না। সব স্থানেই যদি মন্দ বালকদের প্রতি একরূপ নিয়ম ও দণ্ড বিধান হয়, তা'হলে পাঠশালা বদলাইয়া আর তারা উপযুক্ত শাসন হতে অব্যাহতি পাইবে না ও আলস্য ও অজ্ঞতায় দিন কাটাইতে পারিবে না। তারা দায়ে পড়িয়া পরিশ্রম করিতে ও বিদ্যা শিখিতে বাধ্য হবে।

কিন্তু আমাদের এ চিরদুর্ভাগ্য দেশে আমরা কি সে আশা করিতে পারি? আমাদের স্বদেশীয় কৃতবিদ্যরা আজকাল রাজনীতি রাজনীতি করিয়া পাগল হইয়াছেন। যিনিই উপযুক্ত শিক্ষা ও জ্ঞান লভিয়াছেন, তিনিই রাজনীতির নিশান ধরিয়া নিজ নিজ জয়ডঙ্কা বাজাইতেছেন! তাঁদের উচ্চ মনে এ সামান্য কথা টুকুও স্থান পায় না যে, যে দেশের চারিদিক দিন দিন অন্ধকারে ছাপিতেছে—গরীবেরা দুর্ভিক্ষের অন্ধকারে, ধনীরা স্বার্থের অন্ধকারে, শিক্ষিতেরা অনৈক্যের অন্ধকারে, ছাত্রেরা অজ্ঞতার অন্ধকারে, প্রাচীনেরা কুসংস্কারের অন্ধকারে ও স্ত্রীলোকেরা অবরোধ-অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতেছে—সে দেশে রাজনীতির প্রদীপ জ্বালিলে উহাও অচিরে নিবিয়া যাইবার সম্ভাবনা। আগে আমাদের শিক্ষিত লোকেরা এক জোট হতে শিখুন, বিদ্যালয় সকল সংশোধিয়া প্রকৃত শিক্ষার স্থান করুন, দেশের ভবিষ্যৎ আশা বালকেরা যথার্থ জ্ঞানলাভে চরিত্রবান্ হউক, স্ত্রীলোকেরা জীবনের উদ্দেশ্য বুঝুক, দেশে জাতীয় জীবনের ভিত্তি দৃঢ় হউক—তখন দেখিবেন, মানুষের যোগ্য স্বত্ব সকল ক্রমে ক্রমে আমাদের হস্তগত হবে। নহিলে, এখন এ 'ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো' আনিয়া দরকার কি?—গবর্ণমেণ্টের কাছে হাস্যাস্পদ হওয়া মাত্র।

শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দাস।

ওয়েল্‌স্-কাহিনী।

ইউরোপ আমেরিকার সংবাদ আজ কাল আর আমাদিগের দেশের লোকের নিতান্ত অবিদিত নহে। প্রতি বৎসরেই বহুসংখ্যক ভারতসন্তান ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য লইয়া ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, জর্ম্মনি, ইটালী ও আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে গমন করিতেছেন; তাঁহারা প্রবাস-ক্ষেত্র হইতে স্বদেশীয় বন্ধুবর্গের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত আপনাদিগের অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শনের নিদর্শনপূর্ণ বিবিধ প্রবন্ধ প্রকটিত করিতেছেন; এবং তৎপাঠে এখানকার নরনারীরা ভিন্ন ভিন্ন দেশের রীতি নীতি, আচার ব্যবহার ও অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার সমূহ অবগত হইয়া প্রভূত জ্ঞান ও আনন্দলাভে সমর্থ হইতেছেন। ওয়েল্‌সের বিষয় এখনও কিছু লিখিত হয় নাই বলিয়া সে দেশের একখানি ক্ষুদ্র চিত্র সুন্দর প্রদীপালোকে ধরিতে উদ্যত হইলাম।

ওয়েল্‌স্ আমার নিকটে অতি প্রিয় স্থান। ওয়েল্‌সের কথা আমি কোনও কালে হৃদয় হইতে অন্তর্হিত করিতে পারিব না। গ্রীষ্মকালে পথে চলিতে চলিতে পথিক যদি শ্রান্ত হইয়া কোনও বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় উপবেশন পূর্ব্বক ক্লেশাপনয়নে সমর্থ হন, তাহা হইলে সেই বৃক্ষতল চিরকালই তাঁহার নিকটে পরম রমণীয় প্রিয়স্থানরূপে অনুভূত হইয়া থাকে। সুদীর্ঘ প্রবাস-সময়ের মধ্যে কোন স্থানে কেহ যদি বিদেশীয়ের নিকট স্বদেশীয়ের ব্যবহার লাভ করে, অনাত্মীয়ের নিকট আত্মীয়ের প্রেম প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সে স্থান যে, তাহার নিকট চিরদিন মধুর বোধ হইবে, তদ্বিষয়ে আর বিচিত্রতা কি?

ইংলণ্ডের পশ্চিমাংশে ওয়েল্‌স্ রাজ্য। ইংলণ্ড, ওয়েল্‌স্ ও স্কটলণ্ড এই তিনটী রাজ্য লইয়া গ্রেট ব্রিটেন দ্বীপ। ইতিহাস-পাঠকেরা অবগত আছেন, এই দ্বীপ অতি প্রাচীন কালে ব্রিটন্ জাতির বাসভূমি ছিল। রোমানেরা ব্রিটেনাধিকার পরিত্যাগ করিয়া গেলে ইংরেজদিগের আদিপুরুষগণ ব্রিটেন্ জয় করিতে আরম্ভ করেন; এবং তৎকালে অধিকাংশ ব্রিটন্‌ই কালগ্রাসে পতিত অথবা দাসত্বশৃঙ্খলাবদ্ধ হন। যাঁহারা পশ্চিমাঞ্চলের পার্ব্বত্য প্রদেশসমূহে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগেরই জীবন ও স্বাধীনতা অপহৃত হয় নাই। বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত তাঁহারা

স্বাধীনভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের বংশধরেরাই "ওয়েল্‌ষ্‌" নামে পরিচিত। "ওয়েল্‌ষ্‌"দিগের দেশকেই ওয়েল্‌স্‌ বলে। ১২৭৭ খৃষ্টাব্দে ওয়েল্‌সের তদানীন্তন রাজা লিওলিনের সহিত ইংলণ্ডপতি প্রথম এড্‌ওয়ার্ডের বিবাদ ঘটে। লিওলিন ইংলণ্ডপতির প্রাধান্য স্বীকার করিতে বচনবদ্ধ হইয়াও সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া ইংলণ্ড আক্রমণের উদ্যোগ করেন। কথিত আছে, এক মায়াবী ভবিষ্যদ্বক্তা লিওলিনের নিকটে বলিয়াছিলেন, "শীঘ্রই সমস্ত ব্রিটেন্‌ দ্বীপ এক রাজার অধিকারভুক্ত হইবে;" ওয়েল্‌স্‌-রাজ সেই কথা শুনিয়া ইংলণ্ড আক্রমণে সাহসী হন। ইংলণ্ডপতি এড্‌ওয়ার্ড, লিওলিনের ইংলণ্ড আক্রমণ চেষ্টা জানিতে পারিয়া স্বয়ং ওয়েল্‌স্‌ জয় করিতে যাত্রা করেন। যুদ্ধে লিওলিন্‌ পরাস্ত ও নিহত হন। ১২৮২ খৃষ্টাব্দে ওয়েলস্‌ ইংলণ্ডের অধীন হইয়া পড়ে। ওয়েল্‌স্‌ বিজয়ের পরে যখন ইংলণ্ড-রাজ তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে ঐ প্রদেশে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় এড্‌ওয়ার্ড জন্মগ্রহণ করেন। যেদিন ওয়েল্‌সের প্রধান লোকেরা প্রথম এডওয়ার্ডকে রাজভক্তি জানাইবার জন্য সমবেত হন, সেই দিন তিনি স্বীয় নবজাত সন্তানকে তাঁহাদিগের নিকটে উপস্থিত করিয়া "প্রিন্স অব্‌ ওয়েল্‌স" অর্থাৎ "ওয়েল্‌সের রাজকুমার" নামে আখ্যাত করেন। তাহাতে ওয়েল্‌সের লোকেরা বড় সন্তুষ্ট হন। সেই অবধি ইংলণ্ডপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র "প্রিন্স অব্‌ ওয়েল্‌স" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন।

উপরিভাগে যে সকল কথা লিখিত হইল, তৎসমুদয় ইতিহাসজ্ঞ পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। বাল্যকালে এ সকল বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু ওয়েল্‌স জাতি আমাদিগের ন্যায় ইংরেজ জাতির অধীন বলিয়া সে জাতির প্রতি যে ঐকান্তিক সহানুভূতি হওয়া সম্ভব, তাহা বোধ করিতে পারিতাম না; ওয়েল্‌স্‌দিগের জাতীয়প্রকৃতির সহিত আমাদিগের জাতীয়প্রকৃতির কোন সমতা আছে কি না, তাহাও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতাম না। "হোম-রুল"-প্রয়াসী আইরিশগণের অনেক কথা আমাদিগের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদিগের অনেক ভাব আমাদিগের হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছে; ওয়েল্‌স্‌ জাতির সেরূপ কোন কথা, সেরূপ কোন ভাব আমাদিগের নিকটে পৌঁছে নাই বলিয়া ওয়েল্‌ষ্‌দিগের সহিত আমাদিগের কোন বিশেষ সম্বন্ধ অনুভব করিতে পারি নাই। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে খ্রীষ্টজন্মোৎসবের সময় আমি ওয়েল্‌সে গিয়াছিলাম ও তথায় প্রায় একমাস কাল বাস করিয়াছিলাম; সেই সময়েই ওয়েলষ্‌ জাতির প্রতি আমার বিশেষ অনুরাগ জন্মে। ইংলণ্ডে অবস্থান কালে এক ওয়েলষ্‌ যুবকের সহিত আমার প্রগাঢ় বন্ধুতা হইয়াছিল; তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি,এ, উপাধি গ্রহণ করিয়া পুনরায় কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি,এ উপাধি লাভ করিবার জন্য আমাদিগের সহিত একত্র অধ্যয়ন করিতেছিলেন। তিনিই আমাকে তাঁহার জন্মভূমিতে লইয়া যান। তৎকালে তথা হইতে স্বদেশে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলাম, তৎসমুদয় হইতে কোন কোন অংশ এই প্রবন্ধে সংযুক্ত করিয়া দিতেছি; তদ্দ্বারাই আমার বর্ত্তমান উদ্দেশ্য সফল হইবে।

কার্ডিগান শায়ার বো ষ্ট্রীট; ২৬শে ডিসেম্বর, ১৮৯৫।—গত বুধবার রাত্রে এখানে পৌঁছিয়াছি। যাঁহার উদ্যোগে ও যত্নে আমি এখানে আসিয়াছি, তাঁহার নাম উইলিয়ম জেঙ্কিন্‌স জোন্‌স। ওয়েল্‌সে জেঙ্কিন্স, জোন্স, ইভান্স, প্রভৃতি নাম অতি সাধারণ। আমার বন্ধু জোন্‌সের পিতা সূত্রধরের কারবার করেন; তিনি একজন পল্লীগ্রামের মধ্যবিত্ত লোক। তাঁহার কারখানায় কত রকমের কল দেখিলাম। আমাদের দেশের ছুতারের মত তিনি সকল কাজ হাতে করেন না; কলে কাজ হয়। জোন্স তাঁহার পিতা মাতার সঙ্গে ও তিন ভগ্নীর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়া দিলেন। এ স্থানটী বিলক্ষণ পল্লীগ্রাম। চতুর্দ্দিকে ছোট ছোট পাহাড়; সেই সকল পাহাড়ের তলায় এখানে ওখানে দুই চারখানা বাড়ী। বাড়ী গুলি খুব দূরে দূরে। অধিবাসীর সংখ্যা খুব কম। ষ্টেষনের নিকটে এক পোষ্ট আফিস আছে; পোষ্টমাষ্টারের ছেলে চিঠি বিলি করে; পোষ্ট মাষ্টারের একখানি কামারের দোকানও আছে। আমি টিকিট কিনিতে গিয়াছিলাম, পোষ্ট মাষ্টার হাতুড়ি পেটা বন্ধ করিয়া টিকিট দিলেন। এখানে বাজার নাই; একখানি দোকান আছে। সেই দোকানেই গৃহস্থের প্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত দ্রব্য পাওয়া যায়। আমি যে বাড়ীতে আছি, তাহার অধিকারী উক্ত দোকানখানি খুলিয়াছেন। তাঁহার আবার কয়লার ব্যবসায় আছে। এই ব্যক্তির বাড়ীতে তিনটা গাভী

দুইটী ঘোড়া ও তিনটী শূকর আছে। এখানকার অনেকে চাষ বাস করিয়া খায়। এক একজনের ঘর এমন সুসজ্জিত, আমাদের দেশের বড় বড় ধনীদের বাড়ীর ঘর এমন সুসজ্জিত নয়। লোকালয় হইতে দূরবর্ত্তী এই শৈলসমাকীর্ণ স্থানে যে বাড়ীতে আমি বাস করিতেছি, সেই বাড়ী কি সুন্দর ও সুসজ্জিত! যে ঘরে বসিয়া আমি পড়া শুনা করি, এ ঘরে চেয়ার, টেবল, সোফা ও বিবিধ প্রকার সুন্দর ছবি কেমন সাজান রহিয়াছে। বাড়ীর গৃহিণী আমাকে কয়দিন খুব যত্ন করিতেছেন; শীত নিবারণের জন্য আমার ঘরে বেশী করিয়া কয়লা পোড়াইতেছেন; রাত্রিতে শয্যায় শয়ন করিলে পদতলে শীত বোধ হয় বলিয়া উষ্ণজলপূর্ণ কড়ির বোতল শয্যাতে স্থাপন করিতেছেন। এখানকার লোকদিগের হৃদয় স্নেহ, দয়া ও প্রেমে সুশোভিত। একজন বিদেশীকে সর্ব্বান্তঃকরণে কিরূপে ভাল বাসিতে ও সেবা করিতে হয়, তাহা এখানকার লোকেরা বিলক্ষণ জানেন। এই জনহীনপ্রায় স্থানে একটী বিদ্যালয় আছে। তথায় বালক বালিকারা একত্র পাঠ করে। একজন শিক্ষক ও তিনজন শিক্ষয়িত্রী শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। জোন্সের এক ভগ্নীও ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী। রবিবার প্রাতঃকালে এক উপাসনা-মন্দিরে গিয়াছিলাম। উহা অবশ্য খৃষ্টানদিগের উপাসনা-মন্দির। এদেশে এক শ্রেণীর উপাসনা-মন্দিরের নাম চার্চ্চ, অপর সকল শ্রেণীর উপাসনা-মন্দিরের নাম চ্যাপেল। খৃষ্টানদিগের মধ্যে অনেক সম্প্রদায় আছে; ওয়েল্‌সের এ অঞ্চলে কাল্‌ভিনিষ্টিক সম্প্রদায় বিলক্ষণ প্রবল। এক সময়ে ওয়েল্‌সের অধিবাসিবর্গের নৈতিক অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল; এই কালভিনিষ্টিক সম্প্রদায়ের পুরোহিতবর্গের চেষ্টায় সে অবস্থার প্রভূত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আমি যে উপাসনা-মন্দিরে গিয়াছিলাম, তাহা একটী কাল্‌ভিনিষ্টিক চ্যাপেল। ওয়েল্‌ষ্‌ ভাষায় উপাসনা ও উপদেশ সম্পাদিত হওয়ায় আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই। আমি সে দিন উপস্থিত ছিলাম বলিয়া আচার্য্য উপদেশের বিষয়টী একটু ইংরাজিতেও বলিয়াছিলেন। ওয়েলষ্‌ ভাষা শুনিতে কতকটা পার্সি ও আর্বি ভাষার মত। ওয়েল্‌ষ্‌ ভাষা ইংরাজি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, ইহা বোধ হয় আমাদের দেশে অনেকে অবগত নহেন। স্কচ্‌ ভাষা হইতে ইংরেজি ভাষার ভিন্নতা যত, ওয়েলষ্‌ ভাষা হইতে ইংরেজি ভাষার ভিন্নতা তদপেক্ষা অত্যন্ত অধিক। ওয়েল্‌ষ্‌ ভাষার সহিত ইংরেজী ভাষার কিছুই সাদৃশ্য নাই। আমি ইতিমধ্যে ওয়েল্‌ষ্‌ ভাষার কতকগুলি কথা শিখিয়াছি। এ ভাষা ইংরেজি হইতে কত ভিন্ন, তাহা বুঝিতে পারিবে বলিয়া কতকগুলি বাক্য ও পদ নিম্নে লিখিতেছি।

বরে দা খি = Good morning to you.
প্রিড্‌ নাউন্‌ দা খি = Good afternoon to you.
ডির্‌ দা খি = Good day to you.
নোস্তাখি = Good night to you.
ফর দা খি = How are you.
মাইলিব্‌ হেদি = It is wet to-day.
নয়ার ইয়াউন্‌ হেদি = Very cold to-day.
বুরু এরা = It is snowing.
ক্লাউ মান্‌ = It is drizzling.
ক্লাউ ব্রাস্‌ = Raining heavily.

ইয়ে = Yes. ঠাথ = Milk. ঠিথির = Letter. ঠিবর = Book. বুর = Table. ষ্টোল = Chair. টুর্‌ = Water. ব্যারা = Bread. মেনিন্‌ = Butter. কোয়েলি = Bed. প্রেথিন্‌ = Cloth. কস্কি = Sleep.

আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি, ওয়েল্‌ষ্‌ ভাষা যে ইংরাজি হইতে এত ভিন্ন, তাহা আমাদিগের দেশের অনেক লোকেরই জানা নাই। এ দেশের বিদ্যালয়ে ইংরেজি ও ওয়েল্‌ষ্‌ উভয় ভাষারই শিক্ষা হইয়া থাকে। বৃদ্ধদিগের মধ্যে ইংরাজি-অনভিজ্ঞ লোক দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু যুবক যুবতীরা সকলেই সুন্দররূপে ইংরাজী ভাষায় কথা কহিয়া থাকেন। জাতীয় ভাষার প্রতি ওয়েল্‌ষ্‌দিগের প্রগাঢ় অনুরাগ আছে। জাতীয় সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন কামনায় প্রতি বৎসরে ওয়েল্‌স-বাসীরা এক সভা আহ্বান করিয়া থাকেন; ঐ সভায় ওয়েল্‌ষ্‌ কবিগণ আপনাদিগের রচিত কবিতা পাঠ করেন ও কবিগণকে সমগ্র জাতীয় সম্মানসূচক উপঢৌকন প্রদত্ত হয়। বিদেশীয় জাতির অধীন হইলে স্বদেশীয় ভাব, স্বদেশীয় সদ্‌গুণ ও স্বদেশীয় সাহিত্য অনেক পরিমাণে উপেক্ষিত হইতে পারে, একথা ওয়েল্‌স-বাসীরা জানিয়াই বোধ হয় সাবধান হইয়াছেন।

২রা ও ৯ই জানুয়ারী, ১৮৯৬।—বৎসরের প্রথম দিনে

উৎসব করা সকল দেশেই আছে। আমাদের দেশে ব্যবসায়ীরা ভিন্ন অন্য লোকে নববর্ষের প্রথম দিনে বিশেষ কোন উৎসব করেন না। এদেশে খৃষ্টমাসের পরই নববর্ষের প্রথম দিনের উৎসব। বঙ্গদেশে বিজয়া দশমীর দিন যেমন আনন্দময়—উৎসবময়, এদেশে এই দুটী দিন তদ্রূপ। যেমন ইংলণ্ডে, তেমনই ওয়েল্‌সে। নানা স্থানে যে সকল প্রিয় আত্মীয় বন্ধু পড়িয়া আছেন, তাঁহারা এই দুটি দিনে পরস্পরকে স্মরণ করেন; আদরের উপহার প্রেরণ করেন। ওয়েল্‌সের নববর্ষের প্রথম দিনের উৎসব আরও একটু বিশেষ ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে। নববর্ষের নব ঊষা দেখা দিবার সঙ্গে সঙ্গে পল্লীর বালক বালিকারা দলবদ্ধ হইয়া গান করিতে করিতে প্রত্যেক বাড়ীর দ্বারে দেখা দেয়। ঐ গানের অর্থ এই,—"নববর্ষের প্রথম দিনে আমাদিগকে পয়সা দাও, খাবার দাও; আমরা আমোদ করি। কে জানে আর এক বৎসর পরে কে বাঁচিবে, কে মরিবে; এই বেলা আমাদিগকে পয়সা দাও, খাবার দাও, আমরা আমোদ করি।" প্রতি গৃহে গৃহিণী পূর্ব্ব রাত্রিতে এই সকল বালক বালিকার জন্য টাফি নামক এক প্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া রাখেন, সংগীতের শব্দ পাইবা মাত্রই পয়সা ও টাফি লইয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হন। প্রত্যেক বালক, প্রত্যেক বালিকা নাচিতে নাচিতে গান করিয়া টাফি ও পয়সা লইয়া আনন্দে প্রস্থান করে। এদেশের একটী কুসংস্কারের কথা নববর্ষ সমাগমে জানিতে পারিলাম। নববর্ষের প্রথম দিনে যদি কাল লোক কাহারও চক্ষে পড়ে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি উহা বিশেষ শুভ লক্ষণ বোধ করিয়া থাকেন। ঐ দিনে এখানকার দুই এক জন বৃদ্ধা সর্ব্বপ্রথমে আমাকে দেখিবার জন্য বড় ব্যাকুল হইয়াছিলেন। আমি যে বাড়ীতে আছি, সেই বাড়ার গৃহিণীর বৃদ্ধা ভগ্নী ১লা জানুয়ারীর পূর্ব্ব রাত্রিতে বলিতেছিলেন, মিষ্টার মিত্র, আজ যদি আপনি রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত না জাগেন, তাহা হইলে আমি কাল প্রথমে আপনাকে দেখিয়া তবে অন্যকে দেখিব।" ভারতবর্ষীয় কাললোকের সমাগম এপ্রদেশে সচরাচর হয় না; কাফ্রি নিগ্রো জাতীয় লোকও সকল সময়ে দৃষ্টিগোচর হয় না, সচরাচর যে ব্যক্তির কৃষ্ণ কেশ অর্থাৎ চুল কটা নয়, তাহাকে দেখিতে পাইলেও লোকে শুভাদৃষ্ট বোধ করিয়া থাকেন। কুসংস্কারের হস্ত হইতে কোন দেশেরই নিস্তার নাই। ভারতবাসী ইংরেজের যদি এ কুসংস্কার থাকিত, কৃষ্ণবর্ণ লোকদিগের দর্শন যদি তাঁহার শুভজনক বোধ করিতেন, তাহা হইলে বোধ করি, আমাদিগের অনেক কষ্টের লাঘব হইত। ওয়েলসের লোকেরা ধর্ম্মসাধনে অধিক যত্নশীল। কালভিনিষ্টিক সম্প্রদায়ভুক্ত নরনারীরা নববর্ষের প্রথম সপ্তাহে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে উপাসনা মন্দিরে সমবেত হইয়া প্রার্থনা ও সংগীতাদি করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডের কোন স্থানে এরূপ নববর্ষোৎসব আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এখানকার লোকে যেরূপে প্রত্যেক রবিবার যাপন করিয়া থাকেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার্হ। আবালবৃদ্ধবনিতা রবিবারে প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত প্রায় ভজনাগারে উপাসনা শাস্ত্রপাঠ প্রভৃতিতে অতিবাহিত করেন। মধ্যাহ্নকালে একবার তাঁহারা আপনাপন আবাসে গমন করিয়া আহার করিয়া আসেন মাত্র। এক সময়ে ওয়েলসে সুরাপান ও দুর্নীতির বড় প্রাদুর্ভাব ছিল; রবিবারে এদেশের নরনারীর শোচনীয় অবস্থা শোচনীয়তর হইয়া উঠিত; এক্ষণে ঠিক তাহার বিপরীত হইয়াছে। এদেশে একটী প্রথা আছে, তদ্বিষয় শুনিয়া আমি অবাক্ হইয়া গেলাম। এখানকার যুবকেরা অধিক রাত্রিতে অল্পবয়স্কা যুবতীদের সঙ্গে আলাপ করিতে যায়। বিবাহের উদ্দেশ্যেই এই আলাপ। কন্যার আত্মীয়গণের সম্মুখে অথবা দিবাভাগে আলাপ করা ইঁহারা নির্লজ্জতাসূচক বোধ করেন; সেই জন্যই বাড়ীর সকলে যখন নিদ্রিত হইয়া পড়েন, যুবকেরা সেই সময়ে আলাপ করিতে গমন করেন। তাঁহারা আলাপ করিতে গেলে যুবতীরা সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে আপনাদের বিছানায় লইয়া যান। অধিক রাত্রিতে বসিয়া থাকা কষ্টকর বোধেই যুবক যুবতী উভয়ে এক শয্যায় শয়ন করিয়া আলাপ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে লোকে বলিতেন, "ইহাতে আর দোষ কি? আলাপ বৈত নয়"; কিন্তু ঐ আলাপ প্রথার বিষময় ফল ফলায় ঐ প্রথা ক্রমে উন্মূলিত হইতেছে। এখনও ইহা একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। কয়েক দিন হইল, এখানকার এক সভায় গিয়াছিলাম; ঐ সভায় নানাস্থান হইতে বালক বালিকারা আসিয়া ওয়েলস্-কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিল। যিনি উক্ত সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বালক বালিকাদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে তৎপূর্ব্বদিনে ক্ষেত্রে হলকর্ষণ করিতে দেখিয়াছিলাম। আমাদিগের দেশের চাষারা চাষ করিতে করিতে লাঙ্গল ছাড়িয়া সভার সভাপতির কাজ করিবে, একথা এখন কল্পনাতেও মনে আনা যায় না। ওয়েলসবাসীরা ভারতবর্ষীয়দিগের ন্যায় ভাবুক ও হৃদয়বান। ইঁহাদিগের প্রেমের উচ্ছ্বাস আছে; আতিথ্য-সৎকারের বিশেষত্ব আছে; অপরকে সেবা ও যত্ন-আদর করিবার অসাধারণত্ব আছে। ইংরেজ শাসনাধীন থাকিয়া ইঁহারাও এক সময়ে রাজ-নৈতিক অধিকার লাভের জন্য আমাদিগের মত কাতর হইতেন; সেই জন্যই আমাদিগের হৃদয়-ব্যথা ইঁহারা সহজে উপলব্ধি করিতে পারেন। ইংরেজ ও ওয়েলষ্ এই উভয় জাতি এখনও এক হইয়া যাইতে পারেন নাই; ওয়েল্‌ষ্‌গণ আপনাদিগের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য এখনও বিলক্ষণ অনুভব করিয়া থাকেন।

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র।

মেয়েলী সাহিত্য।

সাধারণতঃ সাহিত্যের উচ্চ ও নিম্ন দুইটী স্তর আছে—অর্থাৎ শিক্ষিত সমাজের সাহিত্য এবং অশিক্ষিত সমাজের সাহিত্য। অশিক্ষিত পুরুষ সমাজে, এবং আমাদের বর্ণজ্ঞানশূন্য প্রাচীন রমণী সমাজে পরম্পরা প্রচলিত যে সকল কথা বা গাথা, ছড়া বা কবিতা, রূপকথা বা আখ্যায়িকা প্রভৃতি আমরা শুনিতে পাই, তৎসমস্তই সাহিত্যের অন্তর্গত। তাহাতে শব্দযোজনার পারিপাট্য বা পদবিন্যাসের সৌন্দর্য্য না থাকুক, কিন্তু মানব হৃদয়ের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা হাস্য পরিহাস উচ্ছ্বাস উদ্বেগের অভিব্যক্তিতে তাহা পরিপূর্ণ। আমাদের রমণীসমাজে এইরূপ কবিতা ও গাথা প্রভৃতি বহুল পরিমাণে প্রচলিত আছে। আমাদের মাতা মাতামহী, আমাদের স্ত্রী কন্যা ভগিনীদের কোমল হৃদয়ে এই সাহিত্যের জন্ম, স্থিতি ও পরিণতি। সুতরাং ইহাকে "মেয়েলি সাহিত্য" নামেই অভিহিত করা কর্ত্তব্য। নিম্নে দুইটী প্রাচীন মেয়েলি কবিতা প্রকাশিত হইল। কবিতা দুইটী কিছুমাত্র সংশোধন করা হয় নাই। যেমন শুনিয়াছি, অবিকল তদ্রূপ ভাবেই মুদ্রিত হইল।

(১)

সীতার সাধ ভক্ষণ।

"মাঘে মকরে মিষ্টি কচুতলে শীম।
ফাগুনে দুগুণ মিষ্টি বাত্তাকুতে নিম॥
চৈতে শ্রীফল রাম খাওয়াইলেন বনে।
বৈশাখে শশর মাংস ষোল মাছে আমে॥
জ্যৈষ্ঠে পাকা আম্র আষাঢ়ে কাঁটাল।
শ্রাবণ মাসে খই দই ভাদ্র মাসে তাল॥
আশ্বিন মাসে নারকেল খণ্ড কার্ত্তিক মাসে গুল।
অঘ্রাণ মাসে সরু চেলের অন্ন মাগুর মাছের ঝোল॥
পৌষ মাসে খই মুড়ি খেতে বড় মিঠে আর বাসি পিঠে।
সীতে! আর খেয়েছ কি?
কপ্তভাতে বেগুণ পোড়া খেঁচুরিতে ঘি॥"

(২)

ঠাক্‌রুণ দিদির কথা—নাত্‌নীর উক্তি।

"দ্বিজ গেলেন কুরুক্ষেত্র, এই কথা শুনিবে মাত্র,
পতিগেরস্ত নারী।
পাড়া সইতে সবে মিলে, ব্রাহ্মণীর কাছে গিয়ে,
দাঁড়ান সারি সারি॥
আহা! হৌক হৌক আহ্লাদের কথা,
ঠাকুরটি গিয়েছেন কোথা,
নগরে জানিয়ে সর্ব্ব সিদ্ধি,
বড় কর্ম্মে হাজার বুদ্ধি,
শেষকালে বড় সুখ হ'লো গো মামী।
হিতের কুটুম হিরেমণি, সম্পর্কের নাত্‌নী আমি,
খেয়ে ক'রনা ছারখার, আখেরে হবে উগ্‌গার,
গায়ের দশ তোলা, তাই থাক্‌বে তোলা,
ঠাক্‌রুণ দিদি! যত সাত্ এই বেলা এই বেলা॥
ঠাকুরদাদা আস্‌বা মাত্র খুলে নিও তোড়া।
যা পাবে তাই ঝালিতে পুরো,
চুট্‌কী চাটকী কিছু না ছেড়ো,
ঠাক্‌রুণ দিদি! যত সাত্ এই বেলা এই বেলা।
উঠেছে সব কস্তা, সাড়ী গুলো সব সস্তা,
এই হাটে এক যোড়া কিনে পরা শলা॥

উঠেছে টব্ তোলা বাই দখ্নে শাঁখা,
দাম কত তার আড়াই টাকা,
আগে হাত দুটো ত নাও ঢেকে।
শেষে নিও কানবালা,
হাতেতে এক গাছ জোনারে বালা,
না লম্বা না বেঁটে॥
নাকৃটী তোমার জুত'ল বটে,
মউরে বেশর একখানা গড়িয়ে পরা শলা॥
ঠাকৃরুণ দিদি! কতক দিন যদি
গোড় মল্‌টাই পরতে।
ঠাকুরদাদা তো গা তোলারই মধ্যে॥
ঠাকুরদাদার শ্রাদ্ধ, লুচি চিনি করতে হবে,
চিড়ে দই আর সাজবে না॥"

শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়।

শিশুর অশ্রু।

প্যারিসের কোন রঙ্গালয়ের সাজঘরে একজন নূতন অভিনেতা অভিনয় করিতে ভয় পাইতেছিল। তাহার কোন কোন সঙ্গী তাহাকে উৎসাহ দিল; কিন্তু অধিকাংশ লোকেই বলিল "এরূপ ভীতি সারিবার নহে। প্রকৃতি আমাদিগকে সাহসী বা ভীত, উৎসাহময় বা উৎসাহহীন, গম্ভীর বা আমোদপ্রিয়, যেরূপ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন—আমরা সেইরূপ থাকিব। কে কবে শুনিয়াছে দুরাকাঙ্ক্ষের দুরাকাঙ্ক্ষা বা কৃপণের কার্পণ্য সারিয়াছে?"

কেহ কেহ আবার এ কথার প্রতিবাদ করিলেন এবং একজন বলিলেন "যদি তোমরা কার্পণ্যরোগমুক্ত কৃপণ দেখিতে চাহ, তবে আমি বলিতে পারি যে, আমি সেই দলভুক্ত।"

যিনি একথা বলিলেন, তিনি একজন খ্যাতিপন্ন নাটককার এবং তাঁহার বদান্যতা প্রসিদ্ধ। তাঁহার কথা শুনিয়া কেহ বলিল "অসম্ভব," কেহ বলিল "হইতেই পারে না।" তিনি বলিলেন, "আমি সত্য কথাই বলিয়াছি। আমি কৃপণ ছিলাম; যদিও আমার বিশ্বাস আমি এখন আর কৃপণ নহি। যদি তোমরা শুনিতে চাহ তবে আমি আমার পরিবর্ত্তনের কথা বলিতে পারি। সে পরিবর্ত্তনের কারণ একটী শিশুর অশ্রু।" সেখানে যে যে ছিল, সকলেই তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল—তিনি বলিতে লাগিলেন:—

"১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে আমি পোর্ট সেণ্ট মারটিনের রঙ্গালয়ে আমার একখানা সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক অভিনয়ের জন্য প্রদান করিয়াছিলাম। সেই সময় একদিন এক ডাকে আমি দুইখানা পত্র পাইলাম—দুইখানাই মারসেল হইতে আসিয়াছে। একখানা কোন রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষের লেখা—তিনি আমার নাটক অভিনয় করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন এবং শেষ তালিমের দিন আমার উপস্থিতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। পারিশ্রমিক স্বরূপ আমি ন্যায্যমত যাহা চাহিব তাহাই পাইব। আর একখানা পত্র সংক্ষিপ্ত এবং এইরূপ:—"মহাশয়, আপনার ভ্রাতার পত্নী ও দুহিতা অনাহারে মারা যাইতেছে। কয়েক শত টাকা পাইলে তাহারা রক্ষা পায়। ভরসা করি, আপনি এই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়গণকে দেখিতে আসিতে বিলম্ব করিবেন না; এবং তাহাদিগের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের চলাচলের বন্দোবস্ত করিবেন।" পত্রখানা মারসেলের ডাক্তার ল্যাম্বার্টের লেখা।

"আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি তখন আমি একজন ঘোর কৃপণ। চিকিৎসকের পত্র পাইলে আমার মনে দয়াপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হওয়া দূরে থাকুক, কেবল আমার ভ্রাতৃজায়ার প্রতি পূর্ব্বপোষিত ক্রোধ পুনরুদ্দীপ্ত হইল। আমার ভ্রাতা নাবিকের কার্য্য করিত—অতল অম্বুধিগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া সে প্রাণ ত্যাগ করে। কিছুকাল পূর্ব্বে যখন আমার সাহসী ভ্রাতা এক ধীবর কন্যাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল, তখন আমি আমার হীনগর্ব্ব ও কঠিন কার্পণ্যের শতস্তর অন্ধকার মধ্য হইতে উত্তর দিয়াছিলাম যে, নিঃসম্বল ধীবর-কন্যাকে বিবাহ করা অসম্মানজনক এবং মূর্খের উপযোগী। এমন কি, আমি তাহাকে উপদেশ দিয়াছিলাম যে, যদি সম্ভব হয়, তবে এ বিবাহবন্ধন ছেদন করাই তাহার কর্ত্তব্য। আমার ভ্রাতার সম্মানজ্ঞান ছিল—সে যাহাকে ভালবাসিত, তাহাকে বিবাহ করিল। আমার ভ্রাতৃজায়ার মানাপমান জ্ঞান বড় প্রবল ছিল; তিনি আমার পত্রের কথা কখনও ভুলেন নাই এবং তিনি সেই পত্রলেখককে ঘৃণা করিতেন। স্বামীর মৃত্যুর পর অভাবে পড়িয়াও তিনি আমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন নাই। কিন্তু স্নেহময়ী জননী যখন দেখিলেন যে, তাঁহার একমাত্র দুহিতা

অনাহারে দিন দিন বিশীর্ণ হইয়া যাইতেছে, তখন তাঁহার সেই গর্ব্ব চূর্ণ হইয়া গেল।

"লাভের সম্ভাবনা না থাকায় আমি মারসেলের রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষের প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। আমি তাঁহাকে পত্র লিখিলাম এবং অবিলম্বে মারসেল যাত্রা করিলাম। সেখানে প্রধান হোটেলে উপস্থিত হইয়া দেখি যে, যে চিকিৎসক আমাকে পত্র লিখিয়াছিলেন, তিনি আমার খোঁজ করিতেছেন। আমি তাঁহার পত্রের উত্তর প্রদান না করায় সরলচিত্ত চিকিৎসক ভাবিয়াছিলেন যে, আমি স্বয়ং আসিব। তাহাই মনে করিয়া তিনি প্রতিদিন আমাকে খুঁজিয়াছেন।

"যে কক্ষে তিনি ছিলেন, সে কক্ষের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। তথাপি সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলে, প্রথমেই যাহা আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল, তাহা অত্যন্ত সুন্দর। রোগীর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার একমাত্র দুহিতা—দীপ্তকৃষ্ণতার নয়ন, কুঞ্চিত কুন্তলকলাপ, মুখে সেই বয়সসুলভ উজ্জ্বলতা আর সেই বয়সসুলভ বিষাদের ছায়া! দেখিলে কষ্ট হয়। তাহাকে দেখিয়াই আমার ইচ্ছা হইল, তাহাকে কোলে করি; কিন্তু আমি দৃঢ়চিত্তে সেই নবভাব হৃদয় হইতে দূর করিলাম। রোগীকে কি বলিয়া চিকিৎসক আমাকে অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত করিলেন। আমি অগ্রসর হইলে রোগক্লিষ্টা ভ্রাতৃজায়া উঠিতে চেষ্টা করিলেন। তাঁহার মুখে বিষাদ ও গর্ব্বভাব দেখিয়া আমি বুঝিলাম কি কষ্টে তিনি আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। তাঁহার সাহায্য প্রার্থনার প্রধান কারণ সেই বালিকাকে দেখাইয়া তিনি বলিলেন, 'ঐ দেখুন—কয়েক দিন পরেই সংসারে বালিকার আর কেহ থাকিবে না।'

"বলিতে লজ্জা হয়, তাঁহার এ কথায়ও আমার দয়াবৃত্তি উত্তেজিত হইল না। আমি বলিলাম, 'কেন ভয় পাইতেছেন? আপনার বয়স অধিক নহে, আপনার চিকিৎসক বিজ্ঞ। নিরাশ হইবেন না।' এরূপ স্থলে আমার অপেক্ষা কম স্বার্থপর লোকে আরও বলিত, 'আর আপনার স্বামীর ভ্রাতা আপনার জন্য তাঁহার যথাসাধ্য করি-

তিনি বলিলেন, 'আপনি কালক্ষয় না করিয়া এখানে আসিয়াছেন। অবশ্য আপনি ভাবিয়াছিলেন যে, বিলম্ব করিলে আপনি আসিবার পূর্ব্বেই তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। আপনি ঠিক কথাই ভাবিয়াছিলেন। আপনাকে দেখিয়া আমি বড় সন্তুষ্ট হইলাম।'

"আমি বিপদে পড়িলাম। রঙ্গালয় হইতে অর্থলাভোদ্দেশ্যেই আমি মারসেলে আসিয়াছিলাম; কিন্তু সে কথা কেমন করিয়া চিকিৎসককে বলি? লজ্জার খাতিরে তাহা পারিলাম না। কাজেই পূর্ব্বসঙ্কল্পমত বরাবর রঙ্গালয়ে না গিয়া চিকিৎসকের সঙ্গে আমার ভ্রাতৃজায়াকে দেখিতে গেলাম।

বেন।' কেবল ভাবিতেছিলাম, কেমন করিয়া এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইব। বালিকা বিস্ময়-বিস্ফারিত ব্যাকুল নয়নে আমার মুখপানে চাহিয়াছিল—আমার পার্শ্বে আসিয়া সে বলিল, 'তুমি একবার বিছানার উপর বসিবে? তুমি এত লম্বা যে, তুমি দাঁড়াইয়া থাকিলে আমি তোমার মুখে চুমা খাইতে পারি না।'

"আমি বসিলাম, বালিকা আমার জানুর উপর উঠিল। তাঁহার জননী তখন মুদিতনয়ন, যুক্তকর, যেন প্রার্থনা-রত। আমার ক্রোধব্যঞ্জক দৃষ্টি দেখিয়া ভীত না হইয়া বালিকা তাহার কোমল বাহুপাশে আমার গ্রীবাবেষ্টন করিয়া আমার মুখচুম্বন করিল। তাহার পর সে আমাকে বলিল, "তুমি আমার বাবার মত হইবে? তোমাকে খুব ভাল বাসিব। তুমি দেখিতে বাবার মত—তিনি বড় ভাল ছিলেন। তুমিও কি তাঁর মত ভাল?" আমি তাহার হাত ছাড়াইয়া আমি তাহাকে মেজেয় নামাইয়া দিলাম। বিস্ময়, নিরাশ ও ভীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে সে আমার মুখপানে চাহিল—আর ধীরে ধীরে এক ফোঁটা অশ্রু তাহার গণ্ডস্থল দিয়া বহিয়া পড়িল। তাহার কথায় যাহা হয় নাই, তাহার নীরব বেদনায় তাহা হইল। যেন কোন ঐন্দ্রজালিকের দণ্ডস্পর্শে আমার হীনতা ও নির্ম্মমতা আমার নিকট প্রতিভাত হইয়া উঠিল। আমি ভয় ও আত্মঘৃণায় কম্পিত হইলাম। আমি বিষাদিত বালিকাকে ক্রোড়ে

তুলিলাম, এবং তাহার মস্তকোপরি আমার হস্ত স্থাপন করিয়া বলিলাম "হাঁ, আমি তোমার পিতার মতই হইব। তুমি আমার দুহিতার মত থাকিবে—আমি তোমাকে ভাল বাসিব ও তোমার যত্ন লইব।"

"আমার এই কথায় আমার ভ্রাতৃজায়া কিরূপ আহ্লাদিত হইলেন, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তাঁহার আনন্দোচ্ছ্বাস দেখিয়া তাঁহার চিকিৎসক এবং আমি উভয়েই ভীত হইলাম। যাহা হউক, আনন্দাতিশয্যে প্রায়ই কাহারও মৃত্যু হয় না। মৃদুস্বরে তিনি বলিলেন 'তোমার সম্বন্ধে আমার কি ভ্রান্ত ধারণাই ছিল। আমাকে ক্ষমা কর।' তিনি আমাকে তিরস্কার করিলে আমার যেরূপ কষ্ট হইত, তাঁহার এই কৃতজ্ঞতায় আমার তদপেক্ষা অধিক কষ্ট হইল। আমি সে কথা চাপা দিয়া তাড়াতাড়ি রোগীর গৃহ পরিবর্ত্তনের কথা উত্থাপিত করিলাম। আমি নূতন লোক, সেখানকার কিছু জানি না—সেইজন্য সহৃদয় চিকিৎসক বাটী দেখিবার ভার লইলেন।

"চিকিৎসক মারসেলের সন্নিকটেই আমাদিগের জন্য একটী সুন্দর গৃহ স্থির করিলেন। সেখানে আমার ভ্রাতৃজায়া, ভ্রাতৃদুহিতা এবং আমি, আমরা তিনজন তিন মাস বাস করিলাম। তাহার পর দুহিতাকে আমার নিকট রাখিয়া জননী প্রাণত্যাগ করিলেন। মৃত্যুকালে তিনি জানিয়াছিলেন যে, আমি তাঁহার দুহিতাকে সত্যই স্নেহ করি। সেই অবধি মেরি আমার নিকটেই আছে। এখন তাহার আনন্দ আমার আনন্দ—তাহার জীবন আমার জীবন। তাহার নিকট আমার ঋণ কি সামান্য? প্রভাতের শিশিরবিন্দু যেমন বিকাশোন্মুখ কুসুমকোরকে পতিত হইয়া তাহার কুসুমজীবন বিকশিত করে—তেমনই তাহার সেই অমূল্য অশ্রুবিন্দু আমার হৃদয়কে বিকশিত করিয়াছিল। *

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

* ফরাসী গল্পের ইংরাজী অনুবাদ হইতে অনুবাদিত। লেখক.

মনুষ্যজাতির মৃত্যু।

কথাটা গুরুতর, এবং বোধ হয় আলোচনার অযোগ্য নহে। মানববিশেষের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী, মানুষ মরিতেছে, যাইতেছে, আসিতেছে, কিন্তু মনুষ্যজাতি সমষ্টিতে যেমন,

তেমনই রহিয়াছে, বরং সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইতেছে। হয়ত কোনও বর্ণের ধ্বংস হইতেছে, এবং অপর বর্ণের আবির্ভাব হইতেছে, কিন্তু জাতির ধ্বংস হইতেছে না। এখন প্রশ্ন এই, মানবজাতি কি অমর, উহার কি ধ্বংস নাই? অথবা মানুষবিশেষের ন্যায় মানবজাতিও একদিন এই চিরপরিচিত মাতৃক্রোড় হইতে বিলুপ্ত হইবে, দূর ভবিষ্যতে ইহারও ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী? ফসিল্-তত্ত্বের (Palaeontology) আলোচনাবলে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, এ ধরায় সহস্র সহস্র প্রাণিজাতি জলবুদ্বুদের ন্যায় উৎপন্ন হইয়া মিলাইয়া গিয়াছে, তাহাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও তাহাদের পুরাকালীন অস্তিত্বের সাক্ষিস্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে; এতগুলি জাতি যদি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, তবে আমরাই বা অনন্তকাল অক্ষয় হইয়া রহিব, ইহার ভরসা করি কেন? অপর সহস্র প্রাণিজাতির ন্যায় মানবজাতিও যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে না, ইহার কি কোনও প্রকৃষ্ট কারণ আছে? মরিতে কাহার সাধ করে?—কিন্তু আমাদের এ সাধ ও আশার ভিত্তি কি শুধু কল্পনা, না বাস্তব কোন ভিত্তি আছে, ইহা একবার ভাবিয়া দেখিতে হানি কি?

সম্প্রতি প্লেগে অনেক লোক মরিতেছে, এবং আরও কত লোক মরিবে, তাহা কে বলিতে পারে? মানুষের শত্রু পদে পদে। হয়ত শতগুণ মারাত্মক এমন আর এক মহামারী আসিবে, যাহাতে পৃথিবীকে নির্ম্মনুষ্য করিয়া ফেলিবে। কিন্তু এরূপে সমগ্র মানবজাতির ধ্বংস হওয়া কি সম্ভব?—এ সম্বন্ধে একটা কথা বলা আবশ্যক।—মানুষের বুদ্ধিশক্তি আছে, এবং আজিও পর্য্যন্ত যদিও প্লেগনিবারণের কোনও একটা প্রকৃষ্ট উপায় বাহির হয় নাই, তথাপি মানুষ স্বীয় জ্ঞান এবং ধীশক্তিবলে যে এই সমস্ত প্লেগ ও মহামারী হইতে আত্মরক্ষা করিতে এবং জাতীয় ধ্বংস নিবারণ করিতে সমর্থ হইতে পারে, এরূপ আশা করা যায়। ভবিষ্যৎ পাস্তুরবর্গ হয়ত এমন উপায়ের আবিষ্কার করিবে যাহাতে ব্যাসিলসের ক্রিয়া সম্যক্ নিরাকৃত হইবে।—অভিব্যক্তি প্রক্রিয়ায় ধীশক্তির আবির্ভাবে বিষয়টাকে বিশেষ জটিল করিয়া তুলিয়াছে।

ফসিল্-তত্ত্বের ইঙ্গিতে আমরা বুঝিতেছি, অপর জাতির ন্যায় মনুষ্যজাতিরও ধ্বংস হইবে। তবে যদি মানুষ স্বীয় বুদ্ধিবৃত্তিবলে ধ্বংসরূপ সাধারণ অদৃষ্টফলের খণ্ডন করিতে পারে ত সে স্বতন্ত্র কথা। অদৃষ্টের সহিত এই যে সংগ্রাম, ইহাতে মানুষের ধীশক্তি কতদূর কৃতকার্য্য হইবে, তাহা বলা সহজ নহে। তবে বুদ্ধিবৃত্তি যে প্রাণীকে নিকৃষ্ট জীব অপেক্ষা অধিকতররূপে নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থার উপযোগী করিতে পারে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বন্য উষ্ট্রজাতি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু মানুষের যত্নে উষ্ট্রজাতি গৃহপালিত হইয়া এখনও বর্ত্তমান আছে। মানুষের চেষ্টা ও যত্ন না থাকিলে, উষ্ট্রজাতি বোধ হয় এতদিনে পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইত। পেরুদেশের বন্য লামা এবং আলপাকা উষ্ট্রের দূর জ্ঞাতি। মানুষ স্বীয় বুদ্ধিবলে অপর জাতির জন্য যাহা করিতে সক্ষম হইয়াছে, অন্য একটী জাতিকে যে আসন্ন ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে, স্বজাতির জন্যও যে ততটুকু করিতে পারিবে, এরূপ অনুমান বোধ হয় নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

এ সকল বিচারে আমরা প্রবৃত্ত হইব না। উহা প্রাণিতত্ত্বানুশীলনকারিগণের জন্য রহিল। বিশেষতঃ এরূপ বিচারের কোন প্রয়োজনও নাই। কারণ মানুষ স্বকীয় ধীবলে সহস্র শত্রু হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেও, এমন একটী প্রবল শত্রু প্রকৃতির মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে, যাহা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিরও সাধ্যায়ত্ত নহে। সে শত্রু হইতে আত্মরক্ষা করা মনুষ্যজাতির পক্ষে অসম্ভব, সুতরাং উহার ধ্বংসও অবশ্যম্ভাবী। এমন শত্রু যদি থাকে, তবে মানুষের আর আশা কোথায়?

এই শত্রুটি কে? কোন্ অজ্ঞাত গুপ্ত আততায়ী আমাদের জাতীয় জীবনের বিঘাতক হইয়া আমাদিগের আশা ভরসার সমাধিরচনা করিতেছে, আমাদিগের সমুদয় চেষ্টা ও যত্ন বিফল করিয়া দিয়া আমাদের অদৃষ্টলিপি পূর্ণ করিতে উদ্যত রহিয়াছে? এমন প্রবল প্রতাপ কাহার, আমাদের দাম্ভিক বুদ্ধিশক্তিও যাহার নিকট পরাস্ত? কে এই শত্রু, কেন আমরা মানবজাতির ধ্বংসরূপ অশুভ কল্পনা করিতেছি, তাহা প্রদর্শন করাই আমাদিগের এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

মনুষ্যজাতির জীবন রক্ষার প্রধান উপকরণ, উত্তাপ *

* শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত Heat অর্থে তেজঃ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা সাধারণ্যে প্রচলিত উত্তাপ শব্দেরই ব্যবহার করিলাম। পরে Temperature এই অর্থে উষ্ণতা শব্দের প্রয়োগ করিয়াছি।

ইহা স্থির নিশ্চয়। যদি পৃথিবীতে উত্তাপের অভাব হয়, তবে মানব জাতিরও অভাব হইবে। এ সিদ্ধান্ত হইতে অব্যাহতি নাই। আমাদের জীবনের প্রতি কার্য্যে, সংসারের প্রতি ব্যাপারে, উত্তাপের প্রয়োজন। প্রতিদিন সমগ্র পৃথিবীতে মানবজাতির ব্যবহারের জন্য যে উত্তাপ ব্যয়িত হয়, তাহার সমষ্টি করিলে বোধ হয় একটি বিস্ময়কর অকল্পিতপূর্ব্ব সংখ্যা হইবে। গর্ব্বিত সভ্যতার উন্নতিতে কেবল ব্যয়েরই নব নব পন্থা আবিষ্কৃত হইতেছে। এই আবিষ্কারেই সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি, এই ব্যয় করিবার ক্ষমতা লাভেরই নাম সভ্যতা। রেলওয়ে, ষ্টীমারে কত উত্তাপ ব্যয়িত হইতেছে, আবার দিন দিন রেলওয়ে ষ্টীমারের বেগ বৃদ্ধির সহিত উত্তাপব্যয় আরও বাড়িয়া চলিয়াছে। আজ শুনিতেছি রেলওয়ের গতি ঘণ্টায় ৮০ মাইল করিয়া হইল, মানবোন্নতির কি পরাকাষ্ঠা, কাল শুনিব আট্‌লাণ্টিকে ষ্টীমারের বেগ বৃদ্ধির জন্য বিংশ সহস্র অশ্বশক্তিযুক্ত এঞ্জিনের আবশ্যক, কিন্তু হায়! এ উন্নতির অর্থ যে শুধুই কতকগুলা শক্তির অপচয়, কতকটা উত্তাপ "বেহুদা" উড়াইয়া দেওয়া! যদি কোনও হঠাৎধনলাভোন্মত্ত নবীন যুবক সহরের উপর, দিয়া ছয় ঘোড়ার গাড়ী চড়িয়া ছয়জন ঘোড়সওয়ার সঙ্গে লইয়া চলিয়া যায়, আমরা বলিব যে লোকটা অযথা টাকাগুলা উড়াইয়া দিতেছে, একটু রহিয়া সহিয়া খরচ করিলে ভবিষ্যতে কষ্ট পাইতে হইবে না, কিন্তু যে ষ্টীমারে বিংশ সহস্র অশ্বশক্তি বিশিষ্ট এঞ্জিনের প্রয়োজন হয়, তাহাতে যদি ৫০৬ জন লোক থাকে, তবে প্রতি লোকের জন্য ৪০টি অশ্বের যুক্তশক্তি ব্যয়িত হইতেছে, একথা আমরা ভাবিয়া দেখি না, ইহাকে আমরা উত্তাপের অপচয় বলি না, বরং ইহাকে সভ্যতার উন্নতি বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করি। আমি বিবেচনা করি, আমাদিগের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ, আমাদের কয়লার ভাণ্ডার আমরা এইরূপ অযথা খরচ করিয়া উড়াইয়া দিয়াছি বলিয়া, আমাদের প্রতি অবিমৃষ্যকারিতা এবং বুদ্ধিহীনতার আরোপ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। বিশেষতঃ, যখন তাহারা দেখিবে যে আমরা যদি একটু বুঝিয়া চলিতাম, যদি রেলওয়ে ষ্টীমারের এত দ্রুতগতির জন্য ব্যস্ত না হইয়া আরও একটু ন্যূন বেগে পরিতুষ্ট থাকিতে পারিতাম, তাহা হইলে কয়লার খরচ অনেক কম হইত। তখন তাহারা কত কথাই না বলিবে। শুধু এই সামান্য একটু বেগবৃদ্ধির জন্যই কতটা ব্যয় বৃদ্ধি!

কয়লা (coal) আজকালকার দিনে একটা বিষম সমস্যার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। পৃথিবীতে কয়লার ভাণ্ডার পরিমিত, এ ভাণ্ডার নিঃশেষিত হইলে আর কয়লা পাইবার আশা নাই। অধুনা ধরাতলে অঙ্গার প্রস্তুত হইতেছে না, এই অতি প্রয়োজনীয় খনিজ দ্রব্য পৃথিবীর ইতিহাসের এক অপূর্ব্বকালের অপূর্ব্ব রচনা, এবং তদবধি ধরেতিহাসের সে অঙ্ক পুনরভিনীত হয় নাই। কয়লার ব্যয় যে হারে চলিয়াছে, তাহাতে এ ভাণ্ডার যে শীঘ্রই নিঃশেষিত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভাণ্ডার যতবড়ই হউক না কেন, তাহা যদি পরিমিত হয়, তাহার যদি আয় নাই অথচ ব্যয় থাকে, তবে তাহার কোন দিন না কোন দিন নিঃশেষ হইবেই হইবে। ইংলণ্ডের কয়লা এক কি দুই শতাব্দী টিকিবে, পৃথিবীর অন্যত্র যে কয়লা আছে তাহা আর কয়েক শতাব্দী মাত্র টিকিতে পারে, কিন্তু এ ভাণ্ডার পরিমিত এবং ইহার নিঃশেষ অবশ্যম্ভাবী ও অদূরবর্ত্তী। এজন্য আধুনিক পণ্ডিতবর্গের মস্তক ঈষৎ বিঘূর্ণিত, এবং অন্য নানাবিধ উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত।

অবশ্য একথা কেহ মনে করিবে না যে কয়লার নিঃশেষের সহিত মানবজাতিরও নিঃশেষ হইবে। কয়লার ব্যবহার শিখিবার সহস্র সহস্র বর্ষ পূর্ব্বেও মানুষ পৃথিবীতে জীবিত ছিল। সূর্য্যবিকীর্ণ উত্তাপ যদি সঞ্চিত করিয়া প্রয়োজন মত ব্যয় করা যায়, তাহা হইলেও মানুষের কার্য্য বহুযুগের জন্য সিদ্ধ হইতে পারে। পৃথিবীর অভ্যন্তর সাতিশয় উত্তপ্ত, সে উত্তাপ গলিত লৌহের উত্তাপাপেক্ষাও কম নহে ইহা নিশ্চিত। এই প্রকাণ্ড উত্তাপভাণ্ডার যদি আমরা ব্যবহারোপযোগী করিয়া লইতে পারি, এই উত্তাপ যদি আমরা আমাদিগের নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপে লাগাইবার উপায় উদ্ভাবন করিতে পারি (অবশ্য তাহা আজি পর্য্যন্তও হয় নাই, কিন্তু তাহা একান্ত অসম্ভবও নয়) তাহা হইলে আরও কত শত যুগের জন্য আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি মানবজাতির জীবন রক্ষার পক্ষে প্রধান উপকরণ উত্তাপ। এখন ইহাই বিবেচ্য, যে সমুদয় উত্তাপভাণ্ডার প্রকৃতিতে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহারা

কতকাল মানুষজাতিকে উত্তাপ যোগাইতে সমর্থ হইবে। অনন্তকালের জন্য তাহারা মানুষের প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারিবে কি না, এবং তাহা যদি সম্ভব না হয়, তাহা হইলে বুঝিব মানবজাতিরও দিবসসংখ্যা পরিমিত, উত্তাপের অভাবের সহিত মানবজাতিরও ধ্বংস, মনুষ্যজাতির মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য মানবজীবন কেবলমাত্র উত্তাপের উপর নির্ভর করে না, জীবন ধারণের পক্ষে অন্যান্য নানাবিধ অবস্থা সমন্বয়ের প্রয়োজন হয়, কিন্তু ইহা আমরা স্থির সিদ্ধান্ত মনে করিতে পারি যে যদি উত্তাপের অভাব হয় এবং উত্তাপে পরিণত হইতে পারে এমন দ্রব্যেরও (শক্তিরও) অভাব হয়, তাহা হইলে কেবল এই কারণেই মানুষের পক্ষে জীবন ধারণ অসম্ভব হইবে।

ইহা সহজেই স্বীকৃত হইবে যে, আমাদের ব্যবহারোপযোগী উত্তাপ আমরা সচরাচর সূর্য্য হইতেই প্রাপ্ত হইয়া থাকি। জবাকুসুমসঙ্কাশ মহাদ্যুতি সাবিতৃমণ্ডলই আমাদিগকে জীবিত রাখিয়াছেন, তাঁহারাই অরুণ রশ্মি আমাদিগের প্রাণ, তাঁহার উত্তাপই আমাদিগের জীবন। তাঁহার ভর্গ * আমাদিগের সতত ধ্যেয়। স্বতঃ পরতঃ সূর্য্যের উত্তাপই আমরা নানা মূর্ত্তিতে ব্যবহার করিয়া থাকি, তাঁহার অসংখ্য মূর্ত্তি। ইন্ধন সংযোগে যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া আমাদিগের অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া লই, সে অগ্নি হইতে সূর্য্যোত্তাপই ভিন্নমূর্ত্তিতে বিকীর্ণ হইতেছে। আর কলিকাতার গৃহস্থবধূরা ধূমনিরুদ্ধলোচনে কাষ্ঠ ছাড়িয়া যে "পাথুরে কয়লা" ব্যবহার করেন, তাহার অগ্নিতেও সেই সূর্য্যোত্তাপ বিভিন্ন আকারে প্রকাশমান। জীবিত বৃক্ষলতার উপর যখন সূর্য্যরশ্মি পতিত হয়, তখন উহার পত্রগুলি রশ্মি হইতে উত্তাপটুকু আহরণ করিতে থাকে। বৃক্ষলতার জীবন ও পরিপুষ্টির পক্ষে কার্ব্বনের (Carbon) সমধিক প্রয়োজন, এবং উহারা বায়ুমিশ্রিত অঙ্গারাম্ল বাষ্প (Carbonic acid gas) হইতে উত্তাপ সংযোগে ঐ কার্ব্বনটুকু আহরণ করিয়া লয়। বৃক্ষপত্র সকল সূর্য্য হইতে উত্তাপ সংগ্রহ করিয়া সেই উত্তাপবলে অঙ্গারাম্লের বিশ্লেষণ সম্পাদন করে, এবং নিজের প্রয়োজনীয় কার্ব্বনাংশ বৃক্ষদেহে গ্রহণ করে। † এই উত্তাপ অতি গূঢ় সংহত অঙ্গার এবং অম্লজান পরমাণুর কেবলমাত্র বিশ্লেষণ সম্পাদনেই ব্যয়িত হইয়া থাকে, পরমাণুগণকে বলপূর্ব্বক পরস্পরের আকর্ষণ হইতে দূরে দূরে রাখিবার নিমিত্ত কতকটা উত্তাপরূপ শক্তির প্রয়োজন হয়।

উদ্ভিজ্জের জীবনের পক্ষে কার্ব্বন অত্যাবশ্যক, বায়ু হইতে সে কার্ব্বন সংগৃহীত হয়, এবং অঙ্গারাম্লের বিশ্লেষণে যে উত্তাপের প্রয়োজন হয় তাহা সূর্য্য হইতে আহৃত হইয়া থাকে। পুনরায় যখন উদ্ভিজ্জদেহনিবদ্ধ এই কার্ব্বন দগ্ধ করা হয়, তখন উহা বায়ুস্থিত অম্লজানের সহিত পুনঃ সংযুক্ত হইয়া থাকে, এবং এই সংযোগক্রিয়ায়, পূর্ব্বে যতটুকু উত্তাপ সূর্য্যরশ্মি হইতে সংগৃহীত হইয়া বিশ্লেষণ ক্রিয়ায় ব্যয়িত হইয়াছিল, ঠিক ততটুকু উত্তাপই উৎপন্ন হইয়া বিকীর্ণ হয়। বিশ্লেষণে রাসায়নিক আকর্ষণের বিরুদ্ধ ক্রিয়ায় যেমন উত্তাপের ক্ষয় হয়, সংযোগকালে রাসায়নিক আকর্ষণের পরিতৃপ্তিতে ঠিক তেমনই উত্তাপের উৎপত্তি হয়। এই সামান্য আলোচনা হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, আমাদিগের চুল্লী হইতে যে উত্তাপ এখন বিকীর্ণ হইতেছে, যাহাতে আমাদিগের অন্নব্যঞ্জন সিদ্ধ হইতেছে, তাহা পূর্ব্বে কোন সময়ে সূর্য্য হইতে আগত হইয়াছিল। যদি চুল্লীতে কাষ্ঠ জ্বলিতে থাকে, তবে দশ বিশ বৎসর পূর্ব্বে যে সূর্য্যরশ্মি পৃথিবীতে উত্তাপ দিয়াছিল, আমরা তাহারই ব্যবহার করিতেছি, আর যদি গৃহিণী পাথুরে কয়লা জ্বালাইয়া ধুঁয়ার ছলনা করিয়া কাঁদিতে বসিয়া থাকেন (যাহা আমি অতীব সন্দেহযুক্ত মনে করি) তবে বুঝিব, যে সূর্য্যরশ্মি সহস্র সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে পৃথিবীকে আলোকিত করিয়াছিল, আমার গৃহিণী সেই পুরাকালের সৌরশক্তি আজ কত সহস্র বৎসর পরে পুনরুত্তাপে পরিণত করিতেছেন।

সবিতা আমাদিগের প্রধান উত্তাপভাণ্ডার। সূর্য্যরশ্মির অনন্তকাল স্থায়িত্বের সম্ভাবনা আছে কিনা, এবিষয়ের আলোচনার পূর্ব্বে আমরা অপর কয়েকটি অপ্রধান উত্তাপভাণ্ডারের কথা বলিয়া লইব। অঙ্গারের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; এ ভাণ্ডার পরিমিত, সুতরাং ইহাতে আর বড় অধিক দিন উত্তাপ যোগাইতে পারিবে না। অবশ্য

* সূর্য্যস্য তেজঃ। আদিত্যান্তর্গতং বর্চ্চো ভর্গাখ্যং তন্মুমুক্ষুভিঃ।

† এই তথ্যটি কেবল হরিদ্বর্ণ উদ্ভিদের পক্ষেই খাটে; এবং পৃথিবীর প্রায় সকল উদ্ভিদই এই জাতীয়, কেবল fungus প্রভৃতি কয়েকটি ছাড়া।

পৃথিবীতে এমন আরও কতকগুলি সামগ্রী রহিয়াছে, যাহাদের সহিত অম্লজানের সংযোগে, অথবা যাহাদের অপরবিধ রাসায়নিক পরিবর্ত্তনে উত্তাপের উদ্ভব হয়, কিন্তু ঈদৃশ উত্তাপও যে পরিমিত তাহা নিশ্চিত। বস্তুতঃ পৃথিবীতে এক নির্দ্দিষ্টসংখ্যক রাসায়নিকপরিবর্ত্তনসম্ভব উত্তাপ * বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং একবার এ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইলে পর আর এ ভাণ্ডার হইতে উত্তাপ লাভের প্রত্যাশা নাই।

তারপরে পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ উত্তাপের কথা। এ ভাণ্ডার প্রকাণ্ড বটে, কিন্তু ইহাও পরিমিত এবং ক্রমশঃ ক্ষয়োন্মুখ। কখনও কখনও আগ্নেয়গিরির বিবর হইতে এই উত্তাপ প্রচুর পরিমাণে বহির্গত হইয়া আকাশে মিলাইয়া যায়, এবং অনবরত ধরাপৃষ্ঠ হইতে যেধীর অথচ অশ্রান্ত তাপবিকিরণ ক্রিয়া (radiation) চলিতেছে, তাহাতেও পৃথিবীর এই আভ্যন্তরীণ উত্তাপ ক্রমশঃ বাহির হইয়া যাইতেছে। পৃথিবীর আভ্যন্তর উত্তাপ পরিমিত ও নির্দ্দিষ্টসংখ্যক এবং উহা ক্রমশঃ অবিশ্রান্ত ভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, অথচ এ ক্ষয়ের কোনও উপায়ে পূরণ হইতেছে না, সুতরাং এ ভাণ্ডারেরও নিঃশেষ অবশ্যম্ভাবী। ইহা কখনও চিরদিনের নিমিত্ত উত্তাপ যোগাইতে সক্ষম হইবে না।

এস্থলে পৃথিবীর অপরবিধ এক শক্তিভাণ্ডারের উল্লেখ করা আবশ্যক, কারণ এই শক্তি উত্তাপে পরিণত হইতে পারে। ইহা ধরার অক্ষোপরি আবর্ত্তন হেতুক শক্তি (energy)। যেমন একটা বৃহৎ চক্র অক্ষোপরি বিঘূর্ণিত হইতে থাকিলে আমরা জানি উহাতে কতকটা শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং উহার আবর্ত্তনবেগের হ্রাসের সহিত সেই শক্তি ক্রমশঃ বহির্গত হইয়া যায়, তেমনই জোয়ার ভাটার ক্রিয়ায় ধরার আবর্ত্তন বেগের হ্রাস হয় এবং সেই সঙ্গে এই জ্যাশক্তিরও ক্ষয় হয়। এই ক্ষরিত শক্তি (অংশতঃ অন্ততঃ) উত্তাপে পরিণত হইয়া বিকীর্ণ হইয়া যায়। অবশ্য আবর্ত্তনহেতুক এ জ্যাশক্তি পরিমিত, এবং তাহাও ধীরে ধীরে এইরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, সুতরাং ইহাও চিরদিনের জন্য নহে। যখন জোয়ার ভাটার প্রতিঘাত বশতঃ ধরার আবর্ত্তন বেগ ক্ষীণ হইয়া অর্দ্ধেক মাত্র রহিবে, তখন বর্ত্তমান জ্যাশক্তিরও এক চতুর্থাংশ মাত্র অবশিষ্ট রহিবে।

অনন্তর সূর্য্যোত্তাপ আমরা কত বিভিন্ন আকারে ব্যবহার করিয়া থাকি সে কথা বলা আবশ্যক। উদ্ভিজ্জসমূহ যে উপায়ে সূর্য্যোত্তাপ সঞ্চিত করিয়া রাখে তাহার উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। তারপরে জলপ্রপাত ও জলস্রোত আমাদের কত প্রয়োজন সিদ্ধ করে, সে শক্তিও সূর্য্যোত্তাপের রূপান্তর মাত্র। সৌরতাপ সাগরোপরি পতিত হইয়া জলকে বাষ্পে পরিণত করে, এবং তাহাকে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করে। এই বাষ্প ক্রমে মেঘ, পরে বর্ষা, পরে নদীরূপে পরিণত হইয়া পুনঃ সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হয়, এবং এই নিম্নমুখী গতির নিমিত্তেই নদীস্রোতের কার্য্যকারিতা। সুতরাং মূলে সৌরশক্তিই জলবাষ্পের ঊর্দ্ধগতি সম্পন্ন করিয়া নদীস্রোতকে আমাদের কার্য্যোপযোগী করিয়াছে। এইরূপে সৌরশক্তি বায়ুপ্রবাহের কারণ রূপে বর্ত্তমান থাকিয়া আমাদের নানাবিধ প্রয়োজন সম্পন্ন করিতেছে।

সৌররশ্মির ঈদৃশী কার্য্যকরী শক্তির উপরেই মনুষ্যজাতির মঙ্গল নির্ভর করিতেছে। আমরা দেখিয়াছি, অপর যে কয়েকটী উত্তাপভাণ্ডার বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার কেহই চিরকাল স্থায়ী নহে, সকলগুলিরই নিঃশেষ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আমাদের পরমমঙ্গলালয় সৌররশ্মিই কি চিরস্থায়ী? এই প্রশ্নের মীমাংসার উপরে মানবজাতির অক্ষুণ্ণ জীবন বা স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে। সবিতৃদেব যদি কোনও দিন রশ্মিবিতরণে বিরত হন, তবে ইহা স্থির নিশ্চিত যে, মানবজাতির জীবনকাল নির্দ্দিষ্ট, সেই নির্দ্দিষ্ট কালের পরে মানুষের পক্ষে জীবনধারণ অসম্ভব।

সূর্য্যমণ্ডলে অবশ্য নির্দ্দিষ্টসংখ্যক উত্তাপ * বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং এই উত্তাপ প্রতি মুহূর্ত্তে অতি প্রচুর পরিমাণে ব্যয়িত হইতেছে। সে ব্যয়ের পরিমাণ কল্পনা করিতেও স্তম্ভিত হইতে হয়। এ সম্বন্ধে প্রোফেসর লাঙ্গলী (Professor Langley) নিম্নোক্তরূপ দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। পেন্সিলভেনিয়ায় যে সমুদয় কয়লার খনি আছে, তাহাতে আমেরিকার সমগ্র যুক্তরাজ্যের কয়লার খরচ সহস্র বৎসরের জন্য চলিতে পারে। এই খনিসমূহের অঙ্গারসমষ্টি যদি এক স্থানে স্তূপীকৃত করিয়া একেবারে অগ্নিদগ্ধ করা যায়, তবে যে উত্তাপ উৎপন্ন হইবে, তাহা সূর্য্য কর্ত্তৃক এক সেকেণ্ডের সহস্রাংশে বর্ষিত উত্তাপের তুল্য হইবে না। কি বিস্ময়কর ব্যাপার! এই উত্তাপরাশি, ধরাধামে মানুষের উদ্ভবকাল হইতে শুধু এই কয় শতাব্দী মাত্র নহে, মানুষের আবির্ভাবের সহস্র সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে পৃথিবীতে জীবনলীলার সর্ব্বপ্রথম বিকাশ হইতে আজি পর্য্যন্ত বর্ষিত হইয়াছে। সে ভাণ্ডার কত বৃহৎ, কত বিশাল! এত বর্ষণেও মানুষ তাহার ক্ষয় অনুভূত করিতে পারে নাই, যেমন ভাণ্ডার তেমনই রহিয়াছে!

সূর্য্যদেব অবিরত যে আলোক এবং তাপ বিকিরণ করিতেছেন, তাহার ন্যূনতা কখনও পরিলক্ষিত হয় নাই। প্রাচীনকালে ঋষিরা যখন বেদরচনা করিতেন, অথবা সবিতৃদেবের বরণীয় ভর্গের * ধ্যান করিতেন, তখন যে সৌরতাপ প্রখরতর ছিল এবং সৌরালোক উজ্জ্বলতর ছিল, এরূপ মনে করিবার কোনই কারণ নাই। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবকাল হইতে আজি পর্য্যন্ত সৌরবিকিরণে কোনওরূপ ন্যূনাধিক্য লক্ষিত হয় নাই। কিন্তু ইহা কিরূপে সম্ভবে? অশ্রান্ত বিকিরণে যে সৌরশক্তির ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে ইহাত সুনিশ্চিত, অথচ তাহা এত দীর্ঘকালেও অনুভূত হইতেছে না কেন? এই দুই পরস্পর বিরোধী তত্ত্বের সামঞ্জস্য কোথায়?

সবিতৃদেবের কোনও অলৌকিক উত্তাপজননশক্তি আছে, একথা আধুনিক বিজ্ঞানযুগে কেহ বিশ্বাস করিবে না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থই একই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। অবশ্য অনবরত এই যে উত্তাপরাশি সূর্য্যদেহ হইতে বিকীর্ণ হইতেছে, তাহা যে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে, তাহা কখনই নয়। শক্তির অনশ্বরত্ব একটা প্রাকৃতিক নিয়ম। এই উত্তাপশক্তি সূর্য্য হইতে বিকীর্ণ হইয়া বহুদূরে প্রস্থান করিতেছে এবং আকাশের অতলগর্ভে তাহার কীদৃশী পরিণতি হইতেছে, তাহা কে বলিবে? শক্তি বিনষ্ট হয় নাই, ইহা নিশ্চিত; হয়ত তাহা ঈথরের কম্পনরূপে রহিয়াছে, হয়ত অন্যবিধ কোন রূপ পরিগ্রহ করিয়া অনন্ত আকাশের কোন্ প্রান্তভাগে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু সৌরজগতের পক্ষে উহা একরূপ বিনষ্ট বলিতে হইবে। যে শক্তি বিকীর্ণ হইয়া একবার সৌরজগৎ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহা অন্য কোনও রূপে আমরা আর ফিরিয়া পাই না, বা পাইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং আমাদের এই সৌরজগতের শক্তিরূপ মূলধন যে ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা নিঃসন্দেহ এবং এ ক্ষয় কোনও উপায়ে পরিপূরিত হইতেছে না।

সূর্য্যের এত উত্তাপ তবে কোথা হইতে আসিতেছে যে, এই অপরিমিত ব্যয়েও তাহার কোন ন্যূনতা হয় না? এই প্রশ্ন বহুকাল হইতে বৈজ্ঞানিকবৃন্দের আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছে। অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন, কতরূপ কল্পনা করিয়াছেন, কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর হেল্‌মহোল্টজের (Helmholtz) পূর্ব্বে কেহই এ প্রশ্নের প্রকৃতরূপ মীমাংসা করিতে পারেন নাই। কেহ বলিয়াছেন, সূর্য্য একটী অতি প্রকাণ্ড অতি উত্তপ্ত তাপ-সিত (white-hot) কঠিন গোলক, কিন্তু তাহা হইলে তাপ-বিকিরণের দ্বারা সূর্য্যের উষ্ণতার হ্রাস হইত এবং দুই সহস্র বর্ষের মধ্যে বিকিরণক্রিয়ায় অনুভবযোগ্য ন্যূনতা আসিয়া পড়িত। কেহ বলিয়াছেন সূর্য্যদেহে অনবরত রাসায়নিক সংযোগে উত্তাপের জনন হইতেছে, কিন্তু তাহাও এতাদৃশ অক্ষুণ্ণ সৌরবিকিরণ পক্ষে উপযুক্ত কারণ বলিয়া বোধ হয় না এবং তাহাতেও সৌরোত্তাপের দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব সম্ভবে না। কেহ বা বলিয়াছেন যে, উল্কাপাতের দ্বারা সৌরোত্তাপ সমভাবে রক্ষিত হইতেছে, কিন্তু সৃষ্টিতে এত উল্কা নাই যে, সৌরবিকিরণ জন্য ক্ষয়ের সম্যক্ পূরণ করিতে পারে। এ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইব না। সৌরোত্তাপের প্রকৃত উৎস কোথায়, হেল্‌মহোল্টজ্ তাহা বিশিষ্টরূপে প্রমাণিত করিয়াছেন। সূর্য্য যে কঠিন গোলক নহে, ইহার অধিকাংশই বাষ্পময়, ইহা সুনিশ্চিত। ইহার কোনও অংশই যে কঠিনাবস্থ নহে, এরূপ অনুমান করিবারও অনেক হেতু আছে। সূর্য্যমণ্ডলের বহিরংশ, যাহা আমাদিগের দৃষ্টি এবং পর্য্যবেক্ষণের অধীন, তাহা যে কঠিন নহে, অনুজ্জ্বল বাষ্পরাশি মধ্যে ভাসমান উজ্জ্বল মেঘমালা মাত্র, তাহা অবেক্ষণের দ্বারা স্থিরীকৃত। মেঘবিচ্ছেদ সৌরকলঙ্ক, এবং আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় সৌরোৎপাত উহার বাষ্পীয় প্রকৃতির প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

* উত্তাপেরও পরিমাণ করা যায়, সুতরাং উহার সংখ্যা নির্দ্দেশ করিলে দোষ হয় না।

* এই উত্তাপ দ্বিবিধ :—Actual ও Potential.

* ওম্ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ইত্যাদি বোধ হয় সূর্য্যেরই উপাসনা। সূর্য্যই ত্রিলোকপ্রসবিতা।

তাপক্ষয়ে, বাষ্পীয় এবং কঠিন দ্রব্য উভয়ের সমানবিধ পরিবর্ত্তন ঘটে না ; কঠিনের পক্ষে যে নিয়ম, বাষ্পের পক্ষে ঠিক সে নিয়ম খাটে না। তাপবিকিরণের দ্বারা বাষ্পীয় এবং কঠিন দ্রব্য উভয়েই সঙ্কুচিত হয়, কিন্তু এ সঙ্কোচন উভয়ের পক্ষে সমান নহে। কঠিন গোলক অপেক্ষা বাষ্প-গোলক সমপরিমাণ তাপক্ষয়ে অনেক বেশী সঙ্কুচিত হইবে। কঠিন গোলকের পক্ষে তাপক্ষয়ে উষ্ণতার হ্রাস হয়, কিন্তু বাষ্পগোলকের পক্ষে সকল সময়ে তাহা ঘটে না। এমন কি এই তাপক্ষয়ের কারণেই বাষ্পগোলকের উষ্ণতা কখনও কখনও বৃদ্ধি পাইতে পারে। এ কথা সহজে বিশ্বাসযোগ্য বোধ হইবে না ; যাহার তাপক্ষয় হইল, তাহার উষ্ণতা বৃদ্ধি হইবে কেমন করিয়া ?—কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহা অসম্ভব বোধ হইবে না। তাপ এবং উষ্ণতা এক কথা নহে। বাষ্পগোলকের তাপবিকিরণ জন্য তাপক্ষয় হয় এবং সেই তাপক্ষয়ের জন্যই উহা আবার অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। এই সঙ্কুচিত আয়তনে অবশিষ্ট তাপ বিকাশিত হইয়া হয়ত উহার উষ্ণতার বৃদ্ধি ঘটাইতে পারে। যে তাপে একটি গোলকে এক নির্দ্দিষ্ট উষ্ণতা অনুভূত হয়, তাহা অপেক্ষা অল্প তাপে ক্ষুদ্রতর গোলকে সমপরিমাণ বা অধিকতর উষ্ণতার অনুভূতি অসম্ভব নয়।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে সৌরোত্তাপের অক্ষুণ্ণতার প্রকৃত কারণ অনুমিত হইবে। সূর্য্য সর্ব্বাংশে একটি বাষ্পীয় গোলকমাত্র না হইলেও উহার সমধিকাংশই বাষ্পময় ; সুতরাং উপরিলিখিত আলোচনা আমরা সূর্য্যপক্ষে প্রয়োগ করিতে পারি। সৌরবিকিরণে সৌরোত্তাপের ক্ষয় হইতেছে এবং সেইজন্য সৌরদেহের সঙ্কোচন ঘটিতেছে, কিন্তু উষ্ণতার ন্যূনতা হইতেছে না। এই তত্ত্বটি যে পূর্ব্বকথিত চিরালোচিত প্রশ্নের মীমাংসাপক্ষে কতদূর উপযোগী, তাহা নিম্নোক্ত দৃষ্টান্ত হইতে বোধগম্য হইবে। গণনা দ্বারা জানা যায় যে, সৌরব্যাসের দশ সহস্রাংশ পরিমিত সঙ্কোচনে যে তাপ বিমুক্ত হইবে, তাহাতে বর্ত্তমান হারে দ্বিসহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত সৌরবিকিরণ ক্রিয়া সংসাধিত হইতে পারিবে। এ সঙ্কোচন সৌরদেহের তুলনায় এত সামান্য যে, অতি সূক্ষ্মতম যন্ত্রেরও ইহা অগোচর। এই নিমিত্ত এত অপরিমিত বিকিরণ সত্ত্বেও মানবযুগের মধ্যে সৌরদেহের এ সঙ্কোচন আমরা অনুভূত করিতে পারি নাই।

কিন্তু এ বিকিরণক্রিয়া কি এইভাবে অনন্তকাল চলিবে ? তাহা কখনই সম্ভবে না। ক্রমাগত তাপক্ষয়ে সৌরদেহস্থিত বাষ্পীয় অংশ সকল ক্রমে তরলাবস্থা প্রাপ্ত হইবে এবং বিকিরণক্রিয়া আরও চলিলে পর তরল পদার্থসমূহ কঠিন পদার্থে পরিণত হইবে। এই কঠিন অবস্থায় একবার উপনীত হইলে, তাপক্ষয়ে আর উষ্ণতার বৃদ্ধি হইবে না, তখন তাপক্ষয়ের সহিত উষ্ণতার হ্রাস হইতে থাকিবে।

সূর্য্যের তাপক্ষয়ে অধুনা হয়ত উষ্ণতার হ্রাস না হইতে পারে, হয় ত এখন উষ্ণতার বৃদ্ধি ঘটিতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতে এমন দিন আসিবে যখন উষ্ণতার ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিবে। এ সিদ্ধান্ত হইতে অব্যাহতি নাই। তখন উহার তাপবিকিরণ ক্ষমতাও কমিয়া আসিবে এবং ধরাপৃষ্ঠপতিত সৌরতাপপরিমাণেরও ক্রমশঃ হ্রাস হইবে। সৌর বিকিরণের তখনও বিরাম হইবে না, তাপক্ষয় এবং উষ্ণতাহ্রাস তখনও চলিবে। ক্রমে ক্রমে সবিতার উজ্জ্বলতা নিভিয়া আসিবে, তাপ বিলুপ্ত হইবে, এবং অবশেষে উহা একটি প্রভাহীন শীতল কঠিন নক্ষত্রে পরিণত হইয়া আকাশমার্গে পরিভ্রমণ করিতে থাকিবে। সৃষ্টির অধিকাংশ নক্ষত্রই এতাদৃশ অবস্থাপন্ন এবং সূর্য্যেরও অদৃষ্টলিপি উহা হইতে ভিন্ন নহে।

এইরূপে আমরা দেখিতে পাইতেছি, পৃথিবীতে মানবজাতির জীবনকাল পরিমিত, সূর্য্যের তাপনিঃশেষের সহিত মনুষ্যজাতির মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। প্রোফেসর লাঙ্গ্‌লী সৌর তাপের সম্ভাবিত স্থায়িত্বকাল গণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে অধুনা যে হারে সৌরবিকিরণক্রিয়া চলিতেছে, সে হারে বিকিরণক্রিয়া চলিলে সৌরতাপ মোট ১৮০ লক্ষ বর্ষের অধিক চলিতে পারে না। সৌরসৃষ্টির প্রারম্ভে সূর্য্যে যে শক্তি (energy) সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহার পাঁচভাগের চারিভাগ ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে, এখন আর পঞ্চমাংশ মাত্র অবশিষ্ট আছে। সুতরাং বর্ত্তমান হারে বিকিরণক্রিয়া আর ৪০ কি ৫০ লক্ষ বর্ষ পর্য্যন্ত চলা সম্ভব, কিন্তু কোটিবর্ষ পর্য্যন্ত চলিতে পারে না। সুদূর ভবিষ্যতে জীবনলীলার নির্দ্দিষ্টকালের আমরা একটা আভাস পাইতেছি।

দুইটা নিষ্প্রভ শীতল নক্ষত্রের পরস্পর সংঘর্ষণে হয়ত সূর্য্যের এবং সৌরতাপের উৎপত্তি। হয় ত দুই নক্ষত্রের সংঘর্ষণে উভয়ে বাষ্পীভূত হইয়া মিলিত হওয়ায় এক বিশাল উজ্জ্বল নীহারিকার (nebula) সমুদ্ভব হইয়াছিল এবং এই নীহারিকা হইতে সৌরজগতের সৃষ্টি হইয়াছে। এমনও হইতে পারে যে, প্রভাহীন কঠিন নক্ষত্ররূপী সবিতার আকাশে পরিভ্রমণ কালে পুনরায় তাদৃশ আর এক নক্ষত্রের সহিত উহার সংঘর্ষণ উপস্থিত হইবে এবং এই উপায়ে উভয়ে আবার উত্তপ্ত উজ্জ্বল নীহারিকায় পরিণত হইবে। তখন নূতন করিয়া আবার সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার আরম্ভ হইবে, আবার জীবন-লীলার অভ্যুদয় হইবে। এইরূপে সৃষ্টি ও প্রলয়ের চক্র চিরাবর্ত্তিত হইতে থাকিবে, জীবন ও মৃত্যু পরম্পরাক্রমে আসিবে ও যাইবে। যাবজ্জননং তাবন্মরণং তাবজ্জননী জঠরে শয়নং।*

—০—

লাল-পল্টন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

লাল-পল্টনের কীর্ত্তিক্ষেত্র।

He succeeded because he dared ; he dared, because he had full reliance, first, on himself, on the coolness and calmness with which he could, in the storm of battle, direct a well-thought-out movement ; and, secondly on the troops who had shown themselves during their service in Bengal, amenable to the guidance of a skilful leader.—*Col. Malleson.*

রাজা আনন্দরাজ গজপতি বাহুবলে ভিষক্‌পত্তন অধিকার করিয়া দুর্গ-প্রাচীরে বৃটিশ-পতাকা উড্ডীন করিয়া দিবার পর, ফরাসি সেনাপতি লালী সেনানায়ক কনফ্লাঁকে

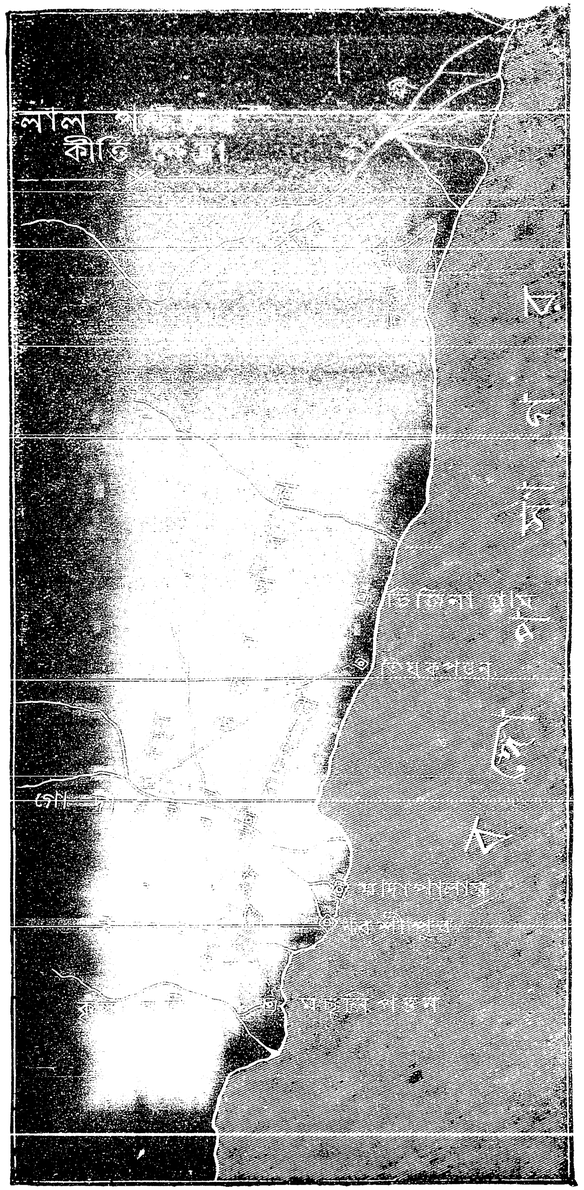

* এই প্রবন্ধটী সার রবার্ট বলের একটি প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। এই অনুষঙ্গে নিম্নোদ্ধৃত অংশটি পাঠকের কৌতূহলোদ্দীপক হইতে পারে।

"After Sir William Thomson had pointed out the preponderating tendency which now seems to exist towards th conversion of all energy into heat-energy and its equal diffusion by radiation through space, the late Professor Rankine put forth a remarkable speculation. He suggested that the ethereal, or, as I have called it, the adamantine medium in which all the stars exist, and all radiation takes place, may have bounds, beyond which only empty space exists. All heat-undulations reaching this boundary will be totally reflected, according to the theory of undulations, and will be reconcentrated into foci situated in various parts of the medium. Whenever a cold and extinct star happens to pass through one of these foci, it will be instantly ignited and resolved by intense heat into its constituent elements. Discontinuity will occur in the history of that portion of matter, and the star will begin its history afresh with a renewed store of energy."—*Jevons' Principles of Science, Bk. VI.*

পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন ; কন্‌ফ্লাঁর কিঞ্চিন্মাত্রও প্রত্যুৎপন্নমতি থাকিলে, লালপল্টন ভিষক্‌পত্তনে অবতরণ করিবার বহুপূর্ব্বেই ফরাসি-সেনা সমুদ্রোপকূল অধিকার করিয়া ফেলিতে পারিত ;—হয়ত আনন্দরাজের যুদ্ধসজ্জা অঙ্কুরেই বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া ফরাসিশক্তি পুনরায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিত। কন্‌ফ্লাঁর আলস্য বশতই তাহা হইতে পারিল না ! তিনি লালীর পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা বশতঃ যখন রাজমহেন্দ্রীতে উপনীত হইলেন, তখন আর আনন্দরাজকে বশীভূত করিবার উপায় রহিল না ;—তখন বৃটিশের রণবাদ্য বাজিয়া উঠিয়াছে, তালে তালে পা ফেলিতে ফেলিতে বৃটিশবাহিনীর গোরা ও কালা সিপাহীরা বঙ্গোপসাগরকূলে অগ্রসর হইয়াছে ! অগত্যা কন্‌ফ্লাঁ রাজমহেন্দ্রীর ২০ ক্রোশ দূরে ৫০০ ইউরোপীয় সেনা, ৫০০০ কালা সিপাহী, ৫০০ কালা অশ্বারোহী লইয়া ইংরাজের আক্রমণ পথের গতিরোধ করিবার আশায় শিবির সন্নিবেশ করিতে বাধ্য হইলেন।

১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর সেনাপতি ফোর্ড সসৈন্যে ফরাসি শিবিরের সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। তিনি চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া শত্রুশিবির সহসা আক্রমণ করিতে সাহস পাইলেন না ; দুই ক্রোশ দূরে চম্বল নামক গ্রামে সসৈন্যে শিবির সংস্থাপন করিলেন। *

উভয় পক্ষেই রণসজ্জার ত্রুটি ছিল না ; পল্টনসংখ্যাও প্রায় সমান, রণকৌশল শিক্ষাতেও কেহ কাহারও অপেক্ষা হীন নহে। এরূপক্ষেত্রে কেবল যে ইংরাজ সেনাপতিই শত্রুশিবির আক্রমণ করিতে ভীত হইয়াছিলেন তাহা নহে ; ফরাসি-সেনাপতিও সাহস করিয়া অগ্রসর হইতে পারেন নাই ! এই ভাবে উভয়ে উভয়ের সম্মুখবর্ত্তী হইয়াও চারি দিবস পর্য্যন্ত কোন পক্ষই কামানে অগ্নিসংযোগ করিলেন না !

অবশেষে ৮ই ডিসেম্বর পরস্পরের অজ্ঞাতসারে উভয় সেনাপতিই আক্রমণ করিবার উপযোগী আয়োজন করিতে আরম্ভ করিলেন। ফরাসিরা চম্বলের বৃটিশশিবির আক্রমণ করিবার কল্পনা করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে ইংরাজ সেনাপতিও চম্বল পরিত্যাগ করিয়া কণ্ডূর নামক তিন মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে সেনাসমাবেশ করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। যথাকালে সংকল্প সাধন করিতে পারিলে, ফরাসিরা চম্বলে উপনীত হইয়া শত্রুসেনার সন্ধান পাইতেন না, তাঁহাদিগকে আরও অগ্রসর হইয়া কণ্ডূরে উপনীত হইতে হইত। কিন্তু আনন্দরাজের সেনাসজ্জায় কয়েক ঘণ্টা বিলম্ব ঘটিল বলিয়া ইংরাজেরা যখন চম্বল ত্যাগ করিতেছেন ঠিক সেই সময়ে ফরাসিরা আসিয়া সহসা আপতিত হইলেন।

ফোর্ড সসৈন্যে কণ্ডূরের দিকে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, আনন্দরাজের সেনা চম্বলেই ছিল ; সুতরাং প্রত্যূষে শত্রুসেনা সহসা শিবিরাক্রমণ করায় আনন্দরাজের পল্টনদিগের মধ্যে তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল ; তাহারা এ সময়ে আক্রমণবেগ প্রতিহত করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল না; সুতরাং আক্রান্ত হইতে না হইতেই ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতে লাগিল। ফোর্ড তাহাদের সহায়তা সাধনের জন্য প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিলেন না ; অগত্যা আনন্দরাজ সসৈন্যে দ্রুতগতিতে ফোর্ডের অনুগমন করিতে বাধ্য হওয়ায় ফরাসি সেনা প্রবল পরাক্রমে চম্বল অধিকার করিয়া ফেলিল, এবং এত সহজে যুদ্ধজয় করিয়াছে ভাবিয়া অহঙ্কারে আস্ফালন করিতে লাগিল। তাহারা জানিত যে আনন্দরাজের সেনাদল সম্পূর্ণ অশিক্ষিত, সকলে বন্দুক ব্যবহার করিতেও জানিত না, তীর, বর্শা, টাঙ্গি, তরবারি এবং ধনুর্ব্বাণ লইয়াও অনেকে পল্টনদলে প্রবেশ করিয়াছিল। সুতরাং আনন্দরাজকে দেখিয়া ভীত হইবার কারণ ছিল না। ইংরাজদিগকে দেখিয়াও ফরাসিদিগের ভয় হয় নাই ; কারণ, তাহারা শুনিয়াছিল যে ইংরাজের সিপাহীদল নূতন গঠিত হইয়াছে, তাহারা এখনও যুদ্ধকৌশল শিক্ষা করিতে পারে নাই। সহজে চম্বল অধিকার করায় ফরাসি পল্টনদলে সকলেই ভাবিয়াছিল যে তাহারা যাহা শুনিয়া আসিয়াছিল তাহাই সত্য ;—ইংরাজের ফৌজ যুদ্ধক্ষেত্রে মুহূর্ত্তমাত্রও তিষ্ঠিতে পারিবে না। এই ভ্রান্তবিশ্বাসই ফরাসিসেনার সর্ব্বনাশের কারণ হইল। * তাহারা ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া কণ্ডূরাভিমুখে ধাবিত হইল, এবং বৃটিশবাহিনী

* Forde, after reconnoitering the French position, came to the opinion that it was too strong to be attacked.—*Malleson's Decisive Battles of India, p. 86.*

* The partial sucess achieved by the French guns was fatal to Conflans. Ignorant of the exact state of affairs, he became confirmed in his belief of the truth of the story told him by the deserters, that the English force was composed of raw levies.—*Malleson's Decisive Battles of India, 88.*

কণ্ডূরগ্রামে প্রবেশ না করিতেই ফরাসির কামান ভীম কলরবে গর্জ্জন করিয়া উঠিল !

বেলা ৮॥ ঘটিকার সময়ে সহসা শত্রুসেনা সম্মুখে উপনীত দেখিয়া ইংরাজ-সেনাপতি তৎক্ষণাৎ সেনাসমাবেশ করিয়া সম্মুখযুদ্ধের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন।

ইংরেজ সেনাপতি গোরাদলকে মধ্যস্থলে রাখিয়া বামে ও দক্ষিণে "লাল পল্টনের" সিপাহীদিগকে দণ্ডায়মান হইতে বলিলেন, এবং তাহাদের পার্শ্বদেশে আনন্দ রাজের অশিক্ষিত সেনাদলকে স্থাপন করিয়া দিলেন ; কামানগুলি পল্টন দলের বামে দক্ষিণে উন্মুক্ত স্থানে বিন্যস্ত হইল। এই ভাবে সেনা সমাবেশ করিয়া ইংরাজ সেনাপতি একটী ভূট্টার ক্ষেতের নিকট দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন ;—ক্ষেত্রটী মধ্যস্থলে পতিত হওয়ায় সমুন্নত ভূট্টা বৃক্ষে গোরাদল আবৃত হইয়া রহিল, বামে দক্ষিণে উন্মুক্ত প্রান্তরে কাতার বাঁধিয়া লালপল্টন দণ্ডায়মান হইল। সুচতুর ইংরাজ সেনাপতি এইরূপে বিচিত্র ব্যূহ রচনা করিবামাত্র লালপল্টনের সিপাহীদলকে রণপতাকা বিস্তার করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। * তাহাদের প্রত্যেক দলের হস্তে কতকগুলি ছোট ছোট পতাকা দেওয়া হইয়াছিল, সেই সকল পতাকা মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া যখন লাল-পল্টনের সিপাহী সেনা বহুদূর ব্যাপিয়া দণ্ডায়মান হইল, তখন ইংরাজ সেনাপতির কৌশল সফল হইল !

সে কালের ইংরাজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে দাক্ষিণাত্যে অনেক যুদ্ধ কলহ উপস্থিত হইয়াছিল। এই সকল যুদ্ধে উভয় পক্ষেই কালা সিপাহী থাকিত ; কিন্তু তাহাদিগকে ইউরোপীয় সেনার ন্যায় রক্তাম্বরে সুসজ্জিত করিবার ব্যবস্থা ছিল না ; তাহারা শ্বেত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া কখন বা দেশীয় প্রথায় অঙ্গাবরণ করিয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হইত। ক্লাইব বঙ্গদেশে আসিয়া এই প্রথার পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন ; এবং বাঙ্গালী সিপাহীদিগের ধুতি চাদর ঘুচাইয়া লাল কুর্ত্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ; একথা মান্দ্রাজ অঞ্চলে কেহ জানিত না। † আজ ক্লাইবের ব্যবস্থায় ফরাসি-সেনাপতির মতিভ্রম ঘটিল।

ফরাসিরা যখন চাহিয়া দেখিল যে, বামে এবং দক্ষিণে বহুদূর বিস্তৃত হইয়া লাল কুর্ত্তিওয়ালা পল্টনশ্রেণী দণ্ডায়মান হইয়াছে, তখন তাহারা মনে করিল উহারা সকলেই "গোরা লোগ্" এবং উহাদিগকে হটাইতে পারিলেই রণজয় সুসম্পন্ন হইবে ! ইংরাজব্যূহের কেন্দ্র ভূমিতে ভূট্টাক্ষেত্রের অন্তরালে যে গোরাদল দণ্ডায়মান রহিয়াছে,—সে কথা কেহ জানিতে পারিল না, এরূপ ঘটনা যে আদৌ সম্ভব, এমন কথাও কাহারও মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল না ! তাহারা মহা কলরবে ব্রিটিশ-ব্যূহের বাম বাহু আক্রমণ করিল। লাল পল্টনের সিপাহী সেনা উপর্য্যুপরি প্রচণ্ড পীড়নে ধরাশায়ী হইতে লাগিল ; কিন্তু আজ তাহাদের সেনাপতি যে অদ্ভুত সমরকৌশলের পরিচয় দান করিতে বসিয়াছেন, তাহাতে ব্যক্তিগত সমরকৌশল প্রদর্শনের বা বাহুবল বিস্তারের উপায় নাই ! সেনাপতির ব্যূহ রচনার কৌশল এইরূপ যে, বাম ভাগের লাল-পল্টনকে শত্রু সেনার আক্রমণ বেগে পশ্চাতে হটিয়া আসিতে হইবে, শত্রু সেনা সহজে রণজয় করিবার আশায় যেমন সম্মুখে অগ্রসর হইতে থাকিবে, অমনি দক্ষিণ পার্শ্বের সিপাহী এবং ভূট্টাক্ষেত্রস্থ গোরাদল ঘিরিয়া ফেলিয়া শত্রু সেনার পরাজয় সাধন করিবে। কার্য্যেও তাহা হইল ! বাম পার্শ্বস্থ লাল-পল্টন হটিয়া যাইতেছে দেখিয়া ফরাসি সেনা তাহাদের সমরকৌশল বুঝিতে পারিল না ; তোপখানা পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া তাহারা ছত্রভঙ্গ ভাবে মার মার রবে বামভাগ বিধ্বস্ত করিয়া লাল-পল্টনের অধিকৃত স্থানে আসিয়া উপনীত হইল। সেখানে পদার্পণ করিবামাত্র তাহাদের মতিভ্রম দূর হইল ; তখন আর দাঁড়াইবার স্থান নাই, তখন আর সেনানায়কের উত্তেজনায় কর্ণপাত করিবার অবসর নাই, তখন আর রণকৌশল প্রদর্শন করিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই ;—তখন ছত্রভঙ্গ ফরাসি সেনা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইল ! *

* Colonel Forde, probably with a view of leading the enemy into the very error into which they fell, ordered the Sipahi Battalions to furl their small colours of which one was allowed to each Company, and to lay them on the ground.—*Broom's Bengal Army, Vol. I. 216-217.*

† It was the first time that the French had met native soldiers so attired.—*Malleson's Decisive Battles of India, 89.*

* লাল পল্টনের কীর্ত্তিক্ষেত্র "কণ্ডূরের" যুদ্ধ কাহিনী যাঁহার।

শত্রু সেনা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবামাত্র গোরাদল সহ লাল-পল্টনের সিপাহী সেনা তাহাদের উপর আপতিত হইল। ফরাসি সেনা বহু ক্লেশে তোপখানার নিকট সমবেত হইল বটে, কিন্তু একবার কি দুইবার কামানে অগ্নি সংযোগ করিতে না করিতেই লাল-পল্টন তাহাদের কামানের উপর আসিয়া পড়িল। যুদ্ধের প্রথম উপক্রমে দ্বিতীয় সংখ্যক লাল-পল্টন সেনা নায়কের ব্যূহ রচনার কৌশলে পশ্চাদ-পদ হইতে বাধ্য হইয়াছিল; এখন তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য উন্মত্তের ন্যায় শত্রু শিবির আক্রমণ করিল। ইংরেজ-সেনাপতি আর তাহাদের গতিরোধ করিলেন না; ফরাসিরা আর তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিতে পারিল না; যুদ্ধাবসানে শত্রুশিবির ইংরাজের হস্তগত হইল, ফরাসীসেনা—নতশিরে পলায়ন করিতে বাধ্য হইল, বাদ্যোদ্যমে রণভূমি পরিপূরিত হইয়া উঠিল। ফরাসীদিগের পটমণ্ডপ ও তোপখানা ইংরাজের করতলগত হইল; প্রত্যূষে যে শিবির ফরাসি-সেনার আস্ফালন ভরে টলমল করিয়া উঠিয়াছিল, সায়াহ্নে সেখানে লাল-পল্টনের অট্ট-হাস্য ধ্বনিত হইয়া উঠিল! তখন সকলেই বুঝিতে পারিল—

"It was with design that that officer (Forde) had placed his red-coated Sipahis in a position to attract the first attack of the French." *

এই যুদ্ধে যে সকল দেশীয় সিপাহী ইংরেজপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, তাহারা এ দেশের সাময়িক ইতিহাসে প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যক লাল-পল্টন এবং মাদ্রাজ সিপাহী নামে পরিচিত। মাদ্রাজী সিপাহীরা সংখ্যায় অল্প ছিল, এবং তাহারা কোন পল্টন ভুক্ত হয় নাই।

প্রথম এবং দ্বিতীয় সংখ্যক লাল-পল্টনের বাহুবলেই যে এই যুদ্ধ জয় সুসম্পন্ন হইয়াছিল, ইংরাজ লিখিত সাময়িক ইতিহাসেও তাহার কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথম সংখ্যক লাল পল্টনের অধিনায়কের নাম কাপ্তান নক্স, দ্বিতীয় সংখ্যক লাল-পল্টনের অধিনায়কের নাম কাপ্তান ম্যাক্‌লিন;—এই দুইজন সেনানায়কের নাম বাঙ্গালী পল্টনের নিকট অতীব প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল।

ভূট্টাক্ষেত্রের অন্তরাল হইতে বাহির হইবার পর গোরাদল যথেষ্ট শৌর্য্য বীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিল, কিন্তু তখনও প্রথম সংখ্যক লালপল্টনের শৌর্য্যবীর্য্যের উপরেই যে যুদ্ধ জয় নির্ভর করিতেছিল সে কথা কাপ্তান ক্রম্ স্বপ্রণীত ইতিহাসে এইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন:—

The day, if not completely gained, was at least secured from reverse by the possession of the enemy's Field Artillery and the flight of their European Battalion; but much yet depended on the conduct of the first Native Battalion. When the European Battalion advanced, its fieldpieces had been left with this corps, encouraged by which support, and the spirit of their gallant Commander, Captain Knox, the Sipahis, though opposed by nearly four times their own number, stood their ground nobly; taking advantage of the cover of some embankments in their front, they kept up a warm fire upon the enemy,—to which the latter replied with great spirit, until they saw their own European Battalion driven from the guns and in disorderly flight, when they also began to retreat. *

কণ্ডূরের যুদ্ধে ফরাসি সেনা যে প্রথমসংখ্যক লাল-পল্টনের অনলবর্ষণেই যুদ্ধভূমি হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল, ইহা সিপাহীদিগের পক্ষে সবিশেষ গৌরবের কথা। এই যুদ্ধে তাহারা ইংরাজের মুখোজ্জ্বল করিতে গিয়া একশত হত এবং একশত আহত হইয়াছিল;—কিন্তু এই যুদ্ধের নাম পর্য্যন্তও ইতিহাস হইতে বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছিল। ধন্য প্রতিভাসম্পন্ন ম্যালিসনের লেখনী! কর্ণেল ম্যালিসনের কৃপাতেই ইহার বিস্তৃত কাহিনী জনসমাজে পরিকীর্ত্তিত হইয়া কণ্ডূরের নামও ভারতীয় মহাযুদ্ধগুলির মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে! †

কণ্ডূর এখন মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত; বোধ হয় অনেক কৃতবিদ্য বাঙ্গালীও মানচিত্রে তাহার স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। কিন্তু কণ্ডূরই বাঙ্গালী লালপল্টনের সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তিক্ষেত্র!

বঙ্গীয় সেনাদলের ইতিহাস সঙ্কলন করিতে বসিয়া সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক অর্ম্মি হইতে কর্ণেল ম্যালিসন পর্য্যন্ত যত ইংরাজ লেখক কণ্ডূরযুদ্ধের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, সকলেই ইহাকে একবাক্যে মহাযুদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

কাপ্তান ক্রম্ বরং আক্ষেপ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, এই যুদ্ধের জন্য যাহারা জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিল এবং যাহারা ইহার গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছিল তাহাদের রণপতাকায় "কণ্ডূরের" নাম লিখিত না হইয়া যাহারা ইহাতে কিছুমাত্র লিপ্ত ছিল না সেই মাদ্রাজী গোরা পল্টনের পতাকায় "কণ্ডূরের" নাম লিখিত রহিয়াছে! *

আমূল অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত পুস্তকাবলী হইতে অনেক সহায়তা লাভ করিবেন। যথা:—

Orme's Indostan, Cambridge's War in India, Grose's Voyage to the East Indies, Broome's History of the Rise and progress of the Bengal Army, and Malleson's Decisive Battles of India.

এই সমস্ত ইতিহাসে লাল-পল্টনের বিশেষ পরিচয় না দিয়া সাধারণতঃ "সিপাহী" নাম প্রদান করায় তাহাদের বীর-কীর্ত্তি সুস্পষ্টরূপে অঙ্কিত হইতে পারে নাই; ক্রম সাধারণ সিপাহী নাম ব্যবহার না করিয়া কোন্ সংখ্যক পল্টন এবং কাহার পরিচালনাধীন তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এজন্য ক্রমের ইতিহাস অবলম্বন করিয়া কণ্ডূরের যুদ্ধ কাহিনী পাঠ করিলে কোনরূপ গোলযোগ ঘটিবে না।

* *Malleson's Decisive Battles of India, 93.*

* *Broome's Bengal Army, vol I. 218.*

† *Malleson's Decisive Battles of India.*

* Thus ended the battle of Condore, one of the most brilliant actions on military record; which, however, is generally but little known or mentioned in the service, and by a strange chance, not one of the corps employed have ever received any distinction for this most important victory, whilst the First Madras European Fusiliers, of which not an officer or man, excepting Captain Callender, was present, have the word "Condore" emblazoned on their colours and appointments. The corps properly entitled to this distinction are the present First Bengal European Fusiliers, the First Regiment of Bengal Native Infantry, and the Bengal Artillery; the Second Native Battalion is no longer in existence, and the Madras Sipahis present was never organised as a regular Corps. —*Captain Broome's Bengal Army, vol. I. 220.*

কলিকাল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

তোমরা শিবচরণকে নিষ্ঠুর বলিও না, কেননা, আমরা জানি, যখন মৃত্যুশয্যায় উমা শিবচরণের চরণে মাথা রাখিয়া তাঁর পদধূলি লইয়া সজল কাতর নয়নে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অন্তিম বিদায় লইতেছিল, যখন শিবচরণের শোকসন্তপ্তা জননী ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইয়া উমার গুণগ্রাম গাহিয়া গাহিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতেছিলেন, যখন শিবচরণের কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় মাতৃহারা শিশুর ন্যায়, অধীর হইয়া রোদন করিতেছিল, তখন শিবচরণের চক্ষু দুইটী যেন ছল ছল করিয়া আসিয়াছিল, জলটা কেবল ঝরিতে ঝরিতে ঝরে নাই!

উপকথায় শুনা যায়, সেকালে রাজার মৃত্যুতে রাজসিংহাসন শূন্য হইলে, শূন্য সিংহাসন পূর্ণ করিতে প্রমত্ত রাজহস্তী শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া বাধা বিপত্তি ঠেলিয়া, ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়াইত! তার পর রাজচিহ্নধারী যাহাকে সম্মুখে দেখিত, তাহাকে স্বীয় পৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া সিংহাসনে বসাইয়া আবার শান্ত ভাবে স্বেচ্ছায় শৃঙ্খলাবদ্ধ হইত! উমারাণী-বিয়োগে শিবচরণের হৃদয়সিংহাসন শূন্য হইলে তাঁহার প্রমত্ত মনমাতঙ্গও তেমনই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িল! ভগ্ন-হৃদয় সিংহাসন শূন্য পড়িয়া খাঁ খাঁ করিতে লাগিল!

শ্মশানে শবসমাগমে সমাগত শকুনির সংখ্যা সহজে করা যায় না, অফিসারের অকাল অন্তর্দ্ধানে অনন্ত অনুরোধ-পত্র ও আবেদনকারীর অভাব দৃষ্ট হয় না, আর পত্নীর পরলোক প্রাপ্তির পর পতির পতিত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে উদারহৃদয় হিন্দু শ্বশুরকুলের অনুগ্রহের ত্রুটিও কখন থাকে না! সুতরাং শিবচরণকেও অধিক দিন বিপত্নীক থাকিতে হইল না! অশৌচান্ত হইতে না হইতে দুই একটী সম্বন্ধ ঘুটিতে লাগিল; শিবচরণের নয়নে কিন্তু তখনও মনোহরপুরের সেই গৌরাঙ্গী সুশীলার যৌবনমুকুলিত দেহলাবণ্য, অনিন্দ্য সুন্দর মুখশ্রী, আর সেই আকর্ণবিস্তৃত নয়নেন্দীবর দুটী ভাসিতেছিল, তাই, কোন সম্বন্ধই আর তাঁহার মনে ধরিতেছিল না!

এসংসারে সময়ে কেহ যায় না! সিনিয়ার অফিসার, বহুদিন জুনিয়ারের উন্নতির পথ রুদ্ধ রাখিয়াও নিষ্কৃতি দেন না, শেষ, পেনসন গ্রহণে গবর্ণমেণ্টের গলগ্রহ হইয়া থাকেন। শাশুড়ী ঠাকুরাণী প্রৌঢ়াবস্থায় গৃহিণীপণা করিয়া, হাড় জ্বালাইয়াও তৃপ্ত নন, বৃদ্ধ বয়সে হরিনাম করিতে করিতেও বেচারী বধূদের চালচলনের দোষ ধরেন! ইঁহারা সময়ে বিদায় গ্রহণ করিলে, সংসারের অনেক কণ্টকই দূর হইত!

আর, তুমি উমা, সেইত তুমি চলিয়াই গেলে, যদি আর কিছুদিন পূর্ব্বে অনুগ্রহ করিয়া ভবের লীলা সম্বরণ করিতে, তবেত শিবচরণকে এ দারুণ অপমান সহিতে ও মনকষ্ট পাইতে হইত না! আর সুশীলার মত রমণীরত্নও বুঝি তাঁর অদৃষ্টচ্যুত হইত না!

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

আজ শিবচরণের বিবাহ। শিবচরণ এবার বিবাহের পূর্ব্ব দিন হইতেই ভাবী শ্বশুরালয়ের কোন প্রতিবেশীর বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন! কিন্তু ঘটক মাধব ভট্ট সঙ্গে নাই! যদিও মাধব ঘটকই প্রথমে পাত্রীর পিতাকে

এসম্বন্ধের সন্ধান দেন, তথাপি ঘটক এ ঘটকালিতে ফাঁকি পড়িয়াছেন! ভট্টরাজ পাত্রীর পিতার নিকট এই সম্বন্ধের কথা উত্থাপন করিলে, তিনি শিবচরণের "নাড়ী নক্ষত্রের" বিস্তারিত পরিচয় লইয়া, শেষে আর তেমন 'গরজ' দেখাইলেন না। কন্যা বয়স্থা হইলেও তিনি এইরূপ পাত্রে সহজে কন্যা দিতে কিছুতেই প্রস্তুত নহেন, বরং এইরূপই আভাস দিলেন! তার পর ঘটক ভগ্নমনোরথ হইয়া সেগ্রাম ত্যাগ করিতে না করিতে কোন বিশেষ আত্মীয়কে সঙ্গে করিয়া, কি জানি, কি উদ্দেশে তিনি বিদেশ যাত্রা করিলেন! দুই এক দিন মধ্যে তাঁহাকে শিবচরণের গৃহে অতিথিরূপে দেখা গেল! শিবচরণের সহিত আলাপে প্রকাশ, তিনি তাঁর অবিবাহিতা, পরমাসুন্দরী বয়স্কা কন্যার সম্বন্ধ স্থির করিতেই বাহির হইয়াছেন! যে পাত্রের সহিত কন্যার সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল, তিনি যদিও কন্যাকে এক গা গহনা ও বিবাহের খরচ এবং পণাদি বলিয়া পাঁচ শত টাকা দিতে স্বীকার ছিলেন, কিন্তু পাত্রীর গর্ভধারিণী সে সম্বন্ধে কিছুতেই স্বীকার নহেন। পাত্রের বয়স কিছু বেশী, "দেখিতে শুনিতেও" মেয়ের যোগ্য নহেন, তাই, ব্রাহ্মণীর এ আপত্তি! ব্রাহ্মণ তার পর কন্যার রূপ ও গুণের বিস্তারিত পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন, শুনিয়া শিবচরণের লোলুপমন-মধুপ মুগ্ধ হইয়া গেল! শিবচরণ বেশীক্ষণ মনের আবেগ চাপিয়া রাখিতে পারিতেন বোধ হয় না; সহসা, ব্রাহ্মণ, শৌচকার্য্য উপলক্ষ করিয়া বাহিরে গেলেন! শিবচরণ সেই সুযোগে ব্রাহ্মণের আত্মীয়ের নিকটই নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিলেন! আত্মীয়টী কন্যার মাতার আপত্তিটা স্মরণ করাইয়া দিতে ভুলিলেন না, কিন্তু শিবচরণ তাঁহাকে কিছুতেই ছাড়িলেন না! মেয়ের গহনা ও পণাদি সম্বন্ধে মুক্তহস্ত হইয়া, ব্রাহ্মণের সেই সঙ্গীকেও ঘটকালি স্বরূপে নগদ এক শত টাকা দিতে স্বীকার হইলেন! শেষে ব্রাহ্মণ ফিরিলে অনেক কথাবার্ত্তা হইল, সঙ্গীর অনুরোধে ব্রাহ্মণ অগত্যা এই সম্বন্ধে মত দিলেন!

শুভদিনে শুভক্ষণে বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহ আরম্ভ হইয়াছে, এমন সময়ে, সহসা কোথা হইতে, ঘর্ম্মাক্তকলেবর বিশুষ্কবদনে, বিকৃত মূর্ত্তি মাধব ভট্ট হাঁফাইতে হাঁফাইতে বিবাহ সভায় উপস্থিত হইলেন! দাবাগ্নিসংযোগে দগ্ধনীড়ে মৃত শাবকের দুর্দ্দশা দেখিয়া কুলায়প্রত্যাগতা বিহঙ্গী যেমন, কাতর কাকলিতে হৃদয়ের দারুণ যন্ত্রণা প্রকাশ করে, ঘটকও সেইরূপ, ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাসে হৃদয়ের যাতনা প্রকাশ করিতে লাগিল!

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

শুনিয়া সুখী হইবেন, বাসর-গৃহেই নব দম্পতীর পরিচয়ের সুযোগ ঘটিয়াছিল। গ্রীষ্মাধিক্যে স্থূলকায় শিবচরণ, কিঞ্চিৎ অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে না করিতে, নব-বধূ শ্রীমতী জয়কালী, তাড়াতাড়ি তালবৃন্ত ব্যজনে স্বামীর সে ক্লান্তি অপনোদন করিয়াছিল। বালিকার এই স্বামী-ভক্তিতে শিবচরণ মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন, এবং বুঝিলেন, এত চেষ্টা ও এত অর্থব্যয় সকলই সার্থক হইয়াছে। এইরূপে জয়কালীর ভক্তিবিন্দু বর্ষণে, শিবচরণের প্রেম-মুকুল যখন প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল, তখন শিব আদরে জয়কালীর চিবুকখানি ধরিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "গহনা মনে ধরেছে কি? আর কি কি চাই?" শিবচরণ কেবল অলঙ্কার মনে ধরার কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন, কেননা, প্রণয়িণীর এতটা অনুরাগ প্রকাশের পর, স্বয়ং অলঙ্কারদাতা সম্বন্ধে আর ঐরূপ প্রশ্ন উত্থাপন শিবচরণ সুরসিকের লক্ষণ মনে করিলেন না।

"অলঙ্কার আবার মনে ধরা কি? মেয়ে মানুষের যা মনে ধরিবার, তাই" বলিয়া বালিকা লজ্জায় উপাধানে মুখ লুকাইল, বলি বলি করিয়া আর বলিতে পারিল না। ফুটি ফুটি করিয়া মুখ আর ফুটিল না। কিন্তু বাকি টুকু বুঝিতে শিবচরণের বাকী রহিল না। তাঁহার প্রেমসিন্ধু উথলিয়া উঠিয়াছিল; তিনি হৃদয়ের আবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া জয়কালীর মুখচুম্বন করিলেন! স্বর্গ আর কোথায়? শিবচরণ একটু নীরব রহিলেন, বুঝি তাঁর কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিয়াছিল। জয়কালী স্বামীর তুষ্ণীম্ভাব দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিল,—"কি বলিতেছিলেন?" শিবচরণ তখন কল্পনার সুখময় রাজ্যে আশা-অশ্বে বিচরণ করিতেছিলেন, সহসা এই প্রশ্নে একটু অপ্রতিভ হইয়া, "কৈ কি বলিতেছিলাম"—বলিতে না বলিতে জয়কালী বলিল "ঐ যে গহনা না কিসের কথা!" "হ্যা, হ্যা তাই ত" বলিয়া শিবচরণ আবার অলঙ্কারের প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন।—আসুন, আমরাও এখন অন্যত্র যাই।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

শিবচরণ বিবাহান্তে গৃহে ফিরিতেছেন, পাত্রীকে বহুমূল্য অলঙ্কার ও বস্ত্রে ভূষিত করিয়া, চারু চৌপালায় চাপাইয়া স্বয়ং তক্তারামা হাঁকাইয়া বাদ্যভাণ্ড "আশাছোটা" গজবাজী পরিশোভিত হইয়া মহা সমারোহে মনোহরপুরের মধ্য দিয়া চলিয়াছেন!. সুশীলার জননী, দেখ দেখ তোমার এম, এ পাস করা জামাই সাধের সুধাংশুনাথ, কি তোমার মেয়েকে এমন সুখৈশ্বর্য্য-শালিনী করিতে পারিবে! আরও দেখ, তোমার কন্যার মত সুন্দরী শিবচরণের চরণসেবার দাসী হয় কি না? আর তোমরা মনোহরপুরবাসী, তোমরাও দেখ, শিবচরণ কাপুরুষ শিশুপাল নহে!

এই বিবাহে এতটা ব্যয়বাহুল্য করিবার কারণ, শিবচরণের কোন বিশেষ বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলে শিব হাসিমুখে উত্তর দিয়াছিলেন, "শাশুড়ীর অনুরোধ! কেন না, তাঁহার মেয়ের ত আর দ্বিতীয় পক্ষ নহে!" আমরা কিন্তু শুনিয়াছি এ ছাড়া আরো কারণ ছিল, শিবচরণের বর্ত্তমান শ্বশুরালয় মনোহরপুরের অতি নিকটে! আধ মাইল মাত্র ব্যবধানে। মনোহরপুরের সেই অপমান শিবচরণ বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। সে স্মৃতি তাঁহার হৃদ্‌পিণ্ডে যেন বৃশ্চিকদংশনের জ্বালার মত তখনও জ্বলিতেছিল।

শিবচরণ যথাসময়ে সস্ত্রীক গৃহে পৌছিলেন। জননী তখনও উমার শোক ভুলিতে পারেন নাই! তখনও তাঁর অশ্রু শুকায় নাই! উমা গৃহে লক্ষ্মী, স্নেহে কন্যা, সেবায় দাসী, তার শোক কি সহজে ভুলা যায়? উমা, তাঁহার শোকে সান্ত্বনা, সংসারের অবলম্বন, অসময়ের ভরসা, উমার স্মৃতি কি দুই দিনে মুছা যায়?

শিবচরণের নূতন ভার্য্যাকে ক্রোড়ে তুলিবার সময়, তিনি যেন শুনিলেন—তাঁহার সেই কন্যারূপিণী, আদরের আদরিণী উমারাণী, দূর হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে, "মা তুমিও কি আমায় কোলছাড়া করিলে?" গৃহিণীর হৃদয়ে মুহূর্ত্তে তুমুল ঝটিকা বহিয়া গেল,—তিনি কিছুতেই আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না, স্থান, কাল, লক্ষণ সমস্ত ভুলিয়া উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন—"বৌমা মা আমার কোথায় তুমি!" সেই সুখের উৎসবে, বহুলোক সমক্ষে শাশুড়ীর সেই কাতর ক্রন্দনে জয়কালী বড় মর্ম্মাহত হইল। দারুণ অপমানে তাহার অন্তরাত্মা জ্বলিয়া উঠিল। আমরা জানি, সে অগ্নি সহজে নির্ব্বাপিত হয় নাই।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

ফুলশয্যার রাত্রিতে কত সাধ হৃদয়ে ধরিয়া শিবচরণ শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন! কিন্তু সর্ব্বনাশ, তাঁহার, সেই হৃদি-বিহারিণী প্রেমের আদর্শ-রূপিনী জয়কালী, আজি এই শুভবাসরে, সুখশয্যার পার্শ্বে বসিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে! আর সেই রোদন-লোহিত কমল-লোচন হইতে অবিরল জলধারা ঝরিতেছে! শিবচরণ প্রথমে বড়ই অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন, শেষে মনে করিলেন, "হাজার হোক্ ছেলে মানুষ বই ত, নয়, চৌদ্দ বৎসরে আর কত হবে—হয় ত মার জন্য মন কেমন করিতেছে," এই অনুমানের সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ প্রশ্নও করিলেন, উত্তরে একটী হৃদয়বিদারক সুদীর্ঘ নিশ্বাস ও একটী ক্ষুদ্র "না" মাত্র শুনিতে পাইলেন! "মন কেমন করে নাই, তবে কাঁদছ কেন?" বলিয়া শিবচরণ "আথিবিথি" জয়কালীকে বুকে ধরিলেন—জয়কালী তখন শিবচরণের বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া হাঁফাইয়া হাঁফাইয়া শাশুড়ীর সেই দুর্ব্ব্যবহারের কথা তুলিয়া, "যদি এতই তোমাদের মনে ছিল, তবে আবার এ গলগ্রহ করা কেন?" বলিতে বলিতে রুদ্ধ অশ্রুর দ্বার আবার মুক্ত করিয়া দিল—শিবচরণ বিব্রত হইয়া "মা একে শোকাতাপা মানুষ, তায় বৃদ্ধা হয়েছেন, ওতে কি কিছু মনে কর্‌তে আছে" ইত্যাদি বলিয়া সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিলেন—কিন্তু বৃথায় সে প্রয়াস, সে শুধু অনলে ঘৃতাহুতি! "বুড়া হয়েছেন, বাহাত্তরে গিয়েছেন, তা আর সংসারে থাকা কেন, তীর্থ ধর্ম্ম করিলেই ত হয়" বলিয়া মানিনী মানভরে শয্যার একপ্রান্তে শয়ন করিয়া আবার রোদন আরম্ভ করিলেন। বিপন্ন শিবচরণ যে সকল শাস্ত্রসিদ্ধ ও নিষিদ্ধ উপায়ে এবং অপায়ে সেই দুর্জ্জয় দুস্তর মানের সাগর উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, শিবপুরাণে সে সকলের বিস্তারিত প্রসঙ্গ প্রকাশ নাই।

সর্ সৈয়দ আহমদ খাঁ। *

১০ই বৈশাখ, ১৩০৫।

আলিগড়ের সর্ সৈয়দ আহমদ খাঁর মৃত্যুর পর মাসাধিককাল গত হইয়াছে। বঙ্গদেশে তিনি প্রধানতঃ কংগ্রেসের বিরোধী বলিয়াই পরিচিত। তাঁহার বিরোধিতায় কংগ্রেসের কার্য্যশক্তির যে কিছু হানি হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। সুতরাং ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে তাঁহার এরূপ কোন ক্ষমতা ছিল, নিজ জীবনে তিনি এরূপ কোন কোন কার্য্য করিয়াছিলেন, যাহার প্রভাবে লোকে তাঁহাকে কংগ্রেসের প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া অনুভব করিয়াছিল। কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালা সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রে তাঁহার জীবনের এরূপ কোন বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয় নাই, যদ্দ্বারা তৎকৃত কার্য্যের গুরুত্ব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধ হইতে পারে। এই হেতু আমরা তাঁহার যে ক্ষুদ্র জীবনচরিতটি লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, তদ্দ্বারা উল্লিখিত উদ্দেশ্য কিয়ৎপরিমাণে সিদ্ধ হইলেও আমাদের উদ্যম সফল জ্ঞান করিব। তদ্ভিন্ন, যাঁহাকে আমরা কোন কোন বিষয়ে বিরোধী মনে করি, তাঁহার মহত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিলেও আমাদের হৃদয় প্রশস্ত ও উদার হয়;—ইহাও পরম লাভ। মহদ্ব্যক্তির চরিতালোচনায় যে সাধারণ সুফল ফলে, তাহা লাভের আশাত আছেই।

বর্ত্তমান প্রবন্ধটি প্রধানতঃ লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল গ্রেহাম রচিত সর্ সৈয়দ আহমদ খাঁর জীবন-চরিত হইতে সঙ্কলিত।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর দিল্লী নগরে সৈয়দ আহমদ খাঁ জন্মগ্রহণ করেন। মোগলশাসনকালে তাঁহার পিতৃ-মাতৃকুলের পূর্ব্বপুরুষগণ উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার মাতামহ দ্বিতীয় আকবর বাদসাহের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার পিতা মহম্মদ তকি খাঁ অতি ধার্ম্মিক ও নির্লোভ পুরুষ ছিলেন। তিনি দিল্লীর বাদসাহের প্রধান মন্ত্রিত্ব গ্রহণ না করিয়া স্বীয় শ্বশুরকে ঐ পদ দিবার জন্য বাদসাহকে অনুরোধ করেন।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদের পিতার মৃত্যুর পর দিল্লীর শেষ বাদশাহ বাহাদুর শাহ তাঁহাকে তাঁহার মাতামহের সমুদয় উপাধি প্রদান করেন। অধিকন্তু তাঁহাকে "আরিফ্ জঙ্গ" অর্থাৎ যুদ্ধকর্ম্মাধ্যক্ষ উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন।

সৈয়দ আহমদ শৈশবে মাতার নিকট বিদ্যাশিক্ষা করেন। বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি দিবাভাগে যাহা শিক্ষা করিতেন, রাত্রে তাহা মাতার নিকট পুনরাবৃত্তি করিতেন। শিক্ষা কমিষ্যনের সমক্ষে সৈয়দ মহোদয় যে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলেন:—

"ভদ্র পরিবারের মুসলমান মহিলাগণ সম্পূর্ণরূপে মূর্খ, এরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক। তাঁহারা ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক নানাবিধ পুস্তক উর্দ্দু ও পারসীক ভাষায়, এবং কোন কোন স্থলে আরবীতে, পাঠ করেন। আমার নিজের জ্ঞাতি কুটুম্বগণের মধ্যে এমন অনেক মহিলা আছেন, যাঁহারা আরবী কহিতে ও বুঝিতে পারেন, ফারসী নৈতিক পুস্তক পড়িতে ও পড়াইতে পারেন, এবং ফারসীতে পত্র লিখিতে এবং নিজ ভাষায় কবিতা রচনা করিতে পারেন। আমি নিজে আমার মায়ের নিকট সহজ সহজ ফারসী বহি পড়িয়াছিলাম; এবং প্রথম যৌবনে তাঁহার নিকট যে সকল নৈতিক ও অন্যবিধ উপদেশ পাইয়াছিলাম, তৎসমুদয় আমার স্মৃতিপথে এখনও উজ্জ্বলরূপে মুদ্রিত রহিয়াছে। * * দিল্লীর শাহ আবদুল আজিজের পরিবারভুক্ত একটী মহিলার কথা আমার মনে আছে; যিনি আরবী ধর্ম্মপুস্তক সমূহের প্রভূত জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন, এবং যিনি মহিলাগণের মধ্যে একজন উপযুক্ত প্রচারকের মত ধর্ম্ম ও নীতি প্রচার করিতেন।"

সৈয়দ আহমদ ইংরাজী শিক্ষা করেন নাই। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা বন্ধ হয়। তিনি সেই বৎসরই আপনার আত্মীয়গণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইংরাজের চাকরী স্বীকার করেন। তিনি প্রথমে দিল্লীর সদর আমীনের আপিসে ফৌজদারী বিভাগের সেরেস্তাদার নিযুক্ত হন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি আগ্রার কমিশনারের আপিসে নায়েব মুন্সী নিযুক্ত হন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি ফতেপুর সিক্রির মুন্সেফ নিযুক্ত হন এবং ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে বদলী হন।

সৈয়দ আহমদ ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে "দিল্লীর ধ্বংসাবশেষ সমূহের পুরাতত্ত্ব" নামক একখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেন। প্রথম প্রথম ইংলণ্ডে ইহার কোন আদর হয় নাই। কিন্তু একজন ফরাসী পণ্ডিত ফরাসী ভাষায় ইহার একটি অনুবাদ প্রকাশ করায় ইহার যথোচিত আদর হয়; এবং এই পুস্তক রচনা হেতু তিনি ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনস্থ রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটীর সম্মানিত সভ্য নির্ব্বাচিত

* ইহাঁর যে ছবিটী দেওয়া হইল, তাহা প্রস্তুত করিবার জন্য আলিগড় কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক একখানি ফটোগ্রাফ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। উহা তাঁহার মৃত্যুর প্রায় পাঁচ মাস পূর্ব্বে তোলা হয়।

সম্পাদক।

৺ সর্ সৈয়দ আহমদ খাঁ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

হন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয়। ইহাতে, যে ১৯টি নগর ও দুর্গ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দিল্লী নামে অভিহিত হয়, তৎসমুদয়ের বৃত্তান্ত লিখিত আছে। ইহাতে তাঁহার শ্রমশীলতা ও গবেষণা-শক্তির সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদ সব্‌জজরূপে রোহতকে এবং ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বিজনৌরে বদলী হন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে যখন সিপাহী যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন সৈয়দ মহোদয় বিজনৌরে ছিলেন। বিদ্রোহকালে তিনি যে প্রকারে রাজভক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত দেওয়া গেল।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মে যখন বিজনৌরে মীরটের বিদ্রোহ সংবাদ পৌঁছে, তখন তথায় ২০ জন ইংরাজ পুরুষ, রমণী ও শিশু ছিলেন। তথাকার কলেক্টর যেক্সপিয়র সাহেব প্রধানতঃ সৈয়দ আহমদের সাহায্যেই ১০০ পাঠান পদাতিক ও অশ্বারোহী সেনা সংগ্রহ করেন। মোরাদাবাদ ও বেরেলী হইতে প্রত্যহ সংবাদ আনিবার জন্য সৈয়দ আহমদ একটী বার্ত্তাবহ-দলও গঠন করেন। মে মাসের শেষে নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের দুর্বৃত্ত লোকেরা বিজনৌরের জেল আক্রমণ করেন। কতকগুলি কয়েদী পলায়ন করে; কিন্তু জেলের প্রহরীগণ বন্দুক ছুড়িয়া শত্রুগণকে তাড়াইয়া দেয়; এবং বহুসংখ্যক কয়েদী কারারুদ্ধ থাকে। যেক্সপিয়র সাহেব, সৈয়দ আহমদ প্রভৃতি পদব্রজে দৌড়িয়া গিয়া বিদ্রোহ দমনে সহায়তা করেন। খাজাঞ্চিখানা লুট হইবার ভয়ে সৈয়দ আহম্মদ কলেক্টরের সম্মতিক্রমে সমুদয় টাকা কড়ি একটা কূপে নিক্ষেপ করেন। কয়েকদিন পরে যখন রুড়কির বিদ্রোহিগণ বিজনৌর পৌঁছে, তখন তথাকার লোকেরা বাস্তবিকই সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে। তখন সৈয়দ আহমদ বিদ্রোহীদের দুজন সুবাদারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এরূপ যুক্তি প্রয়োগ করেন যে, তাহারা ইংরাজদিগকে উত্যক্ত না করিয়া, বেরেলীর বিদ্রোহীদিগের নেতা বখ্‌ৎ খাঁর সহিত যোগ দিতে অগ্রসর হয়। অতঃপর সৈয়দ আহম্মদ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার ১০০ শত পাঠান সৈন্য নবাব মামুদ খাঁ নামক একজন বিদ্রোহী সেনানায়কের সহিত গোপনে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে। তিনি মামুদ খাঁকে অনেক চেষ্টা করিয়াও ইংরেজের পক্ষে আনিতে পারিলেন না। একদিন রাত্রি ৮টার সময় সৈয়দ সাহেব শুনিলেন যে, মামুদ খাঁ গোপনে ত্বরিতপদে বিজনৌরে উপস্থিত হইয়া আট শত সৈন্য লইয়া ইংরাজদিগকে ঘিরিয়া ফেলিতেছেন। ইংরাজেরা তখন সকলেই এক গৃহে বাস করিতেছিলেন। কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে স্বনির্ম্মিত একটী প্রচ্ছন্ন পথ দিয়া সেই গৃহসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া সৈয়দ আহমদ দেখিলেন, শত্রুদল গৃহটকে প্রায় বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু তিনি সৌভাগ্যক্রমে তদভ্যন্তরে অলক্ষিতভাবে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইলেন। ইংরাজদের সহিত পরামর্শের পর স্থির হইল যে, কোন একজনকে মামুদ খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। সৈয়দ আহমদ স্বেচ্ছাক্রমে এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন,। তিনি তরবারি ও পিস্তল ত্যাগ করিয়া, ইংরাজদের অনুরোধের বিরুদ্ধে নিরস্ত্রভাবে, মামুদ খাঁর নিকট চলিলেন। মামুদ খাঁ তখন শান্ত্রীপরিবৃত হইয়া মুক্তাকাশতলে বসিয়াছিলেন। একজন শান্ত্রী সৈয়দ সাহেবকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিল। কিন্তু তিনি নিষেধ না শুনিয়া আরও অগ্রসর হওয়ায় অপর এক প্রহরী তাঁহাকে নিষেধ করিল। তাহাতে তিনি মামুদ খাঁকে দূর হইতে চীৎকার করিয়া বলিলেন যে, তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, তিনি লেখনীজীবী কেরাণী—নিরস্ত্র আসিয়াছেন। অগ্রসর হইতে অনুমতি পাইয়া তিনি নবাবের নিকট গিয়া তাঁহার সহিত নির্জ্জনে কথা বার্ত্তা কহিতে চাহিলেন। নবাব বলিলেন "আমরা এখানে সকলেই ভাই বেরাদর, যাহা বলিবার থাকে, এখানেই বলুন।" সৈয়দ সাহেব বলিলেন, "একটা মুলুক দখল করা সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা সর্ব্বসাধারণ সমক্ষে হওয়া উচিত নয়।" তাহাতে নবাব একান্তে তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে গেলেন। সৈয়দ আহমদ নবাব মামুদ খাঁকে বলিলেন, "আপনি ত আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদের দেশ আবার পাইলেন; এখন ইংরাজদের কি ব্যবস্থা করা যায় বলুন দেখি?" নবাব এ বিষয়ে তাঁহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—"আপনার সম্মুখে দুটি পথ রহিয়াছে—এক, আপনি ও আমি কয়েকজন লোক লইয়া গিয়া তাহাদিগকে বধ করিতে পারি; কিন্তু শীঘ্রই দিল্লীর পতন হইতে পারে; তখন যদি ইংরাজেরা প্রবল হয়, তাহা হইলে প্রস্তাবিত ইংরাজবধ আমাদের বিপদের কারণ হইবে। অপর পথ এই যে, আমি সমুদয় দেশটি দস্তুর মত আপনার হস্তে অর্পণ করিয়া ইংরাজদিগকে কোথাও যাইতে বলি।" নবাব জিজ্ঞাসিলেন—"তাহা কি প্রকারে করা যাইতে পারে?" সৈয়দ আহমদ বলিলেন—"এই এক সর্ত্তে আমি ইহা করিতে পারি যে, আপনি শপথ করিবেন যে, যখন তাহারা চলিয়া যাইবে, তখন কেহ তাহাদিগকে উৎপীড়িত করিবে না।" নবাব এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, কিন্তু বলিলেন যে, ইংরাজদিগকে রাত্রি ২ টার মধ্যে চলিয়া যাইতে হইবে। সৈয়দ সাহেব ফিরিয়া আসিয়া উদ্বিগ্নচিত্ত ইংরাজগণকে সকল কথা বলিলেন। তাঁহারাও নবাবের প্রস্তাবে রাজী হইলেন। সৈয়দ আহমদ নবাবের নিকট ফিরিয়া গিয়া প্রয়োজনীয় দলিলপত্র লইবার জন্য তাঁহাকে ইংরাজদের গৃহে আসিতে বলিলেন। নবাব একাকী যাইতে দ্বিধা বোধ করিতেছিলেন, কিন্তু সৈয়দ আহম্মদ, তাঁহার কোনই ভয় নাই বলায়, নবাব তাঁহার সঙ্গে গেলেন। প্রদেশটি হস্তান্তর করিবার দলিল লিখিবার ভার সৈয়দ আহমদের উপর পড়িল। তিনি চতুরতাপূর্ব্বক এই মর্ম্মে ফারসী ভাষায় দলিলটী লিখিলেন যে, যে পর্য্যন্ত না ইংরাজেরা ফিরিয়া আসিয়া ইহাতে দাবী না করেন, ততদিন পর্য্যন্ত ইহা নবাবকে দান করা হইল; কলেক্টর সাহেব ইহা দস্তখত ও মোহর করিলেন, এবং সৈয়দ আহম্মদ ইহা নবাবকে দিলেন; খাজাঞ্চিখানার চাবীও তাঁহাকে দেওয়া হইল। (টাকা কড়ি ইতিমধ্যে কূপ হইতে উত্তোলিত হইয়াছিল।) নবাব তৎপরে নিজের সৈন্যদের নিকট ফিরিয়া গেলেন; এবং পুনরায় বলিয়া গেলেন যে, ইংরাজেরা যেন রাত্রি ২টার মধ্যে বিজনৌর ত্যাগ করিয়া যান।

তখন রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইয়াছিল। একটীও গাড়ী ঘোড়া বা অন্যবিধ যান পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। তাহার উপর কলেক্টর যেক্সপিয়র সাহেব বলিলেন, তাহার পকেটে একটীও টাকা নাই! সৈয়দ আহমদ আবার নবাবের নিকট গেলেন এবং বলিলেন যে তিনি যখন দেশের শাসনকর্ত্তা, তখন কেবল তিনিই ইংরাজদলের যাত্রার বন্দোবস্ত করিতে পারেন। নবাব তাঁহাকে দুটী হাতী, একটী গরুর গাড়ী, এবং খাজাঞ্চিখানা হইতে তিন হাজার টাকা দিলেন। পলাতক দল রাত্রি ২টার সময় যাত্রা করিলেন। সৈয়দ আহম্মদ পদব্রজে কয়েকজন বন্ধুর সহিত নবাবের ৪ জন এবং নিজের ৪ জন সওয়ার দ্বারা ইংরাজদিগকে রক্ষা করিতে করিতে শত্রুশিবির ছাড়াইয়া বিজনৌরের দুই মাইল দূরে পৌঁছাইয়া দিলেন। তাঁহারা নিরাপদে মীরট পৌঁছিলেন। ইহার পর তিনজন ইংরাজবন্ধু হিন্দু জমিদার নবাবকে পরাস্ত করেন।

প্রতি শ্রদ্ধা পরিলক্ষিত হয়। ইস্‌লাম যে তরবারির ধর্ম্ম নয়, তাহা তিনি প্রমাণ করেন। ভিন্ন মতাবলম্বীর প্রতি অত্যাচার এবং উৎপীড়ন মুসলমান অপেক্ষা খৃষ্টানেরা অধিক করিয়াছেন, তাহাও তিনি ইতিহাসের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করেন। এই গ্রন্থে, বিখ্যাত পণ্ডিত ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অন্যতম ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট সার্ উইলিয়ম মিওরের মুসলমান ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোন কোন উক্তি অযথার্থ বলিয়া প্রমাণিত হয়।

সৈয়দ আহমদ তাঁহার বিলাত যাত্রার বর্ণনা করিয়া লণ্ডন হইতে কতকগুলি পত্র লেখেন। জাহাজে তাঁহার সহিত কুমারী কার্পেণ্টারের সাক্ষাৎ হয়। উক্ত প্রাতঃস্মরণীয়া মহিলার স্ত্রীশিক্ষাবিস্তার-প্রযত্নের সহিত তিনি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করেন। তিনি মার্সেল ও প্যারিসের সৌন্দর্য্যে একান্ত বিমুগ্ধ হন এবং প্যারিসকে ভূস্বর্গ বলিয়া বর্ণনা করেন। একখানি পত্রে তিনি বলেন ;—

"ইংরাজদিগের তোষামোদ না করিয়া আমি সত্যই বলিতে পারি যে শিক্ষা, শিষ্টাচার, এবং সাধুতা বিষয়ে ইংরাজদের সহিত ভারতবাসীগণের তুলনা করিলে বোধ হয় যে, একটা নোংরা জন্তুর সহিত একজন কার্য্যদক্ষ ও সুশ্রী মানুষের যতটা সাদৃশ্য, ভারতবাসী ও ইংরাজের মধ্যে সাদৃশ্যও তদ্রূপ। তুমি কি একটা ইতর প্রাণীকে সম্মানাস্পদ মনে কর? তুমি কি একটা জন্তুর সহিত শিষ্ট ব্যবহার করা আবশ্যক মনে কর? কর না! ইংরাজদের নিকটও ভদ্র ব্যবহার পাইবার আমাদের কোন অধিকার নাই! ইংরাজদের পক্ষে আমাদিগকে অকর্ম্মণ্য পশু মনে করিবার কারণ আছে। * * মানুষের যেসকল পার্থিব ও আধ্যাত্মিক সম্পদ থাকা উচিত, ঈশ্বর তৎসমুদয় ইউরোপের, বিশেষতঃ, ইংলণ্ডের উপর অর্পণ করিয়াছেন।" "আমি নিশ্চয়ই মনে করি যে, ভারতবাসীদের প্রতি ইংরাজদের ব্যবহার ভদ্র নয়, এবং এই অভদ্রতা নিশ্চয়ই সমূলে বিনষ্ট হওয়া উচিত; কিন্তু কার্য্যক্ষমতা হেতু ভদ্র ব্যবহার পাইবার ভারতবাসীদের কোন অধিকার আছে বলিয়া আমি ইহা বলিতেছি না।"

তিনি নিম্নশ্রেণীর ইংরাজ নরনারীর জ্ঞানস্পৃহা ও শিক্ষা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। আধুনিক নানা বিদ্যাশিক্ষা ব্যতিরেকে যে ভারতবর্ষ উন্নত হইতে পারে না, তাহাও তিনি একখানি পত্রে লিখিয়া গিয়াছেন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি বারাণসীতে সব্‌জজ নিযুক্ত হন; এবং ইহার কিয়ৎকাল পরে "মুসলমান সমাজ-সংস্কারক" নামক একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। তাঁহার স্বসম্প্রদায়ের লোকের, আধুনিক জ্ঞানোপার্জ্জনের বিরুদ্ধে যে কুসংস্কার আছে, তাহার বিরুদ্ধে তিনি অনেকগুলি প্রবন্ধ লেখেন। এতদ্দ্বারা মুসলমান-সমাজে চিন্তার গতি কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু এজন্য মক্কার পুরোহিতেরা তাঁহাকে ধর্ম্মদ্রোহী ও সয়তানের সেনাপতি নামে ভূষিত করেন, এবং এই প্রার্থনা করেন যে ঈশ্বর যেন তাঁহাকে বিনষ্ট করেন! তাঁহাদের একজন লিখিয়াছিলেন, যে, তাঁহাকে প্রহার, কয়েদ, প্রভৃতি উপায়ে আক্কেল দেওয়া উচিত। তাঁহাকে অনেক মুসলমান নাস্তিক ও "নেচুরিয়া" (অর্থাৎ প্রকৃতি-উপাসক বা বিবর্ত্তন-বাদী) মনে করিয়াছিলেন। তিনি যখন আলিগড় কলেজ স্থাপন করেন, তখন একজন মুসলমান, এই কলেজের সাহায্য করা উচিত কি না, তদ্বিষয়ে মক্কার মোল্লাদের ব্যবস্থা চান। একজন মোল্লা লেখেন—"এই বিদ্যালয়ের সাহায্য করা যাইতে পারে না। পরমেশ্বর ইহাকে এবং ইহার প্রতিষ্ঠাতাকে বিনষ্ট করুন!" এই ফতোয়াগুলি তাঁহার বিরুদ্ধে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর তিনি অনেক বেনামী পত্র পান। লেখকেরা বলে যে তাহারা তাঁহার প্রাণ বধ করিবার জন্য কোরানে হাত দিয়া শপথ করিয়াছে। কিন্তু সৈয়দ মহোদয় অটলভাবে নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিতে লাগিলেন। নিজ শরীর রক্ষার জন্য একজন রক্ষীরও সাহায্য লইলেন না।

হণ্টর সাহেব, "আমাদের ভারতবাসী মুসলমানগণ; তাহারা কি তাহাদের বিবেকানুসারে মহারাণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে বাধ্য?" নামক একখানি পুস্তক লিখিয়া মুসলমানদের রাজদ্রোহিতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদ এই পুস্তকের উত্তর দেন। তিনি হণ্টর সাহেবের অনেক ভ্রম প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন।

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার পর অবধি তিনি নিজ কলেজ স্থাপনের জন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছিলেন। মুসলমানগণ কেন সম্যক্‌রূপে সরকারী কলেজের সাহায্য লয় না, তাহার কারণ নির্ণয়ার্থ তিনি এতদ্বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ৩টি প্রবন্ধের জন্য তিনটি পুরস্কার অঙ্গীকার করেন। সংক্ষেপে ৪টি কারণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১। রাজনৈতিক পূর্ব্বগৌরবের স্মৃতি। ২। সামাজিক আচার। ৩। ধর্ম্মবিশ্বাস। ৪। দরিদ্রতা। যাহাতে মুসলমানদের কোনই আপত্তি না থাকে, তদর্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট বিষয় ব্যতিরেকে আলিগড় কলেজে প্রাচ্যভাষা ও মুসলমান ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত

করা হয়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন হইতে স্কুলের কার্য্য আরম্ভ হয়।

মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নতিসাধন আলিগড় কলেজ স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য বটে; কিন্তু এতদ্ব্যতীত সৈয়দ-আহমদের ব্যাপকতর একটি উদ্দেশ্য ছিল। তিনি ভারতবর্ষে শিক্ষাপ্রণালীর এক নূতন আদর্শ প্রবর্ত্তিত করিতে ইচ্ছা করেন। গবর্ণমেণ্টের প্রণালী মতে কেবল বুদ্ধির চালনা হয়। শিষ্টাচার, নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হয় না। ছাত্রেরা সহরের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া বাস করে। শিক্ষকদের সংস্পর্শে আসিয়া চরিত্রগঠন করিবার সুযোগ তাহাদের ঘটে না। গুরুশিষ্যের যে প্রাচ্য সুন্দর পিতাপুত্র সম্বন্ধ তাহা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। সরকারী শিক্ষাপ্রণালীতে এইরূপ নানা দোষ ঘটিয়াছে। এই জন্য সৈয়দ আহমদ কলেজের সহিত সুবিস্তৃত ছাত্রাবাস ও ইংরাজ অধ্যাপকগণের বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সিয়া ও সুন্নিদিগের নমাজ পড়িবার সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। ক্রিকেট খেলায় আলিগড়ের ছাত্রদের সমকক্ষ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে নাই বলিলেই হয়। বক্তৃতা করিয়া, কাগজে লিখিয়া, সহরে সহরে ভ্রমণ করিয়া, অল্প অর্থদাতাদেরও নাম যাহাতে কলেজের সহিত স্থায়িভাবে সংসৃষ্ট থাকে তাহার বন্দোবস্ত করিয়া, এবম্বিধ নানা উপায়ে সৈয়দ কলেজের জন্য অর্থসংগ্রহ করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে ভ্রমণকালে অনেক স্থানে লোকে তাঁহাকে অভিনন্দনপত্র ও ভোজ দিবার জন্য প্রভূত অর্থব্যয় করিতে প্রস্তুত হয়। তিনি সেই টাকা সে প্রকারে খরচ করিতে না দিয়া কলেজের জন্য আদায় করিয়া লন। তিনি কেবল এই উপায়ে শুধু হায়দরাবাদ নগর হইতেই ত্রিশ হাজার টাকা আনিয়াছিলেন। আলিগড় কলেজে সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী ছাত্রই পড়িতে পারে। চাঁদাদাতাগণের মধ্যেও দুইজন হিন্দুরাজার নাম সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছে। কলেজ স্থাপিত হইবার পর প্রত্যেক গবর্ণর জেনেরাল উহা পরিদর্শন করিয়াছেন। উহা দ্বারা মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রভূত উপকার হইয়াছে।

৩৭ বৎসর ব্যাপী রাজসেবার পর সৈয়দ আহমদ ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বিশ্রামবৃত্তি গ্রহণ করিয়া আলিগড়ে বাস করিতে আরম্ভ করেন। দিল্লীর দরবারে তিনি জি, সি, এস্, আই উপাধি পান। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদ গবর্ণর জেনেরালের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিযুক্ত হন। তিনি ও তাঁহার পুত্র শিক্ষা কমিষ্যনের সভ্য নিযুক্ত হন, এবং তিনি কমিষ্যনের সমক্ষে নানা বিষয়ে সাক্ষ্য দেন। তাঁহার সাক্ষ্য মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদ তাঁহার চরিতাখ্যায়ক গ্রেহাম সাহেবকে লেখেন:—"ভারতবাসিগণকে স্বেচ্ছা-সৈন্য (volunteer) হইতে না দিয়া গবর্ণমেণ্ট ইহাই বলিতে চান যে গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে বিশ্বাস করেন না। ইহার ফল এই উক্তি হইতেই বিবেচিত হইতে পারে, যে, 'যদি তোমরা আমাদের বিশ্বাসভাজন হইতে চাও, তাহাহইলে আমাদিগকে বিশ্বাস করাও তোমাদের কর্ত্তব্য।"

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদ পঞ্জাব ভ্রমণে বাহির হন। সর্ব্বত্রই তিনি সর্ব্বসাধারণের সাদর অভ্যর্থনা ও কলেজের জন্য চাঁদা প্রাপ্ত হন। সৈয়দ আহম্মদ জীবনের শেষ কয়েক বৎসর আলিগড়ে যাপন করেন। তাঁহার গৃহ যেন সাহিত্য সৌরভে পূর্ণ বলিয়া মনে হইত। তাঁহারবৈঠকখানা পুস্তক ও কাগজ পত্রে পূর্ণ। তাঁহার কার্য্যশক্তি বিস্ময়কর ছিল। প্রত্যূষে ৪টার সময় উঠিয়া তিনি সংবাদ পত্রের জন্য প্রবন্ধ, এবং নিজ পুস্তকাদি লিখিতেন। তাহার পর সাক্ষাৎকারীদিগের সহিত বার্ত্তা কহিতেন এবং কলেজ কমিটি সমূহের সম্পাদকের গুরুতর কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন। এইরূপে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। মস্তিষ্কচালনা তাঁহার পক্ষে দীর্ঘজীবন ও স্বাস্থ্যের অনুকূল হইয়াছিল। তিনি ৮১ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি বিলাতী প্রথামত টেবিলে 'খানা' খাইতেন; কিন্তু কখনও কোন প্রকার মদ্যপান করেন নাই। ভোজনের সময় ও পরে বন্ধুগণ আসিয়া উপস্থিত হইতেন। তাঁহাদের সহিত দর্শন, ধর্ম্ম, রাজনীতি প্রভৃতি নানাবিষয়ে কথাবার্ত্তা হইত। ফারসী কবিতা আবৃত্তি, হাস্যকর নানাবিধ গল্পও এই সময়ে হইত। তাঁহার হাস্যে সরলতা ও আন্তরিকতা ছিল, এবং তিনি বড়ই পরিহাস রসিক ছিলেন। তিনি কখন কখন টেবিলের নীচে ছ[illegible]
দিয়া সাপ সাপ বলিয়া সমবেত বন্ধুবর্গকে [illegible]
তিনি জীবনের শেষ বহু বৎসর বি[illegible]
ধিক বিবাহ করেন নাই। তি[illegible]

কখনও পরিহাস করিয়া বলিতেন "আমি হয়ত আবার বিবাহ করিব! কিন্তু গৃহিণীটি ইংরাজমহিলা হওয়া চাই, যাহাতে আমি অধিকতর অসঙ্কোচে ইংরাজ-সমাজে মিশিতে পারি। তা ছাড়া গৃহিণীটির বয়স ৮০ বৎসর হওয়া চাই, এবং সমুদয় দাঁতগুলিও ভাঙ্গা চাই!" তিনি স্বভাব-বাগ্মী ছিলেন। আর কোন ভারতবাসী মুসলমানের তাঁহার মত ক্ষমতা, বাগ্মিতা, যশ, বিশ্বজনীন সহানুভূতি ও উদারতা, কার্য্যদক্ষতা এবং অধ্যবসায় ছিল না। মুসলমান-শিক্ষা-বিস্তার-প্রযত্নের নেতৃত্ব গ্রহণের তাঁহার মত উপযুক্ত আর দ্বিতীয় মুসলমান ছিলেন না। তাঁহার উদ্যম ও চেষ্টা ব্যতিরেকে শিক্ষা বিষয়ে মুসলমানেরা হিন্দুদের আরও পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতেন। মুসলমানেরা তাঁহার মত বন্ধু আর সহজে পাইবেন না।

এই সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত হইতেই পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে, সৈয়দ আহমদ পূর্ব্বাপর কংগ্রেসের মতের বিরোধী ছিলেন না; জীবনের শেষভাগে তাঁহার রাজনৈতিক মতের পরিবর্ত্তন ঘটে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

১। আরতি।

নয়নে নয়নে করিব আরতি,
এস নয়ন রঞ্জন;
রাখিব সতত আঁখির আগেতে
আঁখির সুখ-স্বপন।
অধরে অধরে হইবে পরশ,
অলস-আবেশ-ভোর;
জাগিবে চুম্বন, করিয়ে মন্থন
সব খানি সুখ মোর।
সারা দেহ দিয়ে করিব আরতি,
দেহ ওই দেহ লাগি;
দেহের বন্ধন হইবে মোচন,
শুধু পরশ জাগি।
প্রক... হৃদয় করিবে তোমার আরতি,
নিক জ্ঞানোপার্জ্জ... লই' সুখ, দুখ, আশা;
বিরুদ্ধে তিনি অনেকগু... ঠিবে পাঁচটী প্রদীপ—
সমাজে চিন্তার গতি কিয় সরমের ভালবাসা।
যৌবন লইয়া রয়েছি দাঁড়ায়ে, ...দ্রাহী ও সয়-
ডালি দিব এবং এই প্রার্থনা
মোহিনী-মাধুরী উঠিবে ফুটিয় করেন! তাঁহাদের
তোমা... প্রহার, কয়েদ, প্রভৃতি
জীবন ঢালিয়া করিব আর... াকে অনেক মুসলমান
ঢালিব ...তি-উপাসক বা বিব-
... আলিগড়
যা আছে আমার যতনে তোমারে
করিব গো সমর্পণ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু এম্ এ।

২। মরণ সঙ্গীত।

কৃষ্ণপক্ষ চতুর্দ্দশী! গাঢ় মেঘরাশি
রজনীর শান্তস্নিগ্ধ শ্যাম অঙ্গের মিশি
করিয়াছে আরো গাঢ়তর! বেগে বহিতেছে
আর্দ্র বায়ু জলাভূমি হ'তে! শঘনে কাঁপিছে
নিবিড় বনানী, শীত-ভীতা জরা-জীর্ণা
অনাথিনী সম! দূরে—বনপ্রান্তে শীর্ণা
নদী বায়ুর সোহাগ স্পর্শে শত করে,
দৃঢ়তর আলিঙ্গনে বাঁধিতে তাহারে,
বিপ্লাবিয়া দীর্ঘ উপকূল ছুটিয়াছে
উদ্দাম আবেগে।

আজি এই প্রকৃতির ঘোর বিবর্ত্তনে
বসি একা অনন্তের নিভৃত পুলিনে
নাহি জানি প্রাণ কেন উঠিছে আকুলি!
থেকে থেকে স্মৃতি-নভে নৈরাশ্য বিজলী
ঝলসিয়া—আধারিয়া প্রতপ্ত পরাণ
গাঢ় নীলিমার মাঝে লভিছে বিশ্রাম!

আজিকার মত হায় কত শত নিশি
অতিথের ভস্ম-স্তূপে গেছে ধীরে মিশি,
কত সুখ কত দুখ কত ভাঙা গান
কত সাধ কত আশা স্বপন সমান।

যে যাহার চলে গেছে আপনা পাসরি
শুধু সেই স্বপ্ন গুলি আছে মোরে ঘিরি

শ্মশানের সর্ব্ব শেষ চিতাভস্ম সম,
হায় এই শান্তি হীন ভগ্ন দেহ মম।
দুর্ব্বিসহ যাতনা সহিয়া—কতদিনে—
লভিবে অনন্ত শান্তি অনন্ত শয়নে!

শ্রীরামনৃসিংহ বক্সী।—

৩। গান।

(অনুবাদ)

"Full Fathom five thy father lies" etc
Tempest, Act I. Sc. II.

অতি গভীর বারিধি নীরে
পিতা তব শয়ান।
প্রবালভার, অস্থি তার,
মুক্তা তার নয়ান—
ফেলে যা'কিছু গিয়াছে পিছু
হয়নিত' মলিন!
সাগর মাঝে এবে বিরাজে
উজ্জ্বল, নবীন—
অপ্সরাসতী, মৃত্যুগীতি
গাহিছে অনুক্ষণ—
শুন অদূরে ঘণ্টারব
ঢন্ ঢনন্ ঢনন্।

শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী।

৪। প্রেমের সৌরভ!

এক রতি-পরিমাণ মৃগনাভি যদি
কক্ষেতে রাখিলে,
বিংশতি বৎসরকাল সেই কক্ষ মাঝে
সে সুগন্ধ মিলে;
আমার অন্তর-কক্ষে রহিয়াছে যাহা
—প্রেম সুমধুর—
কোটি কোটি জন্ম তাহা আমার বিশ্বাস—
রাখিবে এ হৃদি খানি গন্ধে ভরপুর।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ সমালোচনা।

তুলসীমালা বা হিন্দুধর্ম্মের আলোচনা। শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ এম,এ প্রণীত। এই পুস্তকখানি বিশুদ্ধ মার্জ্জিত ভাষায় সুপ্রণালীক্রমে লিখিত হইয়াছে। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের অভিনব ব্যাখ্যা পাঠ করিতে চান, তাঁহারা এই পুস্তক পাঠ করিয়া প্রীত হইবেন। ধর্ম্ম মতের সমালোচনা প্রদীপের উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং এই পুস্তকের এতদ্‌পেক্ষা বিস্তৃততর সমালোচনা করিতে পারিলাম না।

ভারতবর্ষের ইতিহাস। (বালক বালিকাদের জন্য) শ্রীহেমলতা দেবী কর্ত্তৃক রচিত। আমরা বালক বালিকাদিগের জন্য লিখিত যতগুলি ভারতবর্ষের ইতিহাস দেখিয়াছি, এইখানি তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উদ্দেশোপযোগী বলিয়া বোধ হইল। ইহার ভাষা সহজ, বিষয় নির্ব্বাচনও উত্তম। পূর্ব্বে বিদ্যালয়-পাঠ্য ইতিহাস প্রধানতঃ রাজাদের নামের তালিকা, যুদ্ধের তালিকা, এবং কতকগুলি তারিখের সমষ্টি মাত্র বলিয়া বিবেচিত হইত। ক্রমেই সে ধারণা বিলুপ্ত হইতেছে। ইতিহাসে এখন ভিন্ন ভিন্ন যুদ্ধের সামাজিক আচার ব্যবহার, বাণিজ্য শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, প্রভৃতির উন্নতি বা অবনতি, ধর্ম্ম বিপ্লব, ইত্যাদি সমুদয় বিষয়ের বৃত্তান্ত লিখিতে হয়। এই সকলের মধ্যে যে যে বিষয় বালক বালিকাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইবার সম্ভাবনা, তৎসমুদয়ই লেখিকা এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার লিখিবার প্রণালী এরূপ যে, যে সকল বালক বালিকা ইহা বুঝিতে পারিবে, তাহারা ইহা আগ্রহের সহিত আদ্যন্ত পাঠ করিবে। ইহাতে দুইখানি পরিষ্কার ভারতবর্ষের মানচিত্র আছে। ইহার ছাপা ও কাগজ ভাল। মূল্যও সস্তা।

পুস্তক প্রাপ্তি স্বীকার।

১। জাতীয় উন্নতি ও জাতীয় সাহিত্য। শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। মূল্য ৵০। বেঙ্গল ... লাইব্রেরী কলিকাতা।

২। আরাধনা। শ্রীবিনয়ভূষণ ... শক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র ঘোষ, ভাগলপু...

৩। ললনা মঙ্গল। শ্রী... ষোলঘর ঘোষ ফ্যামিলী ... মূল্য ।৴০।

সম্পাদকের নিবেদন।

প্রদীপের ষষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশিত হইল। এই সময়ের মধ্যে যে পরিমাণ গ্রাহক হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমান সময়ের পক্ষে যথেষ্ট বলিতে হইবে। আমরা অতদূর আশা করিতে পারি নাই। এজন্য আমরা আমাদের লেখক ও গ্রাহক মহোদয়গণকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

"প্রদীপ" যদি সচিত্র কাগজ না হইত, এবং উৎকৃষ্ট পুরু কাগজে পরিষ্কার রূপে মুদ্রিত না হইত, তাহা হইলে, আমরা যত গ্রাহক পাইয়াছি, তাহাতেই হয়ত কোন প্রকারে এক বৎসর কাগজ চালান যাইতে পারিত। কিন্তু "প্রদীপে"র ব্যয় সাধারণ মাসিকপত্র অপেক্ষা অনেক অধিক। এইজন্য ইহার আয়ও অনেক অধিক হওয়া আবশ্যক। "প্রদীপে"র যত পাঠক ও পাঠিকা আছেন, তাঁহারা যদি সকলেই গ্রাহক হন, তাহা হইলে আমরা ইহার অনেক উন্নতি সাধন করিতে পারি। অনেকেই বলিতেছেন, "এত সস্তাদরে এরূপ কাগজ আপনারা চালাইতে পারিবেন না।" কিন্তু যদি আমাদের লেখকগণ বরাবর "প্রদীপ"কে স্নেহের চক্ষে দেখেন এবং যদি ইহার গ্রাহক গ্রাহিকাগণ প্রত্যেকেই নিজ আত্মীয় বন্ধুগণকে ইহার গ্রাহক হইতে অনুরোধ করেন, তাহা হইলে, আমরা কেবল যে ইহার বর্ত্তমান উৎকর্ষ রক্ষা করিতেই সমর্থ হইব, তাহা নয়, ইহার প্রভূত উন্নতি সাধনও করিতে পারিব। আমরা "প্রদীপ"কে যেরূপ ভাল কাগজ করিতে চাই, এখনও ইহা তাহা হইতে অনেক নীচে পড়িয়া রহিয়াছে। বঙ্গদেশে ত বাঙ্গলা পাঠকের সংখ্যা করাই কঠিন। বঙ্গদেশ ছাড়িয়া দিলেও উত্তর ভারতবর্ষে বঙ্গ সাহিত্যানুরাগীর সংখ্যা নিতান্ত কম নয়, এত পাঠকের মধ্যে আমরা কি অন্ততঃ দুই হাজার গ্রাহকও পাইতে পারি না? আমাদের প্রত্যেক গ্রাহক যদি ২ জন আত্মীয় বা বন্ধুকে গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করিয়া দেন, তাহা হইলে অচিরেই আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারি। আমরা লাভের কোন আশা না রাখিয়া "প্রদীপে"র উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি। এখন গ্রাহক ও পাঠকগণ একটুকু অনুগ্রহ করিলেই আমাদের চেষ্টা ফলবতী হয়।

পুনশ্চ,—গ্রাহিকাগণ যেন মনে না করেন, যে আমরা তাঁহাদিগের অনুগ্রহ প্রার্থী নহি। সত্য কথা বলিতে গেলে বাঙ্গলা মাসিক পত্রগুলি বহু পরিমাণে তাঁহাদেরই অনুগ্রহে চলিতেছে। আমরা যে পুনঃ পুনঃ "গ্রাহক গ্রাহিকাগণ" না "গ্রাহকগণ" লিখিয়াছি, তাহা কেবল সংক্ষেপে লিখিবার অনুরোধে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

প্লেগের গোলমালে জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রদীপ বিলম্বে প্রকাশিত হইল। তদনুসারে আষাঢ় মাসের প্রদীপও বিলম্বে প্রকাশিত হইবে। আশা করি গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ আমাদের অবস্থা বুঝিয়া ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। এবং যথাকালে কাগজ না পাইলে ব্যস্ত হইবেন না।

দেহে

প্র... হৃদয় করি...
নিক জ্ঞানোপার্জ্জ...
বিরুদ্ধে তিনি অনেক গু...ঠিবে প...
সমাজে চিন্তার গতি কিয়...

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম্-এ।

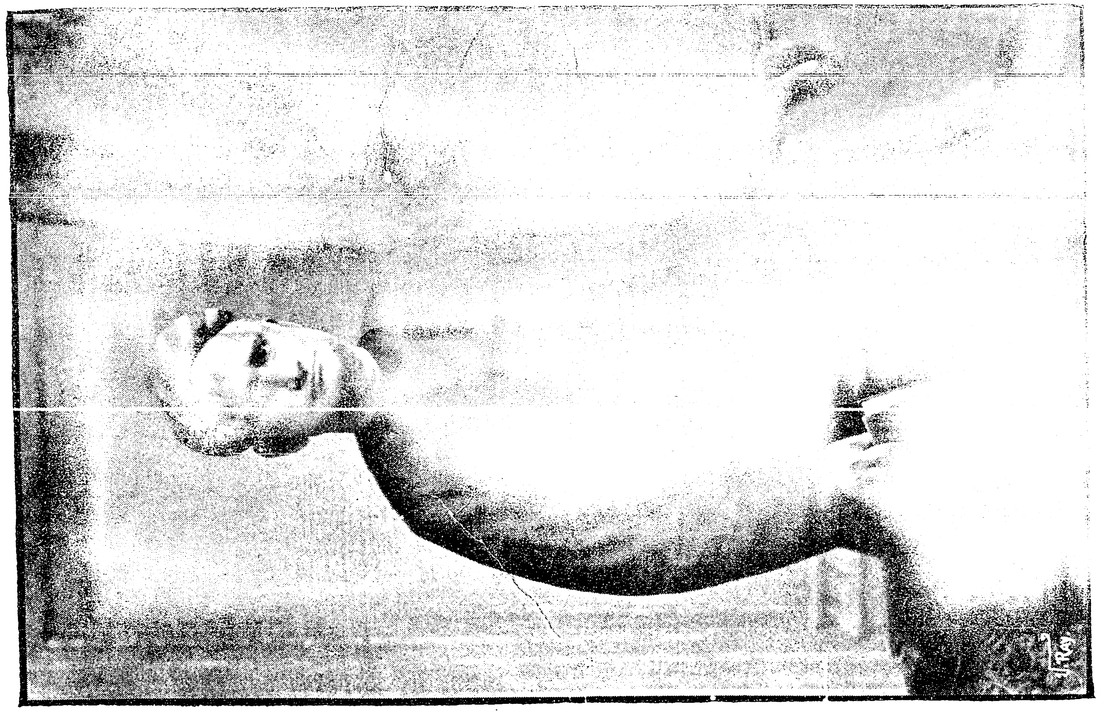

৺ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক নং
শ্রেণী নং
কলিকাতা।

প্রদীপ

প্রথম ভাগ। | আষাঢ়, ১৩০৫। | ৭ম সংখ্যা।

বন্ধুবৎসল বঙ্কিমচন্দ্র।

যখন স্কুল ও কালেজে পড়িতাম, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সংস্কৃতের ব্যবস্থা ছিল না। ঐ সকল পরীক্ষায় বাঙ্গালাই তখন আমাদের "দ্বিতীয় ভাষা" ছিল। তথাপি বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের বড়ই অনাদর ছিল। কেবল যে বড় বড় ইংরাজীওয়ালারা উহার অবজ্ঞা করিতেন তাহা নহে; যাহাদিগকে উহাতে পরীক্ষা দিতে হইত, তাহারাও অবজ্ঞা করিত। তখনকার পণ্ডিত মহাশয়েরা ছাত্রদের ভয়ে জড়সড় হইয়া থাকিতেন। ছাত্রেরা শুধু যে তাঁহাদিগকে মানিত না তাহা নহে, তাঁহাদিগকে লইয়া নানা ক্রীড়া কৌতুক করিত, তাঁহাদিগকে অতিশয় জ্বালাতন করিত। পণ্ডিত মহাশয়ের ঘণ্টাটা হাসি তামাসা গল্প গুজব বকাবকি হাঁকাহাঁকি চেচাচেচির ঘণ্টা ছিল।

বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যের যখন এইরূপ আদর, তখন বঙ্কিম বাবুর নাম প্রথম শুনি। শুনি যে তিনি বাঙ্গালা ভাষায় ইংরাজী ধরণের একখানা উপন্যাস লিখিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষা আমি কখনই ঘৃণা করি নাই, তথাপি ঐকথা শুনিয়া একবার মনে হইয়াছিল, এ আবার কি! এত ইংরাজী পড়িয়া বাঙ্গালায় বই লেখা কেন! কিন্তু ইহা ভিন্ন আর কিছু ভাবি নাই। মনে বঙ্কিম বাবুর সম্বন্ধে অবজ্ঞার ভাব উদয় হয় নাই। ক্রমে শুনিলাম, তিনি ঐ রকম আর একখানা উপন্যাস লিখিয়াছেন। এবার কিন্তু প্রথম বারের মত মনে বিস্ময়ের ভাব একেবারেই জন্মে নাই। বরং বাঙ্গালা ভাষার উপর আস্থা বাড়িয়াছিল। দিন কতক পরে শুনিলাম, বঙ্কিম বাবু আরও একখানা উপন্যাস লিখিয়াছেন। অনেকের মুখে তাঁহার পুস্তকগুলির প্রশংসা শুনিতে লাগিলাম। কাহারও কাহারও মুখে নিন্দাও শুনিলাম। আরও শুনিলাম, কেহ কেহ দুই চারিটা ভাষার ভুল প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রাণান্ত করিতেছেন এবং বঙ্কিম বাবুর বিষম নিন্দা রটনা করিতেছেন। নিন্দা শুনিয়া মনে হইল, বুঝিবা বঙ্কিম বাবুর জন্য কাহারো কাহারো গাত্রদাহ আরম্ভ হইয়াছে। তখন দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী ও কপালকুণ্ডলা কিনিয়া পড়িলাম। দুর্গেশনন্দিনী পড়িয়া মনে হইল, উহা স্কটের আইবানহো পড়িয়া লিখিত। অনেক দিন পরে বঙ্কিম বাবুকে একবার ঐ কথা বলিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন "দুর্গেশনন্দিনী লিখিবার আগে আইবানহো পড়ি নাই" আর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "তুমিই হিন্দুপেট্রিয়টে দুর্গেশনন্দিনীর নিন্দা করিয়াছিলে?" আমি বলিয়াছিলাম "না, হিন্দুপেট্রিয়টে যে সমালোচনা হইয়াছিল তাহা তোমারই কাছে প্রথম শুনিলাম।" তিনি বলিয়াছিলেন "সমালোচনা অন্যায্য হয় নাই এবং পড়িয়া মনে করিয়াছিলাম, উহা তোমারই লেখা—প্রতিকূল হইলেও অমন সমালোচনা পড়িয়া সুখ হয়—সমালোচক জানিতেন না যে তখন আমি আইবানহো পড়ি নাই, তাই নিন্দা করিয়াছিলেন।" তিন খানি উপন্যাস পড়িয়া বুঝিয়াছিলাম যে বঙ্কিম বাবু বাঙ্গালা সাহিত্যে বিপ্লবের সৃষ্টি করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমি তাঁহার কিঞ্চিৎ পক্ষপাতী হইয়া পড়িলাম। তাঁহার বঙ্গদর্শনের গ্রাহক হইলাম। বঙ্গদর্শনে বিষবৃক্ষ প্রকাশিত হয়। কয়েকটী অধ্যায় প্রকাশিত হইলে পর আমাদের দেশের এক শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তি বঙ্গদর্শনের

প্রসঙ্গে অতিশয় ক্রোধ, বিরক্তি ও অবজ্ঞা ব্যঞ্জক স্বরে আমার কাছে বলিয়াছিলেন—'ঐ আবার কুন্দনন্দিনী একটা কি বাহির হইতেছে?' তেমন লোকের মুখে ওরূপ ভাবের কথা শুনিয়া আমার বড়ই মনঃকষ্ট হইয়াছিল—সে মনঃকষ্ট এখনও যায় নাই, বোধ হয় কখনও যাইবেও না। তেমন যশস্বী প্রতিভাশালী পণ্ডিতেও যে বঙ্কিমচন্দ্রকে গুণবান বলিয়া স্বীকার করেন, এরূপ মনঃকষ্ট পাইয়া যদি ইহা বুঝিতে না হইত, তাহা হইলে কত সুখের বিষয় হইত! বঙ্গদর্শন পড়িয়া যাহা বুঝিয়াছিলাম, উহা পড়িবার পূর্ব্বে তাহা বুঝি নাই। বুঝিয়াছিলাম যে বাঙ্গালাভাষায় সকল প্রকার কথাই সুন্দর রূপে কহিতে পারা যায়; আর বুঝিয়াছিলাম, ভাষা বা সাহিত্যের দারিদ্র্যের অর্থ, মানুষের অভাব। বঙ্গদর্শন বলিয়া দিয়াছিল, বঙ্গে মানুষ আসিয়াছে—বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রতিভা প্রবেশ করিয়াছে।

তখনও কিন্তু আমি বঙ্কিম বাবুকে দেখি নাই। না দেখিলে সকলে যাহা করিয়া থাকে আমিও তাহা করিতাম। মনে মনে তাঁহার মূর্ত্তি কল্পনা করিতাম। তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন এমন কেহ কেহ আমাকে বলিতেন, 'বঙ্কিমের চেহারায় বুদ্ধি যেন ফাটিয়া বাহির হইতেছে।' আমিও প্রাণপণে মূর্ত্তি কল্পনা করিতাম। কিন্তু তাঁহাকে যখন দেখিলাম তখন আমার কল্পিত মূর্ত্তি লজ্জায় কোথায় লুকাইয়া পড়িল তাহার ঠিকানা রহিল না। ২২ কি ২৩ বৎসর হইল কলিকাতায় কালেজ রিইউনিয়ন নামে ইংরাজীওয়ালাদের একটা বাৎসরিক উৎসব হইত। সকল কালেজের পুরাতন ও নব্যছাত্রেরা বৎসরে ১ দিন কলিকাতার নিকটস্থ একটা বাগান বাটীতে সমবেত হইয়া পড়াশুনা, কথোপকথন, আলাপ পরিচয়, জলযোগ প্রভৃতি করিতেন। শুনিতাম, এরূপ করিলে দশজনের মধ্যে সদ্ভাব জন্মিয়া একতা স্থাপনের সুবিধা হয়। এখনও শুনি যে এইরূপ সম্মিলনাদি হইতে এইরূপ সুফল লাভ করা যায়। আমি তখনও এ কথা বিশ্বাস করিতাম না, এখনও করি না। মানুষের মতন মানুষ হইলে তাহাদের সম্মিলনে সুফল ফলিতে পারে, নহিলে পারে না। আমরাত মানুষই নহি। তথাপি ঐ কালেজ রিইউনিয়নে যাইতাম। যাইতাম, ওরূপ কিছু মনে করিয়া নয়; যাইতাম—কৃষ্ণ বন্দ্যো, রাজেন্দ্রলাল, প্যারিচরণ, প্যারিচাঁদ, রামশঙ্কর, বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় আমিও একজন কালেজোত্তীর্ণ—আমিও তাঁহাদের সমান, এই শ্লাঘার ভরে। এবং আমার বিশ্বাস যে অনেকেই আমার ন্যায় শ্লাঘার ভরে যাইতেন—সদ্ভাব সৃষ্টির বা বন্ধুত্ব বিস্তারের আকাঙ্ক্ষী হইয়া কেহ যাইতেন না। কিন্তু ও সব কথা এখন থাক। আমি দ্বিতীয় কালেজ রিইউনিয়নের সহকারী সম্পাদক হইয়াছিলাম। সম্পাদক হইয়াছিলেন, রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। সম্পাদক মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মরকতকুঞ্জ নামক প্রসিদ্ধ উদ্যানে সেবারকার উৎসব হয়। অভ্যাগতদিগের অভ্যর্থনা করিতেছি, এমন সময় একটা বিদ্যুৎ সভাগৃহে প্রবেশ করিল। অপরকেও যে প্রকারে অভ্যর্থনা করিতেছিলাম বিদ্যুতকেও সেই প্রকারে অভ্যর্থনা করিলাম বটে। কিন্তু তখনই একটু অস্থির হইয়া পড়িলাম। এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কে? শুনিলাম—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আমি দৌড়িয়া গিয়া বলিলাম—আমি জানিতাম না, আপনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—আর একবার করমর্দ্দন করিতে পাইব কি? সুন্দর হাসি হাসিতে হাসিতে বঙ্কিম বাবু হাত বাড়াইয়া দিলেন। দেখিলাম, হাত উষ্ণ। সে উষ্ণতা এখনও আমার হাতে লাগিয়া আছে। সে হাত পুড়িয়া যায় নাই—আমার হাতের ভিতরেই আছে! যে ভালবাসাইয়া যায়, আগুনে তাহাকে পুড়াইতে পারে না।

সে দিন বঙ্কিম বাবুর সহিত আমার অধিক কথাবার্ত্তা হয় নাই। কিন্তু সন্ধ্যার পর রাজা সৌরীন্দ্রমোহনের [illegible]মান রাগাদি (tableaux vivants) দেখিবার সময় [illegible]কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—আপনি আপনার কোন্ উপন্যাস খানিকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনে করেন? ক্ষণমাত্র চিন্তা না করিয়া, কিছুমাত্র ইতঃস্তত না করিয়া, তিনি বলিয়াছিলেন—'বিষবৃক্ষ'। তখন বোধ হয় চন্দ্রশেখর পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছিল।

ইহার কিছুদিন পরেই এক বিচিত্র ব্যাপারে আমাকে বঙ্কিম বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইয়াছিল। কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতের প্রসিদ্ধ উকিল ৺ কৃষ্ণকিশোর ঘোষ মহাশয়ের উইল সূত্রে হাইকোর্টের সরেনও বিভাগে এক মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। উইল বাঙ্গালায় লিখিত এবং উহার একটী বিধানের অর্থ লইয়া বিবাদ। এক পক্ষের ইচ্ছা, বঙ্কিম বাবু দ্বারা উহার অর্থ করান। বঙ্কিম বাবুকে সম্মত করাইতে আমাকে অনুরোধ করা হয়। বঙ্কিম বাবুর পিতৃবন্ধু, ডায়মণ্ড হারবারের নিকটবর্ত্তী সরিষাগ্রাম নিবাসী এবং ইদানীং কলিকাতা ঝামাপুকুর নিবাসী ৺ রামকুমার বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র আমার ভ্রাতা দুর্গারামকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলাম। তিনি তখন হুগলীর অন্যতম ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট। কাছারি করিতেছিলেন। শামলা মাথায় দিয়া গিয়াছিলাম, কারণ আমি তখন প্রতিদিন বড় আদালতে হাওয়া খাইতে যাইতাম। আমাদিগকে দেখিয়া তিনি চিনিতে পারিলেন না—উকীল মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনারা কোন্ মোকদ্দমায় আসিয়াছেন? আমি বলিলাম, আমরা কোন মোকদ্দমায় আসি নাই। আমার নাম ——। চন্দ্রবাবু!—এই বলিয়া [illegible] ৩ ঘণ্টা দাড়াইয়া মহা সমাদর পূর্ব্বক আমাদিগকে আপন পার্শ্বে বসাইলেন এবং আমাদের অনুরোধ রক্ষা করিবেন বলিলেন। কিন্তু নিজে এমন কষ্টকর অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকার করিয়া আমাদিগকে একটী অতি সুখকর অনুরোধ পালন করিতে স্বীকার করাইলেন—রবিবার তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া আহার করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহে বঙ্কিমচন্দ্রের পার্শ্বে বসিয়া সেই আমার প্রথম আহার। আহার করিলাম—আদর। সকলেই এখন জানেন, বঙ্কিমচন্দ্রের পৈতৃক বাড়ী জেলা ২৪ পরগণার বারাসত মহকুমার অন্তর্গত কাঁটালপাড়া গ্রামে। পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথে গমনাগমন কালে অনেকে সে বাড়ী লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। কতক প্রাচীন ধরণের, কতক নব্য ধরণের অট্টালিকা ঐ রেলপথের পূর্ব্বদিকে নৈহাটী ষ্টেশন হইতে ঐ ষ্টেশনের দক্ষিণ দিকস্থিত প্রথম ফটক পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সদর বাড়ীতে বৃহৎ পূজার দালান ও প্রাঙ্গণ। দুর্গারাম এবং আমি বেলা ৯ ঘণ্টার সময় পৌঁছিয়া দেখিলাম, সেই বৃহৎ প্রাঙ্গণে গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা হইতেছে এবং পূজার দালানের প্রশস্ত রোয়াকে সমস্ত সমবেত শ্রোতৃবর্গের মাথার উপরে আপন মস্তক প্রায় অর্দ্ধহস্ত উত্তোলিত করিয়া এক দীর্ঘকায় বিশালবপু বলিষ্ঠ বৃদ্ধ বসিয়া আছেন। দুর্গারাম বলিলেন, উনিই বঙ্কিম বাবুর পিতা, রায় যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর। আমার মন সম্ভ্রমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বঙ্কিম বাবু এবং তাঁহার সহোদরদিগকে বড় পিতৃভক্ত দেখিয়াছি—সকলেই যেন এই ভাবে ভোর—

'আমাদের বাপ অসাধারণ শক্তি ও মহত্ত্ব স্বরূপ আবির্ভূত হইয়াছিলেন।'

প্রাঙ্গণ বা পূজার দালানে বঙ্কিম বাবুকে দেখিতে না পাইয়া একজন ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কোথায়? ভৃত্য বাহিরের একটী ক্ষুদ্র গৃহ দেখাইয়া দিল। গৃহটী একতোলা, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দিগের শিবের মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে। উহা বঙ্কিম বাবুর নিজের বৈঠকখানা—সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, যেমন আপনি ছিলেন তেমনই। অধ্যয়নের সুবিধার জন্য এবং অপূর্ব্ব লেখা লিখিবার ও বন্ধুদিগের সহিত অকৃত্রিম অ[illegible]মেয় আলাপ করিবার উপযোগী নিভৃততার জন্য ঐ গৃহটী বঙ্কিম বাবুর বড়ই প্রিয় ছিল। উহা এখন সাহিত্যসেবীদিগের পীঠস্থান হইয়াছে। পীঠস্থানের বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ জানিনা। অনেক দিন তথায় যাই নাই। বড় আশা আছে, উহা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয়তম দৌহিত্র দিব্যেন্দ্র সুন্দরের পরম স্থান হইবে।

ঐ ক্ষুদ্র গৃহে গিয়া দেখিলাম, বঙ্কিমচন্দ্র পুস্তক পাঠ করিতেছেন। আমাদিগকে পাইয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'আপনারা যে সত্য সত্যই আসিয়াছেন। আমি মনে করিয়াছিলাম আসিবেন না। রবিবারে উকিলদের বাড়িতে মক্কেলের ভিড় লাগে। মক্কেল পাইলে আপনাদের ত আর কিছুই মনে থাকে না।' কাঁটালপাড়ার বাড়ীতে অনেকবার গিয়াছিলাম। একবারের কথা বলি। নবমী পূজার দিন প্রাতে গেলাম। সঞ্জীব বাবু, বঙ্কিম বাবু প্রভৃতি পূজার দালানে বসিয়া আছেন। দেবীকে প্রণাম করিয়া বসিতে যাইতেছি, বঙ্কিম বাবু বলিলেন—'তা হবে না, রাধানাথকে প্রণাম করিয়া আসিয়া বস।' দেবীর প্রতিমার দক্ষিণ পার্শ্বে সুন্দর বিগ্রহ দেখিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র এই বিগ্রহের কথা কহিতে বড় ভাল বাসিতেন, বলিতেন,—'উনি আমাদের বংশের সর্ব্ব প্রকার মঙ্গল বিধান করেন, সমস্ত দুর্গতি নাশ করেন, আমাদের সকল কথা শুনেন, সব আব্দার রক্ষা করেন, রোগে শোকে বিপদে আমরা উঁহারই মুখ চাহিয়া থাকি, উঁহাকেই ধরি, উনি আমাদিগকে বড় ভালবাসেন। এমন সরল ভাবে এবং ভক্তিভরে রাধানাথের কথা কহিতেন যে শুনিতে শুনিতে আমার চক্ষে জল আসিত। একবার বঙ্কিম বাবুর স্ত্রীর একখানি অলঙ্কার

চাহিয়া পাঠাই। বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছিলেন—'অলঙ্কার খানি এখন পাইবে না; আমার আরোগ্য কামনা করিয়া আমার স্ত্রী উহা রাধানাথের নিকট বন্ধক রাখিয়াছিলেন, এখনও উদ্ধার করা হয় নাই।' শুনিয়াছি, রামকৃষ্ণ পরমহংস বঙ্কিম বাবুর সহিত কিঞ্চিৎ কথোপকথন করিয়া বলিয়াছিলেন—'তোমাতে বুদ্ধি আছে, ভক্তি নাই।' কিন্তু প্রকৃত ভালবাসার ন্যায় প্রকৃত ভক্তিও বড় লুকাইত থাকে না কি?

বঙ্কিম বাবু যে সময়ে কাঁটালপাড়ার বাড়ীতে থাকিয়া হুগলীতে কর্ম্ম করিতেন, সেই সময়ের মধ্যে আমি ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটী লইয়া ঢাকায় যাই। তিনি কিন্তু আমাকে বলিয়াছিলেন—'যাইতেছ যাও, কিন্তু ও কাজে থাকিতে পারিবে না।' আমিও ছয় মাস মাত্র ডিপুটীগিরি করিয়া উহাতে ইস্তফা দিয়া আসি। তাহার দিন কতক পরে বঙ্কিম বাবু হুগলীতে বাসা করেন। দুইটী বাড়ী ভাড়া করিয়াছিলেন। যোড়াঘাটের ঠিক দক্ষিণ পার্শ্বের বাড়ীতে তাঁহার বৈঠকখানা এবং বৈটকখানার দক্ষিণে দুই খানা বাড়ীর পর একটী বাড়ী তাঁহার অন্দর ছিল। অন্দর বাটীর পূর্ব্বাংশের চাতালটী স্তম্ভোপরি নির্ম্মিত; উহার নীচে দিয়া গঙ্গার স্রোত প্রবাহিত হইতে দেখিয়াছি। ঐ চাতালে দাঁড়াইয়া বঙ্কিম বাবু একদিন বলিয়াছিলেন—'সন্ধ্যার পর আমরা এইখানে বসিয়া থাকি।' বুঝিয়াছিলাম, নিশীথে আপনার গুলিকে লইয়া ভাগীরথী ভোগ করেন। তিনি স্রোতস্বিনীর শোভা দেখিতে বড় বাসিতেন। বৈঠকখানা বাড়ীতে তিনটী ঘর ছিল, তন্মধ্যে মাঝের ঘরটী সর্ব্বাপেক্ষা বড়। সেই ঘরে গঙ্গার দিকের একটী বাতায়নের পার্শ্বে এক খানি ইজি চেয়ারে বসিতেন। কথা কহিতেন আর গঙ্গা দেখিতেন। গঙ্গা দেখিয়া দেখিয়া তাঁহার ক্লান্তি বা বিরক্তি হইত না। আমি প্রায় প্রতি শনিবার সেখানে যাইতাম। কোন শনিবার না গেলে তাঁহার বড় কষ্ট হইত। আমি প্রায়ই নৈহাটী দিয়া যাইতাম। নৌকায় আমাকে দেখিতে পাইবা মাত্র ঘাটের নিকটস্থ জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেন। একবার ঘাটে নৌকা পৌঁছিবা মাত্র আমি নামিলাম না দেখিয়া, বলিলেন—'এস।' আমি বলিলাম—'যাব কি না তাই ভাব্‌ছি।' যাইবামাত্র হাসি আর আলিঙ্গন। সে কথা আর কি বলিব!

বঙ্কিম বাবুর খাওয়াইবার বন্দোবস্ত বড় চমৎকার ছিল। আদরের খাওয়া ভিন্ন কখনও তাঁহার কাছে খাই নাই। যখনই গিয়াছি দুই এক দণ্ড পরেই নানা সামগ্রী প্রস্তুত দেখিয়াছি। যখনই আসিতে চাহিয়াছি, তখনই নানা সামগ্রী খাইয়া আসিয়াছি। ভাবিতাম, এ সব কি মন্ত্রে প্রস্তুত হয়। শীঘ্রই বুঝিতে পারিয়াছিলাম, মন্ত্রেই প্রস্তুত হয়, আর তাঁহার পত্নীই সেই মন্ত্র। আমি ত অনেকবার গিয়া অনেক দেখিয়াছিলাম। আমার ঋষিতুল্য বন্ধু, রামায়ণের বিখ্যাত অনুবাদক হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন একবার মাত্র আমার সঙ্গে গিয়া বলিয়াছিলেন,—'বাঃ বঙ্কিম বাবু কি বন্ধুবৎসল!' [illegible] সন্ধ্যার কিছু পরে পৌঁছিয়া শুনিলাম, তাঁহার জ্বর হইয়াছে, [illegible] অন্দরে শুইয়া আছেন। কিন্তু সংবাদ পাইবা মাত্র উঠিয়া আসিলেন, আসিয়া নানা কথা কহিলেন, আমি যতক্ষণ আহার করিলাম ততক্ষণ আমার কাছে উপবিষ্ট রহিলে, যেন কোন অসুখই হয় নাই, যেন দেহে ও মনে স্ফূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই নাই।

বঙ্কিম বাবু সাহিত্যানুরাগীদিগের সহিত আলাপ করিতেই ভাল বাসিতেন—আলাপ করিলেই ভাল থাকিতেন। সাহিত্য ও সাহিত্যানুরাগীর সংসর্গ তাঁহার যেন প্রাণবায়ু ছিল। সে সংসর্গ না পাইলে তিনি তিষ্ঠিতে পারিতেন না, সে সংসর্গ পাইলে তাঁহার প্রাণ যেন ফুলিয়া উঠিত। যেবার হেমচন্দ্রকে লইয়া যাই সেবার গিয়া দেখি, মহামহোপাধ্যায় তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় আসিয়াছেন। শীতকাল। সন্ধ্যা আগতপ্রায়। শীঘ্রই টেবিলের উপর দীপ জ্বলিতে লাগিল। সকলে টেবিল বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন। অতুল রূপ, সুন্দর অঙ্গসৌষ্ঠব, অপূর্ব্ব কমনীয়তা মিশ্রিত অসীম প্রতাপ ও পুরুষকার ব্যঞ্জক মুখগৌরব লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র যেন সম্রাটের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার অন্তরে কি আনন্দ! হেমচন্দ্র উপস্থিত—অগ্রে রামায়ণ ও মহাভারতের কথা আরম্ভ হইল। সেই কথা হইতে আরও কত কথা আসিল। বঙ্কিমচন্দ্রের কি স্ফূর্ত্তি! স্ফূর্ত্তিতে এই কথা ফুটিতে লাগিল—ইহাই ত সুখ, ইহাই ত জীবন, এই রকমই ত চাই।

সাহিত্যের সংস্রব মাত্রেই বঙ্কিমচন্দ্র সুখী হইতেন। বউবাজার ষ্ট্রীটের যে বাড়ীর সন্মুখের খণ্ডে এক্ষণে মুখুজী কোম্পানির হোমিওপেথিক ঔষধের দোকান দেখিতে

পাওয়া যায় দিন কতক তিনি সেই বাড়ীতে ছিলেন। একটা শনিবার আপিস হইতে বেলা ৩টা কি ৪টার সময় তথায় গিয়া দেখি, অসুস্থতার জন্য তিনি মেজের উপর শয্যায় শুইয়া আছেন আর দুই খানা কেদারায় দুইটী যুবক বসিয়া আছেন। একটী যুবককে আমি চিনিতাম। তিনি একখানি ক্ষুদ্র কবিতাপুস্তক লিখিয়া বঙ্কিম বাবুকে উপহার দিতে গিয়াছিলেন। আমি যাইবার দুই চারি মিনিট পরেই যুবক দুইটী চলিয়া গেলেন। তখন তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছু মাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না দেখিয়া, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—ইঁহারা কতক্ষণ ছিলেন? তিনি বলিলেন—'২।৩ ঘণ্টা হইবে।' সাহিত্যের সংস্রব ছিল বলিয়াই বঙ্কিম বাবু অত ছোট বালক দুইটীকে লইয়া অতক্ষণ তেমন স্থির ধীর প্রফুল্ল ভাবে থাকিতে পারিয়াছিলেন। বুঝিয়াছিলাম, বালকদ্বয় তাঁহার নিকট উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। মাতৃভাষায় লিখিতে, বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিতে তিনি অনেককে উৎসাহিত করিতেন। আমি কখনই বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য ঘৃণা করি নাই। তখন চারি দিকে মাতৃ ভাষার নিন্দা শুনিতাম, স্কুলেও উহা ভাল করিয়া শেখান হইত না। কিন্তু আমি লুকাইয়া বাঙ্গালায় প্রবন্ধ লিখিতাম। লিখিয়া লুকাইয়া রাখিতাম, কাহাকেও দেখাইতাম না। অনেক দিন প্রকাশ্যে বাঙ্গালা লিখিতে সাহস করি নাই। বঙ্কিম বাবু যখন যোড়াঘাটের বাড়ীতে ছিলেন, তখন বাঙ্গালা লিখিবার জন্য আমাকে বড়ই পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন। আমি বলিয়াছিলাম—'ভয় করে, বানান ভুল করিয়া হাস্যাস্পদ হব?' তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন—'বঙ্গদর্শন প্রেসে একজন পণ্ডিত আছেন, তিনি বানান ঠিক করিয়া দেন।' বঙ্কিম বাবুর যোড়াঘাটের বাড়ীতে আমি হরপ্রসাদকে প্রথম বন্ধু স্বরূপ পাই। হরপ্রসাদের বাড়ী নৈহাটীতে। তিনি সর্ব্বদাই গঙ্গা পার হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের বাসায় যাইতেন। তাঁহাকে বঙ্কিমচন্দ্রের পরম ভক্ত দেখিতাম, বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন, তাঁহার বুদ্ধি ও বিদ্যার প্রশংসা করিতেন এবং তাঁহাকে বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবায় উৎসাহিত ও নিয়োজিত করিতেন।

আলিপুরে বদলী হইলে বঙ্কিম বাবু কলিকাতায় বাসা করিয়াছিলেন। তখন প্রত্যেক ছুটীর দিন বৈকালে ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং আমি তাঁহার বাড়ীতে যাইতাম। নানা শাস্ত্রজ্ঞ, গম্ভীর প্রকৃতি, বালকবৎ সরলতাশোভিত রাজকৃষ্ণকে বঙ্কিম বাবু যেমন ভালবাসিতেন, তেমনি ভক্তি করিতেন। রাজকৃষ্ণের মৃত্যুর দিন বঙ্কিমচন্দ্র বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কলিকাতার বাসায় তাঁহার আরও কয়েকটী বন্ধু বড় অনুরাগ ভরে আসিতেন—অক্ষয়চন্দ্র কলিকাতায় থাকিলে, তিনি; তারাকুমার কবিরত্ন; বঙ্কিমের সহধ্যায়ী বলাইচাঁদ দত্ত; কবি হেমচন্দ্র, কোমৎমতাবলম্বী যোগেন্দ্রচন্দ্র। আর সেখানে সদাই থাকিতেন, বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যম দাদা সঞ্জীবচন্দ্র। বঙ্কিম বাবুর প্রতিভা ও হৃদয়ের মোহিণী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া আমরা তাঁহার কাছে যাইতাম। গিয়া বড় আদর পাইতাম। বউবাজার ষ্ট্রীটের যে বাড়ীর কথা উপরে বলিয়াছি, এক দিন বৈকালে সেই বাড়ীতে গেলাম। বঙ্কিম বাবু আনন্দমঠের পাণ্ডুলিপি পড়িয়া শুনাইতে আরম্ভ করিলেন। একটা জায়গা খুব ভাল লাগিতে লাগিল। ইচ্ছা হইল, হুঁকার নলটা হাতে করিয়া বসি। বলিলাম, 'এমন সময়ে একজন চাকরকেও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।' বঙ্কিমচন্দ্র তৎক্ষণাৎ পড়া বন্ধ করিয়া উঠিয়া গেলেন। মনে করিলাম, ধমকধামক করিতে গেলেন। কিন্তু সে সব কিছু শুনিলাম না। পাঁচ সাত মিনিট পরে আপনি তামাক সাজিয়া কলিকায় ফু দিতে দিতে আসিয়া বলিলেন—'খাও।' আমি বলিলাম, 'প্রসাদ পাইব।' তিনি তামাক খাইতে বড় ভালবাসিতেন, কিন্তু খুব মিঠে তামাক খাইতেন। তাঁহার মেজ দাদাও তাই। কিন্তু তাঁহাদের তামাক খাওয়া ফুরাইয়াছে। এখন কেবল তাঁহাদের কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্র খাইতেছেন—তাঁহাদেরই ন্যায় মিটাইয়া মিটাইয়া, তাঁহাদেরই ন্যায় মিঠে তামাক খাইতেছেন। খান, বিধাতার কৃপায় কিছুকাল ধরিয়া খান। এখন তিনি ভিন্ন ত্রিভুবনে এমন আর কেহ নাই, যাঁহাকে দেখিলে বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখা হয়!

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু।

সমরু।

(১)

পলাশী যুদ্ধের পর হতভাগ্য সিরাজের নির্দ্দয় হত্যা-কাণ্ড সম্পাদিত হইলে, ইংরাজ বঙ্গরাজ্যে স্বীয় ক্ষমতা বদ্ধমূল করিতে প্রয়াসী হন। সিরাজের পরবর্ত্তী নবাবগণ ইংরাজকে প্রধান সহায় মনে করিলেও তাঁহাদের এই ক্ষমতাবিস্তারে আপনাদিগের অশুভ পরিণাম ভাবিয়া শঙ্কিত হইয়াছিলেন। বৃদ্ধ নবাব মীর জাফর রাজ্যপ্রাপ্তির পর হইতেই ইংরাজদিগের মনোভাব উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মীরণ ইংরাজহস্ত হইতে আপনাদিগের উদ্ধার সাধনের জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা প্রকৃত কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই অকস্মাৎ তাঁহার জীবনবায়ুর অবসান হইয়া যায়। বজ্রাঘাতেই হউক, অথবা অন্য যে কোন আঘাতে হউক, মীরণ চিরদিনের জন্য ইহজগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। মীর জাফর তখনও বাঙ্গলার মসনদে আসীন, কিন্তু ইংরাজ দিন দিনই তাঁহার প্রতি অসন্তোষভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অবশেষে এই সিদ্ধান্ত হইল যে, মীর জাফরকে নামমাত্র নবাব রাখিয়া তাঁহার জামাতা মীর কাসেমের প্রতি বঙ্গরাজ্যের শাসনভার অর্পণ করা হউক। মীর জাফর তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন ইংরাজ মীর কাসেমের নিকট পণ্যদ্রব্যের ন্যায় বঙ্গসিংহাসন বিক্রয় করিয়া মীর জাফরকে বলপূর্ব্বক অপসারিত করিলেন। এইরূপ ক্রয়বিক্রয়ে যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিল। অল্প দিনের মধ্যে ইংরাজ ও মীর কাসেমের মধ্যে বিষম গোলযোগ বাধিয়া গেল। উভয়ের অসন্তোষ দিন দিন বর্দ্ধিত হইলে, ইংরাজ মীর কাসেমকে সিংহাসনচ্যুত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন, মীর কাসেমও ইংরাজদিগকে বঙ্গদেশ হইতে চিরনির্ব্বাসিত করিবার ইচ্ছা করিলেন।

সিরাজ উদ্দৌলার শোচনীয় পরিণামের কথা মীর কাসেম সর্ব্বদাই চিন্তা করিতেন এবং যাহারা ইংরাজের পক্ষ হইয়া সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। যাহাতে ইংরাজের উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারেন, সে বিষয়েও তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল। মীর কাসেম মুর্শিদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে রাজধানী লইয়া যান। মুঙ্গের দুর্গ চিরকাল সুদৃঢ় বলিয়া প্রসিদ্ধ, এবং ইংরাজদিগের প্রধান আবাসস্থান হইতে দূরে অবস্থিত, সেইজন্য তিনি মুঙ্গেরে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করেন। তথায় তিনি কামান, বন্দুক, গোলাগুলি প্রভৃতির কারখানা স্থাপন করিয়া, ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিরাট আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সৈন্য সকল ইউরোপীয় সামরিক প্রথায় শিক্ষিত হইত এবং তজ্জন্য ইউরোপীয় কর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত হইয়াছিল। সেই সমস্ত শিক্ষিত সৈন্য ইংরাজদিগের সমকক্ষ হইয়াই উঠে। যে সমস্ত ইউরোপীয় নবাব মীর কাসেমের সৈন্যদিগকে শিক্ষা প্রদান করিত, তাহাদের মধ্যে সমরু নামে একজন জার্ম্মান বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিল। সেই সমরুর একটা বিবরণ প্রদান করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

জার্ম্মান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত আলসাস প্রদেশের ষ্ট্রাসবুর্গ নগরে সমরুর জন্ম হয়। ইহার প্রকৃত নাম ওয়াল্টার রেনহার্ড। কাহারও কাহারও মতে রেনহার্ড সূত্রধরের ব্যবসায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, এবং তাহাই উপলক্ষ করিয়া ভারতবর্ষে আগমন করে। * আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, রেনহার্ড ষ্ট্রাসবুর্গে কয়েক বৎসর কসাইএর কার্য্য করিয়াছিল, পরে কাপ্তেন জেগ্‌লারের অধীনস্থ একদল সুইস্ পদাতিকের সহিত ভারতবর্ষে উপস্থিত হয়। † জেগ্‌লার বোম্বাই ইউরোপীয় সেনাদলের সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন। তাঁহার উক্ত সংস্রব বিচ্ছিন্ন হইলে রেনহার্ড বাঙ্গলায় উপস্থিত হয় এবং চন্দননগরে ফরাসী সৈন্যদলে প্রবেশ লাভ করে। ১৭৫৪ অথবা ৫৫ সালে তাহার ভারতবর্ষে আগমন করা সিদ্ধান্ত হয়। রেনহার্ডের অবস্থা তাদৃশ উত্তম না হইলেও তাহার কতকগুলি গুণের জন্য সে লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিত। প্রখর বুদ্ধি, অপরিমিত সাহস, অমানুষী কষ্টসহিষ্ণুতা এবং অটল অধ্যবসায় তাহার নিজ সহচররূপে তাহাতে বিরাজ করিত, এবং সেইজন্য সে শীঘ্র শীঘ্র উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হয়। রেনহার্ড প্রথমতঃ সর্ব্বদাই বিষণ্ণভাবে অবস্থিতি করিত। তাহার সেই গম্ভীর মলিন মুখশ্রী দেখিয়া তাহার সঙ্গী সৈন্যসকল তাহাকে sombre বা বিষাদী বলিয়া অভিহিত করিত। উক্ত sombre হইতে তাহার নাম

* Malleson. † Broome's Bengal Army. P. 353.

sumroo সমরুতে পরিণত হয়। ক্রমে তাহার প্রকৃত নাম রেনহার্ডের লোপ হইয়া সে সমরু নামেই পরিচিত হইয়া উঠে। ইতিহাসে সে সমরু নামেই উল্লিখিত হইয়া আসিতেছে। সেইজন্য আমরাও তাহাকে সেই নামেই নির্দ্দেশ করিব।

১৭৫৭ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে, নবাব সিরাজউদ্দৌলার সহিত ইংরাজদিগের যে সন্ধি স্থাপিত হয়, তাহাতে এরূপ একটা সর্ত্ত ছিল, যদ্দ্বারা ইংরাজেরা নবাবের রাজ্যে শান্তিভঙ্গ করিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার করেন। কিন্তু তাহার অল্প দিন পরেই নবাবের সহস্র নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহারা ফরাসীদিগের চন্দননগর দখল করিয়া বসিলেন। চন্দননগর আক্রমণে ইংরাজহস্তে ফরাসীদিগের অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। ফরাসীদিগের সৈন্য সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যে যেখানে পাইল আশ্রয় লইতে আরম্ভ করিল। সমরুও সেই সময়ে উক্ত দলে অন্তর্ভূত ছিল। সেও চন্দননগর পরিত্যাগ করিয়া আশ্রয় অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। প্রথমতঃ সে কিছুকালের জন্য ঢাকায় একটা সৈনিক দলে প্রবিষ্ট হয়, পরে তথা হইতে ১৭৬০ খৃঃ অব্দে পূর্ণিয়ার নবাব খাদেম হোসেন খাঁর সৈন্যদলে প্রবেশ লাভ করে। পূর্ণিয়ায় অবস্থান কালে তাহার কার্য্যদক্ষতার কথা চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। ক্রমে সেকথা নবাব মীরকাসেমের কর্ণগোচর হইলে তিনি তাহাকে নিজের সৈনিক বিভাগে নিযুক্ত করেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মীর কাসেম স্বীয় সৈন্যদিগকে ইউরোপীয় প্রথায় শিক্ষিত করিবার জন্য বিশেষরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই জন্য তিনি কতিপয় ইউরোপীয় ও আর্ম্মেনীয়ের প্রতি সৈন্যগণের শিক্ষার ভার প্রদান করেন। তাহারা প্রধানতঃ গোলন্দাজ সৈন্যগণের নেতৃত্ব গ্রহণ করিত, কিন্তু অন্যান্য সৈনিক বিভাগও তাহাদের শিক্ষা প্রণালী অনুসারে অনেক সময়ে কার্য্য করিত। যে সমস্ত ইউরোপীয় শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে সমরু একজন প্রধান। নবাব মীর কাসেম সমরুকে যার পর নাই স্নেহ করিতেন। তাঁহার উৎসাহ পাইয়া দিন দিন সে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। এই সমস্ত দক্ষ লোকের নিকট শিক্ষিত হইয়া মীর কাসেমের সৈন্যেরা অল্প দিনের মধ্যে ইংরাজদিগের সমপক্ষ হইয়া উঠিল। কিরূপ ভাবে তাঁহার সৈনিক বিভাগ গঠিত হইয়াছিল আমরা এস্থলে তাহার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতেছি।

মীরকাসেমের অশ্বারোহী সৈন্যগণ ইউরোপীয় রেজিমেণ্টের প্রথায় কতকগুলি দলের উপর এক এক জন সেনাধ্যক্ষের নেতৃত্বে বিভক্ত হইত। তদ্ব্যতীত দেশীয় রেশেলা প্রথাও ছিল। অর্থাৎ এক এক জন রেশালাদার বা আজ্ঞাকর্ত্তার অধীনে একেবারে কতকগুলি সৈন্য নিযুক্ত থাকিত, তাহারা আর ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইত না। কিন্তু রেজিমেণ্টে তাহারা দলে দলে বিভক্ত হইত। দক্ষ ও উপযুক্ত লোক ব্যতীত কাহাকেও অশ্বারোহী বিভাগে লওয়া হইত না, এবং সৈন্যগণের অশ্বারোহণের প্রতিও বিশেষরূপ মনোযোগ দেওয়া হইত। এই সমস্ত সৈন্য যে রীতিমত স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইত এমন নহে, তাহারা কতকটা কোম্পানীর অস্থায়ী (Irregular) সৈন্যদের ন্যায়ই ছিল। ইহাদের বেতনও নিতান্ত অল্প ছিল না। আফগান, রোহিলা প্রভৃতি উত্তর দেশীয় বীর মুসলমান জাতি লইয়া অশ্বারোহী সৈন্য বিভাগ সাধারণতঃ গঠিত হইত, এবং মুসলমান সেনাধ্যক্ষগণই তাহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতেন। যদিও প্রায় ১৬ হাজার সৈন্য মাত্র অশ্বারোহী দলভুক্ত ছিল, তথাপি তাহাদের কার্য্যকারিতা সংখ্যার লঘুতাকে গণনার মধ্যেই আনিত না।

পদাতিক সৈন্য সকল অনেক পরিমাণে ইংরাজদিগের সিপাহী ব্যূহের (Battalion) আদর্শে গঠিত হইত, অর্থাৎ পাঁচশত হইতে আটশত পর্য্যন্ত সৈন্য লইয়া এক একটা দলের গঠন হইত। তাহাদের মধ্যে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর সৈন্য দেখা যাইত। এক শ্রেণীকে নজীব ও অপর শ্রেণীকে তেলিঙ্গা কহিত। নজীব সৈন্য সকল দেশীয় পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া বন্দুক হস্তে সজ্জিত থাকিত। তাহারা স্থায়ী ভাবেই নিযুক্ত হইত। তাহাদিগকে এক এক রেজিমেণ্ট বা দলে বিভক্ত করা হইত। উপযুক্ত কর্ম্মচারীসকল তাহাদের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিতেন। তেলিঙ্গা সৈন্যগণ রীতিমত সিপাহী ব্যূহের অনুকরণে গঠিত হইত। তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদাদি ইউরোপীয়গণের ন্যায় ছিল। কার্য্যদক্ষতায় তাহারা বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করে। ইহারাও বন্দুক ব্যবহার করিত। এই সমস্ত বন্দুক নবাব মীর কাসেমের মুঙ্গের প্রভৃতি কারখানায় নির্ম্মিত হইত। তাহারা

বিলাতী বন্দুক অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিল না, বরঞ্চ উৎকৃষ্টই ছিল। বিশেষতঃ তাহাদের নল বা চোঙ্গগুলি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া কথিত হইত।* ধাতু চকমকি প্রভৃতি বন্দুক নির্ম্মাণের উপাদানগুলি যতদূর উত্তম হইতে পারে তাহাই প্রদত্ত হইত। চকমকি সকল সাধারণতঃ রাজমহল পর্ব্বত শ্রেণী হইতে সংগৃহীত হইয়া আসিত।

গোলন্দাজ সৈনিক বিভাগও ঐ প্রকার ইউরোপীয় আদর্শে গঠিত হইত। উক্ত বিভাগে যে সকল কামান ব্যবহৃত হইত, সে গুলি সাধারণতঃ পিত্তলনির্ম্মিত ছিল। তাহাদের অধিকাংশই এদেশে নির্ম্মিত হইত। কোন কোন পিত্তলনির্ম্মিত কামান ও লৌহনির্ম্মিত কামান সকল ভিন্ন ভিন্ন ইউরোপীয় জাতির নিকট হইতে ক্রয় করা হইত। যাহারা সামরিক বা গুপ্ত বাণিজ্য কার্য্যে লিপ্ত থাকিত, তাহারাই এই সকল কামানের আমদানী করিত, যদিও এরূপ ব্যবসায় ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ অননুমোদিত ছিল। কামানবাহী শকটগুলি, এদেশেই নির্ম্মিত হইত। উত্তম শ্রেণীর বারুদ ব্যবহারেরই নিয়ম ছিল। গোলাগুলির কতকাংশ এদেশে নির্ম্মিত হইত, এবং কতকবা বিদেশ হইতে আসিত। এই সমস্ত সামরিক উপকরণ নির্ম্মাণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কারখানা ও ভাণ্ডার গৃহ স্থাপিত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে মুঙ্গেরই সর্ব্বপ্রধান। গোলন্দাজ সৈন্যগণ সাধারণতঃ ইউরোপীয় ও আর্ম্মেনীদিগের তত্ত্বাবধানে থাকিত।

যিনি মীর কাসেমের প্রধান সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি একজন আর্ম্মানী, তাঁহার নাম গর্গিন খাঁ। গর্গিনের প্রকৃত নাম খাজা গ্রেগোর বা সারকোর, কিন্তু ইতিহাসে তিনি গর্গিন খাঁ বলিয়াই প্রসিদ্ধ। গর্গিন কলিকাতানিবাসী খাজা পিক্রস নামে আরমানী সওদাগরের ভ্রাতা। খাজা পিক্রসের সাহায্যে গর্গিন খাঁ অনেক ইউরোপের নির্ম্মিত সামরিক উপকরণ আনাইতেন। গর্গিন অবশেষে নবাবের নিকট বিশ্বাসঘাতকার পরিচয় প্রদান করেন। খাজা পিক্রসই তাহার কারণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। আমরা পরে সে বিষয়ের উল্লেখ করিব।

* The reader will be surprised to learn, that they were found to be superior to those of English manufacture, particularly in the barrels. (Broome's Bengal Army, P. 351.)

মার্কার নামে আর একজন দক্ষ আরমানী অশ্বারোহী, পদাতিক ও গোলন্দাজ সৈন্যের ভিন্ন ভিন্ন দলে গঠিত একটী বাহিনীর (Brigade) তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন। আরাটুন নামে আর এক জন আরমানীরও উল্লেখ দেখা যায়। যে সমস্ত ইউরোপীয় মীর কাসেমের সৈন্যদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করে, তন্মধ্যে সমরুই প্রধান ছিল, ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। সমরুও একটী বাহিনীর (Brigade) নেতৃত্ব গ্রহণ করে। তাহার অধীনে চারি ব্যূহ (Battalion) পদাতি, এক রেজিমেণ্ট অশ্বারোহী ও এক দল গোলন্দাজ সৈন্য অবস্থিতি করিত, এবং যুদ্ধকালে ইহারা এরূপ দক্ষতা প্রকাশ করিত যে, অনেক সময়ে বিপক্ষ পক্ষকে বিস্ময়ান্বিত হইতে হইত। সমরু নিজেই তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করিয়া তুলিয়াছিল। অন্যান্য অনেক বিদেশীয় নিম্ন কর্ম্মচারীর কার্য্য করিত। কোন কোন বিদেশী স্থায়ী দেশীয় রেজিমেণ্ট-অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত হইত, এবং কেহ বা তাহাদের শিক্ষা কার্য্যের ভার গ্রহণ করিত। কিন্তু গোলন্দাজ সৈন্যগণের নেতৃত্ব কেবল ইউরোপীয়দিগেরই প্রতি অর্পিত হইত। ইহাদের অধিকাংশ ফরাসী, জর্ম্মান, পর্টুগীজ, আরমানী ও নেপালী। তাহাদের সংখ্যা ২।৩ শতের কম নহে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে ইহাদের মধ্যে কতকগুলি কোম্পানীর সৈনিক বিভাগ পরিত্যাগ করিয়া মীর কাসেমের পক্ষে যোগ দান করে। * নবাবের অধীনে যে সমস্ত দেশীয় সেনাধ্যক্ষ ছিলেন, তাঁহারাও কোন অংশে ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। ইহাদের মধ্যে মহম্মদ তকী খাঁ, নজফ খাঁ, আসদ উল্লা, নাশীর খাঁ, বদর উদ্দীন, সের আলি, হেম্মত খাঁ, মেহেদী খাঁ প্রভৃতি কয়েক জনের নাম উল্লেখযোগ্য। নবাব এই সকল কর্ম্মচারীকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন। এই প্রকার সুদক্ষ কর্ম্মচারিগণের তত্ত্বাবধানে নবাবসৈন্যগণ দিন দিন ইংরাজদিগের আশঙ্কার কারণ হইয়া উঠিতে লাগিল। ইহার মধ্যে সমরুর অধীনস্থ সৈন্যগণ অত্যন্ত সুশিক্ষিত বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। যুদ্ধবিদ্যায় ও সামরিক শিক্ষাদানে সমরুর বিশেষরূপ পারদর্শিতা প্রকাশ। নবাব মীর কাসেম তাহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, এবং

* Broome P. 353. Broome

অনেক বিষয়ে তাহার পরামর্শ গ্রহণ করাও হইত। সমরু যদিও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিল, কিন্তু তাহার প্রকৃতি তাদৃশ উচ্চ না হওয়ায় নবাব তাহার পরামর্শে অনেক কঠোর কার্য্যের অবতারণা করিয়াছিলেন। কতকগুলি কারণে নবাব ও ইংরাজদের মধ্যে গুরুতর বিবাদ উপস্থিত হয়। সেই বিবাদের ফল পরিণামে বড়ই ভয়াবহ হইয়া উঠে। বারান্তরে আমরা তাহার উল্লেখ করিয়া সমরুর সহিত তাহার কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, দেখাইতে চেষ্টা করিব।

শ্রীনিখিলনাথ রায়, বি, এল।

"চৈতালি"-সমালোচনা সম্বন্ধে বক্তব্য।

ডিসেম্বর মাসের 'দাসীতে' আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের 'রবীন্দ্র বাবুর চৈতালি' শীর্ষক যে সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমার যৎকিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে; সংক্ষেপে তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

আরম্ভেই বলিয়া রাখা ভাল যে, রবীন্দ্র বাবুর সকল কবিতাগুলিই যে সম্পূর্ণরূপে দোষহীন এবং তাহা হইতে কোথাও কিছু উৎকৃষ্ট হইতে পারে না, এমন আমার এবং সম্ভবতঃ রবীন্দ্র বাবুর অন্যান্য ভক্তেরও বিশ্বাস নহে। কারণ মনুষ্যকৃত সমস্ত কার্য্যেই গুণের সঙ্গে ন্যূনাধিক পরিমাণে দোষও অবশ্যই মিশ্রিত থাকিবে। তবে রবীন্দ্র বাবুর কাব্যে যে দোষগুলি বর্ত্তমান আছে, তাহা পূজনীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবুর কথায় বলিতে গেলে, রবিমণ্ডলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষ্ণচিহ্নগুলির সহিতই উপমেয়। ঐ চিহ্নগুলি রবির অতুলনীয় তেজঃ ও প্রভার কোন ক্ষতি করে না এবং বিচক্ষণ জ্যোতির্ব্বিদগণও বিশেষ কৌশলে নির্ম্মিত যন্ত্রাদির সাহায্য ব্যতিরেকে তাহাদের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন না। রবিলাঞ্ছনগুলি আবিষ্কার করিবার জন্য অধিক আয়াস স্বীকার না করিয়া, যাহারা রবির নির্ম্মলোজ্জ্বল আলোক দেখিতে পায় না, তাহাদের চক্ষুরুন্মীলনের জন্য চেষ্টা করা সমালোচকের কর্ত্তব্য। একটা কাব্যের মধ্যে যেটুকু শিক্ষা ও সৌন্দর্য্য আছে, মানবহৃদয়ের আশা ও আকাঙ্ক্ষা, বেদনা ও ব্যাকুলতা পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহাই বিশেষরূপে পাঠকদের মনে মুদ্রিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিলেই, সমালোচকগণ দেশের ও সাহিত্যের যথেষ্ট উপকার সাধন করিতে পারেন।

রবীন্দ্র বাবু কি মনে করিয়া 'সোণারতরী' লিখিয়াছেন, সেই প্রশ্নের আলোচনা লইয়া প্রবন্ধ আরম্ভ হইয়াছে। 'সাহিত্য'-সেবকগণ বিশেষ নৈপুণ্য সহকারে 'সোণারতরী'র যে তিন প্রকার ব্যাখ্যা অনুমান করিয়াছিলেন, তাহার কোনও একটা স্বয়ং কবির অভিপ্রেত ছিল কিনা বলিতে পারি না। তাহা জানিতেও চাহি না। 'সোণারতরী' পাঠে আমার মনে যে ভাবের উদ্রেক হয়, তাহাই আমি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। কাব্যসমালোচনা-প্রণালী সম্বন্ধে রবীন্দ্র বাবু একবার যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"কাব্য সমালোচনা ব্যক্তিগত। চাঁদের আলো পদ্মার বালুচরের উপর পড়িয়া একরূপ আকার ধারণ করে, নদীর জলের উপর পড়িয়া আর একরূপ ভাব ধারণ করে, আবার ও পারের ঘনসন্নিবিষ্ট বনভূমির মধ্যে পড়িয়া আর একরূপে প্রতিভাত হয়। চন্দ্রালোকের মধ্যে যে কাব্যরস আছে ইহাই তাহার তিন প্রকার সমালোচনা। কিন্তু ইহা পাঠগত তাহার আর সন্দেহ নাই। তথাপি চন্দ্রালোকের কবিত্ব হিসাবে তিনই সত্য। চন্দ্রালোককে দেশকাল পাত্র হইতে উঠাইয়া লইয়া তাহার অতি বিশুদ্ধ নিরপেক্ষ সমালোচনা করিতে হইলে, তাহার কবিত্ব ছাঁটিয়া দিতে হয়।" *

রবীন্দ্র বাবু কি ভাবিয়া 'সোণার তরী' লিখিয়াছিলেন, 'পাঞ্চভৌতিক সভা'র 'কাব্যের তাৎপর্য্য' সম্বন্ধীয় আলোচনায় তিনি স্বয়ংই তাহা বলিয়া দিয়াছেন :—

"এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, যখন কবিতাটা "(বিদায় অভিশাপ)" লিখিতে বসিয়াছিলাম তখন কোন অর্থই মাথায় ছিল না. তোমাদের কল্যাণে এখন দেখিতেছি লেখাটা বড় নিরর্থক হয় নাই—অর্থ অভিধানে কুলাইয়া উঠিতেছে না। কাব্যের একটা গুণ এই যে, কবির সৃজন শক্তি পাঠকের সৃজন শক্তি উদ্রেক করিয়া দেয়; তখন স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে কেহ বা সৌন্দর্য্য, কেহ বা নীতি, কেহ বা তত্ত্ব সৃজন করিতে থাকেন। এ যেন আতস বাজিতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া—কাব্য সেই অগ্নিশিখা, পাঠকদের মন ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আতস বাজি। আগুন ধরিবামাত্র কেহ বা হাউইয়ের মত একেবারে আকাশে উড়িয়া যায়, কেহ বা তুবড়ির মত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, কেহ বা বোমার মত আওয়াজ করিতে থাকে। ..... কাব্য হইতে কেহ বা ইতিহাস আকর্ষণ করেন, কেহ বা দর্শন উদ্ঘাটন করেন, কেহ বা নীতি, কেহবা বিষয় জ্ঞান—আবার কেহ বা কাব্য হইতে কাব্য ছাড়া আর কিছুই বাহির করিতে পারেন না—যিনি যাহা পাইলেন তাহাই লইয়া সন্তুষ্টচিত্তে ঘরে ফিরিতে পারেন—কাহারও সহিত বিরোধের আবশ্যক দেখি না—বিরোধে ফলও নাই।"

'সোণারতরী' কবিতাটি যে পাঠকদিগের নিকট আশানুরূপ আদর না পাইয়া ভগ্নহৃদয় কবির বিষাদের গান,

* সাহিত্য, ৩য় বর্ষ, ৪৩২ পৃষ্ঠা।

তাহা যদিও আমি আদৌ বিশ্বাস করি না, তথাপি সমালোচক মহাশয়ের প্রতিকূল মত সত্ত্বেও নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে রবীন্দ্র বাবুর ঐরূপ আক্ষেপ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এদেশে রবীন্দ্র বাবুর প্রতিভার এখনও সমুচিত আদর হয় নাই। সভাস্থলে স্কুলের ছাত্রবৃন্দ অনেক সময় রবীন্দ্র বাবুর সঙ্গীতের জন্য অসংযত ব্যগ্রতা প্রকাশ করে সত্য, কিন্তু তাহাতেই কি সাধারণ্যে তাঁহার কাব্যের যথেষ্ট আদর সূচিত হয়? নব্য বঙ্গে রবীন্দ্র বাবুর ভক্তের সংখ্যা নিতান্ত সামান্য না হইলেও তাঁহার প্রতিভার পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে। রবীন্দ্র বাবু যদি পাঠকদিগের নিকট ন্যায্য আদর পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার আদরের "সাধনা"র অকাল মৃত্যু আমাদিগকে দেখিতে হইত না। সম্ভবতঃ জনসাধারণ এখনও "সাধনা"র সারবত্তা ও প্রয়োজনীয়তা সম্যক্ উপলব্ধি করেন নাই। কিন্তু অনেক শিক্ষিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তি "সাধনা"র তিরোভাব জাতীয় ক্ষতি বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন।

কিন্তু যাহারা সাগ্রহে রবীন্দ্র বাবুর কবিতাদি পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহারাও যে অনেক সময় আশ্চর্য্যরূপে উহার মর্ম্ম গ্রহণে অক্ষমতা প্রকাশ করেন, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা আক্ষেপের বিষয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "সাহিত্যে"র একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক 'তর্ক বৈচিত্র্যে' রবীন্দ্র বাবুর "হিং টিং ছট্" নামক কবিতার যে রূপবিকৃত ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা সম্ভবতঃ সকলের মনে আছে। বর্ত্তমান বর্ষের আশ্বিন মাসের "সাহিত্যে"ও 'বীণাবাদিনী' পত্রিকার সমালোচনা উপলক্ষ্যে রবীন্দ্র বাবুর একটি গানকে যেরূপ অন্যায় আক্রমণ করা হইয়াছে, অনেকে তাহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন—"'মম হৃদয় শয়ন-মাঝে শুন মধুর মুরলী বাজে, মম অন্তরে থাকি থাকি' কেবল কষ্টকল্পিত চর্চ্চিতচর্ব্বণ নয়, নিতান্তই হাস্যরসের উদ্দীপক।" কিন্তু গানটি আদ্যোপান্ত যিনি একটু প্রণিধান পূর্ব্বক পাঠ করিবেন, তিনিই বুঝিবেন যে পংক্তি ক'টি এই রূপ হইবে—

"আজি আকুল ফুলসাজে,
জাগো মৃদু কম্পিত লাজে
মম হৃদয়-শয়ন মাঝে;
শুন মধুর মুরলী বাজে
মম অন্তরে থাকি থাকি।"

কেবল মুদ্রাকর-প্রমাদবশতঃই একটা বিরামচিহ্ন অযথাস্থানে স্থাপিত হইয়াছে।—সাহিত্যসমাজপতি বলিয়া যাঁহারা পরিচিত হইতে অভিলাষী, তাঁহারাই যখন সহজে এরূপ একটা সরল কবিতার অর্থ-বিভ্রাট ঘটাইতে পারেন, তখন সাধারণ পাঠকদের হাতে রবীন্দ্র বাবুর অনেক কবিতারই যে দুর্গতি হয় তাহা স্পষ্টই অনুমান করা যাইতে পারে।

রবীন্দ্র বাবুর বিরুদ্ধে সমালোচক মহাশয়ের একটি অভিযোগ এই যে 'সোণারতরী'র পর হইতে তিনি কবিতার ভাষার প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ প্রদান করিয়াছিলেন, এবং "অতিরিক্ত আদরে ধনীর ঘরের সন্তানের মত তাঁহার ভাষাও কেমন বিগড়াইয়া যাইতেছিল।" সমালোচক "চিত্রা"র কতকগুলি কবিতা লক্ষ্য করিয়াই এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ "চিত্রা" হইতে কয়েকটি যুক্তাক্ষরবহুল সুন্দর শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। "চিত্রা"র অনেক কবিতায় যে রবীন্দ্র বাবু ভাষার উৎকর্ষের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে কবিতাগুলির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে ভিন্ন কোন অংশে কমিয়া যায় নাই। রবীন্দ্রবাবু নিজেই এক স্থানে বলিয়াছেন যে, কবিবর বিহারীলালের কাব্য পাঠ করিয়া তাঁহার "এই শিক্ষাটি স্থায়ীভাবে হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়াছে যে, সুন্দর ভাষা কাব্যসৌন্দর্য্যের একটি প্রধান অঙ্গ; ছন্দে এবং ভাষায় সর্ব্বপ্রকার শৈথিল্য কবিতার পক্ষে সাংঘাতিক।" * ঐ প্রবন্ধেই অন্যত্র বাঙ্গালা কবিতার ছন্দে যুক্তাক্ষরের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়া বলিয়াছেন,—

"বাঙ্গালা যে ছন্দে যুক্ত অক্ষরের স্থান হয় না, সে ছন্দ আদরণীয় নহে। কারণ, ছন্দের ঝঙ্কার এবং ধ্বনিবৈচিত্র্য, যুক্ত অক্ষরের উপরেই অধিক নির্ভর করে। একে বাঙ্গালা ছন্দে স্বরের দীর্ঘ হ্রস্ব নাই, তার উপরে যদি যুক্ত অক্ষর বাদ পড়ে, তবে ছন্দ নিতান্তই অস্থিবিহীন স্খলিত শব্দপিণ্ড হইয়া পড়ে। তাহা শীঘ্রই শ্রান্তিজনক তন্দ্রাকর্ষক হইয়া উঠে, এবং হৃদয়কে আঘাত পূর্ব্বক রুদ্ধ করিয়া তুলিতে পারে না। সংস্কৃত ছন্দে যে বিচিত্র সঙ্গীত তরঙ্গিত হইতে থাকে, তাহার প্রধান কারণ স্বরের দীর্ঘ হ্রস্ব এবং যুক্ত অক্ষরের বাহুল্য। মাইকেল মধুসূদন ছন্দের এই নিগূঢ় তত্ত্বটি অবগত ছিলেন; সেইজন্য তাঁহার অমিত্রাক্ষরে এমন পরিপূর্ণ ধ্বনি এবং তরঙ্গিত গতি অনুভব করা যায়।"

"চৈতালি"র কবিতায় ছন্দের বিচিত্র ঝঙ্কার ও সৌন্দর্য্য নাই। কবিতাগুলির ভাব যেমন সরল, ভাষাও তেমনই

* সাধনা। তৃতীয় বর্ষ, ২য় ভাগ, ১৫৪ পৃষ্ঠা।

বাহুল্যবর্জ্জিত ও সরল;—তাহার কারণ, "চৈতালি"র অধিকাংশ কবিতাই চতুর্দ্দশপদী। এক একটি ভাবে, এক একটি তরঙ্গে, এক একটি কবিতা সম্পূর্ণ। চতুর্দ্দশপদীর সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে ছন্দের সঙ্গীত ও সৌন্দর্য্য বিকশিত করা সম্ভবপর নহে, এবং সেরূপ চেষ্টা করিলে চতুর্দ্দশপদীর উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হইয়া যায়। "চৈতালি"র 'উৎসর্গ' 'গান' ও 'প্রার্থনা'র ছন্দে "চিত্রা"র বিচিত্র তরঙ্গিত সঙ্গীতঝঙ্কার ধ্বনিত হইয়া উঠে। সমালোচক মহাশয় লিখিয়াছেন, "রবীন্দ্র বাবুর কবিতাসিন্ধু মন্থন করিলে অতি অল্প স্থানেই বিষাদভরা করুণস্বর ব্যতীত আর কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়।" এতৎ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, কেবল রবীন্দ্র বাবুর কবিতা কেন, বর্ত্তমান যুগের ইংরাজী কবিতায়ও বিষাদের সুরের প্রভাব যে খুব বেশী তাহা সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু এজন্য আক্ষেপ করিবার বিশেষ কোন কারণ দেখিতেছিনা। রবীন্দ্রবাবু তাঁহার কাব্যগুরু কবি বিহারীলালের প্রতিভা সমালোচনা উপলক্ষ্যে এই প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে;—

"অসন্তোষ মানবপ্রকৃতির সহজাত। ...কবিতায় অসন্তোষমানের বাহুল্য দেখা যায় বলিয়া অনেকে আক্ষেপ করিয়া থাকেন। কিন্তু দোষ কাহাকে দিব? অসন্তোষ মানুষকে কাজ করাইতেছে, আকাঙ্ক্ষা কবিকে গান গাওয়াইতেছে। সন্তোষ এবং পরিতৃপ্তি যতই প্রার্থনীয় হউক, তাহাতে কার্য্য এবং কাব্য উভয়েরই ব্যাঘাত করিয়া থাকে। অ যেমন বর্ণমালার আরম্ভ এবং সমস্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত যুক্ত, অসন্তোষ ও অতৃপ্তি সেইরূপ সৃজনের আরম্ভে বর্ত্তমান এবং সমস্ত মানবপ্রকৃতির সহিত নিয়ত সংযুক্ত। এই জন্যই তাহা কবিতায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, কবিদিগের মানসিক ক্ষিপ্ততা বা পরিপাকশক্তির বিকারবশতঃ নহে।*

যদি ইহকালেই মানব জীবনের সকল আশা ও আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি হইত, তাহা হইলেই এই বিষাদের ভাব নিন্দনীয় হইত, এবং তাহা হইলে সম্ভবতঃ এরূপ অসন্তোষ ও অতৃপ্তি কবিহৃদয় চঞ্চল করিত না। কিন্তু বর্ত্তমান জীবনের এই অতৃপ্তিই আমাদিগের হৃদয়ে ইহকালের পরপারবর্ত্তী অনন্ত জীবনের আশা ও আভাস আনিয়া দেয়। সমালোচক মহাশয় "চৈতালি"র সমালোচনা করিতে যাইয়া তাঁহার প্রবন্ধে পুনঃ পুনঃ বিদেশীয় কবিতার সর্ব্বাঙ্গীন শ্রেষ্ঠতা ঘোষণা করিয়াছেন, এবং কয়েকটি ইংরাজী কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। প্রসিদ্ধ ইংরাজ কবিদিগের রচনার তুলনায় রবীন্দ্রবাবু প্রমুখ এ দেশীয় গীতিকবিদিগের কবিতার অপকর্ষ প্রদর্শন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে তিনি কত দূর সফলতা লাভ করিয়াছেন, তাহা বিচার করা অনাবশ্যক। কারণ অতি প্রাচীন ইংরাজী সাহিত্যের সহিত অপরিপুষ্ট নবীন বাঙ্গালা সাহিত্যের এখনও তুলনার সময় আসে নাই। এই রূপ অনুচিত তুলনা দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরবহানি করিবার চেষ্টা সম্বন্ধে রবীন্দ্রবাবু কোন প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি:—

বহুকাল হইতে বহুতর সামাজিক প্লাবনের সাহায্যে স্তর পড়িয়া ইংরাজী সাহিত্য উচ্চতা, কঠিনতা এবং একটা নির্দ্দিষ্ট আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যে সম্প্রতি পলি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। ...ইহার ইতিহাস নাই, আবহমান কাল প্রচলিত প্রবাহ নাই, বহুকাল সঞ্চিত রত্নভাণ্ডার নাই, ইহার বিক্ষিপ্ত অংশগুলিকে এখনও সমালোচনার নিয়মে বাঁধিবার সময় হয় নাই। সুতরাং ইংরাজী সমালোচন গ্রন্থ হইতে মুখগহ্বর পূর্ণ করিয়া লইয়া যখন কোন প্রবল প্রতিপক্ষ ইহার প্রতি মুহুর্মুহু ফুৎকার প্রয়োগ করিতে থাকেন, তখন বঙ্গ সাহিত্যের ক্ষীণ আশার আলোটুকু একান্ত কম্পিত ও নির্ব্বাপিত প্রায় হইয়া আসে। কিন্তু তথাপি বলা যাইতে পারে ফুৎকার যতই প্রবল হউক, শীর্ণ দীপশিখা তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ।

"বর্ত্তমান বাঙ্গালা লেখকেরা বঙ্গসাহিত্যের প্রথম ভিত্তি নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত আছেন। সুতরাং যাহারা ইংরাজি গ্রন্থস্তূপ শিখরের উপর চড়িয়া নিম্নে দৃষ্টিপাত করেন, তাঁহারা ইহাঁদিগকে ছোট বলিয়া মনে করিতে পারেন। .....যে শ্রেণীর সমালোচকের কথা বলিতেছি, তাঁহারা যখন বাঙ্গালা পড়েন, তখন মনে মনে বাঙ্গালাকে ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া লন, সুতরাং সমালোচ্য গ্রন্থের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না। .....মাতৃভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে সকল সাহিত্যই ম্লান নির্জ্জীব ভাব ধারণ করে, তখন তাহার প্রতি সমালোচন-শর প্রয়োগ করা কেবল 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' দেওয়া মাত্র।" *

কিন্তু বঙ্গসাহিত্য ইংরাজী সাহিত্যের সহিত তুলনার যোগ্য না হইলেও নব্য বঙ্গকবির রচনায় যে, উদার চিন্তা ও মহান্‌ভাব' স্থান পায় না, 'হতাশার কথা না থাকিলে যে এদেশের কবিতা জমাট বাঁধে না,' তাহা কেমন করিয়া স্বীকার করিব? উদাহরণ স্বরূপ এখানে রবীন্দ্র বাবুর "এবার ফিরাও মোরে" শীর্ষক কবিতাটির উল্লেখ করিতে পারি। ইহাতে যে উদার বিশ্বপ্রেমের গম্ভীর রাগিনী ধ্বনিত হইতেছে তাহা কোন বিদেশীয় কবিরই অযোগ্য নহে। অত্যাচরিত, ক্লিষ্ট ও নিরীহ স্বদেশবাসিদিগের দুঃখ দৈন্য দেখিয়া ব্যথিতহৃদয় কবি কহিতেছেন,—

"———এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে

* সাধনা। তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় ভাগ, ১৩১-১৩২ পৃষ্ঠা।

* সাধনা। ১ম বর্ষ, ১ম ভাগ, ৪৭১-৪৭৩ পৃষ্ঠা।

ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা ; ডাকিয়া বলিতে হবে—
মুহূর্ত্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে !
যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে,.....
দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার,
মুখে করে আস্ফালন, জানে সে হীনতা আপনার
মনে মনে !— * * * * *
কি গাহিবে, কি শুনাবে !—বল, মিথ্যা আপনার সুখ,
মিথ্যা আপনার দুঃখ ! স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ
বৃহৎ জগত হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে !
মহা বিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা !
মৃত্যুরে করি না শঙ্কা। দুর্দ্দিনের অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি—তারি মাঝে যাব অভিসারে
তার কাছে,—জীবন সর্ব্বস্ব ধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি ! * * *
শুধু জানি তাহারি মহান্
গম্ভীর মঙ্গল ধ্বনি শুনা যায় সমুদ্র সমীরে,
তাহারি অঞ্চল প্রান্ত লুটাইছে নীলাম্বর ঘিরে,
তারি বিশ্ববিজয়িনী পরিপূর্ণা প্রেমমূর্ত্তি খানি
বিকাশে পরমক্ষণে প্রিয়জন মুখে ! শুধু জানি
সে বিশ্বপ্রিয়ার প্রেমে ক্ষুদ্রতারে দিয়া বলিদান
বর্জ্জিত হইবে দূরে জীবনের সর্ব্ব অসম্মান,
সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নতমস্তক উচ্চে তুলি
যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি
আঁকে নাই কলঙ্ক-তিলক ! * * *
হয়ত ঘুচিবে দুঃখ নিশা,
তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্ব্ব প্রেমতৃষা।"

সমালোচকের মতে বিদেশীয় কবিদিগের কবিতায় সুখ, দুঃখ, আশা, ভয়, আনন্দ, বিষাদ, ঘৃণা, ভালবাসা প্রভৃতি নানা ধ্বনি ধ্বনিত হইয়া থাকে ; কিন্তু অস্মদ্দেশীয় কবিতায় সে সকল ভাব সে সজীবতা ও সে বৈচিত্র্য নাই, তাহা নিতান্তই রুগ্ন ও অশ্রুজলপ্লাবিত। যাঁহারা, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়, "ইস্তক বিলাতী পণ্ডিত, লাগায়েৎ বিলাতী কুকুর সকলেরই সেবা করেন, দেশী গ্রন্থ পড়া দূরে থাকুক, দেশী ভিখারীকেও ভিক্ষা দেন না," তাঁহাদের মুখে এরূপ উক্তি শুনিলে আশ্চর্য্য বোধ হয় না। হেমেন্দ্র বাবুর ন্যায় যাঁহাদের মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ও ভক্তি আছে, তাঁহাদের নিকট হইতে এরূপ অভিযোগ শুনিলে বাস্তবিকই হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত লাগে।

সমালোচক একস্থানে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, "অনেক নবীন কবির কবিতায় রবীন্দ্র বাবুর মধুর মুরলীধ্বনির প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই ; কিন্তু হেমচন্দ্রের গম্ভীর ভেরী নিনাদের প্রতিধ্বনি আর শুনিতে পাইনা কেন ?"—ইহার কারণ এই যে, ভেরীনিনাদ অপেক্ষা মুরলীধ্বনি অধিকতর মধুর এবং প্রাণস্পর্শী। বিশেষতঃ শান্তিপ্রিয় বাঙ্গালী জাতি চিরদিনই মুরলীর সুধাবর্ষী সঙ্গীতে মুগ্ধ। ভেরীরব হৃদয়ে একটা সাময়িক উত্তেজনা জন্মাইয়া দেয় বটে, কিন্তু তাহা আমাদের প্রাণের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। যুদ্ধবিগ্রহাদির সময়ই ভেরীনিনাদ অত্যন্ত আবশ্যক এবং আদরণীয় ; কিন্তু যতই আমরা জ্ঞান ও সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতেছি, ততই বাল্যোচিত যুদ্ধকলহপ্রিয়তা ত্যাগ করিয়া উদার প্রেম ও শান্তির মাধুর্য্য এবং মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতেছি। তাই এখন আর ভেরীরব পূর্ব্বের ন্যায় আমাদিগের চিত্ত আকৃষ্ট করিতে পারিতেছে না ; মুরলীর মধুমাখা শান্তির রাগিনী আমাদিগের নিকট প্রিয়তর হইতেছে।

"বাঙ্গলা শব্দ ও ছন্দ" বিষয়ক আলোচনায় রবীন্দ্র বাবু একবার "সাধনা"য় লিখিয়াছিলেন—"ইংরাজীতে অনেক সময় আটদশ লাইনের একটি ছোট কবিতা লঘুবাণের মত ক্ষিপ্রগতিতে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া মর্ম্মের মধ্যে বিদ্ধ হইয়া থাকে। বাঙ্গলায় ছোট কবিতা আমাদের হৃদয়ের স্বাভাবিক জড়তায় আঘাত দিতে পারে না।"—সমালোচক বলিতেছেন, "এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ইহা মনে করিবার কারণ ছিল যে, রবীন্দ্র বাবুর ক্ষুদ্র কবিতায় এই অভাব দূর হইবে। কিন্তু "চৈতালি"র অনেক কবিতা পাঠ করিয়া তাহা বোধ হয় না।"

উল্লিখিত প্রবন্ধে রবীন্দ্র বাবু দেখাইয়াছিলেন যে, "বাঙ্গালা শব্দ উচ্চারণের মধ্যে কোথাও ঝোঁক নাই," বাঙ্গালা শব্দে অক্ষরের গুরুলঘুও নিরূপিত নাই, এবং "বোধ করি কতকটা সেই কারণে আমাদের ভাষার এই খর্ব্বতা আমরা অত্যুক্তি দ্বারা পূরণ করিয়া লইতে চেষ্টা করি। .... সেইজন্য সংক্ষিপ্ত সংহত রচনা আমাদের দেশে প্রচলিত নাই বলিলেই হয়।" সুতরাং ইংরাজি কবিতার ন্যায় বাঙ্গলা ছোট কবিতা যে সহজে আমাদের মর্ম্মে বিদ্ধ হইয়া থাকে না, তাহা বঙ্গীয় কবির অক্ষমতাজনিত নহে ; পরন্তু বাঙ্গলাভাষার মজ্জাগত কয়েকটি ত্রুটির জন্য। সেই জন্য রবীন্দ্র বাবু যদিবা বঙ্গভাষায় ইংরাজী আদর্শের অনুরূপ ছোট কবিতার অভাব পূরণ করিতে না পারিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহার প্রতিভার অগৌরব কিছুই নাই।

বঙ্গভাষায় ছোট কবিতার ইংরাজী আদর্শানুরূপ উৎকর্ষ যতদূর হইতে পারে, তাহা তিনি সাধন করিয়াছেন, এবং বোধ করি ক্ষুদ্র কবিতার রচনানৈপুণ্যে অন্য কোন বঙ্গীয় কবি তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই।

কিন্তু যথার্থই কি "চৈতালি"র অনেকগুলি ক্ষুদ্র কবিতা ঠিক আদর্শানুযায়ী হয় নাই ? আমরা কিছুতেই ইহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। "চৈতালি"র অনেকগুলি ছোট কবিতা বাস্তবিকই লঘুবাণের মত ক্ষিপ্রগতিতে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া বিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রমাণ স্বরূপ আমরা আলোচ্য প্রবন্ধে উদ্ধৃত "বঙ্গমাতা," "দুই উপমা," "তত্ত্বজ্ঞানহীন" ও "বৈরাগ্য" প্রভৃতি কবিতার উল্লেখ করিতে পারি। "বঙ্গমাতা"র শেষ দুইটিমাত্র ছত্র ঃ—

"সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙ্গালী করে, মানুষ করনি !"

যদি বঙ্গীয় পাঠকের হৃদয়ের স্বাভাবিক জড়তায় আঘাত দিতে না পারে, তবে তাহা নিতান্তই অস্বাভাবিক কাঠিন্য প্রাপ্ত হইয়াছে এবং কোন আঘাতই যে তাহা বিচলিত করিতে পারিবে না, ইহা নিশ্চিত।

"চৈতালি"র দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে যে গুচ্ছ গুচ্ছ ফল ধরিয়াছে, তাহার অনেকগুলিই ইটালীদেশীয় আঙ্গুরের মত সুমিষ্ট, সুগন্ধ ও রসে উৎপূর্ণ। "মানসী" ও "সোণারতরী," এবং "চৈতালি"র কবিতা একজাতীয় নহে। কিন্তু "চৈতালি"র অনেকগুলি সরল চতুর্দ্দশপদী কবিতা যেমন স্বজাতিপ্রেম-প্রণোদিত, তেমনি সময়োপযোগী। দুই একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি। আমাদের যে সকল উচ্চশিক্ষাভিমানী স্বদেশবাসী বিজাতীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন, তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিতেছেন ঃ—

"কে তুমি ফিরিছ পরি' প্রভুদের সাজ !
ছদ্মবেশে বাড়ে নাকি চতুর্গুণ লাজ ?
পরবস্ত্র অঙ্গে তব হয়ে অধিষ্ঠান
তোমারেই করিছেনা নিত্য অপমান ?
বলিছেনা, "ওরে দীন, যত্নে মোরে ধর"
তোমার চর্ম্মের চেয়ে আমি শ্রেষ্ঠতর ?"
চিত্তে যদি নাহি থাকে আপন সম্মান,
পৃষ্ঠে তবে কালোবস্ত্র কলঙ্ক-নিশান।
ওই তুচ্ছ টুপিখানা চড়ি তব শিরে
ধিক্কার দিতেছে নাকি তব স্বজাতিরে ?
বলিতেছে, যে মস্তক আছে মোর পায়
হীনতা ঘুচেছে তার আমারি কৃপায়।
সর্ব্বাঙ্গে লাঞ্ছনা বহি' একি অহঙ্কার !
ওর কাছে জীর্ণ চীর জেনো অলঙ্কার।"
['পরবেশ।']

রাজজাতির নিকট হইতে যখনই পদাঘাত, কর্ণপীড়ন ও অপমান আমাদের লাভ হয়—এবং আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে সেরূপ দুর্ঘটনা আজকাল বিরল নহে—তখনই আমাদের দেশীয় সংবাদপত্রে কেবল ইংরাজের পাশবিকতার বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ প্রকাশ করা হয়। এরূপ আচরণ দেখিয়া কবি ব্যথিতচিত্তে লিখিয়াছেন—

"* * * * *
যারা শুধু মরে কিন্তু নাহি দেয় প্রাণ,
কেহ কভু তাহাদের করেনি সম্মান।
যতই কাগজে কাঁদি, যত দিই গালি,
কালামুখে পড়ে তত কলঙ্কের কালী।
.....
নিজের বিচার যদি নাই নিজ হাতে,
পদাঘাত খেয়ে যদি না পার ফিরাতে,
তবে ঘরে নতশিরে চুপ করে থাক্,
সাপ্তাহিকে দিগ্বিদিকে বাজাস্‌নে ঢাক।
একদিকে অসি আর অবজ্ঞা অটল
অন্যদিকে মসী আর শুধু অশ্রুজল !"
['অভিমান।']

"বঙ্গমাতা" এবং "দুই উপমা" নামক কবিতা দুইটিতে রবীন্দ্র বাবুর স্বজাতির বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কারণ এবং এই দুর্গতি মোচনের উপায়ের আভাস কেমন সুন্দর ভাবে, সরল ভাষায়, অল্প কথায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা একবার মাত্র কবিতা দুইটি পাঠ করিলেই পাঠক দেখিতে পাইবেন। মূল প্রবন্ধেই কবিতা দুইটি উদ্ধৃত হইয়াছে।

"অনাবৃষ্টি" কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়া সমালোচক বলিয়াছেন ঃ—

"জাতীয় কবি হইতে হইলে, জাতির সুখ দুঃখের সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি নিতান্তই আবশ্যক। * * * যে দেশে একবার অনাবৃষ্টি বা অন্য কোন কারণে অজন্মা হইলে দেশের লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়, সে দেশের কবির পক্ষে অনাবৃষ্টির মত একটা গুরুতর বিপদ লইয়া এরূপ বিদ্রূপ করা কতদূর সঙ্গত বলিতে পারি না। * * * জাতির সুখ দুঃখ যদি আমাদিগের সুখ দুঃখ না হয়, তবে আমরা জাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়াও অন্তর্ভুক্ত নহি,—তবে জাতির প্রতি আমাদিগের কিছুমাত্র ভালবাসা নাই * * *।"—

"অনাবৃষ্টি"তে যদিও কবি কৃষককন্যার দুঃখে সহানুভূতি দেখান নাই, তথাপি চৈতালির অনেক কবিতায়ই পল্লীবাসী দরিদ্র কৃষকসন্তানদের প্রতি কবির যেরূপ অকৃ-

ত্রিম স্নেহ, আন্তরিক সহানুভূতি ও সরল সহৃদয়তা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা আর কোন বাঙ্গলা কবিতায় আছে কি না সন্দেহ। "চৈতালি"র একটি "স্নেহ দৃশ্য" এইরূপ ;—দরিদ্রের ঘরের বিংশতি বৎসর বয়স্ক একটা শীর্ণ যুবক

"বহু বরষের রোগে অস্থিচর্ম্মসার
শিশুসম কক্ষে বহি জননী তাহার
আশাহীন দৃঢ় ধৈর্য্য মৌন ম্লানমুখে
প্রতিদিন লয়ে আসে পথের সম্মুখে।
আসে যায় রেল গাড়ী, ধায় লোকজন,—
সে চাঞ্চল্যে মুমূর্ষুর অনাসক্ত মন
যদি কিছু ফিরে চায় জগতের পানে
এইটুকু আশা ধরি মা তাহারে আনে।"

"দিদি" কবিতায় কবি পশ্চিমে মজুরের শিশু সন্তানের খেলা ধূলা ও ভ্রাতৃবাৎসল্যের একটি মধুর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তার পর যেখানে 'দিদি' 'কোমললোম ছাগবৎস ও অবোধ উলঙ্গ শিশু ভ্রাতাটিকে একসঙ্গে কোলে লইয়া উভয়ের "পরিচয়" সাধন করিয়া দিয়াছে, সেখানেও তাঁহার স্নেহদৃষ্টি পতিত হইয়াছে। মূঢ় বেদের মেয়ে ও তাহার প্রিয় সঙ্গী কুকুরের সানন্দ সোৎসাহ ক্রীড়ার দৃশ্যটিও তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। আবার, সরলহৃদয় অশিক্ষিত কৃষকের পুঁটুরাণী নামক বৃহৎকায় মহিষটির প্রতি সরল স্নেহাদরও কবি সকৌতুক মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিয়াছেন। 'পল্লিগ্রাম' ও 'মধ্যাহ্ন' প্রভৃতি কবিতায় পল্লিগ্রামের নির্জ্জন নির্ম্মল প্রকৃতির প্রতি কবির স্বাভাবিক ভালবাসা প্রকাশ পাইয়াছে। কৃষকজীবনের প্রতি কবির সস্নেহ সহানুভূতির প্রমাণ স্বরূপ বোধ হয় আর অধিকসংখ্যক কবিতার উল্লেখ করা অনাবশ্যক। সমগ্র "চৈতালি" গ্রন্থ খানি পাঠ করিয়া দেখিলেই পাঠক তাহা দেখিতে পাইবেন।

সমালোচক বলিয়াছেন, "রবীন্দ্র বাবু প্রেমের কবি; তাঁহার প্রেমের কবিতা অতি মধুর।" একথা যে অতি যথার্থ, তাহা আশা করি, কেহই অস্বীকার করিবেন না। প্রেমের কবিতা রচনায় রবীন্দ্র বাবু সিদ্ধ হস্ত। চৈতালিতেও প্রেমের কবিতার অভাব নাই। কিন্তু কয়েক মাস পূর্ব্বে "দাসী"তে সমালোচিত "মালঞ্চ" নামক কবিতা গ্রন্থখানি যে প্রেমের কথায় পরিপূর্ণ, এপ্রেম তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। এ প্রেম অতি পবিত্র, অতি উদার, অতি মহান্। আলোচ্য প্রবন্ধে উদ্ধৃত "পুণ্যের হিসাবে" কবি প্রেম ও পূজার একত্ব ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন,—

"যারে বলে ভালবাসা, তারে বলে পূজা!"

প্রিয়ার প্রতি প্রেমই যে ক্রমে বিকশিত হইয়া উঠিয়া সমস্ত বিশ্বকে আপনার করিয়া তোলে, তাহা লক্ষ্য করিয়া কবি বলিতেছেন ঃ—

.....
তোমার মহিমাজ্যোতি তব মূর্ত্তি হতে
আমার অন্তরে পড়ি ছড়ায় জগতে।
যখন তোমার পরে পড়েনি নয়ন
জগৎলক্ষ্মীর দেখা পাইনি তখন।
স্বর্গের অঞ্জন তুমি মাখাইলে চোখে
তুমি মোরে রেখে গেছ অনন্ত এ লোকে।
এ নীল আকাশ এত লাগিত কি ভালো,
যদি না পড়িত মনে তব মুখআলো?
অপরূপ মায়াবলে তব হাসি গান
বিশ্ব মাঝে লভিয়াছে শত শত প্রাণ।
তুমি এলে আগে আগে দীপ লয়ে করে,
তব পাছে পাছে বিশ্ব পশিল অন্তরে।'

"চৈতালি"র "ধ্যান" এইরূপ ঃ—

যত ভালবাসি, যত হেরি বড় করে,'
তত, প্রিয়তমে, আমি সত্য হেরি তোরে।
যত অল্প করি তোরে, তত অল্প জানি,
কখনো হারায়ে ফেলি, কভু মনে আনি।
আজি এ বসন্ত দিনে বিকশিতমন
হেরিতেছি আমি এক অপূর্ব্ব স্বপন;—
যেন এ জগত নাহি, কিছু নাহি আর,
যেন শুধু আছে এক মহা পারাবার।
নাহি দিন নাহি রাত্রি নাহি দণ্ডপল,
প্রলয়ের জলরাশি স্তব্ধ অচঞ্চল।
যেন তারি মাঝখানে পূর্ণ বিকাশিয়া
একমাত্র পদ্ম তুমি রয়েছ ভাসিয়া।
নিত্যকাল মহাপ্রেমে বসি বিশ্বভূপ
তোমা মাঝে হেরিছেন আত্ম প্রতিরূপ।"

'চৈতালি"র "আশার সীমা" "মানসী" "প্রেয়সী" প্রভৃতি প্রেমের কবিতাগুলিও অতি সরল এবং সুন্দর।

"বৈরাগ্য" বিষয়ক কবিতায় রবীন্দ্র বাবু গার্হস্থ্যাশ্রমের শ্রেষ্ঠতা যেমন সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, "দেবতার বিদায়" নামক কবিতায়ও তেমনি সুস্পষ্ট ভাষায় দীন এবং অসহায়জনের প্রতি দয়াই মানবের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। "চৈতালি"র কোন কোন কবিতায় ভগবানের প্রতি কবির একান্ত অনুরক্তি ও তাঁহার অনন্ত কৃপায় সুদৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ পাইতেছে। পরম দয়াময়

পরমেশ্বর যে আমাদের ভীতির কারণ নহেন, কিন্তু স্নেহময় পিতার ন্যায় আমাদের একান্ত ভক্তি ও প্রীতির পাত্র, নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটা ছত্রে কবি এই ভাবটি ব্যক্ত করিয়াছেন ঃ—

* * * * * * *
বরঞ্চ ঈশ্বরে ভুলি স্বপ্ন তাহে ক্ষতি,
ভয় ঘোর অবিশ্বাস ঈশ্বরের প্রতি।
তিনি নিজে সত্য কথা ভুলায়ে ভুলায়ে
রেখেছেন আমাদের সংসার কুলায়ে।
তুমি কে কর্কশ কণ্ঠ তুলিছ ভয়ের!
আনন্দই উপাসনা আনন্দময়ের।"

['অভয়।']

অন্যত্র ভগবানকে উদ্দেশ করিয়া কবি ভক্তিভরে কহিতেছেন ঃ—

"তুমি যদি বক্ষোমাঝে থাক নিরবধি
তোমার আনন্দমূর্ত্তি নিত্য হেরে যদি
এ মুগ্ধ নয়ন মোর,—পরাণ-বল্লভ,
তোমার কোমল কান্ত চরণপল্লব
চিরস্পর্শ রেখে দেয় জীবনতরীতে
কোন ভয় নাহি করি বাঁচিতে মরিতে।"

মৃত্যুর বিশ্বব্যাপিনী মূর্ত্তিতে কবি বিভীষিকা কিছুই দেখিতে পান না। প্রত্যুত, "মাধুরী" নিরীক্ষণ করিয়াই তিনি মুগ্ধ ;—

"পরাণ কহিছে ধীরে—হে মৃত্যু মধুর,
এই নীলাম্বর, একি তব অন্তঃপুর?
আজি মোর মনে হয় এ শ্যামলা ভূমি
বিস্তীর্ণ কোমল শয্যা পাতিয়াছ তুমি।
জল স্থলে লীলা আজি এই বরষার,
এই শান্তি, এ লাবণ্য, সকলি তোমার!
মনে হয়, যেন তব মিলন বিহনে
অতিশয় ক্ষুদ্র আমি এ বিশ্বভুবনে!
প্রশান্ত করুণ চক্ষে, প্রসন্ন অধরে
তুমি মোরে ডাকিতেছ সর্ব্ব চরাচরে!
প্রথম মিলন ভীতি ভেঙেছে বধুর
তোমার বিরাটমূর্ত্তি নিরখি মধুর।
সর্ব্বত্র বিবাহ-বাঁশি উঠিতেছে বাজি,
সর্ব্বত্র তোমার ক্রোড় হেরিতেছি আজি।"

['মৃত্যু মাধুরী।']

সমালোচক মহাশয় বলিতেছেন, "অনুসন্ধান করিলে "চৈতালি"তে দুই চারিটি সুন্দর মুক্তা মিলিবে।" কিন্তু সুখের বিষয় "চৈতালি"তে মণিমুক্তার সংখ্যা তেমন বিরল নহে। ইহার অনেক স্থলেই বহুমূল্য উজ্জ্বল রত্নরাজি দীপ্তি পাইতেছে। সে সকল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার স্থান এখানে নাই। রবীন্দ্রবাবু যদিও তাঁহার "ভক্তের প্রতি" বলিয়াছেন—

"গেয়ে গেয়ে ফিরি পথে আমি শুধু কবি।
নহি আমি ধ্রুব তারা! নহি আমি রবি।"

তথাপি আমরা তাঁহাকে ভক্তির যে 'উন্নত লোকে' প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, "চৈতালি" সেখানে তাঁহার 'অচল আসন' দৃঢ়তর করিয়াছে।

"চৈতালি"র রীতিমত সমালোচনা আমার উদ্দেশ্য এবং ক্ষমতার বহির্ভূত। কেবল হেমেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ শ্রবণ এবং পাঠ করিয়া যে কয়েকটি কথা স্বতঃ মনে উদিত হইয়াছে, তাহাই প্রকাশ করিয়া বলিলাম। উপসংহারে, সমালোচকের সহিত আমরাও সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিতেছি যে "রবীন্দ্র বাবুর প্রতিভারবির ভাস্কর জ্যোতিতে আমাদিগের সাহিত্যাম্বর বহুদিন ধরিয়া উজ্জ্বল থাকুক্;" এবং "মানসী," "সোণারতরী" "চিত্রা" ও "চৈতালি"র ন্যায় অমূল্য আভরণে বঙ্গভাষার শ্রী দিন দিন বিকশিত হউক্। *

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

লাল পল্টন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

লালপল্টনের জয়মাল্য।

When the whole of the attendant circumstances are considered,—the numerical Superiority of the enemy,—the strength of the place, and the disadvantages under which the English force was laboring,—as also the great importance of the conquest,—few achievements on Indian record can be compared with this brilliant affair, which is surely deserving of commemoration.——*Captain Arthur Broome.*

কণ্ডূরের কীর্ত্তি-ক্ষেত্র হইতে বিজয়োৎফুল্ল হৃদয়ে অগ্রসর হইয়া মছলিপত্তনের দুর্গ জয় করিয়া লালপল্টনের

* কোন প্রবন্ধ যে পত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার সমালোচনাও সেই পত্রে প্রকাশিত হওয়াই যুক্তিযুক্ত। বর্ত্তমান সমালোচনাটি 'দাসী'তেই প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল। 'দাসী'-সম্পাদকের নিকট ইহা প্রেরিতও হইয়াছিল। কিন্তু, লেখক লিখিয়াছেন, "উক্ত পত্রিকা খানি উঠিয়া যাওয়ায় আমার 'প্রতিবাদ' তাহাতে প্রকাশিত হইতে পারে নাই।"—"প্রদীপ"—সম্পাদক।

সিপাহী সেনা যে জয়মাল্য অর্জ্জন করিয়াছিল, ইতিহাস-লেখকেরা তাহাকে সর্ব্বথা অতুলনীয় বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন!

ফরাসিরা দাক্ষিণাত্যের নিজাম-দরবারে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া ইংরাজদিগের উচ্ছেদসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন; ইংরাজ সেনাপতি বাহুবলে ফরাসির উচ্ছেদসাধনের জন্য সসৈন্যে রাজমহেন্দ্রীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কাপ্তান নক্সের প্রথম সংখ্যক লালপল্টন রাজমহেন্দ্রী অধিকার করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল; তাহাদের লাল-কুর্ত্তি দেখিয়াই ফরাসিরা রাজমহেন্দ্রী হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন;—পঞ্চদশজন ফরাসি পলায়নের আশায় গোদাবরী তীরে দুর্গমূলে নৌকার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহাদিগকে বন্দী করিয়া লালপল্টন একরূপ বিনা-যুদ্ধেই দুর্গাধিকার করিল। *

ইংরাজেরা রাজমহেন্দ্রীতে শিবির সন্নিবেশ করিলেন; ফরাসীরা মছলিপত্তনের বিখ্যাত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ইংরাজ সেনাপতি দেখিলেন যে, মছলিপত্তন অধিকার করিতে না পারিলে ফরাসিরা আবার প্রবল হইয়া উঠিবেন; তাহার কিছু কিছু লক্ষণও দেখা যাইতে লাগিল; পণ্ডিচেরী হইতে মসিয় মোরাসিঁ তিনশত ইউরোপীয় সেনা লইয়া কন্‌ফ্লাঁকে সাহায্য দান করিবার জন্য সমুদ্রপথে যাত্রা করিলেন; নিজাম সসৈন্যে স্থলপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আনন্দরাজ ইহা বুঝিতে পারিলেন না; তাঁহাকে রসদ যোগাইতে হইতেছে বলিয়া তিনি যুদ্ধে ক্ষান্ত হইবার জন্যই পরামর্শ দিতে লাগিলেন। অবশেষে ইংরাজ সেনাপতির মতই প্রবল হইল। বৃটীশ বাহিনী ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে রাজমহেন্দ্রী হইতে বহির্গত হইয়া মছলিপত্তনের সম্মুখে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিল।

মছলিপত্তনের সম্মুখে আসিয়া ইংরাজ সেনাপতির বদনমণ্ডল চিন্তাক্লিষ্ট বিষণ্ণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। দুর্গটি সুদৃঢ়; পরিখা গভীর,—প্রাচীর দৃঢ়োন্নত, তদুপরি একাদশটি বুরুজ,—দক্ষিণে সমুদ্রের খাড়ি, পূর্ব্বোত্তরে কেবল সৈকতশায়ী বালুকাস্তূপ;—মধ্যে মধ্যে বহুবিধ নালা, খাল, এবং পয়ঃপ্রণালী বর্ত্তমান। এইরূপ সুরক্ষিত সুদৃঢ় দুর্গে সুশিক্ষিত ফরাসি সেনাকে অবরোধ করাই কত কঠিন; কোন রূপে অবরোধ করিতে পারিলেও দুর্গ জয় করা অসম্ভব! তাহাতে যত সময় লাগিবে, ততদিনে হয়ত নিজাম অথবা মোরাসিঁ আসিয়া ইংরাজ-সেনার পৃষ্ঠদেশ আক্রমণ করিবেন!

এরূপ ক্ষেত্রে বিপদের উপর বিপদ আসিয়া চাপিয়া পড়িতে লাগিল; রসদ বন্ধ হইয়া গেল, তঙ্কা ফুরাইয়া গেল; গোরা পল্টন অস্ত্র ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে চাহিল;—ইংরাজ সেনাপতির মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল! *

বিপদে ধৈর্য্য এবং বৈরনির্য্যাতনে অতুল অধ্যবসায় কর্ণেল ফোর্ডের স্বাভাবিক গুণ বলিয়া ইতিহাসে পরিচিত; তিনি ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন না; বৈরনির্য্যাতনের কল্পনা পরিত্যাগ করিলেন না; গোরাদলকে স্তুতি মিনতিতে সন্তুষ্ট করিলেন, সিপাহীগণকে উৎসাহবাক্যে উত্তেজিত করিলেন, এবং অবিচলিত অধ্যবসায়ে দুর্গোপরি অনল বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ইংরাজ সেনা যেরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছিল, তাহাতে জাহাজে উঠিয়া সমুদ্রপথে পলায়ন করা ভিন্ন আর উপায় ছিল না। ইংরাজ-সেনাপতি সেরূপ উপায়ে প্রাণ রক্ষা করা অপেক্ষা দুর্গ জয় করিবার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেই কৃতসংকল্প হইলেন। এই সময়ে প্রকাশ হইল যে, আর দুইদিন মাত্র যুদ্ধ করিবার উপযুক্ত বারুদ আছে, অবশিষ্ট সমস্তই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে!

কর্ণেল ফোর্ড কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া নিশাযোগে দুর্গ আক্রমণের ব্যবস্থা করিতে বসিলেন; সকলেই বুঝিল যে, এইবার অসম্ভবের সঙ্গে সংগ্রাম করিবার জন্য জীবন

* Their sole hope was to escape. The sight of the red-coated Sipahis, undistinguishable from Europeans, deprived them of whatever nerve they had till then retained.——*Malleson's Decisive Battles of India, p. 94.*

* When they saw, for they could not help seeing, that their hard-earned prize money had disappeared that nothing was left, that their food was bad and insufficient, that they were engaged upon an impossible enterprise,—they, too, lost heart. On the 19th the European troops broke into open mutiny, and, turning out with their arms, threatened to march away.——*Malleson's Decisive Battles of India, 102*

এরূপ ক্ষেত্রে গোরাদল বিদ্রোহী হইয়া উঠা বিচিত্র নহে; কিন্তু লালপল্টন যে তাহাদের অনুকরণ করে নাই, তাহাই সমধিক বিস্ময়ের বিষয়! যাহারা এরূপ নিদারুণ দুঃখ কষ্ট এবং নিরাশার মধ্যেও সেনাপতির আজ্ঞাবর্ত্তী থাকিয়া তাঁহার সহিত প্রভুর কার্য্যে জীবন বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাদের বীরকীর্ত্তি যথার্থই স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবার উপযুক্ত নহে কি?

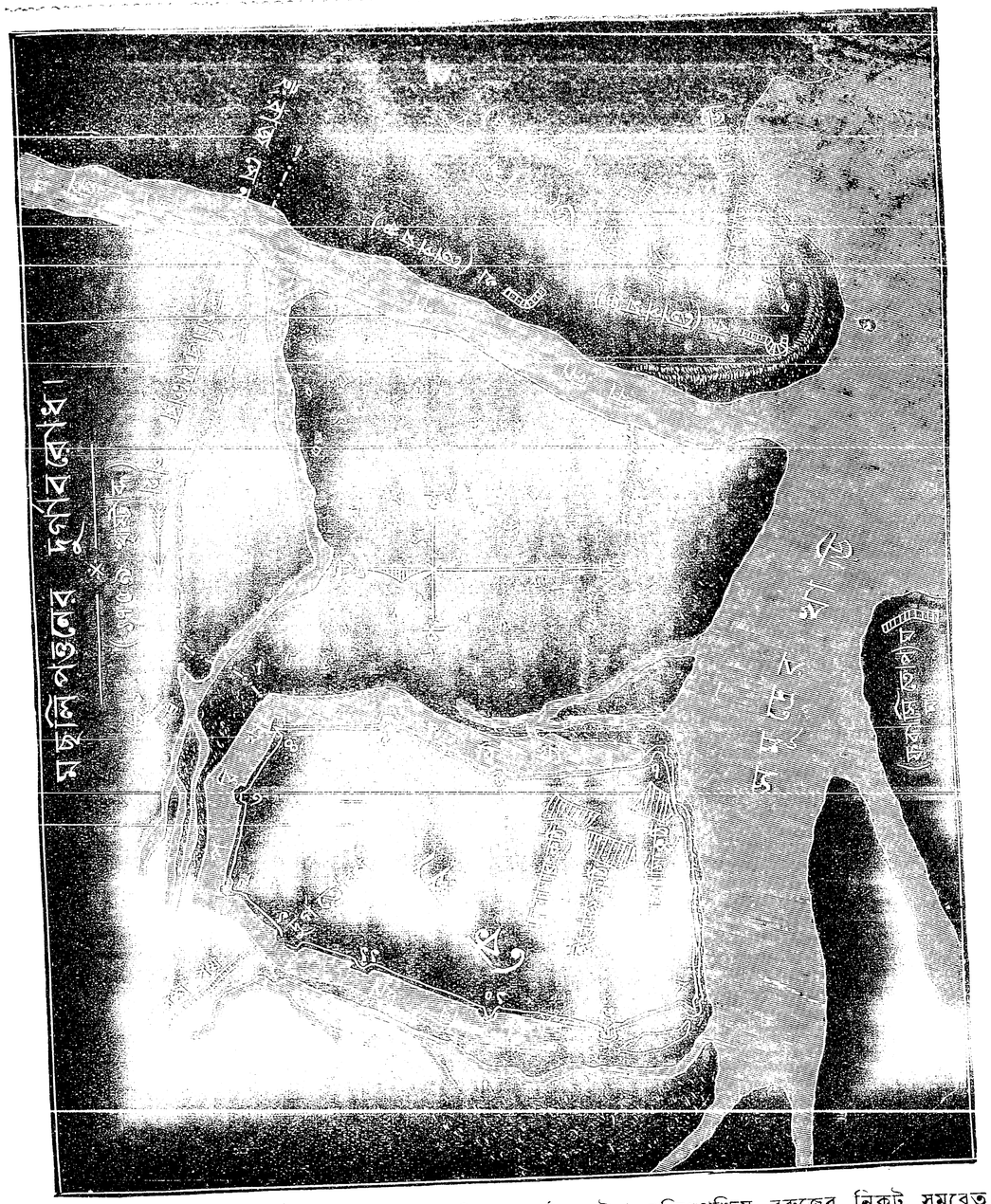

মছলিপত্তনের দুর্গের বেষ্টন।

বিসর্জ্জন করিতে হইবে! তথাপি সেনাদল ভীত হইল না।

দুর্গাক্রমণের প্রণালী এইরূপ স্থির হইল যে, রাজা আনন্দরাজ গজপতি তাঁহার সেনাদল লইয়া দুর্গদ্বারের সম্মুখে উপনীত হইবেন, কাপ্তান নক্স প্রথমসংখ্যক লাল পল্টন লইয়া দক্ষিণপশ্চিম বুরুজের নিকট সমবেত হইবেন; অবশিষ্ট সেনা দুইদলে বিভক্ত হইয়া উত্তরপূর্ব্ব বুরুজের নিকট প্রাচীরারোহণের চেষ্টা করিবে; রজনী দ্বিপ্রহরের ঘণ্টা ধ্বনিত হইবামাত্র প্রত্যেক দল একসঙ্গে আক্রমণ করিবে।

সেদিন সায়ংকালে সকলেই আহারাদি শেষ করিয়া নীরবে নিঃশব্দে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইল; রজনী দশ ঘটিকার পর একে একে নির্দ্দিষ্ট স্থানাভিমুখে যাত্রা করিতে আরম্ভ করিল। যাত্রা করিবামাত্রই সকলে বুঝিল, আজ মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন। পথ নাই, আলোক নাই, সম্মুখে বিস্তীর্ণ সমুদ্রসৈকত ধূধূ করিতেছে, মধ্যে মধ্যে খাল ও নালা পথরোধ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে, উপরে নীল নভস্তলে তারকার ক্ষীণ জ্যোতি মৃদুমন্দ হাস্যের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে, সম্মুখে বিপুলদেহে দুর্গপ্রাচীর দণ্ডায়মান, প্রাচীরাভ্যন্তরে বহুশত বীরসন্তান নির্ভয়ে নিদ্রামগ্ন!

কাপ্তান নক্সের লালপল্টনদিগকেই সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হইতে হইল। তাহারা ফিরিল না; বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া নালার জলে নামিয়া পড়িল, জানু পর্য্যন্ত ডুবিল, কটিদেশ পর্য্যন্ত ডুবিল, অবশেষে বক্ষ পর্য্যন্ত জলস্পর্শ হইল;—তথাপিও একজনও ফিরিয়া চাহিল না; নালা পার হইয়া নিঃশব্দে আপনাপন সঙ্কেতভূমিতে দণ্ডায়মান হইল। *

ফরাসি-দুর্গে কেহ ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিল না; সেনাপতি নিদ্রামগ্ন, সেনাদল অচেতন, কেবল প্রহরিগণ ইতস্ততঃ পাদচারণ করিয়া বেড়াইতেছিল। দুর্গের প্রহরী এক, দুই, তিন, চারি করিয়া গণিয়া গণিয়া বারটা বাজাইয়া দিল, এক, দুই, তিন, চারি করিয়া বারটা পর্য্যন্ত ঘণ্টাধ্বনি দুর্গপ্রাচীরে প্রতিধ্বনিত হইয়া নৈশনীরবতায় মিলাইয়া গেল; এমন সময়ে কাপ্তান নক্সের লালপল্টনের কামান ভীমকলরবে গর্জ্জন করিয়া উঠিল; সঙ্কেতধ্বনি শ্রবণ করিবামাত্র সিংহদ্বারের নিকট আনন্দরাজ গজপতির সেনাদল মহোল্লাসে সিংহনাদ করিয়া উঠিল;—সুপ্তোত্থিত ফরাসী-সেনা সহসা উভয় দিক হইতে শত্রুসেনার আক্রমণ লক্ষ্য করিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া সেই সেই দিকেই ছুটিতে লাগিল;—তখন প্রকৃত আক্রমণকারিগণ পূর্ব্বোত্তর কোণে ধীরে ধীরে প্রাচীরারোহণ করিতে লাগিল!

চারিদিকেই সমরানল জ্বলিয়া উঠিল; কোন্ দিকে কৃত্রিম আক্রমণ আর কোন্ দিকে প্রকৃত আক্রমণ,—কাহার সাধ্য যে সহসা তাহা নির্ণয় করিতে পারে? ফরাসি সেনাপতি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আদেশ পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন, তুমুল কোলাহলে দুর্গবাসিগণ জাগরিত হইয়া ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল; সেই অবসরে ইংরাজসেনা দুর্গ প্রাচীরের কিয়দংশ অধিকার করিয়া ফেলিল। তখন আর শত্রুমিত্র চিনিয়া লইবার উপায় রহিল না; চারিদিকে শত শত শত্রু মিত্র কাতারে কাতারে ধরাশায়ী হইতে লাগিল!

দুইটি বঙ্গীয় রণবাদক—উভয়েই অল্পবয়স্ক,—মেজর ইয়র্কের উভয় পার্শ্বে রণডঙ্কা বাজাইতে বাজাইতে দুর্গ প্রবেশ করিয়াছিল। দুর্গদ্বারে আসিয়া সকলেই থমকিয়া দাঁড়াইল, কেবল সেই দুইটি রণবাদক আর ইয়র্ক প্রবেশ করিলেন; শত্রুসেনার প্রচণ্ড পীড়নে একটি গোলাতে তিনজনেরই মর্ম্মস্থান ছিন্ন হইয়া গেল; দর্শকেরা চাহিয়া দেখিল যে, আহত রণবাদকদ্বয় তখনও মহোৎসাহে ডঙ্কা-নিনাদে মত্ত রহিয়াছে; ধরাধরি করিয়া বাহিরে আনিতে না আনিতে তিনজনেরই প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল! *

ইংরাজ-সেনাদলে অনেকেই ধরাশায়ী হইতে লাগিল; কিন্তু তথাপি আক্রমণবেগ প্রতিহত হইল না; বন্যাস্রোতের ন্যায় তরঙ্গের পর তরঙ্গে গোরা এবং লাল-পল্টন দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল; উন্মত্ত পিশাচের ন্যায় বিকট সিংহনাদ করিয়া অন্ধকারে শত্রুসেনার উপর আপতিত হইতে লাগিল;—এমন সময়ে সহসা তূর্য্যধ্বনি হইল, সহসা রণকোলাহল শান্তিলাভ করিল, সকলে বিস্মিতহৃদয়ে শুনিতে পাইল যে ফরাসি সেনাপতি সসৈন্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, দুর্গজয় সুসম্পন্ন হইয়াছে!

প্রভাতে ইংরাজের রণকৌশল প্রকাশিত হইয়া পড়িল; প্রভাতের তরুণ তপন লাল পল্টনের বীরকীর্ত্তি উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল; দুই সহস্র ইংরাজসেনা, তাহার অধিকাংশই লাল পল্টনের বাঙ্গালী সিপাহী,—তাহাদের বাহুবলে পরাস্ত হইয়া তাহাদের হস্তে বহুসহস্র ফরাসি সেনা বন্দী হইয়াছে, ইহা ইতিহাসে লিখিত হইলেও সহসা বিশ্বাস করিতে সাহস হয় না! এমন দুর্গজয় কয়জনের ভাগ্যে ঘটিয়াছে! যাহারা এইরূপে প্রতিকুল অবস্থায় পতিত হইয়াও মছলিপত্তনের দুর্গজয় করিয়াছিল,—হায়! তাহাদের স্বদেশের কোন কবিই তাহাদের বীরকীর্ত্তি চিরস্মরণীয় করিয়া দিলেন না!*

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

সমাপ্ত।

* As the party led by Captain Knox, comprised entirely of Sipahis, seven hundred in number, destined to wade through the swamp and attack the South-west angle, had a longer distance to traverse, they started first.——*Malleson's Decisive Battles of India*, p. 105.

* এই কাহিনী ম্যালিসন্ এবং ব্রুম্ উভয়েই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। স্বদেশের সমসাময়িক লোকে ইতিহাস লিখিলে এমন কত কাহিনী সংকলিত হইতে পারিত! ইংরাজ রণবাদক হইলে হয়ত তাহাদের নামে মছলিপত্তনের দুর্গদ্বারে জয়স্তম্ভ নির্ম্মিত হইত!

* এসকল কীর্ত্তিকাহিনী এখন ঐতিহাসিক গহ্বরে পুরাতনের চিতাভস্মরাশিতে আবৃত হইয়া রহিয়াছে! কিন্তু এসকল কথা যখন লোকসমাজে পরিচিত ছিল, ওয়াল্টার হ্যামিল্টন সেই সময়ে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে সত্যানুরোধে সাধারণ জনাপবাদের প্রতিবাদ করিয়া বাঙ্গালীর সমরকৌশলের সাক্ষ্যদান করিতে হইয়াছিল। ইতিহাস আলোচনা করিলে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে হ্যামিল্টন যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার এক বর্ণও মিথ্যা নহে!

ঋণ-পরিশোধ।

—০ঃ০ঃ০—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিশ্বনাথের বিশ্বসংসারে এক ভাই ভিন্ন আর কেহ না থাকিলেও গ্রামের সাড়ে ষোল আনা লোক তাহাকে 'বিশু খুড়ো' বলিয়া ডাকিত। পাঁচ বৎসরের বালক হইতে পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধ—সকলেরই সে খুড়ো, অথচ তাহার বয়স পঁয়ত্রিশের বেশী নহে। বিশ্বনাথের এই সার্ব্বজনিক পিতৃব্য খেতাবটি লাভ করিবার, বোধ করি, একটুকু কারণও ছিল। ইংরেজী লেখা পড়া না জানিলেও এ কালে অধিকাংশ লোকের চা'ল চলনের ভিতর অনেকখানি বিলাতী গন্ধ ফুটিয়া উঠিতে দেখা যায়, কিন্তু বিশ্বনাথের আচার-ব্যবহারে কিছুমাত্র বিলাতী প্রভাব প্রবেশ করিতে পারে নাই; তাহার সেই দেশী সাধাসিধা ভাব খানা সুপরিচ্ছন্ন ধুতি চাদরের মত তাহার সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর মানাইত। সে অল্পভাষী ছিল, বিশেষ আবশ্যক ভিন্ন অপরিচিত লোকের সঙ্গে কথা কহিত না, সহসা কাহাকেও বিশ্বাস করিত না, এবং কাহারও সহিত প্রথম আলাপের সময় ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া এমন সন্দিগ্ধচিত্তে আলাপ করিত যে, সহজেই মনে হইত, এমন কর্কশপ্রকৃতি, অরসিক লোক সমস্ত আসামে আর দ্বিতীয় নাই, কিন্তু যে একবার তাহার হৃদয়ের অভ্যন্তরে স্থান পাইয়াছে, কেবল সেই জানিত, তাহার হৃদয় এবং প্রকৃতি ঠিক্ সাধারণ মনুষ্যের মত ছিল না।

সকলে তাহার গাম্ভীর্য্য পছন্দ করিত না, কিন্তু সেজন্য তাহাকে অপরাধী করা যায় না; আমোদ প্রমোদ তাহার ভাল লাগিত না। তাহার গ্রামস্থ লোকের অপরিমিত হাসি, গল্প, গান শুনিয়া অনেক সময়ই তাহার মনে হইত, পরমেশ্বর মানুষকে এ জিনিসগুলা প্রয়োজনের অপেক্ষা অনেক অতিরিক্ত পরিমাণে দান করিয়াছেন। পৃথিবীতে মনুষ্যের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাহার খুব মহৎ ধারণা ছিল, এবং আপনার জীবন দিয়া সে প্রতিনিয়ত তাহা পালন করিত, কিন্তু এজন্য তাহার মুখে কোন দিন উচ্চ ঝঙ্কার শুনা যায় নাই।

তাহার ভাই আনন্দ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির লোক। সংসারের কোন বিষয়ে তাহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। বিশ্বনাথ অপেক্ষা সে দশ বছরের ছোট, অথচ দাদার সঙ্গে সে এমন ব্যবহার করিত, যেন তাহার বুদ্ধি এবং ক্ষমতা দাদার অপেক্ষা অনেক বেশী। ভ্রাতার উপর বিশ্বনাথের অগাধ বিশ্বাস ছিল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন দিন আনন্দকে কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে দেখা গেল না। বাল্যকাল হইতেই গৃহ ছাড়িয়া বিদেশে পলায়ন তাহার একটা রোগের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল, কিন্তু পিতার নিকট যতই সে গুরুতর মুষ্টিযোগ লাভ করুক, কিছুতেই তাহাকে সজ্ঞান করিতে পারে নাই। পিতার মৃত্যুর পর ইদানীং কিছুদিন হইতে সে দাদার সংসারের কর্ত্তা হইয়া আছে। বিশ্বনাথ ভ্রাতার সকল আবদার সহ্য করিয়া মাতার ন্যায় স্নেহ ও ধৈর্য্য এবং পিতার ন্যায় যত্ন ও উদার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার সহিত তাহাকে প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এই কর্ত্তব্য পালনের জন্য কোন দিন তাহার দাদার কাছে আপনাকে কৃতজ্ঞ বলিয়া মনে করিত কিনা, তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

বিশ্বনাথের একখানি ছোট দোকান ছিল। পাহাড়ের নীচে একটু সমতল ক্ষেত্রে একটা হাটের মত স্থান; গ্রামের মধ্যে সেইটাই প্রকাশ্য স্থান। এইখানে একটা বড় গাছের ছায়ায় তাহার ছোট দোকান খানি; চা'ল ডাল প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যরাজি অনেকদূর হইতে কিনিয়া আনিয়া সে এই দোকানে সজ্জিত রাখিত। সংসারে পরিবারের মধ্যে তাহারা দুই ভাই মাত্র, সুতরাং এই দোকানের আয়ে তাহাদের দিনপাত হওয়া কঠিন ছিল না।

অল্প বয়সেই বিশ্বনাথের উপর সংসারের ভার পড়িয়াছিল। গুরুতর সাংসারিক চাপে তাহার জীবনের উৎসাহ কিম্বা স্ফূর্ত্তি বিকশিত হইতে পায় নাই; গ্রীষ্মের স্তব্ধ মধ্যাহ্নে একাকী আপনার ক্ষুদ্র দোকান খানিতে বসিয়া দূরবর্ত্তী পাহাড়ের উপর রৌদ্রকরোজ্জ্বল ধূসর বনশ্রেণীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া নিজের অকিঞ্চিৎকর জীবনটা তাহার কাছে কখন কখন নিতান্ত রহস্যময় বলিয়া মনে হইত। পৃথিবীতে প্রত্যেক লোকের একটা না একটা সখ থাকে; কিন্তু আনন্দ বলিত, "কোন সখ নাই এমন লোক জগতে একজন মাত্র আছে—সে আমার দাদা বিশ্বনাথ।"

কিন্তু একথা স্বীকার করা যায় না। সৌন্দর্য্যবিষয়ে বিশ্বনাথ উদাসীন ছিল না; আকাশে কালো মেঘ উঠিলে, পার্ব্বত্যতরুমূলে শিখিদল মুক্তপুচ্ছে নৃত্য আরম্ভ করিলে, লতাকুঞ্জে শিশিরসিক্ত কুসুমপুঞ্জ প্রস্ফুটিত হইলে এবং জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে দূরবর্ত্তী গিরিগুহা হইতে জলপ্রপাতের অশ্রান্ত কলধ্বনি বায়ুপ্রবাহে ভাসিয়া আসিলে, তাহার হৃদয়ের উপর একটা অম্লান সৌন্দর্য্যের স্নিগ্ধ মোহজাল বিস্তৃত হইত। শুধু তাহাই নহে; তাহার প্রতিবেশিনী যুবতী সারদা যখন অপরাহ্নে সূক্ষ্ম 'মেখলা' খানিতে আপনার যৌবনমহিমাবিমণ্ডিত তনুযষ্টি বেষ্টন করিয়া অদূরবর্ত্তী নির্ঝরিণী হইতে জল লইয়া আসিত, তখন তাহার আগ্রহ-ও-আবেগপরিপূর্ণ উজ্জ্বল চক্ষু দুটী উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিত। আবার সন্ধ্যা বেলা বাসন্তী রঙ্গের 'মেখলা'য় দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, কবরীতে কয়েকটা বনফুল গুঁজিয়া, সুমধুর প্রসন্ন দৃষ্টিতে কজ্জলরঞ্জিত চক্ষু উৎফুল্ল করিয়া, সারদা হাসিতে হাসিতে তাহার দোকানে তৈল কিম্বা লবণ কিনিতে আসিলে বিশ্বনাথের বক্ষের স্পন্দন কিঞ্চিৎ দ্রুত ও ধমনীতে রক্তস্রোতু অপেক্ষাকৃত চঞ্চল হইয়া উঠিত; এবং দেনা পাওনা উপলক্ষে দৈবাৎ উভয়ের করস্পর্শ হইলে সে কিয়ৎকালের জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়া রহিত।

সারদার এখনও বিবাহ হয় নাই; ইচ্ছা সত্ত্বেও কোন দিন বিশ্বনাথ বিবাহ সম্বন্ধে তাহার মতামত জিজ্ঞাসা করিতে ভরসা পায় নাই; তা'ছাড়া নিজের জীবনের সুখ দুঃখের সমস্ত ভার একটা যুবতীর স্কন্ধে চাপাইয়া, তাহাকে আজীবনের মত বিপন্ন করিয়া তুলিবার ক্ষুধিত আকাঙ্ক্ষার মধ্যে যে কিঞ্চিৎ স্বার্থপরতা এবং হৃদয়হীনতা আছে, বিশ্বনাথের চক্ষে তাহা কদর্য্য বলিয়া প্রতীয়মান হইত; কিন্তু আপনার বাসনা-ও-ভ্রান্তিবিজড়িত হৃদয়খানিকে বক্ষের নিভৃত অন্তরালে দিবারাত্রি আড়াল করিয়া রাখিতেও তাহার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। তাহার উন্মত্ত কল্পনা আকাশ জুড়িয়া আকাঙ্ক্ষাজাল বিস্তার করিয়া অবশেষে অসীম ধৈর্য্য সহকারে তাহা টানিয়া নামাইত, কিন্তু তাহাতে বিশ্বের আর কোন দ্রব্যই বাধিয়া আসিত না, কেবল একখানি মুগ্ধ, রক্তাপ্লুত, কুণ্ঠিত হৃদয় সুদৃঢ় বেদনাবন্ধনের মধ্যে লুণ্ঠিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিত; সে হৃদয় তাহার নিজের।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বসন্তকালের একটা সুন্দর অপরাহ্নে বিশ্বনাথ দোকানে বসিয়া আছে। সূর্য্যাস্তের আর বিলম্ব নাই, দূরে ঘনবনে কমলালেবুর ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে; স্থানে স্থানে সহকারশাখায় চূতমুকুলের সুদৃশ্য স্তবক, বনপুদিনার শ্যামাঞ্চলে পাহাড়ের বহুদূর পর্য্যন্ত শ্যামাভ, মিশ্র গন্ধে বসন্ত-গোধুলির অলস বায়ুস্তর ভারাক্রান্ত। বৃক্ষশাখায় বিহঙ্গমকুল হর্ষকোলাহল আরম্ভ করিয়াছে এবং গ্রাম্য বিগ্রহ দধিবামন দেবের মন্দিরপ্রাঙ্গন হইতে হোলী উৎসবের সঙ্গীত উত্থিত হইতেছে। আজ বাসন্তী পূর্ণিমা। যে সজীব মোহিনী প্রতিমার রূপজ্যোতি নিশিদিন বিশ্বনাথের অন্ধকারপূর্ণ হৃদয় আলোকিত করিতেছিল, আজিকার চতুর্দ্দিকের সমস্ত গান ও বিচিত্র গন্ধ, অতীত সুখস্মৃতির সুপরিস্ফুট সহস্র চিত্র, ভবিষ্যতের সুখময় কল্পনার অজস্র প্রমত্ত হিল্লোল, মুক্ত প্রকৃতির সুবিমল সৌন্দর্য্য এবং বসন্ত সন্ধ্যার এই স্নিগ্ধ শান্তি সেই দেবীর আরাধনার জন্য তাহার হৃদয়ের নিভৃত নিকুঞ্জে একগাছি অম্লান মাল্য রচনায় নিযুক্ত ছিল। তাহার হৃদয়ে কাব্যরসের আধিক্য না থাকিলেও এসময় সে অনুভব করিতেছিল, এই বিপুল বিশ্বে নিঃসঙ্গ নিরাশ্রয় মানবহৃদয় আর একখানি সমবেদনা পূর্ণ স্নেহভরা নারী হৃদয়ের সহিত বিজড়িত না হইলে অল্প আঘাতেই ভাঙ্গিয়া পড়ে। কিন্তু তখনই তাহার মনে পড়িল, সেই পুষ্পিত দেহ লতা, সেই পরিপুষ্ট, সমুন্নত, নিটোল বরাঙ্গে যৌবনের দুর্দ্দমনীয় আবেগ এবং লাবণ্য তাড়িতের চঞ্চল তরঙ্গ অনেক সম্ভ্রান্তবংশীয় রূপবান যুবকের চপলচিত্ত মুগ্ধ করিবার যোগ্য; প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পদার্পণ করিয়া রূপগৌরবহীন তুচ্ছ

জীবনে তাহার দুরাশা পূর্ণ হইবার নহে; এমন কি তাহার ছোট ভাই আনন্দও তাহাকে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য বলিয়া মনে করে। এইরূপে তাহার নিজের ক্ষুদ্রতা তাহার নিজের কাছেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে আনন্দ একখানি কুঙ্কুমরঞ্জিত লোহিত বস্ত্রে দেহ আচ্ছন্ন করিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। হোলির আমোদে যোগ দান করিয়া তাহার আসবোন্মত্ত চিত্ত কিঞ্চিৎ তরল অবস্থায় ছিল। সে আসিয়াই বিশেষ আগ্রহের সহিত তাহার দাদার সঙ্গে গল্প আরম্ভ করিল। অবশেষে বলিল, "দাদা, আমার মাথায় একটা মস্ত মতলব এসেছে; এখন তা তোমাকে খোলসা ক'রে বোঝান দরকার নেই; আমাকে গোটা ষাট সত্তর টাকা ধার দেও; আমি তোমাকে ভরসা দিচ্ছি শীঘ্র এ টাকা শোধ দেব। আমি একটা কারবার খুলতে চাই।"

বিশ্বনাথ সবিস্ময়ে বলিল, "ষাট সত্তর টাকা আমি কোথায় পাব? হাটে হ'তে চাল কিনে আনবার জন্যে, আর কিছু ঋণ আছে তা পরিশোধ করবো ব'লে, অতি কষ্টে গোটা পঞ্চাশ টাকা জমিয়ে রেখেছি।"

আনন্দ ব্যগ্রভাবে বলিল, "তবে তাই দেও দাদা। তোমার কিছু ভয় নেই; আমাকে অবিশ্বাস করোনা। আমি সুদ সমেত তোমার টাকা ফেরত দেব।"

বিশ্বনাথ স্থিরভাবে উত্তর করিল, "ভায়ে ভায়ে আবার দেনা পাওনা কিরে হনুমান? আমার নিজের জন্যে কোন ভাবনা নেই; তা যখন তোর এত আবশ্যক বলছিস্; তখন সন্ধ্যের পর আসিস্, দেব।"

"কিন্তু আজই আমি চাই; আমার বড় দরকার" বলিয়া আনন্দ আবার কোথা চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎপূর্ব্বে সারদা যথানিয়মে বিশ্বনাথের দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইল। এটা তাহার প্রাত্যহিক কাজের মধ্যে। অপরাহ্নে ঝরণার জল আনিতে যাওয়া, গা-টি মুছিয়া মনোমত খোপা বাঁধিয়া, কপালে একটি ছোট টিপ কাটিয়া একটি পান চিবাইতে চিবাইতে দর্পণে মুখখানি দেখা যেমন তাহার প্রতিদিনের নিয়মিত কাজের মধ্যে, সেইরূপ প্রতিদিন অপরাহ্নে কোন না কোন উপলক্ষে বিশ্বনাথের দোকানে গিয়া গোটাদুই কথা বলিয়া আসা তাহার নিয়মিত কাজ ছিল, কিন্তু তাহার সেই নিত্যসমাগমের মধ্যে একটা অসাধারণ অবহেলার ভাব প্রকাশিত হইত;—যেন বিশ্বনাথকে একটু অনুগৃহীত করা ছাড়া এখানে আসিবার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। বিশ্বনাথও ইহাই বিশ্বাস করিত।

আজ হোলী উপলক্ষে সারদা কিছু পরিপাটী করিয়া বেশ ভূষা করিয়াছে। কেন বলা যায় না, সারদা আজ কিছু রঙ্গের সহিত আলাপ আরম্ভ করিল; বলিল, "কি দাসের পো, আজও যে তেমনি দোকানের কাছে ব'সে মাটী ভাপাচ্ছো? ও পাড়ায় হোলীর আমোদ, গান বাজনার এত ধূম, তোমার কি কিছুই ভাল লাগে না?"

দাসের পো সতৃষ্ণ নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া মৃদুহাস্যে উত্তর করিল, "ভাল যাকে লাগে তার আশাতেই এতক্ষণ বসে ছিলাম। এতক্ষণ কিছুই ভাল লাগছিল না! এখন সকলই ভাল বোধ হচ্ছে।"

"নেও, আর কতকগুলা মিথ্যা কথা বল্‌তে হবে না; তোমাদের পুরুষ মানুষের মুখে মিথ্যা বল্‌তে যদি একটু বাধে! আমার জন্যে যেন ওঁর চোখে ঘুম নেই।" বলিয়া সারদা সাদরে তাহার গালে একটা ঠোনা মারিয়া চম্পকাঙ্গুলির কুসুমসুকোমল স্পর্শে তাহার হৃদয়ে তড়িৎপ্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া ঘুরিয়া আসিয়া তাহার পাশে বসিল। তাহার পর পুলকপ্রদীপ্ত চক্ষুদুটি বিশ্বনাথের দিকে প্রসারিত করিয়া বলিল, "সত্তি ভাই, আমি লুকিয়ে, সৈ'এর বাড়ী হ'তে মিন্‌সেদের কাণ্ডখারখানা দেখে এলাম, খালি বেসুরো চেঁচাচ্চে, আর আবির কুঙ্কুমের শ্রাদ্ধ কর্চ্চে। তোমার ভাইটিও কম নয়, কিন্তু তার গলাটি যে ভাই মিঠে, এমন মিটে আওয়াজ আর কারো নেই।"

"কে, আনন্দ? ও এক আধটু গাইতে পারে শুনেছি; তোমাকে ভুলোবার ক্ষমতা ওর আছে তা জান্‌তাম না।" বলিয়া বিশ্বনাথ একটু হাসিল।

সারদা আবার সকোপে সভ্রূভঙ্গে তাহার দিকে চাহিল; এবং বিশ্বনাথের পিঠে এমন একটা ধাক্কা দিল যে সে পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে সারদার বস্ত্র ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। সে অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি তাহা যথাস্থানে সংরক্ষিত করিয়া বিশ্বনাথের হাত ধরিয়া তাহাকে উঠাইয়া বসাইল, তাহার পর তাহার আরো নিকটে আসিয়া বসিল। চাঁদ তখন পূর্ব্বাকাশের ঊর্দ্ধদেশ হইতে একটা গিরিশৃঙ্গের

পাশ দিয়া, একটা বড় গাছের উপর দিয়া সেই সুপরিষ্কৃত সমতল আঙ্গিনাখানির উপর কোমল দৃষ্টিনিক্ষেপে এই অসমবয়স্ক নরনারীর কৌতুকদ্বন্দ দেখিতেছিল; ক্লান্ত নৈশবায়ু আরণ্যফুলের স্নিগ্ধগন্ধ, নির্ঝরিণীর মৃদুকলতান, দূর কাননের অন্তর্লীন কোকিলবধূর প্রেমোচ্ছ্বসিত স্বর-লহরী বহিয়া অতি লঘু অদৃশ্যপক্ষে নিঃশব্দে উড়িয়া যাইতে যাইতে এক একবার সারদার চূর্ণ কুন্তলগুচ্ছ স্পর্শ করিতে-ছিল; এবং কোথাও কেহ ছিল না।

অনেকক্ষণ পরে নিশ্বাস ফেলিয়া বিশ্বনাথ ডাকিল, "সারদা!"

সারদা বলিল, "কান আছে, কি বল্‌বে বল।"

বিশ্বনাথ কিঞ্চিৎ ম্লানভাবে উত্তর দিল, "ঐ জন্যই ত তোমাকে কিছু বল্‌তে ভরসা হয় না। কোনদিন আমি তোমাকে বুঝতে পারলাম না, কেবল দগ্ধই হচ্ছি; জানি না এ কি অগ্নি—কিন্তু আজ আর কোন্ কথা গোপন কর্‌বো না,—জিজ্ঞাসা করি চিরটা জীবন কি সন্ন্যাসীই থাকবো? জীবনের উপর যে একেবারেই মায়া নেই তা নয়।"

"আমি আবার অগ্নি হ'লাম কি ক'রে? কারো চালে ব'সে ত অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে ফেলিনি। জীবনের উপর মায়া থাকে, বিয়ে থা ক'রে সুখী হওনা, আটকাচ্চে কে? তবে তোমার সে আনন্দটা দেখা বোধ করি আমার অদৃষ্টে নেই।"

বিশ্বনাথ যেন আকাশ হইতে পড়িল, সবিস্ময়ে বলিল, "কেন, তুমি কি এখানে থাক্‌বে না?—কোথা যাবে? কেন যাবে?"

সারদা বিশ্বনাথের মুখের উপর অচঞ্চল দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিল, "কোথা যাব ঠিক নেই; যে দিকে দুটি চক্ষু যায় যাব; কেন যাব জানি না।"

উচ্ছ্বসিত উদ্বেগ দমন করিয়া বিশ্বনাথ আবার জিজ্ঞাসা করিল, "একা যাবে?"

এমন সময় প্রাঙ্গনে মনুষ্যের একটি ছায়া আসিয়া পড়িল। উভয়ে মাথা তুলিয়া দেখিল, সে আর কেহ নহে আনন্দ; সুতরাং উভয়ের কথা অসমাপ্ত থাকিয়া গেল। তখন সারদা উঠিয়া ত্রস্তা হরিণীর মত এক লম্ফে দূরে সরিয়া দাঁড়াইল, এবং, সরোবরের নির্ম্মল প্রশস্ত বক্ষের উপর দিয়া রাজহংসী যেমন নিঃশব্দে ও অবলীলাক্রমে চলিয়া যায়, তেমনি ভাবে গৃহে চলিয়া গেল।—যতক্ষণ দৃষ্টি চলিল, বিশ্বনাথ মুগ্ধনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিল। আনন্দ বলিল, "দাদা, টাকা; আমার সময় হইয়াছে; এখনি টাকা দাও।"

সুখের স্বপ্ন ও মোহের মরীচিকা মন হইতে সবলে বিতাড়িত করিয়া বিশ্বনাথ গৃহে প্রবেশ করিল, এবং একটি পুরাতন সিন্দুকের ভিতর হইতে আপনার বক্ষপঞ্জরের ন্যায় প্রিয় টাকা পঞ্চাশটি বাহির করিয়া আনন্দের হস্তে সমর্পণ করিল। এই সময় একবার মাত্র তাহার মনে হইয়াছিল, ঋণ-পরিশোধ ব্যতীত এই টাকাগুলিতে আর একটি কাজও হইতে পারিত;—এতগুলি টাকা খরচ করিয়াও কি সার-দাকে বিবাহ করা অসম্ভব?

কিন্তু আনন্দের মনে তখন কি ভাব হইতেছিল, তাহা অন্তর্য্যামী জানেন। আনন্দ টাকাগুলি হস্তগত করিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে অদৃশ্য হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রভাতে কালীনগরের গৃহে গৃহে একটি নূতন আন্দোলনের বাত্যা উঠিল। গতরাত্রি হইতে আনন্দ কোথায় চলিয়া গিয়াছে, যুবতী সারদাকেও পাওয়া যাই-তেছে না। ব্যাপার কি তাহা সহজেই সকলে অনুমান করিয়া লইল। আনন্দ বিশ্বনাথের কতকগুলি টাকা হস্তগত করিয়া গিয়াছে, এবং নির্ব্বোধ বুঝিয়া কিরূপে তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, সে সম্বন্ধে নানালোকে নানা কথা রচনা করিয়া বলিতে লাগিল, কিন্তু এবিষয়ে কাহারো কৌতূহল বিদূরিত করা বিশ্বনাথ আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিল না। সুতরাং গ্রাম্য নরনারীগণ বিশ্বনাথের নির্ব্বু-দ্ধিতারই অধিক দোষ দিতে লাগিল।

কিন্তু এই আরোপিত বুদ্ধিহীনতার জন্য বিশ্বনাথের মনে কিছু মাত্র আক্ষেপ বা অনুতাপের উদয় হয় নাই। তাহার মত গরীবের নিকট পঞ্চাশ টাকা উপেক্ষার বস্তু নহে, কিন্তু বিশ্বাসের মূল্য ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক বলিয়া তাহার ধারণা ছিল।

এদিকে তাহাকে রিক্তহস্ত বুঝিয়া তাহার উত্তমর্ণগণ টাকার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল, পুরাতন দোকান ঘরখানি মেরামত অভাবে একেবারে বাসের অযোগ্য হইয়া

উঠিল; দোকানের পণ্যদ্রব্য ফুরাইয়া আসিল এবং, উন্মত্ত তরঙ্গরাশি প্রত্যেক আঘাতে যেমন নদীতীর প্রতি মুহূর্ত্তে জীর্ণ করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলে, তেমনি তাহার হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে আন্দোলিত চিন্তাবেগ তাহাকে প্রতিদিন অধিকতর জীর্ণ করিয়া ফেলিল; সে অতি শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধত্বের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। শেষে বিশ্বনাথ যখন দেখিল দোকানে আর কোন জিনিষ নাই, উত্তমর্ণের টাকা পরিশোধ করিবার আর কোন সম্ভাবনা নাই, অথচ যেমন করিয়া হোক তাহা পরিশোধ করিতেই হইবে, তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া চা বাগানে খাটিবার জন্য একজন কুলী আড়-কাটীর কাছে সে আত্মবিক্রয় করিল। যে দাসখতের অঙ্গী-কার অতি কঠিন, যে দাস্যবৃত্তির মধ্যে কিছুমাত্র স্বাধীনতা নাই এবং যাহা ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, আলিঙ্গন করিলে জীবনে নিষ্কৃতি লাভের সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প, সেরূপ দাসত্বকে আত্মবিক্রয় অভিধা প্রদান করিলে বোধ করি অন্যায় বলা হয় না। বিশ্বনাথ কুলীজীবনের বেদনা বুঝিত, তাহাদিগের প্রতিদিনের কর্ত্তব্য কি কঠিন তাহা তাহার অজ্ঞাত ছিল না; সে বুঝিতে পারিল, সে স্বহস্তে তাহার জীবনদীপের শান্তিতৈলটুকু একটি অপরিচিত পাহাড়ের উপর চাবাগিচার সেই কঠিন মৃত্তিকায় অবহেলে ঢালিয়া ফেলিতে চলিয়াছে, কিন্তু নিরুপায়,—তাহাকে ঋণ পরিশোধ করিতেই হইবে। সে দোকানখানি বিক্রয় করিয়া, এবং আড়কাটীর নিকট যে টাকা অগ্রিম পাইল, তাহার দ্বারা দেনাগুলি পরিশোধ করিয়া অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য চা-বাগিচায় খাটিতে চলিল। আজন্মের প্রীতির আগার, সুমধুর-শৈশবস্মৃতি-বিজড়িত পৈত্রিক ভিটা খানি তাহার হস্তান্তর করিবার ইচ্ছা ছিল না। তাহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত এই গৃহচ্ছায়ায় অতিবাহিত করিবার আকাঙ্ক্ষা-টুকু তাহার জীবনের অন্তিম সম্বলের মত হইয়া রহিল। তাই তাহার গৃহ দুখানি তাহার প্রতিবেশী গোপীনাথের হাতে সমর্পণ করিয়া নীরবে বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া, গৃহ, গ্রাম ও আত্মীয়স্বজনের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। সংসারে তাহার কোন বন্ধুই ছিল না, কিন্তু আজ সে বিদীর্ণ হৃদয় দ্বারা অনুভব করিল, শত-অভাব-বিড়ম্বিত, দারিদ্র্য-সমাচ্ছন্ন, সঙ্গীহীন জীর্ণ গৃহের প্রতি অন্ধ মায়াকর্ষণ পৃথি-বীর কোন প্রেমের আকর্ষণ অপেক্ষা অল্প নহে।

বিশুখুড়োর বিদায়ে গ্রামের অনেকে দুঃখিত হইল। কোন বুদ্ধিমান্ বলিল, এমন নির্ব্বোধ দুনিয়ায় আর দ্বিতীয় নাই, নির্ব্বুদ্ধিতার দোষেই তাহাকে এতখানি পরিতাপ সহ্য করিতে হইল; শেষে কিনা দেনা শোধের জন্য সে চা-বাগানে খাটিতে গেল! চল্লিশ বছর বয়সেও যাহার ঘটে এতটুকু বুদ্ধির সঞ্চার হইল না, তাহার অদৃষ্টে যদি সুখ থাকে, তবে পৃথিবীতে অসুখী হইবে কে? কিন্তু বিশ্বনাথের মনে এরূপ কোন তত্ত্বেরই আবির্ভাব হয় নাই। সে প্রতিদিন প্রাণপণে তাহার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে লাগিল।

একদিন অপরাহ্নে বাগানের কার্য্যাবসানে বিশ্বনাথ তাহাদের ডিপোর বাহিরে এক বৃক্ষতলে কাপড় বিছাইয়া তাহার উপর বিশ্রাম করিতেছে, এমন সময় সে দেখিতে পাইল, একটি কুলী বালিকা একটা সন্দেশ হাতে লইয়া নাচিতে নাচিতে তাহার অদূরে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর অতি নিঃশঙ্কচিত্তে তাহার দিকে চাহিয়া ক্ষুদ্র অঙ্গুলী দ্বারা সন্দেশের এক এক টুকরা ভাঙ্গিয়া মুখে পূরিতে লাগিল। সহসা কোথা হইতে একটা বছর দশ এগারো বয়সের অর্দ্ধনগ্ন, ধূলিধূসরিত কালো ছেলে আসিয়া তাহার দিকে কঠোর দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক পরুষস্বরে বলিল, "এই জঙ্গলী, আমাকে একটু সন্দেশ দে।" জঙ্গলী সভয়ে সন্দেশটি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বুকের মধ্যে লুকাইল; তখন সেই কালো ছেলেটা হাসিয়া বলিল, "না, না, তোর সন্দেশ নেবো না; দেখি, কেমন সন্দেশ?" জঙ্গলী প্রথমে দেখা-ইতে ভরসা পাইল না, শেষে কি ভাবিয়া একটু দূরে সরিয়া গিয়া অতি সঙ্কোচের সহিত তাহার ক্ষুদ্র মুষ্টি প্রসা-রিত করিয়া বলিল, "এই দেখ; ভাল সন্দেশ না।"—তখন ছেলেটা ঝড়ের মত আসিয়া তাহার ক্ষীণমুষ্টির উপর একটি প্রচণ্ড থাবা মারিল এবং চক্ষের নিমিষে সন্দেশটা নিজের মুখবিবরে পুরিল। বালিকার ব্যথিত আর্ত্তনাদ সেই স্তব্ধ সন্ধ্যায় চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, সে মাটিতে পড়িয়া গড়াইতে আরম্ভ করিল; আর দুরন্ত কালো ছেলেটা যেন কিছুই হয় নাই এই ভাবে ধীরে ধীরে দূরে চলিয়া গেল।

বিশ্বনাথ স্তব্ধভাবে আগাগোড়া এ ব্যাপারটা দেখিল, কি ভাবিয়া তাহার চোখে জল আসিল। সেই বিশ্বস্ত-হৃদয়া, বুদ্ধিহীনা সরলা কুলী বালিকাকে এইরূপে প্রতা-

রিত হইতে দেখিয়া, বোধ করি, তাহার মনে একটু কষ্ট হইয়াছিল, তাহার চিন্তাক্লিষ্ট, ব্যথিত বিদীর্ণ বক্ষের অভ্যন্তর হইতে বুঝি একখানি নিতান্ত সরল এবং বিশ্বাসপ্রবণ হৃদয়, এই অলস নিদাঘসায়াহ্নে, এই জনবিরল ছায়াচ্ছন্ন উপত্যকাপ্রান্তে একটি কাতরা বালিকার অশ্রুসজল ম্লান নেত্রে আপনার অপূর্ণ আশার নিরানন্দময় অস্ফুট প্রতিকৃতি অঙ্কিত দেখিতে পাইল। সে বালিকাকে কোলে তুলিয়া লইয়া বাজারে গিয়া তাহাকে একটা সন্দেশ কিনিয়া দিল। বালিকার চোখের পাতা তখনও আর্দ্র ছিল, এই আশাতিরিক্ত উপহারে তাহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

বিশ্বনাথ তাহাকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া অন্যমনস্ক ভাবে চলিতে চলিতে পাহাড়ের একটা অতি নিভৃত অংশে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং একটা ঝরণার নিকট উপলখণ্ডের উপর বসিয়া দুইহস্তে মুখ ঢাকিয়া কত কথা ভাবিতে লাগিল। অবশেষে সন্ধ্যা গাঢ় হইলে দুই একটা নক্ষত্র আকাশের কোলে ফুটিয়া উঠিলে, সে উঠিয়া ধীরে ধীরে ডিপোতে ফিরিয়া গেল। কিন্তু সমস্ত রাত্রি ধরিয়া মানবজীবনের একটা জটিল রহস্যের কথা চিন্তা করিয়াও সে কোন মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিল না। রাত্রিশেষে তাহার একটু নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছিল, তখনও সেই সুপ্তিঘোরে তাহার হৃদয় ফুলিয়া ফুলিয়া যেন আক্ষেপভরে বলিতে লাগিল, "মানুষ মানুষকে এত প্রতারণা করে কেন? ফুলের মত শুভ্র হাসি দিয়া মানুষ কপটতার বিষ ঢাকিয়া রাখিতে এত যত্নবান্ কেন?"—বিশ্বনাথ এতদিন পরেও সারদাকে ভুলিতে পারে নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যাহারা নিন্দা কিম্বা প্রশংসার কোলাহলে নৃত্য করে, তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক, একটা বেশ সবেগ একটানা স্রোতের মধ্যে জীবনটাকে নিক্ষেপ করিয়া তাহারা দিব্য আরামে থাকে, সেই স্রোতোবেগে তাহাদের জীবনের দিন গুলি অতি দুঃসহ একঘেয়ে বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। কিন্তু যাহারা কর্ত্তব্যনীতিকেই জীবনের অপরিবর্ত্তনীয় অটল উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, নিন্দা-কণ্টক কিম্বা স্তুতিকুসুমের নিরন্তর আঘাত তাহাদিগকে সহজে বিচলিত করিতে সক্ষম হয় না; এবং কর্ত্তব্য কঠিন হইয়া উঠিলেও তদ্দ্বারা তাহাদের সংকল্প দৃঢ়তা লাভ করে। কিন্তু তথাপি নিত্য-উপেক্ষিত অসার মতামতের হীন ধূলিরাশি প্রতিদিন পদাহত ও প্রতিহত হইয়া তাহাদের নিশ্বাস রোধ করিয়া ফেলে, এজন্য কর্ত্তব্যপরায়ণ সংকল্পনিষ্ঠ জীবনও ব্যর্থ এবং নিতান্ত গৌরববিবর্জ্জিত বলিয়া অনুভূত হয়।

একটি নির্ভীক কর্ত্তব্যনিষ্ঠ জীবন বহন করিয়া এবং সাধারণের অনুসৃত পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একটু ভিন্ন দিক দিয়া চলিতে গিয়া বিশ্বনাথের পদে পদে হোঁছট লাগিতে লাগিল। যতদিন দেহে সামর্থ্য এবং ধমনীতে রক্তস্রোত প্রবল ছিল, ততদিন সে কিছুই গ্রাহ্য করে নাই, পড়িতে পড়িতে উঠিয়া গাত্র ধূলি ঝাড়িয়া আবার নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু এখন তাহার আর সে যৌবনসুলভ সামর্থ্য নাই, তাহার হৃদয়বৃন্তের ক্ষুদ্র আশাটুকু অনেকদিন শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে, তাই তাহার অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ সমস্ত জীবন অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন মসীমলিন ধরণীর ন্যায় অতি বৈচিত্রহীন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে সে কঠিন রোগে আক্রান্ত হইল।

রোগের প্রথম আক্রমণে বিশ্বনাথ শরীরের প্রতি কিছুমাত্র যত্ন বা মনোযোগ না করিয়া নিজের নিয়মিত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইত। হয়ত সে শরীর অপেক্ষা নিজের কর্ত্তব্যকেই মূল্যবান বলিয়া মনে করিত, হয়ত নির্দ্দিষ্টকাল পরিশ্রম করিবার জন্য অর্থ গ্রহণ করিয়া সে সময়টা অক্ষমভাবে বসিয়া থাকা তাহার নিকট নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইত। তাহার উপর প্রহরিগণের তাড়না ছিল না, সাধারণ কুলীদের সে অকৃত্রিম বন্ধু এবং হিতোপদেশদাতা ছিল, তাহারাও তাহাকে সর্দ্দারেরমত মান্য করিত। কিন্তু দেহও অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে জানে; অবশেষে এমন হইল যে আর সে পরিশ্রম করিতে পারে না, একটু খাটিলেই মাথা ঘুরিয়া উঠে চারিদিক অন্ধকার দেখে, এবং আহারে কিছুমাত্র রুচি নাই। একদিন ডাক্তার তাহার শরীর মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—"তোমার দীর্ঘকালের জন্য বিশ্রাম আবশ্যক, নতুবা তুমি বাঁচিবে না।" তখন চা-বাগানের সাহেব ম্যানেজার তাহাকে কয়েকটা টাকা দিয়া বিদায় করিয়া

দিলেন; দীর্ঘ সাত বৎসর পরে বিশ্বনাথ দেশে ফিরিয়া আসিল।

দেশে আসিয়া বিশ্বনাথ দেখিল তাহাদের গ্রামে পরিবর্ত্তনের অন্ত নাই। যাহাদিগকে বালক দেখিয়া গিয়াছিল তাহারা যৌবন লাভ করিয়াছে, বালিকাগণ পুত্রকন্যার জননী হইয়াছে, তাহার কত পুরাতন বন্ধু পৃথিবী ত্যাগ করিয়া গিয়াছে! তাহারও বুঝি মরিতে বিলম্ব নাই। যে গৃহে তাহার পিতামাতার মৃত্যু হইয়াছে, সেই শান্তিপূর্ণ স্নিগ্ধ গৃহচ্ছায়ায় চক্ষু চিরমুদ্রিত করিবার অন্তিম আশাটুকু লইয়া সে আজ গৃহে প্রত্যাগমন করিল। তাহার শরীরের পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাহার জীবিত অবশিষ্ট বন্ধুগণ সহসা তাহাকে চিনিতে পারিল না। কেবল একটি বিধবা রমণী সেই বিশীর্ণদেহ, পক্ককেশ, জরাব্যাধিবিশুষ্ক বৃদ্ধকে প্রথম দৃষ্টিতেই চিনিতে পারিল: এই বিধবা গোপীনাথের স্ত্রী রাধারাণী।

আজ দুই বৎসর হইল গোপীনাথের মৃত্যু হইয়াছে। তিন বৎসর বয়সের একটী কন্যা মাত্র লইয়া রাধারাণী বহু কষ্টে দিনপাত করিতেছে। সেই মসজিনী নারী এই কয় বৎসর ধরিয়া বিশ্বনাথের ক্ষুদ্র কুটীর দু'খানি দেবমন্দিরের ন্যায় সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে; কারণ বিশ্বনাথকে সে আন্তরিক শ্রদ্ধাকরিত এবং দেবরের ন্যায় আত্মীয় ভাবিত। এতদিন পরে রুগ্নদেহে, শ্রান্তহৃদয়ে তাহাকে দেশে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া সমবেদনায় তাহার নারীহৃদয় প্লাবিত করিয়া চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। নিজের দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া সমস্ত দেহপ্রাণ সমর্পণপূর্ব্বক সে সেই আত্মীয়-স্বজনবিহীন প্রবাসক্লান্ত রোগকাতর বৃদ্ধের সেবা করিতে লাগিল।

কিন্তু কেন বলা যায় না, এক একজন মানুষের জীবন চিরদুঃখের অভ্যন্তর দিয়া মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হয়। নীতিবিদেরা বলিয়া থাকেন ইহা তাহাদের অগ্নিপরীক্ষা, স্বর্ণের বিশুদ্ধি কেবল অগ্নিতেই পরীক্ষিত হয়। কিন্তু পরীক্ষাই হোক আর দৈবনিগ্রহই হোক বিশ্বনাথ জীবনের প্রতিপদক্ষেপে নিরাশা ভিন্ন অন্য কিছু সঞ্চয় করিতে পারে নাই। সে বিশুদ্ধ স্বর্ণ ছিল কিনা, আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু তুচ্ছ অঙ্গার হইলে এই সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী নিদারুণ অগ্নিপরীক্ষায় নিশ্চয়ই তাহাকে ভস্ম হইতে হইত।

বিধাতার যে অলঙ্ঘ্য বিধান অনুসারে জন্মমৃত্যুস্রোত প্রতিনিয়ত পৃথিবীতে তরঙ্গিত হইতেছে, সেই অপরিবর্ত্তনীয় বিধানে সহসা জ্বররোগে রাধারাণীর মৃত্যু হইল। তখন বিশ্বনাথ অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। মৃত্যুকালে রাধারাণী তাহার শিশুকন্যা কল্যাণীকে বিশ্বনাথের হস্তে সমর্পণ করিয়া গেল।

স্নেহময়ী জননীর মৃত্যু হইলে অসহায় শিশু যেমন আকুল ভাবে কাঁদিয়া থাকে, রাধারাণীর আকস্মিক মৃত্যুতেও বিশ্বনাথ তেমনি ব্যাকুল হইয়া উঠিল। নির্জ্জন গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া কন্যাটীকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া অনেকক্ষণ সে বালকের মত রোদন করিল। তাহার পর চক্ষু মুছিয়া, মৃতদেহের সৎকার সমাধান্তে সেই মাতৃহীনা বালিকার মাতার স্থান গ্রহণ করিয়া বসিল।

চারিবৎসরের শিশু কল্যাণীকে সুখে রাখিবার জন্য সেই অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধের কি গভীর সাধনা! কল্যাণীকে কোন প্রকার ক্ষুদ্র অসুবিধাও যাহাতে সহ্য করিতে না হয় সেজন্য আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া সে তাহার সেবা করিতে লাগিল। একটি পিতৃমাতৃহীনা অনাথা বালিকার জন্য তাহার এই প্রকার প্রাণপণ যত্ন জনপদবধূগণের চক্ষে অত্যন্ত অনাবশ্যক বলিয়া প্রতীয়মান হইত, এবং গ্রাম্য পুরুষগণ প্রকাশ্য বৈঠকে তাহার বার্দ্ধক্যসুলভ বুদ্ধিহীনতার আলোচনা করিয়া প্রভূত আনন্দ উপভোগ করিত; সকলে অকাট্য যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিত, কোন কালে লোকটার বুদ্ধি ছিল না, এবং অতঃপর তাহার বুদ্ধিসঞ্চারের কোন সম্ভাবনা নাই।

কল্যাণী ক্রমে বড় হইয়া উঠিল। তাহার জীবন যাহাতে নিতান্ত দুঃসহ ও একঘেয়ে হইতে না পারে, এজন্য বিশ্বনাথ তাহার সামান্য বিদ্যাটুকু দিয়া তাহাকে লেখাপড়া শিখাইতে লাগিল; তাহার পর বয়স একটু বেশী হইলে সে কল্যাণীকে গ্রামের নবসংস্থাপিত বালিকাবিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিল।

কল্যাণী কাছে না থাকিলে বিশ্বনাথের নিকট সকলই শূন্য মনে হইত, এবং এত বড় পৃথিবীটার মধ্যে সে যেন উপযুক্ত আকর্ষণের জিনিস পাইত না। স্কুলের ছুটীর সময় উত্তীর্ণ হইবার অনেক পূর্ব্ব হইতেই সে কল্যাণীর প্রতীক্ষায় বাড়ীর বাহিরে আসিয়া পথের দিকে চাহিয়া থাকিত, এবং

সহসা চঞ্চলা, কৌতুকময়ী বনদেবীর মত ক্ষিপ্রহাস্যে স্তব্ধ বনপথ ধ্বনিত করিয়া তাহাকে ছুটিয়া আসিতে দেখিলে বৃদ্ধের নিষ্প্রভ চক্ষু দুটী মুহূর্ত্তের জন্য উজ্জ্বল ও তাহার মলিন বিশীর্ণ ওষ্ঠ প্রসন্ন হাস্যে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিত; যেন শীতের বিষণ্ণ, শোভাহীন, শুষ্ক প্রকৃতির উপর দিয়া কোথা হইতে আচম্বিতে বসন্তবায়ুর একটা সুখস্পর্শ, নবীন, প্রাণপূর্ণ আনন্দহিল্লোল প্রবাহিত হইয়া গেল। তাহার পর সেই অল্পভাষী, গম্ভীরপ্রকৃতি বৃদ্ধ এবং কলকণ্ঠা চপলা বালিকার মধ্যে প্রতিদিনের আলোচিত এবং সম্পূর্ণ অনাবশ্যক এমন সকল পুরাতন তুচ্ছ কথার আলোচনা চলিত, যাহা জ্ঞানবান বয়স্ক লোকের নিকট কিছুতেই উল্লেখ যোগ্য নহে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ক্রমে এই বৃদ্ধ পালকপিতা এবং প্রকৃতিমাতা সুগভীর অশ্রান্ত যত্নে পিতৃমাতৃহীনা অনাথা শিশুটিকে মানুষ করিয়া তুলিল। কন্যাটী সরলতাপূর্ণ শৈশব ও চপলতাপূর্ণ কৈশোর অতিক্রম করিয়া আশা ও ভয়, সঙ্কোচ ও সম্ভ্রম, নবনব আকাঙ্ক্ষা ও বিচিত্র চিন্তাপূর্ণ প্রথম যৌবনের পত্রপুষ্পমণ্ডিত, আলোকোজ্জ্বল, শোভাময়, নিভৃত নেপথ্যে পদার্পণ করিল। কিন্তু তাহার এই যৌবন-বসন্তের উদ্দীপনার মধ্যে সে প্রতিদিন কি অতৃপ্তি অনুভব করিতেছে, তাহার হৃদয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী অম্লান কল্পনাকাশে আকাঙ্ক্ষা-চকোর কোন্ অমৃতের ক্ষুধায় কাতর হইয়া ক্ষুব্ধবক্ষে ব্যথিতপক্ষে দিগ্‌দিগন্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহা সে তাহার পিতৃতুল্য বৃদ্ধ বিশ্বনাথের নিকট প্রকাশ করিতে পারিত না। ইদানীং তাহার বাল্য-স্বভাবসুলভ মুখরতা কমিয়া আসিয়াছে এবং তাহার ব্যবহারে দুহিতার আবদারের ভাব বিদূরিত হইয়া এখন সেখানে মহিমাময়ী নারীর উদার মাতৃভাবের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

বিশ্বনাথ কল্যাণীর হৃদয়ের এই পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারিত। সে বুঝিত সে তাহার বার্দ্ধক্যের জীর্ণ বক্ষ বিস্তার করিয়া এই পর্ব্বতবাসিনী পার্ব্বতীর হৃদয়ের স্বাভাবিক গতি রোধ করিতে পারিবে না, অথচ এতদিন তাহাকে সংসারের একটা কথাও শিখাইয়া দেওয়া হয় নাই। বিশ্বনাথ বহুদিন পর্য্যন্ত সমাজ-জীবনের সুখদুঃখময় সংস্পর্শে আসে নাই—এবং এ বিষয়ে তাহার সম্যক্ অভিজ্ঞতাও ছিল না, সুতরাং এখন সে কল্যাণীর প্রতি তাহার কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে পারিল না। সে ভাবিতে লাগিল, আমি আর কত দিন; নূতন অভিনেতা আসিয়া একদিন প্রেমের প্রদীপ জ্বালিয়া এই অন্ধকারপূর্ণ পুরাতন রঙ্গভূমিতে নূতন নাটকের অভিনয় আরম্ভ করিবে, কিন্তু এপর্য্যন্ত অভিনয়ের আবশ্যকীয় কোন পাঠই ত ইহাকে শিখান হয় নাই; কে জানে দেহপিঞ্জর ভাঙ্গিবার পূর্ব্বেই এই প্রাণাধিক পক্ষীটি কোথাও উড়িয়া যাইবে কি না? এ পর্য্যন্ত সেত কাহাকেও প্রেমশৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিতে পারে নাই। তাই এক এক সময় একটি অতর্কিত আশঙ্কায় শঙ্কিত, উদ্বিগ্ন বৃদ্ধ উভয়হস্তে কাতরবক্ষ চাপিয়া বিচলিত হৃদয়ে বলিত, "ভগবান্, সকলেই ফাঁকি দিয়াছে, যে দুদিন চক্ষু চিরমুদ্রিত না হয়, সে দুইদিন আর আমার জীবনের এই আলোকটিকে আমার নিকট হইতে দূরে লইয়ো না।"

এক বৎসর পরে আবার ধরাতলে নববসন্তের সমাগম হইল। অপরাহ্নে কুটীর-দ্বারে উপবেশন করিয়া কল্যাণীর সহিত গল্প করিতে করিতে আজ বিশ্বনাথের মনে একুশ বৎসর পূর্ব্বের একটি চন্দ্রালোকপ্রদীপ্ত চূতমুকুলগন্ধপ্লাবিত বসন্তসন্ধ্যার কথা মনে পড়িতেছিল। কাহারা সেদিন না বলিয়া চলিয়া গিয়াছে, আর ত তাহারা ফিরিয়া আসিল না; প্রতি বৎসর বসন্তঋতু তেমনি সাজসজ্জা করিয়া কোকিলের কুহুস্বরে, ভ্রমরের প্রমোদগুঞ্জরে, বিবিধ পুষ্পের সুমধুর গন্ধবৈচিত্র্যে এবং বিচিত্র বর্ণভঙ্গিমায়, ঊর্দ্ধাধঃপ্রকৃতির উজ্জ্বল নীলিমা হইতে সতেজ পীতাভ পরিচ্ছদে, চন্দ্রসূর্য্যের কমনীয় দীপ্তিমান্ জ্যোতি-স্তরঙ্গে এবং নির্ঝরিণী হইতে মৌক্তিক চূর্ণের ন্যায় নির্ম্মল স্বচ্ছ সলিলরাশির অবিরল ঝরঝর শব্দে ধরাতলে আপনার আগমন-কাহিনী ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে। মৌন বৃদ্ধ বিশ্বনাথ বিশ্বের এ শোভন সৃষ্টির প্রতি এতকাল উদাসীন ছিল, কিন্তু এই জীবনোপান্তে দণ্ডায়মান হইয়া নির্ব্বাণপ্রায় দীপের অন্তিমরশ্মির ন্যায় তাহার নিষ্প্রভ অন্তর প্রকৃতি একবার অধিক উজ্জ্বলতা লাভ করিল। বার্দ্ধক্যের মোহ এবং জরাজীর্ণ হৃদয়ের জড়তার মধ্যেও এই প্রথমবসন্তে যৌবনকালের সেই উন্মত্ত মদির বিহ্বলতা আসিয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিল, কল্যাণীর মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বিশ্বনাথের মনে হইল, "কেন চলিয়া গেল? আমি কি ভালবাসিতে জানিতাম না? যদি আবার তাহারা ফিরিয়া আসে,

তবে আমার এই স্নেহের ধনটিকে তাহাদের করে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তমনে মরিতে পারি। এতদিন পরে কি তাহারা এই অক্ষম বৃদ্ধকে মনে করে?"

—সেই একুশ বৎসর আগেকার মতই শুভ্র চন্দ্রালোকে প্রাঙ্গণের উপর কাহার ছায়া পড়িল। অপরিচিত লোকের ছায়া, শুভ্রবস্ত্রমণ্ডিত, উন্নতদেহ, তরুণ মুখশ্রী। কল্যাণী সভয়ে সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বিশ্বনাথ কুটীর হইতে প্রদীপ আনিয়া আগন্তুকের মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, কিন্তু যুবককে কখন দেখিয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারিল না, অথচ মুখখানি নিতান্ত অপরিচিত নহে। কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া বৃদ্ধ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল:—

"আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন? আপনার নাম?"

"আমি আরাকান হইতে আসিতেছি, অধমের নাম সুজনলাল।"

"এখানে আপনি কাহার অনুসন্ধান করিতেছেন?"

"আমার পিতৃব্য বিশ্বনাথ দাস,—তাঁহার নিকটেই আসিয়াছি।"

কম্পিতকণ্ঠে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার,—তোমার পিতার নাম কি বাছা?"

"আনন্দলাল।"

"তোমার জননী?"

"সারদা বাই।"

সহসা উদ্দাম বায়ুপ্রবাহে বিশ্বনাথের হস্তস্থিত দীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনজনের কেহই কোন কথা বলিতে পারিল না; অবশেষে বিশ্বনাথ তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে প্রায় কোলের কাছে লইয়া অন্ধকারময় গৃহে প্রবেশ করিল। কল্যাণী দীপ জ্বালিয়া আনিলে সুজনলাল দ্বারপ্রান্তে আসনে উপবেশন করিয়া তাহার পিতৃব্যের নিকট আপনার গল্প বলিতে আরম্ভ করিল; অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত কাহারো নিদ্রাকর্ষণ হইল না।

সুজন যাহা বলিল, তাহার মর্ম্ম এই যে, আনন্দ সারদাকে লইয়া আসাম হইতে আরাকানে গমন করে; সেখানে সে নানা উপায়ে অর্থসংগ্রহ করিয়া এখন ছোটখাট একখানি চা-বাগিচার মালিক হইয়াছে; এখন তাহার অর্থের অভাব নাই; তাই এই একুশ বৎসর পরে তাহার পুত্রকে দাদার ঋণপরিশোধের জন্য পাঠাইয়াছে।

সকল কথা শুনিয়া বৃদ্ধের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। কল্যাণীর মাতার মৃত্যুর পর সে কাঁদিয়াছিল; এই দ্বাদশ বৎসর কেহ তাহার চক্ষুতে অশ্রু দেখিতে পায় নাই। বোধ হয় আজ বৃদ্ধের নির্ব্বাণোন্মুখ উদাসীন জীবনের অভিমান এই সুকোমল স্নেহস্মৃতিসংস্পর্শে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল; তাই স্বল্পভাষী, সংযতবাক্ বৃদ্ধ কম্পিতকণ্ঠে উত্তর করিল, "বৎস, তোমার পিতামাতাকে আমি প্রাণাপেক্ষা স্নেহ করিতাম, তোমার কাছে সে স্নেহের পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক; তোমার পিতা আমার নিকট এই স্নেহঋণে আবদ্ধ; আমার কাছে তাহার কোন আর্থিক ঋণ আমি স্বীকার করি না। তথাপি অকিঞ্চিৎকর আর্থিক ঋণের কথা স্মরণ করিয়া এই একুশ বৎসর পরে সে যে তোমাকে তাহা পরিশোধের জন্য পাঠাইয়াছে, তাহার এ কর্ত্তব্যজ্ঞান আমার অনেক দিন মনে থাকিবে; একদিন আমি অর্থের প্রয়োজন অতি তীক্ষ্ণভাবে অনুভব করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন আর তাহার কোন আবশ্যক নাই।"

সুজন ভাবিল, তাহার পিতার উপর পিতৃব্যের এ অভিমান অসঙ্গত নহে। [illegible] করিল, বিশ্বনাথের নিকট কিছুদিন থাকিয়া স্নেহে তাহার হৃদয় বশীভূত করিয়া পিতার ঋণ পরিশোধ করিয়া যাইবে। সুজন এক সপ্তাহের জন্য পিতার নিকট বিদায় লইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু এখানে আসিয়া সপ্তাহের পর সপ্তাহ অতীত হইতে লাগিল।

তাহার ন্যায় আমোদলিপ্সু চঞ্চলপ্রকৃতি যুবক অধিক দিন একস্থানে একভাবে থাকিবে, ইহা আশা করা যায় না। আসামের সেই জনবিরল, নিরানন্দময় উপত্যকায় একখানি জীর্ণ কুটীরে হয়ত সে দুদিনের বেশী বাস করিতে সক্ষম হইত না, কিন্তু এই কামরূপের কুহকময় মৃত্তিকা যেন তাহার উদ্ধত গৌরব ও গর্ব্বিত আত্মাভিমান জীর্ণ করিয়া ফেলিল। কল্যাণী এখন ষোড়শী যুবতী;—শৈশবের চপলতা গিয়াছে, কিন্তু সরলতা যায় নাই; তাহার সমস্ত দেহ তখন অরুণের প্রথম আলোকধারাপাতে তরুণ কিশলয়ের ন্যায় জীবনপূর্ণ এবং লাবণ্যময় হইয়া উঠিয়াছে এবং একটা চঞ্চল স্বপ্নময় সুখবেদনা কোন্ অদৃশ্যমায়াপুরী

TORN PAGES.

হইতে তাহার হৃদয়ান্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক সলজ্জ অতৃপ্তি-বন্ধনে তাহার দেহ ও মনকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। দীপ্ত দিবালোক এবং স্নিগ্ধ নৈশ প্রশান্তির ন্যায় একটি উজ্জ্বল ও মধুর প্রেমের প্রীতিকর তাপশৈত্যে তাহার অনন্যপরায়ণ সুকোমল নারীহৃদয় বিকশিত হইয়া উঠিল এবং সে তাহার সেই বিকচ হৃদয়প্রসূনে সুজনলালের বিশবৎসর বয়সের সেই অনিন্দ্যসুন্দর সুকুমার মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিল। তাই কোথা দিয়া ছ'মাস চলিয়া গেল, তাহা তাহাদের দুজনের কেহই জানিতে পারিল না। শেষে একদিন পিতার ভর্ৎসনাপূর্ণ পত্রে সুজনের চৈতন্য হইল। সে অবসর মত তাহার পিতৃব্যের নিকট বিদায় চাহিল। বৃদ্ধ কোন আপত্তি করিল না। তাহার জীবনের অবশিষ্ট সংক্ষিপ্ত কয়েকটাদিন সে তাহার কাছে থাকিয়া গেলে, জগতে কাহার কি ক্ষতি হইত, তাহা বিশ্বনাথ বুঝিতে পারিল না। কিন্তু পুত্রকে পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না; জীবনের কয়টা ইচ্ছাই বা এ পর্য্যন্ত পূর্ণ হইয়াছে? অন্য অধিকার দূরের কথা, স্নেহের অধিকারের উপরও তাহার আর বিশ্বাস ছিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শোভাময়, নিশ্চিন্ত

শ্রাবণ মাস। পাহাড়ে বর্ষা নামিয়াছে, চারিদিকে শুধু জলের কলকল ছলছল শব্দ; আকাশে পুঞ্জীভূত মেঘরাশি অদূরবর্ত্তী পর্ব্বতশৃঙ্গ এবং ঘন বনরাজির উপর অন্ধকারপূর্ণ ছায়া নিক্ষেপ করিয়াছে; মধ্যে মধ্যে চপলার চঞ্চলপ্রভা ফুটিয়া উঠিতেছে; পরক্ষণেই কৃষ্ণবর্ণ মেঘের অদ্রিগ্রহণ গুরুগর্জ্জিত ধ্বনি; সেই গম্ভীর মেঘমন্দ্রে বিকশিত কদম্বমূলে মুক্তপুচ্ছ শিখীর প্রমোদনৃত্য, ভয়চঞ্চলা হরিণীর ঊর্দ্ধপ্রেক্ষিত চকিত নেত্র, এবং কামিনী, কদম্ব ও কমলার সুমিষ্ট মিশ্র গন্ধ পর্ব্বতবক্ষলীন ক্ষুদ্র গ্রামটিকে সৌন্দর্য্যে ও সৌরভে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

সুদীর্ঘ দিবার অবসানে মৌনরাত্রি ধীরে ধীরে তাহার অবগুণ্ঠনে প্রকৃতির মুখখানি ঢাকিয়া দিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে খুব এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, বৃষ্টিধৌত আর্দ্র গাছপালা বায়ুভরে কাঁপিতেছে, অরণ্যের অন্তরাল হইতে শৃগালের দল সমস্বরে চীৎকার-করিয়া উঠিতেছে এবং গ্রামের সমস্ত লোক নৈশ ভোজন শেষ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেছে।

বিশ্বনাথ আজ বড় অসুস্থ, আজ তাহার শিরঃপীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। গভীর রাত্রে তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইল, কিন্তু কল্যাণী তখন পর্য্যন্ত তাহার পরিচর্য্যায় বিরত হয় নাই। চিরধৈর্য্যময়ী মাতা যেমন নতনেত্রে পীড়িত পুত্রের মুখের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে, বিশ্বনাথের মস্তকপ্রান্তে বসিয়া সেও তেমনি তাহার বিশীর্ণ শুষ্ক মুখ ও নিমীলিত চক্ষুর দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে তাহার মাথায় হাত বুলাইতেছে। আজ এই দুরন্ত বর্ষানিশীথে অশ্রান্ত মেঘগর্জ্জন ও অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে কোন দূরবর্ত্তী চন্দ্রালোকপ্লাবিত মোহকর স্বপ্নের সুখময় স্মৃতি তাহার মনে পড়িতেছিল কি না কেহ বলিতে পারে না, কিন্তু তাহার চিন্তা যেন এক একবার তাহার মুখের উপর এক এক রকম ভাবের তুলিকা বুলাইয়া দিতেছিল। বোধ হইতেছিল যেন একদিকে জীবন ও অন্যদিকে মৃত্যু আসিয়া তাহার হৃদয়ের অংশের জন্য ঘোরতর বিবাদ আরম্ভ করিয়াছে।

এমন সময় অতি কুণ্ঠিত ভাবে কে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল; কল্যাণী দেখিল সুজন?

"সুজন, তুমি আজই যাইতে চাও?"

সুজন ম্লানস্বরে বলিল, "আমিত তোমাকে আমার সকল কথা বলিয়াছি। চাতক জলবিন্দুর প্রত্যাশায় মেঘের নীচে উড়িয়া বেড়ায়—বজ্রাঘাতের কামনা করে না।"

"আজই যাইবে!"

"বল থাকি;—আমি হীন অপদার্থ; তোমার প্রেমের জয় হউক।"

কল্যাণী মাথা না তুলিয়াই বলিল, "তোমার ইচ্ছায় বাধা দিব কেন, সুজন?"

"তবে চল, আমি পৃথিবীর আর কিছু চাহি না, শুধু তোমাকে চাই। তোমার প্রেম ভিন্ন আমার আকাঙ্ক্ষার আর কিছু নাই।"

কল্যাণী কোন উত্তর দিতে পারিল না, তাহার চক্ষে অশ্রু ফুটিয়া উঠিল, ক্রমে তাহা গণ্ডস্থল ভাসাইয়া ফেলিল।

তখন অভিমানোদ্বেলিত কণ্ঠে সুজন বলিল, "বুঝিলাম এতদিন আমি ভুল করিয়া আসিয়াছি; কিন্তু আমাকে ভুলিতে পারিবে কি? একদিনও কি তোমার মনে হইবে না যে কোন দিন তোমার জীবনের উপর দিয়া সুখস্বপ্নের একখানি স্বচ্ছ মেঘ লঘুপক্ষে বসন্তের নীলাকাশে উড়িয়া গিয়াছে?"

কল্যাণী নিরুত্তর; যেন তাহার সমস্ত দীর্ঘনিশ্বাস একত্র হৃদয়দ্বারে জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে, একটা কথাও মুখে বাহির হইতেছে না, শুধু বুকের মধ্যে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে।

অনেকক্ষণ পরে কল্যাণী বলিল, "বেশী কথা বলিবার শক্তি নাই। কাকা আর বেশীদিন বাঁচিবেন না; তাঁহাকে এমন অবস্থায় ফেলিয়াই তুমি চলিয়া যাইতে চাও? ছিঃ।"

নিদ্রিত বৃদ্ধের হৃদয় হইতে একটি অতি সংযত দীর্ঘ নিশ্বাস ফুটিয়া উঠিল।

একটু দৃঢ়স্বরে সুজন জিজ্ঞাসা করিল, "সে কথা যাক্। আজ আমি আমার এই বিদায়কালে জানিতে চাই, তুমি কি আমাকে এই রকম ভাল বাসিতে? শুধু মৌখিক প্রণয়? আতিথ্যের অতি তুচ্ছ শুষ্ক উপহার!"

কল্যাণীর সজল চক্ষু সহসা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। রমণী সকল সহিতে পারে, কিন্তু প্রণয়ে অবিশ্বাস তাহাদের অসহ্য। দৃঢ়স্বরে কল্যাণী বলিল, "সুজন, তুমি যাও, আমি মরিব; বাক্যবাণে বিঁধিয়া আমাকে আর কি অধিক কষ্ট দিবে?—কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানিয়ো, আমি কাকাকে এই রোগশয্যায় ফেলিয়া স্বর্গেও যাইতে চাহি না। মা আমাকে ফেলিয়া গিয়াছিলেন; কাকা আমায় কোলে তুলিয়া মানুষ করিয়াছেন; আর আজ আমি কাকাকে ফেলিয়া নিজের সুখের সন্ধানে যাইব?"

বৃদ্ধের বুক একবার ফুলিয়া উঠিল।

উত্তেজিতস্বরে সুজন বলিল, "তবে কথা শোন; আমি যাত্রার সমস্ত আয়োজন করিয়া শেষরাত্রে আসিব। সে সময় তোমার ঘর দীপালোকিত দেখিলে আমি আসিয়া তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাইব; বুঝিব আমার অনুগমনে তোমার অনিচ্ছা নাই। আর যদি ঘর অন্ধকার দেখি, বুঝিব আমার আশা নাই। তখন হয়ত তোমার সঙ্গে আর দেখা করিতেও পারিব না—এই শেষ দেখা।"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সুজন চলিয়া গেল। কল্যাণী অনেকক্ষণ ধরিয়া স্পন্দহীনের ন্যায় বসিয়া রহিল; তাহার পর বলিল, "কাকা, আমি তোমাকে কখন ফেলিয়া যাইব না। আমি ছাড়া তোমার আর কে আছে কাকা?"—অতি স্নেহকোমল স্বরে এই কথা বলিয়া কল্যাণী বিশ্বনাথের উত্তপ্ত শীর্ণ-পদতলে হাত বুলাইতে লাগিল, কিন্তু তাহার অশ্রুভারাক্রান্ত চক্ষুর সম্মুখে দীপরশ্মি জ্যোতিস্তরঙ্গের সৃষ্টি করিল।

কতক্ষণ পরে ধীরে ধীরে অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া কল্যাণী বিশ্বনাথের মুখের দিকে চাহিল; অস্তগামী ক্ষীণচন্দ্রের শেষ রশ্মির ন্যায় তাহার রুদ্ধ ওষ্ঠে ঈষৎ ম্লান হাস্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, উদ্বেগশূন্য অতি মৃদু হাস্য! অনেকদিন পরে বৃদ্ধের রোগযন্ত্রণার বুঝি উপশম হইয়াছে, গভীর রাত্রে রোগোপশমে বৃদ্ধ বুঝি কোন সুখস্বপ্ন দেখিতেছে! হায় ক্ষণস্থায়ী স্বপ্ন!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অনেক রাত্রে কল্যাণী উঠিয়া গৃহে শয়ন করিতে যাইবে এমন সময়ে বিশ্বনাথ ডাকিল, "কল্যাণী"।

করুণকণ্ঠে কল্যাণী উত্তর দিল, "কেন কাকা, ঘুম হচ্ছেনা? আমিত এখানেই আছি, তোমার এখন শরীর কেমন? মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেব?"

"না মা, আমি বেশ আছি, তুমি শোওগে, আমার জন্য আজ কাল তোমার বড় বেশী পরিশ্রম হচ্ছে। ভগবান তোমাকে সুখী করুন।"

এই স্নেহপূর্ণ স্বরে কল্যাণীর হৃদয় বিগলিত হইল, আবার তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল; একবিন্দু অশ্রু বৃদ্ধের পদদেশে ঝরিয়া পড়িল।

বিশ্বনাথ বলিল, "কল্যাণী, কাঁদচো মা? ছি, এসো, আমার কাছে সরিয়া এসো।" কল্যাণী চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বিশ্বনাথের মাথার কাছে আসিয়া বসিল। তাহার রুক্ষ, শুভ্র কেশগুলি নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "সব মানুষ এক রকম নয় কেন, কাকা?"

"সে কথাটা তোমাকে আমি এত দিন শিখাই নাই; বুড়ো বয়সের অনেক ভুল।"—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বিশ্বনাথ আবার বলিল, "রাত্রি অনেক হইয়াছে, যাও শোওগে।"

কল্যাণী একটি প্রদীপ জালিয়া তাহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল, এবং প্রদীপটি দীপাধারে রাখিয়া একদৃষ্টে সেই দিকে অন্যমনস্ক ভাবে চাহিয়া রহিল। সুজনলাল বলিয়া গিয়াছে, এই দীপ নির্ব্বাপিত দেখিলে আর সে তাহার নিকট বিদায় পর্য্যন্ত লইতে আসিবে না। এই

দীপরশ্মির সহিত তবে কি তাহার হৃদয়ের প্রেমরশ্মিও নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে? কি নিষ্ঠুর! পুরুষের প্রেম কি নির্ম্মম পরিহাস, না নিদারুণ পরীক্ষা?

ভাবিতে ভাবিতে কল্যাণী মুক্ত বাতায়নে আকাশের দিকে চাহিল। কৃষ্ণবর্ণ মেঘখণ্ড থরে থরে আকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছে, মুগ্ধের ন্যায় সে ঊর্দ্ধাকাশে চাহিয়া রহিল। তাহার সমস্ত চিন্তা এই নীরব নিশীথে তাহার রুদ্ধ হৃদয় ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধমেঘস্তর পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত হইল। মেঘের ভিতর হইতে এক একবার কৃষ্ণপক্ষের খণ্ড চন্দ্রের ম্লান মুখ সমস্ত প্রকৃতির উপর অতি ক্ষীণ আলোক বিস্তার করিতেছে, আবার গাঢ়তর মেঘে সমস্ত আকাশ গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে। সহসা একখানি ঘন কৃষ্ণ মেঘের অন্তরাল নির্ম্মুক্ত দুইটী উজ্জ্বল নক্ষত্রের প্রতি তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। একটি অকুণ্ঠিত মহৎ কর্ত্তব্য এবং অপরটি অপরাজেয় অকপট প্রেমের মধুর বার্ত্তা লইয়া যেন বিশাল গগনপ্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে!—কোন্ টিকে সে এই সংসারসমুদ্রে জীবনপোতের পরিচালক স্বরূপ গ্রহণ করিবে? কল্যাণী প্রদীপের আলো উজ্জ্বল করিয়া দিয়া বিছানায় আসিয়া বসিল, দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কাঁদিল; তাহার পর পুনর্ব্বার বাতায়নসন্নিধানে আসিয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল, নক্ষত্র দুটি তখনো সেই ভাবে আকাশের কোলে ফুটিয়া রহিয়াছে। কতক্ষণ পর্য্যন্ত অনিমেষ লোচনে সে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিল, যেন সেই স্তব্ধ নিশীথে তাহার আসন্নবিচ্ছেদশঙ্কাকুল, সুগভীরবিষাদকুহেলীসমাচ্ছন্ন হৃদয় কোন বিরহকাতরা নিদ্রাহীনা নক্ষত্র বালিকার অনিমেষ চক্ষে স্বকীয় হৃদয়বেদনা প্রতিফলিত দেখিতেছে, কিন্তু আর একটি নক্ষত্র অধিকতর উজ্জ্বল, অচঞ্চল, শুভ্রজ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া তাহার অটল মহত্তর কর্ত্তব্যের সরল পথ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক নত নেত্রে ধরণীর দিকে চাহিয়া আছে।—মেখলা সঞ্চালনে দীপ নির্ব্বাণ করিয়া কল্যাণী স্তব্ধ ভাবে শয্যায় শয়ন করিল।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার নিদ্রাকর্ষণ হয় নাই। ভাবিতে ভাবিতে কখন সে ঘুমাইয়া পড়িল, তাহা সে জানিতেও পারিল না, কিন্তু সে নিদ্রা গভীর নহে। রাত্রিশেষে হঠাৎ জাগিয়া সে একেবারে বিছানার উপর উঠিয়া বসিল, দেখিল দীপ প্রজ্বলিত, কক্ষটি আলোকময়! কল্যাণী আপনার চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না; সে আলোক নিবাইয়া শুইয়াছে; তবে কোন্ মন্ত্রবলে অন্ধকারময় গৃহে আবার দীপালোক জ্বলিয়া উঠিল? সহসা বর্ষার আর্দ্র বায়ু মুক্তদ্বারপথে প্রবলবেগে গৃহে প্রবেশ করিল। কল্যাণী সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, দ্বার খোলা! তখন তাহার মনে পড়িল শয়নের সময় সে দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। বিশ্বনাথ নিশ্চয়ই সুজনের শেষ বিদায় কালের কথাগুলি শুনিয়াছে।

কল্যাণী দীপহস্তে বিশ্বনাথের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল; দেখিল সেই কুটীরেও তেমনি আলো জ্বলিতেছে। কিন্তু বিশ্বনাথ বিছানায় নাই, মেঝের উপর একখানি ছিন্ন মাদুর বিছাইয়া গৃহ প্রাচীরে ঠেস দিয়া বসিয়া রহিয়াছে; নিদ্রাভরে তাহার মস্তক সম্মুখে অবনত হইয়া পড়িয়াছে; পদপ্রান্তে একখানি কাগজ;—নোট নয় ত?

কল্যাণী পরীক্ষা করিয়া দেখিল, একখানি এক শত টাকার নোট। বিশ্বনাথের ঋণ পরিশোধের জন্য আনন্দ এখানি পাঠাইয়াছিল তাহা কল্যাণী জানিত, কিন্তু এখানি এ ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে কেন তাহা সে বুঝিতে পারিল না; অপর পৃষ্ঠায় দেখিল মোটা মোটা, অপরিষ্কৃত কম্পিত হস্তাক্ষরে লেখা আছে, "কল্যাণীর বিবাহের আশীর্ব্বাদী।" বিশ্বনাথের এই ব্যবহারের সে কোন অর্থ বুঝিতে পারিল না, সস্নেহে বৃদ্ধকে ডাকিয়া বলিল, "কাকা বসে বসে ঘুমুচ্ছো, বিছানায় উঠে শোও।"

বিশ্বনাথ নির্ব্বাক, নিস্তব্ধ।

কম্পিতকণ্ঠে, উচ্চতর স্বরে কল্যাণী ডাকিল, 'কাকা, এখানে বসেই ঘুমিয়েছ?"

কোন উত্তর নাই, কোন দিকে কোন শব্দ নাই; কেবল কতকগুলা মশক সেই ক্ষুদ্র নিরানন্দময় কুটীর মধ্যে ভন্ ভন্ শব্দ করিয়া তত রাত্রেও আপনাদের ক্ষুধিত আকাঙ্ক্ষার পরিচয় প্রদান করিতেছে, বাহিরে ঘোর অন্ধকার, আকাশে মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে।

বাষ্পরুদ্ধ, বিগলিত কণ্ঠে কল্যাণী আবার ডাকিল, 'কাকা'—কম্পিত হস্তে অতি ধীরে দেহস্পর্শ করিল। প্রাণহীন দেহ শীতল, বক্ষঃস্থল স্পন্দনবিরহিত!

কল্যাণী তখন, মাতা যেমন গতজীবন পুত্রের নিষ্পন্দ দেহ দুই হস্তে আচ্ছাদনপূর্ব্বক ভূতলে লুটাইয়া আকুল হৃদয়ে কাঁদিতে থাকে, তেমনি করিয়া বিশ্বনাথের প্রাণশূন্য দেহপিঞ্জর আপনার ক্ষুব্ধ বিদীর্ণপ্রায় বক্ষপিঞ্জরে ধারণপূর্ব্বক ভূমিতলে পড়িয়া 'কাকা' 'কাকা' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল; তেমন স্নেহোচ্ছসিত নির্ভর—পূর্ণ ব্যথিত কোমল কণ্ঠের আর্ত্তনাদ সে গৃহ হইতে আর কখন উত্থিত হইয়াছে কিনা বলা যায় না, কিন্তু আজ এই ঘোর নিশীথে, তমোময়ী প্রাবৃষিক যামিনীর প্রান্তভাগে এই অনাথা যুবতীকে একটা আশার কথা বলিবার আর কেহই নাই। পর্ব্বতের নিভৃত উপত্যকালগ্ন শোকমগ্ন সেই ক্ষুদ্র গৃহখানির দীপ নিভিয়া গিয়াছে, বর্ষার সলিলসিক্ত উদ্দাম বায়ুপ্রবাহ প্রবলবেগে আঁধার কুটীরে প্রবেশ করিতেছে, কড় কড় শব্দে মেঘ ডাকিতেছে, এবং চঞ্চল বিদ্যুৎপ্রভা আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত হিল্লোলিত হইতেছে। প্রকৃতির এই অন্ধতমসাচ্ছন্ন প্রলয়ঙ্কর নৈশ অভিনয়ের মধ্যে একটা উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত অখ্যাত বৃদ্ধ তাহার অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র জীবনের প্রেমের ঋণ পরিশোধ করিয়া কোথায় চলিয়া গেল, কেহ তাহা জানিতে পারিল না।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

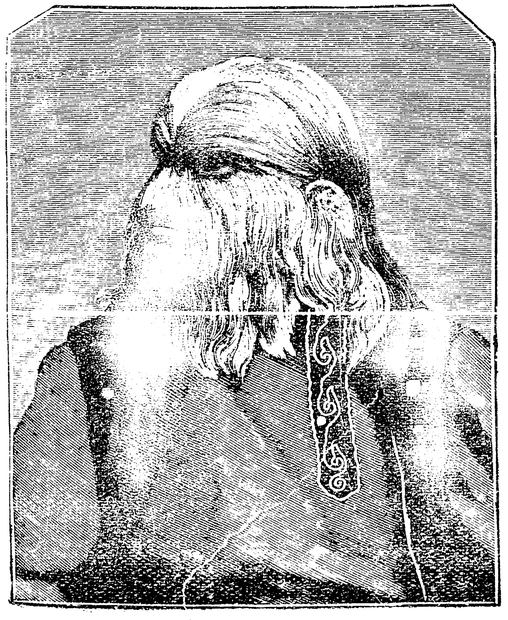

জোজো।

প্রকৃতির খেয়াল।

কিছুদিন হইল প্রদর্শনের জন্য কতকগুলি অদ্ভুত মানুষ একত্র করা হইয়াছিল। সেগুলির কথা ভাবিলে বোধ হয়, প্রকৃতির ঘাড়েও মধ্যে মধ্যে খেয়াল চাপে।

প্রথমটি কুকুরমুখো মানুষ বা মানুষমুখো কুকুর। এই দ্বিপদ কুকুর বয়সে ২৪ বৎসরের যুবক, জাতিতে রুষ, নামে জোজো। লোকটাকে দেখিলে যে ভয় হয়, এমন নয়। চুলের রঙ্ খুব মেটে হইতে হল্‌দে। মাথার চুল ও মুখের চুল একরকম নয়। মাথার চুল মানুষের চুলের মতই। কিন্তু মুখের চুল ঠিক্ যেন কুকুরের মুখের বড় বড় লোম। জোজোর বাবাও নাকি জোজোর মত রোমে আবৃত ছিল।

দ্বিতীয়টি একখানি সঞ্চরমাণ অস্থিপঞ্জর। এমন রোগা মানুষ আর কখনও জন্মে নাই।

তৃতীয় ব্যক্তি বিবি জোন্‌স্। বিবি যেন দাঁতের বেদনায় চির অস্থির--কাল রুমাল খানি মুখে সর্ব্বদা ধাঁধা থাকে। এটা কিন্তু লোককে ফাঁকি দিবার চেষ্টা মাত্র।

বিবি জোন্‌স্।

দাঁতের বেদনা একটুকুও নাই। দশজনের সহিত মিশিবার সময়ে বিবি মুখে রুমাল বাঁধেন, পাছে সুন্দর শোভন শ্মশ্রুরাজি ধরা পড়ে। দাড়ি গোঁপ থাকিলেও বিবি দেখিতে

সুন্দরী এবং নিজদেহের সৌন্দর্য্যে তাঁহার দৃষ্টি না আছে, এমনও নহে।

চতুর্থ ব্যক্তি স্থিতিস্থাপক চর্ম্মের জন্য বিখ্যাত। তাহার নাক, গাল, পা ও বুকের চামড়া দুই আঙ্গুলে চাপিয়া ধরিলে টানিয়া একহাত পর্য্যন্ত উঠান যাইতে পারে।

পঞ্চম ব্যক্তির পা নাই, কিন্তু মাছের ডানার মত পায়ের পাতা নিতম্বের দুইপার্শ্বে সংলগ্ন। ইহার নাম ইলাই বাউয়েন। ইলাই বাউয়েন দুইখণ্ড কাষ্ঠে ভর করিয়া হাতের সাহায্যে ঝুলিয়া ঝুলিয়া বেশ হাঁটিতে পারে। এ ব্যক্তি বেশ শিক্ষিত, বয়স পঁয়তাল্লিশ। বিবাহিত। পাঁচটি সন্তান জন্মিয়াছে। প্রকৃতি সন্তানগুলিকে চরণ-ধনে বঞ্চিত করেন নাই।

ষষ্ঠ ব্যক্তির নাম ডেন্‌লো ফ্রিজ্। ১৪ বৎসর বয়সের সময় এ ব্যক্তি একটা লোককে কিরিচ গিলিতে দেখিয়া নিজে এই কার্য্য অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এখন এ বন্দুকসংলগ্ন সঙ্গীন গিলিয়া ফেলে, পরে বন্দুক ছুঁড়ে—বিপরীত ধাক্কায় সঙ্গীন বাহির হইয়া পড়ে।

সপ্তম ব্যক্তি—এইচ, সি, মেক্‌সি—ছুঁচের রাজা। এ লোকটা ছুঁচ খাইয়া জীবন ধারণ করে। দর্শকমণ্ডলীর একজনের হাতে ছুঁচ ভরা পিন্‌কুশন দিয়া বলে, ছয়টা করিয়া ছুঁচ আমার মুখে দাও। ছুঁচগুলি মুখে দিবা মাত্রই সে গিলিয়া ফেলে। পরে একরিল সুতা দর্শকদিগের হাতে দেওয়া হয়। দর্শকেরা রিল হইতে ৩। ৪ গজ সুতার একটি ছোট গুটি প্রস্তুত করিয়া মেকসির হাতে দেন। মেকসি গুটিটি ছুঁচের পিছনে পিছনে পাকস্থলীতে প্রেরণ করে। তৎপরে নানাপ্রকার মুখভঙ্গী করিতে থাকে। পরিশেষে দাঁতের মধ্যদিয়া একটুকু সুতা বাহির হয়, সুতাটুকু টানিয়া বাহির করিলেই দেখা যায় তাহাতে ছুঁচগুলি সমান দূরে দূরে গাঁথা রহিয়াছে। সুতরাং ছুঁচ গাথা কাজটি নাকি পাকস্থলীতে সম্পন্ন হয়!

অষ্টম ব্যক্তির নাম লালু। সে হিন্দুবালক। তাহার দেহে এক বালিকার শরীরযুক্ত রহিয়াছে। বালিকার গলা লালুর বুকে সংলগ্ন; বালিকা যেন বালকের বুকে প্রবেশ করিতেছিল, সরু রাস্তায় স্কন্ধদেশ আট্‌কাইয়া গিয়াছে।

অনন্ত-শয্যা।

ক্ষীরোদ-সমুদ্র-জলে নারায়ণ অনন্ত-শয্যায়।
পদতলে লক্ষ্মীদেবী, নতমুখী, বসিয়া যতনে
নিয়োজিতা পতির সে চরণপঙ্কজ সংবাহনে।
সমীপে বিরিঞ্চি বসি ভাববশে উন্মত্তের প্রায়।
এ সুন্দর ছবিখানি দেখি দেখি সাধ হল তার;
বসিল সে শয্যাশেষে পা দুখানি লইয়া আমার।

সে আমার কাছে আছে, তবু যদি দুইটি হৃদয়
দুজনার বাহুপাশে প্রাণপণে বাঁধা না রহিল,
সমুদ্রের কূলে বসি তবু যদি তৃষা না মিটিল,
তবে যেন এ মিলন একেবারে বৃথা মনে হয়।
দেবতা নহিত মোরা, অত নাহি সহা যায় প্রাণে,
খেলা থাক্, আয় বাল', আয় আয় হৃদিমাঝখানে।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার।

প্রদীপ

প্রথম ভাগ। | শ্রাবণ, ১৩০৫। | ৮ম সংখ্যা।

যাচনা।

ভালবেসে সখি নিভৃতে যতনে
আমার নামটি লিখিয়ো—তোমার
মনের মন্দিরে!
আমার পরাণে যে গান বাজিছে
তাহারি তালটি শিখিয়ো—তোমার
চরণ-মঞ্জীরে!

ধরিয়া রাখিয়ো সোহাগে আদরে
আমার মুখর পাখীটি—তোমার
প্রাসাদ-প্রাঙ্গনে!
মনে করে সখি বাঁধিয়া রাখিয়ো
আমার হাতের রাখীটি—তোমার
কনক কঙ্কণে!

আমার লতার একটি মুকুল
ভুলিয়া তুলিয়া রাখিয়ো—তোমার
অলক-বন্ধনে!
আমার স্মরণ-শুভ-সিন্দূরে
একটি বিন্দু আঁকিয়ো—তোমার
ললাট চন্দনে!

আমার মনের মোহের মাধুরী
মাখিয়া রাখিয়া দিয়োগো—তোমার
অঙ্গ সৌরভে!
আমার আকুল জীবন মরণ
টুটিয়া লুটিয়া নিয়োগো—তোমার
অতুল গৌরবে!

জীবজাতি-নির্ব্বাচন।

জাতি শব্দের অর্থ কি? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র,—প্রথমে ছিল চতুর্ব্বর্ণ, কালক্রমে উহারা জাতি নাম পাইয়াছে। উহাদের এক এক জাতির মধ্যেই আবার কত জাতি। শূদ্রের যে কত জাতি আছে, তাহা গণিয়া শেষ করাই যেন দুরূহ। আবার মনুষ্যজাতি, গোজাতি, স্ত্রীজাতি, প্রভৃতি বলা যায়। মনুষ্যজাতিকে ককেশীয়, মঙ্গোলীয়, প্রভৃতি কয়েকটি জাতিতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। প্রাণী সম্বন্ধেও যেমন, উদ্ভিদ সম্বন্ধেও তেমন। 'এ জাতীয় আম্র সর্ব্বদা পাওয়া যায় না,' 'চারিশত জাতীয় ধান্য আছে,' ইত্যাদি। *

এই সকল দৃষ্টান্তে জাতি অর্থে ভাগ বা শাখা বুঝিয়া থাকি। পৃথিবীতে যত মানুষ আছে, তৎসমুদয় যেন একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষ; ককেশীয়, মঙ্গোলীয় প্রভৃতি তাহার যেন

* জাতিতে মুসলমান, জাতিতে বৈষ্ণব, জাত ভিখারী প্রভৃতি স্থলে জাতি অর্থে উৎপত্তি বুঝায়। সুতরাং এই সকল প্রয়োগ উপরের দৃষ্টান্তের ঠিক অনুরূপ নহে।

এক এক শাখা। কিম্বা সমুদর মানুষের একভাগ ককেশীয়, দ্বিতীয় ভাগ মঙ্গোলীয়, ইত্যাদি। আর্য্যনামধারী মনুষ্য, সমূহের এক ভাগের নাম ব্রাহ্মণ, এক ভাগের নাম ক্ষত্রিয়, ইত্যাদি। তেমনই, পৃথিবীতে যত আম আছে, তাহার মধ্যে একভাগ বোম্বাই, একভাগ ফজ্‌লি, ইত্যাদি।

রাম, শ্যাম, যদু, গোপাল এক এক ব্যক্তি। উহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ আর্য্যজাতির, আর্য্য ককেশীয় জাতির, ককেশীয় মনুষ্য জাতির, মনুষ্য প্রাণীর, প্রাণী জীবের অন্তর্গত। ইহাদের মধ্যে আরও নানা বিভাগ থাকিতে পারে। যেমনই বিভাগ হউক, যেটি যার অন্তর্গত, সেটি সঙ্খ্যায় অল্প, যার অন্তর্গত সেটি অধিক। ন্যায়-শাস্ত্রে বৃহত্তরটির নাম সামান্য, ক্ষুদ্রটির নাম বিশেষ। তবেই মনুষ্য সামান্য নাম, আর্য্য বিশেষ নাম; আর্য্য সামান্য নাম, ব্রাহ্মণ বিশেষ নাম; ব্রাহ্মণ সামান্য নাম, রাম বিশেষ নাম।

সাধারণ কথাবার্ত্তায় জাতিশব্দের অর্থ বুঝিতে কোন গোল ঠেকে না। কিন্তু জীববিজ্ঞানে জাতিশব্দের (species) অর্থ বুঝা তত সহজ নহে। দুইটা জীব আছে; সে দুটা এক জাতীয় কি না, তাহা নির্ণয় করিতে সময়ে সময়ে বিস্তর পর্য্যালোচনা আবশ্যক হয়। কেন হয়, এবং এই দুরূহতা হইতে জীবসৃষ্টি সম্বন্ধে কি মনে হয়, তাহাই এখানে সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

সকলেই আমগাছ দেখিয়াছেন। দেখিয়াছেন, কোন দুইটি আমগাছ কাণ্ড-শাখা-প্রশাখা পত্রপুষ্পফল প্রভৃতি অঙ্গাদিতে ঠিক এক নহে, অথচ কেহই সে দুটা গাছকে আম না বলিয়া কোন একটাকে জাম বা অন্য গাছ বলেন না। এইরূপ অসঙ্খ্য আম গাছের মধ্যে অল্পাধিক প্রভেদ আছে, অথচ সকলেই আমগাছ। কত রকম পায়রা আছে, অথচ কেহ কোন একটা পায়রাকে ঘুঘু বা অন্য পাখী বলিয়া ভুল করেন না। তবে জীববিদগণই বা ভুল করিবেন কেন?

চাঁপা, কণকচাঁপা, কাঁঠালি চাঁপা, ভুঁই চাঁপা, সুলতান চাঁপা, গোবরিয়া চাঁপা প্রভৃতি অনেক গাছের নামে চাঁপা শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। কিগুণে যে ঐ সকল গাছের চাঁপা নাম হইয়াছে, তাহা ঠিক করা সহজ নহে। কেননা, উহারা সকলেই বিভিন্নজাতীয়; উহাদের মধ্যে কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না। ফুটন্ত চাঁপা ফুল দেখিতে যেমন, ফুটন্ত সুলতান চাঁপা (আধুনিক মালীদের প্রদত্ত বাঙ্গালা নাম) দেখিতে তেমন নয়। গাছের আকারেও নয়, পাতাতেও নয়, ফুলেও নয়। সুতরাং যা তা একটা নাম দিলেই নামের সার্থকতা হয় না। এইরূপ, বড় জাম, ছোট জাম, গোলাব জাম, জামরুল প্রভৃতি গাছের নামে জাম শব্দ থাকিলেও উহারা বিভিন্ন। কিন্তু বোম্বাই, মালদহ, ফজ্‌লী প্রভৃতি নাম থাকিলেও সকলেই এক আম বই অন্য কিছু নহে। তবেই, চলিত নাম দেখিয়া বৈজ্ঞানিক নামকরণের দুরূহতা বুঝিতে পারা যায় না। বৈজ্ঞানিকেরা বড় জাম ও ছোট জাম গাছকে দুই জাতীয় মনে করেন, কিন্তু বোম্বাই ফজ্‌লী প্রভৃতি বহুবিধ আম গাছকে একজাতীয় মনে করেন? ছোট জামগাছে ও বড় জামগাছে যে প্রভেদ, বোম্বাই ও ফজ্‌লীতে সে প্রভেদ নয় কি? কিসে নয়? অর্থাৎ কি প্রকার লক্ষণ থাকিলে বিভিন্ন জাতি হয়? ক ও খ দুইটি জীব আছে। আকারে, জীবনব্যাপারে, উহারা সদৃশও বটে, বিসদৃশও বটে। উহাদের মধ্যে প্রভেদ সত্ত্বেও ক ও খ কে এক জাতি বলা যাইতে পারে কি না; এই প্রভেদ কি প্রকার কতখানি হইলে উহাদিগকে পৃথক্ জাতীয় বলা যাইবে? এইরূপ সমস্যায় জীববিদগণকে পড়িতে হয়।

একটা সহজ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। মনে করুন, কোন স্থানে কাঠমল্লিকা, বনমল্লিকা, নবমল্লিকা (নেবারী), বেলা, মোতিয়া বেলা, কুন্দ, সপ্তলা (বড় কুন্দ), যুথি, হেমপুষ্পিকা (হলদে যুঁই), জাতির (চামেলী) একটা বৃহৎ অরণ্য আছে। উহাদের চলিত নাম ভুলিয়া যান। মনে করুন, ঐ গাছগুলিকে আপনি এই প্রথম দেখিতে-ছেন। দেখিবেন, সমুদয়েরই অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিতে বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। গাছের ধরণে, ডাঁটায় সকলেই প্রায় এক রকম। পাতার অল্প অল্প প্রভেদ দেখা যায়। জাতির পাতা জোড়া জোড়া, গোলাপ পাতার মত; হেমপুষ্পিকার পাতাও প্রায় সেই রকম জোড়া; যুথির পাতা বিল্বপত্রের মত তিনটিতে একটি; সপ্তলার পাতা যুথির মত কিন্তু পাতায় কোমল রোম আছে; কুন্দের পাতা একটি একটি কিন্তু রোমময়; অপর মল্লিকা বেলা নামের গাছগুলির পাতা একটি একটি, রোমশূন্য, আকারে প্রায় এক। এই-রূপ, উহাদের ফুল দেখিলে জানা যায়, গন্ধে ও বর্ণে যাহাই হউক, আকারেও একটু আধটু প্রভেদ থাকিলেও সকলের

ধরণটা এক, সকলেরই দুইটি করিয়া পরাগ-কেশর, ফলেও সকলে প্রায় এক। এখানে আমরা কয়েক রকম গাছ দেখিলাম। অনুসন্ধান করিলে এই ভারতেই উহা-দের মত প্রায় ১৮।১৯ রকম গাছ দেখিতে পাওয়া যায়।

গাছগুলি নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত নাম করিতে হইল। মনে করুন, উহাদের মধ্যে এক এক রকমের গাছগুলি বাছাই করিতে হইবে। আপনি পূর্ব্বে গাছগুলি দেখেন নাই, সবই নূতন। আপনি এক হাত উচ্চ গাছগুলিকে এক সারি, দুই হাত উচ্চ গাছগুলিকে আর এক সারি, তিন হাত উচ্চ গাছগুলিকে তৃতীয় সারি; এইরূপে উচ্চতা মাপিয়া গাছগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিলেন। কিংবা পাতার দৈর্ঘ্য প্রস্থ মাপিয়া ছোট পাতার গাছগুলির এক সারি, তদপেক্ষা বড় পাতার গাছগুলির আর এক সারি করিলেন। কিংবা একটি একটি পাতার গাছগুলির এক সারি, জোড়া জোড়া পাতার গাছগুলির অন্য এক সারি করিলেন। এইরূপ যে কোন একটি অঙ্গ ধরিয়া গাছ-গুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে পারেন। কিন্তু এরূপ বিভাগ যে নিতান্ত অস্বাভাবিক কৃত্রিম, তাহা আর বলিতে হইবে না।

আর এক রকমে ভাগ করিতে পারা যায়। আপনি যদৃচ্ছাক্রমে প্রথমে একটা চামেলী গাছ লইলেন। সেখানে সেই গাছটির সদৃশ আর যত গাছ ছিল, সকলগুলিকে প্রথম গাছটির কাছে আনিয়া রাখিলেন। আপনি দেখি-লেন, সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিচার করিলে উহারা একই রকম, আকারে উচ্চতায় বর্ণে একটু আধটু যে প্রভেদ আছে, তাহা গ্রহণযোগ্য নয়। উহারা সকলেই যে এক জাতীয় (চামেলী), তাহাতে সন্দেহ রহিল না। কিন্তু যখন নানাবিধ মল্লিকা ও বেলার কাছে আসিবেন, তখন একটু ফাঁপরে পড়িতে হইবে। বেলার কাছে মোতিয়া বেলা বসাইবেন কি? মনে আছে, গাছগুলিকে আপনি পূর্ব্বে দেখেন নাই, কোন্ গাছকে বেলা বা মোতিয়া বেলা বলে, তাহাও জানেন না? উহাদের পাতা এক রকম নয়, ফুলও নয়, গাছের ধরণও নয়। তার পর, কাঠ-মল্লিকা ও বনমল্লিকাকে বেলার পাশে আনিবেন কি? এস্থলে একটু ভাবিতে হইবে। এই কয়েকটি একজাতীয় কি না, বলিতে চিন্তা করিতে হইবে।

চিন্তাটা আর কিছু নহে, সেই পূর্ব্বের কথা। কি প্রকার লক্ষণ দেখিলে দুইটি জীবকে একজাতীয় মনে করা যাইতে পারে। এই রকমে বলিলেই প্রশ্নটা দুরূহ হইয়া পড়ে, অথচ জাতীয় লক্ষণ নির্ণয় না করিলেও জাতি-বিভাগ করা চলে না।

যদি বলেন, এক পিতামাতার সন্তানগুলি একজাতীয়, তাহা হইলেও প্রশ্নের দুরূহতা গেল না। কেন না যিনিই উদ্যানকর্ম্ম বা কৃষিকর্ম্ম করিয়াছেন, তিনিই জানেন সন্তান কদাপি অবিকল পিতামাতার মত হয় না। আবার একই পিতামাতার সন্তানগুলি কদাপি এক রকম হয় না। সুতরাং কোন্ কোন্ জীব এক আদিপুরুষের সন্তান, তাহা নিশ্চয় করা দুরূহ হইয়া পড়ে। যদি বলেন, প্রধান প্রধান লক্ষণে যে সকল জীবের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়, তাহারা এক-জাতীয়, তাহা হইলেও সুবিধা হইল না। কেন না, কোন্ কোন্ লক্ষণকে প্রধান বলা যাইবে, তাহা বলা আবশ্যক। এই প্রধান বা বিশেষ লক্ষণ বলিতে গিয়া আপনাতে আমাতে বিলক্ষণ মতভেদ ঘটিতে পারে। আপনি হয়ত মুগ ও মাষকলাইকে দুইজাতীয় মনে করিবেন, আমি হয়ত একজাতীয় মনে করিব; আপনি হয়ত শাদা ও লাল পদ্মকে দুই পৃথক্ জাতীয় মনে করিবেন, আমি হয়ত উহা-দিগকে একই-জাতীয় মনে করিব।

এই সমস্যায় পড়িয়া কোন জীববিৎ যে সকল জীবকে একজাতীয় মনে করেন, আর একজন তাহাদিগকেই আবার দুই বা তিন জাতীয় মনে করিয়াছেন। এরূপ ঘটনা জীববিজ্ঞানের পক্ষে নিত্য ব্যাপার। জাতীয় লক্ষণ নির্দ্দেশ করা কত দুরূহ, এখন কতকটা বুঝিতে পারা যাইবে।

যাহা হউক, মুগ ও মাষকলাইকে কেহই ঠিক এক-জাতীয় বলিতে পারিবেন না। মাষকলাই বুনিয়া মুগ কলাই পাওয়া, আর শ্বেতপদ্মবনে রক্ত পদ্ম পাওয়া, কাঠ-মল্লিকা গাছে মোতিয়া বেলা ফুটা কখন সম্ভব নহে। অথচ উহাদের মধ্যে কোন প্রধান প্রভেদও পাওয়া যায় না। উহারা তবে জাতির শাখা বা 'প্রকার' (variety)। উহারা প্রধান প্রধান লক্ষণে এক, সুতরাং একজাতীয় হইলেও 'প্রকারে' ভিন্ন।

কার্য্যস্থলে জীববিৎকে জাতীয় লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতেই

হয়। এই এই লক্ষণ থাকিলে আমগাছ বলা যাইবে,—প্রশ্নটা ঠিক এরূপ নহে। যাবতীয় জাতির লক্ষণের বিশেষত্ব কি? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, যে সকল জীব দেখিলে এক পিতামাতার (আদিপুরুষের) সন্তান বলিয়া বোধ হয়, তাহারা একজাতীয়। আরও বলা যায় যে, জাতীয় লক্ষণ নিয়ত এক থাকে, সহজে পরিবর্ত্তিত হয় না।

অবিচ্ছিন্ন প্রকৃতিকে বিচ্ছিন্ন করিতে গেলেই চেষ্টাটা অপ্রাকৃতিক হইয়া পড়ে। এখানেও তাই। জাতীয় লক্ষণ চিরকাল এক থাকিবে, কোন কালেই পরিবর্ত্তিত হইবে না? ইহা কি সম্ভবপর? যখনই কোন এক জাতির 'প্রকার' ভেদ দেখা যায়, তখনই উপরের লক্ষণ ব্যর্থ হইয়া পড়ে। অর্থাৎ জাতি-লক্ষণ ও সেই জাতির প্রকার-লক্ষণের মধ্যের প্রভেদটা অতিশয় সূক্ষ্ম। যাহা হউক কার্য্যস্থলে স্বীকার করা যায় যে, প্রকার-লক্ষণ বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয়। প্রকার যখন জাতির অন্তর্গত, তখন আর বলিতে হইবে না যে, জাতীয় লক্ষণ নিয়ত এক থাকার অর্থ বংশানুক্রমে উহার সঞ্চরণশীলতা।

প্রকারলক্ষণাক্রান্ত জীবসমূহকে দুইভাগে ভাগ করিতে পারা যায়। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি আরণ্য; অর্থাৎ স্বাভাবিক জল, বায়ু, মৃত্তিকা, আহার্য্য প্রভৃতির প্রভেদে তাহাদের স্ব স্ব লক্ষণ দাঁড়াইয়াছে। যেমন, শ্রীহট্টের কমলা হুগলিতে পুতিলে সেখানে শ্রীহট্টের কমলা পাওয়া যায় না, বিলাতি কুকুরের পুং স্ত্রী ছাড়া থাকিলে তাহাদের বিলাতিত্ব লুপ্ত হয়। এ সকল স্থানে যে পরিবর্ত্তন ঘটে, সেটা যেন প্রকৃতি নিজেই করে। অন্যপক্ষে, আমরা কুকুর, বিড়াল, ছাগল, ঘোড়া, আম, কাঁটাল প্রভৃতি গ্রাম্যজীবগণকে পালন করিয়া ইচ্ছানুরূপ পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করি। এ সকল পরিবর্ত্তনে প্রকৃতির বড় একটা হাত থাকে না। যেন প্রকৃতির নিয়মের ফাঁকি বাহির করিয়া পরিবর্ত্তনটা ইচ্ছানুরূপ করিয়া লই।

এইরূপে, এক জাতীয় আরণ্য জীবগণের প্রকার সমূহে এত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে যে, স্থূল দৃষ্টিতে তৎসমুদায় পৃথক্ পৃথক্ জাতি বলিয়া বোধ হয়। এইরূপ, আমাদের পালন কৌশলে গ্রাম্য জীবজাতির প্রকারে বহুল পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে। এইরূপেই, কত রকম পায়রা ও কুকুর জন্মিয়াছে। এই রূপেই ফুলকপি ও বাঁধাকপি নানা রকমের হইয়াছে।

মনে করুন, ক এবং ঙ দুইটি জীব। আপাততঃ দেখিলে উহারা যে একজাতীয়, তাহা কিছুতেই বোধ হয় না। কিন্তু মনে করুন অনুসন্ধান করিতে করিতে খ, গ, ঘ জীব পাওয়া গেল। দেখা গেল, ক এবং খ নামক জীবদ্বয়ে প্রভেদ আছে বটে, কিন্তু সে প্রভেদটা ক এবং ঙ'র মত অধিক নহে। তেমনই, খ ও গ'র মধ্যে প্রভেদ আছে বটে, কিন্তু তাহা খ ও ঙ'র মত অধিক নহে। এই রূপে, যদি ক ও ঙ'র মধ্যবর্ত্তী আকারের জীব দেখা যায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে ক খ গ ঘ ঙ কয়েকটি জীব একই জাতীয়, একেরই পরিবর্ত্তনে উহারা একটু একটু বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু যদি খ গ ঘ প্রকার জীব দেখা না যাইত, তাহা হইলে ক এবং ঙ নামক জীব দুইটিকে দুই জাতীয় বলিয়া গণ্য করিতে হইত। এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। যাহা হউক, কোন্ জীবসমূহকে একই জাতীয় বলা যাইবে, তাহা নির্দ্দেশ করা স্থলবিশেষে কত দুষ্কর হয়, তাহা এই দৃষ্টান্ত হইতেও বুঝা যাইবে।

আরও কথা আছে। সকলেই জানেন, একজাতীয় পুং ও অন্যজাতীয় স্ত্রী প্রাণীর সহযোগে সঙ্কর প্রাণী জন্মে। ঘোড়া ও গাধা, নেকড়ে ও কুকুর, কুকুর ও শিয়ালের সঙ্কর অজ্ঞাত নহে। এই এই স্থলে ঐ ঐ জীবজাতি নিকট সম্পর্কের। এতদপেক্ষা দূর সম্পর্কের প্রাণীর মধ্যেও সঙ্কর হইয়া থাকে। ছাগ ও মেষ মধ্যে সঙ্কর হইয়াছে। তবেই দেখুন, যথেচ্ছবিচরণশীল পশু পক্ষীর মধ্যে সঙ্কর উৎপন্ন হইয়া জীবজাতিকে নিয়ত একই লক্ষণাক্রান্ত থাকিতে দিতেছে না। প্রাণীর মধ্যে যেমন, উদ্ভিদের মধ্যেও তেমনই সঙ্কর জন্মিয়া থাকে। তবে বলিতে পারেন, জাতিসঙ্কর প্রায়ই বন্ধ্য হয়। এসম্বন্ধে বলিবার অনেক কথা আছে। তৎসত্ত্বেও কিন্তু অনেক দৃষ্টান্ত আছে, যেখানে বিভিন্নজাতীয় জীবের মত জাতিসঙ্করের উৎপাদিকাশক্তি আছে।

তবেই দেখুন, কোন্ জীব কোন্ জাতীয়, তাহা নির্দ্দেশ করিবার পক্ষে কত অন্তরায় আছে! কিন্তু কেবল জাতিনির্ব্বাচনেই এরূপ অন্তরায় আছে, এমন নহে। বেলা কুন্দাদির মধ্যে পরস্পর সাদৃশ্য আছে। এই সকল সাদৃশ্য দেখিয়া ঐ সকল জীবজাতিকে এক গণের (genus) অন্তর্গত মনে করা যায়। এইরূপ, রুই, কালবোস মাছ, ভাঙ্গন, বাটা এক গণের; সিংহ, ব্যাঘ্র, চিতা, বনবিড়াল, খটাস প্রভৃতি আর এক গণের অন্তর্গত।

কিন্তু গণের লক্ষণ কি? কি প্রকার লক্ষণ দেখিলে কয়েকটি জীবজাতিকে একই গণের অন্তর্গত মনে করা যাইবে? জাতির লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতেও যেমন গোলযোগ, গণের লক্ষণ বলিতেও তেমনই ঘটে। জীবমাত্রেরই পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু সমুদায় পরিবর্ত্তন পুত্রপৌত্রাদিক্রমে সঞ্চারিত হয় না। সেগুলা ব্যক্তিগত পরিবর্ত্তন; যেমন পাতার দৈর্ঘ্য প্রস্থ, ফুলদলের বর্ণ আকার ইত্যাদি। জলবায়ু আহার্য্য প্রভৃতির প্রভেদে এই সকল প্রভেদ ঘটিয়া থাকে। এই সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে কতকগুলি বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয়। সেগুলি লইয়া 'প্রকার' কল্পনা। কতকগুলি প্রকারলক্ষণাক্রান্ত জীব লইয়া এক এক জাতি কল্পনা। এস্থলে প্রধান প্রধান লক্ষণ এক থাকে। কতকগুলি জাতির সমলক্ষণ দেখিয়া এক এক গণকল্পনা। গণের লক্ষণ জাতির লক্ষণের ন্যায় নিকট নহে, কিন্তু জাতির লক্ষণ অপেক্ষা আরও স্থায়ী। এইরূপ কতকগুলি গণ লইয়া বর্গ বংশ প্রভৃতি নানা সমুচ্চয়ে জীবসমূহ বিভক্ত হইয়া থাকে।

আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রত্যেক বিভাগ স্থলেই জাতি নির্দ্দেশের ন্যায় গোলযোগে পড়িতে হয়। জীবজগৎ যেন বলিতেছে, আমাদিগকে বিভাগ করিও না, করিতে পারিবে না! এক জাতির জীব শেষ করিয়া অন্য জাতির জীবে আসিতে গেলে যেমন দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, এক গণ হইতে অন্য গণে, এক বর্গ হইতে অন্য বর্গে, এক বংশ হইতে অন্য বংশে যাইবার সময়েও তেমনই দ্বন্দ্ব দেখা যায়! এমন কি, কোন্ জীবগুলিকে প্রাণী বলিব, কোন্ গুলিকেই উদ্ভিদ বলিব, তাহাও স্থলবিশেষে নিশ্চয় করিতে পারা যায় না। মধ্যস্থলে কোন গোল নাই, সীমাভূমিতেই বিবাদ। কতকগুলি জীব লইয়া একটি বৃত্ত আঁকিতে যাই, অমনই অপর কতকগুলি আসিয়া বৃত্তসীমা অধিকার করে, অন্য এক জীববৃত্তের সঙ্গে মিশাইয়া দেয়। অর্থাৎ এমন জীব দেখা যায়, যাহাকে এ জাতিতেও বসাইতে পারা যায়, ও জাতিতেও পারা যায়; এমন জাতি আছে, যাহা এ গণেও পড়িতে পারে ও গণেও পারে। এরূপ কেন হয়?

এই কেন'র উত্তর দিতে গেলে জীবজাতির পরস্পর সম্পর্কের কথা মনে আসে। অর্থাৎ যাবতীয় জীবজাতির মধ্যে কোন রূপ সম্পর্ক আছে কি না এবং যদি থাকে, সেটা কি রকমের তাহা অনুসন্ধান করিতে হয়।

পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে, নানা রকমে জীবসমূহকে বিভাগ করিতে পারা যায়। কিন্তু কোন্ রকমটি ঠিক? এমন কোন উপায় আছে, যাহা বিভাগ সময়ে একমাত্র অবলম্বন বলিয়া বোধ হইবে? যাহা বিভাজকের খেয়ালের উপর নির্ভর না করিয়া সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে?

মনে করুন, কোন এক পরিবারে পিতা পিতামহ পুত্র পৌত্র খুড়া জ্যেঠা খুড়তত ভাই পিসতুত ভাই প্রভৃতি শতাধিক পুরুষ আছে। মনে করুন, আপনি উহাদিগকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিতে গেলেন। উহাদের মধ্যে কেহ কৃষ্ণ কেহ গৌরবর্ণ, কেহ দীর্ঘ কেহ হ্রস্ব, কেহ স্থূল কেহ কৃশ, কেহ পণ্ডিত কেহ মূর্খ। আপনি এই এই লক্ষণ দেখিয়া নানা রকমে ঐ পরিবারের লোকগুলিকে ভাগ করিতে পারেন। কিন্তু এরূপ বিভাজন প্রকৃতিসম্মত অর্থাৎ সত্য হইবে কি? ইহা যে বড়ই কৃত্রিম হইবে, তাহা সহজেই বুঝা যায়; কেন না, ইহাতে হয় ত পিতামহ পিসতুত ভাইর দলে যাইবে, ভাগিনেয় জ্যেঠার সঙ্গে পড়িবে। সুতরাং এরূপ বিভাজনটা সত্য নহে। কিন্তু যদি পরিবারের লোকগুলির রক্তের সম্পর্ক দেখিয়া পিতামহ পিতা পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে পরে পরে বসান যায়, তাহা হইলে বিভাজনতা যে ঠিক প্রকৃতিসম্মত হয়, তাহা বুঝিতে বাকি থাকে না।

যাবতীয় জীবজাতির মধ্যে এইরূপ কোন সম্পর্ক আছে কি? পূর্ব্বে জীববিদ্‌গণ মনে করিতেন এক এক জাতীয় জীব স্ব স্ব লক্ষণ লইয়া পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্ট হইয়াছে, এবং এক এক জীব নিজের জাতীয় লক্ষণ পুত্র পৌত্রাদিতে সঞ্চারিত করিয়া দেয় বলিয়া পূর্ব্বের লক্ষণগুলি এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। বর্ত্তমানকালের এক এক জাতীয় জীব—কোটি কোটি মানুষ, গরু যুঁই বেলা প্রভৃতি এই প্রাকৃতিক নিয়মে তাহাদের সদৃশ এক বা দুইটি আদিজীব হইতে জন্মিয়াছে। এই আদিপুরুষ কোথা হইতে আসিল,

কে জানে; দুপ্‌দাপ্‌ শব্দে আকাশ হইতে পড়িয়াছে, না এখানে কেহ গড়িয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিবার প্রয়োজন নাই। আমরা আজকালি যেমন পিতা হইতে পুত্রের উৎপত্তি দেখিতেছি, আদি পিতার জন্ম সে রকমে হয় নাই, যেন কোন অনৈসর্গিক বা অতিপ্রাকৃত নিয়মে হইয়াছে।

ইহার নাম পৃথক্‌সৃষ্টিবাদ। এই মতে বর্ত্তমান দৃষ্ট বেলা যুঁই কুন্দাদির উৎপত্তির ইতিহাস নিম্নের চিত্রের ন্যায় দাঁড়ায়।

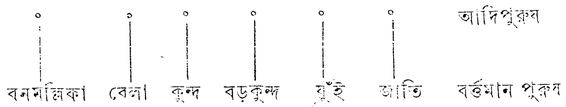

এই মতে দেখা যায়, বর্ত্তমানকালে দৃষ্ট প্রত্যেক জাতীয় জীব—যেমন সমুদয় মনুষ্য—সৃষ্টির প্রথম হইতে এক আদি পুরুষ (এক বা দুই) হইতে আসিতেছে এবং এক্ষণে যত জীবজাতি দেখা যাইতেছে, সৃষ্টির সময়েও ততগুলিত ছিলই, বরং বেশীই ছিল। বেশীই ছিল, কেননা মাটী খুঁড়িতে খুঁড়িতে এমন কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, যাহা বর্ত্তমান সময়ের কোন জীবের মত নহে। সে সমুদায় জীব এখন নাই, পূর্ব্বে ছিল। যাহা হউক, সে তর্কে এখন প্রয়োজন নাই। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এক আদিজীবের সঙ্গে অন্য আদিজীবের কোন সম্পর্ক ছিল না। দুইখান কাপড় এক তাঁতির হইলেও উহারা যেমন কোন সম্পর্ক রাখে না, তেমনই ঐ সকল আদিজীবদিগের মধ্যে পরস্পর কোন সম্পর্ক ছিল না।

সুতরাং এক্ষণে দৃষ্ট যাবতীয় জীবজাতির মধ্যেই বা সম্পর্ক থাকিবে কেন? মানুষের সঙ্গে মাকড়সার সম্পর্ক কি? কিছুই না! কেন না, উহাদের আদিপুরুষের মধ্যেই ছিল না। অবশ্য একই জাতির সমুদয় জীবের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক আছে। যত চামেলী গাছ আছে, সকলেই যখন এক আদি চামেলীর সন্তান, তখনত তাহাদের মধ্যে রক্তের টান নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু চামেলীর সঙ্গে যুঁইর কেন থাকিবে? উহাদের মধ্যে আকারগত সাদৃশ্য? থাকিতেও পারে, নাও পারে। তবেই পৃথক্‌সৃষ্টিবাদে বিভিন্ন জীবজাতির মধ্যে দৃষ্ট সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের কোন কারণ পাওয়া যায় না। কি নিয়মে জীব সমুদয়কে জাতিগণাদিতে বিভক্ত করা যাইবে, তাহারও কোন নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না।

কিন্তু এমনও মনে করা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমানকালে দৃষ্ট এক জীবজাতি কোন অজ্ঞাত বুদ্ধির দুষ্প্রবেশ্য অতীত কালে প্রাকৃতিক নিয়ম ক্রমে * অন্য এক জীবজাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মল্লিকা বেলা কুন্দাদির ভাবীপুরুষ ধরিয়া গেলে এই মতে আমরা দেখিব যে, উহাদের জাতীয় লক্ষণ ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছে; এখন বেলার যে দুই তিনটি 'প্রকার' দেখিতেছি তাহাদের লক্ষণ ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছে; কালক্রমে এত পরিবর্ত্তন ঘটিল যে, আর তাহাদিগকে এক জাতির 'প্রকার' বলিতে পারা গেল না; তাহারা প্রকার-লক্ষণ অতিক্রম করিয়া বিভিন্ন জাতির লক্ষণ পাইল। সেইরূপ, বেলা যুঁই প্রভৃতির পূর্ব্বপুরুষ ধরিয়া গেলে দেখিব যে, উহাদের স্ব স্ব জাতীয় লক্ষণ ক্রমশঃ যেন অস্পষ্ট হইতেছে; উহাদের মধ্যে ক্রমশঃ 'প্রকার' লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে; আরও পূর্ব্বে উহারা সকলেই এক জাতীয় বলিয়া বোধ হইতেছে; আরও কোন অতীত কালে উহারা সকলেই যেন এক আদিপুরুষ হইতে জন্মিয়াছে।

আমরা কেবল বর্ত্তমান পুরুষ দেখিতেছি, ভূত বা ভাবী পুরুষ সম্বন্ধে কিছুই জানিনা। আমাদের অনুমান ঠিক কি না, তাহা ত্রিকালজ্ঞ নইলে কেহই বলিতে পারেন না। মনে করুন, ক্ষণেকের জন্য আমরা ত্রিকালজ্ঞ হইয়াছি, এবং মল্লিকাদির বংশাবলী নিম্নের চিত্রের ন্যায় দেখিতেছি।

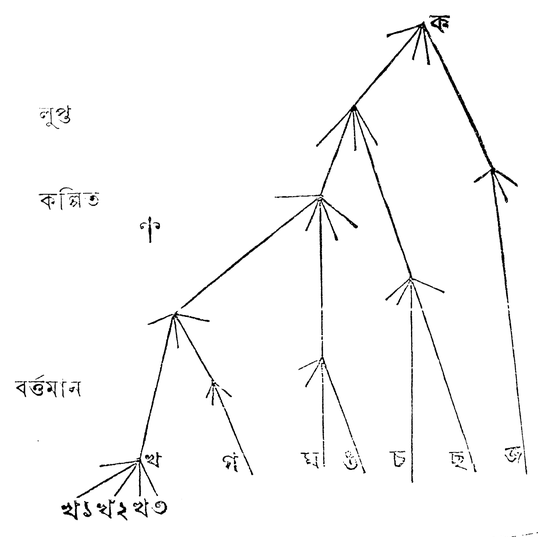

* স্রষ্টার নাম করিলাম না। সম্প্রতি করিবার কোন প্রয়োজন নাই। এই প্রয়োজনাভাবেই কিন্তু এই মতের এত বিপক্ষ দাঁড়াইয়াছে।

এই অনুমানে দেখা যায়, মল্লিকাগণের সমুদয় জাতি ক এক আদি পুরুষ হইতে একটু একটু পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান আকার লক্ষণাদি পাইয়াছে। উহাদের বংশাবলী বৃক্ষের শাখা প্রশাখা স্বরূপে চিত্রিত হইতে পারিল বলিয়া উহাই যেন প্রকৃতি সম্মত বলিয়া বোধ হইতেছে। এতদ্দ্বারায় এক আদি পুরুষ হইতে জাত বিবিধ জাতির মধ্যে সবিশেষ সম্পর্ক দেখা যাইতেছে।

পৃথক্‌সৃষ্টিও অনুমান, পরিবর্ত্তনে বা বিবর্ত্তনে সৃষ্টিও তেমনই অনুমান। কিন্তু ঐ দুই অনুমানের মধ্যে কোন্‌টা ঠিক বলিয়া মনে হয়? কোন্ অনুমান দ্বারা এক গণের জাতি সমূহের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের কারণ বুঝিতে পারা যায়? পৃথক্‌সৃষ্টিবাদে কিছুই পারা যায় না। বিবর্ত্তন-সৃষ্টিবাদে বুঝা যায়, এক আদিপুরুষ হইতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শাখা হইতে বর্ত্তমান দৃষ্ট জাতির উদ্ভব হইয়াছে। উপরের দৃষ্টান্তের বেলা ও কুন্দের যত সাদৃশ্য, বেলা ও চামেলীর তত নহে। কারণ বেলা ও কুন্দ যে সময়ে যে শাখা হইতে বহির্গত হইয়াছে, বেলা ও চামেলী সে সময়ে সেই শাখা হইতে বহির্গত হয় নাই, আরও পূর্ব্বকালে আরও উর্দ্ধতন শাখা হইতে পৃথক্ হইয়াছে। এইরূপে, আরও একটু অতীত কালে প্রবেশ করিলে নিকট সম্পর্কীয় দুই গণের মধ্যেও জ্ঞাতিত্ব দেখিতে পাওয়া যাইবে। এইরূপে সমুদয় উদ্ভিদ যেন এক আদিপুরুষ হইতে জাত বলিয়া বোধ হইবে; সমুদয় প্রাণীর মধ্যে পুরুষানুক্রমে জ্ঞাতিত্বের পরিচয় পাওয়া যাইবে। হয়তবা উদ্ভিদ ও প্রাণীরও আদিপুরুষ এক।

সম্প্রতি ততদূরে যাইবার প্রয়োজন নাই। আমি বুঝিতে পারি, ইতিমধ্যেই পাঠকের ধৈর্য্য চ্যুত হইয়াছে। কিসে কি হয়, কে বলিতে পারে? পৃথক্ সৃষ্টিবাদ সত্য, কি বিবর্ত্তন সৃষ্টিবাদ সত্য, কে বলিতে পারে? কিসে কি হইয়াছে বলিয়া যাঁহারা নিশ্চিন্ত হইতে চান, তাঁহাদের সহিত কোন তর্ক নাই। তাঁহাদের সহিত কোনও তর্ক থাকিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা সৃষ্টিতত্ত্ব জানিতে প্রয়াসী, যাঁহারা এ সকল বিষয় চিন্তা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে একটা অনুমান গ্রহণ করিতেই হইবে। আর উপরের ঐ দুই অনুমান ব্যতীত অন্য অনুমানও নাই, কল্পনাতেও আসে না।

যাঁহারা জীব লইয়া নাড়াচাড়া করেন, যাঁহারা তাহাদের আচার ব্যবহার, ক্রিয়া কলাপ প্রভৃতি শিক্ষা করেন, তাঁহাদিগকে পদে পদে ঐ দুই অনুমানের মধ্যে কোন্‌টা ঠিক, জিজ্ঞাসা করিতে হয়। জীবজাতি পরিবর্ত্তনশীল, তাহা স্বীকার করিতেই হয়। ৮০৯ খৃঃ অব্দে লামার্ক নামক জনৈক জীবতত্ত্বান্বেষী জীবজাতির পরিবর্ত্তনশীলতা উপলব্ধ করেন এবং বলেন যে, এক জাতি হইতে অন্য জাতি হওয়া অসম্ভব নহে। তদনন্তর একের পর অন্য জীববিদ্যাধ্যেতা দেখিতে পাইলেন যে, জীবজাতিকে যত অপরিবর্ত্তনীয় মনে করা যাইত, বাস্তবিক তত নহে। আজ চল্লিশ বৎসর হইল দারবিন সাহেব বিবর্ত্তনবাদের মূল অতীব দৃঢ় করিয়া গিয়াছেন। তদবধি তাঁহার শিষ্যেরা উহার অঙ্গাদির পুষ্টিসাধনে যত্নবান্ রহিয়াছেন। এখন জীববিবর্ত্তনে কেহ অবিশ্বাস করেন না, সে প্রশ্নের আগের প্রশ্ন এখন জীববিদ্‌গণের ভাবনার বিষয় হইয়াছে। কি কারণে কি নিয়মে জাতির পরিবর্ত্তন হয়, তৎসম্বন্ধেই মতভেদ আছে। সে মতগুলিও যে পরস্পরবিরোধী, তাহাও নহে। কেহ বা বলেন, জাতিবিবর্ত্তনে এই কারণ অধিক বলবান্, কেহ বা বলেন সে কারণটা তত বলবান্ নহে, অন্য এই কারণটা অধিক কার্য্যকর, ইত্যাদি।

অথচ এক্ষণেও এদেশে কৃতবিদ্যগণের মধ্যে এই বিবর্ত্তনবাদকে উপহাস করিতে দেখা যায়। জিজ্ঞাসা করুন, বিবর্ত্তনবাদটা কি? তাঁহারা নিঃসঙ্কোচে উত্তর দিবেন, বানর হইতে মানুষের উৎপত্তি। জিজ্ঞাসা করুন, কি তত্ত্ব আবিষ্কার, কি মত প্রচার, করিয়া দারবিন অমর হইয়াছেন, অমনই উত্তর হইবে বানর হইতে মানুষের জন্ম।

মানবের পূর্ব্বপুরুষ বানর ছিল কি কেঙ্গারু ছিল, বিবর্ত্তনবাদে তাহা অকিঞ্চিৎকর। বানর হইতে মানুষের উদ্ভব, কি মানুষ হইতে বানরের উদ্ভব, বানর ও মানুষে খুড়তত, জ্যেঠতত ভাই, তাহা বিবর্ত্তনবাদের প্রতিপাদ্য বিষয় হইলেও অকিঞ্চিৎকর। বস্তুতঃ যদি কোন একটা মত বর্ত্তমান বিজ্ঞানকে গৌরবান্বিত করিয়া থাকে, যদি কোন একটা মত যাবতীয় বিজ্ঞানের চিন্তাস্রোত প্রণালী-

† চিত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ঃ—খ = মল্লিকা, গ = নেয়ালী, ঘ = কুন্দ, ঙ = বড়কুন্দ, চ = যুঁই, ছ = হল্‌দে যুঁই, জ = জাতি, খ১ = বনমল্লিকা, খ২ = কাঠমল্লিকা, খ৩ = বেলা।

বিশেষে আবদ্ধ করিয়া থাকে, তাহা এই বিবর্ত্তনবাদ। যাবতীয় সত্যের বিশেষত্ব এই যে, সেই সত্যটি বলিবামাত্র বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়। মনে হয় যেন বিষয়টা জানিতাম, বলাতে স্পষ্ট হইয়া গেল। বিবর্ত্তনবাদ এমনই সত্য। দারবিন বলিতেছেন, কি অমুক খ্যাতনামা ব্যক্তি বলিতেছেন সুতরাং সত্য, এ তর্ক তখন মনে উঠিবার অবকাশ পায় না। সত্যটা আবিষ্কর্ত্তার যেমন, আমাদেরও তেমনই বোধ হয়।

সে সত্যটা কি? উহা এই যে, উদ্ভিদ ও প্রাণী লইয়া যে সমস্ত জীব দেখিতেছি, অল্পে অল্পে তাহাদের পরিবর্ত্তন হয়; তাহারা যে যে লক্ষণ লইয়া প্রথমে দেখা দিয়াছিল, তাহাদের সে সে লক্ষণ নিয়ত এক নাই। জীবজগৎ পরিবর্ত্তনের রঙ্গভূমি। সেখানে আভ্যন্তর ও বাহ্যকারণ নিয়ত ক্রীড়া করিতেছে। ইহারই ফলে সন্তান অবিকল পিতা মাতার সদৃশ হয় না, বর্ণ আকার অঙ্গাদিতে পিতামাতা হইতে কিয়ৎপরিমাণে বিভিন্ন হইয়া পড়ে। অনুকূল অবস্থা ঘটিলে জাত পরিবর্ত্তন বহুল হয় এবং কালক্রমে ঐ সকল পরিবর্ত্তনের সমুদায় না হউক, কতকগুলি স্থায়ী হইয়া যায়। এইরূপে প্রত্যেক জীবজাতি পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়ে, পরিবর্ত্তনের ফলস্বরূপ নূতন নূতন প্রকারের জীব উৎপন্ন হয়। তাহারাই পরবর্ত্তী কালে আবার বিভিন্ন জাতীয় বলিয়া বোধ হয়। অর্থাৎ প্রথমোক্ত জাতির পরিবর্ত্তনে বা বিবর্ত্তনে শেষোক্ত জাতির উদ্ভব হয়। স্থূলতঃ ইহাই জীবজাতির বিবর্ত্তনবাদ।

জাতিবিবর্ত্তনবাদ অবশ্য প্রত্যক্ষপ্রমাণযোগ্য নহে। একটু চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে উহা সেরূপ হইতেই পারে না। আপনি আমি ইচ্ছা করিলে, এক জাতীয় জীবকে অন্য জাতীয় করিতে পারিব, তাহা নহে। শুধু তাহাই নহে, যতদিন হইতে কোন জীবজাতির ইতিহাস পাওয়া যাইতেছে, সেই দেড় হাজার বৎসরের মধ্যে কিম্বা তদপেক্ষা অধিক সময়ে যে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্য জাতির লক্ষণ পাইয়াছে, তাহাও জানা নাই। এ সকল সত্য, তথাপি জাতিবিবর্ত্তনও সত্য। মাধ্যাকর্ষণশক্তিবাদ যেমন সত্য, বিবর্ত্তনবাদও তেমনই সত্য। যে আকর্ষণ নিয়মে গ্রহগণ নিয়ত সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতেছে, তাহা যেমন সত্য, জীবজাতি অপরিবর্ত্তনীয় নহে, তাহার বিবর্ত্তন হয়, এবং সেই বিবর্ত্তনেই অন্য জাতির উৎপত্তি, ইহাও তেমনই সত্য। বিভিন্ন জীবজাতির সৃষ্টি বিবর্ত্তনবশতঃ হইয়াছে। একথা মানিতেই হয়। কেন হয়? না মানিলে জীববিদ্যা সম্পূর্ণ অসম্বদ্ধ হইয়া পড়ে, উহার অন্তর্গত যাবতীয় বিষয়ই দুরবগাহ হইয়া পড়ে। এ প্রবন্ধে জীবজাতির লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে বিবর্ত্তনবাদের সত্যতা কতকটা উপলব্ধ করা গিয়াছে। কিন্তু জাতিনির্ব্বাচন কিংবা জাতিবিভাজন লইয়াই জীববিদ্যা নহে। উহার অন্যান্য শাখাতেও বিবর্ত্তনবাদ স্বীকার করা কত আবশ্যক হয়, তাহা সময়ান্তরে বলা যাইবে। *

কলিকাল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহের পর দীর্ঘ দেড়টা বৎসর অতীত হইয়া গেলে তবে জয়কালীর একটী কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল! ইহার পরে জয়কালীর যে কয়েকটী পুত্রকন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদেরও পরস্পরের বয়সের পার্থক্য এক এক বৎসরের ন্যূন নহে। কিন্তু তাহার সকলগুলি বাঁচিয়া নাই; কেহ সূতিকাগৃহে কেহ বা ভূলোকের আলোক দর্শনের পূর্ব্বেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে।

কয়েক বৎসর পরে শিবচরণের অপর দুই সহোদরের বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা বিবাহের দুই তিন বৎসর পরেই শোকসন্তপ্তা বৃদ্ধা জননীর হৃদ্‌পিণ্ড ছিঁড়িয়া, কিশোরী পত্নীকে অকূল সাগরে ভাসাইয়া চির দিনের মত সংসার হইতে বিদায় লইয়াছেন! সেকথা সংক্ষেপে ইতি পূর্ব্বে বলিয়াছি।

জয়কালীর বিবাহের চৌদ্দ বৎসরের পরের ঘটনা লইয়া আমরা এই আখ্যায়িকা আরম্ভ করিয়াছি। প্রসঙ্গক্রমে, এই বিবাহের পূর্ব্বের বিবরণও কিছু কিছু দিতে হইল।

---

* ইংরাজীতে Organic Evolution সম্বন্ধে অনেক বহি আছে। Romanes's Evidences of Organic Evolution প্রথম পাঠার্থীর পক্ষে একখানি সুন্দর গ্রন্থ। Wallace's Darwinism গ্রন্থখানিও কঠিন নহে! কিন্তু প্রথমেই Darwin's Origin of Species পড়িতে গেলে সাধারণ পাঠক গ্রন্থখানির রসাস্বাদন করিতে পারিবেন না। তৎপূর্ব্বে অন্ততঃ Darwin's Plants and Animals under Domestication পাঠ করা কর্ত্তব্য।

কাজেই আমরা কথায় কথায় অনেকটা পিছাইয়া পড়িয়াছি। ভূপেন্দ্র, সরোজ এবং সুষমার কথাও ভুলিয়া আছি। এখন আবার তাহাদের সংবাদ লইতে হইতেছে।

মাতাঠাকুরাণীর শ্রাদ্ধাদি ও টাকাকড়ি বিভাগ সম্পন্ন করিয়া শিবচরণ ছয় মাস হইল ব্যবসাস্থানে গিয়াছিলেন। সম্প্রতি গৃহে ফিরিয়াছেন। এদিকে রায়েদের গৃহ-তরণীখানি কাণ্ডারীবিহীন হইয়া ইতস্ততঃ ভাসিতেছিল। শিবচরণের আগমনের এক দিন পূর্ব্বেই, পাকা মাঝি জয়কালী আসিয়া তাহার হাইল ধরিলেন।

ভূপেন্দ্রও নিশ্চিন্ত হইয়া 'ল' পরীক্ষা দিতে কলিকাতা চলিয়া গেলেন। কয়েক দিন পরে সরোজও তাহার কনিষ্ঠ সহোদরের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে পিত্রালয় গেল।

সরোজ যেদিন যায়, সুষমা বালিকার মত, সরোজের গলা জড়াইয়া ধরিয়া সেদিন বড় কাঁদিয়াছিল। সরোজকে পাইয়া সে সকল দুঃখ ভুলিয়াছিল। আজ আবার যেন তার সকল দুঃখ নূতন করিয়া স্মৃতিপটে ফুটিয়া উঠিল, তাহার হৃদয় যেন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল! সুষমাকে ছাড়িয়া যাইতে সরোজেরও মন কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল, পিত্রালয় যাইবার আনন্দেও সে তেমন উৎফুল্ল হইতে পারে নাই।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিধবা হওয়ার পরই সুষমা সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলে, কিন্তু শাশুড়ীর বিশেষ অনুরোধে হাতে কেবল চুড়ি কয়গাছি রাখিয়াছিল। ছেলে মানুষ বলিয়া কেহ তাহাকে থান পরিতে দিত না, সেও অভ্যাস বশতঃ এপর্য্যন্ত মিহি পেড়ে কাপড়ই পরিত।

শিবচরণ পরম হিন্দু, বিধবা ভ্রাতৃবধূর এরূপ বেশভূষা তাঁহার চক্ষে নিতান্তই ধর্ম্ম ও আচারবিরুদ্ধ মনে হইল। দুই এক দিন ইতস্ততঃ করিয়া শেষ পত্নী জয়কালীকে উল্লেখ করিয়া ভ্রাতৃবধূর সমক্ষে শিবচরণ বলিলেন, "আমাদের দেশে বিধবাদের যে ভাবে থাকার নিয়ম আছে, সেইরূপ থাকাই উচিত।" শুনিয়া লজ্জায় সুষমা যেন মরিয়া গেল!

সেই দিবস হইতেই হাত শুধু করিয়া সে থান ব্যবহার আরম্ভ করিল। পর দিন আহার করিতে করিতে জয়কালী সুষমাকে বলিল, "তোমার ভাশুর বল্‌ছিলো দুধ ঘি কি আর কিছু ভাল সামগ্রী খেলে বিধবার ধর্ম্ম থাকে না।" তার পর হইতে সুষমার আহারাদির সম্বন্ধেও বিশেষ বন্দোবস্ত হইল। মধ্যাহ্নে গব্যরস-বিহীন হবিষ্যান্ন আর রাত্রে কিঞ্চিৎ জলপান। সরোজ পিত্রালয় যাইবার ২।১ দিন পূর্ব্ব হইতেই এই প্রকার ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাই সে মহা দুঃখিত হইয়া একবার ভূপেন্দ্রকে জানায়। ভূপেন্দ্র, জয়কালীকে, অন্যান্য কথা লিখিয়া,—প্রসঙ্গক্রমে লিখিয়াছিলেন যে "মেজো বউ ঠাকরুণ ত নিতান্ত ছেলে মানুষ, তাঁর এসব বিড়ম্বনা কেন? এত কড়াকড়ি কল্লে শেষ যে মারা যাবেন।" কিন্তু হিতে বিপরীত হইল, পত্রমর্ম্ম অবগত হইয়া "নিরক্ষর" জয়কালী তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। "ওমা এমন ঘর ভাঙ্গা বেহায়া মেয়ে বাপের কালেও ত দেখিনি গো" বলিতে বলিতে গিন্নি একেবারে ক্ষিপ্রপদে কর্ত্তার নিকট উপস্থিত হইলেন। শিবচরণ অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত গৃহিণীর কথাগুলি শুনিলেন। হিন্দুবধূ, বিশেষতঃ বিধবা, যে, এরূপ লজ্জাহীনা হইয়া নিজের আহারের বিষয়ে পরপুরুষকে লিখিতে পারে, ইহা শিবচরণের বুদ্ধির অগোচর ছিল। তিনি এই ঘটনার ভিতর দিয়া অনেক দূর দেখিলেন। শেষ গৃহিণীকে বলিয়া দিলেন," বৌমার উপর একটু চোখ রেখো।" কথাটা যদি উঠিল তবে সুষমার কাণে না উঠিবে কেন? সুষমা ইহার কিছুই জানে না, সেও একেবারে আকাশ হইতে পড়িল, কিন্তু কি আর সে করিবে! শুধু নির্জ্জনে নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

যে কারণেই হোক্, ভূপেন্দ্র বাটীতে থাকিতে জয়কালীর গৃহীণীপনাটা যেন কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ ছিল। জয়কালীর তিন চারিটী সন্তান, বিশেষতঃ কোলের ছেলেটীকে লইয়া তিনি সদাই ব্যস্ত। তাই সাংসারিক সমস্ত পরিশ্রমের কাজ সুষমার ঘাড়ে চাপিল। জয়কালী ভাল রাঁধিতে পারেন না, বিশেষ আগুণের তাপে গেলেই তাঁর হিষ্টিরিয়া বৃদ্ধি পায়। কাজেই দুই বেলাই সুষমাকে রাঁধিতে হইত; আঁশ হেঁসেলের রান্না শেষ করিয়া ছেলেদের খাওয়াইয়া কাপড় কাচিয়া তবে আবার সে নিজের হবিষ্যান্ন রাঁধিত। কিন্তু জয়কালী একেবারে বিবেচনাশূন্যা নহেন, তিনি একাদশীর দিন রাত্রে সুষমাকে হেঁসেলে যাইতে দিতেন

না। কষ্ট স্বীকার করিয়াও সে বেলা কোনরূপে চালাইয়া লইতেন। আর সুষমাকে উল্লেখ করিয়া বলিতেন, "আহা ছেলে মানুষ, এত কি পারে?"

জয়কালী সুষমাকে পাড়াপ্রতিবেশী কোন স্ত্রীলোকের সহিত মিশিতে দিতে ভাল বাসিতেন না; এমন কি, কেহ যদি দুদণ্ড সুষমার নিকট বসিয়া গল্প করিত; তাতেও বিরক্ত হইতেন। মুখে বলিতেন "চেটো বিধবার কি যারতার সঙ্গে মিশিতে আছে?" লোকে কিন্তু জয়কালীর মহৎ উদ্দেশ্য বুঝিত; তারা বলিত, পাছে সুষমা জয়কালীর কোন নিন্দা করে, এই তাঁর মহা ভয়।

আহারান্তে মধ্যাহ্নে প্রত্যহই সুষমা আপনার ঘরটীতে গিয়া বসিত। সে ঘরে বসিতে বুঝি তার বড় ভাল লাগিত। সেই ঘরে বসিয়া সে পড়া শুনা করিত, কোন দিন বা মাকে, কোন দিন সরোজকে, কখন বা দেবরকে পত্র লিখিত। সে সময়, সে বড় বেশী নয়, সে সংসারের কোন্ কাজ কর্ম্ম করিত না, বুঝি পারিত না। জয়কালী ইহাতে একটু খিট্‌খিট্ করিতেন। এসময়টা যদি সুষমা কোলের ছেলেটিকে দুদণ্ড ধরে, তবে জয়কালী তাহার "মনের কথা"র সহিত দুটো সুখ দুঃখের গল্প একটু আরামের সহিত করিতে পারেন, ছেলেগুলার জন্য দুপুরবেলা একটু বেড়াতে গিয়েও তাঁর শোয়াস্তি নাই।

জয়কালী একদিন দুপুরবেলা নূতন আমদানি অনন্ত ও চুড়ী পরিয়া প্রতিবেশিনী মহলে বেড়াইতে গিয়াছেন। সে দিন দু'পাঁচ মিনিটের জন্য সকল প্রতিবেশীরই বাড়ী গিয়া খোঁজ লইতেছিলেন। কাহাকে দিদি, কাহাকে মাসি, কাহাকেও গোলাপ সম্বোধন করিয়া বলিতেছিলেন, "যে সংসার, তা, ফেলে কি আর দুদণ্ড বেরোবার যো আছে? আজ একটু সময় পেলাম তাই বলি কে কেমন আছে একবার দেখে আসি, তোমরা ত মনে করে' ওদিকে যাও না, আমার মন যেই কাঁদে তাই" ইত্যাদি।

এই রূপে আপ্যায়িত করিয়া গৃহে ফিরিতে জয়কালীর একটু বিলম্ব হইয়া গেল। বাড়ী আসিয়া দেখেন, সর্ব্বনাশ, ঘরে কুকুর ঢুকিয়া দুধটুকু একেবারে নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছে। বেড়াইতে যাইবার সময় তাড়াতাড়িতে জয়কালী কপাটের শিকল তুলিয়া দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু এটা যে তাঁহার দোষ তাহা মনে হইল না, ঝোঁকটা সুষমার উপর। তখন স্বরলহরী সপ্তমে তুলিয়া জয়কালী ঠাকুরাণী বলিতে লাগিলেন, "বলি মেজো বউ, বাড়ীতে যে আছ, তাকি ছাই কিছুই দেখ্‌তে নেই! কি বাবুই হয়েছ মাইরি"! এই মিষ্ট সম্বোধন সুষমার কানে গেল, সে কোথায় পত্র লিখিতেছিল, তাড়াতাড়ি সেই অর্দ্ধ-সমাপ্ত পত্র হাতে লইয়াই বাহিরে আসিয়া বলিল, "কি হয়েছে দিদি"? জয়কালী বিকট মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, "হবে আর কি! আমার মাথা আর মুণ্ডু হয়েছে! দুধটুকু সব কুকুরে খাইয়ে বসে' আছ, এখন ছেলেদেরই বা কি খাওয়াই আর ওঁকেই বা কি পাঁশ দি!" রসজ্ঞ পাঠককে বলিতে হইবে না 'ও' সর্ব্বনামের কর্ত্তা এবং জয়কালীর কর্ত্তা একই। সুষমা এদুধ নষ্ট হওয়ার কিছুই জানে না, সে আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কই দিদি, আমার ঘরে ত দুধ ছিলনা!" এই উত্তরে দলিতা ফণিনীর মত জয়কালী গর্জ্জিয়া উঠিল, "কি ভাঁড়াতেই শিখেছ আর কি! তোমার ঘরে রাখিনি বলেই কুকুর দিয়ে দুধ খাওয়াতে হবে, বুঝি? ঢের ঢের মেয়ে দেখেছি, যাহোক তোমার মত এমন দজ্জাল মেয়ে কিন্তু কখনও দেখিনি; কথার ছিরিখানা দেখ একবার, তবু যদি কপাল না পুড়ত!" বলিতে বলিতে সুষমার হস্তস্থিত পত্রের দিকে জয়কালীর নজর পড়িল। আর যাবে কোথা! "কি লেখা পড়াই শিখেছিলে, রোজ রোজ অত চিঠি লেখ কা'কে? দেখ্‌চি কোন দিন বা তুমি কি করে বস! বাবু যে বলেন—(জয়কালী কিছু দিন কলিকাতায় থাকিয়া কিছু কিছু সহুরে ধরণ-ধারণ শিখিয়াছিল। তবে সব সময় এটা ঠিক রাখিতে পারিত না।) লেখা পড়া শিখ্‌লেই মেয়েরা নষ্ট হইয়া যায় সে মিছে নয়!" আমাদের বোধ হয় এই ভয়েই জয়কালী লেখা পড়া শিখেন নাই। জয়কালীর এইরূপ বাক্যে, বাণবিদ্ধা হরিণীর মত সুষমা জর্জ্জরিত হইল, কিছু উত্তর না করিয়া সে আপনার বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। হায়, রোদন ভিন্ন এ অনাথার আর কি উপায় আছে?

এ ঘটনা কিন্তু এখানেই শেষ হইল না। নব-অলঙ্কার-বিভূষিতা অলঙ্কারপ্রিয়া জয়কালী নানা অলঙ্কারের সহিত ব্যাপারটী স্বামীসমীপে পেশ করিলেন। শিবচরণ স্ত্রীর সকল কথায় বিশ্বাস করেন কি না জানি না, কিন্তু এসকল বিষয়ে তিনি স্ত্রীকে কখনও অবিশ্বাস করেন না। বিশেষ আহারের সময় সম্মুখে দুধের বাটা না দেখিয়া কথাগুলির

সত্যতার উপর আর তাঁহার কোনই সন্দেহ রহিল না। শিবচরণ দেখিতে দেখিতে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তখন সম্বন্ধ ভুলিয়া (রাগিলে শিবচরণের জ্ঞান থাকে না) ভ্রাতৃবধূকে যা'তা' বলিয়া ভর্ৎসনা করিলেন—চিঠি লেখাও পড়াশুনার কথা তুলিয়া বেশ দু কথা শুনাইতেও কসুর করিলেন না। তাহার পর হইতে এরূপ ভর্ৎসনা সুষমার কপালে প্রায়ই ঘটিত।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

সুষমা এখন আর ভ্রমেও পড়াশুনার কি পত্র লেখার দিকে যায় না। কিন্তু একটী অভ্যাস সে ত্যাগ করিতে পারে নাই। গভীর নিশীথে সকলে যখন গৃহে গৃহে ঘুমাইয়া পড়িত, তখন সুষমা, আপনার ঘরে বসিয়া, যেন কত ভয়ে ভয়ে কতকগুলি চিঠি পড়িত। চিঠিগুলি সংখ্যায় বড় বেশী নয়, এক টুকুরা জীর্ণ ফিতায় বাঁধা; বার বার ব্যবহারে হাতে হাতে চিঠিগুলি কিঞ্চিৎ বিবর্ণ, অতি যত্নে রক্ষিত তাই বুঝি এত মলিন! সুষমার স্বামী প্রবাসে বসিয়া এই পত্র কয়খানি লিখিয়াছিলেন। সধবা অবস্থায় যেদিনগুলি সুষমার বড় দুঃখে কাটিয়াছিল, এচিঠিগুলি সেই ক'দিনের, সুখের দিনের কোন স্মৃতি নাই, কিন্তু সেই দুঃখের দিনে, একটু সুখের স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছে। গভীর নিশীথে গৃহের এক কোণে, একটী ভাঙ্গা পিলসুজের পাশে বসিয়া, ক্ষীণালোকে সুষমা সেই তাড়াবাঁধা চিঠিগুলি পড়িত। যেগুলিতে প্রিয় সম্বোধন একটু অধিক, যেখানিতে আদরের কথা দুটা বেশী, যাহাতে একটা বিশেষ সুখের স্মৃতি, সুষমা সেই সব চিঠি বারবার পড়িত! সধবা অবস্থায় এ পত্রগুলি পড়িতে পড়িতে কতবার ধরা পড়িবার ভয়ে সে কখনও বুকের কাপড়ে কখনও খোঁপায়, কখনও বালিসের তলায় লুকাইত! আজও সে পত্রে, তার নিজের মাথার তেলের ও গায়ের একটা সৌরভ মাখা আছে! পত্র পড়িতে পড়িতে সুষমার সব মনে পড়িত, তারপর ক'ফোঁটা চোখের জল ফেলিয়া পত্রগুলি অতিযত্নে ভাঁজ করিয়া তুলিয়া রাখিত, শেষে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শুইতে যাইত। শুইয়া শুইয়া কাঁদিত। কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িত। *

* কলিকালের কয়েকটী পরিচ্ছেদ বহুদিন পূর্ব্বে সাধনা পত্রিকায় একবার "সুষমা" নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখক।

রেখা শব্দাভিজ্ঞান বিদ্যা

বা

সঙ্কেত লিখন।*

বাঙ্গালা ভাষা এখন যে প্রকার কার্য্যকারিণী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে বর্ত্তমান সময়ে এই ভাষায় রেখা শব্দাভিজ্ঞান বিদ্যার বা সঙ্কেত লিখনের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই বিদ্যা দ্বারা সভ্য সমাজে যে কত প্রভূত উপকার সাধিত হইয়া থাকে, তাহা লেখা বাহুল্য মাত্র। রাজনীতি বল, সমাজনীতি বল, বিজ্ঞান, সাহিত্য বা বিচার বিভাগ বল, সকল বিষয়েই ইহার অবর্ণনীয় উপকারিতা পরিলক্ষিত হইয়াছে। সেই জন্যই আজ ইটালি, স্পেন, জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, তুর্কী, গ্রীস্, রুসিয়া, অষ্ট্রীয়া, ও আমেরিকার প্রায় প্রত্যেক গৃহে ইহার আলোচনা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত সিংহল, চায়না, জাপান, কেপ্-কলোনী, নেটাল, সাউথ আফ্রিকেন রিপাবলিক, মাদাগাস্কার, কেনেডা, ব্রেজিল, মেক্‌সিকো, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ, দি বারমুডাজ, ব্রিটিশ গায়েনা, ভিক্টোরিয়া, কুইন্‌সলেণ্ড, ওয়েষ্টরন অষ্ট্রেলিয়া, নিউ সাউথ ওয়েল্‌স, টাস্‌মেনিয়া, নিউজীলণ্ড প্রভৃতি দেশেও ইহার আলোচনা ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইতেছে।

সভ্য সমাজে ফোনোগ্রাফী বা সঙ্কেত লিখনের এত বিস্তৃত আলোচনা হইলেও ভারতের দুরদৃষ্ট বশতঃ এ দেশের অতি অল্পসংখ্যক লোকেও ইহার নাম শুনিয়াছেন কিনা সন্দেহ। এই হিতকর ও প্রয়োজনীয় বিদ্যাটি আর কিছুই নহে, সংক্ষেপে লিখন-প্রণালী। শব্দ শুনিয়া অক্ষরের সাহায্য ব্যতিরেকে কেবল কতকগুলি বিশেষ আকার বিশিষ্ট রেখা দ্বারা তত্তৎ শব্দ লিখন-প্রণালীর নাম রেখা-

* এই প্রবন্ধের লেখক বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয়ের পরিচয় বোধ হয়, আমাদের সকল পাঠক অবগত নহেন। ইনি রেখাশব্দাভিজ্ঞান বিদ্যায় একজন বিশেষ পারদর্শী ব্যক্তি। বাঙ্গলা ভাষার সঙ্কেত লিখন প্রণালী ইঁহারই উদ্ভাবিত। থ্যাকার স্পিঙ্ক কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রকাশিত ইঁহার "রেখাশব্দাভিজ্ঞান" নামক পুস্তক শিক্ষিত সমাজে সাদরে গৃহীত হইতেছে। ইংলণ্ড আমেরিকা ও জর্ম্মনী দেশের রেখাশব্দাভিজ্ঞান-সমাজেও এই পুস্তকের বিলক্ষণ প্রশংসা হইয়াছে। তত্তৎ সমাজ হইতে দ্বিজেন্দ্র বাবু প্রভূত উৎসাহ ও নানাক্ষর-বিশিষ্ট উপাধিমালা প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমেরিকার "দি ষ্টেনোগ্রাফার" নামক মাসিকপত্রের সম্পাদক ইঁহাকে তৎপত্রে লিখিবার জন্য সম্প্রতি নিমন্ত্রণ পাঠাইয়াছেন। সম্পাদক।

শব্দাভিজ্ঞান বিদ্যা বা ফোনোগ্রাফী। প্রতি মিনিটে যতগুলি শব্দ যত দ্রুত পাঠ বা উচ্চারণ করিতে পারা যায়, এই লিখন-প্রণালী রীতিমত অভ্যস্থ হইলে প্রতি মিনিটে, ঠিক ততগুলি শব্দ লিখিতে পারা যায়। প্রথম শ্রেণীর দ্রুত লেখকগণ প্রতি মিনিটে ১৮০ হইতে ২২০টি শব্দ পর্য্যন্ত লিখিয়া থাকেন। কেহ কেহ আরও শীঘ্র লিখিতে সক্ষম, কিন্তু তাঁহারা ঐরূপ শীঘ্র লেখা একাদিক্রমে পাঁচ মিনিট লিখিতে পারেন না। আজকাল আমেরিকা সকল বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে,—রেখা শব্দাভিজ্ঞান বিদ্যাতেও যে অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যাইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? তথায় অনেকেই প্রতি মিনিটে ৩০০ শব্দের অধিক লিখিতে সক্ষম। সম্প্রতি নিউইয়র্কষ্টেটষ্টেনগ্রাফর্‌স্ এসোসিয়েষ্যনের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি এবং সুপ্রীম্ কোর্টের দ্রুত লেখক ল সাহেব ১ মিনিটে ৪৭৮টি শব্দ লিখিয়া রেখাশাব্দিক জগতকে বিস্মিত করিয়াছেন। জগতের খ্যাতনামা বক্তাগণ প্রতি মিনিটে ২২০ শব্দের অধিক বলিতে পারেন না। যাঁহারা উক্ত সংখ্যা অতিক্রম করেন, তাঁহারা অতি বিরল—কারণ বহুক্ষণ ধরিয়া সমভাবে বক্তৃতা দেওয়া সম্ভবপর নহে।

আজ যদি এই বিদ্যা উদ্ভাবিত না হইত, তাহা হইলে সভ্য সমাজকে যে কি বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত তাহা সহজেই অনুমেয়। যে সকল মহাপুরুষ সমাজের হিতকর বিষয়ে আলোচনা করিয়া আমাদের বরণীয় হইয়াছেন, এবং যাঁহাদের উপদেশমালা পাঠ করিয়া আমরা ক্রমশঃ উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতেছি, তাঁহারা কি এত ভুবনব্যাপী যশোলাভ করিতে পারিতেন, যদি এই মঙ্গলকর বিদ্যার আবিষ্কার না হইত? স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া ঐ সকল বক্তৃতা ধ্বংসের সাগরে ভাসিয়া যাইত। জগতে আশানুরূপ উন্নতির কোনই সম্ভাবনা থাকিত না।

আমাদের দেশে আজকাল সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি সম্বন্ধীয় বক্তৃতা দিবার প্রথা প্রসারিত হইতেছে, কিন্তু আজিও এই সকল বক্তৃতা রক্ষার কোন উপায় উদ্ভাবিত হয় নাই। দেশীয় লেখক ও বক্তাগণ আর সকল বিষয় চর্চ্চা করিতেছেন, কিন্তু এবিষয়ে দেশে যে একটা অভাব আছে তাহা অনুধাবনও করিতে পারিতেছেন না। উন্নতিশীল দেশসমূহে এই বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা এত অধিক বলিয়া বোধ হয় যে, যদি চেষ্টা করিয়া কয়েক দিনের জন্য তথায় ইহার ব্যবহার বন্ধ করা যায়, তাহা হইলে সেখানে সমস্ত বিভাগের, সমস্ত সমাজের কার্য্য বন্ধ হইয়া যাইবে; সেই কয়েক দিনের ইতিহাস ঘটনা শূন্য হইয়া থাকিবে। যে উদ্যম, অধ্যবসায়, চিন্তাবলে আমেরিকা ও য়ুরোপীয়গণ আজ জগতের পরিচালক হইয়াছেন, তাহা মনের জড়তা ও সঙ্কীর্ণতায় পর্য্যবসিত হইবে। সভ্যদেশে এই বিদ্যার এত আদর ও সম্মান যে, তৎপাঠে পাঠকগণ বিস্মিত হইবেন।

এই বিদ্যার আবির্ভাবে সমাজের ভিতরে একটি শক্তির সঞ্চার হইয়াছে। অনেকের ইহাই একমাত্র কার্য্যক্ষেত্র হইয়া পড়িয়াছে। ফাউলার নামক জনৈক প্রসিদ্ধ চিন্তাশীল লেখক বলেন, এইরূপ বৈজ্ঞানিক লিখন-প্রণালী সকলেরই শেখা উচিত। ইহা প্রকৃতির অনুমোদিত। প্রচলিত প্রণালী জয়কা[illegible]ন দিয়া নূতন লিখন প্রণালীর আলোচনা করিলে প্রথম প্রথম কিছু অসুবিধা হইতে পারে বটে, কিন্তু পরিণামে যে কি প্রভূত উপকার দর্শিবে তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। যিনি নিজের হিত চাহেন, সময়ের মূল্য জানিতে চাহেন, অতি কষ্টে ও বহু শ্রমে অন্যে যে সকল গভীর চিন্তায় উপনীত হন, সেই সকল মহতীচিন্তায় সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকিতে বাসনা করেন, তবে তিনি যেন রেখাশব্দাভিজ্ঞান শেখেন। ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রিদ্বয় (লর্ড রোজবেরী ও গ্লাডষ্টোন) এই মতের পরিপোষকতা করিয়াছেন।

এ পর্য্যন্ত আমরা কত মহদ্বিষয়ক বক্তৃতা শুনিয়াছি, কিন্তু তদ্দ্বারা আমরা কি বিশেষ উপকৃত হইয়াছি? শ্রবণকালীন কর্ণসুখ হইয়াছিল মাত্র। এ হতভাগ্য দেশে বক্তৃতাগৃহে কত যে অমূল্য কথার চিরসমাধি হইয়াছে, তাহার কে অনুসন্ধান রাখে! আমরা কতদিন আর এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকিব? যাহা সমাজের অশেষবিধ হিতকর, তাহার আলোচনা করা আমাদের কর্ত্তব্য নয় কি?

অধিক লিখিয়া প্রবন্ধ দীর্ঘ করা আমার অভিপ্রেত নহে। রেখাশব্দাভিজ্ঞান বিদ্যা কি এবং তদ্দ্বারা সভ্যসমাজে কি উপকার সাধিত হইতেছে, সংক্ষেপে তাহাই বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছি মাত্র। আশা করি বাঙ্গলা ভাষার হিতৈষিগণ এ বিষয় আলোচনা করিয়া দেশের এক মহৎ অভাব মোচন করিবেন। নিম্নে এই বিদ্যার বর্ণমালা প্রদত্ত হইল।

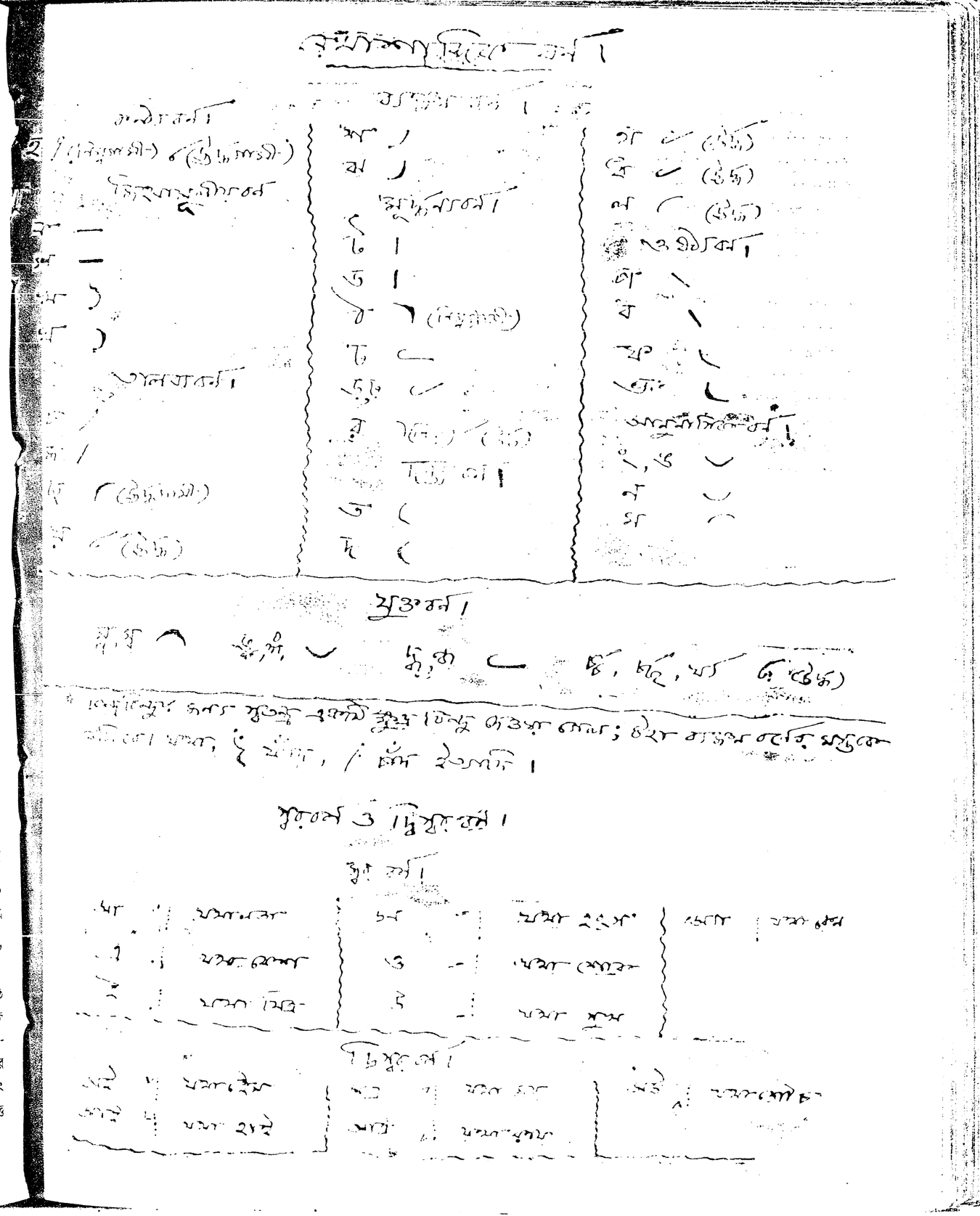

পাঠকগণ দেখিবেন রেখা দ্বিবিধ—সূক্ষ্ম ও স্থূল। ব্যঞ্জন বর্ণের উচ্চারণ ধরিয়া রেখাসমূহকে ঐ দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যে সকল বর্ণের উচ্চারণ হ্রস্ব, সে গুলির সূক্ষ্ম এবং যে গুলির উচ্চারণ দীর্ঘ, সে গুলির স্থূল রেখা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। লেখার সুবিধার্থ হ ও র'র দুইটি করিয়া চিহ্ন বিন্যস্ত হইয়াছে। কতকগুলি ব্যঞ্জন বর্ণের পার্শ্বে "নিম্ন" ও "উর্দ্ধ" লিখিত হইয়াছে—উহা কেবল রেখার গতি নির্ণায়ক। চলিত প্রথানুসারে ব্যঞ্জনবর্ণের বিন্যাস হয় নাই দেখিয়া পাঠকগণের মনে নানা প্রশ্নের উদয় হইতে পারে—উহার উত্তর সংক্ষেপে এই যে, প্রচলিত বর্ণবিন্যাস রেখাশব্দাভিজ্ঞান বিদ্যার অনুমোদিত নহে। ক'র পর গ, খ'র পর ঘ'র উচ্চারণই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়; এবং এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াই চ'র পর জ, ট'র পর ড ইত্যাদি বিনিবেশিত হইয়াছে। বাঙ্গলা ভাষায় হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণে বিশেষ প্রভেদ না থাকায় ই, ঈ, উ, ঊ'র কেবলমাত্র দুইটি চিহ্ন সন্নিবেশিত হইয়াছে। ক্ষুদ্র বিন্দু ও কসি রেখার যখন যে স্থলে বসিবে তখন সেইরূপ উচ্চারিত হইবে—অর্থাৎ আদিতে বসিলে আ, মধ্যে বসিলে এ, অন্তে বসিলে ই ইত্যাদি। অ্যা-বিন্দু আ-বিন্দু অপেক্ষা ক্ষুদ্র। একাধিক রেখা একত্র বিন্যস্ত করিতে হইলে তাহা একটানে অর্থাৎ লেখনী উত্তোলন না করিয়াই লিখিতে হইবে। স্বর-বিন্দু বা কসির পার্শ্বে যে বিন্দু-দাঁড়ি দেওয়া গিয়াছে উহা কেবল বিন্দু বা কসির উচ্চ, মধ্য বা নিম্ন স্থান নির্দ্দেশক।

এই বিদ্যা তিনটি প্রণালীতে বিভক্ত হইয়াছে—শিক্ষার্থী-প্রণালী, পত্র-প্রণালী ও বক্তৃতা-প্রণালী। পাঠকগণ আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন ইহা কত সরল। কলিকাতায় অনেক শিক্ষিত মহিলা এ বিদ্যাটি শিখিয়াছেন এবং শিখিবার সময় চলিত লেখার পরিবর্ত্তে প্রায় এই লেখাই লিখিয়া থাকেন। নিম্নে শিক্ষার্থী ও বক্তৃতা-প্রণালীর উদাহরণ প্রদত্ত হইল। পত্র-প্রণালীর উদাহরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। উহা শিক্ষার্থী-প্রণালী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত।

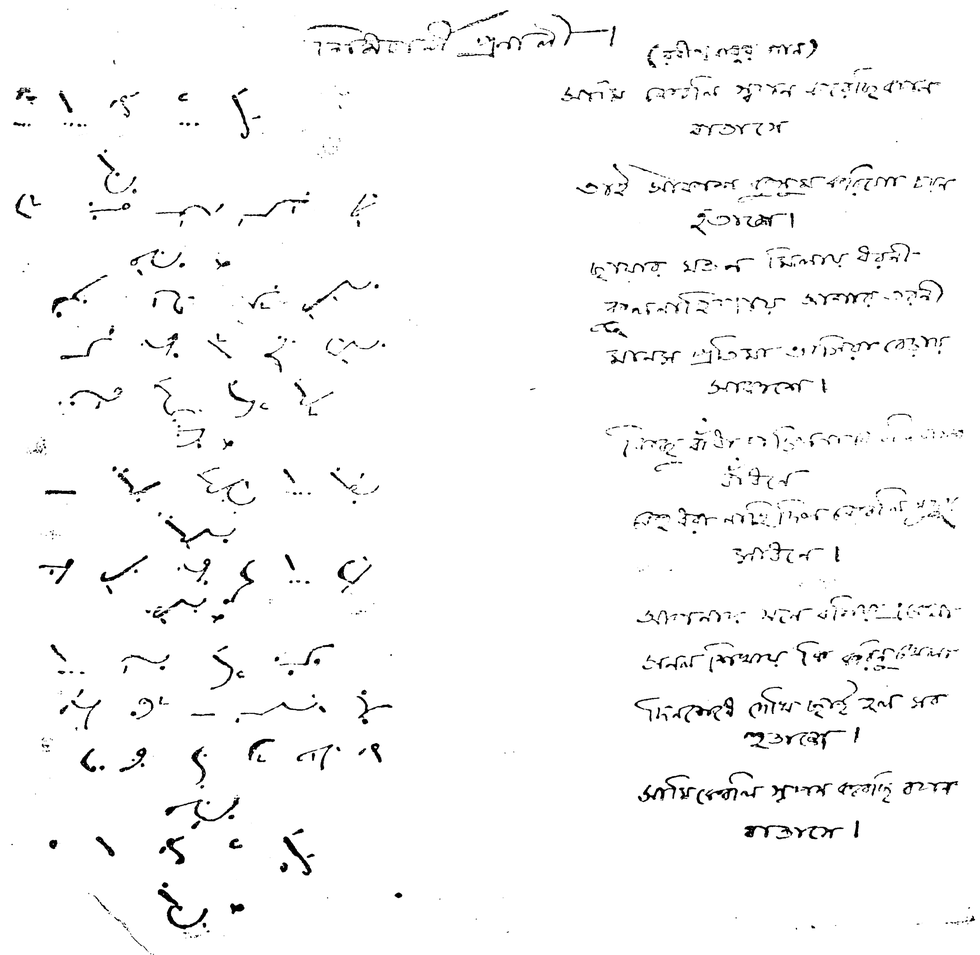

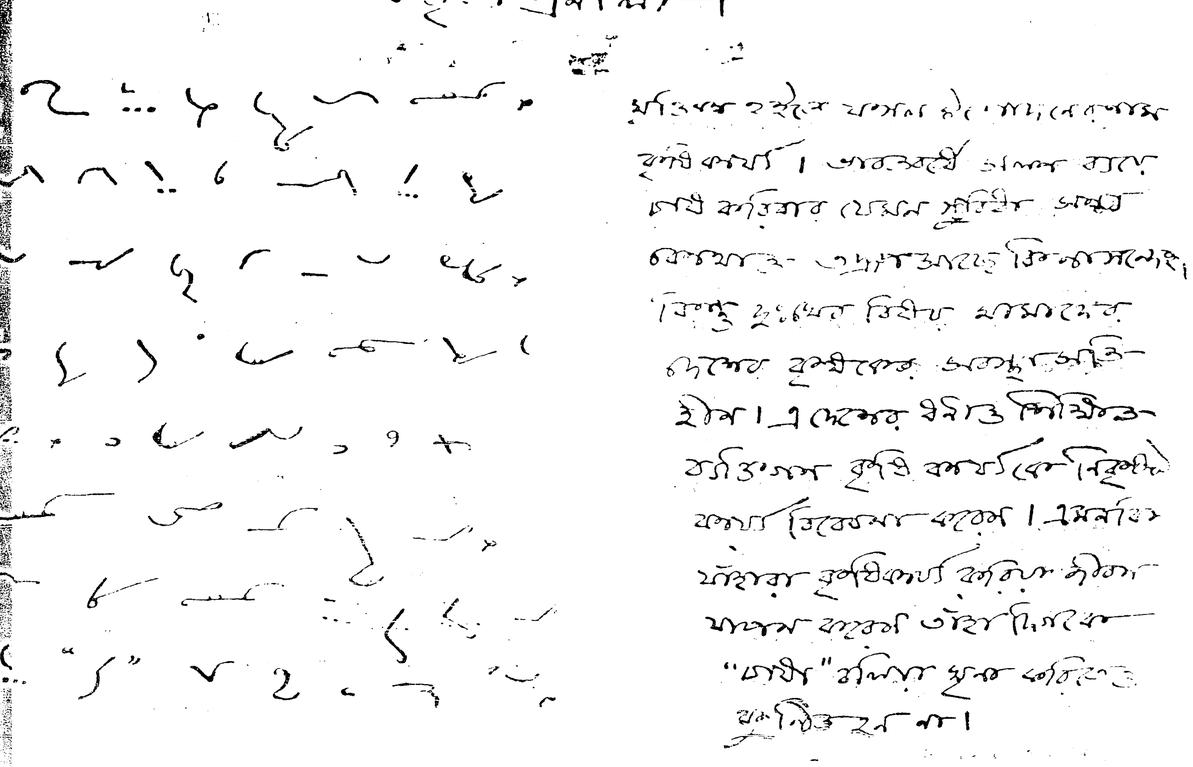

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ।

অযোধ্যাপুরী।

অযোধ্যার বর্ণনাকালে মহর্ষি বাল্মীকি বলিয়াছেন যে, তাহা দৈর্ঘ্যে দ্বাদশ যোজন ও বিস্তারে তিন যোজন ছিল। যথা :—

"আয়তা দশ চ দ্বে চ যোজনানি মহাপুরী।
শ্রীমতী ত্রীণি বিস্তীর্ণা সুবিভক্তমহাপথা।"
বালকাণ্ডম্ ৫মঃ সর্গঃ।

রাজধানী বা "রাজার মূল ধাম" আয়তনে যে এরূপ বিস্তৃত ছিল, তাহা বোধ হয় না। সম্ভবতঃ রাজধানী ও তাহার উপকণ্ঠবর্ত্তী ক্ষুদ্র নগর, গ্রাম ও লোকালয় সমূহও অযোধ্যা নামে অভিহিত হইত। বাল্মীকি পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে তাহারই দৈর্ঘ্য ও বিস্তারের কথা লিখিয়া থাকিবেন। যাহা প্রকৃত রাজধানী, তাহা দৈর্ঘ্য ও বিস্তারে দ্বিযোজন পরিমিত অংশ মাত্র ছিল। যথা :—

"সা যোজনে দ্বে চ ভূয়ঃ সত্যনামা প্রকাশতে।"
ঐ ৬ষ্ঠঃ সর্গঃ।

অর্থাৎ দ্বাদশ যোজন দীর্ঘা ও তিন যোজন বিস্তৃতা মহাপুরীর মধ্যে দ্বিযোজন পরিমিত অংশই পরিখাদি দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া "অযোধ্যা" (অর্থাৎ শত্রুর পক্ষে দুর্জ্জেয়া বা যুদ্ধের অশক্যা) নামের সার্থকতা সম্পাদন করিত। *

এই রাজধানী অযোধ্যাপুরী প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত ছিল। প্রাকারের উপরিভাগে নানা প্রকার যন্ত্র, আয়ুধ ও শত শত শতঘ্নী রক্ষিত থাকিত। প্রাকারের নিম্নদেশেই গভীর পরিখা। সেই পরিখা জলে পরিপূর্ণ রহিত। পুরীর উত্তরভাগে সরযূনদী প্রবাহিত ছিল। সুতরাং সেদিকে

* ভূয়ঃ অত্যধিকং সত্যনামা যোদ্ধৃ মশকোত্যন্বর্থনামা রাজ্ঞো মূলধাম এতাবৎ। ইতি টীকা।

আর পরিখার কোনও প্রয়োজন ছিল না। খরবাহিনী সরযূই সেইদিকে স্বাভাবিকী পরিখার কার্য্য করিত। কিন্তু নদীতটেও সম্ভবতঃ নগরীর প্রাকার ছিল। নগরীর অপর তিন দিকে যে পরিখা ছিল, তাহা নিশ্চিত সরযূ-সলিলে পরিপূরিত হইত। নগরীর বর্ণনাকালে মহর্ষি বাল্মীকি ইহাকে "দুর্গ গম্ভীর পরিখা" এই বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। টীকাকার রামানুজ ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, "জলদুর্গেণ গম্ভীরা অগাধা পরীখা যস্যাম্।" এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, জলদুর্গ দ্বারাই নগরীর পরিখা সকল অগাধজলে পরিপূর্ণ থাকিত। সুতরাং পরিখা সমূহকে জলে পরিপূর্ণ করিবার জন্য জলদুর্গ যে কোনও প্রকার কৌশল (Sluice) ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

নগরীর চারিদিকেই চারিটি দ্বার থাকা সম্ভবপর। দ্বার সমূহের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম থাকাও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু আমরা একটি দ্বার ব্যতীত অপর কোনটির নাম অবগত নহি। নগরীর পশ্চিমদিকে যে দ্বার ছিল, তাহার নাম "বৈজয়ন্ত দ্বার।" কুমার ভরত, শত্রুঘ্নের সহিত মাতুলালয় গিরিব্রজ নগর হইতে অযোধ্যায় আসিবার কালে এই দ্বার দিয়াই পুরীমধ্যে প্রবেশ করেন। যথা :—

"দ্বারেণ বৈজয়ন্তেন প্রাবিশচ্ছ্রান্তবাহনঃ।"

নগরীর পূর্ব্বদিকে যে দ্বার ছিল, সেই দ্বার দিয়া বহির্গমন পূর্ব্বক রাম ও লক্ষ্মণ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত সিদ্ধাশ্রম ও মিথিলানগরী অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু দক্ষিণ দ্বারের সহিত অযোধ্যাবাসিগণের এবং রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার বিষাদময়ী স্মৃতি বহুদিন বিজড়িত ছিল। কারণ, এই দ্বার দিয়াই রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা বনবাসের নিমিত্ত দণ্ডকারণ্যাভিমুখে প্রস্থান করেন এবং পরে এই দ্বার দিয়াই লক্ষ্মণ রামের আদেশে মন্দভাগিনী সীতাকে লইয়া জাহ্নবীতটে বাল্মীকির আশ্রমসন্নিধানে বর্জ্জন করিয়া আইসেন। উত্তর দিকে যে দ্বার ছিল, তদ্দ্বারা নগরবাসীরা সরযূতীরে গমনাগমন করিতে সমর্থ হইত।

এইরূপে প্রাকার ও পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া অযোধ্যানগরী সত্য সত্যই "অযোধ্যা" নামের যোগ্যা হইয়াছিল। শত্রু, মিত্র সকলেরই পক্ষে ইহা একান্ত "দুর্গা" বা দুরাসদা প্রতীয়মান হইত। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, অযোধ্যার চতুর্দ্দিকবর্ত্তী সুদৃঢ় প্রাকারের কথা কাল্পনিক। অযোধ্যার চতুর্দ্দিকে কাষ্ঠবংশাদিনির্ম্মিত কোনও বেষ্টনী বা "বেড়া" ছিল, ইহাই তাঁহাদের মত। কিন্তু রামানুজের টীকায় প্রাকারের উপরিভাগে নানা প্রকার যন্ত্র, আয়ুধ ও শতঘ্নী রক্ষিত থাকিবার কথা লিখিত আছে। অধিকন্তু; অযোধ্যার যোদ্ধৃবর্গও এই প্রাকারের উপরিভাগ হইতেই অস্ত্র-শস্ত্র সঞ্চালন করিয়া শত্রুপক্ষকে বিপর্য্যস্ত করিত। * সুতরাং এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, প্রাকারটি দৃঢ় মৃৎ প্রস্তর বা ইষ্টক-নির্ম্মিত এবং বিলক্ষণ উচ্চ ও প্রশস্ত ছিল। প্রশস্ত না রহিলে তাহার উপরিভাগে কদাপি যন্ত্রায়ুধ ও শতঘ্নী রক্ষিত হইতে পারিত না এবং যোদ্ধৃবর্গও তৎসমুদায় ব্যবহৃত করিতে সমর্থ হইত না। †

প্রাকারের সমীপেই যে যোদ্ধৃবর্গের, অন্ততঃ বর্ত্তনভোগী সৈন্যদলের শিবির বা আবাসগৃহাদি সংস্থাপিত ছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। যেখানে যুদ্ধোপযোগী অস্ত্রশস্ত্র এবং যন্ত্রাদি রক্ষিত হয়, সেই স্থলে সৈন্য বা যোদ্ধারা প্রায়ই অবস্থিতি করিয়া থাকে। বিশেষতঃ শত্রুরা যে যে স্থান সর্ব্বপ্রথমে ও সহজে আক্রমণ করিতে পারে, সেই সেই স্থানেই সৈন্য সংস্থাপন করিয়া রাখা কর্ত্তব্য ও সুসঙ্গত। অতএব প্রাকারের সন্নিকটেই অযোধ্যার যোদ্ধৃবর্গের বাসস্থান নিরূপিত করা নিতান্ত অযথা হইতে পারে না। তৎপরে যে সময়ে যুদ্ধবিগ্রহ না থাকিত, সে সময়ে যুদ্ধকৌশল ও রণনৈপুণ্য শিক্ষা অব্যাহত বা অভ্যস্ত রাখিবার নিমিত্ত যোদ্ধাদিগকে সর্ব্বদাই অস্ত্রাদি পরিচালন করিতে হইত এবং সময়ে সময়ে কৃত্রিম যুদ্ধেও প্রবৃত্ত হইতে হইত। এই সমস্ত কার্য্যের জন্য নির্জ্জন স্থান ও প্রশস্ত ক্ষেত্র সকল একান্ত উপযুক্ত। সুতরাং প্রাকারের নিম্নভাগস্থিত সেনানিবাসের পরেই যে নির্জ্জন প্রশস্ত ক্ষেত্র ও আম্রকাননাদি ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অতঃপর লোকাকীর্ণ নগরীর মধ্যে প্রবেশ করা যাউক। নগরী মহাপথ দ্বারা সুবিভক্ত ছিল। মহাপথের অর্থ বহির্ম্মার্গ;—যে পথ অবলম্বন পূর্ব্বক নগরীর বহির্ভাগে গমন করা যায়, তাহাই মহাপথ। এই মহাপথ গুলি নগরীর চারি দিকের চারিটি তোরণের ভিতর দিয়া বহির্দ্দিকে গিয়াছিল। রাজপ্রাসাদ নগরীর মধ্যভাগে কোনও এক স্থলে অবস্থিত ছিল। রাজপ্রাসাদেরও চারিদিকের চারিটি দ্বার হইতে যে সকল পথ "সর্ব্বপণ্যশোভিত" হইয়া বিরাজমান ছিল, সে গুলি 'রাজমার্গ' নামে উক্ত হইয়াছে। * এই সকল সুপ্রশস্ত রাজমার্গদ্বারাও নগরী "সুবিভক্ত" হইয়াছিল।

এই মহাপথ ও রাজমার্গ সকল প্রতিদিন জলসিক্ত ও ও সুগন্ধি পুষ্পরাশি দ্বারা অবকীর্ণ হইত। † নগরীতে কোনও বিশেষ উৎসব উপস্থিত হইলে তৎসমুদায় চন্দনসলিলে সিক্ত এবং সর্ব্বত্র কমল ও উৎপলে পরিশোভিত হইত। পথের পার্শ্বে রাত্রিতে আলোক দানের কোনও ব্যবস্থা ছিল কি না তাহা অবগত হওয়া যায় না; কিন্তু উৎসব সময়ে যে ইহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হইত, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। রামের রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্ব রাত্রিতে সকল পথেরই উভয় পার্শ্বে বৃক্ষাকার আলোকস্তম্ভ সকল প্রোথিত এবং নগরী আলোকমালায় সুসজ্জিত হইয়াছিল। ‡ এবম্বিধ উৎসবকালে পথপার্শ্ব সকল পুষ্পমালা এবং ধ্বজপতাকাদিতেও সুশোভিত হইত, এবং মার্গসমূহকে "ধূপগন্ধাধিবাসিত" করিয়া রাখা হইত। রাজপথের উভয় পার্শ্বে সুবিন্যস্ত আপণশ্রেণী বিরাজিত ছিল। এতদ্ব্যতীত কোথাও উচ্চ অট্টালিকা, কোথাও "সুসমৃদ্ধ চারুদৃশ্য মানবালয়," কোথাও চৈত্যভূমি, কোথাও বাণিজ্যাগার এবং কোথাও "ভূধরশিখরসম দেবনিকেতন" সকল শোভা পাইত। কোথাও সূতমাগধেরা বাস করিত, কোথাও সর্ব্বপ্রকার শিল্পিসকল দৃষ্ট হইত এবং কোথাও বা বধূগণের নাট্যশালা সমূহ সুশোভিত রহিত। § কোন স্থান বাজী, বারণ, খর ও উষ্ট্রে পরিপূর্ণ থাকিত। কোন স্থানে সামন্তরাজগণ, কোথাও বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণ এবং কোথাও ঋষিমণ্ডল বাস করিতেন। কোথাও নারীগণের ক্রীড়াগার, কোথাও গুপ্তগৃহ এবং কোথাও সাপ্তভৌমিক ভবন বিদ্যমান ছিল। কো[illegible] ক্রি- বিদেশীয় বণিকগণ এবং কোথাও বা[illegible]দিগকে বাঁশ- কোথাও আম্রকানন, কো[illegible]ছিল। কিন্তু ইংরাজেরা অন্য গোচারণ ভূমি দৃ[illegible]হইত। [illegible]নবাবসৈন্যের মধ্যে এক বিষম গোল- মৃদঙ্গ, বীণা, পণব ও [illegible] এবং তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। বাল্মীকি বলিয়াছেন, [illegible]পনাদের সময় অপেক্ষা করিতেছিল, [illegible]ন্দ্রিয়, সাধু ও রাজ[illegible]ত্রভঙ্গ হইতে দেখিয়া তাহারা আর যুদ্ধের সত্যবাদী ছিল। [illegible]। সমরু নিজ সৈন্যদিগকে নিরর্থক নষ্ট না। নারীসকল [illegible] যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করা শ্রেয়ঃ বিবেচনা [illegible] অযোধ্যার নরও সমরু সময় অপেক্ষা করিতেছিল, কিন্তু [illegible] মহর্ষিগণের [illegible]রাজেরা আপনাদের বামপার্শ্বে আসদ উল্লার [illegible] দলিত হয়, সেই সময়ে যদি সে অগ্রসর হইত, [illegible] কুণ্ডল মূল সে দিবস ইংরাজদিগের জয়লাভের কোনই [illegible] সকলে[illegible] থাকিত না। কোন ইংরাজ ঐতিহাসিক লিখি- [illegible]য়, সমরু ইংরাজদিগের হত্যাকাণ্ডে যেরূপ সামর্থ্য [illegible] কুদ্রবা[illegible]ছিল, গিরিয়ার যুদ্ধে সেনাধ্যক্ষরূপে যদি [illegible]। † [illegible] দেখাইতে পারিত, তাহা হইলে গিরিয়া যাইতে- [illegible] ক্ষমতা কিছুকালের জন্য নির্ব্বাপি[illegible]

* অযোধ্যানগরীর বর্ণনাকালে মহর্ষি বাল্মীকি নগরীকে "সর্ব্বযন্ত্রায়ুধবতী" ও "শতঘ্নীশতসঙ্কুলা" এই দুই বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। টীকাকার রামানুজ টীকায় বলিয়াছেন, "সর্ব্বযন্ত্রায়ুধবতী প্রাকারোপরীতি শেষঃ"; পুনশ্চ "শতঘ্ন্যো নাম প্রাকার সংরক্ষণার্থ ময়োভারনির্ম্মিতাঃ প্রাকারোপরিস্থাপিতাঃ আয়ুধবিশেষাঃ।" ইতি।

† এই প্রাকার সম্বন্ধে হুইলার সাহেব একস্থলে বলিয়াছেন—"His (Dasaratha's) palace was magnificent and resplendent, but in describing the walls, the Brahmanical bard has indulged in a simile which furnishes a glimpse of the reality. They were so tall that the birds could not fly over them and so strong that no beast could force its way through them. From this it is evident that the walls could not have been made of brick or stone; for in that case, the attempt of a beast to force its way through them would never have entered the mind of the bard. In all probability, the palace was surrounded by a hedge, which was sufficiently strong to keep out wild beasts or stray cattle." *Wheeler's Ramayana.* হুইলার সাহেবের এই সিদ্ধান্ত বড় বিচিত্র। রাজপ্রাসাদের চতুর্দ্দিকে কোনও প্রাকার ছিল কি না, তাহার প্রমাণ আমরা পাই নাই। সম্ভবতঃ হুইলার সাহেব নগরীর (দ্বিযোজন দীর্ঘ ও প্রশস্ত 'রাজার মূল ধামে'র) চতুর্দ্দিকের প্রাকারকেই লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বোক্ত অদ্ভুত মত প্রকাশিত করিয়াছেন। কিন্তু প্রাকারের বর্ণনাকালে বাল্মীকি কোথায় যে উহাকে পক্ষীর দুর্লঙ্ঘ্য ও পশুর দুর্ভেদ্য বলিয়াছেন, তাহা আমরা অন্বেষণ করিয়া দেখিতে পাইলাম না। ইহা কি লেখকের কল্পনাপ্রসূত? পাঠকবর্গ দেখিতে পাইবেন, হুইলার সাহেব রাজপ্রাসাদ প্রভৃতিরও বর্ণনাকে অতিরঞ্জিত বলিয়াছেন। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ যে একটি অত্যুন্নত ও সুসভ্য দেশ ছিল, তাহা অনেকে সহজে বিশ্বাস করিতে চাহেন না।

লেখক।

* "রাজমার্গঃ সর্ব্বপণ্যশোভিতো রাজদ্বারাৎ পুরঃ প্রবৃত্তঃ" ইতি টীকা।

† "মুক্তপুষ্পাবকীর্ণেন জলসিক্তেন নিত্যমঃ"।
বালকাণ্ডম্, ৫মঃ সর্গঃ।

† Broome.

* "Certainly, had Sombre [illegible]

§ Malleson.

কণ্ঠভূষা কণ্ঠে পরে, করভূষা পরি করে,
বিহরিত অযোধ্যার জন।
আছিল প্রশস্তমনা, দানশীল সব জনা,
সাগ্নিক ধার্ম্মিক মহত্তর,
কদাচার পরায়ণ ; নাহি ছিল কোন জন
চোর কিম্বা বরণ-সঙ্কর।"
(৺ রাজকৃষ্ণ রায়ের অনুবাদ)

চারিবর্ণ তখন স্ব স্ব কর্ম্মেই নিযুক্ত থাকিত। এক বর্ণের কর্ম্মে অপর বর্ণীয় লোক কখনও হস্তক্ষেপ করিত না।

"ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চারি, আছিল অযোধ্যাপুরী,
সত্যধর্ম্ম করিয়া আশ্রয়।
* * * * * *
ব্রাহ্মণেরে ক্ষত্রগণ, ক্ষত্রগণে বৈশ্যজন,
শূদ্র তিন বর্ণে নিসেবিত।" (ঐ ঐ)

অযোধ্যার বীরগণও রাজার বিশ্বস্ত এবং অকুটিল ছিলেন। কেশরী যেরূপ গুহামধ্যে বাস করে, তাঁহারাও সেইরূপ অযোধ্যায় বাস করিতেন। কাম্বোজ, বাহ্লীক, সিন্ধু ও বনায়ুদেশ হইতে নানা প্রকার অশ্ব অযোধ্যায় আনীত হইত, এবং বিন্ধ্য ও হিমালয়-জাত, মহাপদ্ম, ঐরাবত প্রভৃতি ভদ্র মন্দ্র ও মৃগজাতীয় নানাবিধ হস্তী অযো-
লয় দৃষ্ট হইত।*

দ্বার দিয়াই পুরীমধ্যে ... বুদ্ধিশালিনী অযোধ্যানগরী মহারাজ দশরথ
"দ্বারেণ বৈজয়ন্তেন প্রা... ...ন্ত্রী ও অমাত্যগণের সাহায্যে
নগরীর পূর্ব্বদিকে যে দ্বার ছিল, সে... ...াদ, অন্তঃপুর ও প্রকৃষ্ট
পূর্ব্বক রাম ও লক্ষ্মণ মহর্ষি বিশ্বামিত্রে... ...ন্তরে প্রকটিত করিব।†
মিথিলানগরী অভিমুখে প্রস্থান ক... ...বিনাশচন্দ্র দাস।
দক্ষিণ দ্বারের সহিত অযোধ্যাবাসিগণের
ও সীতার বিষাদময়ী স্মৃতি বহুদিন বিজড়ি...
এই দ্বার দিয়াই রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা ব...
দণ্ডকারণ্যাভিমুখে প্রস্থান করেন এবং ...ম ইংরাজদিগের
দিয়াই লক্ষ্মণ রামের আদেশে মন্দভাগিনী ...করিয়া লইয়া-
জাহ্নবীতটে বাল্মীকির আশ্রমসন্নিধানে বর্জ্জন ...ভয়ের মধ্যে
সেন। উত্তর দিকে যে দ্বার ছিল, তদ্দ্বারা ...ধান কারণ
সরযূতীরে গমনাগমন করিতে সমর্থ হইত।

এইরূপে প্রাকার ও পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টি... তাহা মৃগ-
অযোধ্যানগরী সত্য সত্যই "অযোধ্যা" নামের ... প্রাকার-
হইয়াছিল। শত্রু, মিত্র সকলেরই পক্ষে ইহা ...ই প্রবন্ধে
"দুর্গা" বা দুরাসদা প্রতীয়মান হইত। কিন্তু কেহ ...র কথা
বলেন, অযোধ্যার চতুর্দ্দিকবর্ত্তী সুদৃঢ় প্রাকারের ... অংশ

যাহার দেহ

বাণিজ্যঘটিত শুল্ক ব্যাপার। কোম্পানী এদেশে বাণিজ্যের জন্য আসিয়াছিলেন, তাহার উন্নতির জন্য তাঁহাদের প্রাণপণ চেষ্টা ছিল, সেই চেষ্টা ন্যায্যই হউক, বা অন্যায্যই হউক, সে বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া তাঁহারা আবশ্যক মনে করিতেন না। এই সময়ে আবার কতকগুলি ইংরাজ আপনাদের গুপ্ত ব্যবসায়ও আরম্ভ করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই কোম্পানীর কর্ম্মচারী ছিলেন। কি কোম্পানী, কি অন্য ইংরাজ ব্যবসায়ী, সকলেরই এইরূপ ইচ্ছা হইল যে, নবাবের রাজ্যে বাণিজ্যের শুল্ক দেওয়া হইবে না। বস্তুতঃ তাহাই ঘটিয়া উঠিল। এই সময়ে কলিকাতায় ইংরাজ কাউন্সিলে দুইটী দল ছিল। একদলে গবর্ণর ভান্সিটার্ট ও ওয়ারেন হেষ্টিংস প্রভৃতি প্রধান, ইহারা নবাবের কথঞ্চিৎ পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু অন্য দলের নেতা এলিস, আমিয়ট প্রভৃতি মীর কাসেমের ঘোর বিপক্ষতাচরণ করেন। ইংরাজেরা আপনাদের বাণিজ্যের সুবিধার জন্য কাউন্সিল হইতে এইরূপ নিয়ম জারি করিলেন যে, ইংরাজদিগের অনুমতি পত্র লইয়া বিনা শুল্কে সমস্ত মালপত্র যাতায়াত করিতে পারিবে। কিন্তু অন্যান্য ব্যবসায়ীদিগকে অধিক পরিমাণে শুল্ক প্রদান করিতে হইবে। ইহাতে ইংরাজী ব্যবসায়ীদের যথেষ্ট সুবিধা হইল বটে, কিন্তু অন্যজাতীয় ব্যবসায়িগণ একেবারে নির্জীব হইয়া পড়িল। অনেকে জাল ব্রিটিশ ব্যবসায়ী সাজিয়া অনায়াসে শুল্কের হাত হইতে নিস্তার পাইল। ইংরাজের নিশান ও সিপাহীর মত দেখিলেই—নবাবের কর্ম্মচারিগণ তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিত। সে সকল প্রকৃতই হউক, অথবা জাল হউক, সে বিষয়ের অনুসন্ধান লইতে তাহাদের সাহস হইত না। এইরূপে রাজস্বের ক্ষতি হইতেছে দেখিয়া মীর কাসেম এই সমস্ত ব্যাপার বারম্বার কাউন্সিলে লিখিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু কাউন্সিলের সভ্যগণ সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে গবর্ণর ভান্সিটার্ট ইহার একটা মীমাংসার জন্য মুঙ্গেরে নবাবের নিকট উপস্থিত হন। ভান্সিটার্ট বরাবরই সভ্যদিগকে এ বিষয়ে বিবেচনা করিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সে কথা গ্রাহ্যই করিতেন না। যাহা হউক, গবর্ণর ভান্সিটার্ট মুঙ্গেরে গেলে, নবাব তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করেন যে, যেখানে ইংরাজদিগকে শতকরা ৯৲ টাকা মাশুল দিতে হইবে, অন্যান্য

ব্যবসায়িগণ সেরূপ স্থানে শতকরা ২৫৲ টাকা মাশুল দিবে এবং ইংরাজদিগের ছাড় পত্র ইংরাজ অধ্যক্ষ ও নবাবের কর্ম্মচারী উভয়ের কর্ত্তৃকই স্বাক্ষরিত হইবে। ভান্সিটার্ট কলিকাতায় আসিয়া এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলে সভ্যেরা তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন। তাঁহারা কেবল লবণের জন্য শতকরা ২॥০ টাকা মাশুল দিতে চাহিলেন, এবং কোন স্থানে ইংরাজদিগের সহিত নবাবের লোকজনের গোলযোগ ঘটিলে, ইংরাজ অধ্যক্ষেরা তাহার বিচার করিবেন বলিয়া প্রকাশ করেন। নবাব এই সংবাদ শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া দেশীয়, বিদেশীয় সকল প্রকার ব্যবসায়ীকেই রাজ্য মধ্যে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিবার আদেশ দিলেন। ইহাতে ইংরাজদিগের অত্যন্ত ক্ষতি হওয়ায়, তাঁহারা পুনর্ব্বার আমিয়ট ও হে কে নবাবের নিকট পাঠাইলেন। কিন্তু সে বারেও কিছুই স্থির হইল না। ক্রমে উভয় পক্ষের বিবাদ গুরুতর হইয়া উঠে ; উভয় পক্ষই যুদ্ধ সজ্জার আয়োজনে প্রবৃত্ত হয়। এই সময়ে নবাবের কতকগুলি কর্ম্মচারী কলিকাতায় বন্দী অবস্থায় থাকায়, নবাব তাহাদের মুক্তি পর্য্যন্ত হে কে প্রতিভূস্বরূপ মুঙ্গেরে অবস্থিতি করিতে বলেন। আমিয়ট কলিকাতায় যাইতে যাইতে মুর্শিদাবাদে নবাবের লোক দ্বারা হত হন। কোন কোন দেশীয় গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, নবাব নাকি এরূপ আদেশ দিয়াছিলেন যে, যেখানে যত ইংরাজ আছে, একদিনে তাহাদের সকলেরই প্রাণদণ্ড বিধান করিতে হইবে।* কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। পাটনার ইংরেজাধ্যক্ষ এলিস, পাটনা দখল করিয়াছিলেন, কিন্তু নবাব সৈন্যেরা তাহা পুনরধিকার করে। ক্রমে উভয় পক্ষ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিল। এই সময়ে মেজর আডাম্স ইংরাজ সৈন্যের নেতা ছিলেন।

১৭৬৩ খৃঃ অব্দের ১৯এ জুলাই কাটোয়ার পর পারে পলাশীর নিকট মহম্মদ তকী খাঁর সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ হয়, ইহাতে তকী খাঁ অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন দেন। ২৩এ মুর্শিদাবাদের মতিঝিলের নিকট নবাবসৈন্য পরাজিত হইয়া সুতীতে পলায়ন করে। এই সময়ে ইংরাজেরা বৃদ্ধ মীর জাফরকে পুনর্ব্বার সিংহাসন প্রদান করেন। ১লা আগষ্ট গিরিয়া প্রান্তরে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ ঘটে, এই যুদ্ধে সমরুও উপস্থিত ছিল। মুর্শিদাবাদ হইতে ইংরাজসৈন্যের অগ্রসর হওয়ার কথা শুনিয়া মীর কাসেমের সৈন্যগণ ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বিশাল গিরিয়া প্রান্তরে সুতীর নিকট সমবেত হয়। সুতী হইতে তিন ক্রোশ দক্ষিণে বাঁশলই নদী পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ তাহারা অধিকার করিয়া অবস্থিতি করে। তাহাদের সুদৃঢ় অবস্থান ইংরাজ সৈন্যদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল। ভাগীরথী ও বাঁশলই তাহাদের দুই পার্শ্বের পরিখারূপে অবস্থিতি করিতেছিল, তদ্ভিন্ন অন্যান্যদিকেও তাহারা পরিখা খনন করিয়াছিল। মুর্শিদাবাদ হইতে পশ্চিমে যাইবার একমাত্র সড়ক তাহাদের আয়ত্ত হয়। এই সুদৃঢ় অবস্থানের মধ্যস্থলে আমাদের সমরু ও তাহার সহযোগী মার্কার, দক্ষিণ পার্শ্বে সেনাপতি আসদউল্লা এবং বামপার্শ্বে সের আলি ইংরাজসৈন্যকে বাধা প্রদান করিবার জন্য অবস্থিতি করিতেছিল। ইংরাজ সৈন্য মেজর আডাম্স, কার্ণাক, নক্স, গ্রাণ্ট প্রভৃতি সেনাপতির অধীন মুর্শিদাবাদ হইতে গিরিয়াভিমুখে যাত্রা করে। ইংরাজ সৈন্য বাঁশলই পার হইলে নবাবসৈন্যেরা অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে। আসদ উল্লার সৈন্যগণ ইংরাজদিগকে বাঁশলইএর জলে নিক্ষেপ করিয়াছিল। কিন্তু ইংরাজেরা অন্য পার্শ্বে জয়লাভ করায়, নবাবসৈন্যের মধ্যে এক বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয় এবং তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। সমরু ও মার্কার আপনাদের সময় অপেক্ষা করিতেছিল, নবাবসৈন্যগণকে ছত্রভঙ্গ হইতে দেখিয়া তাহারা আর যুদ্ধের অবকাশ পাইল না। সমরু নিজ সৈন্যদিগকে নিরর্থক নষ্ট করা অপেক্ষা যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করা শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিল। যদিও সমরু সময় অপেক্ষা করিতেছিল, কিন্তু যে সময়ে ইংরাজেরা আপনাদের বামপার্শ্বে আসদ উল্লার সৈন্যকর্ত্তৃক দলিত হয়, সেই সময়ে যদি সে অগ্রসর হইত, তাহা হইলে সে দিবস ইংরাজদিগের জয়লাভের কোনই সম্ভাবনা থাকিত না। কোন ইংরাজ ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন যে, সমরু ইংরাজদিগের হত্যাকাণ্ডে যেরূপ সামর্থ্য দেখাইয়াছিল, গিরিয়ার যুদ্ধে সেনাধ্যক্ষরূপে যদি ...ন। † সামর্থ্য দেখাইতে পারিত, তাহা হইলে গিরিয়াটি যাইতে-বৃটিশ ক্ষমতা কিছুকালের জন্য নির্ব্বাপি...

* Riyazus-salatin p. 382.

* "Certainly, had Sombre

† Broome.

§ Malleson.

তাহা না করিয়া নিজ সৈন্যদিগকে গোলাগুলির মুখ হইতে সরাইয়া লইল ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পরাজিত হওয়া অপেক্ষা ধীরে ধীরে পশ্চাৎপদ হওয়া সঙ্গত মনে করিল। তাহার সমসাময়িক লোকেরা বলিয়া থাকে যে, সমরু যুদ্ধে জয়লাভ করা অপেক্ষা নিজ সৈন্যের প্রাণরক্ষা করা শ্রেয়ঃ মনে করিত। সেকালের কোন ইংরাজ কর্ম্মচারী লিখিয়াছেন যে, সমরু তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তনের জন্যই বিখ্যাত ছিল। তাহার এইরূপ নিয়ম ছিল যে, প্রত্যেক যুদ্ধে সে তাহার সৈন্যদিগকে একরেখায় দাঁড় করাইত,—কতকগুলি গোলাগুলি চালাইত, শেষে একটী চতুষ্কোণ ব্যূহ করিয়া আস্তে আস্তে পশ্চাদ্বর্ত্তন করিত। ম্যালিসন ইহার উপর এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, সমরু সেইজন্য আপনার মৃত্যু পর্য্যন্ত গর্ব্ব প্রকাশ করিয়াছিল যে, সে কখনও একটীও কামান শত্রুপক্ষের হস্তগত হইতে দেয় নাই। কিন্তু সমরু যে, সময়ে সময়ে বিশেষরূপ কার্য্যবত্তা দেখাইয়াছে, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। সমরুর প্রতি ইংরাজ জাতির সহানুভূতির অভাব থাকায়, তাঁহারা তাহার বিষয়ে ঐরূপ উল্লেখ করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয়, ম্যাসজিনের ন্যায় নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকও এ বিষয়ে কিয়ৎপরিমাণে জাতীয় দোষ অবলম্বন করিয়াছেন। যাহা হউক, গিরিয়াযুদ্ধে সের আলি ও সমরু কিছু বীর্য্যবত্তা দেখাইলে ইংরাজ সৈন্যকে যে, ভাগীরথী ও বাঁশলইএর গর্ভে চিরবিশ্রাম লাভ করিতে হইত, ইহা ম্যালিসনের ন্যায় নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক স্বীকার করিয়াছেন।

গিরিয়ার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নবাবসৈন্য উধূয়ানালার দিকে অগ্রসর হয়। গিরিয়ার পরাজয়বার্ত্তা নবাব মীর কাসেমের কর্ণগোচর হইলে, তিনি আরাটুন নামে স্বীয় আর্ম্মেণীয় সেনাপতির অধীন ইউরোপীয় রণকৌশলে শিক্ষিত চারি হাজার সৈন্য ও দেশীয় সেনাপতি মীর নজফ খাঁ, মীর হেম্মত আলি ও মীর মেহেদী খাঁ প্রভৃতির অধীন বার হাজার সৈন্য উধূয়ানালায় পাঠাইয়া দেন। এদিকে গিরিয়া হইতে সমরু, মার্কার, আসদ উল্লা প্রভৃতিও আসিয়া [illegible]স্থিত হয়। কোন কোন ইংরাজ ঐতিহাসিক বলিয়া থাকেন যে, উধূয়ানালায় প্রায় ৪০ সহস্র নবাব সৈন্য সমবেত হইয়াছিল।* মেজর আডাম্‌স দুই দিন গিরিয়াতে বিশ্রাম করিয়া ৪ঠা আগষ্ট উধূয়ার দিকে অগ্রসর হন, ও ১১ই উধূয়া হইতে দুই ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব ফুদ্‌কিপুর নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করেন। তথায় রীতিমত পরিখাখনন ও বুরুজাদি নির্ম্মাণ করিতে হয়। নবাবশিবির উধূয়ানালা, গঙ্গা ও কতকগুলি পর্ব্বতদ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়ায় তাহার অবস্থান অত্যন্ত সুন্দর হইয়া উঠে। যেখানে প্রাকৃতিক পরিখা বা প্রাচীরের অভাব হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে পরিখাখনন ও বুরুজ নির্ম্মাণ করিয়া নবাব সৈন্যেরা আপনাদিগের শিবিরকে অভেদ্য করিয়া তুলে। ইংরাজেরা প্রথমতঃ উক্ত শিবিরের কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই, ২৪ তম দিবসে ইংরাজেরা নবাবশিবির লক্ষ্য করিয়া গোলাবৃষ্টি করেন, কিন্তু তাহাতে শিবিরের কিছুই হয় নাই, কেবল একটীমাত্র স্থান সামান্যরূপ ভগ্ন হয়। নবাবশিবিরের নিকট একটী বিল ছিল। নবাব সেনাপতি মীর নজফ খাঁ উক্ত বিলের একটী অল্প গভীর স্থান পার হইয়া মধ্যে মধ্যেইংরাজ শিবির আক্রমণ করিতেন। ইংরাজেরা এইরূপে বারংবার উত্ত্যক্ত হইয়া অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া পড়েন। সহসা এক সুযোগ উপস্থিত হয়। কোম্পানীর বিতাড়িত একটী সৈন্য নবাবের সেনামধ্যে প্রবিষ্ট হয়। সে আবার বিশ্বাস ঘাতকতা অবলম্বন করিয়া ইংরাজ শিবিরে আগমন করে, ও তাহাদিগকে নজফখাঁর অল্প গভীর স্থানের সন্ধান বলিয়া দেয়। একদল ইংরাজ সৈন্য রাত্রিযোগে জম্বুকবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কাপ্তেন আর্ভিংএর অধীনে সেই পথ দিয়া শিবির মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, ও আর একদল কাপ্তেন মোরালের অধীন পূর্ব্বোক্ত ভগ্নাংশ দিয়া শিবির মধ্যে প্রবেশ করে। এই উভয় দলে সহসা নবাব সৈন্যদিগকে আক্রমণ করায় তাহারা অত্যন্ত ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। তাহারা সকলে প্রায় নিদ্রাগত ছিল, এরূপ অবস্থায় অস্ত্রশস্ত্র লইবারও অবকাশ পায় নাই, সহসা কামানের শব্দ ও অস্ত্রের ঝনঝনায় তাহারা জাগরিত হইয়া অস্ত্র গ্রহণের অবকাশ পাইতে না পাইতে ইংরাজহস্তে জীবন বিসর্জ্জন দিতে আরম্ভ করে। ১৭৬৩ খৃঃ অব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর উধূয়ার শিবির আক্রান্ত হয়, পরদিন প্রাতঃকালে ইংরাজেরা তাহা সম্পূর্ণরূপে দখল করিয়া বসেন। সমরু ও মার্কার, শিবিরের নিকট দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ইংরাজ সৈন্যকে বাধা দিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। তাহারা একরূপ অসমসাহসিকতা অবলম্বন পূর্ব্বক প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে থাকে। ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা সমরুকে যেরূপ ভাবে চিত্রিত করেন, এস্থলে আমরা তাহার বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাই। তাঁহাদের মন্তব্য মানিয়া লইলে সমরুকে ইহার অনেক পূর্ব্বে যুদ্ধ হইতে বিরত হইতে হইত। কিন্তু সমরু তাহা না করিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত সম্ভব হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্তই ইংরাজ সৈন্যকে বাধা দিয়াছিল। পরিশেষে অনন্যোপায় হইয়া তাহাদিগকে পথ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। উধূয়া হইতে ইংরাজ সৈন্য মুঙ্গেরে উপস্থিত হইয়া মুঙ্গের দুর্গ অধিকার করে। নবাব মীর কাসেম তাহার পূর্ব্বে মুঙ্গের পরিত্যাগ করিয়া পাটনার দিকে গমন করিয়াছিলেন। উধূয়ার পরাজয়ের পর নবাব তাঁহার প্রধান সেনাপতি গর্গিন খাঁকে অবিশ্বাস করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। তাঁহার সে আদেশ পালিত হইতে বিলম্ব হয় নাই। তদবধি সমরু নবাব মীর কাসেমের আরও প্রিয়পাত্র হইয়া উঠে।

মীর কাসেম যতই আপনার পরাজয়বার্ত্তা শুনিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মনে ইংরেজ-বিদ্বেষানল প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল। তিনি অবশেষে এরূপ ক্রুদ্ধ হইলেন যে, পাটনায় উপস্থিত হইয়া সমস্ত ইংরাজবন্দীকে হত্যা করিবার জন্য স্বীয় সেনাপতিদিগকে আদেশ দিলেন, কিন্তু তাঁহার দেশীয় সেনাপতিগণ কেহই তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। বরঞ্চ তাঁহারা উত্তর দিলেন যে, তাঁহারা যোদ্ধা, কিন্তু ঘাতক নহেন। অবশেষে সমরু নবাবের আদেশ প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হইল। একজন ইউরোপীয় স্বজাতি ও স্বধর্ম্মাবলম্বিগণের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে নিজ আত্মাকে কলুষিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল! ইংরাজ-বন্দীগণ পাটনার যে বাটীতে ছিলেন, তাহাকে হাজী আহম্মদের বাটী বলিত।* ৫ই অক্টোবর সমরু ইউরোপীয় বন্দিদিগকে ভোজ প্রদান করিবার ছলে তাহাদের সমস্ত ছুরী, কাঁটা প্রভৃতি চাহিয়া লয়, তাহার পর দুই দল সিপাহীর দ্বারা হাজী আহম্মদের বাটী পরিবেষ্টিত করিয়া, এলিশ, হে ও লশিংটনকে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান করে। তাঁহাদের সঙ্গে আরও ৬ জন ইংরাজ উপস্থিত হন। তাঁহাদের উপস্থিতি মাত্রেই সমরু তাঁহাদিগকে হত্যা করিবার আদেশ দেয়। তাহার আদেশে তাঁহাদের দেহ খণ্ডবিখণ্ডিত হইয়া একটী কূপমধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। তাহার পর সিপাহীরা ছাদের উপর উঠিয়া অবশিষ্ট বন্দীদিগকে গুলি করে। যাহারা তাহা হইতে নিষ্কৃতি পায়, তাহারা প্রাণভয়ে গৃহমধ্যে আশ্রয় লয়। সেই সময়ে যে সকল সিপাহী নীচে ছিল, তাহারাও অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে। ইংরাজেরা অনন্যোপায় হইয়া বোতল, পাথর ও ইষ্টক দ্বারা আক্রমণকারীদিগকে বাধা প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদের বীর্য্যবত্তা দেখিয়া সিপাহীগণ তাহাদিগের হস্তে অস্ত্র প্রদান করিবার জন্য সমরুকে অনুরোধ করে, এবং আরও প্রকাশ করে যে, তাহারা সৈন্য, ঘাতক নহে।† যাহারা ইংরাজদিগকে হত্যা করিতে এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিল, সমরু তাহাদিগকে প্রহার করে ও অবশিষ্ট সিপাহীদিগকে সেই হত্যাকাণ্ড সম্পূর্ণ করিতে বাধ্য করে। এই সকল মৃতদেহ অবশেষে কূপমধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। বন্দীদিগের মধ্যে গলষ্টন জীবিত ছিলেন। যদিও তাঁহাকে বাঁচাইবার ইচ্ছা ছিল, তথাপি তিনি সমরুর প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করায়, তাঁহাকে জীবিত অবস্থায় কূপমধ্যে নিক্ষেপ করা হয়।‡ চেহেল সেতুন ভবনে কতকগুলি আহত ও পীড়িত ইংরাজ ছিল। ১১ই অক্টোবর তাহাদিগকেও হত্যা করা হয়। কি স্ত্রী, কি পুরুষ কেহই সমরুর নির্দ্দয় হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। এলিশের একটী শিশুসন্তানকে সমরু নিজ হস্তে বধ করিয়াছিল!* হত স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সম্ভবতঃ এলিশ-পত্নীও ছিলেন। ৫০ জন কর্ম্মচারী ও ১০০ জন সৈন্য এই নৃশংস ব্যাপারে হত হয়। একমাত্র ডাক্তার ফলারটন কোনরূপে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন। মীর কাসেম ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিতেন। তিনি হত্যার পূর্ব্বদিন কোনরূপে বন্দীভবন হইতে প্রস্থান করেন।† চারিজন সার্জ্জন নৌকা করিয়া নবাবের নিকট যাইতে-

অযোধ্যা[illegible] [illegible]ral which he afterwards displayed as an হইয়াছিল। [illegible]itish power in Bengal might have been "দুর্গা" বা দুরাসদা [illegible]guished on the field of Gheria," বলেন, অযোধ্যার চতু[illegible]

* Broome's Bengal Army P. 382.

* Mutaqherin (Translation) P. 282. উক্ত বাটীতে আলিবর্দ্দির ভ্রাতা হাজী আহম্মদ থাকিতেন বলিয়া উহার ঐরূপ নাম হয়।

* Malleson.
† Broome.
‡ Broome.
§ Malleson.

ছিলেন, মাঝিদিগকে বশীভূত করিয়া তাঁহারাও নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন। মুতাক্ষরীণকার বলেন যে, এই সমস্ত ইংরাজ-বন্দী হত্যাকাণ্ডের দুই তিন দিন পূর্ব্বে ভৃত্যগণের দ্বারা বন্দুক, বারুদ ও গোলাগুলি সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু যথাসময়ে তাহা তাঁহাদের নিকট পঁহুছিতে পারে নাই। যদি তাঁহারা সে সকল হস্তগত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই সমরুর সৈন্য ভেদ করিয়া বহির্গত হইতেন, অথবা আত্মরক্ষা করিতে করিতে আক্রমণকারীদিগের অনেককে নিহত করিতে পারিতেন।*

পাটনার এই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড কানপুরের হত্যাকাণ্ড অপেক্ষাও যে অধিকতর নৃশংস ও নিন্দনীয় তাহা ব্যক্ত করা বোধ হয় অসঙ্গত নহে। কানপুরে অন্যজাতীয় ও অন্যধর্ম্মাবলম্বী একজন, অপর যে জাতি কর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট, স্থানভ্রষ্ট হইয়া হৃদয়ে ঘোর অসন্তোষ ও অশান্তির ভার বহন করিতেছেন, সেই জাতির কয়েকজনের হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করার এবং পাটনায় কেবল প্রভুর পরিতোষ সম্পাদকের জন্য স্বজাতি ও স্বধর্ম্মাবলম্বীর রক্তে নিজ হস্ত কলুষিত করার মধ্যে কোনটী অধিকতর নির্দ্দয় ও গর্হিত, তাহা বোধ হয় নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন হইবে না। আমরা উভয় হত্যাকাণ্ডকেই যার পর নাই ঘৃণিত মনে করিয়া থাকি। দুঃখের বিষয় এই যে, কানপুরের হত্যাকাণ্ডকে ইংরাজেরা যেরূপ চক্ষে দেখিয়া থাকেন ও যেরূপ ভাবে বর্ণনা করেন, পাটনার হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে সেরূপ ভাব লক্ষিত হয় না। নানা সাহেব ও সমরু উভয়কে জগতের সমক্ষে আনয়ন করিলে কে অধিকতর কৃষ্ণ তাহা নিরপেক্ষ মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। একজন নিরপেক্ষ ইংরাজ ঐতিহাসিক স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে, পাটনার হত্যাকাণ্ড একটী বিষয়ে কানপুরের হত্যাকাণ্ডকেও ভীষণতায় অতিক্রম করিয়াছে, সেটী ইউরোপীয় কর্ত্তৃক ইউরোপীয় হত্যা!† দেশীয় ও ইউরোপীয় উভয় জাতির পক্ষে নিরপেক্ষ বিচার থাকিলে আমাদিগের কোনই ক্ষোভের কারণ থাকে না। পাটনার হত্যাকাণ্ডে আর একটী বিষয়ও আমরা সাধারণকে লক্ষ্য করিতে বলি। নবাবের দেশীয় সেনাপতিগণ এই নৃশংস ব্যাপারে অস্বীকৃত হইয়া নবাবকে কিরূপ ভাবে উত্তর দিয়াছিলেন ও সমরুর সিপাহীগণ বন্দীদিগকে অস্ত্র-শস্ত্র দিবার অনুরোধ করিয়া কি কথা বলিয়াছেন, তাহা বোধ হয় সকলের স্মরণ থাকিতে পারে। যে ঘৃণিত ব্যাপারে একজন ইউরোপীয় অগ্রসর হয়, দেশীয়েরা সাহসসহকারে কিরূপে তাহার নিন্দা করিয়া থাকে, এঘটনা হইতে সাধারণে তাহা বুঝিতে পারিবেন। এই উপলক্ষে দেশীয় ও ইউরোপীয় চরিত্রের সমালোচনা করিবার একটু অবকাশ প্রদান করা বোধ হয় অসঙ্গত নহে। আমরা মহানুভব ইউরোপীয়দিগের সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি না। যখন ইউরোপীয় চরিত্র ঘৃণিত হয়, তখন তাহার গতি কতদূর প্রধাবিত হয় ইহারই ইঙ্গিত করা আমাদের উদ্দেশ্য।

পাটনার এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড অবশেষে সমরুর হৃদয়ে এক ঘোর অশান্তির ছায়া আনয়ন করে। সে সর্ব্বদাই নরকযন্ত্রণা অনুভব করিত। তাহার মনে এইরূপ ধারণা হইয়াছিল যে, ইংরাজেরা তাহাকে ধরিতে পারিলেই পাটনার হত্যার প্রতিশোধ লইবে। সেই জন্য সে সর্ব্বদা আপনার নিকট বিষ-সঞ্চয় করিয়া রাখিত। ইংরাজহস্তে পতিত হওয়া অপেক্ষা বিষপানে জীবন বিসর্জ্জন দেওয়া সে শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছিল। নবাবের আদেশ প্রতিপালন করায় নবাব তাহার প্রতি অধিকতর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু নবাব তাহাকে যথাযোগ্য পুরস্কৃত করিতে পারেন নাই। কারণ মীরকাসেমের ভাগ্যচন্দ্রমা তখন ধীরে ধীরে অস্তোন্মুখ হইয়া আসিতেছিল। নবাব তখন নিজেই অসহায় ও অনন্যোপায়। ইংরাজেরা নবেম্বর মাসে পাটনা দখল করিয়া বসিলেন। নবাব আর কোন উপায় না দেখিয়া অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার শরণাপন্ন হইলেন। সমরুও তাঁহার সহিত নবাব-উজীরের নিকট উপস্থিত হইল ও ক্রমে তাঁহারও প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল।

* Matagteria P. 283. † Malleson.

রামধন-চরিত।

বহু গবেষণা দ্বারাও শ্রীযুত রামধন তত্ত্বনিধির জন্মস্থান বা জন্মের তারিখ নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই। বিজয়নগর বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রূপেই আমরা তাঁহার প্রথম পরিচয় পাই। তিনি শালপ্রাংশু এবং মহাভুজ ছিলেন; কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, তিনি ব্যূঢ়োরস্ক কিম্বা বৃষস্কন্ধ ছিলেন না। নতুবা আমি তাঁহার চরিত

বর্ণনা করিয়া কালিদাসের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারিতাম। তাঁহার বেধ-বিস্তাররহিত দৈর্ঘ্যের জন্য তিনি জ্যামিতিক সরল রেখার মত প্রতীয়মান হইতেন। তাঁহার নাসিকা দীর্ঘ, এবং নাসাগ্র ঊর্দ্ধদিকে বক্র ছিল। মস্তক হইতে দীর্ঘ শিখা পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত লম্বমান ছিল। তাঁহার কিছু কবিরাজী জানা ছিল। আয়ুর্ব্বেদ হইতে তিনি কয়েকটী রত্ন উদ্ধার করিয়াছিলেন। যথা—একাধিক ব্যঞ্জন ভোজন নিষিদ্ধ; কিন্তু পরগৃহে ইহার ব্যতিক্রম করিলে আয়ুর্ব্বৃদ্ধি হয়; পরগৃহে আহারের পর যদি সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া পায়ের নখ দেখা যায়, তবে সে আহার মঞ্জুর নয়; দগ্ধবিল্ব জলযোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদার্থ; ইত্যাদি। কিন্তু বিশ্বনিন্দুকেরা বলিত যে, আয়ুর্ব্বেদে এ সকল কথা নাই, পণ্ডিত মহাশয় এত কৃপণ ছিলেন যে, তিনি আর্দ্র ধান্যক্ষেত্রের পার্শ্ব দিয়া গেলেও ধান শুকাইয়া যাইত।

বিজয়নগর বিদ্যালয়ে মাধব নামে একটী ছাত্র ছিল। সে জাতিতে কৈবর্ত্ত; তাহার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে একমাত্র বৃদ্ধা মাতামহী ছিল। বৃদ্ধা ধান ভানিয়া নিজের ও নাতির খাওয়া পরা চালাইত। পণ্ডিত মহাশয় একদিন মাধবকে বলিলেন—"মাধব, আর শুভঙ্করীতে চল্‌বে না; একখানা প্রসন্নকুমারের পাটীগণিত কিনে আনিস্। মূল্য আঠার আনা।" মাধব বাড়ী গিয়া দিদিমাকে বলিল। বুড়ী তো শুনিয়া অবাক্। সে তৎক্ষণাৎ পণ্ডিত মহাশয়ের বাসায় গিয়া বলিল, "বাবা ঠাকুর, আপুনি কবিরাজ হ'য়ে কেমন ক'রে মাধবকে আঠার আনার পাটীগুড় না পাটালী খেতে বল্লে? একরত্তি ছেলে; এত গুড় কি হজম হবে? তাও আবার পেসন্ন কুমারের গুড়। ও বাবা, আপনারা এতও জান! পেসন্ন কুমার তো হাঁড়ি গড়ে, এই তো জানি। সেকি গুড়ের ভিয়ান কর'তে পারে? সেতো ভোলা ময়রা করে। আপুনি কি জাতও মান না?" এই বলিয়া বুড়ী ক্রোধে সেখান হইতে বকিতে বকিতে চলিয়া গেল, তত্ত্বনিধির উত্তরের অপেক্ষা করিল না। বুড়ী সমুদয় গ্রামে প্রচার করিয়া দিল যে, তত্ত্বনিধি একরত্তি ছেলেকে আঠার আনার পাটালী খেতে বলে, এবং জাতি মানে না। গ্রামের পঞ্চায়েত জমা হইল, এবং পণ্ডিতকে জবাব দেওয়াই স্থির হইল। যিনি পঞ্চায়েতের প্রধান, তাঁহার যোগ্যতার অভাব ছিল না; তিনি নাম দস্তখত পর্য্যন্ত করিতে পারিতেন। তিনি অগ্রসর হইয়া সক্রোধে তত্ত্বনিধিকে বলিলেন, "একি কথা শুনি আজ মাধবের দিদিমার মুখে কবিরাজ? যাও তুমি হস্তিমূর্খ. গেল তোমার কাজ।" যাহা হউক, কৃশকায় রামধনকে হস্তিমূর্খ বলাটা অলঙ্কারশাস্ত্রসঙ্গত হয় নাই। এইরূপ অদ্ভুত বিচারে অতিমাত্র পরিতৃপ্ত হইয়া রামধন তত্ত্বনিধি বিজয়নগর গ্রাম পরিত্যাগ করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে নিকটস্থ সহরে ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিতের পদ খালি ছিল। তত্ত্বনিধি ঐ পদে নিযুক্ত হইলেন।

ইংরাজীতে একটি প্রবাদ আছে যে, যে ভেড়ার পিঠ হইতে লোম কাটা হইয়াছে, বিধাতা তার জন্য শীতের তীক্ষ্ণতা কমাইয়া দেন। এইরূপ কোন একটা ব্যবস্থা না হইলে ইংরাজী স্কুলের ছাত্রদের কি দুর্দ্দশাই হইত। অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনার চাপে তাহাদের প্রাণ বাহির হইয়া যাইত,—যদি তাহারা পণ্ডিত মহাশয়দিগের সহিত হাস্য কৌতুক করিতে না পাইত।

পণ্ডিত মহাশয় যখন টেবিলের উপর পদদ্বয় তুলিয়া নিদ্রালু হন, তৎকালে চেয়ারের সহিত তাঁহার টিকী বন্ধন ছাত্রদের মধ্যে একটা চিরন্তন প্রথাতে পরিণত হইয়াছে। তত্ত্বনিধিও এই নিয়মের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। তবে, মধ্যে মধ্যে টিকীবন্ধন কার্য্যে ছাত্রবিশেষের অপটুতাবশতঃ তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত; এবং দুর্ভাগ্য ছাত্র ভূপতিত হইত। কিন্তু তাঁহার চপেটাঘাতে এরূপ হইত, ইহা মনে করা স্থূলদর্শী অবৈজ্ঞানিকের কাজ। ছুঁচল জিনিষের সূক্ষ্ম অগ্রভাগের বিদ্যুৎ স্ফুরণ, সঞ্চালন এবং আকর্ষণের ক্ষমতা অত্যন্ত অধিক। এই জন্য যে দিন তত্ত্বনিধির শিখা সুমার্জ্জিত ও সূচ্যগ্র থাকিত, সে দিন তাঁহার শিখা স্পর্শ মাত্রেই ছাত্রগণ বিদ্যুৎ-স্রোতের অভিঘাতে মাটিতে পড়িয়া যাইত। কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে এবং গ্লাসগো নগরে লর্ড কেল্‌বিনের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে শিখার বৈদ্যুতিক গুণের পরীক্ষা হইতেছে। ইতিমধ্যেই যেরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে আশা হয় যে শীঘ্রই বিলাতে তেলজলসংযোগে টিকীর চাষ আরম্ভ হইবে। নাস্তিক্যবুদ্ধির প্রবলতা বশতঃ যাঁহারা এ বিষয়ে সন্দিহান, তাঁহারা দুই একটি টিকি শিশিতে পুরিয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে কিম্বা গ্লাস্‌গো লর্ড

কেলবিনের নিকট পাঠাইয়া উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে পারেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তত্ত্বনিধি দগ্ধবিল্ব দ্বারা জলযোগ সমাপন করিতেন। তাঁহার বেল-লালসায় বেলগাছের অধিকারীরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। পণ্ডিত মহাশয় আর বেল পান না। তখন তিনি নিরুপায় হইয়া বেলগাছের অন্বেষণে নগরভ্রমণ আরম্ভ করিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে সহরের প্রান্তে এক পল্লীতে অনেক বেল গাছ আবিষ্কার করিলেন। তাহার পরদিন স্কুলে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে তাঁহার ছাত্র হীরালাল উক্ত পল্লীর অধিবাসী। তিনি হীরালালকে প্রত্যহ বেল দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। হীরালাল বলিল, "মহাশয়, আমাদের বেল গাছ নাই, ওসব গাছ অন্য লোকের।" পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "তাদের কাছে চেয়ে আনিস।" হীরালাল বলিল, "পণ্ডিত মহাশয়, তাহারা রোজ রোজ বেল দেবে না।" রামধন ছাড়িবার পাত্র নহেন; বলিলেন, "আরে, এমনি চুপি চুপি পাড়িয়া আনিস্।" হীরালাল বলিল, "মহাশয়, আমি চুরি করিতে পারিব না।" তখন রামধন সক্রোধে কহিলেন, "তুই তো বড় সাধু দেখচি; বেল চুরি আবার চুরি!" কিন্তু হীরালাল তাহাতেও রাজী না হওয়ায় অগত্যা রামধনের ভাগ্যে পূর্ব্বোক্ত পল্লীর বিল্ব-ভোজন ঘটিল না। কিন্তু এখানেই তাঁহার দুরদৃষ্টের শেষ হইল না। কয়েক দিন পরে হীরালাল তাহার "হস্তাক্ষরে" নিম্নলিখিত কবিতাটি লিখিয়া আনিল :—

"বেলচুরি ক'রো নারে রামধন;
বেল চুরি কল্লে তুমি যাইবে জেল-ভবন।"

পণ্ডিত মহাশয় যেমন না পড়িয়া সকলের "হস্তাক্ষর' গুলিতে "দৃষ্ট রা-তত্ত্বনিধি" এই দস্তখত করিতেন, হীরালালের "হস্তাক্ষরে"ও তদ্রূপ করিলেন। ছাত্রগণ অতি কষ্টে হাস্যসংবরণ করিল; কিন্তু সমস্ত সহরে তাঁহার বেল চুরি বিষয়ক কবিতা প্রচারিত হইল। তিনি যে রাস্তা দিয়া যান, সেই রাস্তাতেই গুরুভক্ত ছাত্রগণ উচ্চৈঃস্বরে "বেল চুরি ক'রো নারে রামধন" বলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু এখানেই তাঁহার গুরুদক্ষিণার পরিশোধ হইল না।

পণ্ডিত মহাশয় যে পাড়ায় বাস করিতেন, তথায় গোলোক নামে তাঁহার একটি সুবুদ্ধি ছাত্র থাকিত। সে একদিন একজন ভালুক-নাচওয়ালাকে পণ্ডিত মহাশয়ের গৃহে পাঠাইয়া দিল এবং বলিল যে বাবু অতিশয় আমীর আদমী ও অতিশয় দান খয়রাত করেন। রামধনের উত্তেজিত নিষেধ সত্ত্বেও ভালুক নাচওয়ালা যত প্রকার কৌতুক জানিত, দেখাইল, এবং অতি কষ্টে চারিটি পয়সা আদায় করিল। কিন্তু এই চারিটি পয়সার শোক পণ্ডিত মহাশয়ের মর্ম্মে মর্ম্মে বিদ্ধ হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন ইহা গোলোকের কর্ম্ম। পরদিন স্কুলে গিয়া গোলোককে শাস্তি দিবার জন্য একটা অছিলা খুঁজিতে লাগিলেন। ইহা বুঝিতে পারিয়া সুবুদ্ধি গোলোক হাসিয়া উঠিল। আর যাবি কোথা? পণ্ডিত মহাশয় তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন "চল্ তোকে হেড্ মাষ্টারের কাছে নিয়ে যাব; তুই বড় দুষ্ট হ'য়েচিস্।" গোলোকও ছাড়িবার পাত্র নয়; বলিল, "চলুন, মশায়, আমি হেড্মাষ্টার মহাশয়কে কেনারামের কথা বলিয়া দিব।" জোঁকের মুখে চূণ দিলে যেমন হয়, পণ্ডিত মহাশয় তদ্রূপ দমিয়া গেলেন, এবং "বেশ, বেশ, আর বাহাদুরী ক'ত্তে হবে না" এই বলিয়া গোলোককে ছাড়িয়া দিলেন।

এই কেনারামের কথাটা কি, পাঠকের জানা উচিত। কেনারাম এক অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন চর্ম্মকারের পুত্র, ইংরাজী স্কুলে পড়ে। বর্ষাকালে বৃষ্টি হইলে এবং পথে কাদা হইলে পণ্ডিত মহাশয় চটিজুতা জোড়াটির চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত হইতেন। অবশেষে স্থির করিলেন, যে ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র যেমন পদরেণু দিয়া অহল্যার উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, তিনিও কলিযুগে তদ্রূপ কেনারামকে চর্ম্মকার জন্ম হইতে উদ্ধার করিবেন। সুতরাং বৃষ্টি হইলেই পণ্ডিত মহাশয় কেনারামের স্কন্ধে চটি-বহনের ভার অর্পণ করিতেন। ইহা হেড্মাষ্টার মহাশয়ের গোচর হওয়ায় তিনি রামধনকে খুব তিরস্কার করেন। কিন্তু রামধন পূর্ব্ববৎ গোপনে চর্ম্মকারোদ্ধার ব্রত পালন করিতে লাগিলেন। কেনারামও ইহাতে আপত্তি করিত না; কারণ সে এই প্রকারে স্কুলে পণ্ডিতের ঘণ্টায় সর্ব্বপ্রকার দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইত। ইহাই কেনারামের কথা।

এই প্রকারে সুখে দুঃখে কিছুদিন কাটিয়া গেল। অবশেষে রামধনের পত্নীবিয়োগ হইল। খেজুর গাছে রস আছে সকলেই জানেন, কিন্তু রামধন সম্বন্ধে তদ্রূপ

সন্দেহ কেহ কখনও করে নাই। কিন্তু রামধন সত্য সত্যই পত্নীবিয়োগবিধুর হইয়া পড়িলেন। একটি ব্রাহ্মণীর অভাব বিলক্ষণ অনুভব করিতে লাগিলেন। আর ইহা যুক্তিসঙ্গতও বটে। দেখ, সংসারে দুই হাত, দুই পা, দুই চোখ; লিখিতে হইলে লোকে শিবদুর্গা, সীতারাম লেখে; সকলই দুই দুই। এমন কি, দুই আঙ্গুল ভিন্ন এক আঙ্গুলে নস্য লওয়াও চলে না। সুতরাং রামধন কেমন করিয়া একাকী থাকিবেন? তিনি কুলীন ছিলেন; সুতরাং যদিও তিনি পক্ককেশ হইয়াছিলেন এবং সম্মুখের দুটি দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তথাপি শীঘ্রই তাঁহার পাত্রী স্থির হইয়া গেল। চুলে কলপ মাখিয়া রামধন উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। বলা বাহুল্য, তখন কুন্তলীনের সৃষ্টি হয় নাই, নতুবা রামধন তাহার গুণাগুণও একবার পরীক্ষা করিতেন।

কিন্তু কলপে বার্দ্ধক্য ঢাকে না। রামধনের শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণী কুলীনকন্যা হইলেও নারী; তিনি দুহিতার বুড়া বরে সন্তুষ্ট হইলেন না। কথাটা রামধন তত্ত্বনিধির কাণে গেল। তাঁহার শ্বশুরালয় কর্ম্মস্থান হইতে একক্রোশ মাত্র দূরে ছিল। সুতরাং তিনি পদব্রজে ডেলি প্যাসেঞ্জার হইয়াছিলেন। একদিন সন্ধ্যাকালে শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীকে একান্তে পাইয়া রামধন সোচ্ছ্বাসে কহিলেন—"শুন শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী, শুন শ্বশ্রূঠাকুরাণী, বয়সেতে বৃদ্ধ নই, জ্ঞানে বৃদ্ধ আমি। চিন্তাভারে ফরাশিশ রাণী অংটোয়ানেটের এক রাত্রে কেশ শুভ্র হইয়া গিয়াছিল। আমার বহুবৎসরের দার্শনিক চিন্তায় কেশ শুভ্র হইবে না কেন? আর আমি এখনও শক্ত সমর্থ আছি। দেখ, এক লম্ফে বারাণ্ডা হইতে উঠানে নামিতে পারি।" এই বলিয়া রামধন লম্ফ দিলেন। পূর্ব্বেই তাঁহার দুইটি দাঁত ভাঙ্গিয়াছিল; যেমন পড়া, আর অমনি আরও দুইটি দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল! অতঃপর যাহা ঘটিল, পাঠক অনুমান করুন।

পণ্ডিত মহাশয়ের জীবনে যখন যাহা কিছু ঘটিত, সে সম্বন্ধে গোলোক যেন সর্ব্বজ্ঞ ছিল। তাঁহার দাঁত ভাঙ্গার বৃত্তান্তটি গোলোক সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া দিল। পূর্ব্বে যে দুটি দাঁত ভাঙ্গিয়াছিল, তাহারও ইতিহাস গোলোক প্রকাশ করিতে ছাড়িল না। যথা—

রামধন যখন বিজয়নগরের গ্রামে শিক্ষক ছিলেন, তখন গুরুগিরিও করিতেন। বিজয়নগরের উত্তর প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র নদী ছিল, তাহারই ওপারে নিশ্চিন্তপুর গ্রাম। তথায় রামধনের ভক্তদাস নামে একজন শিষ্য ছিল। সে জাতিতে গন্ধবণিক; বপুটি তৈলাক্ত ও হৃষ্টপুষ্ট; সর্ব্বাঙ্গে ছাপ; ঠিক যেন একটি ডেড্ লেটার (dead letter); টাকা কড়ি বেশ ছিল। গুরু তাহার বাড়ীতে পায়ের ধূলা দিলে সে ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার সেবা করিত; এবং প্রণামী ও বিদায়ের টাকাটা বেশ দিত। ইহাতে, কাণাকে হেলেঞ্চার পুকুর দেখাইয়া দিলে যাহা হয়, তাহাই হইল। তত্ত্বনিধি ঘন ঘন ভক্তদাসকে কৃপা করিতে লাগিলেন। শেষে ভক্তদাসের ভক্তি চটিয়া গেল। পরাণ নামে এক নাপিত তাহার ক্ষৌরী করিত। ভক্তদাস পরাণকে কিছু বক্‌সিস্ অঙ্গীকার করিয়া গুরুঠাকুরকে জব্দ করিবার এক উপায় স্থির করিল। সমস্ত ঠিক্; এমন সময় একদিন অপরাহ্নে রামধন তত্ত্বনিধি মহাশয় আগমন করিতেছেন, ভক্তদাস বৈঠকখানা হইতে দেখিতে পাইল। সৌভাগ্যক্রমে পরাণও তথায় উপস্থিত ছিল। গুরুঠাকুর আসিবামাত্র ভক্তদাস সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিল এবং পা ধুয়াইয়া দিয়া ভক্তিপূর্ব্বক পাদোদক পান করিল। তিনি উপবিষ্ট হইলে পরাণ তাঁহাকে তামাক সাজিয়া দিল। কিয়ৎক্ষণ পরে পরাণ ক্ষিপ্তের ন্যায় মুখভঙ্গী করিয়া ভক্তদাসকে বলিল, "বাবু গো, আমার যেন সেই ব্যামোটা চাগিয়ে উঠ্‌ছে।" এই বলিয়া ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল। ভক্তদাস "বাবারে, পাগ্‌লা কুকুরের কামড়, জলাতঙ্ক হয়েছে রে," বলিয়া বৈঠকখানা হইতে দ্রুতবেগে অন্দরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিল। রামধন সভয়ে বলিতে লাগিলেন, "ওহে শিষ্য, খোল খোল দ্বার, খোল দ্রুতগতি, ওপারেতে মোক্ষ যার; এপারেতে মৃত্যু কিন্তু।" ভক্তদাস দ্বার খুলিল না। এদিকে পরাণ ঘেউ ঘেউ করিয়া তাঁহাকে কামড়াইতে আসে, সুতরাং গুরুঠাকুর ঊর্দ্ধশ্বাসে বিজয়নগর অভিমুখে দৌড়িতে লাগিলেন। পরাণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘেউ ঘেউ করিতে করিতে চলিল, পথে পাথরে হুঁজুট খাইয়া রামধন পড়িয়া গেলেন ও তাঁহার দুটি দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল। তথাপি নিস্তার নাই। ক্ষিপ্ত পরাণ পশ্চাতে রহিয়াছে। সুতরাং রক্তাক্তমুখে রামধন সেই ক্ষুদ্র নদীর জলে আসিয়া পড়িলেন। পরাণের রোগ জলাতঙ্ক; সুতরাং এতক্ষণে জল

পাইয়া রামধন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। পরাণ ঘেউ ঘেউ করিতে করিতে অন্যদিকে চলিয়া গেল। ইতি।

রামধন পণ্ডিতের কীর্ত্তি সুমহান্।
দ্বিজ হরিদাস ভনে শুনে পুণ্যবান্॥

শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার

M. D., D. L., C. I. E.

হাওড়ার আঠার মাইল পশ্চিমে পাক্‌পাড়া নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২রা নবেম্বর এই স্থানে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ৺ তারকনাথ সরকার। আপনাদিগের সামান্য ভূসম্পত্তির উপর নির্ভর করিয়া, তিনি জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। পিতার ও পিতৃ পুরুষগণের কোন্ গুণের আপনি উত্তরাধিকারী হইয়াছেন, এই প্রশ্নের উত্তরে ডাক্তার সরকার মহাশয় বলেন, "তাঁহাদিগের সরলতার ও তেজস্বিতার উল্লেখ করিতে পারি। তাঁহারা পুরুষানুক্রমে নির্ভীক ও স্বাবলম্বন-প্রিয় ছিলেন, স্বার্থের জন্য তাঁহারা কখনও আত্ম-মর্য্যাদা বিসর্জ্জন করেন নাই। যদি আমাতে তাঁহাদিগের কোনও গুণ সঞ্চারিত হইয়া থাকে, তবে এই সকলই হইয়াছে।"

সরকার মহাশয়ের পিতার সাংসারিক অবস্থা ভাল ছিল না। পল্লীগ্রামে কোনরূপে অন্ন বস্ত্র সংগ্রহ হইত। বৈধব্যের পর তাঁহার জননীকে শিশু পুত্র দুইটী সঙ্গে লইয়া, কলিকাতায় আপনার ভ্রাতাগণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। মাতুলাশ্রয়েই ডাক্তার সরকার মহাশয়ের শিক্ষা আরব্ধ হয়। প্রথম বয়সে মাতুল পরিবারে তিনি যে উপকার লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করিয়া থাকেন। প্রথমে কিছুদিন একটী বাঙ্গালা পাঠশালায় শিক্ষালাভ করিয়া, তিনি ৺ ঠাকুরদাস দেব নামক তাঁহাদিগের প্রতিবাসী কোন ভদ্রলোকের নিকট ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করেন। নিজের বাল্য শিক্ষকদিগের মধ্যে ইঁহারই নাম ডাক্তার সরকার মহাশয় কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন। ঠাকুরদাস বাবুর প্রকৃতি অতি মধুর এবং অমায়িক ছিল। শিক্ষাদান-গুণে, ততোধিক তাঁহার সুকোমল ব্যবহারে, তিনি ছাত্রদিগের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারিতেন। সদুপদেশ পূর্ণ শত শত, সুন্দর সুন্দর গল্প তাঁহার অভ্যস্ত ছিল। তাঁহার গল্পে বালকের কথা দূরে থাকুক, প্রবীণগণও মুগ্ধ হইতেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ডাক্তার সরকার মহাশয় তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন। যোগ্যতর শিক্ষকের নিকট অধ্যয়ন করিয়াও, বাল্য শিক্ষকের প্রতি তাঁহার ভক্তির হ্রাস হয় নাই। ঠাকুরদাস বাবুর পরিবারস্থ ব্যক্তিগণকে তিনি এখনও আত্ম-পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণের ন্যায় স্নেহ করেন।

আনুমানিক ৭ বৎসর বয়সের সময় সরকার মহাশয় অধ্যয়নার্থ হেয়ার স্কুলে প্রবেশ করেন। মহাত্মা হেয়ার তখন জীবিত ছিলেন। স্বর্গীয় বাবু উমাচরণ মিত্র তখন হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন এবং খ্যাতনামা বাবু (পরে ডাক্তার) দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি এখানে অধ্যাপনা করিতেন। উমাচরণ বাবুর আবৃত্তি-প্রণালী অতি অপূর্ব্ব ছিল। অবকাশ কালে বা স্বশ্রেণীতে অধ্যাপনের সময় তিনি যখন সেক্সপিয়ার, মিল্টন প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে কোন অংশ আবৃত্তি করিতেন, ডাক্তার সরকার মহাশয় নিম্নশ্রেণী হইতে তদ্গতচিত্তে তাহা শ্রবণ করিতেন। পঠিত অংশের অর্থ বুঝিতে না পারিলেও, পুনঃ পুনঃ তাহা শ্রবণ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইত এবং নিজের নিম্নশ্রেণীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঠ্যপুস্তক তিনি উমাচরণ বাবুর অনুকরণে পাঠ করিতে চেষ্টা করিতেন। এই সময় হইতেই সেক্সপিয়ার ও মিল্টনের প্রতি তাঁহার আজীবনব্যাপী অনুরাগ উদ্ভূত হয়। যাঁহারা ডাক্তার সরকারের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা একবাক্যে তাঁহার উচ্চারণ প্রণালীর প্রশংসা করিয়া থাকেন। বাল্যকাল হইতে উমাচরণ বাবুর অনুকরণে আবৃত্তি সম্বন্ধে মনোযোগ করাতেই তিনি এই গুণ লাভ করিয়াছেন। হেয়ার স্কুলে অধ্যয়নের সময়ই তিনি একজন বিশেষ মেধাবী ছাত্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন; শিক্ষকগণ তাঁহার ব্যবহারে আন্তরিক সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহার হেয়ার স্কুলের সহপাঠীদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ নাটককার স্বর্গীয় বাবু দীনবন্ধু মিত্রের নাম উল্লেখ যোগ্য।

উমাচরণ বাবুর পর (Mr. Twentyman) মিষ্টার টোইন্‌টীম্যান নামক একজন সাহেব হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। ডাক্তার সরকার তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। মিঃ টোইন্‌টীম্যান অনেক সময় তাঁহার লিখিত অনুশীলন এবং রচনা সগৌরবে উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদিগকে পাঠ করিয়া শুনাইতেন। ১৮৪৮।৪৯ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার সরকার, হেয়ার স্কুল হইতে জুনিয়ার স্কলারশিপ বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া, হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। সে বৎসরের পরীক্ষায় তিনিই সর্ব্বপ্রথম হইয়াছিলেন। সুপরিচিত নামা Sutteliffe সাহেব তখন হিন্দু কলেজের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন। তিনি ডাক্তার সরকারকে বিশেষ স্নেহ করিতেন এবং মিষ্টার টোইন্‌টীম্যানের ন্যায় তিনিও তাঁহার লিখিত প্রশ্নের উত্তর সমূহ আপনার বন্ধুদিগকে লইয়া দেখাইতেন। হিন্দুকলেজ তখনও বঙ্গদেশের মধ্যে একটী অত্যুৎকৃষ্ট বিদ্যালয় বলিয়া পরিচিত ছিল; সুতরাং ডাক্তার সরকার, মেডিকেল কলেজে প্রবেশের পূর্ব্বে, এদেশে সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে যতদূর উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব, তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই উচ্চশিক্ষার গুণেই তিনি জীবনে এত উন্নতি করিতে এবং পরিণামে চিকিৎসা ব্যবসায়ী হইয়াও, বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস্ ফ্যাকল্টীর সভাপতি হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার সমব্যবসায়ীদিগের মধ্যে আর কেহ এ পর্য্যন্ত এ গৌরব প্রাপ্ত হন নাই। ডাক্তার সরকারের হিন্দুকলেজের সহাধ্যায়ীদিগের মধ্যে স্বনাম প্রসিদ্ধ জজ বাবু দ্বারকানাথ মিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। উভয়েই কলেজের মধ্যে বিশেষ প্রতিভাবান্ ছাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন এবং উত্তর কালে উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুতা সঞ্জাত হইয়াছিল। ডাক্তার সরকার বিজ্ঞান সভার উদ্যোগ করিলে দ্বারকানাথ বাবু তাহাতে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং এক হাজার টাকা চাঁদা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। হিন্দুকলেজে পাঠাবস্থায় ডাক্তার সরকার তাঁহার আজীবনব্যাপী একটী গুণ লাভ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীদিগের মধ্যে তিনি একজন বিশেষ অধ্যয়নশীল ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত। আহার, নিদ্রা প্রভৃতির সময় বাদ দিলে তাঁহাকে অতি অল্পক্ষণই পুস্তকবিরহিত দেখিতে পাওয়া যায়। নিজের ব্যবসায়সংশ্লিষ্ট পুস্তক ব্যতীত অন্যান্য এত গ্রন্থ তিনি পাঠ করিয়াছেন যে, বাঙ্গালীর মধ্যে অতি অল্প লোকই তাঁহার সমকক্ষ আছেন। হিন্দুকলেজ হইতেই এই অধ্যয়নাসক্তি তাঁহার হৃদয়ে সঞ্জাত হয়। সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক প্রচুর গ্রন্থ তিনি এই সময় পাঠ করিয়াছিলেন। বাল্যজাত এই অধ্যয়নস্পৃহা এক্ষণে তাঁহার এরূপ প্রকৃতিগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, রোগ শয্যায় শয়ন করিয়াও তিনি অধ্যয়ন হইতে নিবৃত্ত থাকিতে পারেন না।

ডাক্তার সরকার হিন্দুকলেজ হইতে সিনিয়র বৃত্তি লাভ করিয়া, ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেন। মেডিকেলকলেজে তখন Dr. (পরে Sir Joseph) Fayrer, Dr. Partridge, Dr. Goodeve, Dr. Oshaughnessy, Dr. Thomson প্রভৃতি অনেক খ্যাতনামা অধ্যাপক অধ্যাপনা করিতেন। ডাক্তার সরকার ইহাদিগের সকলের, বিশেষতঃ চক্ষুরোগ চিকিৎসক ডাক্তার Archer এবং প্রসিদ্ধনামা ডাক্তার Fayrer এর একান্ত স্নেহভাজন হইয়াছিলেন। মেডিকেল কলেজে তিনি একজন বিশেষ প্রতিষ্ঠাভাজন ছাত্র ছিলেন। শারীর বিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, ভৈষজ্য এবং ধাত্রীবিদ্যা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে তিনি বৃত্তি ও মেডাল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হিন্দু কলেজে রীতিমত শিক্ষালাভ করিয়া যাওয়াতে, মেডিকেল কলেজে সাধারণ শিক্ষার্থী ছাত্রদিগের অপেক্ষা তাঁহার অনেক বিষয়ে সুবিধা হইয়াছিল। যে সকল বিষয় বুঝিতে হইলে গণিত ও বিজ্ঞানের সাহায্য আবশ্যক, তাহা তিনি অপেক্ষাকৃত অনায়াসে বুঝিতে পারিতেন। তাঁহার ছাত্রাবস্থার একটী গল্প নিম্নে প্রদত্ত হইল। কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়নের সময়, একবার তিনি তাঁহার কোন পীড়িত আত্মীয়কে লইয়া চক্ষুরোগ চিকিৎসার স্থানে গমন করেন। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে চক্ষু রোগের চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া হইত না। অধ্যাপক ডাক্তার আর্চার পঞ্চম বার্ষিকশ্রেণীর ছাত্রদিগকে লইয়া Microscopic anatomy of the eye আলোচনা করিতেছিলেন। কিন্তু ছাত্রেরা তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেছিলেন না। হঠাৎ ডাক্তার সরকারের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, তিনি তাঁহার একটী প্রশ্নের উত্তর দিলেন। ডাঃ আর্চার তাঁহাকে আরও কয়েকটী প্রশ্ন করিলেন, এবং তাঁহার সন্তোষজনক উত্তর প্রাপ্ত হইয়া ও ডাক্তার সরকার যে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র তাহা অবগত হইয়া, একান্ত বিস্মিত ও প্রীত হইলেন। এই

দিন হইতে ডাক্তার আর্চার সরকার মহাশয়কে আন্তরিক স্নেহ করিতে আরম্ভ করিলেন। পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রেরা পরে ডাক্তার সরকারকে কথায় কথায় বলিলেন যে, আলোক-বিজ্ঞান (Light) সম্বন্ধে উপযুক্ত শিক্ষার অভাবেই তাঁহারা চক্ষু রোগের চিকিৎসা প্রণালী বুঝিতে পারিতেছেন না। তিনি যদি আলোক-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে উপদেশ দেন, তাহা হইলে বিশেষ উপকার হয়। ডাক্তার সরকার তাঁহাদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং কলেজের অধ্যক্ষের অনুমতি গ্রহণ করিয়া "আলোক" সম্বন্ধে কয়েকটী বক্তৃতা করিলেন। সেই বৎসরই তিনি Adaptation of the human eye to distance" নামে একটী বক্তৃতা করেন। ইহাই প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা সমূহের প্রথম। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র হইয়া পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদিগকে উপদেশ প্রদান করা বড় সাধারণ ক্ষমতার পরিচায়ক ও অল্প গৌরবের বিষয় নহে। কিন্তু যাঁহারা ভাবী জীবনে কোনরূপ মহত্ব প্রদর্শন করেন, তরুণ বয়সে তাঁহাদিগের প্রকৃতিতে এইরূপ অনন্য সুলভ শক্তি প্রায়ই লক্ষিত হইয়া থাকে। মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষায় ডাক্তার সরকার প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সুপরিচিত নামা স্বর্গীয় ডাক্তার জগবন্ধু বসু ও তিনি এক সঙ্গে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে M. D. উপাধি লাভ করেন। M. D. পরীক্ষায় ডাক্তার সরকার প্রথম এবং জগবন্ধু বাবু দ্বিতীয় হইয়াছিলেন।

মেডিকেল কলেজ হইতে উত্তীর্ণ অন্যান্য ছাত্রের ন্যায় ডাক্তার সরকারও প্রথমে য়্যালোপাথি মতে চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। কলেজ হইতে প্রতিষ্ঠার সহিত বহির্গত হওয়াতে এবং কলেজের অধ্যাপকগণের আস্থা-ভাজন হওয়াতে, অল্পদিনের মধ্যেই ব্যবসায়ে তাঁহার উন্নতি লক্ষিত হইয়াছিল। ডাক্তার ফারার (Fayrer) তাঁহাকে এরূপ স্নেহ করিতেন যে, Bengal Branch of the British Medi- [illegible] Association নামক সভা প্রতিষ্ঠার সময় বয়োজ্যেষ্ঠ নামক [illegible]বাপীয় ডাক্তারকেও পরিত্যাগ করিয়া তিনি ইংরাজী পড়ি[illegible]ভার সভাপতি করেন। সভা প্রতিষ্ঠিত দিগের মধ্যে ইঁহারই ন[illegible] প্রথম কয়েক বৎসর তাহার সম্পা- চিত্তে স্মরণ করেন। ঠাকুরদ[illegible] ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট হইয়া- এবং অমায়িক ছিল। শিক্ষাদান-[illegible]শ সম্পূর্ণ নূতন ছিল।

ডাক্তার (Berigny) বেরিণী কেবল অল্পদিন মাত্র এদেশে আসিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর মধ্যে কেবল ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দত্ত পরিবারস্থ স্বর্গীয় বাবু রাজেন্দ্র দত্তই হোমিওপ্যাথির আলোচনা করিতেন; এবং তাঁহার দ্বারা চিকিৎসিত হইয়া উপকার লাভ করাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ও হোমিওপ্যাথিতে শ্রদ্ধাবান হইয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই ডাক্তার সরকারকে হোমিওপ্যাথির আলোচনার জন্য অনুরোধ করিতেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদিগের কথায় কর্ণপাত করা দূরে থাকুক, বরং তাঁহাদিগকে অবৈজ্ঞানিক মতের সমর্থক বলিয়া উপহাস করিতেন। ব্রিটিস্ মেডিকেল য়্যাসোসিয়েসনের প্রথম অধিবেশনে তিনি হোমিওপ্যাথির সম্বন্ধে অনেক উপহাস ও কটূক্তি পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। এই সময় Morgan's Philosophy of Homoeopathy নামক গ্রন্থ সমালোচনার জন্য তাঁহার হস্তগত হয়। ডাক্তার সরকারের মন হোমিওপ্যাথির প্রতি এরূপ বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিল যে, তিনি পুস্তকখানি পাইবা মাত্রই বলিলেন যে, "ইহাত বিজ্ঞানমূলক নয়, এই মুহূর্ত্তেই ইহার সমালোচনা করিয়া দিতেছি।" কিন্তু তিনি যতই পুস্তকখানি পাঠ করিতে লাগিলেন, ততই বুঝিতে পারিলেন যে, হোমিওপ্যাথি অযুক্তিমূলক এবং অবৈজ্ঞানিক নহে। তাহার মূলে সত্য নিহিত আছে। ইহারই সমকালে রাজেন্দ্র বাবুর চেষ্টায় কতকগুলি উৎকট রোগ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় আরোগ্য হয়, ইহা তিনি দেখিতে পান। তাঁহার নিজের মাতুলও কঠিন শূল বেদনা হইতে রাজেন্দ্র বাবুর চেষ্টায় নিষ্কৃতি লাভ করেন। তখন আর অবিশ্বাসের কারণ রহিল না। ক্রমে তিনি যতই হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও আলোচনা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইতে লাগিল। অবশেষে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিস মেডিকেল সভায় প্রদত্ত একটী বক্তৃতায় তিনি, হোমিওপ্যাথি যে যুক্তিমূলক এবং তিনি নিজে যে ইহাতে আস্থাবান, ইহা সাধারণের সমক্ষে ব্যক্ত করিলেন। তাঁহার সমব্যবসায়ী এবং আত্মীয়গণের মধ্যে এই বক্তৃতায় বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হইল। অপ্রচলিত এবং উপহাসার্হ মতের পরিপোষক হইয়া তিনি নিজের ভাবী উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিলেন, অনেকেই এইরূপ বলিতে লাগিলেন। ডাক্তার ফারার ছাত্রাবস্থা হইতে সরকার মহাশয়কে অত্যন্ত

স্নেহ করিতেন; এক দিন সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাঁহাকে সস্নেহে বলিলেন—"সরকার, তুমি একি করিতেছ, তুমি ব্যবসায়ে নূতন প্রবৃত্ত হইয়াছ, ইহাতে তোমার কি ক্ষতি হইবে তাহা কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ না?" ডাক্তার সরকার তাঁহাকে বিনীত ভাবে বলিলেন, "ব্যবসায়ে আমার ক্ষতি হইতে পারে, কিন্তু যখন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রকৃষ্টতর বলিয়া আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে, তখন তাহা সমর্থন এবং অবলম্বন না করিলে আমার পক্ষে অন্যায় কার্য্য করা হইবে।" ডাক্তার ফারার বলিলেন,—"একথার উপর আমার কোন কথা নাই, কিন্তু এখনও বিবেচনা করিয়া দেখ, অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও না।" এইরূপ আরও অনেকে স্পষ্টভাবে এবং ঈঙ্গিতে তাঁহাকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা হইতে নিবৃত্ত হইতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু ডাক্তার সরকার তাহাতে বিচলিত হইলেন না। সত্য প্রচার করিতে যাইয়া নিজের অদৃষ্টে যাহা হয় হইবে, এইরূপ স্থির করিয়া তিনি হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভগবানের কৃপায় তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন না। তিনি যেমন হোমিওপ্যাথিকে রক্ষা করিয়াছেন, হোমিওপ্যাথিও তেমনই তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছে। তাঁহার পূর্ব্বে রীতিমত চিকিৎসাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ অপর কোন ব্যক্তি এদেশে হোমিওপ্যাথির আলোচনা করেন নাই। হোমিওপ্যাথি যে হাতুড়িয়া চিকিৎসা নহে, ইহা তিনিই প্রতিপাদন করিয়াছেন। এদেশে হোমিওপ্যাথির প্রচারের জন্য স্বর্গীয় বাবু রাজেন্দ্র দত্তের, তাঁহার এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম স্মরণীয় হইবে।

চিকিৎসা সম্বন্ধে ডাক্তার সরকার মহাশয় যে প্রতিষ্ঠা এবং সুযশ লাভ করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার সমকালবর্ত্তী চিকিৎসকদিগের মধ্যে তিনি একজন অগ্রগণ্য। সার রিচার্ড গার্থ ও অনারেবল্ গিবস্ (Gibbs) এর ন্যায় সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ ইংরাজ, এবং বঙ্গদেশের শির্ষস্থানীয় কত রাজা মহারাজা তাঁহার চিকিৎসায় উপকার লাভ করিয়াছেন। আজ প্রায় ত্রিশ বৎসরের অধিককাল তাঁহার গৃহে দরিদ্রদিগের জন্য দাতব্য চিকিৎসা চলিয়া আসিতেছে। তাঁহার নামে আকৃষ্ট হইয়া কোন কোন দিন দুইশতেরও অধিক রোগী তাঁহার দ্বারে সমাগত হইয়াছে। সুস্থাবস্থায় তিনি প্রাতে ৬টা হইতে ১০টার পর পর্য্যন্তও নিজে বসিয়া তাহাদিগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি উগ্রপ্রকৃতি ও কটুভাষী চিকিৎসক বলিয়া কাহারও কাহারও নিকট পরিচিত, কিন্তু উগ্রতাই তাঁহার প্রকৃতি নহে। রোগী হইয়া চিকিৎসকের ব্রত গ্রহণ করিতে আসিলেই তিনি বিরক্ত হন। তিনি বলেন,—"রোগী চিকিৎসকের নিকট আপনার প্রকৃতি, শারীরিক অবস্থা, রোগের লক্ষণ সমস্তই বলিতে পারেন, কিন্তু "এ ঔষধ না দিয়া ও ঔষধ দেওয়া যায় কি না, অমুক এ ঔষধ দিয়াছিলেন, তাহাতে কিছু হয় নাই, এবং এটী আহার করিলে কি ক্ষতি?" এরূপ প্রশ্ন করিবার তাঁহার অধিকার নাই। চিকিৎসা এবং পথ্য, সকল বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে চিকিৎসকের উপর নির্ভর করাই তাঁহার কর্ত্তব্য।" এ সম্বন্ধে তিনি নিম্নলিখিত গল্পটী বলেন।

"একবার কোন পীড়িতা ইংরাজ মহিলা চিকিৎসার জন্য তাঁহার স্বামির সঙ্গে আমার নিকট আসিয়াছিলেন। মহিলাটী বাতরোগে বিকলাঙ্গ ও চলচ্ছক্তি রহিত হইয়া কষ্ট পাইতেছিলেন। চিকিৎসার ত্রুটী হয় নাই, জল বায়ু পরিবর্ত্তনের দ্বারা উপকার হইবে, এই আশায় তাঁহার স্বামী তাঁহাকে অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই; শেষ নিরাশ হইয়া আমার নিকট আসিয়াছিলেন। আমি সমস্ত অবস্থা শুনিয়া, পীড়িতা মহিলাটীকে বলিলাম, "আমার দ্বারা আপনার চিকিৎসার সুবিধা হইবে না। আমি যে ব্যবস্থা করিব আপনি তদনুসারে চলিতে পারিবেন্ না।" পীড়িতা এবং তাঁহার স্বামী কাতর স্বরে বলিলেন, "সে কি? আমরা যখন আপনার নিকট আসিয়াছি, তখন সম্পূর্ণ রূপেই আপনার মতে চলিব, তাহাতে সন্দেহ নাই।" আমি মহিলাটীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি আহার করেন?" তিনি মাংস, ডিম্ব, পিষ্টক সমস্তই নাম করিলেন। আমি বলিলাম, "এ সকলের কিছুই হইবে না। সাত দিন কেবল চপাটী (একপ্রকার রুটী) এবং মুগের ডাল খাইয়া থাকিতে হইবে, তাহার পর বুঝিয়া ঔষধ দিব।" মহিলাটী বলিলেন, "হায়! তাহা হইলে আমি মারা যাইব!" আমি বলিলাম, "আমিত পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, আমার ব্যবস্থায় আপনার সুবিধা হইবে না। আমি চিকিৎসা করিলে এই রূপই করিব। এখন আপনার যেরূপ ইচ্ছা করিতে পারেন।" মহিলাটী

অগত্যা স্বীকৃতা হইয়া গেলেন। সাত দিন পরে যখন তিনি ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার শরীর অনেক সুস্থ। স্বামীর স্কন্ধে ভর দিয়া তিনি নিজে উপরে আসিলেন এবং আনন্দের সহিত বলিলেন যে আমার ব্যবস্থায় তাঁহার অনেক উপকার হইয়াছে। আমি বলিলাম, "উত্তম! আর সাত দিন ঐরূপে চলুন্।" মহিলাটী বলিলেন,"সেকি! আমাকে ঔষধ দিবেন না, কেবল এই রূপে রাখিবেন?" আমি বলিলাম, "না, আপাততঃ এইরূপ চলুন্, পরে ঔষধের বিষয় বিবেচনা করিব।" মাসাধিককাল এইরূপ ব্যবস্থার এবং আহারাদির সামান্য পরিবর্ত্তন দ্বারা মহিলাটী ক্রমশঃ সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন। বিদায় গ্রহণের দিন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া শেষ বলিলেন, "ডাক্তার! আমার দুঃখ এই যে আমাকে একবিন্দু ঔষধ না দিয়া আপনি আমায় আরোগ্য করিলেন।" (Doctor! I am sorry you have cured me without a drop of medicine.) ডাক্তার সরকার বলেন,—"চিকিৎসকের উপর এইরূপ আস্থা এবং সম্পূর্ণ নির্ভর করাই কর্ত্তব্য। ইহা না করিলে চিকিৎসককে ডাকিয়া তাঁহার প্রতি কৃপা প্রদর্শনের আবশ্যক নাই।"

ক্রমশঃ—

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু

বৈদ্যনাথ—দেওঘর।

প্রবাসের সুখ।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

পথে যাইতে যাইতে এক্কাচালকের নিকট যখন শুনিলাম যে, অদ্য রাত্রে আমাদিগকে শিভালিক-পাদমূলে এক আড্ডায় অবস্থিতি করিতে হইবে, তখন মনে বড়ই আতঙ্কের উদয় হইয়াছিল। আমি মনে করিয়াছিলাম, এক্কাওয়ালা বরাবর আমাকে দেরাদুনে পৌঁছাইয়া দিবে। সেখানে অনেক বাঙ্গালী আছেন, আমি তাঁহাদের কাহারও গৃহে অতিথি হইব; এবং সেখানে যে পরম সমাদরে গৃহীত হইব, সে সুখের কল্পনাও পূর্ব্বেই করিয়া রাখিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি, এই মুসলমানপ্রবর এক্কাওয়ালা আমাকে এই পর্ব্বতপদতলস্থ গাড়ীর আড্ডায় নিশা যাপন করাইল। আমাকে যেখানে নামাইয়া দিল, সেখানে রাস্তার পার্শ্বে কয়েকখানি লম্বা লম্বা খড়ের চালাঘর। সেই ঘরগুলির সম্মুখে বসিয়া নানা দলে বিভক্ত অনেকগুলি মানুষ গল্পগুজব করিতেছে।

এক্কা হইতে নামিয়া আমি চালকের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। সে আমাকে নামাইয়া দিয়াই গাড়ী লইয়া পূর্ব্বোক্ত গৃহগুলির পশ্চাৎদিকে চলিয়া গিয়াছিল। হিন্দী ভাষায় আমার যে প্রকার দখল, তাহাতে গৃহপ্রাঙ্গনোপবিষ্ট কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার সাহস আমার হইল না। আমি মনে করিলাম, আমি হয়ত এক কথা জিজ্ঞাসা করিব, তাহারা হয়ত আর এক কথার জবাব দিবে। এবং তাহাদের খাঁটী হিন্দুস্থানী বুলি বুঝিতে না পারিয়া কোন প্রকার প্রত্যুত্তর না দিলে তাহারা হয়ত কোন প্রকার সম্পর্কবিরুদ্ধ সম্ভাষণে আমাকে আপ্যায়িত করিতে পারে। এইবার রেলে আসিতে এ প্রকার একটী ঘটনা আমার উপর দিয়া ঘটিয়া গিয়াছে। আমি যে গাড়ীতে আসিতেছিলাম, রাস্তার মধ্যে কোন এক ষ্টেসন হইতে একজন সুবেশধারী প্রৌঢ় মুসলমান ভদ্রলোক তাহাতে আমার সঙ্গী হইলেন। তিনি সবিশেষ শিষ্টাচার প্রদর্শনপূর্ব্বক আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,"আপ্‌কা দৌলতখানা কাঁহা"। এ প্রশ্নের অর্থ কি, আমি মোটেই বুঝিতে পারিলাম না। সুতরাং তাঁহার প্রশ্নের কোনই উত্তর দিতে পারিলাম না। ভদ্রলোক হয়ত আমাকে বধির স্থির করিয়াছিলেন, এবং সেই জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চৈঃস্বরে সেই প্রশ্নই সেই ভাষায় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রশ্ন বুঝিলেত জবাব, অথচ ভদ্রলোকের কথার জবাব করা শাস্ত্র ও সুরুচিসঙ্গত এ জ্ঞান অবশ্যই আমার লোপ পায় নাই। অন্য উপায় না দেখিয়া আমি সাঁটে তাঁহার কথার এক রকম জবাব দেওয়া স্থির করিয়া দক্ষিণ হস্ত নাড়িয়া ইহাই বুঝাইতে চাহিলাম যে, আমি জানি না। উত্তরটী বধিরের মত হইল না বটে, বাতুলের মত হইল। ভদ্রলোকটী তখন তাঁহার সঙ্গীকে হিজিবিজি করিয়া উর্দ্দু, ফারসি, হিন্দি মিশাইয়া কতকগুলি কি বলিলেন। কথার ভাবে বুঝিলাম, সেগুলি আমার সম্বন্ধেই বলা হইল। এবং আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার মধ্যে একটী শব্দের অর্থ আমার বিশেষ জানা ছিল, সে শব্দটী "বাউরা"। আমি বুঝিতে পারিলাম, ভদ্রলোকটী আমাকে বাতুল স্থির করিলেন। দিব্যজ্ঞান-সম্পন্ন, কথঞ্চিৎ বুদ্ধিমান্‌ও বটে, সুস্থকায় সবলশরীর প্রখরা মস্তিষ্ক আমাকে নিতান্ত বাতুল স্থির করায় আমার মনে সত্যসত্যই একটু কষ্ট হইল। এবং তখনি স্থির করিলাম, পারতপক্ষে আর কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেছি না। এই জন্যই এক্কাওয়ালা চলিয়া গেলে, আমি সাহস করিয়া কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করি নাই। বিশেষতঃ এই কয় মাইল পথ এক্কাওয়ালার সঙ্গে আসিতে আসিতে সে আমার হিন্দী জ্ঞান এবং পশ্চিম দেশ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার অনেক পরিচয় পাইয়াছে। এ অবস্থায় কাহারও সঙ্গে যে কোন প্রকারে হউক, দুই চারিটী কথা বলিয়া আমার উপস্থিত কার্য্য শেষ করিতে পারিব, এই আশা করিয়া তাহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিলাম।

অনতিবিলম্বেই এক্কাচালক আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং আমাকে সেই এক স্থলেই দণ্ডায়মান দেখিয়াই বুঝিতে পারিল যে, আমি তাহারই অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছি। এই অন্ধকার রজনীতে এই পর্ব্বতক্রোড়ে সেই আমার একমাত্র সহায়, একমাত্র অবলম্বনদণ্ড। এক্কাচালক আমাকে সঙ্গে লইয়া পথিপার্শ্বস্থ লম্বা লম্বা খড়ের ঘরের একখানিতে প্রবেশ করিল। ভিতরে বহু দিনের কলঙ্কময় মসীমলিন, তিন দিকে কাচশূন্য (অবশ্য কাগজ মোড়া) একটী জীর্ণ লণ্ঠনের মধ্য হইতে বহুকষ্টে একটু একটু আলো বাহির হইতেছে; সেই আলোকে দেখিলাম যে, ঘরটী নিতান্ত বড় নহে; তাহার মধ্যে ৩।৪ খানি দড়ির খাটিয়া পড়িয়া রহিয়াছে এবং তাহারই একখানির উপর একটী মনুষ্যমূর্ত্তি উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ক্ষীণ আলোকে আমি মানুষটীর চেহারাও ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম না। আমাকে এক্কাওয়ালা তাহারই একখানি চারপাই অধিকার করিয়া বসিতে বলিল। সঙ্গে যে সামান্য বিছানা ছিল, তাহাই আনিবার জন্য এক্কাওয়ালা তাহার গাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

তখন গৃহমধ্যস্থ জীবের সহিত আলাপ করিবার পালা। তিনিই প্রথমে আমাকে প্রশ্ন করিলেন; তাঁহার প্রশ্নের ভাবেই বুঝিলাম, তিনি বেশ ভাল হিন্দী জানেন না; সুতরাং এ ক্ষেত্রে মণিকাঞ্চন সংযোগ হইল। আমরা দুই চারি কথা স্ব-রচিত হিন্দীতে বলিয়াই বুঝিলাম যে, আমাদের কথা বলিবার আর এক উপায় আছে, সেটী ইংরাজী ভাষার সাহায্যে। কারণ যাঁহার সঙ্গে আমি কথা বলিতেছি, তিনি মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণ, বন-বিভাগে কাজ করেন; মান্দ্রাজপ্রদেশে হইতে প্রেরিত হইয়া দেরাদুন বনবিদ্যালয়ে পড়িতে যাইতেছেন। এ হেন সঙ্গী পাইয়া আমার মনে বড়ই আনন্দ হইল। তিনিও অল্পক্ষণ পূর্ব্বে এই পান্থশালায় পঁহুছিয়াছেন, রাত্রে কিছুই আহার করিবেন না, কারণ তিনি সাহারাণপুরেই আহার কার্য্য শেষ করিয়াছেন। যদিও তিনি এ প্রদেশে নূতন আসিতেছেন, কিন্তু এখানে আসিবার পথঘাট সম্বন্ধে তাহার বিশেষ জ্ঞান আছে; প্রতি বৎসরই মান্দ্রাজ বিভাগ হইতে অনেক ছাত্র দেরাদুন বন-বিদ্যালয়ে পড়িতে আসেন; এখনও দেরাদুনে তাঁহার কয়েকটী বন্ধু পড়িতেছেন; তাঁহারাই পূর্ব্বে পথ ঘাটের সমস্ত বিবরণ তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

এদিকে এক্কাওয়ালা আসিয়া আমার বিছানা পাড়িয়া দিল এবং আমার নিকট হইতে চারি আনা পয়সা লইয়া গিয়া তাহার নিজের হিসাব মত কয়েকটী ভাল আম এবং এক ব্যক্তির দ্বারা খানিকটা গরম দুগ্ধ আমাকে আনিয়া দিল; এক্কাওয়ালাগণ জাতিতে মুসলমান, সেইজন্যই দুগ্ধ আনিবার জন্য অপর লোক স্থির করিয়াছিল। সঙ্গী মান্দ্রাজী ছাত্রটীর ঘটিতে জল ছিল। আমি সংক্ষেপে পানাহার শেষ করিয়া, ছাত্রটীর সহিত নানাবিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলাম।

ভারতবর্ষে বাস করি, উভয়েই হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিই; কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার এই, মান্দ্রাজবাসী ভদ্রলোকটীর আচার ব্যবহার সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞানই নাই। তিনি যখন তাঁহাদের দেশের সমস্ত কথা বলিতে লাগিলেন, আমার নিকট সে সকল অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল! ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রুষিয়ার আচার ব্যবহার বিষয়ের সামান্য খুঁটী নাটী পর্য্যন্তও বলিতে পারি; অথচ যাঁহাদের সঙ্গে একদেশে বাস করি, তাঁহাদের কিছুই আমরা জানি না। এমনই সুন্দর আমাদের শিক্ষা, এমনই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি, আর ততোধিক সুন্দর আমাদের জ্ঞানস্পৃহা। আমার বেশ মনে আছে, আমার একজন কৃতবিদ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিধারী কঠোর কংগ্রেসওয়ালা বন্ধুর সঙ্গে রাজনীতি সম্বন্ধে

কথা হইতেছিল। সমস্ত ভারতবর্ষের লোক এই কংগ্রেসের দৌলতে একসূত্রে গ্রথিত হইবে, সকলে একপ্রাণ হইবে, সকলের আশা আকাঙ্ক্ষা এক হইবে, আচারব্যবহারগত ভেদও ক্রমে চলিয়া যাইবে। কথাগুলি বেশ মুখপ্রিয়, বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া সাজাইয়া বলিলে শুনিতে ভারি সুন্দর, ঘন করতালি পাইবার সম্পূর্ণ অধিকারী। আমি বন্ধুর সমস্ত কথাই নীরবে শুনিতেছি। এমন সময়ে আমাদের বাসার নীচে দিয়া মহা হল্লা করিয়া মহরমের procession চলিয়া গেল। আমি তখন ধীরে ধীরে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সিন্ধু, পঞ্জাব, মান্দ্রাজ, ত্রিবাঙ্কোর, গড়োয়াল, শ্রীহট্ট সব এক হইয়া যাইবে, আপনারাই সেই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন; কিন্তু এই ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশে যে সব লোক বাস করে তাহাদের সামাজিক বা ধর্ম্মবিষয়ক আচার ব্যবহার সম্বন্ধে আপনার কোন জ্ঞান আছে কি? অন্যের কথা দূরে থাকুক, যে মুসলমানদের সঙ্গে আজ এই চারি শত বৎসর এক সঙ্গে বাস করিলেন, রাত্রি প্রভাত হইলেই যে মুসলমানের মুখ দর্শন করিতে হয়, তাহারা কি জন্য এই হল্লা করিয়া রাস্তা দিয়া গেল তাহার ইতিহাস জানেন কি? খুব বেশী যদি জানেন তবে বলিবেন মহরম, কারণ আজ আপনার ছুটী। এই ত ব্যাপার। যদি পরস্পরে মিশিতে হয়, যদি একপ্রাণ হইতে হয়, তাহা হইলে প্রাণে মিশিবার জন্য বিশেষভাবে পরিচিত হইতে হয়, নতুবা এক আবেদন পত্রের উল্টা পৃষ্ঠে গায়ে গায়ে নাম সহি করিয়াই ত্রিবাঙ্কোর পঞ্জাব এক হইবে না।"

মান্দ্রাজী ছাত্রটীর সহিত আলাপ পরিচয়ের সময়ে নিজের অনভিজ্ঞতার কথা ভাবিয়া বাস্তবিকই আমি লজ্জিত হইয়াছিলাম। তাঁহার সহিত গল্প করিতে করিতে অজ্ঞাতসারে নিদ্রাদেবী আমাদের উপরে তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। রাত্রি প্রায় ৪টার সময়ে এক্কাওয়ালার ডাকাডাকিতে আমাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল; আমরা তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া এক্কায় আরোহণ করিলাম। আমাদের দুই খানি গাড়ী ধীরে ধীরে শিভালিক পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজলধর সেন।

কয়েকটী প্রশ্ন।

১। মধ্যাহ্নের সূর্য্য অপেক্ষা প্রাতঃকালের ও সায়াহ্নের দিক্‌প্রান্তস্থিত সূর্য্যকে বৃহত্তর দেখায় কেন?

২। পিপীলিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র জীব খাড়া দেয়ালেও চিৎ হইয়া ছাদে অনায়াসে হাঁটিয়া যায়। টিক্‌টিকি প্রভৃতিকেও এইরূপে যাইতে দেখা যায়। মাধ্যাকর্ষণে ইহাদিগকে ফেলিয়া দিতে পারে না কেন?

৩। পদ্মের পাতা ও কচুপাতা জলে ভিজে না কেন? পারদে কি ভিজে?

৪। গ্রীষ্মাদি কালে যে উর্ণনাভের জাল (gossamer) বায়ুতে ভাসিয়া বেড়াইতে দেখা যায়, উহা কি এবং কোথা হইতে আইসে?

৫। শরদাদি কালে যখন চন্দ্র নাতিস্বচ্ছ শুভ্র মেঘে বেষ্টিত হয়, তখন তাহার চারিদিকে একটী আলোকমণ্ডল দেখা যায়। ইহাতে কখন কখন ইন্দ্রধনুর বিচিত্র বর্ণ লক্ষিত হয়। লোকে ইহাকে "চন্দ্রসভা" কহে। ইহা কিরূপে উৎপন্ন হয়?

৬। ভূমিকম্পের পূর্ব্বে, এবং কখন কখন পরে, মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় একটী সুগভীর ধ্বনি শুনা যায়। গত ভূমিকম্পে অনেকেই উহা শুনিতে পাইয়াছেন। ইহা কেন হয়?

৭। হস্ত দ্বারা কর্ণপথ রুদ্ধ করিলে এক প্রকার সোঁ সোঁ শব্দ শুনা যায়—ইহার কারণ কি?

৮। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে আমাদের বঙ্গদেশে অনেক ঝড় বৃষ্টি হইয়া থাকে। এই সকল ঝড় বৃষ্টি সর্ব্ব স্থানেই বৈকালে হয়। প্রাতঃকালে ঝড় হয় না—হইলেও অতি বিরল। ইহার প্রকৃত কারণ কি?

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ রায়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

61, BAGH-BAZAR STREET.
CALCUTTA.
NIRA BHUSHON DE.

...য়ের সময়ে

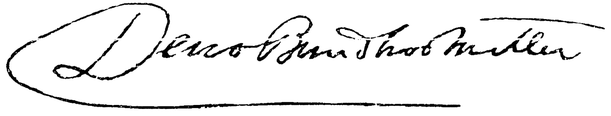

প্রদীপ

১ম ভাগ। } ভাদ্র, ১৩০৫। { ৯ম সংখ্যা।

বেনামী চিঠি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কত সামান্য তুচ্ছ ঘটনার মূলভিত্তির উপর কত বড় বড় ব্যাপারের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। কথিত আছে, কোনও দেশের রাজা মৃগয়া করিতে যাইবার মানসে ভৃত্যকে অশ্ব সজ্জিত করিতে আজ্ঞা দেন। ভৃত্য যখন এই কার্য্যে ব্যস্ত ছিল, তখন তাহার শিশুপুত্র আসিয়া মিঠাই খাইবার জন্য মহা আবদার আরম্ভ করে। পিতা বিরক্ত হইয়া পুত্রকে চপেটাঘাত করিল, ইহাতে সেই ক্রুদ্ধ শিশু একটা বংশদণ্ড তুলিয়া পিতার পদে নিক্ষেপ করিল। আঘাতের যন্ত্রণায় ও মনের বিরক্তিতে ভৃত্য ভাল করিয়া জিন বাঁধিতে পারিল না। এই ত্রুটিবশাৎ মৃগয়াকালে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া গিয়া রাজার মৃত্যু হইল। পরবর্ত্তী রাজাটি ভয়ানক অত্যাচারী হইল। দেশশুদ্ধ লোক তাহার কু শাসনে অশ্রুপাত করিতে লাগিল। অবশেষে একটা ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ উপস্থিত হইল, সহস্র সহস্র লোক মৃত্যু-মুখে পতিত হইল, শত শত গৃহ দগ্ধ হইয়া গেল,—এক কথায় রাজ্যটা লণ্ড ভণ্ড হইয়া গেল। এখন, এত বড় একটা ব্যাপারের মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে, সেই সহিস-পুত্রের সন্দেশ খাইবার লোভে আসিয়া পৌছিতে হয়!—আমাদের এই আখ্যায়িকাটিতেও একটি সামান্য ঘটনায় একটি বৃহৎ ফল ফলিয়াছিল। বুদ্ধিহীনা বালিকার লিখিত একখানি দুই তিন ছত্র বেনামী চিঠিতে, একটি মনুষ্য-জীবনের গতি আশ্চর্য্যরূপে ভিন্ন দিকে ধাবিত হইয়াছিল। যাহা হউক, এখন গল্প আরম্ভ করি।

আজ দুই বৎসর হইল রামসুন্দরের বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু অহো দুর্ভাগ্য!—সে এখন প[illegible] একবারও শ্বশুরবাড়ী যাইতে পাইল না। সে যখন বি, [illegible] শ্রেণীর ছাত্র, তখন তাহার বিবাহ হয়। তখন পরীক্ষা সন্নিকট বলিয়া "যোড়ে" শ্বশুরবাড়ী যাওয়া হয় নাই। বিবাহের কিছুদিন পরে, তাহার শ্বশুর সপরিবারে নিজ কর্ম্মস্থান এলাহাবাদে ফিরিয়া যান। জ্যৈষ্ঠ মাসে জামাইষষ্ঠী উপলক্ষ্যে যথাসময়ে নিমন্ত্রণ আসিল। সে বৎসর উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে দারুণ গ্রীষ্ম;—কলেরা ও বসন্ত সেই-দিকটাতেই নিজেদের দিগ্বিজয়ের শিবির স্থাপন করিয়াছিল। সংবাদপত্রের স্তম্ভ হইতে এই সমাচার প্রাপ্ত হইয়া রামসুন্দরের পিতা পুত্রকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইতে আপত্তি করিলেন। তাহার পর পূজার ছুটির সময় আবার যথারীতি নিমন্ত্রণ আসিল। কিন্তু রাম-সুন্দর জ্বরে পড়িল, যাওয়া হইল না। জ্যৈষ্ঠ মাসের জামাইষষ্ঠীর দিন আবার নিকটে আসিতে লাগিল। এবার রামসুন্দর যাইবেই। এবার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বেশ বৃষ্টি হইতেছে; কোনও প্রকার রোগের উপদ্রব নাই। এবার আর রামসুন্দরের আশালতা পুষ্পিত হইতে বাকী থাকিবে না। কলিকাতা হইতে আসিবার সময় সে একখানা 'টাইম-টেবেল' সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। সেই টাইম-টেবেল খানি এখন তাহার "বেদ"—অথবা একালের এঁচোড়ে পাকা ছেলেদের "গীতা" হইয়া দাঁড়াইল। রাত্রি দশটার সময় হুগলিতে গাড়ী চড়িতে হইবে। ছাড়িবার পূর্ব্বে "অমুক সময়ে পৌছিতেছি" বলিয়া এলাহাবাদে একখানা টেলিগ্রাম্ পাঠাইতে হইবে। তাহার পর গাড়ীতে উঠিয়া, উপরের বঙ্কে বিছানা পাতিয়া নিদ্রা;—নিদ্রা হইবে

কি? গ্রীষ্মকালের রাত্রে রেলপথে ভ্রমণ কি আরাম-দায়ক! কি সুন্দর শীতল বায়ু! তাহার উপর রজনী চন্দ্রালোকিত!—মোকামায় গিয়া প্রভাত হইবে। তখন এক পেয়ালা কি দুই পেয়ালা গরম গরম চা। নিশ্চয়ই খুব আরাম হইবে। বেলা দুইটার সময় এলাহাবাদে পৌছান যাইবে।—ইত্যাদি প্রকারে রাম-সুন্দর-মিস্ত্রী আকাশে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে ব্যস্ত রহিল। কিন্তু হরি হরি, সব পণ্ড হইয়া গেল! যাত্রার অবধারিত দিনের কিয়ৎ পূর্ব্বে রামসুন্দরের মাতার ভয়ঙ্কর জ্বর।—আর যাওয়া হইল না। আমরা রামসুন্দরের প্রতি অবিচার করিব না। সে এমন কথা ভাবে নাই, আমি যাত্রা করিলে পর তখন মার জ্বর হইল না কেন? অথবা আমার যাত্রা করিবার দিন আরও কিছু পূর্ব্বে ধার্য্য হয় নাই কেন?—সে প্রাণপণে জননীদেবীর সেবা করিল। শ্বশুরবাড়ী যাওয়া হইল না, ইহার দরুণ কোনও আপশোষ তাহার মনে স্থান পাইল না। রামসুন্দরের মাতা আরোগ্য-লাভ করিলেন। গ্রীষ্মাবকাশ ফুরাইয়া আসিল। এখন রামসুন্দর আইন পড়িতেছিল, বাক্স বিছানা পুস্তকাদির তল্পী বাঁধিয়া পুনরায় কলিকাতা যাত্রা করিল।

কলেজে তাহার সহপাঠী বিবাহিত বন্ধুরা বসিয়া নিজের নিজের শ্বশুরবাড়ীর গল্প ফাঁদিল। রামসুন্দর তাহাদের গল্পে নিজের কোন অভিজ্ঞতা যোগ করিতে পারিল না। মাঝে মাঝে বিদ্রূপের বাণ আসিয়া তাহার মস্তকে পড়িতে লাগিল। সে মুখটি চূণ করিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত ছুরীর অগ্রভাগ দিয়া পেন্সিলের মস্তকে নিজ নামের অক্ষরগুলি খোদিত করিয়া সময় কাটাইল।

এ বৎসর রামসুন্দরের আইন পরীক্ষা। পূজার ছুটীর পূর্ব্বে বাড়ীতে লিখিয়া পাঠাইল, পরীক্ষা 'নিকট, পড়াশুনার চাপ অত্যন্ত অধিক, এবার বাড়ী যাইব না।' রামসুন্দরের জননী ইহাতে প্রথমে আপত্তি করিলেন, কিন্তু তাঁহার সে আপত্তি টিকিল না। ছুটিতে রাম-সুন্দরের মেসের বাসার সকলে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিল; রামসুন্দর একা হইয়া পড়াশুনা করিতে লাগিল। দুই চারিদিন এইরূপে কাটিলে, একদিন ভোরের বেলাটায় নিদ্রাভঙ্গের পর বিছানায় পড়িয়া, হঠাৎ তাহার মস্তকে একটা মতলবের আবির্ভাব হইল, একবার এই ফাঁকে এলাহাবাদ সহরটা দেখিয়া আসিলে হয় না?—সেদিন প্রভাতে আর তাহার পড়াশুনা কিছুই হইল না। কেবল "যাব কি যাবনা"—এই ভাবনা করিতে লাগিল। অবশেষে যাইবার পরামর্শই স্থির করিল। আহারান্তে বাজারে বাহির হইয়া, স্ত্রীর জন্য নানাপ্রকার সাবান, চিরুণী, এসেন্স, সুগন্ধি তৈল, লতা-পাতা-ফুল-আঁকা চিঠির কাগজ ও খাম, দুই এক খানি গল্পের ও কবিতার বহি এবং আরও কত কি সব আমাদের স্মরণ নাই—ক্রয় করিল। সন্ধ্যার পর হাবড়ায় গিয়া, যাত্রা করিবার সংবাদ এলাহাবাদে টেলিগ্রাফ করিয়া, ডাকগাড়ীতে আরোহণ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যথাসময়ে রামসুন্দর এলাহাবাদে পৌছিয়াছে। তাহার শ্বশুর স্বয়ং ষ্টেশনে আসিয়া সাদর সম্ভাষণে প্রাণাধিক জামাতাকে গৃহে লইয়া গিয়াছেন। রাম-সুন্দরের শ্বশুরের নাম নিমাই বাবু। সে কালের অনেক লোকে নিজ নাম অদ্ভুত রকমে ইংরাজিতে বানান করিয়া থাকেন;—ইনিও নিজের নাম Nemye Loll করিয়া লিখিতেন। নিমাই বাবু বাল্যকালে মিশনারী স্কুলে পড়িতেন, কিঞ্চিৎ সাহেবী ধরণের লোক। ষ্টেশনে গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া রামসুন্দর হ্যাটকোটধারী শ্বশুরকে প্রথমে চিনিতে পারে নাই, বিবাহের রাত্রে তাঁহাকে নামাবলী গায়ে দিয়া কন্যা সম্প্রদান করিতে দেখিয়াছিল কি না! তাহার পর চিনিতে পারিয়া যখন তাঁহাকে প্রণাম করিবার উদ্যোগ করিল, তখন তিনি তাহাতে বাধা দিয়া শেক্‌হ্যাণ্ড করিয়াছিলেন। নিমাই বাবু ইংলিশ্ ডিনারের ভয়ানক পক্ষপাতী, মোগল-ডিষ্-গুলির প্রতিও তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ অল্প ছিল না। কিন্তু তাঁহার সাহেবীয়ানা বন্ধুসমাজে ও বৈঠকখানায়; অন্তঃপুরে তাহা বড় প্রশ্রয় পাইত না। সেখানে তিনি যতক্ষণ থাকিতেন, "জুজুটি" হইয়া থাকিতেন।

রামসুন্দর নূতন শ্বশুরবাড়ী আসিয়া খুব আমোদে দিন কাটাইতেছে। তাহার স্ত্রীর কোনও সহোদর বা

সহোদরা ছিল না; কিন্তু খুড়তুতো ও পিস্‌তুতো একটি দুইটি তিনটি শ্যালিকা-রত্ন সমস্ত দিন তাহাকে খেলার পুঁতুল করিয়া তুলিল। এই তিনটির মধ্যে বড়টির সম্প্রতি বিবাহ হইয়াছিল। অপর দুইটির মধ্যে একটির দুধে দাঁত ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অন্যটির মাথায় একগাছিও চুল ছিল না। সম্প্রতি রোগ-শয্যা হইতে উঠিয়া তাহার এ বিপত্তি ঘটিয়াছিল। রাম-সুন্দরের বড় শ্যালিকাটি চিরদিনই বিদেশে, তথাপি তাহার সংবাদ পাইতে বাকী ছিল না যে, ভগ্নীপতির সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা করিতে হয়। অতএব সে এই কর্ত্তব্যভার স্বীয় মস্তকে গ্রহণ করিতে নিমেষমাত্র বিলম্ব করিল না। ছোট বোন দুইটিকে লইয়া সে একটি ফৌজ নির্ম্মাণ করিয়া, রামসুন্দরের ভগ্নীপতিত্ব-দুর্গে অবিশ্রান্তভাবে আক্রমণ করিল। পানের ভিতর সুপারির পরিবর্ত্তে কয়লার গুঁড়া ভরিয়া দিয়া, জলের গেলাসে লবণ মিশাইয়া দিয়া, আল্‌তা গুলিয়া চা করিয়া দিয়া, রুমালে বাঁধা পোর্টম্যাণ্টোর চাবি হরণ করিয়া লইয়া এমন কি জুতা একপাটি পর্য্যন্ত লুকাইয়া রাখিয়া, রাম-সুন্দরকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। পরিবারস্থা একটি সুরসিকা, পরিচিত তাবৎ দম্পতীর নামে ছড়া বাঁধিয়া-ছিলেন;—রামসুন্দর ও তাহার পত্নীর নামেও বাঁধিয়া-ছিলেন। সেই ছড়াটি তিনজনে সমস্বরে আবৃত্তি করিয়া কিছুতেই ক্লান্তি মানিল না। পাঠকগণের কৌতূহল-নিবারণার্থ সেই ছড়াটি এখানে বলিতেছি।

বেল ফুলের গড়ে মালা
রামসুন্দরের সুরবালা।

এই কবিনীর অন্যান্য কবিতায় তাঁহার আরও অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। জগতের হিতার্থ তাহার দুই একটির নমুনা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

১। আমার কি হৈল
অক্ষয়ের শৈল।

২। আমি কি হয়েছি কালা (!)
যতীশের নগেন্দ্রবালা।

এইরূপে জ্বালাতন হইয়া, রামসুন্দর তাহার বড় শ্যালিটিকে বিরক্ত করিবার এক অভিনব উপায় অকস্মাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। এই বালিকাটির নাম চিরদিনই ডেমি ছিল, কিন্তু বিবাহের পর হইতে সে হঠাৎ ইন্দুবালা হইয়া গিয়াছে। এই নূতন নাম পুরাতন মেয়েটিকে মানাইয়া লইবার জন্য বাড়ীর লোকেরা সর্ব্বদাই তাহাকে ইন্দুবালা বলিয়া ডাকেন। রামসুন্দর তাহাকে দুই একবার ডেমি বলিয়া ডাকিল, তাহাতে ইন্দুবালা কিঞ্চিৎ ক্রোধের সহিত আপত্তি জানাইল। রামসুন্দর আর ছাড়িবে কেন? তাহাকে ক্রমাগত ডেমি বলিতে লাগিল। ইহাতে সেই দাঁতপড়া মেয়েটির পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল; সে এবং তাহার অনুকরণে ছোট মেয়েটি "ডেমি-ড্যাম্‌ডেমি" এই পুরাতন বিস্মৃতপ্রায় খ্যাপানটি সুর করিয়া উচ্চ স্বরে বলিতে বলিতে বাহু তুলিয়া তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিল। "কণ্টকেনৈব কণ্টকং" এই নীতিবাক্যের সার্থকতা দেখিয়া রামসুন্দর মনে মনে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিল। ইন্দুবালা প্রথম প্রথম অন্তঃপুরে গিয়া নালিশ করিতে লাগিল। কিন্তু তত্রস্থ ধর্ম্মাধিকরণেরা হাসিয়া এই মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিস্ করিতে লাগিলেন। ইহাতে বালিকার অভিমান অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। সে কাঁদিয়া ফেলিল, তাহাতে রামসুন্দর কিছু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল।

সে দিন গেল। পরদিন আবার এই অভিনয়ের সূত্রপাত হইল। আর কিন্তু ডেমি অন্তঃপুরে নালিশ করিতে গেল না। সে কিছুদিন পূর্ব্বে একখানি গল্পের বহিতে পড়িয়াছিল, কোনও লোক তাহার শ্বশুরবাড়ীতে অবস্থান করিতে করিতে বিলাত পলাইয়া যাইবার আয়োজন করে। তাহার পিতামাতা ইহা জানিতে পারিয়া সময়মত আসিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করেন। এই ঘটনা উপলক্ষে জামাই বাবুর নাকালের শেষ থাকে নাই। ইন্দুবালা ভাবিয়া চিন্তিয়া ঘরে খিল বন্ধ করিয়া একটুকরা কাগজে বামহস্তে লিখিল:—

"তোমার ছেলে বিলাত পলাইয়া যাইবার আয়োজন করিয়াছে, সাবধান।"

এই কাগজখানি খামে ভরিয়া, রামসুন্দরের পিতার নামে ঠিকানা দিয়া, দাসীহস্তে ডাকঘরে পাঠাইয়া দিল। পত্র তৃতীয় দিবসে বেলা দশটার সময় রামসুন্দরের পিতার হস্তগত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রামসুন্দরের পিতার নাম হরিবল্লভ বাবু। লোকটি সম্পূর্ণ সেকালেরও নহেন, এ কালেরও নহেন। সামান্য ইংরাজি জানেন। বয়স পঞ্চাশ। পূর্ব্বে কোথাকার নীলকুঠীতে চাকরি করিতেন। শুনা যায় সে কার্য্যটিতে তাঁহার বেশ 'দু পয়সা' ছিল। এই 'দু পয়সা' সম্বন্ধীয় কি গোলযোগে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে কর্ম্মত্যাগ করিতে হয়। এখন বাড়ীতে বসিয়া বিষয়-কর্ম্ম দেখিতেছেন। পৈত্রিক ও স্বোপার্জ্জিত জমিদারী সম্পত্তির আয় হইতে সংসারটি বেশ চলিয়া যায় এবং "কোম্পানির" কাগজের সংখ্যা প্রতি বৎসর বৃদ্ধিই হইতে থাকে।

হরিবল্লভ বাবু বৈঠকখানার ঘরে বসিয়া ঘোষেদের কন্যা-বিবাহের একটা ফর্দ্দ করিয়া দিতেছিলেন। এমন সময় উল্লিখিত পত্রখানি তাঁহার হাতে পৌঁছিল। খুলিয়া পাঠ করিয়া, তাঁহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া এ সংবাদ গৃহিণীকে অবগত করাইলেন। তিনি ত ইহা শুনিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে পাড়াময় এ কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। প্রতিবেশী, বন্ধু, আত্মীয় স্বজন অনেকগুলি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলেই বৃদ্ধকে পরামর্শ দিলেন, আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করা উচিত নহে, কলিকাতায় গিয়া, যাহাতে ছেলেকে পাওয়া যায়, সেই চেষ্টা করিতে হইবে। তৎক্ষণাৎ পাল্কীর বেহারা ডাকিতে লোক ছুটিল। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত প্রস্তুত। রামসুন্দরের পিতা অস্নাত ও অভুক্ত অবস্থাতেই যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। পাড়ার ভদ্রলোকদের অনুরোধে তাহা আর হইতে পাইল না। হরিবল্লভ বাবু গৃহদেবতাকে সজল নেত্রে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। গৃহিণী বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন, যদি মা কালী মা দুর্গার ইচ্ছায় সে এখনও বিলাত না গিয়া থাকে, তবে যেন তাহাকে বাড়ীতে আনা হয়; আর ছাই ইংরাজি পড়িয়া কাজ নাই। বামুনের ছেলে ঠাকুর পূজা করিয়া খাইবে।

হরিবল্লভ বাবু কলিকাতায় পৌঁছিয়া রামসুন্দরের বাসা খুঁজিয়া বাহির করিলেন। দরজায় চাবি বন্ধ। পাশে একটি মুসলমান দোকানদার ছিল, সে বলিল, ছুটিতে সব বাবুরাই চলিয়া গিয়াছেন, কেবল একটি বাবু ছিলেন, কয়দিন হইতে তাঁহাকেও দেখিতে পাইতেছি না।

বৃদ্ধ হরিবল্লভের দুই চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। ছেলে যে বিলাত গিয়াছে, এ বিষয়ে আর তাঁহার কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। এমনটা যে হইবে, তাহা কি তিনি কখন স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলেন? এতকাল বুকের রক্ত দিয়া যাহাকে পোষণ করিয়াছেন, সে তাঁহার এই বৃদ্ধ দশায় বুকে শেল মারিয়া বিলাত চলিয়া গেল? ভাবিলেন—আর কি সে বাঁচিয়া থাকিয়া ফিরিয়া আসিবে? যদি ফিরিয়া আসে, তবে জাতিচ্যুত, সমাজ-চ্যুত, হইয়া আসিবে; তাহাকে আর ঘরে রাখিতে পারিব না—শ্রাদ্ধের পর্য্যন্ত সে অধিকারী থাকিবে না। হয় ত একটা খৃষ্টানীকে বিবাহ করিয়া আনিবে;—এমনও ত অনেক লোকে করিয়াছে। সকলই ইংরাজি শিক্ষার দোষ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ভাবিলেন, রামসুন্দর যখন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, সেই গ্রামের স্কুলে যে মাষ্টারিটি যুটিয়াছিল, তাহা করিতে দিলে কলিকাতায় আসিয়া কুসঙ্গে পড়িয়া ছেলেটি খারাপ হইত না। বাসার দরজার বাহিরে দুই ধারে যে ইষ্টক নির্ম্মিত দুইটি বসিবার স্থান আছে, সেই খানে বসিয়া বৃদ্ধ ব্যথিতমনে এই সমস্ত চিন্তা ও অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তখন উঠিয়া ধীরপদে আশ্রয়ের সন্ধানে বাহির হইলেন। তাঁহার এক বাল্যসখা জীবনকৃষ্ণ বাবু হাইকোর্টে ওকালতী করিতেন, বাসা বাগবাজারে, তাঁহারই কাছে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন!

বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর অনেককালের পর সাক্ষাৎ হইল। উভয়ের পরস্পর কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসার পর, হরিবল্লভ বাবু নিজের বিপদের কাহিনী আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলেন। জীবনকৃষ্ণ বাবু সমস্ত শুনিয়া নীরবে কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন। পরে বলিলেন—"আচ্ছা, বিলাত গেল, টাকা পাইল কোথায়?" হরিবল্লভ, বলিলেন—"টাকা কোথায় পাইল, তাহা ত আমিও

কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" জীবনকৃষ্ণ বাবু বলিলেন—"বিলাত যাওয়া ত মুখের কথা নহে, বিস্তর টাকার প্রয়োজন। তা ছাড়া, সেখানে ত অবশ্য পড়িতে গিয়াছে, সেখানে তাহার খরচ যোগাইবে কে?" এই কথাটা শুনিয়া হরিবল্লভ বাবু যেন কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। তখন তাঁহার মনে হইল, ইহার ভিতর নিশ্চয়ই কিছু গোলযোগ আছে। পকেট হইতে বেনামী চিঠিখানি বাহির করিয়া, জীবনকৃষ্ণ বাবুর হাতে দিলেন। জীবনকৃষ্ণ বাবু পত্রখানি টেবিলের উপর রাখিয়া, দেরাজ হইতে চশমাটি বাহির করিলেন। বাতিটা একটু উজ্জ্বল করিয়া দিয়া, চশমাটি শাবরের চামড়ায় বেশ করিয়া মুছিলেন। চশমা পরিয়া উকীলোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত পত্রখানি অত্যন্ত সাবধানে পাঠ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ হাতের লেখা কার, তাহা তুমি কিছু আন্দাজ করিতে পার? অবশ্য বাম হাতের লেখা।" হরিবল্লভ বাবু "না" উত্তরসূচক শিরশ্চালন করিলেন। আরও কিছুক্ষণ গেল। জীবনকৃষ্ণ বাবু বলিলেন—"ছেলের এলাহাবাদে বিবাহ দিয়াছিলে না?" হরিবল্লভ বাবু বলিলেন—"হাঁ। কেন বল দেখি?" জীবন বাবু উত্তর করিলেন, "পত্র এলাহাবাদ থেকে এসেছে। এই দেখ এলাহাবাদের ছাপ রয়েছে।"

হরিবল্লভ বাবু সাগ্রহে বলিলেন—"তবে ত সে নিশ্চয়ই এলাহাবাদে গিয়েছে।"

জীবন বাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"শুন। হয় ত এ চিঠির কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। কোনও লোকের দুষ্টামি। কিন্তু তথাপি রামসুন্দর হটাৎ বাসা ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ হইয়া কোথায় চলিয়া গেল, তাহার মীমাংসা হয় না। নহে ত, সে বিলাত যাইবার বাস্তবিকই আয়োজন করিয়াছে। পত্রে একথা বৌমাকে লিখে থাকতে পারে অথবা এই মুহূর্ত্তে সে এলাহাবাদেই অবস্থান করিতেছে।"

হরিবল্লভ বাবু প্রস্তাব করিলেন,—"তবে এলাহাবাদে টেলিগ্রাফ্ করিয়া দিই, যাহাতে সে না যাইতে পারে।" জীবন বাবু বলিলেন, "পূর্ব্বে সংবাদ লওয়ার প্রয়োজন, সে এলাহাবাদে আছে কি না।" হরিবল্লভ বাবুও ইহাই উচিত বিবেচনা করিলেন। বলিলেন, "যদি এলাহাবাদে থাকে, তবে আবার টেলিগ্রাফ করিয়া দিব যাহাতে বিলাত না যাইতে পারে, এবং কল্যকার ডাকগাড়ীতে আমি স্বয়ং এলাহাবাদে গিয়া ছেলেকে ফিরাইয়া আনিব।"

তৎক্ষণাৎ নিমাইবাবুকে অর্জ্জেণ্ট টেলিগ্রাম প্রেরিত হইল—"রামসুন্দর ওখানে আছে কি না এবং কেমন আছে।" উত্তরের জন্যও দুই টাকা জমা করা হইল।

জীবনকৃষ্ণ বাবু বলিলেন—"যদি সে বাস্তবিকই বিলাত যাইবার ইচ্ছা করিয়া থাকে, তবে পথের মাঝে এলাহাবাদ, ওখানে না হইয়া কখনই যাইবে না। আজকালকার ছেলে কি না!—যদি এখনও না গিয়া থাকে, তবে আবার টেলিগ্রাফ করিয়া এলাহাবাদে তাহাকে আটক করান যাইবে। আর যদি কোনও উপায়ে জাহাজের ভাড়া সংগ্রহ করিয়া যাত্রা করিয়া থাকে, তবে তাহার পড়িবার খরচ তোমাকে যোগাইতেই হইবে। অদৃষ্টে থাকে ত ছেলেটা মানুষ হইয়া আসিবে।"

তখন রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। জীবনকৃষ্ণ বাবুর বারম্বার অনুরোধে হরিবল্লভ বাবু হস্ত পদাদি প্রক্ষালন করিয়া সন্ধ্যার্চ্চনায় মনোনিবেশ করিলেন।

আহারাদি শেষ হইতে এগারোটা বাজিয়া গেল। এই সময়ে এলাহাবাদ হইতে উত্তর আসিল—"রামসুন্দর এখানে আছে। ভাল আছে।"

বৃদ্ধ হরিবল্লভ এ সংবাদ পাইয়া আনন্দের অশ্রুধারা রোধ করিতে পারিলেন না। জীবন বাবুর হাতটি ধরিয়া বলিলেন—"ভাই তুমি আজ আমার যে উপকার করিলে, তাহা আমি এজন্মে বিস্মৃত হইতে পারিব না। ঈশ্বর তোমাকে ধনে পুত্রে লক্ষ্মীশ্বর করুন।"

জীবনকৃষ্ণ বাবু হাসিয়া বলিলেন—"আমি আর তোমার উপকারটা কি করিলাম!" হরিবল্লভ বলিলেন, "বিলক্ষণ! তুমি না পরামর্শ দিলেও সব বুদ্ধি কি আমার পাড়াগেঁয়ে মাথায় প্রবেশ করিত!"

তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয়বার এলাহাবাদে অর্জ্জেণ্ট

টেলিগ্রাম প্রেরিত হইল—"রামসুন্দর বিলাত পলাইবার আয়োজন করিয়াছে। তাহাকে আটক কর। আমি আসিতেছি।"

ইহার পর দুই বন্ধু রাত্রের মত পরস্পরের নিকট বিদায় লইয়া শয্যাশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মানসিক উত্তেজনা বশতঃ সমস্ত রাত্রি হরিবল্লভ বাবুর নিদ্রা হইল না বলিলেই হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরদিনের প্রভাতটি বড় সুন্দর হইয়া এলাহাবাদ সহরে দেখা দিয়াছে। পূর্ব্বদিনের মেঘ ও বৃষ্টি একবারে অন্তর্হিত। রামসুন্দর প্রাতর্ভ্রমণের পর ফিরিল। তখন বেলা ৭টা হইবে। বৈঠকখানার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহার শ্বশুর মহাশয় সেই মাত্র চা পান শেষ করিয়া আরামকেদারায় বসিয়া চুরট-সেবা করিতেছেন এবং একখানি সংবাদপত্র পাঠ করিতেছেন।

রামসুন্দর তাঁহার কাছের চেয়ার খানিতে উপবেশন করিল। জামাতাকে দেখিয়া নিমাই বাবু সংবাদ পত্রখানি টেবিলে রাখিয়া দিলেন। নেত্রলগ্ন চশমাটি ঠিক করিয়া লইয়া, চুরটটি দন্তে দংশন করিয়া, ইংরাজি ভাষায় বলিলেন—"তুমি বিলাত যাইবার ইচ্ছা করিয়াছ? বেশত—অতি উত্তম কথা।"

রামসুন্দর ইহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বোকার মত চাহিয়া রহিল।

নিমাইবাবু স্বীয় জামাতার ভাবী পদগৌরব কল্পনায় সূচিত করিয়া হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন, এবং সেই উচ্ছ্বাসে কেবল ইংরাজি কথাই বলিতে লাগিলেন। আমরা তাহার বঙ্গানুবাদ গুলিই নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

জামাতাকে নিরুত্তর দেখিয়া নিমাই বাবু বলিলেন—"আমার কাছে আর লুকাও কেন? আমি সকলই জানিতে পারিয়াছি। তুমি যে বিলাত যাইবার কল্পনা করিয়াছ, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। তুমি খরচের কি বন্দোবস্ত করিয়াছ জানিনা, হয়ত বিলাতে পৌঁছিয়া পিতাকে সংবাদ দিলে, তিনি খরচ না দিয়া থাকিতে পারিবেন না, ইহাই ভাবিয়াছ। এইরূপ কেহ কেহ করিয়াছে শুনিতে পাই। তোমার পিতা দায়ে পড়িয়া তোমাকে খরচ যোগাইবেন সত্য, কিন্তু তোমার আচরণে তিনি দুঃখিত ও রুষ্ট হইবেন এবং হয়ত ভবিষ্যতে তোমাকে মার্জ্জনা করিবেন না। তাহাতে কায নাই। আমিই তোমার সমস্ত খরচের ভার লইলাম।"

রামসুন্দর এ সমস্ত কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিল। আকাশ পাতাল ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। প্রথমে মনে হইয়াছিল, শ্বশুর বুঝি পরিহাস করিতেছেন। কিন্তু বিশেষ মনোযোগ দিয়া দেখিয়া তাঁহার মুখে, কথাবার্ত্তার ভঙ্গিতে সে ভাবের কণিকামাত্রও লক্ষিত হইল না। কি বলিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। নিমাই বাবু উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—

"তোমরা নব্যসম্প্রদায়েরা শ্বশুরের টাকা লইতে নিতান্ত নারাজ, আমি তাহা জানি। আমাদের সময়ে এরূপ ছিলনা। আমার শ্বশুর মহাশয়ই ত আমাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া, লেখা পড়া শিখাইয়া, চাকরি করিয়া দিয়াছিলেন, তিনি তাহা না করিলে আমি এতদিন কোথায় থাকিতাম? আমার একমাত্র কন্যা। আমার যাহা কিছু আছে তাহা সমস্তই ভবিষ্যতে তোমার হইবে। তুমি তোমার নিজের টাকায় বিলাতে শিক্ষাব্যয় নির্ব্বাহ কর। আজ কাল যে দিন সময় পড়িয়াছে, তাহাতে এখানে থাকিয়া আর কিছুই হয় না। সুতরাং মনে কোনও প্রকার দ্বিভাব করিয়ো না।"

তখন রামসুন্দর মনে করিল, "বাঃ, এত মন্দ নয়! শ্বশুরের অর্থে যদি একটা "কেষ্ট-বিষ্ণু" হইয়া আসিতে পারা যায়, তবে সে সুযোগ ছাড়ে এমন হস্তিমূর্খ কে আছে?" প্রকাশ্যে সাহস করিয়া গম্ভীরভাবে বলিল—

"আমি বিলাত যাইব আপনি কেমন করিয়া জানিলেন?"

নিমাই বাবু পকেট হইতে টেলিগ্রাম্ দুই খানি বাহির করিয়া, হাসিতে হাসিতে রামসুন্দরের হাতে দিলেন। রামসুন্দর সে দুইটি আদ্যোপান্ত নিরীক্ষণ করিয়া ভাবিল—"আর কিছুই নয়, বাবা কোনও কার্য্য উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়া আমাকে দেখিতে পান নাই। অনুসন্ধান করিয়াছেন, কেহ তাঁহাকে মিথ্যা কথা বলিয়া একটু মজা দেখিতেছে। বাল্যকাল হইতেই আমার বিলাত যাইবার ঝোঁক, ইহা তিনি অবগত আছেন, এইজন্য একথা সহজেই বিশ্বাস হইয়াছে। যাহা হউক, তিনি নিশ্চয়ই আমাকে ধরিতে আসিবেন। সুতরাং আর কাল-বিলম্ব করা উচিত নহে।" শ্বশুরকে বলিল—

"বাবা ইহাতে রাগ করিবেন, মা কাঁদিবেন, এমন কায করা কি আমার উচিত?"

নিমাই বাবু একটু যেন উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—"কোন্ পিতা কোন্ সন্তানের উপর রাগ না করেন?-আর কান্না ত স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক ধর্ম্মই। তোমার পিতা এখানে আসিলে তাঁহাকে আমি ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিব। বলিব আমিই তোমাকে পাঠাইয়াছি, তোমার ইহাতে কোন দোষ নাই। বরং প্রথমে তুমি অসম্মত ছিলে। আর তাঁহার সহিত সুরবালাকে পাঠাইয়া দিব। তোমার মা বধূকে পাইয়া পুত্রবিচ্ছেদ-শোকে সান্ত্বনা-লাভ করিবেন। যখন তুমি মনে জানিতেছ, এ কাজ গর্হিত নয়, ইহার ভাবীফল সর্ব্বাংশে শুভই হইবে, তখন একটু আধটু অসুবিধা ও সেণ্টিমেণ্টালিটির জন্য কায হারান নিতান্ত বোকামি।"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া, অল্প হাসির ভূমিকার সহিত বলিলেন—"আর তোমার উপর তোমার সে পিতার অপেক্ষা আমার অধিকার বেশী—কারণ আমি হইলাম ফাদার্-ইন্-লা;—আমিই তোমার আইনসংগত পিতা।" এই বলিয়া তিনি হোঃ—ওহ্—ওহ্ করিয়া উচ্চহাস্য করিলেন, এবং নির্ব্বাপিত চুরটটি পুনর্ব্বার প্রজ্জ্বলিত করিয়া স্বচ্ছন্দমনে সতেজে ধূমপান করিতে লাগিলেন।

সেই দিন বৈকালে দুই তিন ঘণ্টা কাল রামসুন্দর শ্বশুরের সহিত দোকানে দোকানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পোষাক পরিচ্ছদ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করিল। সন্ধ্যার পর এক পরিচিত সাহেব ব্যারিষ্টারের নিকট নিমাই বাবু তাহাকে লইয়া গেলেন। তাঁহার কাছে বিলাতে বাস করা সম্বন্ধে নানা প্রকার উপদেশ এবং কয়েকখানি পরিচয় পত্র পাওয়া গেল। জাহাজে স্থান রাখিবার জন্য বোম্বাইয়ে টেলিগ্রাফ্ করা হইল। সেই দিন রাত্রেই তিনটার মেল্‌ট্রেণে রামসুন্দর সাহেব সাজিয়া যাত্রা করিল।

কোনও রূপ বিদ্রোহাশঙ্কায় এই সংবাদ অন্তঃপুরে প্রচারিত হইল না। নিমাই বাবু গৃহিণীকে বড়ই ভয় করিতেন। মেয়েরা জানিলেন, রামসুন্দর কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়াছে। কিন্তু পরদিনই হরিবল্লভ বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সকল কথা ফাঁস হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণের জন্য অন্তঃপুরে বিলক্ষণ কোলাহল উত্থিত হইল। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি, ইন্দুবালা এই ব্যাপার সম্বন্ধে একটি কথাও বলে নাই।

সুখের বিষয়, হরিবল্লভ বাবুকে ঠাণ্ডা করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না। বেহাই তাঁহার পুত্রের জন্য অত টাকা খরচ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, বেহাইয়ের উপর রাগ করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। বিশেষতঃ নিমাই বাবু এবং তাঁহার বন্ধুগণ বৃদ্ধকে ভাল করিয়া বুঝাইলেন, বিলাতে প্রবাসকালে অথবা পথে কোনও বিপৎ সম্ভাবনা নাই, কোনও ভয় নাই, কোনও চিন্তা নাই, কত লোক যাইতেছে, ইত্যাদি।

পূর্ব্বপরামর্শমত সুরবালাকে তাঁহার সঙ্গে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

উপসংহার।

আমরা গল্পলেখকেরা বিধাতার বরে অনেক অসাধ্য সাধন করিতে পারি বটে, কিন্তু আমাদেরও ক্ষমতার একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে। বিলাত-ফেরত ব্যক্তিগণ আমাদের গল্পের বিষয়ীভূত হইলে, তাঁহাদিগকে মিষ্টার ছাড়া অন্য কিছু বলা আমাদের সেই ক্ষমতাসীমার অতীত। মিষ্টার রামসুন্দর বিলাত হইতে ফিরিয়া বোম্বাই হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। দুই বৎসরেই বেশ পসার জমিয়া গিয়াছে। পিতা মাতা পুত্রের সম্পদে তাহার পূর্ব্বকৃত অপরাধ বিস্মৃত হইয়াছেন। একটা জাঁকাল রকমের প্রায়শ্চিত্ত ক্রিয়ায় সমাজও রামসুন্দরকে মার্জ্জনা করিয়াছেন।

আপাততঃ মার্জ্জনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু কন্যার বিবাহের সময় কোনও গোল উঠিবে কিনা বলা যায় না। রামসুন্দর দেশের বাড়ীতে চাবি বন্ধ করিয়া পিতা মাতাকে মাঝে মাঝে লইয়া আসেন, কিন্তু এখানে গঙ্গা নাই বলিয়া তাঁহারা অধিক দিন থাকিতে চাহেন না।

এক বেনামী চিঠিই যে তাঁহার বিলাত যাওয়ার মূল সূত্র, তাহা রামসুন্দর অনেক দিন জানিতে পারিয়াছেন। কিন্তু তাহার লেখককে বহু চেষ্টাতেও আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। আমাদের পাঠিকাগণের প্রতি ইন্দুবালার বিশেষ অনুরোধ, যদি কখনও তাঁহারা নিমন্ত্রণসমাজে তাহার সুরি দিদির সহিত মিলিত হন, তবে যেন কথায় কথায় এটা প্রকাশ করিয়া না ফেলেন।

একটি প্রার্থনা।

হে ঈশ্বর, আমি কভু দেখিনি তোমারে ;
বড় সাধ দেখি একবার।
ভক্তি দিয়ে, প্রেম দিয়ে, হৃদয় ভরিয়া
বড় সাধ পূজি একবার।
কহ নাথ, কহ নাথ, কোথা দেখা দিবে,
কি মূরতি গ্রহণ করিয়া ?
কি বাসে আবরি অঙ্গ, কোন কণ্ঠস্বরে
চিত্তে দিবে সুধা সঞ্চারিয়া ?

আমি কহি, এস তুমি তার রূপ ধরি,
যে আমার প্রণয়-প্রতিমা।
তা হ'লেই আঁখি মোর ডুবিবে তোমাতে
নাহি লভি সৌন্দর্য্যের সীমা।
তা হ'লেই হৃদয়ের সারভক্তি প্রভু
দিতে পারি চরণে তোমার।
তা হ'লেই হৃদয়ের সারাৎসার প্রেম
দিতে পারি পূজা-উপহার।

এমনি করিয়া যদি দেখা দিতে পার,
দেহ তবে দেহ তবে নাথ।
নহিলে থাকুক্ ;—হায়, ফিরাব কি শেষে
দিয়ে শুধু শুষ্ক প্রণিপাত ?
জানি মহার্ণব তুমি ;—জলকণিকা সে ;—
তবু প্রভু কেমনে তোমায়
হারাইয়া ফেলিলাম তাহার মাঝারে ?
লীলা তব কি বিচিত্র হায় !

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

জাগ্রত স্বপন।

ঘুমে অচেতন ; যেন কোন দূরদেশ হ'তে,
কা'র কণ্ঠস্বর আসি পশিল শ্রবণে।
সহসা ভাঙ্গিল ঘুম। শান্তিময়ী নিশা,
কক্ষ অন্ধকারময়—নীরব নিঝুম ;
তবু বাজিতেছে কাণে, কোমল মধুর
সেই স্বর। ত্রস্ত হ'য়ে বাতায়ন পাশে
দাঁড়াইনু ; অস্তমান রবিকর মাখা
বিশাল বারিধিমত রয়েছে পড়িয়া,
জ্যোৎস্না-মাখা মাঠখানি সম্মুখে আমার।
অদূরে কে যায় অই, এ নিশীথকালে,
মৃদুমন্দ-পদক্ষেপে একাকিনী বালা ;
শশীকরস্নাত কোমল মু'খানি তার
ফিরায়ে আমার পানে হাসিল মধুর
এতটুকু। মুদিত নয়ন ; নিমেষেতে
মেলি আঁখি, দেখি, চুমিতেছে চন্দ্রকর
দূর্ব্বাময়ী শ্যামতনু স্থির অচঞ্চল।

শরচ্চন্দ্র।

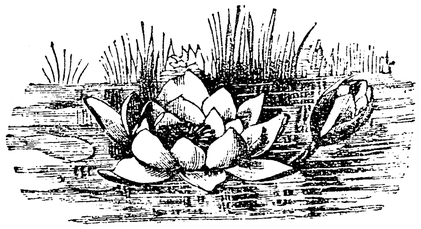

পুলগাঁওয়ে সূর্য্যগ্রহণ।

গ্রহণ দর্শনের প্রয়োজন।—রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করিয়া ও সমূহ পথকষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক দূর দেশান্তর হইতে বৈজ্ঞানিকগণ ভারতে কিরূপ তত্ত্ব নির্ণয়ার্থ আগমন করিয়াছেন, তাহা জানিবার জন্য পাঠকবর্গের স্বতঃই কৌতূহল উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। নিম্নে কয়েকটী বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আভাস দেওয়া যাইতেছে।

সূর্য্য পৃথিবী হইতে ৯২৫ লক্ষ মাইল, কিন্তু চন্দ্র কেবলমাত্র ২॥ লক্ষ মাইল দূরে। পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে, কিন্তু চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে। চন্দ্র ঘুরিতে ঘুরিতে অমাবস্যার দিন সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে আসিয়া পড়ে। কোন কোন সময়ে এমন হয় যে, চন্দ্র আমাদের চক্ষু ও সূর্য্যের ঠিক মধ্যে আসিয়া পড়ে এবং চন্দ্র অস্বচ্ছ হওয়াতে আমরা সূর্য্যের আলোক দেখিতে পাই না। সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া আমাদের দুই তিন হাত অন্তরে কোন গোলাকার পদার্থ রাখিলে যেমন সূর্য্য ঢাকিয়া যায়, সেইরূপ চন্দ্র মধ্যে আসিয়া পড়াতে আমাদের চক্ষু আর সূর্য্যকে দেখিতে পায় না, তখনই লোক সূর্য্যগ্রহণ হইতেছে বলিয়া থাকে। প্রায় ২৬০ লক্ষ চন্দ্র একত্র করিলে সূর্য্যের আয়তনের সমান হইতে পারে। চন্দ্র পৃথিবী হইতে যত দূরে, তার প্রায় ৪০০ গুণ দূরে সূর্য্য। চন্দ্র এত নিকটে থাকাতে এত ক্ষুদ্র হইয়াও সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলে। অমাবস্যার দিন চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীর দিকে পতিত হয়। এবার ২২শে জানুয়ারি শনিবার চন্দ্র যখন পশ্চিমদিক হইতে ক্রমে সূর্য্যের ঠিক নীচে আসিতেছিল, তখন চন্দ্রের এক ছায়া ক্রমে আফ্রিকা ও আরব মহাসাগর হইতে আসিয়া বোম্বাইয়ের প্রায় ১০০ মাইল দক্ষিণে রত্নগিরি নামক স্থানের নিকট দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। রত্নগিরি ও সেতারা জেলা হইয়া নিজাম রাজ্যের উত্তরাংশ ও বেরার প্রদেশের অমরাবতী ও ওয়ার্দ্ধা জেলা দিয়া নাগপুরে আসে। তৎপর মিউনি, মাণ্ডলা জেলা দিয়া বাঘেলখণ্ড প্রদেশ হইয়া কাশীর নিকটে আসে। শেষে গাজিপুর, সারণ, মতিহারী ইত্যাদি জেলার মধ্য দিয়া দার্জ্জিলিংএর প্রায় ৫০ মাইল উত্তর দিয়া তিব্বতে চলিয়া যায়। ন্যূনাধিক ৫০ মাইল বিস্তৃত স্থানে চন্দ্রের এই ছায়া পতিত হইয়াছিল, অর্থাৎ পূর্ণগ্রাস হইয়াছিল। সেই "অভ্রভেদী দেব আত্মা" পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ গৌরীশঙ্কর বা Mount Everest ও কয়েক মিনিটের জন্য এই ছায়ার অন্তর্ভূত ছিল। ভারতের মানচিত্রের উপর এই ছায়াপথ অঙ্কিত হইলে দেখা যায়, যেন ভারতবর্ষ এক উত্তরীয়স্কন্ধে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পূর্ণগ্রাস হইলে পরও কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্রমণ্ডলের চারিদিকে একপ্রকার জ্যোতিঃ দেখা যায় ; ইংরাজিতে ইহাকে Corona বলে। যদিও এ জ্যোতিঃ সূর্য্যমণ্ডল সংযুক্ত বলিয়া জানা গিয়াছে, তথাপি ইহার স্বরূপ, উৎপত্তির কারণাদি বিশেষ তত্ত্ব এখনও সম্যকরূপ জ্ঞাত হওয়া যায় নাই। পূর্ণগ্রাসের সময় চন্দ্রমণ্ডলের এদিকে ওদিকে ঐ জ্যোতির অন্তর্ভূত কতকগুলি রক্তবর্ণ উচ্চ উচ্চ কি পদার্থ দেখা যায়, ইহাদিগকে ইংরেজিতে Red prominences বলে। ইহারা যে সূর্য্যমণ্ডল হইতে উদ্ভূত এবং চন্দ্রমণ্ডলস্থ নহে তাহা বেশ বুঝা যায়, কেননা ঐ সময়ে চন্দ্রের গতির সহিত ইহাদের গতি দেখা যায় না, বরং ঐ গুলি চন্দ্রের দ্বারা আবৃত হইতেই দেখা যায়। তুমি আমি হয়তঃ বলিতে পারি যখন ইহারা আমাদের ইষ্টানিষ্ট কিছুই করিতেছে না, তখন ইহারা রাহুর দংশনচিহ্নই হউক বা সূর্য্যমণ্ডলস্থিত অন্য কোন পদার্থই হউক, অর্থ ব্যয় করিয়া বিদেশে গমন পূর্ব্বক ইহাদিগের দিকে তাকাইয়া থাকিবার আবশ্যকতাটা কি ? তুমি আমি যাই বলি, জ্যোতির্ব্বিদেরা কিন্তু ইহাদিগের তত্ত্ব জানিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল ও উৎসুক। পাঠক মহাশয়েরা বোধ হয় জানেন আলোক-বিশ্লেষণ (Spectroscopic analysis) দ্বারা গগনমণ্ডলস্থিত প্রায় যাবতীয় গ্রহ উপগ্রহ ও নক্ষত্রাদির উপাদান পদার্থগুলি নির্ণীত হইয়াছে ; এমন কি কোন্ পদার্থ কত উত্তাপে রহিয়াছে, তাহাও জানা যাইতে পারে ও গিয়াছে। সূর্য্যমণ্ডলে নিম্নলিখিত মূলপদার্থের অবস্থিতি জানা গিয়াছে ;—Sodium, Iron, Calcium, Magnesium, Chromium, Nickel, Barium, Zinc, Cobalt, Hydrogen, Manganese, Titanium, Aluminium, Lead, Cadmium, Palladium, Malybdenum ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত রৌপ্য, টিন প্রভৃতি আরো কতকগুলি ধাতুর অস্তিত্ব সন্দেহ করা হইতেছে। এখন যদি ঐ রক্তবর্ণ পদার্থগুলির আলো বিশ্লেষণ করিয়া

এতদতিরিক্ত ধাত্বাদির অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের চিন্তাশক্তি ব্যবহারের বিস্তৃত ভূমি পাওয়া যায়। এই সব তত্ত্ব সন্দর্শন পূর্ণগ্রাসের সময় ভিন্ন অন্য কোন সময় হইতে পারে না। তাই কোন জ্যোতির্ব্বিৎ বলিয়াছেন, "সূর্য্য আপন আলোক দ্বারা আমাদিগকে জগতের যে সকল সৌন্দর্য্য দেখাইতেছেন, হয় ত সেই আলোক দ্বারাই আবার নিজের অধিকতর সৌন্দর্য্য আমাদের চক্ষুর বহির্ভূত করিয়া রাখিয়াছেন। সূর্য্যালোকের হ্রাস না হইলে আমরা তাহার দিকে তাকাইতেই পারি না। ঘটনাচক্রে চন্দ্রের অনুগ্রহে আমরা মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু দেখিয়া লই।"

পূর্ণগ্রাসের সময় চন্দ্রের বহির্ভাগে ছোট ছোট মালার ন্যায় যাহা দেখা যায়, তাহাদিগকে Baily's Beads বা বেলি সাহেবের মালা বলে। বেলি সাহেবই সর্ব্বাগ্রে তৎপ্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এতদ্বিষয়ে পণ্ডিতেরা বলেন, চন্দ্রের উপরিভাগে যে পাহাড় আছে, সেই পাহাড়ের মধ্যে সূর্য্যের আলো দেখা যায় বলিয়াই এইরূপ দেখায়। পূর্ণগ্রাসের সময় চন্দ্রমণ্ডলের তিন চারিদিকে চক্ষু ঝলসিয়া যায়, এমন তিন চারিটা কিরণধারা দেখা যায়। তাহাদিগকে Streamers বলে; ইহাদের উৎপত্তির কারণ নির্ণীত হয় নাই।

সৌর জগৎ সম্বন্ধে আমাদের আজ পর্য্যন্ত যাহা জানা আছে তদনুসারে বুধগ্রহই সূর্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে। লেবেরিয়ে সাহেব বুধগ্রহের পথ গণনা করিয়া দেখিতে পান যে, যখন বুধ সূর্য্যের অপেক্ষাকৃত নিকট আসে তখন তাহার গতির ব্যতিক্রম হয়; যতগুলি গ্রহ জানা আছে তাহাদিগের আকর্ষণ দ্বারা বুধের ঐ গতির ব্যতিক্রম ব্যাখ্যা করা যায় না। পণ্ডিতগণ এই বাক্যের সত্যতা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। সুতরাং ঐ ব্যতিক্রম ব্যাখ্যার জন্য সূর্য্য ও বুধের মধ্যে অন্য একটী গ্রহের অস্তিত্ব অনুমিত হইয়াছে। সেই গ্রহের Vulcan নাম দেওয়া হইয়াছে। নামকরণ ত হইয়াছে, কিন্তু এপর্য্যন্ত কেহ তাহাকে দেখিতে পান নাই। গ্রহণের সময় সূর্য্যালোক হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে পণ্ডিতেরা সেই Vulcan গ্রহেরও অন্বেষণ করিয়া থাকেন।

সূর্য্যগ্রহণের সময় চারিটী স্পর্শ বা সংযোগ ঘটিয়া থাকে। প্রথম, চন্দ্র যখন পশ্চিম দিক্ দিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া সূর্য্যকে স্পর্শ করে। দ্বিতীয়, চন্দ্র ক্রমে যখন সূর্য্যের পূর্ব্বদিকের অতি ক্ষুদ্রতম শেষ আলোকটুকুও গ্রাস করিয়া ফেলে অর্থাৎ যখন পূর্ণ গ্রাস আরম্ভ হয়। তৃতীয়, যখন পশ্চিমে সূর্য্যের অতি ক্ষুদ্র অংশ দেখা দেয় অর্থাৎ পূর্ণ গ্রাস শেষ হয়। চতুর্থ, যখন চন্দ্র সূর্য্য হইতে পৃথক হয়।

এই চারিটী স্পর্শের সময় শুদ্ধরূপে দেখিয়া রাখিলে পঞ্জিকার জন্য চন্দ্রের স্থান সংশোধন করা যাইতে পারে। এখনও আমেরিকা ও ইংলণ্ডের পঞ্জিকায় চন্দ্রের স্থান ও গতি পরিমাণ সম্বন্ধে অনৈক্য রহিয়াছে। এমন কি ১৮৭৮ সালের ২৯শে জুলাই তারিখে আমেরিকায় যে সূর্য্যের পূর্ণ গ্রহণ হয়, তখন ইংলণ্ডের পঞ্জিকা দ্বারা গণিত চন্দ্রের ছায়া হইতে আমেরিকার পঞ্জিকা দ্বারা গণিত ছায়ার প্রায় ৩॥ মাইল ব্যবধান ছিল। চারিটী স্পর্শের সময় অতিশয় সাবধানতার সহিত অর্দ্ধ সেকেণ্ডও ভুল না হয় এমন ভাবে দেখিয়া রাখিলে, পঞ্জিকাস্থ চন্দ্রের স্থান গণনা দ্বারা সংশোধিত করা যায়। সূর্য্যগ্রহণের সময় চারিটী স্পর্শের সময় খুব সাবধানতার সহিত উত্তম বিশুদ্ধ ঘড়ী দ্বারা দেখিয়া রাখা হয়।

গ্রহণের পূর্ব্বে পরিপক্ক খাদ্যদ্রব্যাদি অব্যবহারোপযোগী ও পরিত্যক্তব্য বলিয়া যে ভারতের কোন কোন স্থানে হিন্দুদের সংস্কার রহিয়াছে, তাহার একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার আবশ্যক হইলে এইরূপ দেওয়া যায়। গ্রহণের পূর্ব্বে পঞ্জিকাস্থ চন্দ্রসূর্য্যের স্থান ও তৎসম্বন্ধীয় ফলাফল জ্যোতিষজ্ঞ হিন্দুদিগের নিকট আর কার্য্যকরী থাকিত না। গ্রহণ দর্শন দ্বারা পঞ্জিকা সংশোধনপূর্ব্বক পূর্ব্ব গণিত সমস্ত ফলাফল পরিবর্জ্জন ও নূতন গণনারম্ভ সূচনার্থ হিন্দুদিগের এই 'সনাতন' প্রথা চলিয়া আসিতেছে।

গ্রহণ দর্শনের আয়োজন:—গ্রহণের সময় কি কি বিষয় নির্ণয় করা হয় পাঠকবর্গকে সংক্ষেপে তাহা বলা হইল। এখন এবারকার গ্রহণের সময় কোথা হইতে কে কে আসিয়াছিলেন এবং কোন্ স্থানে "কেম্প" করিয়াছিলেন তত্তৎ বিষয় কিছু বর্ণনা করা যাইতেছে। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ১৮ই আগষ্ট তারিখে আর একবার ভারতে পূর্ণ গ্রহণ হইয়াছিল, কিন্তু তখন এইরূপ আয়োজন হয় নাই; তখন চন্দ্রের ছায়া রত্নগিরি হইতে নিজাম রাজ্যের মধ্য দিয়া মসলিপত্তন ও রাজমহেন্দ্রী হইয়া বঙ্গোপসাগরে চলিয়া গিয়াছিল।

বিলাতের Royal Society ও Royal Astronomical Society দ্বারা গঠিত "যুক্ত স্থায়ী গ্রহণ সমিতি" (Joint Permanent Eclipse Committee) নামক এক সভা আছে। সেই সভা হইতে সভাপতি ক্রীষ্টি সাহেব (W. H. M. Cristie, M. A. F. R. S Astronomer Royal), প্রতিনিধি সভাপতি লক্‌ইয়ার সাহেব (Sir J Norman Lockyer F. R. S), ও সম্পাদক হিল্‌স্ সাহেব (Captain E. H. Hills R. E.) বর্ত্তমান সূর্য্য গ্রহণ দর্শনাভিপ্রায়ে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ক্রীষ্টি সাহেব সাদোলে, সার নর্ম্মেন লক্‌ইয়ার বিজয়দুর্গে ও কাপ্তান হিল্‌স পুলগাঁওয়ে কেম্প করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন জাপান, আমেরিকা ও বিলাতের অন্যান্য সভা হইতেও বৈজ্ঞানিকগণ আসিয়াছিলেন। বোম্বাই হইতে বেহার পর্য্যন্ত প্রায় ৭টী স্থানে কেম্প করা হইয়াছিল।

১। বিজয়দুর্গ:—বোম্বাইয়ের প্রায় ১০০ মাইল দক্ষিণে সমুদ্রতীরে রত্নগিরি নামক জিলার অন্তর্গত বিজয় দুর্গ স্থান। এই স্থানে সার নর্ম্মেন লক্‌ইয়ার আপন কেম্প স্থাপন করিয়াছিলেন। "মেলপোমিনি" নামক জাহাজ সার নর্ম্মেনের সাহায্য করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিল। সেই জাহাজের কাপ্তান, কর্ম্মচারী ও নাবিক সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ১২৯ জন লোক গ্রহণ দর্শনের সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহারা ২১ ভাগে বিভক্ত হইয়া এক এক বিভাগের যন্ত্র দ্বারা গ্রহণের তত্ত্বনিরূপণ ও আপন আপন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে পারিয়াছিলেন। আলোক বিশ্লেষণ প্রণালার প্রায় ৬০ খানা প্রতিকৃতি উঠান হইয়াছিল। সবগুলিই খুব ভাল ও মূল্যবান হইয়াছে। এই স্থানেই সার নর্ম্মেনের পুত্র ডাক্তার লক্‌ইয়ার, ভারত গবর্ণমেণ্টের Meteorological Reporter ইলিয়ট সাহেব (J. Eliot, C. S. I., F R. S.,) ও কলিকাতার অধ্যাপক পেড্‌লার সাহেব সার নর্ম্মেনের নানারূপ সাহায্য করিয়াছিলেন। রত্নগিরির মাজিষ্ট্রেট ও পূর্ত্ত বিভাগের কর্ম্মচারী সকল সার নর্ম্মেনের আদেশ মত যখন যা আবশ্যক তখন তা সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

২। জিউর—(Jeur) এই কেম্প পুনার ৬০।৭০ মাইল পূর্ব্বে জি, আই, পি রেলওয়ের জিউর নামক ষ্টেষনের নিকট; শোলাপুর জিলার অন্তর্গত। এখানে পুনার বৈজ্ঞানিক কলেজ হইতে অধ্যাপক নাইগমভালা (Prof. K. D. Naegamvala) আসিয়াছিলেন। আমেরিকার লিক মানমন্দির হইতে অধ্যাপক কেম্বেল (Prof. W. W. Campbell) ও তাঁহার সহচরবর্গ এইস্থানেই কেম্প করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত জাপান হইতে অধ্যাপক টারো (Prof. Taero) ও অধ্যাপক হিরমায়া (Prof. Hiramaya) ও তাহাদের দুইজন সাহায্যকারী আসিয়াছিলেন। জিউর কেম্পের ২ মাইল দক্ষিণে Mr. C. Burckhalter, Major Harkne-s, Captain Dugan ইত্যাদি কয়েক জন দর্শক কেম্প করিয়াছিলেন। কোলাপুরের মহারাজা অধ্যাপক নাইগম্‌ভালা ও অধ্যাপক আপ্তের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। অধ্যাপক নাইগম্‌ভালা ৩০ খানা প্রতিকৃতি উঠাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে ১৫ খানা খুব ভাল হইয়াছে।

৩। তাল্লি—এই কেম্প অমরাবতীর নিকটে। জি, আই, পি রেলওয়ে লাইন হইতে অল্প দূরে। এখানে British Astronomical Society র মণ্ডার, থোয়েট্‌স্ ও এভারষেড্ (Mr. E. W. Maunder, Mr. C. Thwaites ও Mr. Evershed) সাহেব কেম্প করিয়াছিলেন। অন্যান্য স্থানের ন্যায় এইখানেও আকাশ খুব পরিষ্কার থাকাতে সকল কার্য্যই আশানুরূপ হইয়াছিল। এই কেম্প পুলগাওয়ের প্রায় ৬ মাইল পশ্চিমে স্থিত।

৪। পুলগাও—পুলগাও জি, আই, পি রেলওয়ের একটী ষ্টেষন। ষ্টেষনের প্রায় ১ মাইল উত্তরে এক মাঠের মধ্যে এই কেম্প স্থাপিত হইয়াছিল। এখানে "যুক্তস্থায়ী গ্রহণ সমিতির" সম্পাদক কাপ্তান হিল্‌স্ ও কেম্ব্রিজের নিউয়াল (Mr. Newal) সাহেব আসিয়াছিলেন। ইহাদের সাহায্যের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট কাপ্তান কানিংহাম সাহেবকে পাঠাইয়াছিলেন। আমরাও এই কেম্পের কার্য্য করিবার জন্য দেরাদুন হইতে গিয়াছিলাম। ওয়ার্দ্ধা জেলার মাজিষ্ট্রেট, এসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট, সিভিলসার্জ্জন ইত্যাদি সকলই সেখানে তাম্বু করিয়াছিলেন। সিভিল সার্জ্জন একজন বাঙ্গালী। এই কেম্পের কার্য্য পরে বিবৃত হইবে।

৫। সাদোল—সোহাগপুরের অন্তর্গত বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের সাদোল ষ্টেষনের নিকটে এই কেম্প স্থাপিত

হইয়াছিল। এই স্থানে ইংলণ্ডের রাজকীয় জ্যোতির্ব্বিৎ ক্রীষ্টি সাহেব ও অধ্যাপক টার্ণার (Professor H. H. Turner F. R. S.) যন্ত্রাদি লইয়া আসিয়াছিলেন। মান্দ্রাজ মানমন্দিরের মিকিস্মিথ (Mr. C. Michie Smith) সাহেবও এখানে আসিয়াছিলেন। ক্রীষ্টি সাহেব ৭ খানা বড় প্রতিকৃতি পূর্ণগ্রাসের সময় উঠাইয়াছিলেন এবং অধ্যাপক টার্ণার ১২ খানা। এখানে দর্শকরূপে ভারতীয় বড় বড় ইংরাজ কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন। ভারতীয় জরীপ বিভাগ হইতে মেজর বরার্ড এই কেম্পের সকল বন্দোবস্ত করিবার জন্য ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সাদোলের নিকটে গগ্রা নামক স্থানে Dr. Copeland প্রতিকৃতি উঠাইবার জন্য উপস্থিত ছিলেন।

৬। বক্সর—ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ের বক্সার নামক ষ্টেষনের সন্নিকটে এই কেম্প স্থাপিত হইয়াছিল। British Astronomical Association "ইংলণ্ডীয় জ্যোতির্ব্বিদ্যা সভা" হইতে পাদ্রি বেকন সাহেব (Rev. J. M Bacon) এখানে প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং উৎকৃষ্ট প্রতিকৃতি উঠাইতে পারিয়াছিলেন। এখানে অনেক সংখ্যক দর্শকও নানাদিক হইতে আসিয়া সমবেত হইয়াছিলেন।

৭। ডুমরাঁওন—ভারতীয় জরীপ বিভাগের এসিষ্টেণ্ট সার্ভেয়ার জেনেরল পোপ সাহেব এখানে গ্রহণের প্রতিকৃতি উঠাইবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। তৎসঙ্গে প্রেসিডেন্সী কলেজের লিট্‌ল সাহেব ও কলিকাতা হইতে জ্যোতিষজ্ঞ কুচলর সাহেব আসিয়াছিলেন। লিট্‌ল সাহেব চারিটী স্পর্শ সময় দেখিয়া লিখিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং পোপ সাহেব ৯ খানা প্লেট দ্বারা গ্রহণের প্রতিকৃতি উঠাইতে পারিয়াছিলেন। প্রতিকৃতিগুলি ভালই হইয়াছে। ডুমরাওনের মহারাণী ও তাঁহার মেনেজার ফক্‌স সাহেব গ্রহণ দর্শনের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এখানকার সকল দর্শকই মহারাণীর অতিথিস্বরূপ ছিলেন।

অধ্যাপক লিট্‌ল সাহেব ৪টী স্পর্শের যে সময় দর্শন করিয়াছিলেন তাহা এই :—

	ঘ.	মি.	সে.	
১ম স্পর্শ—	০	৩২	৫৫	এই সময় স্থানীয় ঘড়ির সময়।
২য় স্পর্শ—	১	৫৮	২৫	Latitude—25 – 35 – 5N
৩য় স্পর্শ—	২	০	৪	Longitute—5^h – 36^m – 33^s 4E
৪র্থ স্পর্শ—	৩	১৬	৩৩	

পুলগাঁওয়ে আমাদের কার্য্য।—আমরা রবিবার অপরাহ্নে পুলগাঁওয়ে পঁহুছি। পরদিন সোমবার ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ স্পর্শের সময় গণনা করা হয়। দেখা যায় ১১ ঘটিকা ৫৫ মিনিটের সময় গ্রহণ লাগিবে; প্রায় ১॥ ঘটিকার সময় পূর্ণগ্রাস আরম্ভ, ১ মিনিট ৫৫ সেকেণ্ড পূর্ণগ্রাসের স্থিতি এবং অপরাহ্ন প্রায় ৩॥ টার সময় মোক্ষ।

তিনটী নানারূপ ফটোগ্রাফ লওয়ার সুবৃহৎ যন্ত্র বিলাত হইতে আনিয়া তিন ঘরে স্থাপিত হইতেছিল। উপযুক্ত ভাবে স্থাপন করিতে অনেক সময় লাগে। তাই কাপ্তান হিল্‌স ও নিউয়াল সাহেব সারাদিন খাটিয়াও তখন পর্য্যন্ত যন্ত্রগুলি যথাযথ ভাবে স্থাপন করিতে পারেন নাই। আমাদিগকে বলা হইল যন্ত্রগুলি স্থাপিত হওয়া মাত্রই আমরা চারিজন ও কনিংহাম সাহেবের কর্ম্মচারী দুইজন এই ছয় জন সাহায্যকারীর স্ব স্ব কার্য্য নির্ণীত হইবে এবং পূর্ব্বে কয়েক দিন ক্রমাগত অভ্যাস করিয়া আপন আপন কার্য্যে পটুত্ব লাভ করিতে হইবে।

পুলগাঁও ওয়ার্দ্ধা জিলার অন্তর্গত একটী রেলওয়ে ষ্টেষন। ষ্টেষনের এক মাইল উত্তরে এক মাঠের মধ্যে এই কেম্প স্থাপিত হইয়াছিল। ওয়ার্দ্ধা নদীর উপর রেলওয়ের এক পুল আছে; এই পুলের নামানুসারেই এই স্থানের নাম পুলগাঁও হইয়াছে। এখানে ওয়ার্দ্ধা জেলার ডেপুটী কমিষনর, এসিষ্টাণ্ট কমিষনর, সিভিল সার্জ্জন ইত্যাদির তাম্বু পড়িয়াছিল। এতদ্ব্যতীত কাপ্তান কানিংহাম, কাপ্তান হিল্‌স ও নিউয়াল সাহেব সস্ত্রীক আসিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের জন্য অনেকগুলি তাম্বুর আবশ্যক হইয়াছিল। বাবুদের জন্য, খালাসী পুলিস ইত্যাদির জন্যও অনেকগুলি তাম্বু পড়িয়াছিল। গ্রহণ দর্শনের জন্য প্রায় ১৴ বিঘা পরিমাণ স্থান চারিদিকে বেড়া দিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। একদিকে মাত্র একটা দ্বার রাখা হইয়াছিল, তাহাতে দিবারাত্র পুলিস পাহারা থাকিত। এই বিঘা পরিমাণ স্থানে একটা তাম্বু, একখান বস্ত্রনির্ম্মিত ঘর ও চারিখানা চাটাই নির্ম্মিত ঘর প্রস্তুত হইয়াছিল। চারিখানা চাটাই নির্ম্মিত ঘরের একখানায় তাপমান যন্ত্রাদি রাখা হইয়াছিল; অন্য তিনখানায় গ্রহণের সময় ফটোগ্রাফ লওয়ার তিনটী সুবৃহৎ যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছিল। একটাতে কাপ্তান কানিংহাম ও অন্য দুটীতে কাপ্তান হিল্‌স ও

নিউয়াল সাহেব দর্শকরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিলেন। তাম্বুতে নানাবিধ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, সূত্রধরের অস্ত্রশস্ত্রাদি ও আনা লওয়ার বাক্সগুলি থাকিত। বস্ত্রনির্ম্মিত ঘর ফটোগ্রাফ উঠাইয়া তাহা ধৌত করিবার জন্য বিশেষ ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

বুধবার দিন অভ্যাস করিবার জন্য আমাদিগকে ডাকা হইল। কানিংহাম সাহেবের কর্ম্মচারী ২ জন জোরে জোরে সেকেণ্ড গণিতে নিযুক্ত হইলেন। আমাদের মধ্য হইতে কানিংহাম সাহেবকে সাহায্য করিতে ২ জন, এক জন নিউয়াল সাহেবকে ও এই প্রবন্ধের লেখক কাপ্তান হিল্‌স্ সাহেবকে সাহায্য করিতে নিযুক্ত হইলেন। আমাদের কার্য্য মোটে ১ মিনিট ৫৫ সেকেণ্ডের জন্য ছিল। প্রত্যেক ঘরের বাহিরে বড় বড় এক একটা আয়না ছিল। সেই আয়নার সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ীর মত যন্ত্র সংলগ্ন ছিল, যেন সেই আয়না সূর্য্যের দিকে মুখ রাখিয়া সর্ব্বদা চলিতে পারে। আয়নায় সূর্য্যালোক পতিত হইলে সেই আলো প্রতিবিম্বিত হইয়া যন্ত্রের ভিতর দিয়া গিয়া প্রতিকৃতি উঠিত। ঘরের মধ্যে থাকিয়া সেই প্রতিবিম্বিত আলো উন্মুক্ত করা ও আচ্ছাদন করাই আমাদের কার্য্য ছিল। ১ মিনিট ৫৫ সেকেণ্ডের মধ্যে অনেকগুলি ফটোগ্রাফ উঠাইতে হইবে। এক এক খানা প্লেট বিভিন্ন সময়ের জন্য উন্মুক্ত করিতে ও আচ্ছাদন করিতে হইবে বলিয়াই ভুল ভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

কাপ্তান হিল্‌সের নিকট আলোক বিশ্লেষণ-প্রণালীর যন্ত্র ছিল। ঘরের বাহিরে যে আয়না ছিল তাহার প্রতিবিম্ব ঠিক রাখিবার জন্য লেফটেনাণ্ট বিজলী আয়নার কাছে বসিয়া সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া ছিলেন ও সেই আয়নাসংলগ্ন ঘড়ির এদিক্ ওদিক্ ঠিক করিতেছিলেন। সেই আয়না হইতে আলো প্রতিফলিত হইয়া এই লেখক যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেখানে অতি সূক্ষ্ম এক ছিদ্রে আসিয়া পড়িত; সেই ছিদ্র দ্বারা কতকগুলি কাচের Prism এর মধ্য দিয়া লেখক হইতে ৫।৬ হাত দূরে যেখানে কাপ্তেন হিল্‌স্ অবস্থিত ছিলেন সেখানে গিয়া রামধনুর মত সপ্তবর্ণরূপে প্রকাশিত হইত। ইহারই প্রতিকৃতি লইবার জন্য কাপ্তেন হিল্‌স্ আসিয়াছিলেন। কাপ্তান হিল্‌সের স্ত্রীও নিকটে অবস্থিত থাকিয়া আপন জেব ঘড়ী দ্বারা প্রতিকৃতি লওয়ার সময় দেখিয়া ও লিখিয়া রাখিতেন। একখানা কাগজের বোর্ড দ্বারা সেই সূক্ষ্ম ছিদ্র একবার উন্মুক্ত করা ও অন্যবার আচ্ছাদন করা এই লেখকের কার্য্য ছিল। মধ্যে একবার একখানা পাতলা সূক্ষ্মছিদ্রবিশিষ্ট পিতলের পাত যন্ত্রের মুখ হইতে উঠাইয়া বিপরীত ভাবে পুনরায় সেই মুখে বসাইয়া দিতে হইত। ইহা উপযুক্তরূপে অতি অল্প সময়ের মধ্যে করিতে হইত। অভ্যাসের একদিন সেই পাত প্রবেশ করাইতে বিলম্ব হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া ভয় ছিল পাছে গ্রহণের দিনও সেইরূপ হইয়া পড়ে। গ্রহণের সময় অন্ধকার হইলে পাছে সেই ছিদ্র না দেখিতে পাই, সেই জন্য পূর্ব্বেই আলোর বন্দোবস্ত করিয়া রাখা হইয়াছিল। পূর্ণ গ্রাস আরম্ভ হইলে পর ১৫ সেকেণ্ডের মধ্যে ৭ খানা প্রতিকৃতি উঠাইয়া প্রায় এক মিনিটের জন্য অন্য একখানা উদ্‌ঘাটিত রাখিয়া পূর্ণ গ্রাসের শেষভাগে অন্য ৭ খানা প্রতিকৃতি উঠান হইয়াছিল। পূর্ণগ্রাস আরম্ভ হইবার প্রায় ৫ মিনিট পূর্ব্বে কাপ্তান কনিংহাম বলিতেন—Ready (প্রস্তুত হও), কয়েক সেকেণ্ড পূর্ব্বে বলিতেন Stand by (আপন আপন স্থানে স্থির থাক), তৎপর বলিতেন Go (আরম্ভ কর)। এই Go বলিবামাত্রই metronome নামক সেকেণ্ড গণিবার যন্ত্র চালাইয়া দেওয়া হইত। এবং সেই টিক্ টিক্ শব্দের সহিত মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া একজন বাবু জোরের সহিত এক, দুই করিয়া সেকেণ্ড গণিতে আরম্ভ করিতেন। ৬০ পর্য্যন্ত গণা হইলে অন্য বাবুটী গণিতে আরম্ভ করিতেন। এই সময়ে প্রত্যেক ঘরে নিঃশব্দে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট কাজ সময়ানুসারে করা হইত। কাপ্তান কনিংহাম Go বলিবামাত্রই আমাদের ঘরে কাপ্তান হিল্‌স আমাকে expose বা উদ্‌ঘাটন করিতে সঙ্কেত করিতেন; এক সেকেণ্ড পরেই আবার আমায় close বা আচ্ছাদন করিতে হইত। এইরূপ ৭।৮ বার করিলে পর এক মিনিটের প্লেট দেওয়া হইত। তখন এক মিনিটের জন্য আমার ছুটী। ছুটীর পর আবার পূর্ব্ববৎ ৭।৮ বার উদ্‌ঘাটন ও আচ্ছাদন করিতে হইত। এই এক মিনিট সময়ের মধ্যে আমি একবার গ্রহণের দিকে চাহিয়াছিলাম। গ্রহণের এ দৃশ্য অবশ্য কখনই দেখি নাই এবং এজন্মে আর দেখিব কি না তাহাও জানি না। যাহা দেখিলাম তাহা বোধ হইল যেন বৈদ্যুতিক আলো চন্দ্রের

তিন দিকে লম্বভাবে জ্বলিতেছে; তাহাতে চক্ষু ঝলসিয়া যাইতেছিল। ইহাই কিরণ ধারা বা streamers এর আলো। আমাদের ঘরে আমরা ৫ জন ছিলাম। কাপ্তান হিল্‌স্‌ ও তদীয় পত্নী, লেফটেনাণ্ট বিজলী, অন্য একজন লেফটেনাণ্ট ও লেখক। নিউয়েল সাহেবের ঘরে নিউয়েল সাহেব, তদীয় পত্নী, এসিষ্টেণ্ট কমিশনর ও দেরাদুনের এক বাবু। সকলেরই কিছু না কিছু কাজ নির্দ্দিষ্ট ছিল। নিউয়াল সাহেবের পত্নী আপন স্বামীর সহিত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন।

পূর্ণগ্রাসের সময় অতীত হওয়া মাত্রেই প্লেটগুলি সুরক্ষিত করিয়া একে একে সকলেই বাহিরে আসিলেন। যেরূপ অন্ধকার হইবে ভাবিয়াছিলাম, সেরূপ হয় নাই। পূর্ণিমা রাত্রের ন্যায় আলো ছিল।

শনিবার পূর্ণগ্রাসের সময় আমাদের স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন হওয়াতে মনে যে এক অপার আনন্দ হইয়াছিল, তাহা অক্ষর দ্বারা ব্যক্ত না করিলেও পাঠক মহাশয়েরা অনুভব করিতে পারিবেন। হাজার হাজার টাকা ব্যয় করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা এদেশে যে কার্য্যের জন্য আসিয়াছিলেন, আমাদের ভ্রমবশতঃ যদি সেগুলি পণ্ড হইয়া যাইত, তবে কত না লজ্জা ও দুঃখের কারণ ছিল। পূর্ণগ্রাসের সময় প্রকৃতি যে অল্পক্ষণের মধ্যে আপন পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া এক কৃষ্ণবর্ণ আবরণে আপন মুখ আচ্ছাদন করেন, তাহা দেখিয়া কাহার না বক্ষঃস্থল দুরদুর করিতে থাকে? সেই সময়ে মনুষ্য মাত্রেরই ভ্রম ভ্রান্তি হওয়া সম্ভবপর। যাহা হউক কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়াতে মনে মনে ঈশ্বর-চরণে সকৃতজ্ঞ একটী প্রণাম করিলাম। পরে সাহেবেরা সানন্দ অন্তরে জ্ঞাপন করিলেন যে, সকলের কাজই সুচারু রূপে সম্পাদিত হইয়াছে। এখন প্রত্যেকে আপন তাম্বুতে গমন করিতে পারেন। সকলের এক সঙ্গে ফটোগ্রাফ্‌ লওয়া বাঞ্ছনীয়, সুতরাং সকলেরই ৪॥ঘটিকার সময় আসিতে চেষ্টা করা উচিত। আমরা বিশ্রামান্তে ৪॥টার সময় 'মানাগারে' চলিলাম। সেখানে কয়েকজন নিম্ন সাহেব কর্ম্মচারী মাটীতে বসিয়া পড়িলেন। মেমেরা ও উচ্চ কর্ম্মচারী সাহেবেরা চেয়ারে বসিলেন। আমরা তৎপশ্চাৎ দাঁড়াইয়া রহিলাম। এইরূপ অবস্থানের পর ফটোগ্রাফ্‌ উঠান হইল। গ্রহণ দর্শন কার্য্য তো সম্পন্ন হইল। এখন এতৎ সম্বন্ধীয় তত্ত্ব নির্দ্ধারণে যে কতকাল লাগিবে, তাহা কেহ বলিতে পারে না।*

ছেলেকে বিলাতে পাঠাইব কি?

আমরা বাঙ্গালী, সঙ্গতি থাকিলে এবং ছেলে যদি বুদ্ধিমান হয় ত তাহাকে বিলাতে পাঠাই। সঙ্গতি না থাকিলে কর্জ্জ করিয়াও পাঠাই। অনেককাল এরূপ পাঠাইয়া আসিতেছি। এখন আমার বিবেচনায় লাভালাভ বিচার করিবার সময় হইয়াছে।

ছেলে ভাল হইবে, ভাল কর্ম্ম করিবে, কিম্বা ভাল উপার্জ্জন করিবে, ইহাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। উপার্জ্জনক্ষম হইয়া আমাদের সহায়তা করিবে, এ কথা তত মনে হয় না। অনেক সময় তাহার আবশ্যকও হয় না। দেশের, জাতির উপকার হয় কিনা সে কথাটাও একবার ভাবিয়া দেখিতে হয়।

উপকার না হইবার কোন কথা নাই। এত বড় যে ইংরেজ জাতি তাহাদের ঘরে বৎসর কয়েক বাস করিলে, তাহাদের কাছে শিখিলে, যথেষ্ট উপকার হওয়ার কথা। এদেশে ইংরেজ দেখিলে সমস্ত জাতির সম্বন্ধে অনেকগুলা কুসংস্কার জন্মিয়া যায়। এই সব শ্বেতাঙ্গ, ভ্রুকুটিকুটিল লোহিত মুখ গুলা দেখিলে কুম্ভকর্ণ বিভীষণকে যতটা ঝটিতি মনে পড়ে, রাম লক্ষ্মণকে তত শীঘ্র মনে পড়ে না। কিন্তু ইংরেজ জাতি আসুরিক গুণপ্রধান নহে। পৃথিবীর পঞ্চমাংশ সুশাসিত করা বল, বিক্রম ও অসাধরণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয়, কিন্তু দেব লক্ষণও এই জাতিতে সম্পূর্ণ বর্ত্তমান। এই বহুগুণসম্পন্ন, মহিমান্বিত জাতির দেশে বাস করিলে যে উপকার হয় না, এ কোন কথাই নহে।

যে ছেলে বিলাতে গিয়া সিভিলিয়ান হয়, তাহার প্রবাস সার্থক, কেন না জেলার মাজিষ্ট্রেট হইলেই একটা মহকুমার শাসনকর্ত্তা হইল, রাজত্বের অংশীদার হইল। যে চক্ষে আমরা এ কথাটা দেখি, সে চক্ষে সে দেখে কি না আমার কিছু সন্দেহ হয়। আর কতকগুলা বিষয়ে বিলাত প্রত্যাগত বাঙ্গালীর ছেলেগুলি সব এক রকম।

* স্থানাভাবে এই প্রবন্ধটির অনেক মনোরম অবান্তর কথা পরিবর্জ্জন করিতে হইয়াছে। সম্পাদক।

আমরা না কি নিতান্ত দেশী, কখন বিলাতে যাই নাই, সেইজন্য হয়ত অকারণে এই বিলাত ফেরত নব্য যুবকগুলির প্রতি বিদ্বেষ করি। কতক পরিবর্ত্তন হওয়া যে অবশ্যম্ভাবী, সেজন্য আমাদের বিরক্ত হওয়া উচিত নয়, এ কথাটা তত স্মরণ রাখি না। দোষ আমাদের যথেষ্ট আছে। ঘরের টাকা খরচ করিয়া, ঘরের ছেলেকে বিলাতে পাঠাইয়া, সেই ছেলে ফিরে আসিলে তাহাকে ঠেলিয়া রাখি, ঘরে ঢুকিতে দিই না, সমাজে তাহাকে চালাই না। মূর্খতা আর কতদূর গড়াইতে পারে? যদি বিলাতে পাঠাইলে ছেলেকে এক ঘরে করিতে হইবে, তাহা হইলে তাহাকে পাঠাইবার আবশ্যক কি? একে ত বিলাতে ঠাণ্ডা লাগিয়া ছেলেটার নাসিকা ঈষৎ কুঞ্চিত হয়, তারপর ঘরে ফিরিলে তাহাকে অস্পৃশ্য বিবেচনা করিয়া যদি তাহাকে কানাচে দণ্ডায়মান করাই, ও সে চলিয়া গেলে গোবর জল ছড়া দিই, তাহা হই[illegible] সে যদি আর বড় একটা আমাদের তোয়াক্কা না র[illegible] ত আমাদের রাগ করা অন্যায়।

তা ছাড়া [illegible] বিলাতে গেলে যে শিক্ষা হয় তাহাতে আমাদের প্র[illegible] পারিবারিক একতার মূল উৎপাটিত হইয়া যায়। আমাদের এই যে একান্নবর্ত্তিতা, শতপদ অলসগামী তেঁতুলে বিছার মত বহুপ্রাণী সমষ্টিকে এক পরিবার জ্ঞান, বিলাতে সে বালাই নাই। থাকিলে হয়ত পৃথিবীর প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত ইংরেজের রাজপতাকা উড়িত না। বিলাতে পারিবারিক বন্ধন শিথিল, প্রত্যেক ব্যক্তি স্বোপার্জ্জিত ধন দ্বারা নিজের স্ত্রী-পুত্রকে পালন করিবে ইহাই আদর্শ। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া বাঙ্গালীর ছেলে পুঁই শাক ও কুচা চিংড়ী-মাছের চড়্‌চড়ি, কলাইয়ের দাল ও ভাত খাইয়া, মাথা গুঁজিয়া বহু পরিবারের মধ্যে বাস করিবার জন্য যে অত্যন্ত উৎসুক, এরূপ মনে করা ভ্রম। এমন অবস্থায় তাহাকে বুকে টানিয়া আবার ঘরের ছেলে না করিয়া লইলে, তাহার পর হইয়া যাওয়া বিচিত্র নহে।

অতএব আমাদের যে দোষ নাই এমন কথা আমি বলি না। কিন্তু আমাদের দোষে বিলাত ফেরত ছেলেদের দোষ ঢাকে না। আমরা প্রাচীন, তাহারা নব্য; আমরা আশাহীন, তাহারা দেশের ভরসা। তাহাদের শিক্ষায়, উদ্যমে, দেশের জাতির মঙ্গল হওয়া উচিত। না হইলে, বৃথা ব্যয় করিয়া তাহাদিগকে দূর প্রবাসে পাঠাই। বিলাতে গিয়া এ দেশের কুসংস্কারগুলা দূর হইবার কথা; উত্তম উত্তম শিক্ষা হইবার কথা। ইংরেজি শিক্ষা পাইয়া বাঙ্গালীর ছেলে ভাল বাঙ্গালী হইয়া আসিবে, এ কথা বুঝিতে পারি। বিলাতে গিয়া বাঙ্গালীর ছেলে খারাপ সাহেব সাজিয়া আসিবে, এ কথা মোটেই বুঝিতে পারি না।

এই সাজের কথাটা শুনিতে যত ছোট, বাস্তবিক তত সামান্য নয়। ইহার ভিতর একটা মস্ত জাতীয়তার কথা নিহিত আছে। কোন দেশে, কোন শাস্ত্রে, কোন সমাজে, কোন জাতিতে, কোথাও এমন কথা নাই যে বিদেশে, ভিন্ন জাতির কাছে বিদ্যাভ্যাসের জন্য বা চাকরীর প্রত্যাশায় বাস করিতে হইলে আপনার জাতির, আপনার দেশের পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া সেই দেশের, সেই জাতির পরিচ্ছদ ধারণ করিতে হইবে। আবশ্যক হয়, যতদিন সেই দেশে বাস, ততদিন সেই দেশের বাস পরিধান করিবে। স্বদেশে ফিরিলে আবার পূর্ব্বের মত বেশ করিবে। যদি বিলাতে গিয়া তাহার পর বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ হয়, সেই জন্য ইংরেজের বেশ; তাহা হইলে শিক্ষা দেওয়া দূরে থাকুক, অশিক্ষাই একমাত্র লাভ। যদি এমন কথা হয় যে, সাহেবের বেশ ধারণ না করিলে সাহেব-সমাজে পসার হয় না, সেও কোন কাজের কথা নয়; কেননা বাঙ্গালী সাহেবের সঙ্গে মিশিলেও বাঙ্গালী, না মিশিলেও বাঙ্গালী।

এদিকে, আমরা বড় লজ্জা পাই। সাহেবের পোষাক বিলাতে গেলেও ধারণ করা যায়, না গেলেও ধারণ করা যায়, কিন্তু সাহেব সাজিলে কে কোন জাতি চেনা দুষ্কর। বাঙ্গালীর ছেলে সাহেব সাজিলে কেহই তাহাকে ইংরেজ মনে করে না, কেন না বেশের সঙ্গে চামড়া বদল হয় না, স্বভাবও পরিবর্ত্তন হয় না। হয় এইমাত্র, যে বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী না মনে করিয়া নানা রকম অন্য ভ্রম হয়। মেটে ফিরিঙ্গী, গোয়াবাসী, বোম্বে অঞ্চলের হোটেলের "বয়", এ রকম নানা সন্দেহ হয়। কিন্তু এ সব চেয়ে বাঙ্গালী শ্রেষ্ঠ, এ কথা সহজেই স্বীকৃত হইবে। ফল দাঁড়ায় এই যে, বাঙ্গালী সাহেব সাজিলে কেহই তাহাকে বাঙ্গালীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জাতি মনে করে না, নিকৃষ্ট বলিয়া অনেকের ভ্রম হয়।

তাহার পর, আমাদের এই বিলাত ফেরত ছেলেগুলির মনের ভাব বুঝিয়া দেখ। মনে কর, তোমার ছেলেটীকে তুমি বিলাতে পাঠাইলে, সে সিভিলিয়ান হইয়া আসিল। তাহার পর সে সাহেব সাজিয়া সাহেবের মত থাকে। সিভিলিয়ান অধিকাংশই ইংরেজ, সে তাহাদেরই একজন হইতে চায়। পাকে প্রকারে সে ইংরেজ সিভিলিয়ান-দিগকে বুঝাইতে চায়, "দেখ, আমি বাঙ্গালী বলিয়া তোমরা আমায় ঘৃণা করিও না। বাঙ্গালী বলিয়া আমি নিজে অত্যন্ত লজ্জিত। দুর্ভাগ্য বশতঃ বাঙ্গালীর কালো বর্ণটা কোন মতেই কটা করিতে পারি না, কিন্তু আর যতদূর সম্ভব প্রাণপণে ইংরেজ হইবার চেষ্টা করিব। ইংরেজের মত কাপড় পরিব, টুপী পরিব, ইংরেজের মত মেজাজ করিব, তোমরা যদি ষোল আনা সাহেবিয়ানা কর ত আমি আঠার আনা করিব। আমি যে বাঙ্গালী, এ কথা তোমরা ভুলিয়া যাও, আমাকেও নিজের মত ইংরেজ মনে কর।"

কিন্তু এরূপ মনের ভাব মোটেই হওয়া উচিত নয়। যদি বাঙ্গালীর ছেলে সিভিলিয়ান হইয়া আমাদের দেশের গৌরব স্বরূপ হইতে চায় ত তাহাকে এরূপ ভাবে থাকিতে হইবে, যাহাতে তাহার মনোভাব অন্যরূপ প্রকাশ পায়। ইংরেজদিগকে বুঝাইতে হইবে, "দেখ, আমি ইংরেজ নই, খাটি বাঙ্গালী। আমি কেবল রাজকর্ম্ম করিতেছি না, দেশেরও সেবা করিতেছি। যে বাঙ্গালীকে তোমারা এত অবজ্ঞা কর, সেই বাঙ্গালী আমি। সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া, তোমাদের দেশে কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, অনেক ইংরেজকে পশ্চাতে রাখিয়া সিভিলিয়ান হইয়াছি। ইংরেজ বলিয়া পরিচয় দিবার আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই।"

দিবার কোন আবশ্যকও নাই। সকল সিভিলিয়ান সাহেব সাজে না, না সাজিলে সম্মান বাড়ে বই কমে না। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম সিভিলিয়ান, তাঁহার মাথায় কেহ কখন ইংরেজী টুপী দেখে নাই, চোগা চাপকান পরিয়াই তিনি প্রকাশ্য সমাজে উপস্থিত হন। তিনি সর্ব্বত্র যেরূপ সম্মানের সহিত কর্ম্ম করিয়াছেন, এরূপ কয়জন দেশী সিভিলিয়ান করিয়াছেন? তাঁহার মত বাঙ্গালী সিভিলিয়ান হইলে আজ আমাকে এতগুলা ভাল মন্দ কথা বলিয়া কাহারও বিরক্তিভাজন হইতে হইত না।

বাঙ্গালী ছাড়া অন্য জাতিও এদেশে সিভিলিয়ান হইয়াছে। তাহাদের ত সাহেব সাজিবার এত ঝোঁক নাই। শ্রীপদ্ বাবাজী ঠাকুর দক্ষিণ দেশীয় ব্রাহ্মণ, সিভিলিয়ান হইয়া সাহেব হন নাই। বাড়ীর ধুতি ও পুনার চটি জুতা পরিয়া থাকিতেন, কাছারীতে ও বাহিরে টুপী কিম্বা পাগড়ী পরিতেন। ইংরেজের সঙ্গে মিশিবার জন্য কিছুমাত্র ব্যস্ত হইতেন না, ব্রাহ্মণের তেজ পূর্ণ মাত্রায় ছিল। কয়েক বৎসর হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। দুইজন নব্য পঞ্জাবী সিভিলিয়ান হইয়াছে—একজন হিন্দু, আর একজন মুসলমান। ইহারাও ইংরেজী টুপি মাথায় দেয় না।

আর একজনের কথা বলি। দাদাভাই নৌরোজী সিভিলিয়ান নন, কিন্তু সে জন্য বোধ হয় তাঁহাকে কেহ নিতান্ত হাল্কা লোক মনে করে না। তিনি ইংলণ্ডে ত্রিশ চল্লিশ বৎসর বাস করিয়াছেন, সেখানে ই[illegible]রজী পোষাক পরিতে হয়। কিন্তু দেশে আসিলে [illegible]াইতে জাহাজ হইতে নামিবার পূর্ব্বেই বেশ পরিবর্ত্তন [illegible]ন—বহুকাল পূর্ব্বে পার্সীদের যে বেশ ছিল, সেই বে[illegible]ারণ করেন। পার্লামেণ্টের মেম্বর হইয়া যখন এদেশে আসিয়াছিলেন, তখনও সেই রকম। সেই সৌম্যমূর্ত্তি ভারতসন্তানকে দেখিবার জন্য লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল।

একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই বেশের কথা তত সামান্য মনে হয় না। ইহাতে মানুষের অস্থিমজ্জাগত প্রকৃতি বুঝিতে পারা যায়। বুঝিতে পারা যায় যে, বাঙ্গালীর ছেলে যেরূপ তরল, চপল, শক্তিশূন্য, অনুকরণপ্রিয় এরূপ আর কোন জাতি নয়। 'কাক আছি কাক থাকিব, ময়ূর সাজিব না' এই যে একটা জাত্যভিমান এটা বাঙ্গালীর বড় অল্প। সেই জন্য কোন দিকেই শিকড় বাঁধে না, কোন কথা শক্ত করিয়া ধরিতে পারে না। আমাদের ছেলেগুলি বুদ্ধিমান হউক, মানসিক বলশূন্য, দৃঢ়তার লেশ মাত্র নাই। উত্তপ্ত দ্রব ধাতুর মত ঢলিয়া, গড়াইয়া বেড়ায়; যে ছাঁচে ঢাল সেই রকম হয়। ধাতুটাও মূল্যবান নয়। তরল পিত্তলের মত ছেলেটী বিলাতী ছাঁচে পড়ে, বিলাতী মোহর লাগিয়া, বিলাতী বেশ ধরিয়া মনে করে বুঝি বিলাতী গিনি হইলাম। পিত্তল যে সোণা হয় না, সে কথা ভুলিয়া যায়; ওজনে কত তফাৎ সেটা মনে রাখে না।

বোঝে না যে খাঁটি তামার পয়সা ভাল, পিত্তলের মেকি মোহর কিছু নয়।

সুতরাং লাভের চেয়ে লোকসানের ভাগ বেশী মনে হয়। কিন্তু হাজার যাহাই করুক বাঙ্গালীর ছেলে বাঙ্গালীই থাকে। বিলাতে শিক্ষা নিষ্ফল হয় না, ঘুরিয়া ফিরিয়া নিজের দেশের দিকে, নিজের জাতির দিকে মন ঝুঁকিবেই। আজ না হয় কাল, না হয় দশ বৎসর পরে যে বাঙ্গালী সেই বাঙ্গালী হইবে। বাঙ্গালী সিভিলিয়ানের সংখ্যা বাড়ুক আমাদের সর্ব্বদাই ইচ্ছা এবং চেষ্টা। অতএব ছেলে ভাল হইলে তাহাকে বিলাতে পাঠাইব।

আশার আরও কথা আছে। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত বাঙ্গালী সিভিলিয়ানদিগের অগ্রগণ্য। দুইজনেই রাজকর্ম্ম হইতে অবসর লইয়াছেন। দুইজনেই স্ব স্ব ক্ষমতামত দেশের কাজ করিতেছেন। আমরা এই যে যথাকিঞ্চিৎ রাজনৈতিক আন্দোলন করি, শতকরা নিরানব্বই জন সিভিলিয়ান তাহার উপর হাড়ে চটা। ইহাদের সঙ্গে সত্যেন্দ্র বাবু পঁয়ত্রিশ বৎসর ও রমেশ বাবু ছাব্বিশ বৎসর কর্ম্ম করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের মনোভাব কিছুমাত্র বিচলিত বা পরিবর্ত্তিত হয় নাই। আমাদের এই সর্ব্বসিভিলিয়াননিন্দিত রাজনৈতিক আন্দোলনে দুইজনে পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত যোগ দিয়াছেন। রমেশ বাবু বিলাতে স্বদেশের জন্য যে কাজ করিতেছেন, কয়জন তাহা পারে? বঙ্গের এমন সুসন্তানদ্বয়কে যদি কেহ মেকি বলে ত তাহার মুখে ছাই! বাঙ্গালী সিভিলিয়ান মাত্রেই ইহাদিগকে আদর্শস্বরূপ জ্ঞান করিবে, ক্ষমতা থাকে ত ইহাদের পদানুসরণ করিবে। অতএব বাঙ্গালী সিভিলিয়ানের সংখ্যা যত বাড়িবে ততই দেশের মঙ্গল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার

M. D., D. L., C. I. E. *

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

য়্যালোপ্যাথি মতে চিকিৎসা হইতে ডাক্তার সরকার কিরূপে হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা কার্য্যে প্রণোদিত হইয়াছিলেন, আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। সত্যানুরাগ এবং বিশ্বাসের জন্য যাঁহারা ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করেন, তাঁহাদিগকে যে নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয়, ইহা সকলেরই পরিচিত। কিন্তু বিজ্ঞানের একাংশ অপেক্ষা অপরাংশের উপকারিতা অধিক, ইহা স্বীকার করিলে যে নিপীড়িত হইতে হয়, তাহা বোধ হয় অনেকে অবগত নহেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ডাক্তার সরকারকে চিকিৎসা বিষয়ে মত পরিবর্ত্তনের জন্য বহু ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল। নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি বলে তিনি এক্ষণে তাঁহার স্বদেশীয়দিগের অগ্রণীরূপে দণ্ডায়মান হইয়াছেন; কিন্তু এক্ষণেও তাঁহার অনেক সমব্যবসায়ী "তিনি হোমিওপ্যাথ" কেবল এই মাত্র অপরাধে তাঁহার প্রতি ঈর্ষা-কলুষিত দৃষ্টিক্ষেপ করিতে ত্রুটী করেন না। কয়েক বৎসর হইল, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভা কর্ত্তৃক মেডিকেল ফ্যাকল্টীর সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি হোমিওপ্যাথ বলিয়া, তাহা তাঁহার সমব্যবসায়ীগণের সহ্য হয় নাই। তাঁহারা তাঁহাকে মেডিকেল ফ্যাকল্টী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া আপনাদিগের কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। ডাক্তার সরকার এসম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারকে যে দুই খানি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা অতি সুযুক্তি পূর্ণ এবং আত্মমর্য্যাদা প্রকাশক। * মেডিকেল ফ্যাকল্টী তাঁহার যুক্তি

---

* গতবারে অনবধানতাবশতঃ বিজ্ঞান সভায় জষ্টিস্ দ্বারকানাথের স্বীকৃত সাহায্য ৪০০০৲ টাকা স্থলে ১০০০৲ লিখিত হইয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার অকাল মৃত্যুতে বিজ্ঞান সভা এই স্বীকৃত সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই।

* দ্বিতীয় পত্রের উপসংহার স্থলে আপনার সমস্ত বক্তব্যের মর্ম্ম স্বরূপ তিনি লিখিয়াছিলেন :—

First. I indeed asked the Senate to remove my name at once from the Faculty of medicine, if the Faculty should declare that I have forfeited their confidence by virtue of my having exercised my right as physician, a right, which, I maintained, involved liberty of reason and of conscience to search and to avow truth. The Faculty have not said so, and it is for the senate to judge whether they ought, under such circumstances, to remove my name.

Second. The question is not a mere personal matter. If it had been so, if the Faculty had made it so, which very properly they have not done, nothing would have given me greater pleasure than to relieve my brethern of the Faculty of the pain from a thorn in their side.

Third. I submit, the question is much broader than a mere personal one. It affects not my place alone on the Faculty, it affects the place of all present and future members of the Senate and of the Faculties. It affects freedom of thought and inquiry not only in medicine; but in all the subjects which come within the curricula of the Univercity. And thus it affects not only the character of the Faculty but it affects the character of the University itself.

খণ্ডন বা তাঁহার পত্রের উত্তর দিতে পারেন নাই। উত্তর দিবারও তাঁহাদিগের কিছু ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অযোগ্য সঙ্কীর্ণতা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহারা ডাক্তার সরকারকে নিষ্কাষিত করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল ফ্যাকল্টীতে নাম না থাকায়, তাহা ডাক্তার সরকারের বা ফ্যাকল্টীর, কাহার পক্ষে অধিক অগৌরবজনক হইয়াছে, বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রেই এক্ষণে তাহা বুঝিতে পারিতেছেন।

ডাক্তার সরকার চিকিৎসক, সুতরাং চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁহার মত ব্যক্ত করা প্রয়োজনীয়। প্রচলিত চিকিৎসা প্রণালী সমূহের মধ্যে হোমিওপ্যাথির শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিলেও তিনি অন্যান্য প্রণালীর উপকারিতা অস্বীকার করেন না। একদেশদর্শিতা সকল বিষয়েই নিন্দনীয়; বিশেষতঃ চিকিৎসা—যাহার উপর মনুষ্যের জীবন মরণ নির্ভর করে—তাহাতে একদেশদর্শিতার ন্যায় অনিষ্টকর আর কিছুই হইতে পারে না। পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের গুরু ও পিতা হিপক্রেটিস্ বলিয়াছেন, "diseases are sometimes cured by contraries, sometimes by similars and sometimes by medicines which have neither similitude nor antagonism." ডাক্তার সরকার বলেন, "ইহাই প্রত্যেক চিকিৎসকের অনুসরণীয় হওয়া কর্ত্তব্য; প্রচলিত সমস্ত চিকিৎসা প্রণালীরই মূল এই কয়টা কথায় নিবদ্ধ আছে। আমাদিগের শাস্ত্রকারগণ যে বলিয়াছেন,

"তদেব যুক্তং ভৈষজ্যং যদারোগ্যায় কল্পতে।
সচৈব ভিষজাং শ্রেষ্ঠো রোগেভ্যো যঃ প্রমোচয়েৎ॥"

ইহা স্মরণ রাখিলে হোমিওপ্যাথ বা য়্যালোপাথ, কবিরাজ বা হেকিম, ইহাদিগের পরস্পরের মধ্যে বিবাদের সম্ভাবনা থাকে না। ধর্ম্মে এবং নীতিতে যেমন, বিজ্ঞানেও তেমনই সত্য প্রতিষ্ঠিত হউক, ইহাই সকলের লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। সুতরাং সত্যানুরোধে কেহ কোন মত পরিবর্ত্তন করিলে, তাঁহার প্রতি ঈর্ষা বা উপেক্ষা প্রদর্শন কর্ত্তব্য নহে।" *

যিনি তাঁহার স্বদেশীয়দিগের মধ্যে বিজ্ঞান-চর্চ্চার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চেষ্টা এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, কিরূপে তাঁহার নিজের চিত্ত বিজ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা অবগত হইতে পাঠকের কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। বাল্যকাল হইতেই ডাক্তার সরকারের প্রকৃতি অনুসন্ধানেচ্ছু ও কৌতূহল-পরবশ ছিল। প্রত্যেক ঘটনার কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে তিনি সর্ব্বদাই অগ্রসর হইতেন। হিন্দু কলেজে অধ্যয়নের সময় তিনি তৎকালপ্রচলিত কোন কোন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। একদিন তাঁহার কনিষ্ঠ মাতুল মহাশয় Rev. Milner's tour through creation নামক একখানি পুস্তক পাঠের জন্য আনয়ন করেন। ইহাতে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আলোচিত ছিল। ডাক্তার সরকার তাঁহার স্বাভাবিক অধ্যয়ন স্পৃহার সহিত পুস্তকখানি পাঠ ও আয়ত্ব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যতই তিনি পাঠ করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার কৌতূহল বর্দ্ধিত ও জ্ঞানলালসা উদ্দীপিত হইতে লাগিল। সৃষ্টপদার্থ সমূহের বহুত্ব ও বিশালত্ব এবং জগৎস্রষ্ঠার অনুপমশক্তি ও কৌশল চিন্তা করিয়া, তাঁহার তরুণ হৃদয় বিস্ময়ে অভিভূত হইল। পুস্তকখানির এক স্থলে সূর্য্য সম্বন্ধে সার উইলিয়াম হার্সেলের মত উদ্ধৃত করিয়া লিখিত ছিল যে, "আমাদিগের বাসভূমি এই পৃথিবী যেমন সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, তেমনই এই গ্রহ, উপগ্রহ সম্বলিত সৌরজগৎ অন্য কোন বৃহত্তর সূর্য্যের এবং তাহাও হয়ত অপর কোন মহা সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে।" ডাক্তার সরকার মহাশয় বলেন, "যখন আমি এই অংশটী পাঠ করিলাম, তখন আমার মনের ভাব যে কিরূপ হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে প্রকাশ করিবার আমার সাধ্য নাই। আমার মনে হইল, জগত্তত্ত্বের একটা গূঢ় রহস্য আমার নিকট সহসা প্রকাশিত

* চিকিৎসা সম্বন্ধে ডাক্তার সরকারের মত কি, তাহা তাঁহার সম্পাদিত Calcutta journal of medicine নামক পত্রিকার উদ্দেশ্য-ব্যঞ্জক নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটী পংক্তি হইতে ব্যক্ত হইবে। তাহাতে এইরূপ আছে, full and fairplay will be allowed to all the systems of medicine in vogue in the world, and in fact to whatever can be shown to have succeeded in effecting a true cure, or at least in affording relief to suffering where established means had failed. Preference will always be given to simpler means and ways, and thorough contempt shown to secrecy and mystery, the essence of quackery. Thus, cases under the Kaviraj and the Hakim, and even under persons ignorant of the profession, will be admitted, provided they are genuine and authentic, and reported faithfully and in detail, by competent authorities. But cases, of cures however brilliant, brought about by secret remedies, will meet with no favour."

হইল। সূর্য্য যদি বৃহত্তর সূর্য্যের এবং তাহাও যদি তদপেক্ষা আরও বৃহৎ কোন সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে, তবে এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড হয়ত সেই অনন্তশক্তি, মহামহিমাময় জগৎস্রষ্ঠার সিংহাসনের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। ভাবের উচ্ছ্বাসে আমি নির্ব্বাক হইলাম এবং মনের সেই অবস্থায় নগ্নপদে ও নগ্নদেহে মাতুল মহাশয়দিগের গৃহ হইতে লেবুতলার গির্জ্জা পর্য্যন্ত অনবরত পাদচারণ করিতে লাগিলাম। আমাকে সে অবস্থায় দেখিলে লোকে বায়ুরোগগ্রস্ত বলিয়া মনে করিত। সেই দিন হইতে বিজ্ঞানের প্রতি আমার যে অনুরাগ এবং বিজ্ঞানের সাহায্যে জগৎস্রষ্ঠার মহিমা অবগত হইবার জন্য, আমার যে আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে, তাহা একদিনের জন্যও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই।"

বিজ্ঞান শিক্ষার সুবিধা হইবে ভাবিয়াই ডাক্তার সরকার মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কলেজ ত্যাগের পর হইতে এপর্য্যন্ত তিনি সাধ্যানুসারে বিজ্ঞনানুশীলনে নিযুক্ত আছেন। কোন স্থানে বিজ্ঞানের চর্চ্চা হইতেছে দেখিলে, তিনি আনন্দলাভ করেন। বিজ্ঞান-সভা প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে তিনি সেণ্ট জেভিয়ারর্স কলেজে পাঁচশত টাকা মূল্যের যন্ত্রাদি দান করিয়াছিলেন। তাঁহার বাল্যলব্ধ বিজ্ঞানানুরাগের ফল "ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা"। ইহাই তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠতম কার্য্য এবং ইহারই জন্য তাঁহার নাম তাঁহার স্বদেশে স্মরণীয় হইবে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারি বিজ্ঞান সভার অনুষ্ঠান পত্র হিন্দু-পেট্রিয়ট পত্রিকায় প্রথম প্রচারিত হয়, এবং ছয় বৎসরের অবিশ্রাম চেষ্টা ও পরিশ্রমের পর ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ১৯এ জুলাই ইহা প্রকাশ্য ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গের তাৎকালীন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর স্যার রিচার্ড টেম্পল প্রতিষ্ঠা-সভার সভাপতি ছিলেন এবং কলিকাতার প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ সভাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া প্রতিষ্ঠা কার্য্যে সহায়তা করিয়া ছিলেন। বিজ্ঞান সভার প্রথম সুহৃদ ও উৎসাহদাতাগণের মধ্যে ডাক্তার সরকার স্বর্গীয় বাবু কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের নাম সর্ব্বাপেক্ষা কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করিয়া থাকেন।

বিজ্ঞান-সভা সম্বন্ধে প্রথম হইতে এত বাদানুবাদ চলিয়া আসিয়াছে যে, তাহাই একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক হইতে পারে। সে সকল কথার পুনরুল্লেখ এক্ষণে প্রীতিকর হইবে না। কেহ কেহ এখনও বলিয়া থাকেন যে, "এত আড়ম্বর এবং আয়োজন করিয়া যে সভা প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহার দ্বারা স্থায়ী উপকার কি হইল? বিজ্ঞান সভা যখন Londan Royal Institutionএর ন্যায় একজনও ইয়ং ডেভি বা ফ্যারাডে উৎপাদন করিতে পারিল না, তখন ইহার কার্য্যকারিতা কোথায়?" ইহার প্রত্যুত্তরে ডাক্তার সরকার বলেন, "আমার স্বদেশীগণ যে য়ুরোপের এবং ভারতবর্ষের পার্থক্য বিস্মৃত হন, ইহা বড়ই ক্ষোভের বিষয়। য়ুরোপে শত শত বৎসর হইতে যে শক্তি সঞ্চিত রহিয়াছে, ডেভি বা ফ্যারাডে তাহারই বিকাশ মাত্র। আর আমাদিগের ভারতে যুগ যুগান্তের ঔদাস্য রাজত্ব করিতেছে; ভারতের জ্ঞান ও উদ্যম পক্ষাঘাতগ্রস্ত। স্বল্পদিনে এখানে কি ফল হইবে? য়ুরোপ উন্নতিপথে অগ্রসর হইবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত, আর ভারতবর্ষে সমস্ত বিষয়ই প্রথম হইতে আরম্ভ করিতে হইতেছে; সুতরাং এখানে মৌলিক গবেষণার বা তত্ত্বনির্ণয়ের সম্ভাবনা কোথায়? বিজ্ঞান সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি বলেন, "The first object of this institution is to create a taste for science by the diffusion of scientific knowledge. This object it is now endeavouring to fulfill. The other object, the advancement of science can only follow when the institution has men paying their undivided attention, literally devoting their lives, to the pursuit of particular branches of Sciences." বাস্তবিকও বিজ্ঞানের প্রতি যখন অনুরাগই নাই, তখন বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব আকাশ-কুসুম মাত্র। বিজ্ঞান সভা হইতে যদি এপর্য্যন্ত কোন ডেভি বা ফ্যারাডে উৎপন্ন না হইয়া থাকেন, তবে সে অপরাধ ডাক্তার সরকারের নহে। বিজ্ঞান সভার প্রথম প্রচারিত অনুষ্ঠান পত্রে তিনি বলিয়াছিলেন, "The object of the Association will be, as its name indicates, to invite, encourage and enable the Natives of India to cultivate science in all its departments." দেশ, দেশান্তর হইতে ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া, এবং নিজের শরীর পাত করিয়া তিনি এক্ষণে বিজ্ঞান সভাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপন করিয়াছেন।

উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তিনি তাঁহার স্বদেশবাসীদিগকে বিজ্ঞানানুশীলনের জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছেন, কিন্তু তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া, বিজ্ঞানে M A উপাধিধারী যুবক যদি শাম্‌লা হস্তে, ঘর্ম্মাক্ত দেহে ট্রাম ধরিবার জন্য ধাবমান হন, তবে এ দেশে বিজ্ঞানের উন্নতি হইল না বলিয়া, বিজ্ঞান সভার প্রতি দোষারোপ বা অবজ্ঞা প্রদর্শন করা সঙ্গত হইবে না। ডাক্তার সরকারের পক্ষে যাহা করা সম্ভব তিনি তাহার ক্রটী করিতেছেন না। সভার বক্তা এবং উপদেষ্টা তিনি, সভার জন্য অর্থ সংগ্রহকারক তিনি, সভার কার্য্য-সম্পাদক তিনি, এবং সভার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য রাজপুরুষদিগের দ্বারস্থও তিনি। ৬৫ বৎসর বয়সে রোগজীর্ণ শরীর লইয়া ইহার অধিক আর তিনি কি করিতে পারেন? দোষ ডাক্তার সরকারের বা বিজ্ঞান সভার নহে, দোষ আমাদিগের এই দিবাস্বপ্নদর্শী, কল্পনা প্রিয়, উদ্যম হীন, হতভাগ্য জাতির।

বিজ্ঞান সভা প্রতিষ্ঠা করিয়া ডাক্তার সরকার যেমন তাঁহার মস্তিষ্কবত্তার পরিচয় দিয়াছেন, বৈদ্যনাথের নিরাশ্রয় কুষ্ঠ রোগীদিগের জন্য আশ্রয় নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া, তিনি তেমনই তাঁহার হৃদয়বত্তারও পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বৈদ্যনাথের কৃপায় পীড়া আরোগ্য হইবার আশায় ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে কুষ্ঠ রোগীগণ বৈদ্যনাথে আসিয়া থাকে। আশ্রয়ের অভাবে ইহাদিগকে পূর্ব্বে মর্ম্মান্তিক ক্লেশে কালযাপন করিতে হইত। বৃক্ষতলে, নদীতীরে বা রাজপথে তাহাদিগকে শীত, বর্ষা সকল সময় বাস করিতে হইত, এবং অনেক হতভাগ্য সেই অবস্থায় শৃগাল, কুক্কুরের দংশন সহ্য করিয়া প্রাণত্যাগ করিত। বৈদ্যনাথপ্রবাসী ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু এবং বৈদ্যনাথ মন্দিরের অন্যতর পুরোহিত স্বর্গীয় বাবু গিরিজানন্দ দত্তঝা প্রভৃতি স্থানীয় কয়েকজন ভদ্রলোক কুষ্ঠ রোগীদিগের জন্য একটী গৃহ নির্ম্মাণের উদ্যোগী ছিলেন। ডাক্তার সরকার তাঁহাদিগের মধ্যে একজনের নিকট সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া, এবং দুই হাজার টাকা হইলে একটী গৃহ নির্ম্মিত হইতে পারে শুনিয়া, একাই দুই হাজার টাকা প্রদান করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। ১৮৯২ সালের জুলাই মাসে সার চার্‌ল্‌স্ ইলিয়ট এই গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং ১৮৯৫ সালের আগষ্ট মাসে দ্বারবঙ্গের মহারাজা কর্ত্তৃক ইহা প্রকাশ্য ভাবে উন্মুক্ত হয়। ডাক্তার সরকার প্রথমে ২০০০৲ টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু ক্রমে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া ২৪ জন রোগীর উপযুক্ত অতি সুন্দর দুইটী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন! হতভাগ্য কুষ্ঠ রোগীগণ এতদিন নিরাশ্রয় অবস্থায় আকাশতলে দিনপাত করিত, আজ তাহারা পরম সুখে সুন্দর অট্টালিকায় বাস করিতেছে। ডাক্তার সরকারের অভিপ্রায় অনুসারে এবং দেওঘরবাসিদিগের সম্মতিক্রমে, এই গৃহ তাঁহার সহধর্ম্মিনীর নামানুসারে "বৈদ্যনাথ রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রম" নামে অভিহিত হইয়াছে।*

* কি অবস্থায় ডাক্তার সরকার একাই আশ্রমগৃহের সম্পূর্ণ ব্যয় দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, তাহা সাধারণের পরিচিত নয় বলিয়া সে সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগ হইতেই আশ্রমের অনুষ্ঠাতাগণ চাঁদা সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছিলেন। প্রকাশ্যভাবে সাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনায় সাহসী না হইয়া বৈদ্যনাথে যে সকল ধনাঢ্য ব্যক্তি জলবায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য বা পূজার জন্য আসিতেন, তাঁহারা তাঁহাদিগেরই নিকট প্রার্থনা করিতেন। একবার কোন ধনিক পুত্র দুইটী বৃহৎ বিলাতী কুক্কুর লইয়া বৈদ্যনাথে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কুক্কুর দুইটীর আদরের সীমা ছিল না। প্রত্যেকটীর জন্য প্রতিদিন এক সের করিয়া মাংস, এক সের চাউল, এক সের মুসুরীর ডাল খরচ হইত। তাহাদের গাত্র মার্জ্জনের ও সেবার জন্য একটী ভৃত্য নিযুক্ত ছিল। অনুষ্ঠাতাদিগের একজন উক্ত ধনিক পুত্রের দ্বারস্থ হইয়া আপনার বক্তব্য জ্ঞাপন করিলেন। তিনি বিবেচনা করিবেন বলিয়া চাঁদার খাতা খানি ২।৩ দিন রাখিয়া দিলেন এবং পরে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "ও সকল কাযে আমার দ্বারা কিছু হইবে না।" তাঁহার কোন সহচরও বলিলেন, "এখন যেরূপ দিন কাল, লোকে নিজের ব্যয়ই চালাইতে পারে না, তাহাতে আবার পরের উপর দয়া।" কুক্কুরের জন্য প্রতিদিন এক টাকার অধিক ব্যয়, আর ভগবানের হতভাগ্য পুত্র কন্যাগণের প্রতি এইরূপ ভাব কি আর বলিব?

আর একবার আশ্রমের কোন সুহৃদ, সাহায্যের জন্য, কলিকাতার এক মহারাজার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বাবু তাঁহার নামে এক অনুরোধ পত্র দিয়াছিলেন। বহু আয়াসে মহারাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ হইলে, তিনি সমস্ত শুনিয়া ও রাজনারায়ণ বাবুর পত্র পাঠ করিয়া বলিলেন, "রাজনারায়ণ বাবুকে বলিবেন, আমার এখন সময় ভাল নয়, আমি কিছু করিতে পারিব না।" শুনিয়াছি ইহারই সমকালে তিনি হ্যারিসন রোডের উভয় পার্শ্বের সমস্ত জমী এক লাটে ৪০ লক্ষ টাকায় ক্রয় করিবার প্রার্থী ছিলেন। তবে এই জমী কেনার কথাটী আমার শোনা মাত্র, সত্য কিনা বলিতে পারি না। ধনাঢ্যেরা যদি অনাথের দুঃখ মোচনে এইরূপ ভাব প্রকাশ করেন, তবে ভারতবর্ষের এই যুগ যুগান্ত ব্যাপী দুর্দ্দশার জন্য ন্যায়বান, সর্ব্বদর্শী ভগবানকে দোষারোপ করিলে চলিবে কেন?

অনেকের নিকট এইরূপ নিরুৎসাহ জনক ব্যবহারের পর অনুষ্ঠাতাগণ ডাক্তার সরকারের নিকট তাদৃশ সহানুভূতি ও সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় অবস্থার ব্যক্তির পক্ষে এককালীন প্রায় ৫০০০৲ টাকা সাহায্য যে বড় সাধারণ কথা নয়, তাহা বোধ হয় বলিবার আবশ্যক করে না।

নিজের ব্যবসায়েও ডাক্তার সরকার অনেক সময় যে উদারতা ও মহাপ্রাণতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহার সম প্রতিষ্ঠাবান চিকিৎসকদিগের মধ্যে দুর্লভ। বন্ধু, বান্ধবদিগের কথা দূরে থাকুক, যাঁহারা বিজ্ঞান সভায় কখনও কিছু এককালীন দান করিয়াছেন, কেবল এইমাত্র সম্পর্কে, তিনি তাঁহাদিগের অনেকের নিকট এককপর্দ্দকও গ্রহণ করেন না। কেহ প্রকৃতই বিপদগ্রস্ত এবং তাঁহার দ্বারা তাঁহার উপকার হইবার সম্ভাবনা বুঝিলে ডাক্তার সরকার সাধ্যানুসারে তাঁহার উপকার করিতে পরাঙ্মুখ হন্ না। একবার কলিকাতার কোন অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন ব্যক্তির পত্নীর কঠিন পীড়া হইয়াছিল। অবস্থাসত্ত্বেও, এবং ডাক্তার সরকারের চিকিৎসায় উপকার হইতেছে বুঝিলেও, তিনি পত্নীর জীবনের প্রতি অবজ্ঞাপূর্ব্বক তাঁহার দ্বারা চিকিৎসা করাইতে বিরত হইলেন। পীড়িতার অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া আসিতে লাগিল। এদিকে তাঁহার হৃদয় হীন স্বামী, পত্নীর মৃত্যুর পূর্ব্বেই লাভজনক অন্য বিবাহের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ডাক্তার সরকার শুনিয়া বিনা অর্থগ্রহণে চিকিৎসা করিয়া পীড়িতাকে সুস্থ করিলেন। তাঁহার নির্ল্লজ্জ স্বামী বলিলেন, "চাষাবেটা আপনার কেদটা আচ্ছা বজায় রেখেছে।" *

যিনি আজ প্রায় ৪০ বৎসর কাল বঙ্গদেশের নানাবিধ কার্য্যের সহিত স্বল্পাধিক সংশ্লিষ্ট আছেন, মাসিক পত্রিকায় দুই একটা প্রবন্ধে তাঁহার বিষয় সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। তাঁহার কার্য্য কেবল তাঁহার নিজের ব্যবসায়ের মধ্যে আবদ্ধ নয়। তিনি একাধারে চিকিৎসক, বক্তা এবং লেখক। যে সকল গুণকে ইংরাজেরা good citizenএর লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহা তাঁহাতে প্রচুর পরিমাণে লক্ষিত হয়। কলিকাতা মিউনিসিপাল সভায় এবং বেঙ্গল কাউন্সিলে, বিজ্ঞানসভায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটে, চৈতন্য লাইব্রেরিতে এবং টাউন হলে, সিটিকলেজের এবং সংস্কৃত কলেজের পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে, ডেভিড হেয়ারের এবং রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভায় অনেক সময় তাঁহার কণ্ঠস্বর শ্রুত হওয়া গিয়াছে। রাজনীতি, শিক্ষা, সমাজ-সংস্কার নানা বিষয়ে তিনি, মাতৃভূমির সেবার জন্য, নিজের রসনা ও লেখনী নিয়োজিত করিয়াছেন। অবলম্বিত ব্যবসায়েও যেমন, বক্তৃতা শক্তিতে এবং লিপি কৌশলেও তেমনই, তিনি তাঁহার স্বদেশীয়দিগের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি। তাঁহার সম্পাদিত The Calcutta Journal of Medicine নামক পত্রিকার প্রবন্ধ সমূহ য়ুরোপীয় ও আমেরিকা দেশীয় চিকিৎসাবিষয়ক পত্রিকা সমূহে সাদরে উদ্ধৃত হইয়া থাকে। তাঁহার লিখিত On the supposed uncertainty in Medical science and on the relation between diseases and their remedial agents, On the Physiological basis of Psycology, The moral influence of Physical science প্রভৃতি প্রবন্ধ সমূহ তাঁহার গভীর চিন্তাশীলতার ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

নিজের বিদ্যা, বুদ্ধিবলে ডাক্তার সরকার স্বদেশে ও বিদেশে যে সম্মান লাভ করিয়াছেন, তাহাও সাধারণের সুলভ নয়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৮৯৩খ্রীষ্টাব্দ হইতে উপর্য্যুপরি চা'র বৎসর তিনি আর্টস ফ্যাকল্টির প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। গত বৎসর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে D. L. উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। রাজপুরুষগণও তাঁহাকে সম্মানিত করিতে ক্রটী করেন নাই। সার রিচার্ড গার্থ তাঁহাকে কলিকাতার সেরিফ্ মনোনীত করিয়াছিলেন, লর্ড রিপণ তাঁহাকে C. I. E. উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন এবং সার রিভার্স টমসন, সার ষ্টুয়ার্টবেলী এবং সার চার্লস ইলিয়ট তাঁহাকে চা'রবার বেঙ্গল কাউন্সিলের সভ্য নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। তিনি ইংলণ্ডীয় British Association for the Advancement of scene এবং ফ্রান্স দেশীয় Astronomical society নামক সভাদ্বয়ের আজীবন স্থায়ী সভ্য। ইংলণ্ড ও আমেরিকা দেশীয় Homoeopathic Institutеএর তিনি Corresponding Member. নিরক্ষর সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া এরূপ উন্নতি ও মর্য্যাদা লাভ পৃথিবীর যে কোন দেশেই স্মরণীয় ও গৌরবজনক।

* ডাক্তার সরকার মহাশয় সদ্গোপবংশীয় বলিয়া কোন কোন মহাপুরুষ তাঁহাকে "চাষা" বা "চাষা বেটা" এই বিশেষণে বিভূষিত করিয়া থাকেন!!!

ডাক্তার সরকারের অনেকগুলি গুণের বিষয় আমরা উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু যে দুইটী গুণের জন্য তিনি তাঁহার স্বদেশীয়গণের আদর্শ স্বরূপ, তাহার আলোচনা করা হয় নাই। ইহার মধ্যে প্রথম তাঁহার বিদ্যানুরাগ। সাধারণতঃ আমাদিগের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দান সম্পূর্ণ হইলেই পাঠ সমাপ্ত হয়। নিজের অবলম্বিত ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট কার্য্য এবং সংবাদপত্র পাঠ, ইহাতেই আমাদিগের অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তির সময় অতিবাহিত হয়। কিন্তু ডাক্তার সরকার ছাত্রাবস্থার ন্যায় এখনও পূর্ণমাত্রায় শিক্ষার্থী রহিয়াছেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, যে কোন বিষয়ে হউক, ইংরাজীতে কোন নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে, তাহা ক্রয় এবং পাঠ, না করিলে তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। প্রবীণ বয়সে রীতিমত শিক্ষক রাখিয়া তিনি ফরাসী ও পারসীক ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী ডাক্তার Jousset প্রণীত Conferences upon Homoeopathy এবং M. Gallavordin প্রণীত An essay on the choice of Homoeopathic Remedies নামক পুস্তিকা দ্বয়ের তাঁহার কৃত ইংরাজী অনুবাদ ইংলণ্ডের Monthly Homoeopathic Review কর্ত্তৃক "অতি উৎকৃষ্ট অনুবাদ" বলিয়া সমাদৃত হইয়াছে। নিজের জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি নিজের পুস্তকালয়ে প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। যে দেশে লক্ষপতির গৃহে একটী ভূগোলক বা একখানি মানচিত্র দুর্লভ, সে দেশে দরিদ্রের সন্তানের পক্ষে নিজের উপার্জ্জন হইতে পুস্তকালয়ের জন্য এক লক্ষ টাকা ব্যয় বড় সহজ কথা নয়। তাঁহার জ্ঞান পিপাসা যে কিরূপ প্রবল এই একটী মাত্র প্রমাণ হইতেই তাহা প্রতীত হইতে পারে। বিদ্যাসাগর মহাশয় ভিন্ন তাঁহার সহিত এদেশে এ বিষয়ে আর কাহারও তুলনা হয় না। তাঁহার বিদ্যানুরাগের সঙ্গে তাঁহার বিজ্ঞানের জন্য স্বার্থত্যাগও উল্লেখ যোগ্য। বিজ্ঞান সভার জন্য তিনি যে কিরূপ আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছেন, অতি অল্প লোকই তাহা অবগত আছেন। আজ এই প্রায় ২২ বৎসরকাল তিনি সকল বিষয়ে ইহার প্রাণ স্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন। বিজ্ঞান সভায় উপদেশ দিতে প্রস্তুত হইবার জন্য তাঁহাকে অধ্যয়নে যে সময় ব্যয় করিতে হয়, তাহা নিজের ব্যবসায়ে নিয়োগ করিলে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন। যেদিন তাঁহার বক্তৃতার দিন নির্দ্দিষ্ট থাকে, সেদিন শত মুদ্রা দিলেও তিনি চিকিৎসাকার্য্যে গমন করেন না। বিজ্ঞান সভার জন্য সময় ক্ষেপ না করিলে, এই ২২ বৎসরে তিনি যে অন্যূন পাঁচ, ছয় লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ইংলণ্ডীয় সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ফ্যারাডে রাসায়নিক বিশ্লেষণ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসন্ধানেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার এই স্বার্থত্যাগের বিষয় উল্লেখ করিয়া অধ্যাপক টিণ্ডাল বলিয়াছিলেন, 'taking the duration of his life into account this son of a blacksmith and apprentice to a bookbinder had to decide between a fortune of £150,000 on the one side, and his undoward science on the other. He chose the latter, and died a poor man. বিদ্যাবুদ্ধিতে বা মৌলিক গবেষণায় ফ্যারাডের সহিত ডাক্তার সরকারের তুলনা করা আমাদের অভিপ্রেত নয়; তবে একথা বলিতে পারি যে, দরিদ্র কৃষিকার্য্যোপজীবীর সন্তান হইয়া তিনি যে নিজের উপার্জ্জন হইতে অধ্যয়নের জন্য লক্ষ টাকার পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন এবং বিজ্ঞান সভার জন্য অন্যূন পাঁচ, ছয় লক্ষ টাকা সঞ্চয় হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়াছেন, তাহা ফ্যারাডের ন্যায় মহাপুরুষেরই পদাঙ্ক অনুসরণের যোগ্য!

ডাক্তার সরকার এত অধিকবার সাধারণের সমক্ষে ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সে সম্বন্ধে কোন অজ্ঞাত কথা বলিবার সম্ভাবনা নাই। তিনি সাকার উপাসনার বিরোধী, একমাত্র চিন্ময় ঈশ্বরই তাঁহার উপাস্য। তিনি বলেন, "সাকার বা পৌত্তলিক উপাসনার দ্বারা পৃথিবীর, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের, যে কি ঘোরতর অনিষ্ট হইয়াছে, তাহা বর্ণন করিতে পারা যায় না। মহম্মদ পৌত্তলিকতার উচ্ছেদের জন্য তাদৃশ চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়াই, দোষ সত্ত্বেও, আমি তাঁহাকে এত সম্মান ও শ্রদ্ধা করি।" খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ক বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করাতে এক সময় তিনি প্রকাশ্যভাবে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

তাঁহার গৃহে বাইবেল-গৃহীত চিত্রসমূহ তাঁহার খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি পূর্ব্বানুরাগের ফল। ধর্ম্মপ্রচারকদিগের মধ্যে যীশু খৃষ্টই তাঁহার মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সামাজিক কুপ্রথাসমূহের মধ্যে বাল্যবিবাহই সর্ব্বাপেক্ষা দোষাবহ বলিয়া বিবেচনা করেন। তিনি বলেন, "আমাদিগের মানসিক ও শারীরিক দুর্ব্বলতার এবং স্ত্রীজাতির ভগ্নস্বাস্থ্যের প্রধান কারণ বাল্যবিবাহ। বাল্যবিবাহের অন্যতম ফল বহু পুত্রোৎপাদন, ইহা দ্বারা একদিকে পিতামাতার শরীর অন্তঃসারহীন হয়, অপর দিকে জাতীয় দরিদ্রতা বর্দ্ধিত হয়। ভারতবর্ষের উন্নতি করিতে হইলে ধর্ম্ম হইতে পৌত্তলিকতা এবং সমাজ হইতে জাতিভেদ ও বাল্যবিবাহপ্রথা উৎপাটন করা একান্ত আবশ্যক। বালবিধবার বিবাহ দিলে "একঘরে" করার রীতি নিষ্ঠুরতা এবং অত্যাচার ভিন্ন আর কি বলিব?"

কথা প্রসঙ্গে অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে ডাক্তার সরকারের যে সকল মত জানিতে পারিয়াছি, আধুনিক কথোপকথন প্রথানুযায়ী নিম্নে তাহা সন্নিবিষ্ট করিয়া এই প্রবন্ধ সম্পূর্ণ করিব। এক বিষয়ের অপেক্ষা বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার মত জানিলে, তাঁহাকে অধিক চিনিতে পারিবার সম্ভাবনা বলিয়া আমরা তাঁহার বিভিন্ন বিষয়ক মতই লিপিবদ্ধ করিব।

প্রবন্ধ লেখক। বাঙ্গালীর কি বিজ্ঞান শিক্ষার উপযোগী শক্তি আছে বলিয়া আপনি বিশ্বাস করেন?

ডাক্তার সরকার। বিলক্ষণ আছে বিশ্বাস করি। সে বিশ্বাস না থাকিলে আজ এই প্রায় ৩০ বৎসরকাল বাঙ্গালীর মধ্যে বিজ্ঞান প্রচারের জন্য চেষ্টা করিব কেন?

প্রঃ লেঃ। যদি বাঙ্গালীর শক্তিই আছে, তবে বিজ্ঞান চর্চ্চার প্রতি এত অল্প অনুরাগ কেন?

ডাঃ সঃ। তন্ত্রে, মন্ত্রে, যোগবলে বিশ্বাস। বিজ্ঞান শিখিতে হইলে হাতে কলমে কায করিতে হয়, আর তন্ত্রে, মন্ত্রে কল্পনা মাত্রেই কায হয়। বহু শত বৎসরের পরাধীনতায় হিন্দুজাতি আপনার আর্য্যোচিত উৎসাহ ও শক্তিহীন হইয়াছে এবং কার্য্যপ্রিয়তার পরিবর্ত্তে কল্পনাপ্রিয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই জন্যই আপাততঃ বিজ্ঞানের প্রতি তাঁহাদিগের অনুরাগ নাই। শক্তির অভাব এই ঔদাসীন্যের কারণ নয়।* বাঙ্গালীর যে অন্তর্নিহিত শক্তি আছে, ইহার মধ্যেইত তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। যে দুইজন বাঙ্গালী এ বিষয়ে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা কৃতকার্য্য হইয়াছেন। শ্রীমান্ জগদীশচন্দ্র এবং শ্রীমান্ প্রফুল্লচন্দ্র বাঙ্গালীর গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন।

প্রঃ লেঃ। বিজ্ঞান শাস্ত্রের কোন্ অংশটী আপনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করেন?

ডাঃ সঃ। ইহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, নিকৃষ্ট নাই। সকলই মনুষ্যের সমান আলোচনার যোগ্য এবং সকলই সমান উপকারী। তবে Biology আমার নিজের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। ইহারই জন্য আমি মেডিকেল-কলেজে প্রবেশ করিয়াছিলাম। কলেজের সকল ছাত্র চলিয়া গেলে আমি একা বসিয়া এই বিষয়ের গ্রন্থ সকল পাঠ করিতাম। আমি যে বিজ্ঞান সভায় Physics সম্বন্ধে বক্তৃতা করি, তাহার কারণ এই যে অন্য কেহ এ ভার গ্রহণ করেন না। Physicsএর দ্বারা আমার Biology শিক্ষারও সুবিধা হয়।

প্রঃ লেঃ। আমাদিগের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যে প্রণালীতে এক্ষণে অধ্যাপনা হইতেছে, সে সম্বন্ধে আপনার মত কি?

ডাঃ সঃ। ইহার দ্বারা সর্ব্বনাশ হইতেছে। প্রকাণ্ড বোঝা ঘাড়ে দিয়া ছেলেদের স্বাস্থ্যত যাইতেছে, তাহার উপর প্রকৃত বুদ্ধির উৎকর্ষ হইতেছে না। একটা কথা আছে, "Universities are the graves of talent" আমাদিগের কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় সম্বন্ধে একথা যেমন খাটে, আর কোথাও তেমন নয়।

প্রঃ লেঃ। আপনার বিবেচনায় এই অনিষ্টকারিতার প্রধান কারণ কি?

ডাঃ সঃ। প্রধান কারণ বিষয়বাহুল্য এবং প্রত্যেক বিষয়ে পাশ করিতে হইবে, এই কুরীতি। যাহার যে বিষয়ে

* তাঁহার লিখিত একটী প্রবন্ধেও তিনি এইরূপ ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন:—The Hindu mind * * has lost much of its original Aryan vigour and energy and has become more of a speculative than of a practical character, singularly deficient in patient industry to observe and collect materials, too prone to hasty generalisation, depending more upon its own inspirations than upon outward facts. Thus altogether, though highly inlowed, it has been little productive of results.

শিক্ষার উপযোগী শক্তি আছে, সে তাহাই শিক্ষা করুক্ এই নিয়ম হওয়া উচিত। কোন পরীক্ষার্থী এক বিষয়ে যদি শূন্য পায়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? ফ্যারাডে গণিতে অজ্ঞ ছিলেন বলিলেও হয়, কিন্তু তিনি বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাহা করিয়াছেন, পৃথিবীতে কয়জন তেমন করিতে পারিয়াছেন?

প্রঃ লেঃ। আমাদিগের জাতির প্রধান দোষ এবং প্রধান গুণ কি কি?

ডাঃ সঃ। প্রধান দোষ সত্যের প্রতি ঔদাসীন্য; নিজের কথা রক্ষা করিবার প্রতি দৃষ্টি নাই। দয়া, কোমলতা এবং বিপদে সহিষ্ণুতা ইহাই আমাদিগের প্রধান গুণ। আমাদিগের রমণীগণের পতিভক্তি এবং অপত্য স্নেহ জগতে অতুলনীয়। পতিভক্তির ন্যায় পত্নীপ্রেম আছে একথা বলিতে পারিলে আমি সুখী হইতাম।

প্রঃ লেঃ। বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালার মধ্যে আপনার মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কে?

ডাঃ সঃ। রাজা রামমোহন রায়। তাঁহার নিম্নে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

প্রঃ লেঃ। বাঙ্গালা গ্রন্থের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আপনার প্রিয় কি?

ডাঃ সঃ। বাঙ্গালা অধিক পড়ি নাই। বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস, মাইকেলের মেঘনাদবধ পড়িয়াছি, মন্দ নয়। কিন্তু রামায়ণ মহাভারতের মত কিছুই ভাল বোধ হয় না। ছেলে বেলা পথের ধারে রামায়ণ গান শুনিতে শুনিতে এত তন্মনস্ক হইয়া যাইতাম যে, ঘরে আসিয়া এক একদিন প্রহার খাইতাম। এখনও রামায়ণ, মহাভারত শুনিলে যে সুখ পাই, আর কোন পুস্তকে তাহা পাই না।

প্রঃ লেঃ। পৌরাণিক চরিত্র সমূহের মধ্যে আপনার মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কোন্‌টী?

ডাঃ সঃ। সীতা! পৃথিবীর কোনও দেশের সাহিত্যে এমন চরিত্র আর নাই। সীতা জগতে অতুলনীয়া!!

প্রঃ লেঃ। য়ুরোপীয় জাতি সমূহের মধ্যে কাহারা সর্ব্ব প্রধান?

ডাঃ সঃ। সমস্ত বিষয় লইয়া অবশ্যই ইংরাজ। Shakspeare এবং Newton আর কোনও দেশ উৎপন্ন করিতে পারে নাই। সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, রাজনীতিতে, জনহিতৈষণায় ইহারা অপর সকলের অগ্রণী। দেশে ইহারা দেবতা, কিন্তু বিদেশে আসিলে ইহাদিগের প্রকৃতি অন্যরূপ হয়।

প্রঃ লেঃ। ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্ব সম্বন্ধে আপনার মত কি?

ডাঃ সঃ। ইংরাজ রাজত্ব এদেশে ভগবৎ-প্রেরিত বলিয়া আমার বিশ্বাস। অধঃপতিত হিন্দু জাতির উন্নতির জন্যই ঈশ্বর ইংরাজকে এদেশে পাঠাইয়াছেন।

প্রঃ লেঃ। ইংরাজের সহিত দেশীয়দিগের এই যে, দিন দিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতেছে, সে সম্বন্ধে আপনি কি বিবেচনা করেন?

ডাঃ সঃ। এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবশ্যম্ভাবী। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইংরাজ সহ্য করিতে পারিবে না, কিন্তু সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বারা আমরা তাঁহার শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারি। এ সকল বিষয়ে পরাস্ত হইলেও, ইংরাজ সুখী বই অসুখী হইবে না।

প্রঃ লেঃ। বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য কি?

ডাঃ সঃ। বহির্জ্জগৎ এবং অন্তর্জ্জগৎ, দৃশ্য জগৎ এবং অদৃশ্য জগৎ যে একই সুনিয়মে পরিচালিত হইতেছে, তাহা বুঝিবার জন্যই জড়বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজন। জগতত্ত্ব এবং তাহা হইতে সেই জগৎস্রষ্টাকে অবগত হওয়াই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য।

আমাদিগের প্রবন্ধ এরূপ দীর্ঘ হইয়াছে যে এক্ষণে নিরস্ত হওয়াই আবশ্যক। শেষ প্রশ্নের উত্তরে ডাঃ সরকার প্রবন্ধ লেখককে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা হইতে কয়েক পংক্তি অবিকল উদ্ধৃত হইল। প্রশ্ন ছিল, "আপনি যে জীবনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহার মূল কি কি? অবলম্বিত ব্যবসায় সম্বন্ধে এবং সাধারণতঃ আপনার নিজের প্রকৃতি সম্বন্ধে দুই একটী কথা জানিতে ইচ্ছা করি।" তিনি উত্তরে লিখিয়াছিলেন!—

"I attribute whatever success I have attained to acting up to my convictions at any risk and hazard, at any sacrifice of time health and worldly prosperity. I was somtimes on starvation point when I publicly declared my faith in Homeopathy and would have been a much richer man had I not to devote the best portion of my life for the Science Association. I have an absolute hatred of every thing false, and my love of nature—which means truth and reality—is unbounded. This makes me outspoken to rudeness, but for which I could have been popular. Pardon me the egotism when I say that beneath a rough exterior there is some tenderness, is, and that in associati onwith a most irritable disposition and an impetuous temper there is the greatest caution as a physician and a scientific experimenter and researcher. I have often from a sense of duty attended on patients for days and months without remuneration, when convinced of their poverty and that their lives depended upon my care and treatment."

ডাক্তার সরকারের কোন দোষের বিষয় আমরা এপর্য্যন্ত উল্লেখ করি নাই। মানবজন্ম ধারণ করিয়া দোষশূন্য হওয়া সহজ নহে। তিনি যে দোষবিরহিত নহেন, সে কথা তিনি নিজেই তাঁহার পত্রে উল্লেখ করিয়াছেন। স্বভাবতঃ তাঁহার প্রকৃতি অতি উগ্র এবং অসহিষ্ণু; কুপিত হইলে তিনি আত্মসম্বরণ করিতে পারেন না। অপ্রিয়ভাষী না হইয়াও যে সত্য বলিতে পারা যায়, তাহা তিনি অনেক সময় বিস্মৃত হন। সামান্য মিষ্টভাষণের অভাবে তিনি কোন কোন সময়ে লোকের মর্ম্মবেদনার কারণ হন এবং স্বাবলম্বনে অভ্যস্ত হওয়াতে অন্যের সহিত সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতিতে গুণের ভাগ এত অধিক যে, তাহার সহিত তুলনায় এই সকল দোষ অতি সামান্য বলিয়াই বিবেচিত হয়। তাঁহার দোষ আছে সত্য, কিন্তু স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা, চাটুকারিতা প্রভৃতি নীচতার সম্পর্ক তাহাতে আদৌ নাই। বাহিরের রুক্ষ এবং সহজ-কোপন স্বভাবের অভ্যন্তরে তাঁহার প্রকৃতিতে আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদিগের প্রতি অতি মধুর, স্নিগ্ধ ভাব লক্ষিত হয়। তাঁহার কোন বন্ধু তাঁহাকে একবার বলিয়াছিলেন, "আপনার প্রকৃতি নারিকেলের মত; বাহিরে কর্কশ আবরণ, কিন্তু অভ্যন্তরে মধুর সলিল। বাস্তবিকও কথাটী ঠিক। দোষ, গুণ সমস্ত লইয়া মনে হয়, তাঁহার ন্যায় ব্যক্তি বাঙ্গালা দেশে এ পর্য্যন্ত অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। প্রতিকূল অবস্থার সহিত তাঁহার সংগ্রাম, তাঁহার বিদ্যানুরাগ, তাঁহার স্বাবলম্বন, তাঁহার স্বার্থত্যাগ এবং তাঁহার তেজস্বিতা তাঁহার স্বদেশীয়গণের আদর্শ স্বরূপ। ব্রাহ্মণেতর বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও ব্রাহ্মণোচিত এই সকল গুণ তাঁহাতে প্রভূত পরিমাণে বিদ্যমান আছে। বঙ্গদেশের যে গৌরবময় যুগে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার কর্ম্মকারকগণ একে একে চলিয়া যাইতেছেন। দীনবন্ধু, দ্বারকানাথ, কেশবচন্দ্র, কৃষ্ণদাস, রাজেন্দ্রলাল যাঁহাদিগের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ্য ছিল, তাঁহারা সকলে অন্তর্হিত হইয়াছেন। কেবল প্রাচীন অরণ্যানীর ধ্বংসাবশিষ্ট মহাদ্রুমের ন্যায় তিনি এবং তাঁহার মত আরও দুই একজন মাত্র এখনও দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। বঙ্গভূমি যে উষর নহে, অঙ্গুলি সঙ্কেতে তাঁহাকে দেখাইয়া আমরা তাহা প্রমাণিত করিতে পারি। ভগবান্ করুন, বঙ্গীয় যুবক, যেন তাঁহার প্রদর্শিত মার্গ অনুসরণ করিয়া স্বদেশ ও স্বজাতির মুখোজ্জ্বল করিতে পারেন। আমরা এই স্থানে ডাক্তার সরকারের স্বাক্ষরের প্রতিলিপি প্রদান করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

সম্পূর্ণ।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু, বৈদ্যনাথ, দেওঘর।

মধ্য আফ্রিকার দুটি অসভ্য জাতি।

বঙ্গো।

বঙ্গো (Bongo) নীলনদের দক্ষিণে একটি বিখ্যাত প্রদেশ। তথাকার অধিবাসীদিগকেও প্রদেশের নামানুসারে 'বঙ্গো' বলা হয়। বঙ্গোদের গায়ের রং ঈষৎ রক্তাভ কটা। তাহাদিগের চুল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু অর্দ্ধ ইঞ্চির বেশী দীর্ঘ হয় না। তাহাদিগের গোঁপ ও দাড়ী কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

বঙ্গো পুরুষেরা এক খণ্ড বস্ত্র অথবা কোন প্রকার পশুচর্ম্ম কটিদেশে জড়াইয়া রাখে। স্ত্রীলোকেরা সপুষ্প

বঙ্গোস্ত্রীলোক। বঙ্গোর পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশের স্ত্রীলোক।

লতা পাতা, বৃক্ষশাখা বা সুন্দর সুন্দর ঘাস পরিধান করে। পূর্ণবয়স্ক স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই স্থূলকায় হইয়া পড়ে। ইহারা কুকুর, কুম্ভীর, শেয়াল প্রভৃতি জন্তুর দাঁত ও নখ প্রভৃতি সূত্র দ্বারা গাঁথিয়া গলায় পরিধান করে। ইহারা এত অলঙ্কারপ্রিয় যে, উপরের ঠোঁট, কর্ণ ও হস্তপদে সুবৃহৎ ছিদ্র করিয়া ধাতু নির্ম্মিত ব্যাঘ্রনখ ও অঙ্গুরী প্রভৃতি পরিধান করে। যাহাদিগের আর্থিক অবস্থা মন্দ, তাহারা সুবৃহৎ কাষ্ঠনির্ম্মিত কাঠি দ্বারা ঐ ছিদ্র সমূহ পূর্ণ করিয়া থাকে। একজন ইংরেজ পরিব্রাজক বলেন,—তিনি একজন বঙ্গো স্ত্রীলোকের গাত্রে শতাধিক বৃহদাকারের ছিদ্র দেখিয়াছিলেন। তথাকার অধিকাংশ স্ত্রীলোকের শরীর বিবিধ প্রকারের বিচিত্র উল্কি দ্বারা চিত্রিত।

বঙ্গোতে স্ত্রীলোকেরা বিক্রীত হইয়া থাকে। দশ সের লৌহ দিলেই একটি স্ত্রীলোক ক্রয় করিতে পারা যায়। ইহাদিগের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে, কিন্তু একজন পুরুষ তিনটির অধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে না।

বঙ্গোরা সম্পূর্ণ গোলাকৃতি করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। গৃহ-দ্বার এত নীচু করে যে, হামাগুড়ি দিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে হয়। স্ত্রীলোকেরা গৃহের ভিতরে এবং পুরুষেরা দ্বারে এক খণ্ড কাষ্ঠের উপরে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যায়। ইহারা বিশেষ যত্নের সহিত কুকুর ও ছাগল পুষিয়া থাকে। কুকুরের মাংস ব্যতীত আর সকল জন্তুর মাংসই ইহারা খায়। এমন কি সাপ, বেঙ, ইঁদুর ও ছুঁচোর মাংসও বাদ যায় না।

বঙ্গোদিগের বিবিধ প্রকারের বাদ্যযন্ত্র আছে। ইহাদের সঙ্গীত-প্রণালী অতি অদ্ভুত। এক একটী সঙ্গীতে কত প্রকারের যে রাগিণী ও তান লয় থাকে, তাহার সীমা নাই। ইহারা যখন গান গাহিতে থাকে, তখন যুগপৎ কুক্কুর, বিড়াল, বৃষ ও রাসভের চীৎকারধ্বনি স্মৃতিপথে জাগিয়া থাকে।

বঙ্গো স্ত্রীলোকেরা নিরতিশয় পরিশ্রমী, সাহসী ও আমোদ-প্রিয়। ইহারা দলবদ্ধ হইয়া নৃত্য করিয়া থাকে। সন্তানকে স্তন্য দান করিতে করিতে বড় বড় বোঝা মস্তকে করিয়া লইয়া যাইতে পারে।

পরিব্রাজকেরা বলেন, বঙ্গোজাতি সৃষ্টিকর্ত্তা বা অপর কোন দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। কিন্তু ইহা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা বলা যায় না। তবে ইহারা সততই ভূতের ভয়ে নিতান্ত ভীত। অতি বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরাই সাধারণতঃ ভূত বা 'ডাকিনী' হইয়া থাকে, তাহারা এইরূপ বিশ্বাস করে।

নিয়াম্-নিয়াম্।

মধ্য আফ্রিকায় নিয়াম্-নিয়াম্ (Niam-Niam) নামে আর একটি জাতি আছে, তাহাদের প্রকৃতি অতীব ভীষণ। ইহারা সকল প্রকার পশু পক্ষীর মাংস ত রন্ধন না করিয়াই খায়, কাঁচা মনুষ্য-মাংসও পরম আদরের সহিত খাইয়া থাকে! ইহাদিগকে রাক্ষস বলা যাইতে পারে। ইহাদের মস্তক বৃহৎ ও গোলাকার। মস্তকের কেশ শৈবালের ন্যায় গুচ্ছবিশিষ্ট এবং সুদীর্ঘ। নাসিকা বৃহৎ ও চেপ্টা। গায়ের রং কটা, মুখমণ্ডল বিচিত্র উল্কি দ্বারা চিত্রিত। দন্ত সুতীক্ষ্ণ। কোন উৎসব উপস্থিত হইলে ইহারা নানা প্রকার রং দ্বারা দেহ চিত্রিত করে।

ইহাদের স্ত্রীলোক হইতে পুরুষদিগের সাজসজ্জা বেশী। পুরুষেরা মস্তকের কেশ নানাপ্রকারে সজ্জিত করিয়া পালকবিশিষ্ট টুপী পরিয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা সাজসজ্জা করে না বলিলেই হয়।

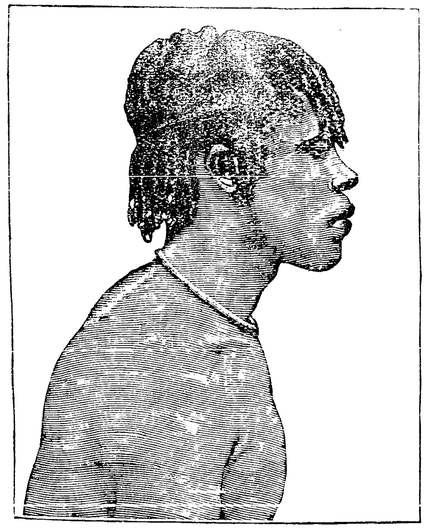

নিয়াম্-নিয়াম্ স্ত্রীলোক।

নিয়াম্-নিয়াম্ দিগের মধ্যে স্ত্রী-বিক্রয় প্রথা নাই। কাহাকেও বিবাহ করিতে হইলে দলপতির নিকট আবেদন করিতে হয়। দলপতি যে স্ত্রী নির্ব্বাচন করিয়া দেয়, তাহাকেই গ্রহণ করিতে হয়। ইহাদিগের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা আছে। একজন পুরুষ যত ইচ্ছা স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে। স্ত্রী কোন অপরাধ করিলে স্বামী তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারে। বিবাহের সময় বিশেষ আড়ম্বর হইয়া থাকে। কন্যা বিবিধ বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া সদলে বরের গৃহে উপস্থিত হয় এবং তথায় প্রচুর পরিমাণে আহারাদি ও নৃত্যগীত হইয়া থাকে। ভূমি কর্ষণ ও রন্ধন ব্যতীত স্ত্রীকে স্বামীর দেহ চিত্রিত ও পোষাকাদি প্রস্তুত করিয়া দিতে হয়। নিয়াম্-নিয়ামেরা স্ব স্ব পত্নীকে বড়ই ভাল বাসে।

ইহারা শত্রুদমন ও শিকার করিবার জন্য লৌহনির্ম্মিত বর্শা এবং আত্মরক্ষার্থ পশুচর্ম্মের ঢাল ব্যবহার করিয়া থাকে। নিয়াম্-নিয়াম্ পুরুষেরা উত্তম লক্ষ্যবেধকারী।

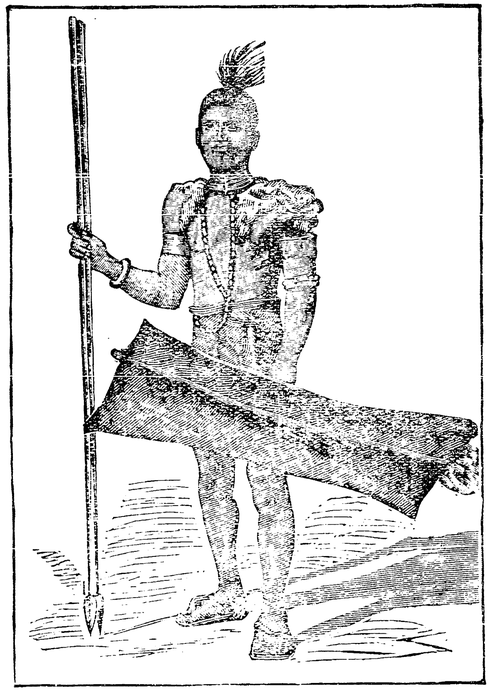

নিয়াম্-নিয়াম্ যোদ্ধৃ-পুরুষ।

ইহাদের প্রধান শস্য 'রাগি'। রাগি হইতে প্রস্তুত তীব্র মদ্য নিয়াম্-নিয়াম্‌রা পরম উপাদেয় মনে করিয়া পান করে। ইহাদের গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে কুকুর ও মোরগই প্রধান। ইহারা যে সকল লোককে পরাজিত ও ধৃত করিয়া আনে, বলি দিয়া তাহাদের আম-মাংস পরমানন্দে আহার করে। যে সকল লোক অসহায় অব-

স্থায় পতিত হয়, এবং পীড়া বা বার্দ্ধক্যগ্রস্ত হয়, এই রাক্ষসেরা তাহাদের মাংসও খাইয়া থাকে! ইহাদের গৃহের চতুষ্পার্শ্ব নরকঙ্কাল দ্বারা সর্ব্বদা সজ্জিত করিয়া রাখে।

দলপতির আজ্ঞামাত্র ইহারা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাদের প্রকৃতি যতই কেন ভীষণ হউক না, দলপতির নিকট ইহারা ক্রীড়ার পুত্তলবৎ। যুদ্ধ জয় করিয়া যে সামগ্রী লাভ হয়, দলপতি একাকী তাহার অর্দ্ধ-ভাগ গ্রহণ করে, অপরার্দ্ধ সকলে ভাগ করিয়া লয়।

গভীর অরণ্যে ভূত বাস করে বলিয়া নিয়াম্-নিয়াম্‌রা বিশ্বাস করে। বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর শব্দ ভূতের কণ্ঠস্বর বলিয়া ইহারা মনে করে। কোন লোক ভূতগ্রস্ত হইয়াছে কিনা, পরীক্ষা করিবার জন্য ইহারা একটি মোরগকে জলের ভিতরে চাপিয়া ধরে। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি মোরগটি বাঁচিয়া উঠে, তবে নিরাপদ মনে করে; কিন্তু মরিয়া গেলে দুর্লক্ষণ মনে করিয়া নিতান্ত ভীত হইয়া পড়ে।

কোন আত্মীয়ের মৃত্যু হইলে নিয়াম্-নিয়াম্‌রা মস্তক মুণ্ডন করে, এবং মৃত ব্যক্তির দেহ কর্দ্দমে প্রোথিত করিয়া তদুপরি একখানি ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দেয়।

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর।

পাঠক, বর্ত্তমান সংখ্যা "প্রদীপের" প্রারম্ভ স্থানে যাঁহার ছবি দেখিতেছেন, ইঁহারই প্রণীত 'নীলদর্পণ' অভিনয় করিয়া আজ কলিকাতার দুইটি রঙ্গালয় কত লোককে মোহিত করিতেছে। প্রায় ২৫ বৎসর হইল ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।

১২৩৬ সালে চৈত্র মাসে দীনবন্ধু মিত্র জন্মগ্রহণ করেন। যমুনানদীবেষ্টিত চৌবেড়িয়া গ্রাম ইঁহার জন্মস্থান। তাঁহার পিতা দরিদ্র ছিলেন। তিনি গ্রামস্থ পাঠশালায় পুত্রের লেখা পড়া সমাপ্ত হইলে, তাঁহাকে এক জমিদারী সেরেস্তায় মাসিক আট টাকা বেতনে চাকরীতে নিযুক্ত করিয়া দেন। বালক দীনবন্ধু পিতার ভয়ে কিছুদিন সেই চাকরী করিয়াছিলেন, কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া ইংরাজী শিখিবার জন্য তাঁহার মন নিতান্তই ব্যাকুল হইতে লাগিল। তাঁহার সমবয়স্ক পাঠশালার সহপাঠিগণ অনেকে পূর্ব্বেই লেখাপড়া শিখিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিল। এই সকল কারণে দীনবন্ধুর চাকরী বজায় রাখা অসম্ভব হইয়া উঠিল; তিনি স্বীয় পিতৃদেবের অমতে চাকরী পরিত্যাগ করিলেন এবং কলিকাতায় আসিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তখন তাঁহার বয়স প্রায় পনের কিম্বা ষোল বৎসর হইবেক।

তৎকালে কলিকাতায় তাঁহার পিতৃব্যের এক বাসা ছিল। তিনি তথায় আসিয়া পিতৃব্যপুত্রগণের শরণাপন্ন হইলেন এবং কষ্টে দিনপাত করিয়া ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে তাঁহাকে পালাক্রমে রন্ধন কার্য্যও করিতে হইত। কিন্তু তিনি অবিচলিত অধ্যবসায় ও প্রতিভাবলে সকল বাধাই অতিক্রম করিতে লাগিলেন। তাঁহার পাঠে কিরূপ মনোযোগ ছিল, তৎসম্বন্ধে একদিন-কার ঘটনার উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। একদিন প্রাতঃকালে বাসাতে একজন গায়ক অতি উৎকৃষ্ট গান করিতেছিল। সকলে আনন্দ সহকারে এবং অতি আগ্র-হের সহিত গান শুনিতে ব্যস্ত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, যে গানের গোলমালে সকলকেই নিজ কার্য্য পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল, এইরূপ গোলমাল হইলেও কেহই দীন-বন্ধুকে তথায় দেখিতে পাইলেন না। অনুসন্ধানে জানা গেল যে, তিনি নিকটস্থিত গৃহে পাঠে নিবিষ্টচিত্ত রহিয়াছেন। তাঁহাকে গোলমালের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেন, "কই, আমিত কিছুই টের পাই নাই।" বাহ্যজগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যোগীদিগের ন্যায় নিজ কার্য্যে মনো-নিবেশ করিবার ক্ষমতা উত্তরকালেও তাঁহার জীবনে দেখা যায়। একদিন তিনি সুকিয়া ষ্ট্রীটে মেট্রোপলিটান স্কুলের (তখন কালেজ হয় নাই) পূর্ব্বপার্শ্বের বাটীর বারাণ্ডার উপরিস্থিত বৈঠকখানায় বেলা দশটার সময় বসিয়া কি লিখিতেছিলেন। সেই সময়ে একখানি জুড়ি গাড়ি রাস্তার ধারের খানায় পড়িয়া যায়। স্কুলের ছাত্র এবং অন্যান্য সমস্ত লোক চীৎকার ও গোলমালে একটি ক্ষুদ্র বিপ্লবের যোগাড় করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু দীনবন্ধু বাবুকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করায় তিনি বলিয়াছিলেন যে, আফিসের কাজে এত নিবিষ্ট ছিলেন, কিছুই জানিতে পারেন নাই।

কলিকাতায় আসিয়া স্কুলে ভর্ত্তি হইবার সময় তিনি একটি নূতন রকমের কার্য্য করেন। শৈশবে তাঁহার পিতা নামকরণ কালে তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন, "গন্ধর্ব্ব-নারায়ণ মিত্র"। দীনবন্ধু পিতৃদত্ত "গন্ধর্ব্বনারায়ণ" নাম পরিত্যাগ করিয়া নিজের পছন্দমত দীনবন্ধু নাম গ্রহণ করেন এবং স্কুলের খাতায় ঐ নাম লিখাইয়া দেন। তদ-বধি তিনি স্বগৃহীত নামে পরিচিত হইতে লাগিলেন। 'নীলদর্পণ' তাঁহার স্বগৃহীত নামের সার্থকতা রক্ষা করি-য়াছে। তাঁহার নাম পরিবর্ত্তনের বিশেষ কোন কারণ পাওয়া যায় না। তবে শৈশবকালে "গন্ধর্ব্ব" নামটি ছোট করিয়া সকলে তাহাকে 'গন্ধ' বলিয়া ডাকিত এবং সম-বয়স্কেরা "থু গন্ধ" "দুর্গন্ধ" ইত্যাদি বলিয়া ক্ষেপাইত। দীন-বন্ধু যে ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইতেন না এমন নহে; কেননা তাঁহার পূজনীয়া জননী তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্যই ছোকরাদিগকে বলিতেন যে 'দেখিস্ এরপর ইহার গন্ধে দেশ ভুর ভুর করিবে।' তাঁহার মাতার ভবিষ্যদ্বাণী যে সত্যে পরিণত হইয়াছিল তাহা বাঙ্গালী পাঠকদিগের নিকট সপ্রমাণ করিবার আবশ্যক নাই। সকলেই এক-বাক্যে স্বীকার করিবেন দীনবন্ধুর নামের সৌরভ সমগ্র বঙ্গদেশে বিকীর্ণ হইয়াছে।

কলিকাতায় তিনি প্রথমে প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা লং সাহেবের প্রতিষ্ঠিত একটী ইংরাজি বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। লং সাহেব তাঁহাকে বড়ই স্নেহ করিতেন। কিন্তু তখন দুই জনের কেহই জানিতেন না যে তাঁহাদিগের নাম ভবিষ্যতে অত ঘনিষ্ঠরূপে একত্রীভূত হইবেক। লং সাহেবের স্কুল হইতে দীনবন্ধু মাসিক দুই টাকা মাহিনায় এক স্কুলে ভর্ত্তি হয়েন। স্কুলের মাহিনা তাঁহাকে চাঁদা লইয়া সংগ্রহ করিতে হইত। সেই স্কুল হইতে জুনিয়ার স্কলারসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন এবং বৃত্তি পাইয়া হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। হিন্দু কলেজে নির্দ্দিষ্টকাল অধ্যয়ন করেন ও সিনিয়ার স্কলারসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার কলে-জীয় বন্ধুগণের মধ্যে প্রায় সকলেই পরলোকগত হইয়াছেন; কেবলমাত্র চিকিৎসা শাস্ত্রের গৌরব ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এম ডি, ডি এল; ও নানাভাষাবিৎ সাহিত্যানুরাগী সুলেখক কলিকাতা মিউনিসিপালিটির সুযোগ্য কলেক্টর বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, ইঁহারা এখনো বর্ত্তমান আছেন; এবং আশা করি তাঁহারা দীর্ঘজীবী হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে আরও উন্নতি সাধন করিবেন। তাঁহারা যদি বাল্যসখা দীনবন্ধু মিত্রের জীবন সম্বন্ধে স্ব স্ব পূর্ব্বস্মৃতি কথা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে দীনবন্ধু বাবুর ভবিষ্যৎ জীবনী লেখকের বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে। কেননা রচনায় উভয়েই সুদক্ষ এবং তাঁহাদের মোহিনীলেখনীনিসৃত বাক্যগুলি সকলেরই নিকট সমাদৃত হইবে। পঠদ্দশা হইতেই দীনবন্ধু বাঙ্গালা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তপ্রকাশিত পত্রিকা সমূহে তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছেন, 'প্রভাকরে' দীনবন্ধু যে সকল কবিতা লিখি-য়াছেন, তাহা পুনর্মুদ্রিত হইলে বিশেষরূপে আদৃত হইবার সম্ভাবনা; দীনবন্ধু বাবুর পুত্রগণ বহুযত্নে সেই সকল কবি-তার উদ্ধার করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। যাঁহাদিগের দীনবন্ধুর বাল্যরচনা দেখিবার অভিলাষ আছে, তাঁহারা ঐ পুস্তক পাঠে সকলই জানিতে পারিবেন। কবিতাগুলি বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী না হইলেও, তদা-নীন্তন অনুপ্রাস ও শ্লেষবহুল রচনার সুন্দর দৃষ্টান্ত।

তাঁহার চাকুরীর বিষয় বিশেষ বলিবার কিছু প্রয়োজন নাই। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ডাক বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন। তাঁহার শীঘ্র শীঘ্র পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধি হইয়াছিল। তাঁহার উপরিওয়ালা সিভিলিয়ান সাহেবগণ তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান ও আদর করিতেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট "লুসাই যুদ্ধের" অনুষ্ঠান করেন। ডাকের সু-বন্দোবস্ত করিবার জন্য দীনবন্ধু বাবুকে যুদ্ধমুখে গমন করিতে হইয়াছিল। অনেক সাহেব বাঙ্গালীর নিন্দা করিয়া বলেন যে, তাঁহাদিগকে বিপদ-সঙ্কুল কার্য্যে প্রেরণ করিলে তাঁহারা সহজে গমনোন্মুখ হয়েন না, কিন্তু দীনবন্ধু বাবু যেরূপ তৎপরতার সহিত ও নির্ভীক চিত্তে যুদ্ধযাত্রায় যোগ দিয়াছিলেন, তাহা সচরাচর দেখা যায় না। তাঁহার প্রদ-র্শিত দৃষ্টান্ত বাঙ্গালীর এই অপবাদ বিমোচন করিতে সক্ষম। লুসাই যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগমনের পর গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি প্রদান করেন। সে আজ ২৬ বৎ-সরের কথা। তিনি আঠার বৎসর মাত্র চাকরী করিয়া-ছিলেন, এবং ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই প্রথম শ্রেণীর কর্ম্ম-চারী হইয়াছিলেন। অকালে কালগ্রাসে পতিত না হইলে, তাঁহার পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের পদে উন্নীত হইবার সম্ভাবনা ছিল।

দীনবন্ধু বাবুর চাকরী সম্বন্ধে আর কিছু বলিব না, কিন্তু রাজকার্য্যানুরোধে তাঁহাকে যেরূপ পরিভ্রমণ করিতে হইত, তদ্বিষয় কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতে হইবে, কেননা তাঁহার নাটকের চরিত্রবৈচিত্রের সহিত ইহা কতকাংশে সংশ্লিষ্ট। তিনি বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্রই পরিদর্শন করিয়াছিলেন। গ্রামে গ্রামে তাঁহাকে গমন করিতে হইত। তাঁহার লোকের সহিত মিশিবার ও আলাপ করিবার অদ্বিতীয় ক্ষমতা ছিল, এবং তিনি সকল শ্রেণীর লোকের সহিত মিশিতেন এবং তাহাদের জীবনের কার্য্যকলাপ দেখিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, নাটকপ্রণয়ণ কালে তাহা সম্যক্‌রূপে কার্য্যোপযোগী করিতেন। লোকের সহিত আলাপ করিবার উপলক্ষে তিনি কখন কখন অভিনব পন্থা অবলম্বন করিয়া লোককে বিস্ময়াবিষ্ট করিতেন। আমরা এক্ষণে তাহার একটি দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করিব। একদিন তিন পাল্‌কী করিয়া এক গ্রামের ভিতর দিয়া গমন করিতেছিলেন। অদূরে এক ভদ্রলোকের বাটীর বৈঠকখানায় কতিপয় ভদ্রলোক সমবেত দেখিয়া, বেহারাকে তথায় পাল্‌কী লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। পাল্‌কী তথায় পৌঁছিলে, তিনি পাল্‌কী হইতে নামিয়া বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন, বেহারা তাঁহার বাক্স তাঁহার সমীপে রাখিয়া দিল। তিনি কাহারও সহিত বাক্যালাপ না করিয়া বাক্স হইতে কাগজ বাহির করিয়া একটি বিশেষ দরকারী রিপোর্টের অবশিষ্টাংশ নিবিষ্টচিত্ত হইয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন। উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ মুখ চাওয়াচায়ী করিতে লাগিলেন। তাঁহার লেখা শেষ হইয়াছে, এমন সময় সংবাদ আসিল যে, পাত হইয়াছে। সকলে গাত্রোত্থান করিলেন, দীনবন্ধুও সেই সঙ্গে গাত্রোত্থান করিয়া একটি পাতা দখল করিলেন; সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু কেহই কথা কহিতে সাহস করিলেন না। অবশেষে ভোজনান্তে কথাবার্ত্তা কহিতে দীনবন্ধু স্বীয় পরিচয় প্রদান করেন। গৃহস্বামী তাঁহার এই অযাচিতভাবে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করায় যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। সেই অবধি তিনি দীনবন্ধুর বন্ধু মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন, এবং দীনবন্ধু বাবু ঐ গ্রামে গমন করিলে উপরিউক্ত বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া ফিরিতেন না।

তিনি মফস্বলে গমন করিলে লোকে তাঁহার সহিত আলাপ করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন, এবং তাঁহার পূর্ব্ব-পরিচিত বন্ধুগণ অনেক স্থলে তাঁহার আগমন উপলক্ষে গ্রামস্থ সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া একত্রে মিলিত হইতেন। একবার এইরূপ নিমন্ত্রণ উপলক্ষে একটা হাস্যজনক ঘটনা ঘটিয়াছিল। তখন 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হইয়াছে। সমবেত ভদ্র ব্যক্তিগণ নীলদর্পণের কথা লইয়া আলোচনা করিতেছিলেন। তন্মধ্যে একজন নীলকুঠির দেওয়ান উপস্থিত ছিলেন। তিনি দীনবন্ধু বাবুকে চিনিতেন না, সুতরাং দেওয়ানী ভাষায় বলিয়াছিলেন যে, পুস্তকের ঘটনা ও বর্ণনাগুলি এমনি ঠিক ঠিক হইয়াছে, যেন বোধ হয় "শা—" আমাদের কুঠীর ভিতরে বসিয়া পুস্তক লিখিয়াছে। এই বাক্যের পর গৃহস্বামী দেওয়ান মহাশয়কে দীনবন্ধু বাবুর সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। দেওয়ান নিতান্তই অপ্রতিভ ও ম্রিয়মান হইয়াছেন দেখিয়া, গ্রন্থকার বলিলেন যে, 'মহাশয় আপনার গালাগালি আমার বড় মিষ্টি লাগিয়াছে। কারণ আপনার গালাগালিতে অলক্ষিতভাবে নাটকের যৎপরোনাস্তি প্রশংসা নিহিত রহিয়াছে।' দেওয়ান মহাশয় আর উত্তর করিতে পারিলেন না।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, তিনি লুসাই যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে মণিপুর, কাছাড়, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতির আভ্যন্তরীণ ইতিহাস সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহারই সাক্ষাৎ ফল স্বরূপ তাঁহার শেষ নাটক 'কমলে-কামিনী'। রাজকার্য্যানুরোধে নানা দেশ পরিভ্রমণে তিনি যে বহুদিগ্‌দর্শী জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, সাহিত্য ক্ষেত্রে তাহা অমূল্য হইয়াছিল। কিন্তু এইরূপ পরিভ্রমণের ক্লেশ ও শ্রান্তি তাঁহার শরীর ভগ্ন হইবার একটি কারণ। শরীর একবার ভগ্ন হইলে তাহাতে উৎকট রোগ সকল সহজেই প্রবেশ লাভ করে। দীনবন্ধু বাবুর স্বাস্থ্য বিষয়ে তাহাই ঘটিয়া ছিল। চল্লিশ বৎসরের কিছু পরেই তাঁহাকে বহুমূত্র রোগে আক্রমণ করিয়াছিল। এবং তদানুষঙ্গিক বিস্ফোটকে ছিন্নবিচ্ছিন্নশরীর হইয়া চুয়াল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি ভবলীলা সাঙ্গ করেন। তাঁহার মৃত্যুদিন শনিবার ১লা নবেম্বর ১৮৭৩। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ 'নীলদর্পণ' ১৮৬০ সালে প্রকাশিত হয়।

তৎপরে যথাক্রমে নবীনতপস্বিনী, বিয়েপাগলা বুড়ো, সধবার একাদশী, লীলাবতী, সুরধুনী কাব্য, জামাই বারিক, দ্বাদশ কবিতা ও কমলে কামিনী প্রকাশিত হয়। তাঁহার গ্রন্থ সমালোচন করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে, তবে তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিলে অসঙ্গত হইবে না। তিনি স্বীয় পুস্তক মধ্যে বন্ধুগণের নাম প্রবেশ করাইবার সুবিধা পাইলে তাহা পরিত্যাগ করিতেন না। 'জামাই-বারিকের' জামাইগণের তালিকায় তাঁহার খ্যাতনামা বন্ধু সকলের নাম সন্নিবিষ্ট আছে। ইহার আর একটি দৃষ্টান্ত আমরা 'নবীনতপস্বিনী'তে দেখিতে পাই।

"যদবধি হাঁদাপেট হেরেছি নয়নে,
পূর্ণচন্দ্র কার্ত্তিকেয় নাহি ধরে মনে।"

এই কবিতার শেষ চরণে সাধারণ পাঠক পূর্ণচন্দ্র অর্থে পূর্ণিমার চাঁদ ও কার্ত্তিকেয় অর্থে ষড়ানন বুঝিয়া থাকেন। অর্থ অতি সুসঙ্গত হয়, কিন্তু কবি পূর্ণচন্দ্র ও কার্ত্তিকেয় শব্দ দ্বয়ে তাঁহার অপরূপরূপলাবণ্যসম্পন্ন সুন্দরকান্তি বন্ধু, কৃষ্ণনগর রাজবংশের দৌহিত্র বাবু পূর্ণচন্দ্র রায় এবং স্বনামখ্যাত ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতপ্রণেতা বাবু কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়দিগকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থে কোন কোন স্থলে জীবন্ত ব্যক্তির মুখনিঃসৃত বাক্য অবিকল প্রবিষ্ট করিয়া দেন এবং কোন স্থলে মর্ম্ম ঠিক রাখিয়া ভাষাগত কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া দেন। বাহুল্য ভয়ে ইহার দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলাম না।

দীনবন্ধু বাবুর জীবনের স্থূল স্থূল ঘটনা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে তিনি কি প্রকার লোক ছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব। স্বভাবতই লোকের মনে হইবে যে, দীনবন্ধু বাবু কৌতুকপ্রিয়, হাস্যরসের অবতারস্বরূপ, আমোদপ্রমোদপরায়ণ হইয়া সরলান্তঃকরণে প্রাণ ভরিয়া হাসিতেন এবং লোককে হাসাইতেন। একথা সত্য হইলেও একদেশদর্শী। কারণ তিনি যেমন হাসিতে ও হাসাইতে জানিতেন, সেইরূপ কাঁদিতে ও কাঁদাইতেও জানিতেন। তিনি পরের দুঃখে যার পর নাই কাতর হইতেন এবং সেই দুঃখ বিমোচন করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতেন। নীলকর-প্রপীড়িত ব্যক্তিগণের দুঃখ নিজের দুঃখের ন্যায় অনুভব করিয়াছিলেন এবং নয়নাসারে লেখনী অভিষিক্ত করিয়া নীলদর্পণ রচনা করিয়া বঙ্গীয় পাঠকমণ্ডলীকে কাঁদাইয়াছেন। কিন্তু তিনি জানিতেন মনুষ্যজীবন শুধু ক্রন্দনের জন্য নহে, তাই হাস্যরসের প্রকৃত ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় দেশে হাসির স্রোত প্রবাহিত করিতেন। তাঁহার গ্রন্থে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার জীবনেও তাহাই লক্ষিত হয়। কপটতা তাঁহার ধর্ম্মের অঙ্গীভূত নহে। সমাজমধ্যে কপটতা দেখিলেই তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রক্ষেপ করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না।

অগ্রেই তাঁহার হাস্যরসপটুতার কথা বলা হইয়াছে। এই হাস্যরসপটুতা গুণে তিনি সরস সুমিষ্ট কথোপকথনে সকলকেই মুগ্ধ করিতে পারিতেন। বর্ত্তমান পাঠকমণ্ডলীর অনেকেই পূজ্যপাদ স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সরস কথোপকথনের বিষয় অবগত আছেন। একদিন কোন বন্ধুর বৈঠকখানায় বিদ্যাসাগর মহাশয় গল্প করিয়া শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করিতেছিলেন, এমন সময় দীনবন্ধু বাবু তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কহিলেন, 'এই যে আমার ভায়া এসেচেন, এইবার আমি অবসর গ্রহণ করি,' এবং দীনবন্ধুকে আসর ছাড়িয়া দিলেন। আর একদিনকার ঘটনা এইরূপ। দীনবন্ধু বাবু গুটিকত বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। রাত্রি ৮ ঘটিকা না হইতেই দুই একজন বন্ধু আহারের জন্য ব্যস্ত হইলেন। দীনবন্ধু বাবু রন্ধনশালায় সংবাদ লইয়া জানিলেন যে, ১১টার আগে আহার প্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা নিতান্তই অল্প। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সে ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। তখন দীনবন্ধু বাবু ও বিদ্যাসাগর মহাশয় পাশাপাশি বাটীতে অবস্থিতি করিতেন। দীনবন্ধু বাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়কে রন্ধনশালার অবস্থা জানাইলেন এবং দুইজনে পরামর্শ করিয়া মজলিসে বসিলেন এবং কথোপকথনে সকলকে এরূপ মুগ্ধ করিলেন যে, অভ্যাগত ব্যক্তিগণ আহারের বিষয় একেবারে বিস্মৃত হইলেন। রাত্রি প্রায় ১১টার সময় আহার প্রস্তুত হইয়াছে সংবাদ আসিল; কিন্তু তখন বন্ধুবর্গ দীনবন্ধু বাবুর সৃষ্ট হাস্যরসসাগরে ভাসিত এবং গাত্রোত্থানে অসম্মত। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, 'আর কথোপকথনে প্রয়োজন নাই, আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে।' ইহার পর সভা ভঙ্গ হইল। বঙ্কিম বাবু বলিতেন যে, দীনবন্ধু সকলেরই সহিত

হাসিতামাসা করিতেন। কাছাড় হইতে প্রত্যাগমন করিয়া বঙ্কিম বাবুকে এক জোড়া কাছাড়ের নির্ম্মিত চর্ম্মবিহীন বস্ত্রের জুতা পাঠাইয়া দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একখানি পত্র প্রেরণ করেন। তাহাতে কেবল এই কয়েকটি কথা ছিল, "কেমন জুতা"! বঙ্কিমচন্দ্র জুতা ও পত্র একসঙ্গে পাইয়া হাস্যসংবরণ করিতে পারেন নাই। বঙ্কিম বাবু আরও বলিতেন যে, মুন্সেফ এবং ডেপুটি সংক্রান্ত হাস্যজনক গল্পের ভাণ্ডার দীনবন্ধুর সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ থাকিত; এ শ্রেণীর একটি গল্প পাঠকগণকে উপহার দিব।

গল্পটি এইরূপ;--এক তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইবার আশা করিতেছেন, এমন সময় নিম্নলিখিত পরোয়ানা তাঁহার হস্তগত হইল। "The Lieutenant-Governor has been pleased to allow you to discharge the functions of a Munsiff of the second grade." মুন্সেফ বাবু ইংরাজিতে অনভিজ্ঞ, সেরেস্তাদারের শরণ লইলেন। সেরেস্তাদারও তদ্রূপ, তবে decree discharge কথা জানিতেন। তিনি মুন্সেফ বাবুকে বলিলেন যে, আপনাকে ডিস্‌চার্য অর্থাৎ কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছে। মুন্সেফ বাবু বিষণ্ণ মনে ডেপুটি বাবুর আশ্রয়ে উপনীত। ডেপুটি বাবু ব্যাখ্যা করিলেন যে, হাঁ ডিস্‌চার্য্য করেছে বটে; কিন্তু pleased খুসী হয়ে ডিস্‌চার্য্য করেছে। ডেপুটিরত্নের pleased কথাটার অর্থ জানা ছিল। মুন্সেফ ভাবিলেন, যদি ছাড়িয়েই দেবে, তবে খুসী হবে কেন? তিনি ডেপুটির ব্যাখ্যায় সন্দিহান হইয়া পরোয়ানা সদরে পাঠাইয়া দিলেন। তথা হইতে প্রকৃত ব্যাখ্যা আসিলে মুন্সেফ বাবু নিশ্চিন্ত হইলেন।

আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আমরা বিদায় লইব। আষাঢ় মাসের 'প্রদীপে' বাবু চন্দ্রনাথ বসু "বন্ধুবৎসল বঙ্কিমচন্দ্র" শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্কিম বাবু সম্বন্ধে গুটিকতক কথা বলিয়াছেন। ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের ইদানীন্তন কতিপয় বন্ধুর নাম সন্নিবিষ্ট আছে। কিন্তু আমরা বন্ধুবৎসল বঙ্কিমচন্দ্রের ইহলোকপরলোকব্যাপী বন্ধুত্বের বিষয় জানাইতে ইচ্ছা করি। দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধুত্ব এক্ষণে সাহিত্যের অঙ্গীভূত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দুইজনে অকৃত্রিম প্রণয় ছিল। দীনবন্ধু বঙ্কিমচন্দ্রকে "নবীন তপস্বিনী" উৎসর্গ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে "মৃণালিনী" উৎসর্গ করেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এইখানে নিরস্ত হইতে পারেন নাই। দীনবন্ধুর মৃত্যুতে বঙ্কিমচন্দ্র এতই শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন যে, বঙ্গদর্শনে দীনবন্ধু সম্বন্ধে কিছুই লিখিতে পারেন নাই। অনেকেই ইহাতে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল এবং সেই কারণেই বঙ্কিম বাবু "বঙ্গ-দর্শনের বিদায় গ্রহণ" প্রবন্ধে এই বিষয়ের কতকটা কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন। দীনবন্ধুর প্রেম, ভালবাসা, প্রণয় বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়পটে এরূপ উজ্জ্বলরূপে অঙ্কিত ছিল যে, তিনি স্থির করিলেন, স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে সম্বন্ধ আছে। ইহা হইতে আনন্দমঠের অভিনব উৎসর্গের সৃষ্টি। যদি বৃহতের সহিত ক্ষুদ্রের তুলনা করা যায়, তবে বলা যাইতে পারে, আনন্দমঠের উৎসর্গ বাঙ্গলা সাহিত্যের "In Memoriam."

অনেকেই বঙ্কিম বাবুর নিজ মুখে শুনিয়াছেন যে, আনন্দমঠের উৎসর্গে বঙ্কিমচন্দ্র "ক্ষণভিন্ন সুহৃদ" দীনবন্ধুর পবিত্রস্মৃতি কল্পিত করিয়াছেন। দীনবন্ধু বাবুর তৃতীয় পুত্র বাবু বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র এম্, এ, বি, এল্, বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত 'অঞ্জলিদান' নামক শোক কবিতায় আনন্দমঠের উৎসর্গের এইরূপ সুন্দররূপে ও সহৃদয়তার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন:—

* * * * * *

জীবন-সখার * তার † প্রাণের ক্রন্দন
শুনিল কেবল সেই অন্তর্যামী জন;
সেই ব্যথা, সে হৃদয়ে গাঢ় রেখাময়;
সেই প্রেম সে সখার ভুলিবার নয়।
তাই কত বর্ষ পরে, দাঁড়ায়ে যখন
আনন্দমঠের দ্বারে, গীতিময়প্রাণ,
ল'য়ে ভক্তিগীতিময় কুসুম চন্দন
করি সপ্ত কোটি প্রাণে বেগে বহমান
এক প্রাণ জীবনের তড়িৎ প্রবলা,
গেয়েছিল মহাগীত, আনন্দে অধীর
সুজলা, সুফলা সেই অনন্ত-শ্যামলা
স্বর্গাদপি গরীয়সী মহাজননীর;
তখন অপর দিকে ডাকিল হৃদয়
'ক্ষণভিন্নসৌহৃদ' সে জীবনসখায়
অমর প্রেমের এই মহা দিগ্বিজয়,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে এ সম্বন্ধ কভু না ফুরায়।

দুইজনেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া আবার একত্রে মিলিত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের কীর্ত্তিরাশি চিরকালের জন্য বঙ্গদেশে দেদীপ্যমান রহিল।

* দীনবন্ধু। † বঙ্কিমচন্দ্র।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

দ্যাসাগর
বিদ্যাসাগর ল

শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু।

প্রদীপ

প্রথম ভাগ। | আশ্বিন ও কার্ত্তিক, ১৩০৫। | ১০ম ও ১১শসংখ্যা।

পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।*

যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে নিম্নলিখিত বচনটী প্রাপ্ত হওয়া যায়;—

তরবোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি॥

অর্থ—"তরুলতাও জীবন ধারণ করে; পশু পক্ষীও জীবন ধারণ করে, কিন্তু সেই প্রকৃতরূপে জীবিত যে মননের দ্বারা জীবিত থাকে।"

মনন শব্দের অর্থ মনের ক্রিয়া বা ব্যাপার। লূতাতন্তুর ন্যায় অথবা ক্ষৌমকীটের ক্ষৌমকোষের ন্যায় মন সর্ব্বদাই কিছু বুনিতেছে; আপনার অন্তর্নিহিত জ্ঞানসামগ্রী সকলের সাহায্যে সর্ব্বদাই নব নব আদর্শ রচনা করিতেছে—মনের এই যে অবিশ্রান্ত গঠনকার্য্য ইহার নাম মনন। ইহা মানবেরই স্বধর্ম্ম, অপর জীবে নাই।

মানুষের যেন দুইটা জীবন আছে, একটা দেহরাজ্যে, আর একটা এই মনন-রাজ্যে। দেহ-রাজ্যের জীবনটা সামান্য, সংকীর্ণ ক্ষেত্রে আবদ্ধ এবং শক্তি, সময় ও সর্ব্ববাদিদ্বারা নিয়মিত; কিন্তু মনন-রাজ্যের জীবনটা পরদুঃখ, সুদূর প্রসারিত ও গগন-সঞ্চারী বায়ুস্রোতের ন্যায়। তাঁহা জগতের মহামনা ব্যক্তিগণ দেহ-রাজ্যের জীবনকে আলো জানিয়া মনন-রাজ্যের জীবনকেই সার জ্ঞান করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ যাঁহারা মানব সমাজের সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহারা আপনাদের মনন-রাজ্যেই অধিকাংশ সময় বাস করিতেন। তাঁহাদের চরিত্রকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে তন্মধ্যে কতকগুলি উপাদান দৃষ্ট হয়। তাহার মধ্যে প্রধান—বর্ত্তমানে অতৃপ্তি। এটা মানব-প্রকৃতির স্বধর্ম্ম বলিলেও হয়। মানব স্বীয় অবস্থাতে কখনই পরিতৃপ্ত নহে। মানব যাহা একবার পায়, তাহার প্রতি আর ফিরিয়া তাকায় না; যাহা পায় নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে পাইতে পারে, সেই পথ চাহিয়া থাকে। বর্ত্তমান দেখিয়া আমরা সর্ব্বদাই অসুখী। আমরা যেন সর্ব্বদা বলিতেছি আমি আপনার মনের মত হইতে পারিলাম না, আমার গৃহ পরিবার, আমার সমাজ, আর এই প্রকাণ্ড মানব সংসার আমি যে দিকে তাকাই, কেহই, কিছুই, ঠিক্ মনের মত নহে; মনের মধ্যে যে পূর্ণতার আদর্শ আছে সকলই যেন তাহার নিম্নে পড়ে; মানবের আচার ব্যবহারে, কার্য্যকলাপে, আইন আদালতে, যতটা সত্য, যতটা ন্যায় বা যতটা প্রেম আছে, যেন তাহা যথেষ্ট নহে; আমরা আরও চাই, ইহাই যেন মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক ভাব। এই যে অতৃপ্তি, যাহা তোমার আমার হৃদয়ে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় থাকে, উস্কাইলেই পাই, প্রশ্ন করিলেই দেখা দেয়, ইহাই জগতের ধর্ম্ম বা সমাজ সংস্কারকদিগের হৃদয়ে ঘনীভূত আকারে প্রকাশ পায়। এই অতৃপ্তি নর-প্রেমের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদিগকে ঘোর দুঃখে নিমগ্ন করে। তাঁহাদের সহিত আর একটী বিষয়ে আমাদের প্রভেদ আছে। আমাদের অতৃপ্তি অনেক সময়ে দরিদ্রের মনোরথের ন্যায় হৃদয়ে উদয় হইয়াই লয় প্রাপ্ত হয়, কিন্তু নির্ম্মলচিত্ত মহামনা ব্যক্তিদিগের অন্তরে তাহা স্থায়ী ফল প্রসব করে। তাঁহারা এই অতৃপ্তি লইয়া বসিয়া থাকেন না; মনন-শক্তির বলে ভবিষ্যতের ছবি গড়িতে থাকেন। ইহা যেন কতকটা ছায়াবাজী বা ম্যাজিক লণ্ঠনের ন্যায়। মন নিজের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার আদর্শকে ভবিষ্যতের পটে ফেলিয়া সেই শোভা দর্শন করিতে থাকে ও তাহাতে মুগ্ধ হইয়া বর্ত্তমানের

* বিগত ১৩ই শ্রাবণ তারিখে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যু দিনোপলক্ষে, 'ঝামাপুকুর রিডিং রুম ও বিদ্যাসাগর লাইব্রেরীর' অনুরোধে এই প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল।

হীনতা ভুলিয়া যায়। বিষয়াসক্ত চিত্তের পক্ষে এই ভবিষ্যতের ছবি মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় বোধ হইতে পারে; মৃগতৃষ্ণিকা যেমন জলের মত দেখায় অথচ জল নয়, এই ছবিও সেইরূপ সত্যের মত দেখাইলেও সত্য নহে। ইহার জন্য সেরূপ ব্যক্তি এক পয়সাও ব্যয় করিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু জগতের এক শ্রেণীর লোকের নিকট ইহা অপেক্ষা অধিক সত্য আর কিছু নাই, চক্ষু যেমন আকাশে বিস্তৃত পদার্থকে দর্শন করে, তাঁহারাও ইহাকে সেইরূপ উজ্জ্বল ভাবে দর্শন করিয়া থাকেন। ইহা তাঁহাদের ধ্যান জ্ঞানে প্রবেশ করে, তাঁহাদের চিত্তকে সিক্ত ও আপ্লুত করে, তাঁহাদের কল্পনাকে উত্তেজিত করে ও হৃদয়কে জাগ্রত করে!

তৎপরে জগতের ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারকদিগের আর একটী লক্ষণ আছে, তাহাও মানব-প্রকৃতির স্বধর্ম্ম বলিলে হয়। সেটী নিজ মনন-গঠিত আদর্শে অনুর[illegible] এই অনুরাগের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে [illegible]ময় সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। আজি যদি সকলে শুনেন, একজন চিত্রকর নিজে এক নারীমূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া তাহার সহিত এমনি প্রেম পড়িয়াছে যে, তজ্জন্য সে আহার নিদ্রা বিবর্জ্জিত হইয়াছে, তাহা হইলে সকলে তাহাকে বাতুল মনে করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি দেখি মানব প্রকৃতিতে এই বাতুলতা বিদ্যমান রহিয়াছে। মানুষ আপনার মনন-শক্তির দ্বারা যে ছবি বা যে আদর্শ সমুৎপন্ন করে, তাহাতে এমনি আসক্ত হয় যে, জীবনকে জীবন জ্ঞান করে না। ইহা প্রতিদিন প্রত্যেকে দেখিতেছেন। লক্ষ লক্ষ লোক স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য বা গৌরবের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতেছে, কিন্তু স্বাধীনতা বা জাতীয় গৌরব কি বস্তু? ইহার আকৃতি প্রকৃতি কি প্রকার? ইহা কোন্ স্থানে বাস করে? ইহার অপেক্ষা সূক্ষ্ম, অতীন্দ্রিয় ও আধ্যাত্মিক পদার্থ আর কি হইতে পারে? ইহা মানবের মনন-রচিত, কল্পনা-সমুদ্ভূত আদর্শ মাত্র। একজন ইংরাজ যে জাতীয় গৌরবের জন্য প্রাণ দেয়, একজন কাফ্রী সে জাতীয় গৌরব দেখিতে পায় না কেন? গত শতাব্দীর শেষ ভাগের ফরাসি বিপ্লবের অধিনায়কগণ সাম্য ও স্বাধীনতার জন্য যেরূপ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিলেন, কোন্ পুরুষ কোন্ স্ত্রীলোকের জন্য, আজি পর্য্যন্ত এতদূর ক্ষিপ্ত হইয়াছে? তাই বলি মানুষ আপনার মনন-শক্তির রচিত ছবিকে এত ভালবাসিতে পারে যে, কোন পুরুষ স্ত্রীকে বা স্ত্রী পুরুষকে তত ভালবাসে না। বিষয়াসক্তি-শূন্য, নিঃস্বার্থ, প্রেমিক প্রকৃতিতে এই প্রেম পূর্ণ মাত্রায় জাগিয়া থাকে। তাঁহারা তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া ইহাতে একেবারে নিমগ্ন হইয়া যান এবং মানুষ যেমন আলেয়ার পশ্চাতে ছোটে, তেমনি তাহার পশ্চাতে ছুটিতে থাকেন। আবার ভাবিয়া দেখ এই যে বর্ত্তমানে অতৃপ্তি, এই যে ভবিষ্যৎ রচনা, ও এই যে মনন-রচিত আদর্শে আসক্তি, ইহাদের অন্তরালে কি? কোন্ ছবিতে মানুষকে বাতুল করে? ন্যায় ও অন্যায় সাম্য ও বৈষম্য, সত্য ও অসত্য ইহার মধ্যে কোন্‌টাতে মানব চিত্তকে উন্মাদ-গ্রস্ত করে? কোন্‌টীর জন্য মানুষ প্রাণমন সমর্পণ করে? সাম্যের পরিবর্ত্তে বৈষম্য যদি ফরাসি বিদ্রোহের অধিনায়কদিগের লক্ষ্যস্থলে থাকিত, তাহা হইলে কি তাঁহারা সেরূপ ক্ষিপ্ত হইতে পারিতেন? অনুসন্ধান করিয়া দেখ, পরীক্ষা করিয়া দেখ, যেখানেই মানবচিত্ত ভবিষ্যতের কোনও আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উন্মাদগ্রস্ত হইতেছে, সেখানে সত্য, ন্যায়, প্রেম, পবিত্রতা প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাই দেখিতে চাহিতেছে; এবং এই গুলিই হৃদয়ে থাকিয়া হৃদয়কে উত্তেজিত করিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপ ও আমেরিকার সভ্যদেশ সকলে ভূমিকম্পের ন্যায় যে ঘন ঘন সমাজ-কম্প হইতেছে, এবং ধনী দরিদ্রে, রাজা প্রজাতে যে ঘোর বিদ্রোহ চলিতেছে, সেখানেও মানুষের দৃষ্টি সত্য, ন্যায়, প্রেম প্রভৃতির প্রতিষ্ঠার দিকে নিবদ্ধ হইয়াছে।

কিন্তু সত্য ন্যায় প্রেম প্রভৃতি ঈশ্বরের স্বরূপ, অতএব যদি [illegible]লি যে স্বয়ং ঈশ্বর মানব-আত্মাতে নিহিত থাকিয়া মা[illegible]কে আপনার অভিমুখে লইতে চাহিতেছেন, ত[illegible]ল কি অত্যুক্তি হয়? ঈশ্বর আমাদের প্রকৃতিতে নিহিত আছেন বলিয়াই আমাদের এপ্রকার বাতুলতা রহিয়াছে। ইহা হৃদয়বাসী ঈশ্বরের নিঃশ্বাস. ইহা তাঁহারই ফুৎকার। এই বাতুলতাতেই আমাদের প্রকৃত মনুষ্যত্ব। আমরা জগতের অসত্য, অন্যায়, অপ্রেমের বিষয় চিন্তা করিয়া পাগল হইতে পারি, এইটুকুই আমাদের মনুষ্যত্ব। মনুষ্যত্ব কেন, এটুকু আমাদের দেবত্বও বটে, কারণ এখানে দেব মানবে সম্মিলন। যদি বল সকলেত পাগল হয় না? আমি বলি, মনুষ্যনামধারী সকলেত মানুষ নয়। আমাদের সৌভাগ্য

এই যে, আমরা এরূপ পাগল মানুষ দুই চারি জন পাই; তাহা না হইলে মনুষ্য-সমাজের গতি কি হইত? আমি এরূপ একজন পাগল মানুষের বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে যাইতেছি।

কেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে পাগল বলিতেছি? যিনি গতানুগতিকের পথ পরিত্যাগ করিয়া, জগতের ধনধান্য সম্ভোগের পথ পরিত্যাগ করিয়া, সংসারের আরাম, বিশ্রাম, আত্মীয়তাদির সুখ পায়ে ঠেলিয়া, পরের জন্য আপনাকে দুরন্ত শ্রমে নিক্ষেপ করিলেন, যিনি হাজার হাজার টাকা তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দিলেন, যিনি অম্লানচিত্তে লোকনিন্দা ও নির্য্যাতনের মুকুট মাথায় তুলিয়া পরিলেন, যিনি লোক নিন্দার বোঝা পৃষ্ঠে লইয়া বালবিধবাদিগকে কর্দ্দম হইতে তুলিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন, এমন মানুষকে পাগল বৈ আর কি বলিব? বিদ্যাসাগর মহাশয় মনে করিলে দেহরাজ্যের সামান্য জীবনে কি সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেন না? তিনি নিজের শ্রমের অন্ন কি সুখে আহার করিতে পারিতেন না? নিজের অসাধারণ প্রতিভাবলে পণ্ডিতকুলের মধ্যে যশস্বী হইয়া জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত সৌভাগ্যলক্ষ্মীর ক্রোড়ে কি বাস করিতে পারিতেন না? বঙ্গদেশে এমন কোন্ পদ কে অধিকার করিয়াছে যাহা বিদ্যাসাগর মনে করিলে অধিকার করিতে পারিতেন না? কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে সে পথে যাইতে দিলেন না। কি যেন কিসের জন্য তাঁহাকে পাগল করিয়া জগতের মহৎ ব্যক্তিদিগের মধ্যে তাঁহার নাম লিখিয়া দিলেন।

আমরা সচরাচর বলি তিনি দেশমধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্য পাগল হইয়াছিলেন, তিনি পরদুঃখে কাঁদিয়াছিলেন, ওটাত বাহিরের মানুষের কা[illegible] তাঁহার ভিতরের মানুষটা কি ছিল, অগ্রে [illegible]কটু আলোচনা করা যাউক। সেটা কি [illegible]দ্যাসাগরের বিদ্যাসাগরত্ব হইয়াছিল, যাহা [illegible]কে পার্থিব ধন মানের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিতে দেয় নাই, যাহা তাঁহাকে সোজা-পথে নিজ অভী[illegible] দিকে লইয়া গিয়াছিল? এ জগতে সোজাপথে চ[illegible] বড় সহজ? একটা লক্ষ্য স্থির না থাকিলে কি [illegible]থ চলা যায়? যদি গগনে ধ্রুবতারা না থাকিত, তা[illegible] হলে নাবিকগণ কি সোজা পথে চলিতে পারিত? সেইরূপ এই তেজস্বী পুরুষ সিংহগণ যে জীবনে সোজাপথে চলিয়াছেন, তাহার মূলে কি? আমি এজীবনে যে অল্পসংখ্যক মানুষকে সোজাপথে চলিতে দেখিয়াছি, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার মধ্যে একজন প্রধান। আমি যখন ৮বৎসরের বালক, তখন প্রথমে তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হয়। সেই দিন হইতে আমাকে ভাল বাসিতেন, এবং সেই দিন হইতে আমি তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছি,—এমন সোজাপথে চলিবার মানুষ আমি অল্পই দেখিয়াছি। আমি তাঁহার অত্যুজ্জ্বল গুণাবলীর পার্শ্বে দুই একটা উৎকট দোষও দেয়াছি, কিন্তু সেই তেজঃপুঞ্জ চরিত্রের সোজাপথে চলা যখন স্মরণ করি, তখন আর কোনও দোষের কথা মনে থাকে না, বলি হায় হায়! এমন মানুষ আবার কতদিনে পাইব?

তবে বিদ্যাসাগরের চরিত্রের মেরুদণ্ড কি? সে কি জিনিস যাহা হৃদয়ে থাকাতে তিনি সোজা পথে চলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? তাহা মানব-জীবনের মহত্ত্ব-জ্ঞান। কথাটা শুনিতে ছোট, কিন্তু ফলে অতিশয় বড়। তুমি আমি এ জগতে কি হইব বা কোন্ স্থান অধিকার করিব, তাহার অনেকটা ইহার উপরে নির্ভর করে। তুমি যদি জীবনটাকে ক্ষুদ্র করিয়া দেখ, তাহা হইলে ক্ষুদ্রতাতেই সন্তুষ্ট হইবে, যদি মহৎ করিয়া দেখ, তবে মহত্ত্বের দিকে তোমার দৃষ্টি পড়িবে। তাহা হইলে জীবনের সামগ্রী অপেক্ষা জীবনকে বড়ই উচ্চ বোধ হইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবিকা অপেক্ষা নিজ মনুষ্যত্বকে অনন্তগুণে অধিক উচ্চ পদার্থ মনে করিতেন। তাঁহার মনুষ্যত্বের প্রভাব এত অধিক ছিল যে, তিনি সেই প্রভাবে স্বদেশ ও স্বজাতির অনেক উপরে উঠিয়াছিলেন। যেমন ক্ষুদ্রকায় বনজ গুল্মসকলের মধ্যে দীর্ঘদেহ শালবৃক্ষ দণ্ডায়মান থাকে, তেমনই সেই পুরুষ-সিংহ নিজ মহৎ মনুষ্যত্বে স্বসমকালীন জনগণকে বহু নিম্নে ফেলিয়া ঊর্দ্ধ-শিরা হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "ভারতবর্ষে এমন রাজা নাই, যাহার নাকে এই চটিজুতা শুদ্ধ পাখানা তুলিয়া টক্ করিয়া লাথি মারিতে না পারি।" ঠিক্ কথা! এরূপ তেজস্বী পুরুষের নিকটে রাজা রাজড়া কোথায় লাগে? সমগ্র দেশের লোকের বাহু একত্রে বাঁধিলে এমন একটা মানুষকে আঁকড়াইয়া ধরা ভার। তিনি

স্বদেশবাসীদিগকে বিধবাবিবাহ বুঝাইবার জন্য শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়াছিলেন বটে, বাহিরে দেখিতে শাস্ত্রের দোহাই দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মন শাস্ত্রের নিম্নে না পড়িয়া শাস্ত্রের উপরে উঠিয়া শাস্ত্রকে আদেশ করিয়াছিল,—"আমি এইটা চাই, তোমাকে ইহা প্রমাণ করিতেই হইবে।" শাস্ত্র তাঁহার হস্তে কাদার তালের ন্যায় যাহা চাহিয়াছিলেন, তাঁহাকে [illegible] দিয়াছিল। এই মনুষ্যত্বের বিক্রম সম্বন্ধে কেবল একজন মহাপুরুষের সহিত তাঁহার তুলনা হইতে পারে, তিনি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়। রামমোহন রায়ের মনুষ্যত্ব ভারতবর্ষে ধরে নাই, উছলিয়া জগতে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনুষ্যত্বও দেশে ও শাস্ত্রে ধরে নাই; উছলিয়া গিয়াছিল।

নিজের মনুষ্যত্বের মহত্ত্ব-জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে পরদুঃখকাতর হৃদয় ছিল, সেই জন্যই অপরের প্রতি অত্যাচার দেখিলে, কাহাকেও অন্যায়রূপে কোনও মনুষ্যত্বের প্রাপ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত দেখিলে, তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। রামমোহন রায়ের ধর্ম্মসংস্কারের চেষ্টা এইজন্য; বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ প্রচলন ও বহুবিবাহ নিবারণের চেষ্টাও এই জন্য। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে অসত্য ও অন্যায়ের গন্ধ সহ্য করিতে পারিতেন না, তাহার কারণ এই, অসত্য বা অন্যায়কে তিনি মানব-জীবনের পক্ষে এত হীনতা মনে করিতেন যে, তাঁহার চিত্ত তাহার চিন্তনেও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিত। অনেকে জানেন, তিনি এক কথায় পাঁচশত টাকার চাকুরি ছাড়িয়াছিলেন। তাহার মূলে কি? এই অদম্য, অনমনীয়, মনুষ্যত্ব। ডিরেক্টর তাঁহাকে এরূপ কিছু কাজ করিতে বলিলেন, যাহা তাঁহার বিবেচনায় সত্যানুগত নহে। তিনি সে কথা ডিরেক্টরকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, ডিরেক্টর শুনিলেন না। বলিলেন, "You must! You must" এই শব্দদ্বয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনুষ্যত্বের উপরে জ্বলন্ত অয়োগোলকের ন্যায় পড়িল; তিনি আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না; এ চাকুরি তাঁহার বিষবোধ হইতে লাগিল; কেহই তাঁহাকে তাহাতে রাখিতে পারিল না। তৎপরে স্বয়ং লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ডাকাইয়া পুনরায় স্বীয় পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন, তিনি কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর যখন বলিলেন, তোমার ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে কিসে? তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "আপনি কি মনে করেন যে, আপনাদের দ্বারস্থ না হইলে আমার দিন চলিবে না? আপনি ভাবেন কি? এই কলিকাতা সহরে আমি ৫৲ টাকাতে দিন চালাইতে পারি।" তিনি আমাকে একদিন বলিয়াছিলেন যে, তিনি যে স্কুলপাঠ্য গ্রন্থাবলী রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহার একটা কারণ রাজপুরুষদিগকে দেখান যে, তিনি তাঁহাদের দাসত্ব না করিয়াও সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ।

পূর্ব্বে যে বর্ত্তমানে অতৃপ্তি, ভবিষ্যৎরচনা ও নিজ আদর্শে আসক্তি এই তিনটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি, যাহা মানবপ্রকৃতির গভীর রহস্য এবং যাহা মানবজাতির মুখপাত্র স্বরূপ প্রত্যেক মহাজনে দৃষ্ট হইয়াছে, উহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। তিনি হৃদয়ে যে ছবি দেখিতেন ও অন্তরের অন্তরে যাহা চাহিতেন, তাহার সহিত তুলনাতে বর্ত্তমানকে তাঁহার এতই হীন বোধ হইত যে, বর্ত্তমানের বিষয়ে কথা উপস্থিত হইলে তিনি সহিষ্ণুতা হারাইতেন। তাঁহার জীবনের শেষভাগে যখন আর তাঁহার পূর্ব্বের ন্যায় খাটিবার শক্তি ছিল না, তখন এই অতৃপ্তি ভূগর্ভশায়ী প্রদীপ্ত অনলের ন্যায় তাঁহার অন্তরে বাস করিতেছিল। প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলেই ঐ অনল আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় জ্বালারাশি প্রকাশ করিত। তাঁহার কোমল ও পরদুঃখ কাতর হৃদয়ে বর্ত্তমান সমাজের অসারতা, কৃত্রিমতা ও অসাধুতা এতই আঘাত করিত যে, বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় তাঁহাকে যাতনাতে অস্থির করিয়া তুলিত। এমন কি তিনি ক্ষোভে দুঃখে ঈশ্বরকে গালাগালি দিতেন। একদিন তিনি কোন এক হতভাগিনী বিধবাকে দেখিয়া নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার পরিচিত কয়েক জন বন্ধু বসিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে উত্তেজিত দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন "এই জগতের মালিককে যদি পাই, তা হলে একবার দেখি। এ জগতের মালিক থাকিলে কি এত অত্যাচার সহ্য করে?" এই বলিয়া কিরূপে দুষ্ট লোকে ঐ বিধবাটীর সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছে তাহা বলিতে লাগিলেন, ও দরদর ধারে দুই চক্ষে জলধারা বহি[illegible]াগিল। ফল-কথা এই যে, তিনি যত সত্বর স্বদেশ[illegible]দিগকে অগ্রসর দেখিতে চাহিতেন, তাহারা তত [illegible] অগ্রসর হইবার

লক্ষণ দেখাইত না বলিয়া তিনি তাহাদের প্রতি অগ্নিবৃষ্টির ন্যায় বিরাগ বর্ষণ করিতেন!

বর্ত্তমানে অতৃপ্তির ন্যায় ভবিষ্যৎরচনার শক্তিও তাঁহার ছিল। তিনি নিজ অন্তরে ভাবী ভারতের কি ছবি ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা কোনও স্থানে সমগ্রভাবে প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু দেশ মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন, বিধবাবিবাহ প্রচলন ও বহুবিবাহ নিবারণাদির চেষ্টা দ্বারা তিনি জানিতে দিয়াছেন যে, ভবিষ্যৎ ভারতসমাজের একটা ছবি তাঁহার হৃদয়ে ছিল। তিনি সেই ছবির দিকে স্বদেশকে অগ্রসর করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন এবং শীঘ্র যায় না বলিয়া সহিষ্ণুতা হারাইতেছিলেন। সে ছবিটীর সমগ্র আয়তন ও পরিসর নির্দ্দেশ করিবার উপায় নাই, কিন্তু স্থূলতঃ তাহার মূলভাবটী নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ের প্রত্যেক যুগ-প্রবর্ত্তক ব্যক্তির ন্যায় তিনি পূর্ব্ব ও পশ্চিমকে নিজ হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন। লোকে তাঁহাকে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াই জানে, আমরা জানি তাঁহার ন্যায় প্রতীচ্যজ্ঞানে অভিজ্ঞ পুরুষ বঙ্গদেশে অতি অল্পই ছিলেন। তাঁহার সুবিখ্যাত পুস্তকালয় তাহার প্রমাণ। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয়ের সহিত তাঁহার প্রতীচ্য দর্শন, বিশেষতঃ ফরাসি দেশ-প্রসিদ্ধ কোমৎ দর্শন বিষয়ে সর্ব্বদা বিচার হইত। একদিন বিচারান্তে বিদ্যাসাগর মহাশয় উঠিয়া গেলে মিত্র মহাশয় উপস্থিত বন্ধুদিগকে বলিলেন "বাবারে একটা giant, দেখ্‌লে কেমন বুদ্ধি বিদ্যার দৌড়, মানুষটার যেমন heart তেমনি head"। একথা অবাধে বলা যায় যে, তিনি প্রতীচ্য সভ্যতার সকল বিভাগই সমুচিতরূপে অনুশীলন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতীচ্য জগৎ হইতে যে কিছু জীবনের আদর্শ পাইয়াছিলেন, তাহা প্রাচ্যভাব ও প্রাচ্যজীবনের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছা করিতেন, প্রাচ্য প্রীতি ভক্তির উপরে প্রতীচ্য কর্ম্মশীলতা স্থাপন করিবার প্রয়াস করিতেন। এই প্রাচ্য প্রতীচ্যের একত্র সমাবেশের গুণেই তিনি বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষিত সমাজের মুখপাত্র স্বরূপ হইতে পারিয়াছিলেন। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যে প্রাচ্য প্রতীচ্যের অদ্ভুত সমাবেশ করিয়া নবসাহিত্যের আবির্ভাব করিয়াছেন, তেমনি বিদ্যাসাগর মহাশয় মানব চরিত্রের আদর্শে প্রাচ্য প্রতীচ্যের সমাবেশ করিয়া নবচরিত্র ও নবসমাজ গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। সে কার্য্য যে এখনও চলিতেছে ও পরেও চলিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আমরা এখন চারিদিকেই বিদ্যালয় দেখিতেছি, প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র বালক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে শুনিতেছি, আমরা ভুলিয়া গিয়াছি এই শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কত ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল। তিনি যখন নিজে পাশ্চাত্য জ্ঞানের আস্বাদন পাইলেন, তখন তাহা স্বদেশবাসী ও স্বদেশবাসিনীদিগকে দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। গবর্ণমেণ্টকে প্ররোচনা দিয়া তাঁহাদের সাহায্যে স্থানে স্থানে মডেল স্কুল স্থাপন করিতে লাগিলেন। কি অসুবিধাতেই তাঁহাকে কার্য্য করিতে হইয়াছিল, না ছিল উপযুক্ত শিক্ষক, না ছিল উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তক। নিজে পাঠ্য পুস্তক রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অনেক স্থলে টোলের পণ্ডিতদিগকে ধরিয়া ভূগোল, জ্যামিতি প্রভৃতি কিনিয়া দিয়া পড়াইয়া কাজ চালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমন করিয়া তাঁহাকে শিক্ষা বিস্তার করিতে হইয়াছে।

তিনি যে কেবল পুরুষদিগের মধ্যেই এই প্রতীচ্য জ্ঞানালোক বিস্তার করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন, তাহা নহে। তিনি বর্ত্তমান বীটন, অথবা বেথুন স্কুলের সম্পাদক ছিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বেও উক্ত কলেজে গিয়া বালিকাদিগকে বিধিমতে উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন দেশের নানা স্থানে বহুসংখ্যক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে ডিরেক্টারের সহিত তাঁহার মতভেদ উপস্থিত হয়, সেই মতভেদ হইতেই মনান্তর জন্মে। রামমোহন রায়ের ন্যায় তিনিও বুঝিয়াছিলেন যে, প্রাচ্যজীবনে প্রতীচ্য জ্ঞানের সমাবেশ না হইলে দেশ উঠিবে না। অতএব বলিতেছি তিনি বর্ত্তমানে অতৃপ্ত হইয়া নিজ মনে মনে একটা ভবিষ্যৎ রচনা করিয়া তদভিমুখে স্বদেশকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

এ জগতে দুই শ্রেণীর লোকের দুই প্রকার ভাব দেখি। এক শ্রেণীর লোকের প্রকৃতিতে শ্রদ্ধার মাত্রা কিঞ্চিৎ অধিক, তাঁহারা অতীতের প্রতি এমনি শ্রদ্ধাসমন্বিত যে বর্ত্তমানের প্রতি যখনি তাঁহাদের অতৃপ্তি জন্মে তখনি

তাঁহারা আবেগের সহিত অতীতের দিকে যাইতে চান, তাঁহাদের চিত্ত অতীতের দ্বারেই ঘুরিয়া বেড়ায়, অতীতের চিন্তার মধ্যেই তাঁহারা বাস করিতে ভাল বাসেন। অপর শ্রেণী সর্ব্বদাই ভবিষ্যতের দিকে মুখ ফিরিয়া রহিয়াছেন। ভবিষ্যতের মধ্যেই তাঁহারা বাস করেন। আশার চক্ষে ভবিষ্যৎকে দেখেন ও সেই দিকে স্বদেশ ও স্বজাতিকে লইতে চান। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শাক্য, যীশু, মহম্মদ প্রভৃতি এই শ্রেণীর লোক ছিলেন। ইদানীং কালে রামমোহন রায় এই প্রকৃতিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। ইতিহাসে দেখা যায় এই প্রকৃতি সম্পন্ন ব্যক্তিদিগেরই মানব মনের উপরে সমধিক প্রভাব হইয়া থাকে। কারণ আশার অপেক্ষা ভাল জিনিষ আর নাই; যে মানুষকে আশা দেয়, সেই জীবন দেয়। যিনি বলেন তোমরা এখন মলিন বটে, কিন্তু চিরদিন মলিন থাকিবে না, তোমাদের জন্য শুভদিন আসিতেছে, চল তদভিমুখে অগ্রসর হই, তিনি আমাদের প্রকৃত বন্ধু, আমরা এরূপ সেনাপতির বিজয় বৈজয়ন্তীর তলে দাঁড়াইতে ভালবাসি। এ জীবন যেন রণ-ক্ষেত্রের ন্যায়, এখানে আমরা সহস্র প্রকার প্রতিকূলতার মধ্যে স্বীয় স্বীয় জীবনের আদর্শসাধনে নিযুক্ত রহিয়াছি, নিরন্তরই আশা নিরাশার আন্দোলনে দুলিতেছি, বিবাদ ও অনুশোচনার যাতনা সহিতেছি। অতি বলবান্ হৃদয়ও এই কঠোর সংগ্রামে সময়ে সময়ে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে। যখন আমরা নির্জ্জনে জীবনের ভার বহনে ম্লান ও ম্রিয়মান হই, তখন যদি কোনও বলবান্ পুরুষের আশাজনক বাণী আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে—যদি শুনিতে পাই একজন বলিতেছেন 'অগ্রসর হও, অগ্রসর হও, ভয় নাই, জয়শ্রী সম্মুখে,' তাহা হইলে আমাদের অবসন্ন মনে তাড়িত-প্রবাহ প্রবাহিত হয়, আমরা স্বতঃই তাঁহাদিগের প্রতি আকৃষ্ট হই। এইরূপ বিক্রমশালী ও আশাপূর্ণ ব্যক্তিরাই মানব সমাজের নেতৃস্থান অধিকার করিয়া থাকেন। বিদ্যাসাগরের ন্যায় তেজস্বী পুরুষকে একবার দেখাও পরমলাভ, একবার দেখিলে তাহা চিরজীবনের শক্তির উৎস হইয়া থাকিতে পারে।

এই সকল চরিত্র জাতীয় সম্পত্তি। ইহাদিগকে জন্ম দিবার জন্য জাতিকে উচ্চ হইতে হয়, এবং ইহারা জন্মিয়াও জাতিকে উচ্চ করিয়া তোলেন। ইহারা যখন অন্তর্হিত হন, তখন উত্তরাধিকারসূত্রে ইহাদের চরিত্র-সম্পত্তি পাইয়া আমরা ধনী হই। ইহাদের চরিত্রের গুণাবলী অজ্ঞাতসারে আমাদের আত্মার অস্থি মজ্জাতে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে উচ্চতর ভূমিতে লইয়া যায়। বিধাতার এই সত্যময় রাজ্যে এক কণা খাটি জিনিস নষ্ট হয় না। কেহ কি এরূপ মনে করেন, যে যদি আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটিও স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন না করি, বঙ্গ-সমাজ বিদ্যাসাগরহীন হইবে? তাহা কি সম্ভব? বিদ্যাসাগরকে জন্ম দিয়া বঙ্গভূমি উঠিয়াছে, আর কে তাহাকে নামাইতে পারে? বহুক না কেন প্রতিকূল স্রোত, কিছুদিন বহিতে দেও, সে মহৎ চরিত্রের কার্য্য আবার দেখিতে পাইবে। রামমোহন রায়েরও কোনও স্মৃতি চিহ্ন নাই, কিন্তু তাঁহার জীবন কি বিফলে গিয়াছে? অপেক্ষা কর, দেখিবে অচির কালের মধ্যে রামমোহন রায় ভারতাকাশে উজ্জ্বলতাতে প্রথম শ্রেণীর নক্ষত্ররূপে শোভা পাইবেন।

আবার বলি, যাঁহারা মননের দ্বারা জীবিত থাকেন, তাঁহারাই সার্থক জীবিত, তাঁহাদের চরিত্র জাতীয় সম্পত্তিরূপে পরিণত হয়। তাঁহাদিগকে লইয়াই জাতির গৌরব। যেমন দূর হইতে হিমালয়ের ক্ষুদ্র পাদশৈল সকল ভাল করিয়া দেখা যায় না, কিন্তু চিরতুহিনাবৃত শৃঙ্গরাজি লক্ষিত হইতে থাকে, এবং হিমালয়ের মহত্ত্ব জ্ঞাপন করে, তেমনি অপর জাতি সকল দূর হইতে এই সকল অসাধারণ পুরুষের আলোকমণ্ডিত মস্তক দর্শন করিয়া জাতিগত মহত্ত্ব অনুভব করিয়া থাকে। ইহাদিগকে বুঝিতে পারা এবং সমুচিত শ্রদ্ধা দিতে পারাও মহত্ত্বে উঠিবার সোপান স্বরূপ।

আমরা বালককালে লোকের মুখে শুনিতাম চোরেরা তৈলাক্ত হইয়া গৃহস্থের গৃহে প্রবেশ করে, যদি ধরা পড়ে যেন পিছলিয়া পলাইতে পারে। আমরা দেখিতে পাই এক শ্রেণীর পবিত্রচেতা মানুষ যেন তৈলাক্ত হইয়া এসংসারে প্রবেশ করেন। তাঁহারা এখানকার পথে গতায়াত করেন অথচ এখানকার কর্দ্দম পঙ্ক তাঁহাদিগের আত্মাতে লাগে না এবং এখানকার পাপ প্রলোভনে ধরিলেও তাঁহারা পিছলিয়া পলাইয়া যান। যাহা সৎ তাহার আচরণ করাই ইঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক, যাহা অসৎ তাহা ইঁহারা দেখিয়াও দেখিতে পান না। সকল সাধুভাব সকল মঙ্গলভাব যেন স্বাভাবিকরূপেই ইঁহাদের অন্তরে আশ্রয় পায়, অসাধুভাব সকল যেন হৃদয়ে প্রবেশের দ্বার পায় না। বিদ্যাসাগর

মহাশয় এই শ্রেণীর লোক ছিলেন। তিনি যখন প্রথম কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার পিতার সহিত বাস করেন, আর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই দিনে যখন তিনি সংসার হইতে অবসৃত হইলেন, এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি জীবনের কত পথেই ভ্রমণ করিয়াছেন, কত প্রলোভনের সহিত সাক্ষাৎকার হইয়াছে, কত পাপের দ্বার উন্মুক্ত দেখিয়াছেন, কিন্তু কিরূপে শিশুর ন্যায় সরল, অকপট, হৃদয়টা লইয়া চলিয়া আসিলেন! ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নয়? তাঁহার যৌবনকালে কলিকাতার কি ভয়ানক অবস্থা ছিল! আমরা বাল্যকালে এই কলিকাতা সহরকে যাহা দেখিয়াছি তাহা এখন স্মরণ করিতেও হৃদয় কম্পিত হয়। তিনি কিরূপে এই সহরে নানা অবস্থার মধ্যে বাস করিলেন, অথচ পাপপঙ্ক তাঁহার আত্মাতে লাগিল না। এরূপ ধর্ম্মে অনুরাগ কিরূপে রাখিলেন, যাহাতে তাঁহার চিত্তটা চিরদিন সরল ও সত্যানুরাগী রহিল? জীবনের মহৎ লক্ষ্যের প্রতি ঐকান্তিক অভিনিবেশ ইহার কারণ। প্রত্যেক মহামনা ব্যক্তির জীবনে এই ঐকান্তিক অভিনিবেশ দেখিয়াছি। যে আকাশের তারার দিকে চাহিয়া পথ চলে, সে কি পথের দুই ধারে কি আছে, তাহার সংবাদ পায়? তেমনি যাহারা ধর্ম্মের মহা নিয়মের প্রতি দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করিয়া এই সংসারে পথ চলিয়া থাকেন, এখানকার পাপ প্রলোভন কি তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হয়? আমরা সকলেই চলিবার সময় নীচের দিকে দেখি, আমাদের মধ্যে মাঝে মাঝে দুই চারি জন তারা-দেখা লোক না জন্মিলে আমাদের গতি কি হইত? আমি নির্জ্জনে বসিয়া যখন এই তারা-দেখা লোকদিগের বিষয় ভাবি তখন মনটা বড়ই উচ্চ হয়। এই সকল মানুষের চরিত্র যেন কস্তুরীর ন্যায়, ইহারা যাহাকে স্পর্শ করেন তাহাতেই সুবাস মাখাইয়া দিয়া যান। চিন্তা করিয়া দেখ বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গদেশে কি সৌরভ মাখাইয়া দিয়া গিয়াছেন, যাহাতে আমাদের চিত্ত ভরপুর হইয়া রহিয়াছে। পৃথিবীর হাতে এমন কোনও রজ্জু নাই যাহাতে এই তারা-দেখা লোকদিগকে বাঁধিতে পারে। ইহারা মুক্ত জীব। ইহারা গৃহধর্ম্ম করিয়াছেন, বিষয় ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়াছেন, সংসারের ভাবনা চিন্তা সকল বোঝাই বহিয়াছেন, অথচ যেন পদ্মপত্রের জলের ন্যায় এখানে বাস করিয়াছেন, কিছুতেই আসক্ত হন নাই। ভগবদ্গীতার উপদেশ স্বাভাবিক ভাবে ইহাদের জীবনে ফলিত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মনুষ্যত্বের মহৎ আদর্শের প্রতি অবিচলিত দৃষ্টিই এই অনাসক্তির কারণ। তুমি যদি চরিত্রের মহত্ত্ব সাধনকেই আপনার জীবনের লক্ষ্য বলিয়া মনে কর এবং জীবিকার উপায় সকলকে উপলক্ষ্য মনে কর, তাহা হইলে সেই উপলক্ষ্যগুলি আর তোমাকে বাঁধিতে পারে না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনে তাহাই ঘটিয়াছিল।

রামমোহন রায়ের ন্যায় তাঁহার মনের সর্ব্বতোমুখীন গতি ছিল। রামমোহন রায় যেরূপ প্রধানতঃ ধর্ম্মসংস্কার কার্য্যে রত থাকিলেও, সমাজসংস্কার, শিক্ষা বিস্তার, সাহিত্যের সৃষ্টি, রাজনীতির আন্দোলন প্রভৃতি সকল বিষয়েই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সেইরূপ দেশের হিতকর সকল বিষয়েই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। এরূপ সর্ব্বতোমুখ স্বদেশপ্রিয়তা প্রায় দেখা যায় না। একসময়ে ধর্ম্মসংস্কার বিষয়ে তিনি উৎসাহী ছিলেন। তিনি একসময়ে তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত সংযুক্ত ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার লেখকদিগের মধ্যে একজন ছিলেন। ক্রমে নানা কারণে সে সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎপরে চিরদিন জাতীয় জীবনের উন্নতির জন্য যে বিভাগে যখনি সাহায্যের প্রয়োজন হইত, তখনি সে বিষয়ে সহায়তা করিবার নিমিত্ত তিনি বদ্ধপরিকর হইতেন। তাঁহার প্রণীত বেতাল পঞ্চবিংশতি প্রথমে সুমিষ্ট সুললিত বাঙ্গালা রচনার প্রণালী প্রদর্শন করিল। তৎপরে বহুদিন চলিয়া গিয়াছে, বঙ্গভাষা সে দশা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, সেই পুরাতন সংস্কৃতের ছায়াকে পরিত্যাগ করিয়া, অনেক দূর চলিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এ বিষয়ে নূতন পথ প্রদর্শকের মহিমা কি কখনও বিলুপ্ত হইতে পারে? তাঁহার সীতার বনবাসের বাঙ্গালা কি আমরা কখনও ভুলিতে পারিব? বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রস্তাবের উপসংহারভাগ মরণের দিন পর্য্যন্ত কি আমাদের কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইবে না? আমাদের বর্ত্তমান বঙ্গভাষা কি পরিমাণে যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট ঋণী, তাহা কি নির্দ্দেশ করা যায়? একদিকে তিনি যেমন বিশুদ্ধ, কোমল হৃদয়গ্রাহী বাঙ্গালাভাষার সৃষ্টি করিতে লাগিলেন, অপরদিকে বিদ্যালয় সকল স্থাপন করিয়া শিক্ষার বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যখন দেখিলেন, গবর্ণমেণ্টের

মনোগত অভিপ্রায় উচ্চশিক্ষাকে কতিপয় সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে আবদ্ধ রাখা, এজন্য তাঁহারা প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধি করিতেছেন, অথচ অনুভব করিলেন যে, এই উচ্চশিক্ষাই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোকদের জীবিকা অর্জ্জনের ও মনুষ্যত্ব লাভের একমাত্র উপায়, তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বালকদিগের উচ্চশিক্ষার্থ নিজ ব্যয়ে নিজ বাসগ্রামে এণ্ট্রান্স স্কুল ও কলিকাতায় মেট্রপলিটান কলেজ স্থাপন করিলেন। এজন্য তাঁহাকে কত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। একদিকে তিনি যেমন শিক্ষাবিস্তারের জন্য ব্যগ্র হইলেন, অপরদিকে দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতি বিষয়ে সহায়তা করিতে লাগিলেন। স্বর্গগত প্যারীচরণ সরকার মহাশয় যখন সুরাপান নিবারণী সভা স্থাপন করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার একজন প্রধান সহায় ও উৎসাহদাতা ছিলেন। হিন্দুপেট্রিয়ট পত্রিকার প্রথম সম্পাদক খ্যাতনামা হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইলে, পরলোকগত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিবার পরিজনের নিকট হইতে পেট্রিয়ট কিনিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার হস্তে ঐ পত্রিকা অবসন্ন দশাপ্রাপ্ত হইয়া যখন উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইল, তখন তিনিই মধ্যে পড়িয়া উহার সম্পাদকতা ভার কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। প্রথম উদ্যমে কৃষ্ণদাস পাল সম্পূর্ণরূপে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শের অনুগত হইয়া চলিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহায়তাতেই তিনি স্বকর্ত্তব্য সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন। এমন কি, তাঁহার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন কয়েকজন ভদ্রলোক উদ্যোগী হইয়া "হিন্দু ফ্যামিলি এনুয়িটী ফণ্ড" স্থাপন করেন, যদ্দ্বারা বহুসংখ্যক পরিবার উপকৃত হইতেছে, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার একজন উৎসাহ দাতা ছিলেন এবং এজন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ফল কথা এই তিনি যে কার্য্যে দেখিতেন দেশের কিছু কল্যাণ হইবার সম্ভাবনা তাহাতেই সহায়তা করিবার জন্য অগ্রসর হইতেন। তাঁহার অর্থ ও সামর্থ্য সে কার্য্যে লাগিত। তাঁহার স্বদেশানুরাগ যেমন সর্ব্বতোমুখীন ছিল, তাঁহার বন্ধুতা, আতিথ্য, সৌজন্য সমুদায় সেইরূপ সর্ব্বতোমুখীন ছিল। তাঁহার প্রীতি ও দয়া জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি ধাবিত হইত। কোন কোন ইংরাজের সহিত তাঁহার এতদূর প্রীতি হইয়াছিল যে, তাহাদিগকে তিনি পরম মিত্র বলিয়া জানিতেন। ইংরাজেরা সচরাচর এদেশীয়দিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাকে যিনি একবার দেখিতেন তিনিই সম্ভ্রমের সহিত ব্যবহার করিতে বাধ্য হইতেন। তাঁহার ব্যবহারে এমন একটা আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান থাকিত, এমন একটা নিজ চরিত্রের গুরুত্ব ও গৌরবের জ্ঞান প্রকাশ পাইত যে, তাঁহারা তাঁহাকে সমুচিত শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাঁহারা দেখিতেন, বিদ্যাসাগর নিঃস্বার্থ পুরুষ, স্বার্থসাধনের মানসে তাঁহাদের দ্বারস্থ হন না, পরার্থের জন্যই তাঁহাদের সাহায্য চান, সুতরাং তাঁহারা তাঁহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। দুটী জিনিসকে ইংরাজেরা বড়ই ঘৃণা করেন, প্রথম স্বার্থসাধনার্থ বন্ধুতা, দ্বিতীয় 'না' বলিবার সাহসের অভাব। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত্রে উক্ত উভয় দোষের কোনটীই ছিল না। তাঁহার মত নিঃস্বার্থ প্রকৃতির পুরুষ অতি অল্পই দেখা গিয়াছে, দ্বিতীয়তঃ তিনি সততই "না" কথাটা বলিতে সাহসী হইতেন। এজন্য ইংরাজগণ তাঁহাকে সমুচিত শ্রদ্ধা করিতেন ও তাঁহার সহিত তদনুরূপ ব্যবহার করিতেন। তাঁহাদের সহিত মিশিবার সময়ে তিনি পূর্ণ মাত্রায় আত্ম সম্মান রক্ষা করিয়া চলিতেন। তাঁহার চিত্তে আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান এতদূর প্রবল ছিল যে, তাঁহার কর্ম্মত্যাগের কয়েক বৎসর পরে বিধবা বিবাহের আন্দোলনের ব্যয়ভারে তিনি যখন ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন তৎকালীন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর তাঁহাকে আবার কর্ম্ম লইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। যে সময়ে একবার তাঁহার প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপকের কর্ম্ম লইবার কথা হয়। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরকে লিখিয়াছিলেন যে যদিও তিনি ঋণদায়ে ব্যতিব্যস্ত, তথাপি ইংরাজ প্রোফেসারদিগের অপেক্ষা অল্প বেতন দিলে তিনি কখনই উক্ত পদ গ্রহণ করিতে পারেন না। ঘোর ঋণদায়ে যখন বিব্রত তখনও তাঁহার আত্মসম্মান জ্ঞান এত উজ্জ্বল! এই জন্যই তিনি বঙ্গসমাজের শিরোভূষণ হইতে পারিয়াছিলেন।

এইত গেল তাঁহার চরিত্রের প্রধান প্রধান সদ্গুণের কথা, কিন্তু যে গুণের জন্য তিনি দেশের লোকের নিকটে

সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাহার উল্লেখ এখনও করা হয় নাই। তাহা তাঁহার ভুবনবিখ্যাত দয়া। এবিষয়ের অসংখ্য গল্প দেশে প্রচলিত আছে। সে সকলের উল্লেখ করিতে গেলে, প্রবন্ধ অতিশয় দীর্ঘ হইবে এবং তাহা আমার সাধ্যায়ত্তও নহে। তবে তাঁহার দয়া যে কিরূপ জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলকেই আলিঙ্গন করিত, তাহার একটা মাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব। একবার মান্দ্রাজ প্রদেশীয় দুইটী ভদ্র ঘরের ছেলে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য বোম্বাই সহরে যায়। সেখান হইতে খ্রীষ্টীয় মিশনারিগণ তাহাদিগকে কলিকাতাতে আনয়ন করেন। কলিকাতাতে আসিয়া তাহাদের মত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এদিকে তাহারা জাতিভ্রষ্ট, স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে চাহিলেও হঠাৎ যাইতে পারে না। খ্রীষ্টীয় মিশনারিগণও তাহাদের বৃত্তি বন্ধ করিয়া দিলেন; তখন তাহারা নিরুপায় হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএশন সভার অধিবেশনের দিন, সেখানে গিয়া কলিকাতার দলপতি বাবুদিগকে ধরিল। তাঁহারা কেহ দুই টাকা, কেহ এক টাকা এইরূপে কয়েক টাকা চাঁদা স্বাক্ষর করিলেন। দুই জনের অভাব পক্ষে চৌদ্দ পনর টাকা চাই, তাহার মধ্যে ৮।১০ টাকা স্বাক্ষরিত হইল। যাহা স্বাক্ষরিত হইল, তাহাও আদায় হয় না; এক এক স্থানে দুই চারি বার যাইতে যাইতে তাহাদের সমুদায় সময় যাইতে লাগিল, পড়াশুনা এক প্রকার বন্ধ হইয়া গেল। এই অবস্থাতে তাহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারে উপস্থিত হইল। তিনি তখন মাতৃশোকে কাতর হইয়া চিৎপুরের এক নির্জ্জন উদ্যানে একাকী বাস করিতেছিলেন। সেখানে তাহারা উপস্থিত হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাদিকে দেখিয়া ও তাহাদিগের সহিত কথা কহিয়াই জানিতে পারিলেন যে, তাহারা ভদ্রঘরের সন্তান। তৎপরে যখন শুনিলেন যে, দশটা টাকা স্বাক্ষর করাইয়া তাহারা প্রায় এক মাস কাল দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছে, তখন ক্ষোভে ও ক্রোধে পূর্ণ হইয়া তাহাদের চাঁদার বহিখানি দূরে ফেলিয়া দিলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন —"তোমরা গিয়া পড়াশুনা কর, প্রতি মাসের ২রা কি ৩রা তোমাদের জন্য ১৪টা টাকা ও দুই যোড়া কাপড় তোমাদের বাসাতে যাইবে। তাহারা যত দিন এখানে ছিল, ততদিন এই মাসিক ১৪টা টাকা ও দুই যোড়া কাপড় তাহাদের জন্য আসিত। সর্ব্ববিষয়েই তাহার হৃদয় কি প্রশস্ত ও উদার ছিল!

সর্ব্বশেষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটা প্রধান গুণের উল্লেখ করিতেছি—সেটা তাঁহার অকৃত্রিমতা। হায়! হায়! এমন স্পৃহণীয়, অকৃত্রিমতা আর কোথাও দেখিব না, প্রকৃতির হাতে গড়া এমন আভাঙ্গা মানুষটা প্রায় পাওয়া যায় না। যে দুঃসময়ে আমরা পড়িয়াছি, তাহাতে এরূপ চরিত্রের মূল্য বড় অধিক বলিয়া বোধ হইতেছে। কি কৃত্রিমতার মধ্যেই আমরা পড়িয়াছি! নব্য শিক্ষিতদিগের ধর্ম্মকর্ম্মের দিকে চাই, মুখে নিষ্ঠা ভক্তির ছড়াছড়ি! সংবাদপত্রে স্বধর্ম্মানুরাগের ভোর জোয়ার, বক্তৃতাতে সংসার-বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা, কিন্তু কার্য্যে অসারের অসার, অন্তঃসারবিহীন, আস্থাবিহীন, নিষ্ঠাবিহীন আচরণ। নব্য শিক্ষিতদিগের সমাজের দিকে চাই, কোথায় মনুষ্যত্ব, কোথায় গাঢ় কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, কোথায় প্রকৃত ধর্ম্মভীরুতা! নব্যশিক্ষিতদিগের সাহিত্যের দিকে চাই, তাহা সাবানের ফেনা, ফেনাইয়া, ফাঁপাইয়া, ফুলাইয়া তুলিতেছে; ভাষার চটকে তাক লাগাইয়া দিতেছে; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির প্রসাদে, বঙ্গভাষাকে সাজাইয়া, গুছাইয়া, মনোমোহিনী করিয়া, রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ করিতেছে; কিন্তু তন্মধ্যে মনুষ্যোচিত প্রতিজ্ঞা নাই, জীবন্ত ভাষায়, জীবন্ত হৃদয়ের জীবন্ত ভাব নাই। স্বকর্ত্তব্য সাধনে যাহারা প্রাণ মন দিয়াছে, এমন মানুষের উক্তি নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ-বিষয়ক প্রস্তাবের উপসংহার ভাগ পাঠ কর, অক্ষয়কুমার দত্তের ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের ভূমিকা পড়িয়া দেখ, সোমপ্রকাশের পুরাতন ফাইল খুলিয়া দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের উক্তি সকল পাঠ কর, ইহারা কেহই লঘুচেতা লোক ছিলেন না। প্রাণে আগুনের মত যাহা জ্বলিয়াছে, ভাষা তাহাই উদ্গিরণ করিয়াছে। বঙ্গ-সাহিত্যের সেই সকল অংশের সহিত বর্ত্তমান সময়ের ফাঁপা, ফোলা, ফেনান সাহিত্যের তুলনা কর, চক্ষে জল আসিবে; বলিবে, কি মানুষের হাত হইতে কি সব মানুষের হাতেই পড়িয়াছি! চন্দ্র, সূর্য্য অস্ত গিয়া খদ্যোতের আলোকের উপরে নির্ভর করিতেছি! বাগ্‌দেবীর বীণাধ্বনির পরিবর্ত্তে যেন চৈত্র মাসের ঢক্কার ধ্বনি

শুনিতেছি! এরূপ অসার সাহিত্য, অসার খাদ্যদ্রব্যের ন্যায় বহুমাত্রায় আহার করিলে অল্পমাত্রায় উপকার হয় এবং জাতিটা স্ফীতোদর হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

এই অসারতা ও কৃত্রিমতার উপর হইতে চক্ষু তুলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অকৃত্রিম চরিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কি স্পৃহণীয়ই বোধ হয়। প্রকৃতির হাতে গড়া আভাঙ্গা মানুষ, কৃত্রিমতা কাহাকে বলে তিনি জানিতেন না। তোমরা দশজনে তাঁহাকে কি দেখিবে ও কি বলিবে তাহা তাঁহার মনেই হইত না। তিনি গিরিপৃষ্ঠজাত, অযত্ন-সম্ভূত, প্রকাণ্ড ওকবৃক্ষের ন্যায় শৈবালরাশিতে আকীর্ণ হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। সে তরু বাবুদের বাগানে থাকিবার উপযুক্ত নহে; কিন্তু তাহার সেই স্বভাবজাত বন্ধুরতার মধ্যেও এক প্রকার গাম্ভীর্য্য-সম্বলিত মনোহারিত্ব ছিল। এই জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ভালবাসিতাম যে, তাঁহাতে তাজা খাটি, ষোল আনা মানুষটা পাইতাম। তাঁহার সকল বৃত্তিই সতেজ ও উৎকট ছিল; ভালবাসাটাও উৎকট, বিদ্বেষটাও উৎকট। বিদ্যাসাগর মহাশয় যাহাকে ভালবাসিতেন, প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। তাঁহার বন্ধুতা, বাৎসল্য, দয়া, সমুদয় সতেজ ছিল। এমন প্রেমিক বন্ধু বঙ্গদেশে কেহ কখনও দেখিয়াছেন কি না জানি না। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ দে, কালীকৃষ্ণ মিত্র, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী প্রভৃতি তাঁহার হৃদয়ের প্রিয় যে সকল বন্ধু ছিলেন, তাঁহাদের প্রতি যে অবিচলিত প্রেম দেখিয়াছি, ভাষাতে তাহার বর্ণনা হয় না। বন্ধুগণকে ভালবাসিয়া, উপহার দিয়া, খাওয়াইয়া তাঁহার কখনই তৃপ্তি হইত না। তাঁহার বন্ধুগণ পরলোকগত হইলেও তাঁহার প্রেম, তাঁহাদের পরিবার পরিজনকে আলিঙ্গন করিয়া থাকিত। ইহার একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। তাঁহার একজন প্রিয় বন্ধু পরলোকগত হইলে, তিনি তাঁহার পরিবার পরিজনকে আপনার জ্ঞান করিতেন। একবার তিনি শুনিলেন যে, তাঁহার বন্ধুর কন্যা উন্মাদ রোগগ্রস্তা হইয়া এই খেয়াল ধরিয়াছে যে, বিদ্যাসাগর খাওয়াইয়া না দিলে খাইব না; সেই জন্য তিনি অনাহারে আছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই কথা শুনিয়া তাঁহার বিবিধ কাজের মধ্যে সময় করিয়া ঐ বন্ধুর কন্যাকে দুইবেলা খাওয়াইতে যাইতেন। এরূপ অনেক দিন করিতে হইয়াছিল। সকল বিষয়েই এইরূপ। এরূপ মাতৃভক্ত কে কবে দেখিয়াছেন? তাঁহার আরাধ্যা জননী দেবীর স্বর্গারোহণ হইলে, নিকটের লোকে প্রায় দুই, তিন বৎসর কাল সতর্ক থাকিতেন, তাঁহার সহিত কথোপকথনে তাঁহার জননীর উল্লেখ করিতেন না, কারণ তাহা হইলে তিনি বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতেন। তাঁহার প্রেম যেমন তেজস্বী ছিল, বিদ্বেষও তেমনি তেজস্বী ছিল। যাহার স্বভাব চরিত্র দেখিয়া একবার চটিতেন, তাহার নাম আর শুনিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহার এই আশ্চর্য্য মহত্ত্ব ছিল যে, বিপদে পড়িলে সেই সকল ব্যক্তির সাহায্য করিতে ত্রুটী করিতেন না। ইহার একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। একবার কলিকাতার একটী ধনী পরিবারের একটী যুবক স্বীয় পিতার সহিত বিরোধ করিয়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে চলিয়া যায়। উক্ত যুবকের পিতা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একজন বন্ধু ছিলেন। সে স্বীয় পিতার প্রতি যে দুর্ব্যবহার করিয়া গিয়াছিল, তাহা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ যুবকের প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন। ঐ যুবকের সহিত বালক [illegible] আমার আত্মীয়তা ছিল। কিছুকাল পরে আমি যখন বি,এ ক্লাশে পড়ি, তখন ঐ যুবক হঠাৎ একদিন স্ত্রী ও পুত্র সমভিব্যাহারে আমার ভবনে আসিয়া উপস্থিত, দেখিলাম সে কঠিন জ্বররোগে আক্রান্ত। আমি তাহাকে স্বীয় ভবনে রাখিয়া যথাসাধ্য চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম। পীড়ার উপশম না হইয়া ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। অবশেষে আমরা তাহার জীবনাশা পরিত্যাগ করিলাম। সেই সময়ে সে একদিন আমাকে বলিল, যদি পার আমার পিতাকে আনিয়া একবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দেও, আমি তাঁহার কাছে মার্জ্জনা চাহিব।" এই অনুরোধটা আমার মনে বড়ই লাগিল। অথচ তাহার পিতার সহিত আমার পরিচয় ছিল না,—কাহার সাহায্যে এই ঘটনা সংঘটিত করি তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। শেষে নির্দ্ধারণ করিলাম বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন গতি নাই। তাঁহার কোপের কথা জানিতাম, তথাপি তাঁহার ভালবাসার প্রতি নির্ভর করিয়া, আবদার করিয়া ধরিব ভাবিয়া তাঁহার নিকট গমন করিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কিরে, কি মনে করে?" আমি বলিলাম "একটা অনুরোধ কর্‌তে এসেছি

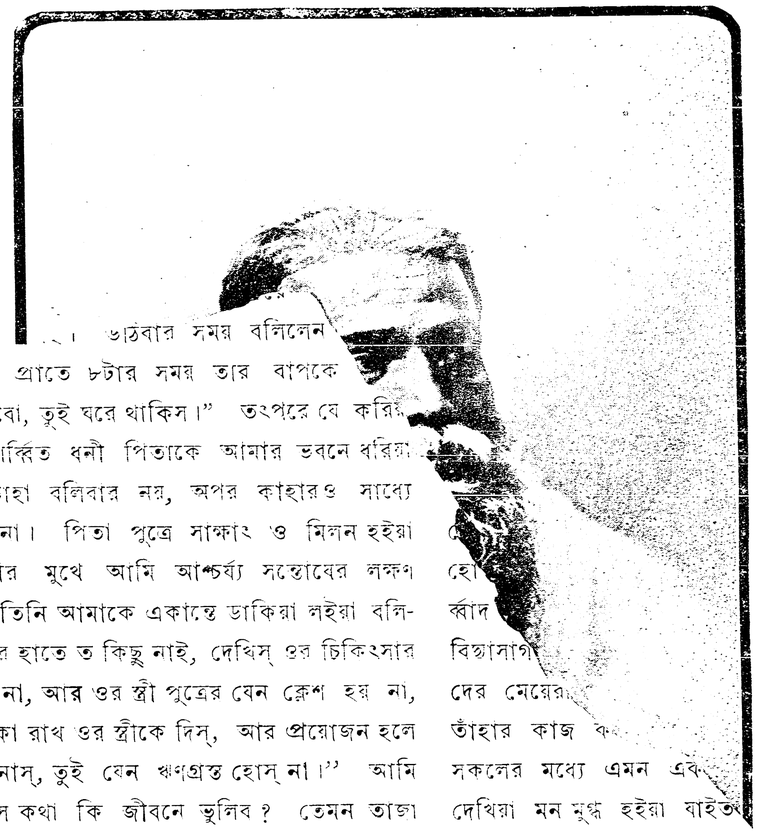

[illegible] ডাঠবার সময় বলিলেন [illegible] যাস্‌নে, কাল প্রাতে ৮টার সময় তার বাপকে বাড়ীতে আন্‌বো, তুই ঘরে থাকিস।" তৎপরে যে করিয়া তিনি সেই গর্ব্বিত ধনী পিতাকে আমার ভবনে ধরিয়া আনিলেন, তাহা বলিবার নয়, অপর কাহারও সাধ্যে তাহা হইত না। পিতা পুত্রে সাক্ষাৎ ও মিলন হইয়া গেলে, তাঁহার মুখে আমি আশ্চর্য্য সন্তোষের লক্ষণ দেখিলাম। তিনি আমাকে একান্তে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন "ওর স্ত্রীর হাতে ত কিছু নাই, দেখিস্ ওর চিকিৎসার যেন ত্রুটী হয় না, আর ওর স্ত্রী পুত্রের যেন ক্লেশ হয় না, এই দশটা টাকা রাখ ওর স্ত্রীকে দিস্, আর প্রয়োজন হলে আমাকে জানাস্, তুই যেন ঋণগ্রস্ত হোস্ না।" আমি সে দিনের সে কথা কি জীবনে ভুলিব? তেমন তাজা মানুষ আর দেখিব না। তিনি তাঁর কোনও প্রবৃত্তিকেই যেন কখনও রোধ করেন নাই; সকলেই পূর্ণ মাত্রায় বাড়িয়াছিল। নিকটে গেলেই দোষে গুণে জড়িত আসল মানুষটা দেখিতাম, এই জন্যই তাঁহার চরিত্র চিন্তা করিতে ভাল লাগে। আমরা একবার একটী বিধবা বিবাহ দিয়া কিছুদিন লোকের পরিত্যক্ত হইয়াছিলাম। তখন তিনি আমাদের বাসাতে প্রায় আসিতেন। আমাদের বাসার একটী যুবক তাঁহার মুখের উক্তি বলিয়া একটী কথা প্রচার করিয়াছিল। বিদ্যাসাগর বলিলেন—"ওরূপ কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হইতেই পারে না।" সে বলিল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনে নাই, উনি

[illegible]
হো[illegible]
র্ব্বাদ [illegible]
বিদ্যাসাগ[illegible]
দের মেয়ের[illegible]
তাঁহার কাজ ক[illegible]
সকলের মধ্যে এমন এক[illegible]
দেখিয়া মন মুগ্ধ হইয়া যাইত[illegible]
আসল মানুষটা ধরিতে পারিলে
বড় লোকদিগের জীবন চরিত পাঠ ক[illegible]
দশের মাঝে কি কাজ করিয়াছিলেন,
বলিয়াছিলেন, উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত থাকি
ছিলেন, তাহা জানিবার জন্য তত ব্যগ্র হই না
পরিবারে, বন্ধুবান্ধবের মধ্যে কি করিয়াছিলে[illegible]
বলিয়াছিলেন তাহা শুনিতে ভালবাসি, কারণ সেখা[illegible]
আসল মানুষটা ধরিতে পারা যায়। আমাদের যে এই আসল মানুষ দেখিবার কামনা তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ে সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ হয়।

পরিশেষে যে উক্তি স্মরণ করিয়া প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়া-

শুনিতেছি! এরূপ অসার সাহিত্য, অসার খাদ্যদ্রব্যের ন্যায় বহুমাত্রায় আহার করিলে অল্পমাত্রায় উপকার হয় এবং জাতিটা স্ফীতোদর হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

এই অসারতা ও কৃত্রিমতার উপর হইতে চক্ষু তুলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অকৃত্রিম চরিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কি স্পৃহণীয়ই বোধ হয়। প্রকৃতির হাতে গড়া আভাঙ্গা মানুষ, কৃত্রিমতা কাহাকে বলে তিনি জানিতেন না। তোমরা দশজনে তাঁহাকে কি দেখিবে ও কি বলিবে তাহা তাঁহার মনেই হইত না। তিনি গিরিপৃষ্ঠজাত, অযত্ন-সম্ভূত, প্রকাণ্ড ওকবৃক্ষের ন্যায় শৈবালরাশিতে আকীর্ণ হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। সে তরু বাবুদের বাগানে থাকিবার উপযুক্ত নহে; কিন্তু তাহার সেই স্বভাবজাত বন্ধুরতার মধ্যেও এক প্রকার গাম্ভীর্য্য-সম্বলিত মনোহারিত্ব ছিল। এই জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ভালবাসিতাম যে, তাঁহাতে তাজা খাটি, ষোল আনা মানুষটী পাইতাম। তাঁহার সকল বৃত্তিই সতেজ ও উৎকট ছিল; ভালবাসাটাও উৎকট, বিদ্বেষটাও উৎকট। বিদ্যাসাগর মহাশয় যাহাকে ভালবাসিতেন, প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। তাঁহার বন্ধুতা, বাৎসল্য, দয়া, সমুদয় সতেজ ছিল। এমন প্রেমিকতার বঙ্গদেশে কেহ কখনও দেখিয়াছেন কি না জানি। ধর্ম্মী, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ দে, কালীর তুমি কি প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী প্রভৃতি তাঁহার হৃদপেক্ষা প্রধান সকল বন্ধু ছিলেন, তাঁহাদের প্রতি [illegible] বা কি পরিবে, দেখিয়াছি, ভাষাতে তাহার বর্ণ অলঙ্কার থাকিবে কি দশ বাসিয়া, উপহার দিয়া, [illegible]টা সামান্য কথা, আলোচ্যের হইত না। তাঁহার বন্ধু তুমি কি দাঁড়াইতেছ, জগতের প্রেম, তাঁহাদের [illegible]রদিকে প্রসারিত রহিয়াছে, তাহাতে থাকিত। ইহা পড়িতেছে? এই চরিত্র বস্তুটা যাহাদের একজন প্রিয় [illegible], তাঁহারা মনন-রাজ্যেই বাস করেন এবং বার পরিজনকে সামান্য জ্ঞানে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। তিনি [illegible] বিদ্যাসাগর মহাশয় এক হস্তে যেমন হাজার হাজার টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তেমনি আর এক হস্তে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি উপস্থিত মত ধনাগমের একটা উপায় করিতেন, কিন্তু আপনার চরিত্রটাকে সর্ব্ব প্রযত্নে বাচাইতেন। থাক্ ধর্ম্ম, যাক্ পদ, থাক্ ধর্ম্ম যাক্ অর্থ, থাক্ ধর্ম্ম যাক্ বন্ধুতা, বিষয়েই এইরূপ। এরূপ মাতৃভক্ত কে কবে দেখিয়াছেন? তাঁহার আরাধ্যা জননী দেবীর স্বর্গারোহণ হইলে, নিকটের লোকে প্রায় দুই, তিন বৎসর কাল সতর্ক থাকিতেন, তাঁহার সহিত কথোপকথনে তাঁহার জননীর উল্লেখ করিতেন না, কারণ তাহা হইলে তিনি বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতেন। তাঁহার প্রেম যেমন তেজস্বী ছিল, বিদ্বেষও তেমনি তেজস্বী ছিল। যাহার স্বভাব চরিত্র দেখিয়া একবার চটিতেন, তাহার নাম আর শুনিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহার এই আশ্চর্য্য মহত্ত্ব ছিল যে, বিপদে পড়িলে সেই সকল ব্যক্তির সাহায্য করিতে ত্রুটী করিতেন না। ইহার একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। একবার মাদের মনের একটী ধনী পরিবারের একটী যুবক স্বীয় পি[illegible] শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

যায়

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

বর্ষায়।

ঝর ঝর ঝরে বরষা ধারা,
দিক্-বধূ যেন কাঁদিয়া সারা।
বিরাম বিশ্রাম হীন
মেঘগুলি সারাদিন
গগনে ঘুরে মরে পাগল পারা।

সাঁঝের শেষরেখা মিশে যায়,
নিবিড় তিমির অম্বরে ধায়।
পশ্চিম সাগর নীরে
ম্লান রবি ডুবে ধীরে,
আঁধার নামি আসি ধরা ছায়।

বাহিরে কেহ নাহি কোথা' আর,
একেলা গৃহ মাঝে, রুধি' দ্বার
বসি বাতায়ন পাশে,
কোথা' হতে ভেসে আসে
ব্যাকুল মনো মাঝে কথা কা'র!

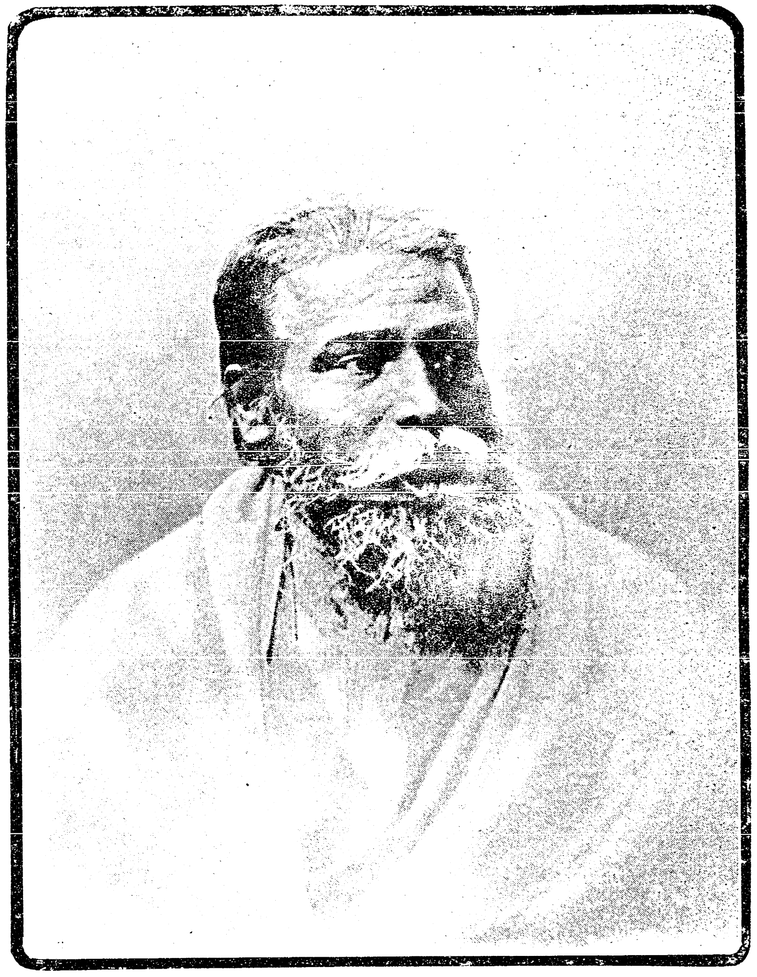

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।

[illegible]ণে!

[illegible]UNTALINE PRESS.

বাদল ধারা ঝরে অবিরল,
নয়ন ভরি' কেন আসে জল !
মনে পড়ে অনিবার,
ম্লান মুখখানি কা'র
শরম প্রেমে আঁখি ঢল ঢল !

পবন থেকে থেকে বহে বেগে,
বিজলী জ্বলি' উঠে কালমেঘে ;
মনে হয়, একাকিনী
ঘনঘোরা এ যামিনী
কেমনে আজি সে যাপিবে জেগে' !

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

রাজগৃহ—বিহার।

Stop !—for thy tread is on an Empire's dust !
An Earthquake's spoil is sepulchred below !
Is the spot mark'd with no colossal bust ?
Nor column trophied for triumphal show ?

Byron.

বলিয়া কে দেবে মোরে আজি বিজনে ?
প্রতিপদে কোথাকার
ভস্মরাশি অনিবার
বনপথে চারিধার
ঠেকে চরণে ?
কোন্ অতীতের কথা জাগে স্মরণে ?
এ যেন জগত ছাড়া,
বাহিরের নাহি সাড়া,
সব (ই) পুরাতনে গড়া,
ঢাকা পাষাণে !
প্রকৃতি পাগল পারা
হেথা সদা কেঁদে সারা,
কি যেন করুণা ধারা
ঢালে পরাণে !
কোথা হ'তে নাহি জানি
মুখে মোহময় বাণী
প্রতিধ্বনি উদাসিনী
ছোটে কাননে !
পাদপ মর্ম্মর ছলে
কি যেন পথিকে বলে ;
'বাণগঙ্গা' কলে কলে
ভাসে রোদনে !
ভারতের রাজপুরি !
একি তোর দশা হেরি !
আজি 'ব্যূহ সপ্তগিরি'
ঘন গহনে !
কে বলিয়া দেবে মোরে আজি এবনে—
কোন্ অতীতের স্মৃতি জাগিছে মনে ?

শ্রীমন্মথনাথ দে।

সংশয়।

আজো যে করেনি তোমা আত্ম-সমর্পণ,
ওহে মৃত্যু, তারে শুধু দিও কুদর্শন।
জান, অন্তর্য্যামি, তোমা অভিশপ্ত হিয়া
শতবার সঁপিতেছি, শীতল মানিয়া ;
—পারিনি সঁপিতে তবু ! নিখিল-ক্রন্দন
পরাইয়া নিত্য নব মায়ার বন্ধন
ল'য়ে যায় বন্দী করি' ! তাই সদা ভয়,
কাঁপিছে আবেগক্ষুব্ধ, অভক্ত সংশয় !—
স্থলগ্নে, সায়াহ্নসম দাঁড়াইবে যবে
আমার জীবনতটে, প্রশান্ত নীরবে,
লভিব কি চিরশান্তি ! হবে কি নিঃশেষ
গতমর্ত্ত্যক্লান্তিদগ্ধ দুঃস্বপ্নের লেশ !
কিম্বা অশরীরী-বেশে, নিষ্ফল সন্ধানে
সন্তরিব অন্তহারা অতৃপ্তির পানে !

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

আকাঙ্ক্ষা।

সাকারেতে আমি নিরাকার।
মম এই স্থূল দেহ,—
অদ্ভুত পার্থিব গেহ,
শোভে যাহে অপূর্ব্ব দুয়ার !

এই খানে দিবানিশি,
আছি গো জাগিয়া বসি',
সাধ মনে তোমা দেখিবার।
কিন্তু বাধা ঘটে অনিবার।

শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, রূপ, রস—
এই অনুভূতি চয়
সতত দেহেতে হয়;
কিন্তু তাহে অতৃপ্ত মানস।
তোমারে দেখিতে চাই,
দেখিবারে নাহি পাই,
কাঁদি কত হইয়া বিবশ।
কেমনে গো পূরিবে লালস?

নিরাকারে রাখিয়া সাকারে,
কি লীলা কর যে, হায়,
বুঝিতে না পারা যায়—
স্থূল দিয়া ঢাক আপনারে!
স্থূল দেহে বাস করি,
স্থূলেতেই তোমা হেরি,
স্ব-রূপেতে না হেরি তোমারে।
পারি না গো লীলা বুঝিবারে।

স্থূলে স্থূলে অপূর্ব্ব মিলন
ঘটে, মরি, কতবার।
সাকারেতে নিরাকার
করি, নাথ, তোমা দরশন।
বিশ্বের আড়ালে থাকি,
স্থূলে হ'য়ে মাখামাখি,
দেখা দাও প্রতিক্ষণে ক্ষণ;—
কিন্তু তাহে অবিতৃপ্ত মন।

কেন, নাথ, লীলাখেলা আর?
ভেঙে দাও আবরণ,
হ'য়ে যাক্ সুমিলন—
নিরাকারে হেরি নিরাকার।

নিরাকার হও তুমি,
নিরাকার হই আমি;
স্থূলে স্থূলে মিলন অসার,—
সত্য রূপ হেরি গো তোমার।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

গতরাত্রির কথা।

এমন করিয়া সখি, এমন করে'
ভাসাতে আসিও তুমি সুখের সরে
দারুণ মরম ব্যথা
অয়ি সরমের লতা!
হরিও, ভরিও বুক প্রেম সাগরে।
এমনি রজনী শেষে স্বজন পরে।

২

প্রবাসে উদাসী প্রাণ সারাটা বেলা
যাহা কিছু পায় নিয়ে কি হেলা ফেলা।
স্বপনে তোমারে তাই,
যদি কভু কাছে পাই,
স্মরণে ভরিয়া থাকে সুখের মেলা
জাগে সদা মধুমুখ, সে প্রেমলীলা।

৩

হায় সে হেমন্তরাণী কি মধুবেশে,
বিরহীরে দেখা দেয় রজনী শেষে!
শেফালির মৃদুবাস,
কুন্দের কোমল হাস,
চঞ্চল অঞ্চলে বাঁধি ঊষা সে আসে
হেমন্তের হিমস্নিগ্ধ হায়ন মাসে।

৪

প্রকৃতির মুখে এই প্রেমের কথা
জাগায় কিসব স্মৃতি, কিসের ব্যথা!
বহে বায়ু সুশীতল
চোখে কেন আসে জল
কাহারে একেলা ফেলে এসেছি হেথা—
জাগিছে কাহার মনে বিরহ ব্যথা!

৫

তোমারি সে মুখ, প্রিয়ে, মুখ তোমারি
স্মরিয়া হরিয়া আনে নয়নে বারি
বুকেতে রাখিয়া যারে
মানিত সাগর পারে
কত দেশ, কত নদী, কত বা গিরি
মাঝে কত ব্যবধান এবে তাহারি!

শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী।

তোরা কি আমার?

চাহিলে তোদের মুখপানে,
বুকে আসে সুখের জোয়ার;
আবার ক্ষণেক পরে,
সরে তা' সংশয় ভরে,
ঝরে বিন্দু নয়ন আসার!
মনে হয় তোরা কি আমার?

বিচিত্র সৌন্দর্য্য জগতের,
নহেত রে সম্পত্তি কাহার!
শোভি অরূপের কোলে,
কেন, কোথা যায় চলে,
কে বুঝিবে রহস্য তাহার?
ভাবি তাই তোরা কি আমার?

দেখি তাই বসন্তের বনে,
পত্র পুষ্পে আনন্দ বিকাশ;
তবু তরু মৃদুস্বরে,
মর্ম্মরে বিষাদ ভরে,
বহে আনি' সুগন্ধ বাতাস,
ফেলে যায় সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস।

পূর্ণ চন্দ্র কোলে প্রকৃতির,
সুখে হাসি মুখে নাহি ধরে,
তবু নেত্রে দেয় দেখা,
শিশির বাষ্পের রেখা!
বাজে বাঁশী মধুর সুস্বরে
রন্ধ্রে রন্ধ্রে বেদনা সঞ্চরে!

গলে পরি' নক্ষত্রের হার,
বহে শূন্য অন্ধকার বুকে;
নিন্দিয়া দ্রবিত স্বর্ণ,
সন্ধ্যার সুন্দর বর্ণ;
তবুও সে দেয় ম্লান মুখে
ছায়াবগুণ্ঠণ টানি' দুখে!

দিগন্তের যবনিকা আড়ে,
রূপের রাজত্ব বুঝি কার;
যা কিছু শোভন ভবে,
তারি অধিকার সবে;
সব রত্ন গচ্ছিত তাহার!
ভাবি তাই তোরা কি আমার?

শ্রীবিনয়কুমারী ধর।

তাপসীর প্রেম।

ছাড়ি লোকালয় আসি এ বিজনে
কেন গো বেঁধেছি ঘর,
শোন্ লো সজনি, বলিতে সে কথা
কাঁপে হিয়া থর থর।
যমুনার কূলে ভ্রমণের ছলে
গেছি সখি কতবার,
একদা বাঁশরী হৃদয় শিহরি
বাজিল যমুনা পার।
তখনো সাঁজের লোহিতবরণ
হয়নি আঁধার ঘন,
থাকিয়া থাকিয়া তখনো পাপিয়া
কাঁপায় কুসুম-বন।
মুখ হাসি হাসি কুলবধূ আসি
নামিল যমুনাজলে,
লহর তুলিয়া গাহিয়া গাহিয়া
একে একে গেল চলে।

নীলিম আকাশে সুষমা বিকাশি'
ফুটিল অযুত তারা,
শান্ত যমুনার শ্যামল পুলিনে
অভাগী আপনাহারা।
প্রাণে প্রাণে মোর যে বাঁশী বেজেছে
ধ্বনিবে অনন্তকাল,
আর কি গো গেহে ফিরিব সজনি,
ছিন্ন শত মায়াজাল।
সারাটি যামিনী বসে থাকি হেথা
জোছনা আঁধার নিশি,
কভু শুনি কভু নাহি পশে কাণে
সেই সে মোহন বাঁশী।
নাইবা শুনিনু হৃদয়ে আমার
মুহূর্ত্ত বিরাম নাই—
সজনে সংসারে নর কোলাহলে
এ সুখ কোথায় পাই ?
একখানি প্রাণ দশদিকে দিব
সে সাধ্য আমার নাই—
(আমি) মরণে জীবনে ইহ পরলোকে
আর কিছু নাহি চাই।
পাছে গো সজনি ধরণীর ধ্বনি
ডুবায় অমৃত তান,
তাই এ বিজনে আপনার মনে
প্রেম সুধা করি পান।

হামির।

বীরপ্রসবিনী ভারতভূমি যে একদিন বীরত্ব, সারল্য ও উদারতাগুণে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, রাজস্থানের পুরাবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে তাহার স্পষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাজস্থান অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সমষ্টি মাত্র। তন্মধ্যে মেওয়াড় (মিবার) ও মারওয়াড় প্রদেশ বিশেষ প্রসিদ্ধ ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ। চিতোড় (চিতোর) মেওয়াড় প্রদেশের রাজধানী। চিতোড় নগরী যবনগণ কর্ত্তৃক তিনবার আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হইয়াছিল। রাজ্যবিস্তার বা ধনলিপ্সা যবনরাজের চিতোড় আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না, রূপবতী পদ্মিনীকে করতলগত করিবার জন্যই দিল্লীশ্বর নিষ্ঠুর আলাউদ্দীন শান্তিময়ী চিতোড়পুরীতে সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন। পদ্মিনীর উপাখ্যান বঙ্গীয় পাঠকবর্গের নিকট অবিদিত নহে ; সুতরাং সে বিষয়ের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

সুরসুন্দরী পদ্মিনীকে হস্তগত করিতে না পারায় ১৩০১ খৃষ্টাব্দে যবনরাজ আলাউদ্দীন চিতোড় ধ্বংস করিবার মনস্থ করেন। এই মনস্থ ঘোরতর যুদ্ধে পরিণত হয়। এই কাল-সমরে রাণা লক্ষ্মণসিংহের একাদশ পুত্র একে একে রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া, স্বীয় স্বীয় প্রাণ আহুতি দেন, একমাত্র কনিষ্ঠ অজয় সিংহই শিশোদীয়কুলের পিণ্ডদান করিবার জন্য জীবিত ছিলেন। অগ্রজগণের ন্যায় যবনসমরে আত্মোৎসর্গ করিবেন, ইহাই অজয়সিংহের সংকল্প ছিল, কিন্তু জনকের অনিচ্ছা হেতু তিনি স্বীয় সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। পূর্ব্বপুরুষগণের পবিত্র নাম রক্ষার জন্য, অনিচ্ছা সত্ত্বেও অজয়সিংহকে মেওয়াড়ের পশ্চিম পার্শ্বস্থিত সুবিস্তীর্ণ আরাবল্লী পর্ব্বতের সানুদেশে দুর্গম কৈল্‌ওয়াড়া নামক স্থানে গুপ্তভাবে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। কৈল্‌ওয়াড়ার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম ও নেত্রস্নিগ্ধকর। শ্যামল পল্লবাচ্ছাদিত গগনস্পর্শী অগণন বৃক্ষনিচয় কণ্ঠহার স্বরূপ গিরিশিখরকে নিরন্তর বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। রজতরেখার ন্যায় অসংখ্য নির্ঝরিণী গিরিগাত্র ভেদ করিয়া কলস্বরে নিম্নমুখে প্রবাহিত হইতেছে। স্থানে স্থানে হরিদ্বর্ণ শস্যক্ষেত্রসমূহ ও কোমল-তৃণাবৃত গোচারণ ক্ষেত্র শৈলপাদমূলে দেহবিস্তার করিয়া নীরবে শয়ান রহিয়াছে। অজয়সিংহ আত্মীয়স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এই নিভৃত গিরিপ্রদেশে কালাতিপাত করিতেছিলেন সত্য, কিন্তু এতদবস্থায় থাকিয়াও জন্মভূমি চিতোড়ের স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারে তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। যে বীরপুরুষের সহায়তায় তিনি চিতোড়ের দাসত্বশৃঙ্খল ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহারই বিষয় আলোচনা করা এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

এই বীরপুরুষের নাম হামির। হামির অরিসিংহের পুত্র ও অজয়সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র। দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি যে প্রকার অলৌকিক বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা মেওয়াড়ের ইতিহাসে বিরল না হইলেও, জগতের অপর দেশের ইতিহাসে অতিশয় বিরল ও সুবর্ণ-অক্ষরে অঙ্কিত করিয়া রাখিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। হামিরের জন্মবৃত্তান্ত অতিশয় কৌতুকজনক। রাণা লক্ষ্মণ সিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র অরিসিংহ একদা অণ্ডোয়া নামক অরণ্যে মৃগয়ার্থ গমন করিয়াছিলেন। তথায় কোন তরুণবয়স্কা রমণীর দ্বারা মৃগয়ায় বিশেষ সাহায্য ও তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। রাজপুতানার পুরুষগণের ন্যায় রাজপুতানার রমণীগণের চরিত্রেও বীরত্বের বিকাশ লক্ষিত হইয়া থাকে। যে রমণী একখণ্ড যষ্টির দ্বারা একটী বন্যবরাহের প্রাণবায়ু বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন, যে রমণীর নিক্ষিপ্ত প্রস্তর খণ্ডের দ্বারা কুমার অরিসিংহের অশ্বের পাদদেশ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, যাঁহার বুদ্ধিকৌশলে জনৈক রাজপারিষদ অশ্বসহ ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, সেই রমণী যে কতদূর ক্ষমতাশালিনী ছিলেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। অরিসিংহ যখন অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে, সেই বীর্য্যবতী রমণী ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভবা, তখন তিনি তাঁহার পাণিগ্রহণে উৎসুক হইলেন। যুবতীর পিতা এ সম্বন্ধে নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু গৃহিণীর তাড়নায়, অবশেষে তাঁহাকে সম্মতি প্রদান করিতে হইয়াছিল। এই শুভ সম্মিলনের ফল বীরবর হামির।

হামিরের শৈশবাবস্থা সরলপ্রকৃতি কৃষিজীবিদিগের সহিত মাতুলালয়ে শান্তির সুখময় ক্রোড়ে অতিবাহিত হইয়াছিল। কূট রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা কিম্বা রণকৌশল শিক্ষা করিবার আদৌ তাঁহার আবশ্যকতা নাই। এ কারণে মনের আনন্দে গ্রাম্য বালকগণের সহিত পল্লীগ্রামে চিতোড়ের প্রনষ্ট গৌরব-উদ্ধারকারী হামির সুখ শান্তিতে কালযাপন করিতেছিলেন। কিন্তু বিধাতা সে শান্তি ভোগ তাঁহার অদৃষ্টে অধিক কালের জন্য লিখেন নাই। এ সময়ে চিতোড়ে যে ঘোর সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, তাহাতে শিশু হামিরকে কঠোর কার্য্যক্ষেত্রে তরবারি হস্তে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল।

চিতোড়ের তদানীন্তন অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে অজয়সিংহের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। একদিকে দোর্দ্দণ্ড যবনসেনার প্রচণ্ড প্রতাপে সমগ্র মেওয়াড় কম্পিতপ্রায় এবং অপর দিকে পার্ব্বত্য ভীল সর্দ্দারগণের অত্যাচারে জন্মভূমি উৎপীড়িতা। এরূপ ঘোর সঙ্কটে পতিত হইয়াও অজয় সিংহের বজ্রহৃদয় তিলার্দ্ধের জন্য বিচলিত হয় নাই। পক্ষান্তরে লজ্জা ও ঘৃণায় দ্বিগুণ উত্তেজিত হইয়া যবনসেনার সমূলে উচ্ছেদ সাধনে তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু অজয়সিংহ একাকী কয়দিক রক্ষা করিবেন ? জনৈক সহকারী বীরপুরুষের নিতান্ত প্রয়োজন হইল। যদিও তৎকালে আজিম সিংহ ও সুজন সিংহ নামে তাঁহার দুই পুত্র বর্ত্তমান ছিলেন, তথাপি তাঁহাদিগের দ্বারা তাঁহার কোনই উপকার পাইবার আশা ছিল না। আলাউদ্দীনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই মহারাণা লক্ষ্মণসিংহ বলিয়াছিলেন যে, যথাসময়ে অরিসিংহের পুত্র হামিরই যেন চিতোড় সিংহাসন অধিকার করেন। মহারাণার সেই ভবিষ্যদ্বাণী অজয়সিংহের স্মৃতিপটে সহসা উদ্ভাসিত হইল। পিতার সেই আদেশবাক্য স্মরণ করিয়া, তিনি হামিরের নিকট অবিলম্বে দূত প্রেরণ করিলেন ; হামিরও কালবিলম্ব না করিয়া কৈল্‌ওয়াড়ায় উপস্থিত হইলেন, এবং পিতৃব্যচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া, আদেশ জানিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। অজয়সিংহ অল্পবয়স্ক হামিরের নিকট চিতোড়ের তৎকালীন অবস্থা জ্ঞাপন ও পুরাতন শত্রু ভীলসর্দ্দার মুঞ্জ বলৈচারের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। হামির পিতৃব্যের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক, ভীলসর্দ্দারের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। বিদায় গ্রহণকালে তিনি পিতৃব্য চরণ স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, "দুরাত্মা মুঞ্জের মস্তক ছিন্ন করিয়া আনিতে না পারিলে, আপনার নিকট আর মুখ দেখাইব না।" অল্পকাল পরে ভীলসর্দ্দারদিগকে পরাভূত করিয়া বিজয়চিহ্নস্বরূপ মুঞ্জের ছিন্ন মস্তক সঙ্গে লইয়া হামির পিতৃব্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। অজয়সিংহ বিজিত শত্রুর ছিন্ন মস্তক দেখিয়া পরম প্রীত হইলেন এবং হর্ষোল্লাসে বিচ্ছিন্ন মস্তক হইতে এক বিন্দু শোণিত লইয়া হামিরের ললাটদেশে রাজতিলক অঙ্কিত করিয়া দিলেন। এতদ্দর্শনে অজয়সিংহের পুত্রদ্বয়ের চিতোড় সিংহাসন অধিকার-আশা চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইল।

অজয়সিংহের মৃত্যুর পর হামির মেওয়াড়ের রাজসিংহা-

হামির।

সনে আরূঢ় হয়েন। মহাত্মা টড্ হামিরের সিংহাসনারোহণের যে অব্দ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে চিতোড়যুদ্ধে জয়ী হইয়া আলাউদ্দীন দিল্লিতে প্রত্যাগত হয়েন। এই ঘটনার পরে অজয়সিংহ চিতোড়ের স্বাধীনতা উদ্ধারে কৃতসংকল্প হইলেন এবং বালক হামিরকে মাতুলালয় হইতে আনয়ন পূর্ব্বক পর্ব্বতনিবাসী ভীলদিগকে পরাভূত করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। বালক হামির তাহাদিগকে দমন করিয়া কৈল্ওয়াড়ায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এই সকল ঘটনার কিছুদিন পরে অজয়সিংহ ইহলোক হইতে অপসৃত ও হামির পৈত্রিক সিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন, সুতরাং চিতোড় যুদ্ধের অর্থাৎ ১৩০৩ খৃষ্টাব্দের অন্ততঃ তিন চারি বৎসর পরে অর্থাৎ সম্ভবতঃ ১৩০৬ কিম্বা ১৩০৭ খৃষ্টাব্দে হামির রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন বলিতে হয়। কিন্তু মহাত্মা টড্ ভট্টগ্রন্থের অনুসরণ করিয়া ১৩৫৭ সম্বতে বা ১৩০১ খৃষ্টাব্দে হামিরের সিংহাসন প্রাপ্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। টডের ন্যায় ঐতিহাসিকের গ্রন্থে এই ভ্রম কিরূপে স্থান লাভ করিয়াছে, আমরা তাহা নির্ণয় করিতে অক্ষম।

হামির যে দিন সিংহাসনপ্রাপ্ত হয়েন, সেই দিনই রাজপরিবারের প্রাচীন আচারানুযায়ী পিতৃব্যবৈরী বনৈচার রাজ্য আক্রমণ করেন ও পশেলিও নামক গিরিদুর্গে বিজয়পতাকা উড্ডীন করেন। হামির যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন যবনসেনার হুহুঙ্কারে সমগ্র চিতোড়পুরী প্রকম্পিত হইতেছিল। দিল্লীশ্বরের অসংখ্য সেনাদল চিতোড়ের পরিখা বেষ্টন করিয়া ক্ষুধিত রাক্ষসের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছিল। শনিগুরু মালদেব যবনরাজের প্রতিনিধি হইয়া চিতোড়ের রাজদণ্ড স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় হামির স্বল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া সম্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্তই অসম্ভব বিবেচনা করিলেন। সুতরাং কঠোর নীতির আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন তাঁহার আর আত্মরক্ষার কোনও উপায় ছিল না। তিনি চতুষ্পার্শ্বস্থিত গ্রামসমূহে অগ্নি প্রজ্জ্বলন করিয়া দিলেন এবং এই মর্ম্মে ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, "যাঁহারা মহারাজ হামিরের প্রভুত্ব স্বীকার করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা যেন অচিরে স্ব স্ব আবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আরাবল্লীর গিরিব্রজের অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করেন।" এই ঘোষণা প্রচারানন্তর প্রজাসমূহ বন্যার ন্যায় শৈলাভিমুখে প্রধাবিত হইতে লাগিল এবং বন্যতরুলতাচ্ছাদিত দুর্ভেদ্য আরাবল্লী গিরিপ্রদেশ অল্পদিনের মধ্যেই বহুলোকের বাসস্থানে শোভায়মান হইল। দেখিতে দেখিতে মেওয়াড় প্রদেশের অধিকাংশ স্থানই জনশূন্য মরুভূমিতে পরিণত হইল। রাজপথ দুর্গম হইয়া উঠিল। জলাভাবে যবনসৈন্য সাতিশয় কষ্ট অনুভব করিতে লাগিল এবং গো অশ্বাদিও খাদ্যাভাবে ক্রমশঃ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। সুরপুরীতুল্য সুন্দর চিতোড়পুরী বিকট শ্মশানপুরীতে পরিণত হইল। গৃহপ্রাঙ্গণস্থিত অযত্নসম্ভূত লতাগুল্মাদি ও স্তূপাকার ভগ্নাবশেষসমূহ চিতোড়ের গত বৈভবের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল মাত্র।

ভীল সরদার।

এই সময় হইতে কৈল্ওয়াড়া হামিরের রাজধানী হইল। মেওয়াড়ের শস্যশ্যামল প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার রাজভক্ত প্রজাগণ কৈল্ওয়াড়ায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। যে সকল স্থান দুর্গমতাহেতু ভীষণ শ্বাপদকুলের আবাসভূমি ছিল, হামিরের প্রজাবৃন্দের চেষ্টায় তাহা মনুষ্যবাসোপযোগী পল্লিশ্রেণীতে পরিণত হইল। নিয়তির ঘোর আবর্ত্তনে রত্নসিংহাসনপরিভ্রষ্ট হামির, এক্ষণে সহায়সম্পদহীন বনচারী। কিন্তু সময়গুণে এ অবস্থাই সেই সময়ে তাঁহার সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছিল। কারণ কৈল্ওয়াড়া আরাবল্লীর অত্যুচ্চশৃঙ্গপরিবেষ্টিত সমতলভূমির উপর অবস্থিত ছিল। এই সমতল ভূমির পরিসর প্রায় ৫০ মাইল এবং নিম্নভূমি হইতে ইহা প্রায় ১২০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত ছিল। চতুর্দ্দিক দুর্ভেদ্য অরণ্যানীর দ্বারা পরিবেষ্টিত, কেবল পশ্চিমপ্রান্তে মাড়োয়ার ও গুজরাট প্রদেশ হইতে খাদ্যসামগ্রী আনয়নের জন্য একটী সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কট ছিল। এই সুবিস্তীর্ণ মালভূমে ফলমূল কিম্বা পানীয় জলের কিছুমাত্র অভাব ছিল না, সুতরাং এস্থানে হামির ও তাঁহার প্রজাবর্গ জন্মভূমি পরিত্যাগজনিত মর্ম্মান্তিক যাতনা আদৌ অনুভব করিতে পারেন নাই।

কৈল্ওয়াড়ায় অবস্থানকালে হামির গিরিব্রজের পশ্চিম পার্শ্বস্থিত ভীলদিগের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া স্বীয় সহায়বল বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। এই অসভ্য ভীলগণ হামিরের এতদূর পক্ষপাতী হইয়াছিল যে, যুদ্ধকালে গিরিব্রজবাসী হামিরের আশ্রিত পরিবারবর্গের সম্মান ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাহারা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিল। এই দুঃসময়ে ভীলদিগের এই সাহায্য যে হামিরের কতদূর মহোপকার সাধন করিয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। যবনসৈন্য চিতোড় হইতে বহির্গত হইলেই, গুপ্তগিরিনিবাস হইতে হামিরের দলবল শার্দ্দূলের ন্যায় তাহাদের উপর আপতিত হইত এবং তাহাদিগের মধ্যে অনেকেরই বিনাশসাধনপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাগত হইত। এইরূপ উপায় অবলম্বন করায়, অল্পদিনের মধ্যেই অগণন যবন-সেনার ক্ষয় হইয়া আসিয়াছিল। যবন-সেনা ইহার প্রতিবিধান করিতে অসমর্থ হইয়াছিল, কারণ অরণ্যাচ্ছাদিত দুর্গম পথগুলি তাহাদিগের নিকট বিদিত ছিল না। এইরূপ কূটনীতি যদিও বীরজনোচিত কিম্বা ক্ষত্রধর্ম্মোপযোগী নহে, তথাপি যে অবস্থায় ও যে সময়ে ইহা অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহা তৎকালোপযোগী বলিয়া সমর্থন করিতে পারা যায়।

যখন মেওয়াড়ভূমির ঈদৃশী অবস্থা, দীর্ঘকালব্যাপী

সমরানল যখন প্রচ্ছন্ন থাকিয়াও অল্প অল্প ধূম উদ্গীরণ করিতেছিল, সেই সময়ে মালদেব হামিরকে তাঁহার স্বীয় দুহিতার পাণিগ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। এরূপ অচিন্তিতপূর্ব্ব প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া, হামির ও তাঁহার পারিষদবর্গের মনে বিষম সন্দেহের উদয় হইল। সকলেই এই প্রস্তাবে বিশ্বাসঘাতকতা কল্পনা করিয়া, হামিরকে তাহা স্বীকার করিতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু সাহসীকশ্রেষ্ঠ হামির যেরূপ প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে ঘোরতর বিপদের সম্মুখেও ভীত হওয়া, তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহার বীরহৃদয় কিছুতেই বিচলিত হইল না। নিজের ক্ষমতার প্রতি তাঁহার এতদূর বিশ্বাস ছিল যে তিনি জানিতেন যে তাঁহার শাণিত তরবারির সম্মুখে কোন প্রকার কপটতা বা বিশ্বাসঘাতকতা সফল হওয়া সম্ভব নহে। এই কারণে মন্ত্রিবর্গের পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও তিনি মালদেবের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন।

পূর্ব্বপুরুষগণের পবিত্র সৌধশ্রেণীর সোপানতলে এ জীবনে অন্ততঃ একবার বিচরণ করিবার আকাঙ্ক্ষা হামিরের হৃদয়ে প্রবল হইল। ভবিষ্যৎ অদৃষ্টাকাশের ঘোরতর মেঘাচ্ছন্ন প্রদেশের মধ্যে সহসা এই আকাঙ্ক্ষালোকের জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হওয়ায় হামিরের বজ্রহৃদয়কে যে কতদূর উদ্বেলিত করিয়াছিল তাহা অনুমেয়। তিনি আর কিছুতেই ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না। শত সহস্র অদমনীয় চিন্তার বৃশ্চিকদংশনে জর্জ্জরিত হইয়া তিনি আত্মভাব আর লুক্কায়িত রাখিতে পারিলেন না। তিনি অমাত্যবর্গকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, শত সহস্র বিপদ উপেক্ষা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়াই ক্ষত্রিয়ের একমাত্র ধর্ম্ম। পবিত্র ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে কলঙ্ক কালিমা ঢালিবার তাঁহার ইচ্ছা নাই এবং এ সুযোগ পরিত্যজ্য বলিয়া কখনই বিবেচিত হইতে পারে না। মন্ত্রিবর্গ দ্বিরুক্তি না করিয়া সকলেই এ শুভকার্য্যে সম্মতি প্রদান করিলেন। অনন্তর পঞ্চশত অশ্বারোহী সৈনিক সমভিব্যাহারে হামির চিতোড়াভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মালদেবের পঞ্চপুত্র তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনার নিমিত্ত নগরের কিয়দ্দূরে অবস্থান করিতেছিলেন। বরযাত্রিগণ সাদরে অভ্যর্থিত হইয়া রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। চিতোড়ের সিংহদ্বারে উপনীত হইলেন। তোরণ* দেখিতে না পাইয়া সকলেরই মনে দারুণ সংশয়ের উদয় হইল। হামির বুঝিতে পারিলেন যে, অমাত্যবর্গের আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক ছিল না। কিন্তু হামির পশ্চাৎপদ হইবার লোক ছিলেন না। ক্রমে সকলেই শিশোদীয়কুলের প্রাচীন প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। মালদেব বিবাহমণ্ডপে স্বীয় দুহিতাকে আনয়ন করিলেন এবং সকলের সমক্ষে দীন কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় বিবাহোচিত চিরপ্রচলিত আচারের অনুষ্ঠান না করিয়া, হামিরের করে কন্যাকে সমর্পণ করিলেন। উদ্বাহকার্য্য অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমাহিত হইয়া গেল।

বরকন্যার বস্ত্রাঞ্চল ও হস্তবন্ধন ব্যতিরেকে অন্য কোন আনুসঙ্গিক প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইল না। হামির চিরানুযায়ী প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, রাজপুরোহিত "ক্রমশঃ সমস্তই হইবে, ধৈর্য্যাবলম্বন করুন" ইত্যাকার প্রবোধপূর্ণ বচনে আপ্যায়িত করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। হামিরও চিন্তাদগ্ধ-হৃদয়ে বাসরগৃহে নীত হইলেন। বাসরগৃহে পত্নীর সহিত কথোপকথনে হামির অবগত হইলেন যে, তিনি বিধবার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। বিধবাবিবাহ ক্ষত্রিয় সমাজের অনুমোদিত নহে। হামির এক্ষণে স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাকে জাতিভ্রষ্ট ও অবমানিত করিবার উদ্দেশ্যেই, ঘোর অশান্তির কালে কপট মালদেব তাঁহার নিকট বিবাহ প্রস্তাব পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু এ বিবাহে অনিষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, পরিণামে যে অমৃতময় ফল উৎপন্ন করিয়া বাপ্পাবংশের মুখোজ্জ্বল করিবে, অদূরদর্শী মালদেব তৎকালে তাহা বুঝিতে পারেন নাই। নিয়তি চক্রের অচিন্ত্য আবর্ত্তনে কোন্ কার্য্যের কি প্রকার ফল হয়, মানব বুদ্ধির

* পুরাকালে রাজপুত নরপতিগণের মধ্যে বিবাহের পূর্ব্বে মঙ্গলোৎসবের নিদর্শন স্বরূপ সিংহদ্বারে "তোরণ" (কাষ্ঠের ত্রিভুজ) বিলম্বিত রাখিবার প্রথা ছিল। পাত্রকে এই কাষ্ঠ ত্রিভুজ বর্ষার দ্বারা ভগ্ন করিয়া কন্যাগৃহে প্রবেশ করিতে হইত। যৎকালে পাত্র তোরণ ভঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, সিংহদ্বারের উপরিস্থিত তরুণবয়স্কা মহিলাগণ মঙ্গলোৎসবের গীত গাহিতেন এবং কৌতুকের জন্য নিম্নে বরের গাত্রে আবির নিক্ষেপ করিতেন। "তোরণ" ভঙ্গ হইলে পর হুলুধ্বনি হইত, ও পাত্র সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া ভাবী শ্বশুরভবনে প্রবিষ্ট হইতেন। উপরিস্থিত অন্তঃপুরমহিলাগণও আনন্দসূচক গীত গাহিতে গাহিতে স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন।

তাহা অগম্য। এ বিবাহে যে শুভফল হইয়াছিল, মেওয়াড়বাসী তাহা কখনও বিস্মৃত হইতে পারে নাই। আর ভুলিতে পারে নাই—সেই লজ্জাবনতা, সারল্যময়ী, প্রেমপ্রতিমা হামির পত্নীর অসীম সাহসিকতা, ধৈর্য্যবশায় ও বুদ্ধিপ্রখরতা। এরূপ সহধর্ম্মিণীর সহায়তা প্রাপ্ত না হইলে, চিতোড় উদ্ধার সাধনে, হামির কতদূর কৃতকার্য্য হইতেন, সন্দেহের বিষয়। বিবাহ সমাধা হইবার পর, পক্ষকাল মাত্র শ্বশুরালয়ে যাপন করিয়া, পত্নীর পরামর্শানুসারে মেহতাবংশীয় জলধর * সর্দ্দারকে যৌতুক স্বরূপ গ্রহণ করিয়া, নবদম্পতি কৈলওয়াড়ে প্রত্যাগত হইলেন এবং সংকল্প সিদ্ধির সুযোগ অপেক্ষা করিয়া অতি সাবধানে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল পরে হামিরের একটী পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। পুত্রটীর নাম ক্ষেত্রসিংহ। ক্ষেত্রসিংহের এক বৎসর বয়ঃক্রম কালে জনৈক জ্যোতির্ব্বেত্তা গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, শিশুটীকে স্থানান্তরিত না করিলে তাহার জীবন সংশয় হইবে। সৌভাগ্যক্রমে মালদেবদুহিতা এই ঘটনাতে চিতোড় উদ্ধারের সহায়তা করিবার একটী বিশেষ সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি পিতৃসন্নিধানে গণকের গণনার ফল জ্ঞাপন করিয়া পাঠাইলেন। মালদেব মহা আড়ম্বরের সহিত দুহিতাকে চিতোড়ে আনয়ন করিলেন। ক্ষেত্রসিংহের জননীর অবস্থানকালে মীরদিগকে দমন করিবার জন্য, মালদেবকে সসৈন্যে মাদেরিয়া নামক স্থানে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। সুচতুরা মালদেবদুহিতা এই অবসরে জলধর সর্দ্দারের সাহায্যে অবশিষ্ট সৈন্যগণকে বশীভূত করিয়া ফেলিলেন। চিতোড়ের অনতিদূরস্থিত "বাগোর" নামক স্থানে হামির এই সময়ে সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি সহধর্ম্মিনীর এবম্বিধ কৌশল অবলম্বনের কথা শুনিতে পাইয়া চিতোড়াভিমুখে অগ্রসর হইলেন। যদিও সল্পসংখ্যক যবনসৈন্য তাঁহার চিতোড় প্রবেশের গতিরোধ করিবার জন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার তীক্ষ্ণ অসির পরাক্রমে রণক্ষেত্রে কেহই তিষ্ঠিতে সমর্থ হয় নাই। বিনা রক্তপাতে হামির চিতোড়ের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিলেন। এইরূপে চিতোড় অধিকৃত হইলে পর আবালবৃদ্ধ বনিতা, হামীরের অধীনতা স্বীকার করিল। চিতোড় অবরোধ কালে যে সমস্ত প্রজাবর্গ অজয় সিংহের আদেশানুযায়ী জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৈলওয়াড়ার গিরিব্রজে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল এক্ষণে তাহারা পুনরায় চিতোড়ে আসিয়া আবাস নির্ম্মাণ করিল। অল্পদিনের মধ্যে শ্মশানে পরিণত চিতোড়পুরী পূর্ব্বশ্রী প্রাপ্ত হইল। চিতোড়বাসীগণ বহুদিন পরে মহোৎসবে মত্ত হইয়া হামিরের দীর্ঘায়ু কামনা করিতে লাগিল।

মীরদিগকে দমন করিয়া মালদেব চিতোড়ে প্রত্যাগমন করিলে পর, জামাতাকর্ত্তৃক চিতোড় অধীকৃত হইয়াছে দেখিয়া, চিতোড় শাসনের ভার পুনঃপ্রাপ্তির আশায়, দিল্লিতে গমন করেন এবং আলাউদ্দীনের উত্তরাধিকারী মহম্মদ খিলজীকে * পুনর্ব্বার চিতোড় আক্রমণ করিবার জন্য প্রোৎসাহিত করেন। স্বার্থান্ধ মালদেবের উত্তেজনায় যবনরাজ চিতোড় আক্রমণ করেন এবং হামির কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া চিতোড়-কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েন। তিনমাসকাল বন্দীভাবে কারাগৃহে যাপন করিয়া অবশেষে একশত হস্তী, পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা ও কয়েকটী জনপদের চিরস্বত্ব ত্যাগ করিয়া যবনরাজ স্বীয় স্বাধীনতা ক্রয় করেন। দিল্লীশ্বরকে নিষ্কৃতি দিবার সময় বীরবর হামির সদর্পে বলিয়া-

* জলধর মালদেবের একজন বিশ্বস্ত ও পুরাতন কর্ম্মচারী ছিলেন। তাহাকে হস্তগত করিতে পারিলে, যবন সেনাকে বশীভূত করা তাদৃশ দুরূহ হইবে না, হামির পত্নী বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বিবাহের পর পাত্র যে দ্রব্য যৌতুক গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিবেন, রাজপুতানার প্রথানুযায়ী কন্যা কর্ত্তাকে তাহাই দিতে হইবে। সুতরাং হামিরের প্রার্থনায়, অনিচ্ছাসত্ত্বেও মালদেবকে সম্মতি প্রদান করিতে হইয়াছিল।

* দিল্লির সিংহাসন এই সময়ে কোন্ সম্রাট কর্ত্তৃক অধিকৃত ছিল, তাহা মীমাংসা করা দুরূহ। আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মোবারক দিল্লির সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াছিলেন। মহাত্মা টড্ বোধ হয়, ইঁহাকেই এ স্থলে "মহম্মদ খিলজী" নামে অভিহিত করিয়াছেন। মোবারক যখন গুজ্জর ও দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন যে তাঁহার পক্ষে চিতোড় আক্রমণ করা অসম্ভব ছিল, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু পণ্ডিতবর এল্‌ফিষ্টোন সাহেবের মত গ্রহণ করিলে, ইহার ঠিক বিপরীত সপ্রমাণ হয়। এলফিষ্টোন সাহেব লিখিয়াছেন যে, ১৩১২ খৃষ্টাব্দে হামির চিতোড় উদ্ধার করেন। কিন্তু আলাউদ্দীনের মৃত্যুর অব্দ তিনি ১৩১৬ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে, আলাউদ্দীনের মৃত্যুর চারি বৎসর পূর্ব্বে, চিতোড় স্বীয় স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু এই দীর্ঘকাল মধ্যে আলাউদ্দিন, হামিরের হস্ত হইতে চিতোড় কাড়িয়া লইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন কিনা, এল্‌ফিষ্টোন সাহেব কিছুই লিখেন নাই। সুতরাং প্রকৃত ঘটনা ঐতিহাসিক অন্ধকারে চিরকাল আবরিত থাকিবে।

রাজপুত।

ছিলেন, "উপযুক্ত কার্য্যের উপযুক্ত প্রতিফল পাইলেন। যদি এ অবমাননার প্রতিশোধ লইতে ইচ্ছা থাকে, পুনর্ব্বার চিতোড় আক্রমণ করুণ, হামির আপনাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য চিতোড়ের প্রান্তভাগে দণ্ডায়মান থাকিবে। কখনও মনে করিবেন না যে আপনি দিল্লীশ্বর বলিয়াই, ভীত হইয়া আপনাকে মুক্তি দিতেছি।" *

মালদেবের শাসনকর্ত্তৃত্ব চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইল। শ্বশুরবংশ কি জানি দুর্দ্দশাগ্রস্থ হয়েন, এই ভাবিয়া হামির কয়েকটী জনপদের স্বত্ব তাঁহাদিগকে দান করিলেন। ইহাতে হামিরের সারল্য ও উদারতা প্রকাশ পায় মাত্র। যে শ্বশুর তাঁহার উচ্ছেদ সাধনের জন্য যবনরাজ কর্ত্তৃক পুনরায় চিতোড় আক্রমণ করাইয়াছিলেন, তাঁহারই প্রতি ঐরূপ অনুকম্পা, অসাধারণ ক্ষমাশীলতার পরিচায়ক। জগতের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। হামিরের অসামান্য পরাক্রম ও রণকৌশলে মেওয়াড়ের প্রণষ্ট গৌরব পুনরায় পূর্ণভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হইল। রাজস্থানের অন্যান্য রাজন্যবর্গ সার্ব্বভৌম নরপতি হামিরের আদেশ হৃষ্টচিত্তে পালন করিতে লাগিলেন এবং শত্রুদমনের জন্য সময়ে সময়ে সসৈন্যে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন। বীরবর হামির অতঃপর মেওয়াড় রাজ্য এরূপ সুদৃঢ়িকৃত করিতেছিলেন, যে বাবরের অভ্যুদয় পর্য্যন্ত বৈরীগণের বহুবার আক্রমণ সত্বেও, চিতোড়ের গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল। দিল্লির সিংহাসন লইয়া এই সময়ে, খিলজি, লোদী ও শূরবংশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে ঘোর অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হয়। এই গৃহ বিচ্ছেদের সুযোগে মেওয়াড়নৃপতিগণ স্বীয় স্বীয় রাজ্য আরও সুদৃঢ় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই সময়ে চিতোড়ের উন্নতির পরাকাষ্ঠা সাধিত হইয়াছিল। মেওয়াড়ের সর্ব্বত্রই শান্তি বিরাজিত হইতেছিল ও সৌভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না হইয়াছিলেন। এইরূপ সমৃদ্ধ ও উন্নত অবস্থায় দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া ১৩৬৫ খৃষ্টাব্দে শূরশ্রেষ্ঠ হামির মানবলীলা সম্বরণ করেন। হামিরের ন্যায় তেজস্বী, সাহসী ও সুদক্ষ নরপতি যে দেশেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, গৌরবের বিষয় বলিতে হইবে।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

* ফেরিস্তাও পরাজয় সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু যখন এই সময়ে চিতোড় স্বাধীনতা পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তখন এ বিজয় সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই।

কলিকাল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অনেক দিন জয়কালীর পিতৃ গৃহের সংবাদ লওয়া হয় নাই, এখন লইতে হইতেছে। জয়কালীর পিতা কন্যাদায় হইতে উদ্ধার পাইয়া কিছুদিন পরেই ইহ সংসারের সকল

দায় হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং সাধের জামাতা লইয়া আমোদ আহ্লাদ করা আর তাঁর ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। তাঁহার অন্তিম শয্যায় অর্দ্ধাঙ্গিনী নয়নতারা যখন ভাবী বৈধব্য যন্ত্রনায় বিবশা হইয়া "আমার দশা কি কর, কোলে গো" বলিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া করুণ ক্রন্দনে শিবচও বিদীর্ণ করিতেছিলেন, তখন মুমূর্ষু ব্রাহ্মণ, শয্যা পার্শ্বে উপবিষ্ট শোকাবিষ্ট জামাতা শ্রীমান শিবচরণের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "ভয় কি?—শিব রহিলেন!" ব্রাহ্মণ মিথ্যা বলেন নাই, সাধারণের চক্ষে শিব ক্রমে অন্য মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হইলেও শাশুড়ির হাতে শিব চিরদিন শিবই ছিলেন।

শ্বশুর মহাশয়ের স্বর্গারোহণের পর হইতে শিবচরণ শাশুড়ি ঠাকুরাণীকে প্রয়োজনীয় খরচপত্র নিয়ম মত দিতেন, ব্রাহ্মণ জীবিত থাকিতে বরং নয়নতারা মাঝে মাঝে সংসার জ্বালায় জ্বালাতন হইতেন, খরচ পত্রের অভাবে কষ্টও পাইতেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের পরলোক গমনের,—তা, সে শোকের কাহিনীটা আর নাই তুলিলাম! ইহারই নাম বুঝি "বিধি চেয়ে ব্যাধ ভাল" "বড় দুখে সুখ।"

এদিকে মায়ের আদরের আদরিণী জয়কালী মা ছাড়া বড় একটা থাকিতে পারিতেন না। জয়কালীর জননীর মত জননী কা'র আছে? নয়নতারা জয়কালীর সম্বন্ধে মাতা, পরামর্শে মাতুল (শকুনি), শিক্ষায় মন্থরা, মনোরঞ্জনে দুঃশাসন, কা'র এমন হয়? জননী রন্ধনে ব্রাহ্মণী, যত্নে কুটুম্বিনী, পরিচর্য্যায় সখি, কে এমন পায়? এহেন জননীকে কি জয়কালী ছাড়িয়া থাকিতে পারেন? জয়কালী যখন হাঁটিয়া যায়, জননী তখন পথে বুক পাতিয়া দিতে চান, পাছে গজেন্দ্রগামিনী কন্যার কোমল চরণে তৃণাঙ্কুশ বিঁধে! তাই নয়নতারা তাঁর কন্যারত্নের সংসার পথের কণ্টক, "ফুয়ে উড়াইতে' ব্যগ্র! তবে নিতান্ত সহজে যাহা যায় না, সম্মার্জ্জনী সঞ্চালনেও তাহা স্থানচ্যুত করিতে তিনি ক্লান্তি অনুভব করেন না!

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

জয়কালীর একটি মাত্র সহোদর, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেটি জয়কালীর কনিষ্ঠ। জয়কালীর পিতা পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন "পদ্মলোচন,—"এ নামকরণ নিরর্থক হয় নাই।

শ্রীমান পদ্মলোচন, শৈশবকাল হইতেই কিঞ্চিৎ অসাধারণত্ব প্রকাশ করিয়াছিল। বর্ণ পরিচয় হইতে ইহার তের খানি 'বর্ণপরিচয়ে'র প্রয়োজন হইয়াছিল! বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণ বিভাগের দোষে যদিও পদ্মলোচন, সমস্ত "বর্ণপরিচয়" কয়েক খণ্ডের সহিত সম্পূর্ণ পরিচয় সাধন করিয়া উঠিতে পারেন নাই, কিন্তু তবু তাহার বুদ্ধিবৃত্তির প্রাখর্য্যে সন্দিহান হইবার যো নাই! পদ্মলোচনের বাল্য ইতিহাসের দুই এক পৃষ্ঠা আলোচনা করিলেই আমাদের একথার সার্থকতা উপলব্ধি হইবে!

পদ্মলোচনের দৌরাত্ম্যে তাহার পাঠশালার সহপাঠিবৃন্দ বড়ই জ্বালাতন হইত। কিন্তু তবু তাহার বিরুদ্ধে গুরুমহাশয়ের নিকট কিছু বলা কাহারও সাহসে কুলাইত না! একদিন সহসা গুরুমহাশয় পদ্মলোচনের করতল পরীক্ষা করিলেন,—দেখিলেন সত্যই সে করতলে, শ্রীকৃষ্ণবক্ষে ভৃগুপদচিহ্নের মত তাম্রকূট-সেবন-সুলভ কলিকা-কলঙ্ক রহিয়াছে! পদ্মলোচন সকলই বুঝিল; বুঝিল, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী, নন্দলালেরই এ কাজ! নন্দলাল এ গোয়েন্দাগিরি করিয়াছে, সুতরাং আজ আর গুরুমহাশয়ের হাত হইতে নিস্তার নাই, ইহা বুঝিতে তাহার বাকী রহিল না! তখন পদ্মলোচনের লোচনদ্বয় ছল ছল করিতে লাগিল, সে কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল, 'পণ্ডিত মশায়, কাল আমি নন্দলালদের চণ্ডীমণ্ডপে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, আর নন্দা আমার হাতে কলিকা দিয়া তামাক খাইয়াছিল, এ তারই দাগ! সে তখন চক্ষু মুছিতে মুছিতে কয়েকজন সাক্ষী মানিল, নন্দের শত্রু মিত্র পদ্মলোচনের জানা ছিল, সুতরাং নন্দের বিপক্ষে সাক্ষীর অভাব হইল না! এদিকে পদ্মলোচনের অনুমান মিথ্যা হয় নাই, সত্যই নন্দ গোপনে পণ্ডিত মহাশয়কে পদ্মলোচনের তাম্রকূট সেবনের সমস্ত তথ্য বলিয়া দিয়াছিল—পদ্মলোচনের সহিত নন্দলালের যে প্রতিযোগীতা ছিল, পণ্ডিত মহাশয়ের সেটা বেশ জানা ছিল, সুতরাং সূক্ষ্মদর্শী গুরুমহাশয় বেচারা নন্দলালকেই দোষী সাব্যস্থ করিলেন,—তাঁহার উত্থিত বেত্র, নিষ্ফলে যাইবার নহে, কাজেই সে দণ্ড বিরাশি দশ আনা ওজনে নন্দের পৃষ্ঠে পড়িল। সেইদিন হইতে, পদ্মলোচনের প্রভাব পাঠশালার ছাত্রবৃন্দের উপর, বড়ই বাড়িয়া গেল। নন্দলাল, নিরানন্দে দিন কাটাইতে লাগিল!—পদ্মলোচন "একছত্রী" হইল!

নিরীহ সতীর্থবর্গের প্রতি পদ্মলোচনের আর কোন প্রকার বিদ্বেষের কারণ রহিল না, কিন্তু তাহার স্বভাব তাহাকে যে স্থির থাকিতে দেয় না! ক্রমে, পদ্মলোচনের সাহস বাড়িতে লাগিল, শুনিলে বিশ্বাস হয় না, সে জলে বাস করিয়া কুম্ভীরের সঙ্গেও বাদ আরম্ভ করিল, স্বয়ং গুরুমহাশয়ের সহিতও সে বুদ্ধির চাল চালিতে লাগিল। গুরুমহাশয়ের কিঞ্চিৎ নৈশ জাগরণ এবং দিবানিদ্রা অভ্যাস ছিল! এ উভয়বিধ কার্য্যেই, পদ্মলোচন কিছু কিছু বাধা জন্মাইবার আয়োজন করিল। কেন জানি না, গুরুমহাশয় "লোচনের" এই আচরণে প্রথমে মৌখিক কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া, বরং তাহাকে "সুবুদ্ধি" হইবার অমৃত উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন—কিন্তু "লোচনের" কর্ণকুহরে সে সব স্থান পাইল না! তাহার উৎপাত ক্রমে বাড়িয়াই চলিল! গুরুমহাশয়ের রংটা কিঞ্চিৎ কৃষ্ণবর্ণ ছিল, একদিন জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যাহ্নে, নিদাঘ-তাপে তাপিত, মুক্তকচ্ছ, ঘর্ম্মাক্ত কলেবর, গুরুমহাশয় পাঠশালায়, ছাত্রমণ্ডলিপরিবেষ্টিত হইয়া "তাকিয়া ঠেশান" দিয়া নিদ্রা যাইতে ছিলেন,—কি চমৎকার অভ্যাস, ঘোর নিদ্রার ঘোরেও মাঝে মাঝে তাঁহার মুখে গুরুগর্জ্জনে "এ—ই" শব্দ ও হস্তে বেত্র সঞ্চালন হইতেছিল। এই অবকাশে, পদ্মলোচন আজ একটা বড় রকমের চাল চালিল,—তাহার কার্য্যে পাঠশালার পড়ুয়াদের হৃদ্‌কম্প হইতে ছিল, পদ্মলোচন কটাক্ষে সকলকে সতর্ক করিয়া, শান্তভাবে স্বস্থানে আসিয়া উচ্চকণ্ঠে (?)—"মহামহিম শ্রী" কাঁদিতে আরম্ভ করিল! এদিকে বেলা অবসানের সঙ্গে সঙ্গে গুরুমহাশয়ের নিদ্রারও অবসান হইতে লাগিল! সে নাসিকা রাগিণী ক্রমে মেঘমল্লার হইতে খাদে নামিল! গুরুমহাশয়ের উন্মীলিত রক্তবর্ণ চক্ষু, তখন উত্তরীয় ও পরিধেয় বস্ত্রের দিকে পড়িল,—এ—কি—এ—কার এমন "মতিচ্ছন্ন" হইল "কে দিল আগুণে হাত, কে ধরিল ফণী" কে তাঁহার বস্ত্রাদিতে আলকাতরা লেপিয়া দিল? গুরুমহাশয়ের সুদীর্ঘ বেত্র তখন হৃত-শাবক সিংহিণীর লাঙ্গুলের ন্যায় আস্ফালন করিতে লাগিল! ক্রোধে, অপমানে, গুরুমহাশয়ের কাল মুখও লাল হইয়া উঠিল! সে রুদ্রমূর্ত্তিতে, ছাত্রবৃন্দ বায়ু-বিতাড়িত-বেতস-পত্রের মত কাঁপিতে লাগিল! গুরুমহাশয়ের বুঝিতে বাকী রহিল না, এ নাটের গুরু কে?—তিনি ক্রোধ-বিজড়িত-কণ্ঠে হাকিলেন—"লোচ না"—আজ্ঞে, বলিতে বলিতে প্রশান্ত-পথ লোচন গুরুমহাশয়ের সম্মুখবর্ত্তী হইল—তখন গুরুমহাশয়, "লে'কাজ কে করেছে বল্‌ত" বলিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে পদ্মের চুলায় পূর্ণ[illegible]র জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন—লোচন একটু স্থানের অ[illegible] গেল, মুখে বলিল, "আজ্ঞে, আপনি ভাল করে দেখুন, ওসব আপনার ঘামের দাগ",—গুরুমহাশয় অনেক সহিয়া ছিলেন, আর পারিলেন না! তখন তিনি তাঁ'র সেই প্রচণ্ড বেত্র সজোরে উত্তোলন করিলেন—সে বেত ইন্দ্রের বজ্রের মত পদ্মের উপর নিশ্চয়ই পড়িত; কিন্তু পদ্মলোচন অসাধারণ লম্ফন-পাণ্ডিত্যে, চকিতের মধ্যে গুরুমহাশয়ের মস্তক উল্লঙ্ঘন করিয়া, পশ্চাৎ দিক হইতে বেতগাছটী ধরিয়া এমনই টানিল যে, লম্বোদর গুরুমহাশয় সহসা চাল ভ্রষ্ট কুষ্মাণ্ডের মত ভূপতিত হইলেন। পদ্মলোচন সেই দিন হইতে পাঠশালা এবং পাঠ উভয়ই পরিত্যাগ করিয়াছিল! স্বাধীন পদ্মলোচনের প্রকৃত শিক্ষা এত দিনে আরম্ভ হইল!

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পদ্মলোচন ক্রমে বিংশতি বৎসর অতিক্রম করিল। নয়নতারার বড় সাধ, তাঁহার পদ্মের একটী পদ্মমুখী বধূ হয়! কিন্তু তাঁহার সে আশাবৃক্ষে অনেকবার মুকুল ধরিয়াও আজ পর্য্যন্ত কোন ফল দেখা দিল না। "পদ্ম" বিকশিত হইতে লাগিল, কিন্তু কোন ঘটক-ভৃঙ্গ তাহে বসিল না; এক আধবার ভোঁ ভোঁ করিয়া সকলে উড়িয়া গেল! নয়নতারা স্থির করিলেন, তাঁহার প্রতিবেশী ও গ্রামবাসী জাতি শত্রুরাই এ বাদ সাধিতেছে! তাহারাই এ সকল সম্বন্ধ ভাঙ্গাইতেছে! নয়নতারা দুই বৎসর এজন্য শত্রুবর্গের উদ্দেশে অনেকে অশ্রু ও গালি বর্ষণ করিয়া শেষ কিছুদিনের জন্য স্থানত্যাগ করাই সংকল্প করিলেন! প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, পুত্রবধূ না করিয়া আর গৃহে ফিরিবেন না! তখন কন্যা জয়কালীর সহিত পরামর্শ আঁটিয়া নয়নতারা কিছুদিন সপুত্রক জামাতৃ-গৃহে বাস করিবার বন্দোবস্তে প্রবৃত্ত হইলেন!

শিবচরণও বিশেষ আনন্দের সহিত এ প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন! শিবচরণ সম্প্রতি জয়কালীর নামে যে ৬০/ বিঘা জমী করিয়াছেন, সেগুলিকে খাসে রাখিয়া চাষ আবাদ করা তাঁ'র একান্ত ইচ্ছা; কিন্তু তিনি নিজে সর্ব্বদা বিদেশে থাকেন, কে আর তাঁ'র চাষ আবাদের তেমন তত্ত্বাবধান করিবে? শিবচরণ যখন এই বিষয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, ঠিক সেই সুযোগে শাশুড়ীর এই প্রস্তাব তাঁহার কর্ণে পৌঁছে! শিবচরণ দেখিলেন, সম্বন্ধী শ্রীমান্ পদ্মলোচনের দ্বারা চাষ আবাদের কার্য্য সুচারুরূপেই চলিতে পারিবে, তাই তিনি আহ্লাদের সহিত এ প্রস্তাবে রাজি হইলেন! বিশেষতঃ শ্বশুরালয়ে, শাশুড়ীর খরচও ত তাঁ'কেই যোগাইতে হয়!

ইহার পর শিবচরণ স্বয়ং বাটী আসিয়া চাষ আবাদের বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন! জয়কালীত পূর্ব্বেই আসিয়াছেন,—কয়েক দিন পরে নয়নতারা তাঁর পুত্ররত্নসহ জামাতৃ-ভবনে আবির্ভূত হইলেন।

হাফ্‌টোন্ ছবি।

ফটোগ্রাফীর সাহায্যে পুস্তকাদিতে ছাপিবার জন্য ছবি খোদাই হইবার কথা অনেকেই জানেন। হাফ্‌টোন্ নামক যে সকল ছবি আজকাল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই প্রণালীতে খোদিত।

নিজের ব্যবসায়ের কথা লইয়া সাধারণের সময় নষ্ট করিতে যাওয়া কতদূর সঙ্গত তাহা জানিনা। কিছুদিন পূর্ব্বে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে গিয়া তিরস্কৃত হইয়াছিলাম। তিরস্কর্ত্তা স্বয়ং একজন দেশীয় হাকিম। দুনিয়ার সকল বিষয় তাঁহার বিচারাধীন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, হাফ্‌টোন্ নামক এই একটা অজ্ঞাত কুলশীল বিদেশী জিনিস এতদিন যাবৎ এদেশে আমদানী হইয়াও তাঁহার খবরে পৌঁছায় নাই। সুতরাং তিনি পত্রিকাস্থ বিজ্ঞাপনে হাফ্‌টোনের বিস্তারিত বিবরণের অভাব দেখিয়া গরীবকে অপরাধী সাব্যস্ত করতঃ পোষ্টকার্ডে পরওয়ানা প্রেরণ করিয়াছেন—"you ought to have &c. তদবধি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, যেরূপেই হউক, এসম্বন্ধে সাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতেই হইবে। আজ 'প্রদীপ' সম্পাদক মহাশয় অনুকম্পা করিয়া সেই প্রতিজ্ঞা পালনের অবসর প্রদান করিয়াছেন।

কোন জিনিসের ছবি তুলিতে হইলে ফটোওয়ালারা তাহার সাম্‌নে ক্যামিরা স্থাপন করিয়া কত প্রকারের কস্‌রৎ করে, তাহা সকলেই দেখিয়াছেন। ক্যামিরার ভিতরে যে তখনই ঝাঁ করিয়া একটা জিনিসের ছবি আঁকা হইয়া যায়, তাহা কিন্তু নহে। ক্যামিরার ভিতরে একখানা মসলা মাখান কাচে সাম্‌নের জিনিসের একটা ছবি পড়ে। সেই ছবি পড়ার দরুণ সেই কাচে মাখান মসলাটাতে কেমন একটা পরিবর্ত্তন হয়। সে পরিবর্ত্তন তখন দেখা যায় না, কিন্তু তার পর সেই কাচখণ্ডকে আর কতকগুলি প্রক্রিয়ার অধীন করিলে তাহার পৃষ্ঠে জিনিসের একটা উল্টা ছবি (negative) ফুটিয়া উঠে। উল্টা ছবি বলিবার অর্থ এ নয়, যে আপনার পদদ্বয় উর্দ্ধে উঠিবে, আর শিরোব্রজে গমনাগমনের ব্যবস্থা হইবে। কিন্তু ইহার অর্থ এই, যে ঐ কাচে অঙ্কিত ছবিতে আলোকের স্থানে অন্ধকার, এবং অন্ধকারের স্থানে আলোক দেখা যাইবে। প্রকৃত ছবির যে স্থান যত কাল হওয়ার দরকার নেগেটিভের সেই স্থানটি ততই স্বচ্ছ হইবে, আর প্রকৃত ছবির যে স্থান যত ফর্‌সা হওয়ার দরকার, নেগেটিভের সেই স্থান ততই কাল হইবে।

এখন এই নেগেটিভকে একখণ্ড মসলা মাখান কাগজের অথবা অন্য কোন উপযোগী জিনিসের উপরে স্থাপন করিয়া আলোতে ধরিলে সেই কাগজে একখানি প্রকৃত (positive) ছবি (অর্থাৎ যাহাতে আলো ও ছায়া যথাযথরূপে ব্যক্ত হইয়াছে সেইরূপ ছবি) পাওয়া যাইবে। ইহাকেই আমরা ফটোগ্রাফ বলি।

কথাটাকে নিতান্তই মোটামুটি বলা হইল। কিন্তু যাঁহারা এসম্বন্ধে কিছু জানেন, তাঁহাদের পক্ষে এসকল কথা অনাবশ্যক এবং বিরক্তিকর হইতে পারে। আর যাঁহারা এসম্বন্ধে কিছুই জানেন না, তাঁহাদিগকে সাময়িক পত্রের প্রবন্ধে দুকথা বলিয়া ইহার চাইতে পরিষ্কার জ্ঞান দেওয়া খুব কঠিন বোধ হয়।

উপযুক্ত নেগেটিভ, আর উপযুক্ত মসলা মাখান ধাতুর পাত হইলে সেই ধাতুর পাতে পজিটিভ ছবি মুদ্রিত করা যায়। আর সেই ছবির এমন গুণ হইতে পারে যে, যে আরকে ডুবাইলে ধাতুর পাত গলিয়া যায়, সে আরকে এই

ছবিখানির কোন অনিষ্ট হয় না। ছবি অক্ষত থাকে, তদ্ভিন্ন অন্য স্থানের ধাতু গলিয়া গিয়া তাহা গর্ত্ত হইয়া যায়। এরূপ হইলেইত আপনারা যাহাকে 'এন্‌গ্রেভিং' বলেন তাহা হইল। ফটো মানে আলোক। মূলতঃ আলোকের সাহায্যে এই এনগ্রেভিং নিষ্পন্ন হয় বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে 'ফটোএন্‌গ্রেভিং।'

দেখা যাইতেছে যে ফটোএন্‌গ্রেভিঙ্গের মূল প্রক্রিয়া তিনটি। ১—নেগেটিভ প্রস্তুত; ২—ধাতুর পাতে পজিটিভ ছবি মুদ্রণ; ৩—উপযুক্ত আরকের সাহায্যে সেই ধাতুকে খোদাই (etch) করা।

এ স্থলে একটা কথার আলোচনা হওয়ার দরকার হইতেছে। মনে করুন, একখানা ফটো অথবা পেন্‌সিল কিম্বা তুলির আঁকা ছবি উড্ এন্‌গ্রেভারকে এন্‌গ্রেভ্ করিতে দিয়াছেন। আপনার প্রদত্ত ছবিতে যে উপায়ে আলো ও ছায়া ফলান হইয়াছে, সে উপায়ে কাঠের ব্লকে আলো ছায়া ফলান সম্ভব নহে। আপনার প্রদত্ত ছবিতে সাদা কাগজ হইতে আরম্ভ করিয়া মিশ্‌মিশে কাল পর্য্যন্ত অসংখ্য প্রকারের সেড্ রহিয়াছে। এই অসংখ্য প্রকারের নয়, সাদা নয়, কাল সেড্‌কে ইংরাজি ভাষায় 'হাফ্‌টোন্' বলে। *

যাহা বলিতেছিলাম। তুলিতে ছবি আঁকিবার সময় চিত্রকর যে উপায়ে হাফটোন্ ফলান, এন্‌গ্রেভারের সে উপায় অবলম্বন করা অসম্ভব। তুলির কাজে কাল রঙে যথেচ্ছা জল মিশাইয়া তদ্দ্বারা যেরূপ সেড্ ইচ্ছা প্রস্তুত করা যায়। এন্‌গ্রেভার কি তাহা পারেন? এন্‌গ্রেভারের ব্লক্ একই কাগজে একই কালীতে ছাপা হইবে—জল মিশাইয়া সেই কালীকে আবশ্যক মত এক স্থানে পাতলা অপর স্থানে গাঢ় করিবার ব্যবস্থা তাহাতে খাটিবে না। ব্লকের যে সকল স্থান গর্ত্ত, তাহা একেবারে সাদাই থাকিবে, আর যে সকল স্থান উঁচু, তাহা একেবারে কালই হইবে। অথচ আপনার চাই যে, সাদা হইতে কাল পর্য্যন্ত যত প্রকারের মাঝামাঝি সেড্ মূল ছবিতে আছে, ব্লক্ হইতে ঠিক তেমনিটি ছাপা হয়—নইলে সে জিনিস্‌টি হইবে না। সুতরাং এনগ্রেভারকেও সকল প্রকারের হাফটোন্ ফলাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। একখানি এনগ্রেভিঙ্গের ছাপ পরীক্ষা করিয়া দেখুন, সে ব্যবস্থা কিরূপ।

খুব সরু সরু কতকগুলি রেখা খুব কাছাকাছি টানিলে, একটু দূর হইতে তাহাদিগকে পৃথক পৃথক রেখার ন্যায় দেখা যায় না; কিন্তু তাহাদের স্থানটি একটি 'সেডের' মতন দেখায়। রেখাগুলি যত মোটা আর তাহাদের পরস্পরের ব্যবধান যত খানি, তাহার উপর সেই সেড্‌টির গাঢ়তা নির্ভর করে। রেখার পরিবর্ত্তে বিন্দু দ্বারাও ঐরূপ সেড্ প্রস্তুত করা যায়। বিন্দু গুলির পরস্পরের ব্যবধান (ব্যবধান বলিতে, এক বিন্দুর ঠিক মধ্যস্থল হইতে অপর বিন্দুর ঠিক মধ্যস্থল পর্য্যন্ত যে দূরত্ব, তাহাই বুঝিতে হইবে। কেবলমাত্র দুই বিন্দুর মাঝখানের সাদা অংশ টুকুকে বুঝিলে চলিবে না।) যদি ঠিক রাখা যায়, তবে খালি তাহাদের আয়তনের উপর সেডের গাঢ়তা নির্ভর করে। যে স্থান একেবারে সাদা, সেখানে বিন্দু থাকিবে না, তার চাইতে একটু ময়লা হইলেই অতিশয় সূক্ষ্ম বিন্দুর আবশ্যক হইবে। ক্রমে যতই ঘোর রঙ্গের দিকে যাইবেন, ততই বড় বড় বিন্দু দিতে হইবে। বিন্দু গুলি বড় হইতেছে, কিন্তু তাহাদের ব্যবধান ঠিক রহিয়াছে; সুতরাং শেষে এমন হইবে যে, এক বিন্দু অপর বিন্দুর গায় আসিয়া ঠেকিবে। বিন্দুর আকৃতি ভেদে এরূপ অবস্থায়ও তাহাদের মাঝখানে ফাঁক থাকিতে পারে; যেমন গোল বিন্দুর মাঝখানে থাকে। কিন্তু ইহার চাইতে বড় হইলে আবার সেই ফাঁকটুকুও চলিয়া যাইবে। তখন একেবারে কাল রঙে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। এই উপায়ে এন্‌গ্রেভার হাফটোনের ব্যবস্থা করেন। যে ছবি প্রেসে ছাপা হইবে, তাহার সম্বন্ধে অন্যরূপ ব্যবস্থা প্রযুজ্য নহে।

এখন কথা এই, একখানি ফটো হইতে আগাগোড়া ফটোগ্রাফীর সাহায্যে যদি ব্লক করা দরকার হয়, তাহা হইলে হাফটোনের ব্যবস্থা কি করিয়া হইতে পারে? এর জন্য একটা ব্যবস্থা না হইলে প্রেসে ছাপিবার উপযুক্ত ব্লক প্রস্তুত হইতেছে না।

প্রস্তাবিত সমস্যার মীমাংসার জন্য অনেক প্রকার উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার সকলটার ফল

* ক্রমাগত ইংরাজী কথা ব্যবহারের ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। এই সকল কথার এক একটা বাঙ্গালা প্রতিশব্দ ভাবিয়া স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাদের অর্থ আর খানিক পরে স্বয়ং বুঝিতে পারিব কিনা, সে বিষয়েই গভীর সন্দেহ হওয়ায় তাহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

সন্তোষজনক হয় নাই। আজকাল চৌদ্দ আনা হাফ্‌টোন্ এন্‌গ্রেভার যে উপায়ে ব্লকের দানা (grain) উৎপাদন করেন, তাহা এই।

পরিষ্কার কাচের ফলকে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সরল রেখা সমান্তরাল ভাবে সমান সমান দূরে অঙ্কিত করিতে হয়। রেখাগুলি অতিশয় পরিষ্কার হওয়া চাই, আর তাহাদের স্থূলতা এবং ব্যবধানের একটুও উনিশ বিশ না হওয়া চাই। এক ইঞ্চি পরিমাণ স্থানের ভিতরে এইরূপ ৭৫ হইতে ১৭৫ অবধি রেখা সাধারণ কার্য্যের জন্য ব্যবহার হয়। বিশেষ বিশেষ স্থলে মোটার দিকে ৫০ এবং মিহির দিকে ২৪০ পর্য্যন্ত ব্যবহার হইতে পারে।

এইরূপে দুইখণ্ড কাচে রুল কাটিয়া তাহার একখানিকে আর একখানির উপর স্থাপন করিতে হইবে। এরূপ ভাবে স্থাপন করিতে হইবে, যেন তাহাদের রুলকাটা দিক ভিতরে থাকে, এবং একখানা কাচের রুল আর একখানার উপর আড়বাগে পড়িয়া জাফ্রি বা জালের ন্যায় হয়। এইরূপ অবস্থায় কাচ দুখানিকে শক্ত করিয়া যুড়িতে পারিলেই ছবিতে দানা প্রস্তুত করিবার যন্ত্র নির্ম্মিত হইল। এইরূপ কাচকে স্ক্রীণ (screen) বলে।

সহজেই বুঝা যায় যে, এরূপ স্ক্রীণ ইচ্ছা করিলেই প্রস্তুত করা যায় না। অতিশয় সতর্ক এবং বুদ্ধিমান্ লোক বহুমূল্য যন্ত্রাদির সাহায্যে হীরার দ্বারা কাচের উপরে ঐরূপ লাইন কাটিতে পারেন। কিন্তু এ কার্য্য এত কঠিন যে, পৃথিবীতে তিনটি মাত্র লোক সম্প্রতি ইহা করিতেছেন। তন্মধ্যে আমেরিকার ম্যাক্স্ লেভিই প্রধান।

ক্যামিরার ভিতরে মসলা মাখান কাচের উপরে যে সময়ে ছবি পড়ে, সেই সময়ে একখানা স্ক্রীণ্ তাহার সামনে ধরিতে হয়। তাহা হইলেই নেগেটিভ খানা সাধারণ ফটোগ্রাফীর নেগেটিভের মতন না হইয়া দানাযুক্ত হইয়া পড়ে। এই দানাযুক্ত নেগেটিভ হইতে ধাতুর পাতে ছবি মুদ্রিত করিলে তাহাও দানাযুক্ত হয়। দূর হইতে তাহাকে মোটামুটি ফটোর মতন দেখায়, কিন্তু নিকট দৃষ্টিতে দেখা যায় যে, তাহা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিন্দুর সমষ্টি। এখন এই দানাযুক্ত ছবি বিশিষ্ট ধাতু ফলককে এচ্ করিলে বিন্দু গুলি ভিন্ন অন্য স্থল গর্ত্ত হইয়া যায়। তাহা হইলেই হাফ্‌টোন্ ব্লক্ প্রস্তুত হয়।

হাফ্‌টোন্ ছবি খুব বেশী দিন যাবৎ প্রচারিত হয় নাই; কিন্তু ইহার মধ্যেই এতদ্দ্বারা সচিত্র পুস্তকাদির ব্যবসায়ে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। যে সকল গুণে এই শ্রেণীর ছবি লোকের এত প্রিয় হইয়াছে, তাহা এই—

১। ইহাতে অবিকল আদর্শের অনুরূপ ফল পাওয়া যায়। উড্ এন্‌গ্রেভারের নিকট এ বিষয়ে সকল সময়ে সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায় না।

২। অল্পসময়ে কাজ হয়।

৩। সস্তায় কাজ হয়।

৪। ভাল হাফ্‌টোন্ ছবি দেখিতে যারপরনাই মোলায়ম হয়।

পক্ষান্তরে হাফ্‌টোন্ ছবির কতগুলি ত্রুটি আছে যথা—

১।—হাফ্‌টোন্ ছবির দানা ঐরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়াতে দেখিতে একটু অস্বাভাবিক দেখায়। খুব সরু স্ক্রীণ্ ব্যবহার করিয়া এই দোষ নিবারণ করা যায়, কারণ দানা খুব সরু হইলে তাহা মালুম হয় না। কিন্তু ইহাতে ছাপিবার হাঙ্গাম ও খরচা বাড়িয়া যায়।

২। ছবি খানি আদর্শের চাইতে ঝাপ্‌সা হয়। যত মোটা স্ক্রীণ্ ব্যবহার করা যায়, এ দোষ ততই অধিক পরিমাণে দেখা দেয়। খুব সরু স্ক্রীণে ইহা প্রায় দেখা যায় না।

৩। ছবির উজ্জ্বল স্থান গুলিতে আলো ও ছায়ার তারতম্য তেমন ভাবে রাখা যায় না। হাতে কাজ করিয়া ইহার আংশিক প্রতীকার হইতে পারে, কিন্তু তাহা সকল সময় বাঞ্ছনীয় নহে, কারণ তাহাতে চেহারা বদ্‌লাইয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে।

৪। হাফ্‌টোন্ ছবি মাত্রেরই কাজ খুব সূক্ষ্ম; সুতরাং তাহা ছাপিতে পরিশ্রম ও ব্যয় বেশী পড়ে। ভাল কাগজ, ভাল কালী, ভাল ছাপা না হইলে ভাল হাফ্‌টোন্ ছবি হয় না।

এই সকল দোষগুণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সহজেই বুঝা যাইতে পারে যে, উড্‌কট্ অপেক্ষা হাফ্‌টোন্ ছবি কোন্ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, আর কোন্ বিষয়ে নিকৃষ্ট। উড্‌কট্ ছাপিতে মুস্কিল নাই, আর তাহাতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি সহজেই দেখান যায়। সুতরাং ছোট ছোট

আভাস দিতে হইলে, আর অল্প ব্যয়ে ছাপিবার দরকার হইলে, উড্‌কট্‌ ব্যবহার করাই প্রশস্ত। সাধারণতঃ দোকানদারের ক্যাটলাগ, অল্প মূল্যের স্কুলপাঠ্য বহি, ইত্যাদিতে উড্‌কটেই বেশী ফল দেয়। *

কিন্তু যেখানে সুন্দর মোলায়ম ছবি চাই, চেহারা অক্ষুণ্ণ থাকা চাই, খরচপত্র পরিশ্রমে আপত্তি নাই, একটু ঝাপ্‌সা হইলেও ক্ষতি নাই, সেখানে হাফ্‌টোনেরই দরকার।

অবশেষে, যদি বেয়াদবি না হয়, তবে হাফ্‌টোন্‌ ব্লকের ভাল-মন্দ কিসে হয়, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ নিবেদন করি। আদর্শের সেড্‌লাইট্‌—বিশেষতঃ উজ্জ্বল স্থান গুলিতে—যে পরিমাণে রক্ষিত হইবে, সেই পরিমাণে ব্লক্‌টিকে ভাল বলিব। ইহার উপরে ছবি খানি দেখিতে যত মোলায়ম হইবে, ততই তাহা আরও উঁচুদরের হইবে। অতঃপর (মুদ্রাকরের দিক হইতে) ছাপিবার সময় যে ব্লকখানি যত কম নাকাল করিবে, অবশ্য তাহা এক হিসাবে ততই প্রশংসনীয় হইবে। কিন্তু এই শেষ কথাটার সম্বন্ধে একটু বক্তব্য এই যে, ছবি খুব মোলায়ম রাখা, আর মুদ্রাকরকে ষোল আনা সন্তুষ্ট করা, এ দুটি ব্যাপার এক সময়ে ঘটান সুকঠিন। মুদ্রাকরের যন্ত্র, মালমসলা এবং যোগ্যতা যথোচিত হইলে এ বিষয়ে বিশেষ চিন্তার কারণ থাকে না বটে, কিন্তু এ দেশকালে তাহা সচরাচর ঘটে কই?

যেমন তেমন একটা হাফ্‌টোন্‌ ব্লক প্রস্তুত করা অতি সহজ কাজ, কিন্তু আদর্শের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া ছবি খানিকে মোলায়ম করা একটু বেশী রকমের কঠিন। শিক্ষিত লোকে আর মুটেতে যে তফাৎ, এই দুই প্রকার কার্য্যেও সেইরূপ তফাৎ।

---

* এ স্থলে একটা কথা বলা আবশ্যক। ফটোগ্রাফীর সাহায্যে হাফটোন ভিন্ন অন্য এক প্রকারের ব্লক প্রস্তুত হইতে পারে। আদর্শটি এরূপ ভাবে অঙ্কিত করা যাইতে পারে যে, তাহার ব্লক করিতে আর স্ক্রীণের সাহায্যে দানা ফলাইবার প্রয়োজন হয় না। সাদা কাগজে গাঢ় কৃষ্ণ কালীতে কলমের দ্বারা ছবি আঁকিলে, সে ছবি এই শ্রেণীর হয়। ফটো এন্‌গ্রেভিং প্রণালীতে এইরূপ ছবি হইতে অবিকল আদর্শের অনুরূপ ব্লক প্রস্তুত হয়; তেমন ব্লক উড্‌ এন্‌গ্রেভিং দ্বারা হওয়া সম্ভব নহে। অবশ্য ইহাকে হাফটোন্‌ ব্লক বলে না; ইহার নাম রব কিনা, সে ভাল 'কালী কলমের' ছবি আদর্শ হইলে তাহা করিতে বাধ্য হইয়াছি। ইয়া লাইন্‌ ব্লক করাইলে অধিকতর সন্তোষ-

হীরার মূল্য।

দক্ষিণ হয়দ্রাবাদের ওমরাহ নবাব সুলতান আসফ জঙ্গের বাটীতে আজ বড় গোল পড়িয়াছে।

আসফ জঙ্গ্‌ হয়দ্রাবাদের একজন ক্রোড়পতি। সহরের একটা পাড়া জুড়িয়া তাঁহার বাড়ী। অট্টালিকার নাম মতিমহল। বৃহৎ সিংহদ্বারে আরব্য ও শীদিদিগের প্রহরা। দ্বার অতিক্রম করিয়া উদ্যান; উদ্যানে সুবাসিত শীতল জলের উৎস। উদ্যানের সম্মুখে সুসজ্জিত বৃহৎ প্রাসাদ। তাহার পশ্চাতে উচ্চ, দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরবেষ্টিত জেনানা-মহল।

কয়েক দিবস হইল আসফ জঙ্গ্‌ দশ লক্ষ মুদ্রা দিয়া এক খণ্ড হীরক ক্রয় করেন। জেনানামহলে তহখানার বৃহৎ লোহার সিন্দুকে সেই হীরক রক্ষিত হয়। সিন্দুকের চাবি আসফ জঙ্গ্‌ নিজের কাছে রাখিতেন। অদ্য প্রাতে নিজামের একজন কর্ম্মচারী আসফ জঙ্গ্‌কে আসিয়া বলে, নিজাম হীরক খণ্ড একবার দেখিতে চাহিয়াছেন। আসফ জঙ্গ্‌ অন্দরে গিয়া সিন্দুক খুলিয়া দেখেন, হীরক সিন্দুকে নাই। সিন্দুক তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন, কোথাও পাইলেন না। বাহির করিয়া যে আর কোথাও রাখিয়াছেন, এরূপও স্মরণ হইল না। এমন স্থান হইতে কে কিরূপে হীরক বাহির করিয়া লইল?

তখন আসফ জঙ্গের বৃহৎ অট্টালিকায় বড় গোল উঠিল।

(২)

বাটীর প্রহরীগণ হুকুম পাইবা মাত্র লোকের যাতায়াত বন্ধ করিল। বাটী হইতে কেহ বাহির হইতে পাইল না। থানার পুলিস আসিয়া আরও গোল বাড়িল, কিন্তু তাহারা বহির্ব্বাটীতেই হাক ডাক করিতে লাগিল। যে স্থান হইতে চুরী হইয়াছে, সেখানে সহসা কেহ যাইতে পারে না। মুসলমান ওমরাহের অন্তঃপুরী, সেখানে মক্ষিকারও প্রবেশ নিষেধ; তাহাতে তহখানা বিলাস ও বিশ্রামের স্থান; সেখানে গিয়া কে খুঁজিয়া দেখিবে, অন্তঃপুরবাসিনীদিগকে কে প্রশ্ন করিবে? পুলিশের লোকেরা বাহিরে ভৃত্যবর্গকে পীড়ন করিতে লাগিল, কিন্তু কোতওয়াল আসফ জঙ্গ্‌কে গোপনে বুঝাইয়া বলিলেন যে, তাহাতে কোন ফল হইবে না।

শ্রীবলাকুমার গুপ্ত

সে কথা আসফ জঙ্গ্ ও বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু এমন অবস্থায় নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারা যায় না। দশ লক্ষ টাকার শোক যে অসহ্য তাহা নহে, যদ্যপি টাকাটাও অল্প নহে। কিন্তু হীরকখণ্ড বহুমূল্য। নিজাম স্বয়ং দেখিতে চাহিয়াছেন। বিশেষ, অন্দর মহল হইতে এরূপ চুরী হয় এ বড় বিষম কথা। শুধু অন্দরমহল নহে, তহখানা অত্যন্ত গোপনীয় স্থান। নবাব আসফ জঙ্গ্ সে স্থানে গমন না করিলে বেগমেরাও সেদিকে গমন করেন না। দাসীদিগের যাইবার কোন প্রয়োজন হয় না। যাইলেও লোহার সিন্দুক খুলিয়া হীরক বাহির করিয়া লওয়া অসম্ভব। সিন্দুক কেহ ভাঙ্গে নাই। চাবির কৌশল না জানিলে কেহ খুলিতে পারে না। চাবি সোনার চেনে নবাবের নিমাস্তিনের পকেটে থাকে। কাহার এমন সাহস হইবে যে তাঁহার পকেট হইতে তাঁহার অজ্ঞাতে চাবি লইয়া সিন্দুক খুলিবে? তিনি চাবি কখন ভৃত্য বা বেগমদিগেরও হস্তে দেন না, পকেটে ব্যতীত আর কোথাও রাখেন না। এমন অবস্থায় এমন স্থান হইতে যদি হীরকখণ্ড চুরী গিয়া থাকে, তাহা হইলে ত তাঁহার হরমের ভিতরে সকল দুষ্কর্ম্মই সম্ভব। যে উপায়েই হউক, এই চুরীর তদন্ত করিতে হইবে।

(৩)

সদর মহলে প্রহরী, ভৃত্য, ও কর্ম্মচারীদিগকে পুলিশ জেরা করিতে লাগিল। পুলিশের সনাতন প্রথানুরূপ কাহাকেও ভয় দেখায়, কাহাকেও আশ্বাস দেয়, কাহাকেও প্রলোভন দেখায়। ফল কিছু হউক বা না হউক, পুলিশের যাহা কর্ম্ম তাহা করিল। তাহাদের জিজ্ঞাসাবাদে বিরক্ত হইয়া নবাবের প্রহরীদিগের মধ্যে একজন শীদি বলিল, "উল্লুকে তওর বার বার কেয়া পুছ্‌তা হ্যায়? হীরা কেয়া মেরে পাস্ হ্যায়?"

নায়েব কোতওয়াল সাহেব মহা খাপা হইয়া বলিলেন, "জবান সম্‌হাল কে বাত কিয়া কর্। শক্ সব পর হ্যায়। তু কওন হ্যায় যো তেরে উপর শক্ ন হো।"

"তেরা শক্ ময় অভি মিটা দেতা হুঁ," বলিয়াই শীদি কটি হইতে প্রকাণ্ড ছোরা বাহির করিল। নায়েব কোতওয়ালের বক্ষে বসাইয়া দেয় আর কি! পাঁচ সাত জন লোক মাঝে পড়িয়া অনেক কষ্টে তাহাকে থামায়।

অন্দরে পুলিশের উৎপাত ছিল না, কিন্তু সংশয়ের কারণ সেখানেই অধিক। জেনানার প্রবেশদ্বারে খোজার পাহারা। যদি চোর বাহির হইতে আসিয়া থাকে, তাহা হইলে হয় খোজাদিগের, অথবা দাসীদিগের, অথবা উভয়েরই জানিবার সম্ভব। যদি অন্দরমহল হইতেই কেহ চুরী করিয়া থাকে, তাহা হইলে চোর মহলেই আছে। কিন্তু কোন্ সময়, রাত্রিকালে কিম্বা দিনের বেলায়, কয় দিন হইল, চুরী হইয়াছে তাহার কোন স্থিরতা নাই। আসফ জঙ্গ্ খোজার সর্দ্দার মুরাদকে ডাকাইলেন। এব্যক্তি বহুকালের ভৃত্য এবং অত্যন্ত বিশ্বাসী। তাহাকে অনেক জিজ্ঞাসা করিয়া নবাব কিছুই সন্ধান পাইলেন না। অবশেষে দাসীদিগকে একে একে ডাকাইলেন। দাসী সম্প্রদায় সব দেশেই একরূপ, তা মেরি তেরি করিয়া অতি পরিষ্কার, অতি মধুর দিল্লীর হিন্দুস্থানী ভাষায় কথা কহুক, কিম্বা গলায় কাঁসর বাজাইয়া বীরভূম জেলার বাঙ্গালাই বলুক। যাহার বয়স হইয়াছে সে চেঁচাইয়া মহল মাথায় করিতে উদ্যত হইল, আর দশজনকে গালি পাড়িল, খানাতল্লাসী দিতে সম্মত হইল। যাহার বয়স অল্প সে চেঁচাইল না, কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল। আসফ জঙ্গ্ বড় বিপদে পড়িলেন।

কিন্তু তিনি ক্ষান্ত হইলেন না। দাসীদিগকে জিজ্ঞাসা বাদ করিয়া তাহার পর তল্লাসী আরম্ভ হইল। চোরাই মাল যে একেবারে বরামদ্ হইল না এমন নহে, কিন্তু সেগুলার প্রতি আসফ জঙ্গ্ বড় একটা লক্ষ্য করিলেন না। যে সামগ্রীর জন্য তল্লাস হইতেছিল তাহা পাওয়া গেল না। পাওয়া যাইবে এমন আশা করিয়া অনুসন্ধানও করা হয় নাই।

তাহার পর নবাব ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। হীরক খণ্ড চুরী গিয়াছে, সাধ্যমত তাহার সন্ধান করা কর্ত্তব্য। দাসদাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াই নিবৃত্ত হওয়া যায় না। অন্তঃপুরবাসিনী বেগমদিগকেও জিজ্ঞাসা করা উচিত। যদি তাঁহারাই কেহ কৌতুক করিবার ইচ্ছায় হীরক খানা লুকাইয়া রাখিয়া থাকেন! কিন্তু সে সম্ভাবনাও অল্প; কারণ বেগমেরা কেহই সিন্দুক খুলিবার কৌশল অবগত ছিলেন না; নবাবের অজ্ঞাতসারে চাবি তাঁহাদিগের হস্তগত হওয়া সম্ভবপর নহে। অথচ না জিজ্ঞাসা করিলেও চলে না।

সাত পাঁচ ভাবিয়া আসফ জঙ্গ্ প্রধানা বেগম বিবি সেলিমা বেগমের গৃহদ্বারে উপনীত হইলেন।

সেলিমা বয়সে বড় এবং প্রথমা পত্নী বলিয়া প্রধানা, স্বামীর হৃদয়রাজ্যে আর প্রধানা নহেন। স্বামীর সহিত দেখা সাক্ষাৎই আর বড় ঘটে না। নবাবকে দেখিয়া কহিলেন, "পথ ভুলিয়া আজ এখানে যে! আজ সকালে উঠিয়া না জানি কাহার মুখ দেখিয়াছি!"

সম্ভাষণটা নিতান্ত মিঠা রকম নহে, কিন্তু আসফ জঙ্গ্ তাহাতে পিছাইলেন না। বলিলেন, "এত মূল্যের হীরা চুরী গেল এবড় আশ্চর্য্য কথা। তাহারই সন্ধান করিতেছি।

বেগম বলিলেন, "তা আমার কাছে কেন? আমি কি ফৌজদার না কোতওয়াল, না আমার কাছে তোমার সিন্দুকের চাবি থাকে?"

"না, তা নয়, তবে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতে হয়। তোমাদের সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি।"

বেগমের মধুর গলা একটু তীব্র বাজিল। "জিজ্ঞাসা করিতে হয় যেখানে দিনরাত পড়িয়া থাক, সেইখানে জিজ্ঞাসা কর। আমার ছায়া পর্য্যন্ত মাড়াও না, আমার সহিত কোন সম্বন্ধই নাই, তোমার কি চুরী যায় না যায় আমি তার কি জানি?"

"সে কথা আমি বলিতেছি না। হীরা খানা অন্দর মহলেই ছিল, অন্দরমহল হইতেই চুরী গিয়াছে। দাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, তাহাদের তল্লাসী লওয়া হইয়াছে। এখন বাড়ীর আর সকলকে জিজ্ঞাসা না করিলে ভাল দেখায় না।"

বেগম ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন। "স্পষ্ট করিয়াই বলনা কেন আমার উপর সন্দেহ হইতেছে। দাসীতে আর আমাতে প্রভেদ কি? আর ত সবই ফুরাইয়াছে, এখন চোর অপবাদ দিতে পারিলেই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। দাসীদিগের তল্লাসী লইয়াছ, আমাকেই বা ছাড়িবে কেন? তা তুমি কষ্ট করিবে কেন, আমি নিজে দেখাইতেছি।" রোষে, অভিমানে স্ফুরিতাধরা, আয়তলোচনা প্রবীণার যৌবন যেন ফিরিয়া আসিল। দ্রুতপদে, কম্পিতহস্তে সিন্দুক, বাক্স খুলিয়া ফেলিয়া সকল সামগ্রী বেগে আসফ জঙ্গের সম্মুখে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কত রকম কারুকার্য্যখচিত পেশোয়াজ, বহুমূল্য ইজারবন্ধ সুদ্ধ পায়জামা, জরিদার আঙ্গরাখা ও কাঁচুলি স্তূপাকার হইয়া উঠিল। রাশীকৃত অলঙ্কার ছুড়িয়া ফেলিলেন; মুঠা মুঠা আশরফি ঝন্ ঝন্ করিয়া গৃহময় ছড়াইয়া পড়িল। তল্লাসী শেষ না হইতেই আসফ জঙ্গ্ স্বয়ং চোরের মত পলায়ন করিলেন।

অপর বেগমদিগের মহলে কিছু রসবৈচিত্র ঘটিল। কোথাও হাসির তরঙ্গ উঠিল, কোথাও রোদনের উৎস মুক্ত হইল, কোথাও উভয়ের সংমিশ্রণ ঘটিল। অবশেষে আসফ জঙ্গ্ লয়লা বেগমের গৃহে উপনীত হইলেন। অল্প দিন হইল ইনি নবাবের হরমে প্রবেশ করিয়াছেন। এখন ইনিই প্রধানা বেগম। সৌন্দর্য্যে ইহার তুল্য মহলে কেহ ছিল না, তাহাতে পূর্ণ যৌবন। প্রৌঢ়বয়স্ক নবাবের হৃদয় ইনি সম্পূর্ণ অধিকার করিয়াছিলেন। ইহার গৃহে উপস্থিত হইয়া উপবেশন করিয়া কহিলেন, "তোমার কাছে আসিলে বিপদের সময়েও একটু শান্তি পাই।"

লয়লা আর্মানী। আসল নাম জজিয়ানা। নবাব আদর করিয়া লয়লা নাম রাখিয়াছিলেন। সকলেই তাঁহাকে লয়লা বেগম বলিত। এমন রূপে যে নবাব মুগ্ধ হইবেন ইহা বিচিত্র নহে। ঘন নীল ভ্রূযুগ ঈষৎ বঙ্কিম করিয়া বীণাবিনিন্দিত স্বরে লয়লা কহিলেন, "কি বিপদ! হীরা পাওয়া যাইতেছে না?"

আসফ জঙ্গ্ কহিলেন, "বিপদ অল্পই বা কি? দশ লক্ষ মুদ্রা দিয়া হীরা কিনিয়াছি, আজ পনর দিনও হয় নাই। আর এ রকম চুরী হওয়া বড় ভয়ানক কথা। তহখানার লোহার সিন্দুক, চাবি আমার কাছে, খুলিবার কৌশল কেহ জানে না, কেমন করিয়া চুরী গেল? যদি কোন সন্ধান না পাওয়া যায়, চোর ধরা না পড়ে, তাহা হইলে ত সর্ব্বদাই শঙ্কা। আবার ত কোন দিন কিছু চুরী যাইতে পারে!"

বেগম কহিলেন, "আবার কি চুরী যাইবে?

নবাব পরিহাসমানসে কহিলেন, "কি জানি বিবি যদি তোমাকেই কোন দিন চুরী করিয়া লইয়া যায়?"

অতি মধুর, ক্রূর কটাক্ষপাত করিয়া বেগম কহিলেন, "আমার মূল্য কি দশ লক্ষ টাকা?"

নবাব লয়লার করচুম্বন করিয়া কহিলেন, "একখানা পাথরে আর তোমাতে? দুনিয়া জাহান একদিকে করিলে তোমার তুলনা হয় না।"

এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া লয়লা কহিলেন, "কথা ত সত্যই ভয়ানক। এখন কি করিবে?"

"বাহিরে পুলিসে সন্ধান করিতেছে। এ মহলে খোজাকে লইয়া আমি নিজে তল্লাস করিতেছি। দাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাহাদের ঘরের ও আসবাবের তল্লাসী লইয়াছি। যখন খোঁজ হইতেছে, তখন সকল জায়গায় করিতে হয়। বেগমেরা কেহ কিন্তু এ কথা বুঝিবেন না, কেহ রাগ করিতেছেন, কেহ ব্যঙ্গ করিতেছেন। তাই তোমায় জিজ্ঞাসা করিতে আসিলাম।"

"এত বেশ কথা। ইহাতে আপত্তি কি? কোন দাসীই যদি চুরী করিয়া বেগমদের মহলে রাখিয়া দিয়া থাকে?"

নবাব তখন ভরসা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ঘরের তল্লাসী করিব?"

লয়লা উঠিয়া, স্থির রূপরাশি আন্দোলিত করিয়া, কুর্ণীশ করিলেন, চক্ষের উপর হস্ত রাখিয়া বক্ষে হস্ত স্থাপন করিলেন। কহিলেন, "চশম্, চশম্। দিলোসে, জানোসে। তল্লাসীর হুকুম হউক।"

রঙ্গ দেখিয়া নবাব বড় চঞ্চল হইলেন। দ্রুত উঠিয়া বেগমের হস্ত ধারণ করিলেন। কহিলেন, "রসো, দেহের তল্লাসী আগে করি। যদি এই রূপের মধ্যে হীরাখানা লুকাইয়া রাখিয়া থাক!"

জলের তরঙ্গ যেমন ধরিয়া রাখা যায় না, প্রসারিত বাহু অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়, লয়লা সেইরূপ তরল, চঞ্চল, তরঙ্গায়িত হইয়া, নবাবের হস্তমুক্ত হইয়া দূরে গিয়া দাঁড়াইল। নবাবের মুষ্টি, তাঁহার প্রসারিত বাহু শূন্য রহিল। রঙ্গিনী লয়লা গম্ভীর হইল, বলিল, "শরীরের তল্লাসী দাসীতে করিবে, তাহাতে তোমার না প্রতীতি হয় খোজায় করিবে"—নবাব মুখ বিকৃত করিলেন—"কিন্তু যতক্ষণ অন্বেষণ শেষ না হয়, ততক্ষণ আমার উপর চুরীর সন্দেহ। এখন আমায় স্পর্শ করিও না।" বেগম স্বয়ং পরিচারিকাকে ডাকিয়া তাহার হাতে চাবি দিলেন, বলিলেন, "পেটারা বাক্স সব খুলিয়া নবাবকে দেখাও।"

নবাব বিস্মিত, পুলকিত হইয়া কহিলেন," তোমার মত আর সকলে বুদ্ধিমতী হইলে কোন গোল হইত না, হয়ত চুরীই হইত না।"

অন্যান্য সামগ্রী বাহির করিতে দাসীর হস্তে একখানা চিঠি উঠিল। "হাঁ, হাঁ কি ওটা দেখিদেখি," বলিয়া নবাব হাত বাড়াইলেন। ততক্ষণ পত্র লয়লার হস্তে। তিনি একবার দেখিয়া, অল্প হাস্য করিয়া, নবাবের হস্তে দিলেন। আসফ জঙ্গ্ পত্রখানা লইয়া, উল্টাইয়া পাল্টাইয়া, ভ্রূ ও চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "এ কি ভাষা আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

বেগম কহিলেন, "তোমরা কি ভাষায় লেখ আমিও ত কিছুই বুঝিতে পারি না।"

নবাব বলিলেন, "এ কি চিঠি, কে তোমায় লিখিয়াছে?"

"আমার এখানে আসিবার পূর্ব্বের চিঠি। কে লিখিয়াছে বলিলে তুমি চিনিতে পারিবে না। আমাদের দেশের কাহাকেও ত তুমি জান না।"

নবাব কিছু সন্দিগ্ধ হইয়া কহিলেন, "এ পত্র নূতন দেখিতেছি। পুরাতন হইলে জীর্ণ হইত।"

বেগম অল্প হাসিয়া কহিলেন, "আমিও ত তোমার গৃহে নূতন আসিয়াছি, এখনও পুরাতন হই নাই।"

কিন্তু নবাবের মনে সন্দেহ রহিল। "এ পত্র আমার নিকট থাকুক। আমি বহুভাষী দ্বারা পাঠ করাইব।" বলিয়া নবাব পত্রখানা স্বীয় বস্ত্রমধ্যে রাখিতে উদ্যত হইলেন।

কিন্তু, ক্ষিপ্রকারিতায় নবাবের কি সাধ্য যে তিনি যুবতীর সঙ্গে আঁটিয়া উঠেন। পলকের মধ্যে লয়লা তাঁহার হস্ত হইতে পত্র ছিনিয়া লইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ক্রোধে অধীর হইয়া কহিলেন, "এখন তোমার দাসী হইয়াছি বলিয়া যে আমার কোন বল নাই এমন মনে করিও না। আমার পূর্ব্ব কথা তোমাকে বলা না বলা আমার ইচ্ছা।"

নবাব কিছু লজ্জিত কিছু সন্দেহাকুল হইয়া প্রস্থান করিলেন।

(৪)

বহু অনুসন্ধানে, পুলিশের ধমকে, পীড়নে কিছু ফল হইল না। কেমন করিয়া চুরী হইল, কে চুরী করিল,

ঘুণাক্ষরে তাহার কিছু প্রকাশ হইল না। হীরকখণ্ড যে আর কোন দেশে আবার বিক্রয় হইবে, এবং সেই সূত্রে চোর ধরা পড়িবে, সে আশাও বড় ক্ষীণ, কারণ এ কর্ম্ম এমন নির্ব্বোধের নহে যে, সে নিজের হাতে নিজে হাতকড়ি লাগাইবে। এমন মহামূল্য সামগ্রী ঘটী বাটীর মত পথে ঘাটে বিক্রয় হয় না।

আসফ জঙ্গ্ তার করিয়া বোম্বে হইতে প্রধান ডিটেক্টিভকে আনয়ন করাইলেন। ছিপ্‌ছিপে একহারা মানুষ, মাথায় খাট, ফিরিঙ্গী, নাম আরাটূন। আসফ জঙ্গের সকল কথা স্থির হইয়া শুনিয়া কহিল, "এ কাজে আপনি আমাকে কেমন করিয়া নিযুক্ত করিবেন ?"

আসফ জঙ্গ্ কিছু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "নিযুক্ত করিব না ত তোমাকে ডাকাইয়াছি কেন ?"

আরাটূন কিছু নীরস স্বরে কহিল, "সকল কর্ম্মেই যে আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারি, এরূপ মনে করিবেন না। আমাকেও কাজ একটু দেখিয়া শুনিয়া করিতে হয়, নহিলে লোকে আমায় বিশ্বাস করিবে কেন ? যে কার্য্যের গোড়াতেই নানা বিঘ্ন তাহাতে হাত দিতে ইচ্ছা হয় না।"

নবাব কহিলেন, "কিছু না করিয়াই তুমি কেমন করিয়া বিঘ্ন দেখিতে পাইলে ?"

"আপনিই বিবেচনা করিয়া দেখুন। আমাদের ক্ষমতায় অলৌকিকতা কিছুই নাই, এক জায়গার চুরী আর এক জায়গায় বসিয়া ধরিতে পারি না। হয় ত সন্ধান পাইলে পারি। চুরীর স্থান দেখিতে হইবে, যাহাদিগকে সন্দেহ হয় তাহাদিগকে দেখিতে হইবে, তাহার পর যেরূপ কৌশল মনে হয় সেইরূপ অবলম্বন করিতে পারি। আপনার চুরী হইয়াছে জেনানামহলে। সেখানে পরপুরুষের প্রবেশ নিষেধ। আমি এ চুরীর কি করিব ?"

কথাটা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। নবাব কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "তাই ত, কি উপায় করিব বুঝিতে পারিতেছি না। ভিতরের মহলে অন্য পুরুষ প্রবেশ করিলে অত্যন্ত দুর্নাম হইবে। কিন্তু আমি এ চুরীর কথা ত্যাগ করিতে পারি না। এক উপায় আছে। বেগমদিগকে আমি বাগানবাটীতে পাঠাইয়া দিতে পারি, তুমি মহল ভাল করিয়া দেখিতে পার। ইচ্ছা হয় দাসীদিগকেও যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে পার। বেগমদিগকে দেখিতেও পাইবে না, কোন কথাও জিজ্ঞাসা করিতে পাইবে না। তবে যদি আমায় কোন কথা বল, আমি জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতে পারি।"

"বেগমদিগের সম্বন্ধে যদি আপনার নিকট কোন কথা জানিতে চাহি তাহাতে কোন আপত্তি হইবে না ?"

"কিছু না।"

"অগত্যা ইহাতেই আমাকে স্বীকৃত হইতে হইবে। কিন্তু আপনাকে পূর্ব্বে হইতে বলিয়া রাখিতেছি যে, আমি যদি অকৃতকার্য্য হই ত আপনি নিরাশ বা বিরক্ত হইবেন না। গোড়ার কথা যতদূর জানা সম্ভব ডিটেক্‌টিভের সমস্ত জানা উচিত। যত লোকের উপর সন্দেহ হইতে পারে, সকলকে দেখা উচিত। আমি তাহা পাইব না। এ অবস্থায় আমা হইতে যাহা হয় করিব। একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি।"

"দশটা কর।"

"কাহারও উপর আপনার সন্দেহ হয় ?"

"না।"

"তবে আমি বাড়ী সুদ্ধ লোককে সন্দেহ করিতে পারি, লাগায়েৎ ডেউড়ীর সান্ত্রী হইতে ইস্তক অন্দর মহলের বেগম পর্য্যন্ত ?"

নবাব একটু রসিকতা করিলেন, "শুধু তাহা কেন, আমার উপরও পূরা সন্দেহ করিতে পার।"

"কেবল তাহা নহে। আমার মনে যখন যে সন্দেহ উপস্থিত হইবে আপনাকে বলিব, আপনি রাগ করিতে পাইবেন না। অতি গুহ্য কথা জিজ্ঞাসা করিলেও বিরক্ত হইবেন না। তাহা হইলে তখনি আপনার কর্ম্ম ত্যাগ করিব।"

"সেত জানা কথা।"

"আর এক অনুরোধ। যদি আবশ্যক বোধ করি ত আপনার অবরোধে স্ত্রীলোক গোয়েন্দা নিযুক্ত করিব। দাসীর হিসাবে কিম্বা আর কোন ছলে সে থাকিবে। যখন ইচ্ছা হয় আসিবে, যখন ইচ্ছা হয় যাইবে, কেহ তাহাকে বাধা দিবে না। বেগমদিগের অথবা কোন বেগমের অপ্রিয় হইলে তাহাকে বিদায় করিবেন না।"

আসফ জঙ্গ্ কহিলেন, "বেগমদিগের পিছনে আবার গোয়েন্দা কেন ? আমি ত স্বয়ং সকল কথা জানিতে স্বীকার করিয়াছি।"

"আপনি যাহা জানিতে পারিবেন না, গোয়েন্দায় তাহা জানিবে। আমার প্রস্তাবে আপনি সম্মত না হইলে আমি এ কর্ম্মে স্বীকৃত হইব না।"

অগত্যা নবাব সম্মত হইলেন। বলিলেন, "তোমার কি বিশ্বাস চোর অন্দর মহলেই আছে ?"

আরাটূন বলিল, "তাহা জানি না, কিন্তু চুরীর সন্ধান অন্দর মহল ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যাইবে না।"

(৫)

আসফ জঙ্গ্ বেগমদিগকে উদ্যানবাটিকায় পাঠাইয়া দিলেন। দাসীগণ ও খোজারা সঙ্গে গেল। নবাব তখন আরাটূনকে অন্দরমহলে লইয়া গেলেন।

আরাটূন প্রথমে তহখানায় লোহার সিন্দুক দেখিতে গেল। সিন্দুকের চারি পার্শ্বে উত্তমরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিল। ঘরের দরজা দেখিল। সিন্দুকের কলের পাশে কোন চিহ্ন আছে কি না দেখিল। তাহার পর নবাবকে সিন্দুক খুলিতে বলিল। সিন্দুক খুলিবার কৌশল ভাল করিয়া দেখিল। নবাব সিন্দুক বন্ধ করিলে তাঁহার হাত হইতে চাবি লইয়া স্বয়ং সিন্দুক খুলিল। নবাবকে বলিল, "আপনি যে বলিতেছিলেন চাবির কৌশল কেহ জানে না সে বড় কাজের কথা নয়। একবার ভাল করিয়া দেখিলেই শিখিতে পারা যায়। আপনি যখন সিন্দুক খুলিতেন, তখন কি কেহ দেখিত না ?"

"কেন দেখিবে না ? বেগমেরা থাকিতেন, কখন কখন দাসীরাও থাকিত।"

"আপনি যে হীরা কিনিয়াছিলেন একথা বাড়ীতে রাষ্ট্র হইয়াছিল ?'

"এমন কথা কি চাপা থাকে ?"

"আপনি যখন সিন্দুকে হীরা রাখিয়াছিলেন, তখন এখানে কে ছিল ?"

"লয়লা বেগম। দাসী দুই এক জন ছিল কি না স্মরণ হইতেছে না।'

"বেগম এখানে কতদিন আসিয়াছেন ?"

"মাস তিনেক হইবে।"

"তিনি সুন্দরী কিনা জিজ্ঞাসা করিতে পারি ?"

"পরমা সুন্দরী।"

"বুদ্ধিমতী ?"

"অসাধারণ বুদ্ধিমতী।"

"বয়স কত ?"

"বাইশ তেইশ হইবে।"

"কি জাতি ?"

"আর্ম্মানী।"

"এখানে কেমন করিয়া আসিলেন ?"

নবাব মুখ একটু ভারি করিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। আবার অল্প হাসিয়া কহিলেন, "সে কথা তোমার জানিবার আবশ্যক নাই।"

আরাটূন ফিরিঙ্গী হিসাবে দুই স্কন্ধ সঙ্কোচিত করিয়া উপরে তুলিল। ধনী নবাবদিগের মহলে বেগম এখনও গোপনে ক্রয় করা হয়, এ কথা তাহার অগোচর ছিল না। সে কথা ছাড়িয়া দিয়া আরাটূন আবার জিজ্ঞাসা করিল, "ইহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কিছু জানেন ?"

"না।"

"জানিবার কোন উপায় আছে ?"

"এখন বোধ হয় আর নাই।"

"তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি আপনার কাছে আছে ?"

নবাব কিছু রুক্ষ ভাবে কহিলেন, "না।"

"হীরা রাখিবার সময় তাঁহার সঙ্গে দাসী কয়জন ছিল ?"

"স্মরণ নাই। দাসী কেহ ছিল কিনা স্মরণ হইতেছে না।"

"তাঁহার কয়জন দাসী আছে ?"

"দুইজন দাসী সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকে, তাহা ছাড়া অন্যান্য পরিচারিকাও আছে।"

আরাটূন তহখানার বাহিরে আসিল। দুই তিনটা বারান্দা দিয়া তহখানায় যাওয়া যায়। বারান্দার সম্মুখে বৃহৎ প্রাঙ্গণ; প্রাঙ্গণের চারিদিকে বেগমদিগের মহল। এক এক মহলের সঙ্গে দাসীদিগের থাকিবার স্থান। বারান্দা পার হইয়া একটা বৃহৎ, শূন্য প্রকোষ্ঠ, তাহার পর খোজার প্রহরা। বারান্দার সম্মুখে যে মহল, আরাটূন তাহার সম্মুখে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কাহার মহল ?"

আসফ জঙ্গ্ বলিলেন, "বড় বেগমের, বিবি সেলিমার।"

"তিনি কতদিন আসিয়াছেন?"

"বিশ পঁচিশ বৎসর হইবে।"

ফিরিঙ্গী আর দুই একটা মহলের পরিচয় লইল। অবশেষে জিজ্ঞাসা করিল, "লয়লা বেগমের মহল কোথায়?"

"এদিকে নয়, আমার সঙ্গে আইস।" নবাব আরাটুনকে আর একদিকে লইয়া গেলেন। লয়লার মহলের নিকটে অন্য মহল নাই। সেলিমার মহল হইতে তহখানা যতদূর লয়লার মহল হইতেও ততটা দূর হইবে। দাসীদিগের গৃহের ভিতরে গিয়া আরাটুন চারিদিকে ভাল করিয়া দেখিল। তাহার পর নবাবের সঙ্গে বহির্ব্বাটীতে গেল।

বাহিরে আসিয়া আরাটুন নবাবকে জিজ্ঞাসা করিল, "কবে চুরী হয় আপনার মনে নাই?"

"কেমন করিয়া থাকিবে? সিন্দুকে হীরা রাখিয়া আমি আর সিন্দুক খুলি নাই। পনর দিন পরে সিন্দুক খুলিয়া দেখি হীরা নাই। এই কয়দিনের মধ্যে কবে চুরী গিয়াছে কেমন করিয়া জানিব?"

"এ কয় দিবস চাবি কোথায় ছিল?"

"যেমন আমার কাছে সর্ব্বদা থাকে সেইরূপ ছিল।"

"রাত্রে?"

"রাত্রিকালে আমার শয্যার কাছে থাকে।"

"সে কয় রাত্রি কোথায় শয়ন করিয়াছিলেন?"

"অন্দর মহলে। হয়ত এক আধ দিন বাহিরে শয়ন করিয়া থাকিব।"

"ভাল করিয়া স্মরণ করিয়া দেখুন।"

"সে কয়দিন বোধ হয় ভিতর বাটীতে শয়ন করিয়াছিলাম।"

"কোন্ মহলে?"

"লয়লা বেগমের মহলে। এখন আর কোন মহলে বড় শয়ন করি না।"

"একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, কিছু মনে করিবেন না। রাত্রে মদ্যপানের অভ্যাস আছে?"

"আহারের সঙ্গে অল্প পান করি।"

"কখন অতিরিক্ত হয়?"

"এখন আর বড় হয় না।"

"আপনার পানীয় সুরা কে রাখে?"

"যে বেগমের মহলে থাকি তিনি বহির্ব্বাটী হইতে আনাইয়া দেন।"

"আপনি যে তল্লাসী করিয়াছিলেন, বেগমদিগের গৃহে বা দাসীদিগের নিকটে সন্দেহজনক কিছু সামগ্রী পাওয়া গিয়াছিল?"

"কিছু না," বলিয়া একটু চিন্তা করিয়া নবাব কিছু লজ্জিত ভাবে কহিলেন, "লয়লা বেগমের বাক্সে একখানা চিঠি পাওয়া গিয়াছিল?"

"সে চিঠি কোথায়?"

"বেগম রাগ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছেন। আমি সে চিঠি পড়িতে পারি নাই।"

"ছেঁড়া টুক্‌রা গুলা পাওয়া যায় না?"

"পর দিবস আমি সন্ধান করিয়া জানিলাম, বেগম সে গুলা জ্বালাইয়া দিয়াছেন।"

আরাটুন কহিল, "বেগমদিগকে এই বাটীতে শীঘ্র আনয়ন করা হউক। তাঁহারা অন্যত্র থাকিলে কোন কাজ হইবে না।"

(৬)

বেগমেরা ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন বাড়ীতে একজন নূতন দাসী। নাম রুহানী, বয়স তেমন অল্প নয়। জিজ্ঞাসা করিলে বলে হিন্দুস্থানী, কিন্তু হিন্দী কথা তেমন পরিষ্কার বলিতে পারে না। বেগমেরা শুনিলেন নবাব নিজে তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। শুনিয়া তাঁহারা বিরক্ত হইলেন, কেন না গৃহকর্ত্তার পক্ষে দাসী নিযুক্ত করা প্রথাবিরুদ্ধ। রুহানী এদিক ওদিক করিয়া বেড়ায়, বেগমদিগের অসাক্ষাতে তাঁহাদের ঘরে উঁকিঝুঁকি মারে, বেগম লয়লার মহলের দিকে কিছু নজর বেশী। লয়লা তাহার সাক্ষাতেই আপনার দাসীদিগকে বলিলেন, "নবাব যখন উহাকে রাখিয়াছেন, তখন উহার যখন ইচ্ছা হয় আমার মহলে আসিতে পারে, তোমরা উহাকে নিষেধ করিও না।" রুহানী দেখিল নবাবের নূতন বেগম অন্য বেগমদিগের মত সন্দিগ্ধ চিত্ত নহেন।

রুহানী কে, কেন নিযুক্ত হইয়াছে, আর কেহ জানিতে পারিল না, কিন্তু লয়লার প্রখর বুদ্ধিতে প্রথমেই সংশয় জন্মিয়াছিল যে ইহার ভিতর অন্য কিছু রহস্য আছে। চুরীর সন্ধানের জন্য একজন ফিরিঙ্গী আসিয়াছে একথা প্রকাশ হইয়াছিল। লয়লা কৌশল পূর্ব্বক নবাবের কাছে জানিয়া লইয়াছিলেন যে রুহানী সেই ফিরিঙ্গীর লোক। কিন্তু রুহানী কোনই কথা প্রকাশ করে না। তথাপি লয়লার জিত, কারণ তিনি রুহানীর উদ্দেশ্য জানিতেন, রুহানীর বিশ্বাস তিনি কিছুই জানেন না। রুহানী গোয়েন্দা কিন্তু লয়লা যে তাহার উপর গোয়েন্দা সে তাহা জানিত না।

লয়লা দেখিলেন রুহানী কখন বাহিরে যায় কখন আসে, তাহার স্থিরতা নাই। সিপাহীরা ও খোজারা তাহাকে কেন ছাড়িয়া দেয় একজন দাসীকে দেখিতে বলিলেন। একজন সিপাহী দাসীর অনুগ্রহপ্রার্থী। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে রুহানীর কাছে নবাবের নামাঙ্কিত অঙ্গুরী থাকে, নবাবের হুকুম সেই অঙ্গুরী দেখাইলে যে সময় হউক কোন কথা না জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবে।

(৭)

ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের বহু চিহ্ন পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু তাহাতে প্রাণ নাই! কেবল হয়দ্রাবাদে বাদশাহীর কিছু অবশিষ্ট আছে। ঐশ্বর্য্যে অতুলতা আছে, ভোগে চাকচিক্য আছে। সকল বিষয়ে একটু প্রভেদ। আর কোন সহরে ফেরিওয়ালা সুখ বিক্রয় করে? হয়দ্রাবাদে সুখ বিক্রয় করে—"মওজ লে মওজ!" মওজ কি রকম ডাকিয়া দর না করিলে কি বেচিতেছে বুঝিতে পারা যায় না।

কিন্তু সুখ মূল্য দিয়া পাইলেও দারিদ্র্যের শেষ হয় না। ভিখারী হয়দ্রাবাদে বিস্তর। একদিন এক ভিখারিণী আসফ জঙ্গের অট্টালিকার সিংহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। স্ত্রীলোকটা যুবতী, অন্দর মহলে ভিক্ষার জন্য যাইতে চায়। সান্ত্রী প্রথমে তাহাকে ছাড়িয়া দিবে না, চুরীর গোলমাল তখনও মিটিয়া যায় নাই। তাহার পর তাহাকে বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিল, অবশেষে অনেক মিনতি করিয়া ভিখারিণী প্রবেশ করিতে পাইল।

বেগমদিগের মহলে গিয়া ভিখারিণী কাহারও কাছে একটা গান করে, কাহাকেও দুইটা রসের কথা বলে, এবং ভিক্ষা যথেষ্ট পায়। ঘুরিয়া ফিরিয়া লয়লা বেগমের মহলের সম্মুখে আসিল। দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া গাহিল,

"দরোওয়জোয়া ঠাঢ়ি রহুঁ।
পিয়া কি আওয়ন কি ভয়ি রে বেরিঁয়া,
সঁইয়া দরোওয়জোয়া ঠাঢ়ি রহুঁ।"

এই কয়টী কথায় গান, কিন্তু গানের কর্‌তব কি! ভিখারিণীর গলা মিষ্ট, গাহিবার সময় ঘন ঘন বেগমের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। গান সমাপ্ত হইলে বেগম কহিলেন, "দরজা গোড়ায় কাহার জন্য দাঁড়াইয়া থাকিস্?"

ভিখারিণী হাসিল, বলিল, "আমি ভিক্ষার জন্য সকলের দরজায় দাঁড়াই। এ কথা আর একজনের।"

ভিখারিণী আর একটা গান ধরিল,

"কহ গয়ে পিয়া আওনকো কব্ হোয়তরি পরসোঁ
এ পরসোঁ।
যো কোই আজ কহে কল আয়ে নহিঁয়া জনি গুজর
গয়ে লাখোঁ পরসোঁ এ পরসোঁ।
দিল চাহতা হয় উসে উড় যায় মিলুঁ মুসেঁ উড়া ভি ন
যাওয়ে পরসোঁ এ পরসোঁ।"

একটা দাসী দাঁড়াইয়া গীত শুনিতেছিল, বেগম তাহাকে স্থানান্তরে কোন কর্ম্মে পাঠাইলেন। দাসী চলিয়া যাইবামাত্র ভিখারিণী বেগমের নিকটে আসিয়া তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিল। বেগম পাঠ করিয়া পত্র গোপন করিলেন। ভিখারিণীকে মৃদু মৃদু কহিলেন, "ভাল কথা, পরশুই ঠিক্ রহিল।"

ভিখারিণী কহিল, "উত্তর লিখিয়া দিবে না?"

বেগম কহিলেন, "না, লিখিলে আশঙ্কা আছে।"

দাসী ফিরিয়া আসিলে বেগম ভিখারিণীকে কয়েকটা মুদ্রা দিয়া বিদায় করিলেন।

ভিখারিণী যখন মহলে প্রবেশ করে, সে সময় রুহানী বাড়ী ছিল না। আসিয়া দেখে, ভিখারিণী লয়লা বেগমের মহল হইতে আসিতেছে। রুহানী দ্রুতপদে গিয়া খোজাদিগকে বলিল, "এই মাগীকে ধরিয়া দেখ, ইহার নিকটে কি আছে।"

ভিখারিণী চলিয়া যাইতেছে, এমন সময় খোজারা তাহাকে ধরিল, কহিল, "তোর কাছে কি আছে দেখি!"

ভিখারিণী রাগিয়া কহিল, "কি আবার থাকিবে?

ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইয়াছি, তাহাই আছে। আমি কি তোদের মত চোর যে কিছু চুরী করিয়া লইয়া যাইব ?"

খোজারা তাহার কাপড় চোপড় ঝাড়িয়া, ভিক্ষালব্ধ সামগ্রী ব্যতীত আর কিছু দেখিতে পাইল না। তখন ছাড়িয়া দিল। ভিখারিণী তাহাদিগকে গালি দিতে দিতে চলিয়া গেল।

লয়লা কেন পত্র দেয় নাই, বুঝিতে পারিল। মনে মনে বেগমের বুদ্ধির অনেক প্রশংসা করিল।

৮

দুই দিবস পরে লয়লা নির্জ্জনে রুহানীকে ডাকিয়া বলিলেন, "এই যে হীরা চুরী গিয়াছে, সে বিষয়ে তুমি কিছু শুনিয়াছ ?"

রুহানী যেন কিছুই জানে না। বলিল, "বিবি, সকলে যেমন শুনিয়াছে, আমিও সেইরূপ শুনিয়াছি। চুরী যখন হয়, তখন ত আমি এ বাড়ীতে ছিলাম না।"

"তাহা জানি। কিন্তু আমি ভাবিতেছিলাম যে, পুরাতন দাসী সকলের উপরই সন্দেহ হয়। তুমি নূতন, আর বেশ সেয়ানাও দেখিতেছি। তোমাতে আমাতে মিলিয়া চেষ্টা করিলে হয়ত কিছু সন্ধান পাইতে পারি।"

"আমি তোমার দাসী যেরূপ আজ্ঞা করিবে, সেইরূপ করিব। কাহারও উপর তোমার সন্দেহ হয় ?"

"সন্দেহ একটু পাকা না হইলে বলিয়া কোন ফল নাই। আমি একটা উপায় ঠাওরাইয়াছি।"

"কি ?"

"আজ রাত্রে তোমায় বলিব। তুমি রাত্রে কোথায় শয়ন কর ?"

"যেখানে স্থান পাই সেই খানে। অপর দাসীরা আমাকে বড় একটা ঠাঁই দেয় না।"

বেগমের মহলের বাহিরে একটা ছোট কুঠরী ছিল। সে ঘরে কেহ শয়ন করিত না। লয়লা রুহানীকে বলিলেন, "আজ রাত্রে এই ঘরে শয়ন করিয়া থাকিবে ? আবশ্যক হইলে রাত্রে তোমায় ডাকিয়া লইতে পারিব।"

রুহানী ত তাহাই চায়। তাহার প্রতি আরাটূনের আদেশ ছিল, লয়লা বেগমের প্রতি বিশেষ নজর রাখিবে। বেগম তাহাকে স্বয়ং ডাকিয়া নিজের কাছে রাখিতেছেন। রুহাণী তখনই সম্মত হইল।

সন্ধ্যার সময় নবাব লয়লা বেগমের মহলে আসিলেন। বেগমের বেশভূষা, অলঙ্কারের অতিরিক্ত আড়ম্বর। তাঁহাকে দেখিয়া নবাব স্মিতমুখে, দিওয়ান হাফিজ হইতে মৃদু মৃদু গাহিলেন,

"শাহেদ দিল রুবায় মন, মি কুনদ্ অজবরায় মন,
নক্‌শ নিগার রঙ্গ বু তাজ ব তাজ নও ব নও।"

বেগম লোল কটাক্ষে বিদ্যুৎ হানিয়া শেষের বয়েৎ গাহিলেন,

"বাদি সবা চু বু গুজরি, বর্‌সর কূয় আঁ পরি,
কিস্‌সয়ে হাফিজশ্ বুগু তাজ ব তাজ নও ব নও।"

আসফ জঙ্গ্ এ পর্য্যন্ত লয়লাকে এরূপ দেখেন নাই। এমন হাস্য কৌতুক, এত রাগ রঙ্গ, এরূপ চিত্তমুগ্ধকারিণী মোহিনী কখন দেখেন নাই। আহারের পূর্ব্বে নিয়মমত নবাব সুরা পান করিলেন। আহারাদির পর, দাসীরা চলিয়া গেলে বেগম স্বহস্তে নবাবকে আর এক পাত্র সুরা পান করাইলেন। সুরা মাদকমিশ্রিত। পান করিয়া অল্পক্ষণ পরেই নবাব গভীর নিদ্রামগ্ন হইলেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইলে, সকলে নিদ্রিত হইলে, লয়লা নবাবের পকেট হইতে সিন্দুকের চাবি বাহির করিলেন। রুহানীর ঘরে গিয়া তাহাকে ডাকিলেন। সে জাগিয়াই ছিল, কিন্তু বেগমের আহ্বানে চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে, হাই তুলিয়া উঠিল। বেগমের মুখে অল্প হাসি দেখা দিল। রুহানীকে বলিলেন, "নিঃশব্দে উঠিয়া আমার সঙ্গে আইস।"

"কোথায় যাইব ?"

"আমি পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছি। কোন কথা কহিও না।"

রুহানীকে সঙ্গে করিয়া লয়লা তহখানার দ্বার মুক্ত করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাহার পর দ্বার সাবধানে রুদ্ধ করিয়া আলোক জ্বালাইলেন। রুহানীকে বলিলেন, "দেখ, এই সিন্দুকে হীরা ছিল।"

রুহানী কিছু বিরক্ত হইয়া কহিল, "সিন্দুক দেখিলে কি হীরা পাওয়া যাইবে ?"

লয়লা কহিলেন, "কি জানি! সিন্দুক একবার খুলিয়া দেখি।"

তাঁহাকে সিন্দুক খুলিতে দেখিয়া রুহানী জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি বিবি ? তুমি চাবি কেমন করিয়া পাইলে ?"

"নবাব নিদ্রিত, আমি চাবি লইয়া আসিয়াছি।"

"যদি নবাবের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায় ?"

"এখন ভাঙ্গিবে না।"

রুহানী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বেগমের দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার মনে একটু ভয় হইল।

লয়লা সিন্দুক খুলিয়া, নিজের বস্ত্র হইতে হীরক খণ্ড ও একখানা পত্র বাহির করিলেন। হীরকের দীপ্তিতে রুহানীর নয়ন ঝলসিত হইল। সে কহিল, "এতদিন হীরা তোমার কাছে ছিল ? নবাব চুরী গিয়াছে ভাবিয়া অস্থির হইয়াছেন। তোমার এ কি রঙ্গ কৌতুক!"

লয়লা বলিলেন, "আমার কাছে ছিল বলিবার কোন আবশ্যক নাই। তাহা হইলে তুমি পুরস্কার পাইবে না। তুমি নবাবকে ও ফিরিঙ্গীকে বলিও হীরা যেখানে ছিল সেইখানেই আছে।"

ফিরিঙ্গীর নাম শুনিয়া রুহানীর মুখ শুকাইল। ভয়ে কথা কহিতে পারিল না।

লয়লা মৃদু মৃদু, কুটিল হাসি হাসিয়া কহিলেন, "আর একটা কৌতুক আছে। তুমি কাপড় ছাড়, আমি তোমার সহিত বেশ বদল করিব।"

রুহানী সভয়ে কহিল, "তোমার মনে কি আছে জানি না। দরজা খুলিয়া দাও আমি বাহির হইয়া যাই, নহিলে চেঁচাইব।"

এক পদ অগ্রসর হইয়া লয়লা রুহানীর মুখে বাম হস্ত দিয়া দক্ষিণ হস্তে তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিলেন। চক্ষে বিষময়ী জ্বালা জ্বলিতেছিল। কুপিত, নিঃশ্বসিত ফণিনীর তুল্য কহিলেন, "চীৎকার করিলেও এ দরজার বাহিরে শব্দ যায় না। চীৎকার করিবার পূর্ব্বে তোমার বক্ষে এই ছুরী আমূল বিদ্ধ করিব। প্রাণ যদি প্রিয় হয় ত একটী কথাও কহিও না।"

রুহানীর প্রাণ অত্যন্ত প্রিয়। সে দেখিল, সাক্ষাৎ সর্পিনীর সম্মুখে পড়িয়াছে। লয়লা সর্পিনীর মত ফণা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, সেইরূপ সুন্দরী, সেইরূপ করাল। রুহানীর কণ্ঠ তালু শুষ্ক হইয়া গেল, সে প্রাণভয়ে কাঁপিতে লাগিল। লয়লা নিজের ওড়না দিয়া রুহানীর মুখ এরূপ ভাবে বাধিলেন যে, তাহার আর চীৎকার করিবার ক্ষমতা রহিল না। তাহার পর তাহার বস্ত্রাদি খুলিয়া লইলেন, নবাবের নামাঙ্কিত অঙ্গুরী গ্রহণ করিলেন। আপনার বস্ত্র ত্যাগ করিয়া রুহানীর বস্ত্র ধারণ করিলেন। তাহার পর রুহানীর হস্তপদাদি বাঁধিয়া তাহাকে কহিলেন, "সিন্দুকে হীরা এবং নবাবের জন্য পত্র রহিল, প্রাতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে বলিও।" চাবি সেইখানে পড়িয়া রহিল। বাহির হইতে দরজার শিকল দিয়া লয়লা বাহির হইয়া গেলেন।

তিনি মহলের দিকে ফিরিলেন না। যেদিকে খোজার প্রহরা সেইদিকে চলিলেন। রুহানীর ওড়নায় মুখ আবৃত ছিল। একজন খোজা বসিয়া ঢুলিতেছিল, বলিল, "কে ও ?"

লয়লা রুহানীর স্বরে কহিলেন, "রুহানী।"

"মোহর দেখি।"

লয়লা নবাবের নামাঙ্কিত অঙ্গুরী দেখাইলেন।

খোজা বলিল, "যাও।" অর্দ্ধস্ফুটস্বরে আপনা আপনি বলিল, "মাগী জ্বালাতন করিয়া তুলিল। একটু স্থির হইবার জো নাই।"

সদর দরজায় শান্ত্রী পাইচারী করিয়া পাহারা দিতেছিল। সে হাঁকিল, "কে যায় ?"

এবার লয়লা কোন কথা কহিলেন না। অঙ্গুরী বাহির করিয়া সিপাহীকে দেখাইলেন। সিপাহী পথ ছাড়িয়া দিল। বলিল, "বেটী আবার মুখ ঢাকিয়া যাইতেছে। যেন নবাবের ছোট বেগম রে!" শুনিয়া লয়লার বড় হাসি পাইল।

লয়লা রাজপথে আসিয়া পড়িলেন। আকাশে নক্ষত্র জ্বলিতেছে, চারিদিক শব্দশূন্য, ক্বচিৎ নৈশ সঙ্গীতধ্বনি। অন্তঃপুরবাসিনী রমণী কোথায় যাইবে ?

ভয় বা ভাবনা আদৌ লয়লার মনে উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু আশঙ্কার আর এক কারণ উপস্থিত হইল। পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল, "রুহানী! এত রাত্রে যে!"

লয়লা ফিরিয়া দেখিলেন, একজন ফিরিঙ্গী!

আরাটূন আসিয়া কটাক্ষ মাত্রেই চিনিল, এ স্ত্রীলোক রুহানী নহে। ওড়না ধরিয়া টানিল, লয়লার মুখ অনাবৃত হইয়া পড়িল। আরাটূন তাঁহাকে কখন দেখে নাই, তথাপি তাঁহাকে সবিস্ময়ে চিনিল, বলিল, "বেগম লয়লা!"

ক্রোধে, লজ্জায় লয়লার মুখ রক্তবর্ণ হইল। কহিলেন, "আমি যে হই না কেন, আমাকে তুই বাধা দিবার কে?"

আরাটূন হাসিল, বলিল, "তুমি যেই হও, আমি নবাবের আদেশমত তোমায় আটক করিব। যাহা বলিবার হয়, কাল নবাবকে বলিও।"

লয়লার মুখ অত্যন্ত মলিন হইয়া গেল, কহিলেন, "তাহা হইলে আমি আত্মঘাতিনী হইব।"

আরাটূন কহিল, "বিবি, তুমি মহলে আর যাইতে পাইবে না। আমার সঙ্গে আইস। হীরা পাওয়া যায় না যায়, নবাবের অদৃষ্ট। তোমাকে আমি ত্যাগ করিব না।" ফিরিঙ্গী লয়লার হস্ত ধারণ করিল।

এমন সময় পথে আর একজন দীর্ঘাকার পুরুষের ছায়া পতিত হইল। তাহাকে দেখিবামাত্র লয়লা আকুল স্বরে ডাকিল, "দারা!" আর একটা কথা কোন্ ভাষায় বলিল আরাটূন বুঝিতে পারিল না।

সে আহ্বানে অসীম প্রেম, অসহ্য যাতনা, নিরতিশয় আনন্দ! সে স্বরে চমকিত হইয়া ফিরিঙ্গী লয়লার হাত ছাড়িয়া দিল।

ব্যাঘ্রী আপনার শাবককে রক্ষা করিবার জন্য যেরূপ শত্রুকে আক্রমণ করে, দারা আরাটূনকে সেইরূপ আক্রমণ করিল। তাহার হাতে লাঠি, কটিতে পিস্তল। লাঠি তুলিয়া ফিরিঙ্গীর মাথায় মারিল। এক ঘা লাঠি খাইয়াই আরাটূন অচৈতন্য হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। দারা ডাকিল, "জজিয়ানা!"

লয়লা দুই বাহু প্রসারিত করিয়া দারার কণ্ঠলগ্ন হইল। দারা তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

পর দিবস কোলাহলের মধ্যে নবাব লয়লার পত্র পাইলেন। তাহাতে লেখা ছিল, "আমার স্বাধীনতার মূল্য স্বরূপ হীরা রাখিয়া যাইতেছি।"

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

রাসায়নিক পরিভাষা।*

"নানান্ দেশে নানান্ ভাষা
বিনা স্বদেশী ভাষা পূরে কি আশা?"

আমাদের জাতীয় ভাষায় বৈজ্ঞানিক পুস্তক লিখিতে গেলে সর্ব্বপ্রথমে এক বিষম সমস্যা উপস্থিত হয়, তাহা উপযুক্ত পরিভাষার অভাব। পাশ্চাত্যবিজ্ঞান বঙ্গভাষায় প্রচার হইতে আরম্ভ হওয়া অবধি এই অসুবিধা অনুভূত হইতেছে। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ৺ অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়" পদার্থবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, জ্যোতিষ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছিলেন। তৎপরে ৺ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় তাঁহার প্রবর্ত্তিত "বিবিধার্থ সংগ্রহ" নামক পত্রিকায় নানাবিষয়ক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রচার করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তৎপ্রণীত গ্রন্থাবলীতে, বিশেষতঃ 'জীবন-চরিত' নামক পুস্তকে অনেকগুলি পারিভাষিক শব্দের সংকলন করেন। যে তিন মহাত্মার নাম উল্লিখিত হইল, ইঁহারাই আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের জন্মদাতা। ইঁহারা সকলেই যথাসম্ভব সংস্কৃতমূলক পরিভাষা সংকলন করিয়া দীনা বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধিশালিনী করিয়াছেন।

সম্প্রতি বাঙ্গলা ভাষায় বহুল পরিমাণে বিজ্ঞানগ্রন্থ প্রচারিত হইতেছে, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে তন্মধ্যে বৈজ্ঞানিক পরিভাষার কোন ঐক্য দৃষ্ট হয় না। প্রত্যেক গ্রন্থকার স্ব স্ব প্রধান। কেহ কাহারও প্রাধান্য স্বীকার করিতে ইচ্ছুক নহেন; সুতরাং "নানা মুনির নানা মত" হইয়া দাঁড়াইতেছে। পদার্থবিদ্যা, অস্থিবিদ্যা, শারীরস্থানবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যা লইয়া তত অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। কারণ বহুদিন হইতে সাধারণভাবে এসকলের চর্চ্চা হইতেছে। সাঙ্খ্য ও বৈশেষিক দর্শনে পরমাণু-ঘটিত আলোচনা দেখা যায় এবং সুশ্রুতে শারীরস্থান নামক অধ্যায়ে অস্থি ও মাংসপেশী সম্বন্ধীয় অনেক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। জ্যোতিষ শাস্ত্রেরত কথাই নাই—আর্য্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি সে বিষয়ে আমাদের পথ পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।

*রাসায়নিক পরিভাষা—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম,এ, সংকলিত। সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকা। সরল রসায়ন—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় এম,এ প্রণীত

রসায়ন শাস্ত্র লইয়াই বিষম সমস্যা উপস্থিত। রসায়ন শব্দটী আয়ুর্ব্বেদ হইতে গৃহীত, কিন্তু মৌলিক অর্থের সহিত ইহার কোনও সাদৃশ্য নাই। "যজ্জরাব্যাধি বিধ্বংসি ভেষজং তদ্রসায়নম্।" জরাব্যধি বিনাশক ঔষধের নাম রসায়ন। যে বিদ্যার সাহায্যে এই রসায়ন প্রস্তুত করা হয়, তাহার নাম রসায়ন বিদ্যা। আধুনিক রসায়ন বিজ্ঞানের বয়ক্রম কিঞ্চিদধিক একশত বৎসর। মহামতি লাবোয়াশিয়ার ইহার জন্মদাতা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি রসায়ন শাস্ত্রে যে সকল পরিভাষা সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন, ইয়ুরোপের বিজ্ঞান জগৎ তাহাই অবিসম্বাদে গ্রহণ করিয়াছে। বঙ্গদেশে যদি তাঁহার ন্যায় কোন ক্ষণজন্মা পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া রসায়ন শাস্ত্রে পরিভাষা সঙ্কলন করিতেন, তাহা হইলে আর কোন গোলমালের সম্ভাবনা থাকিত না। পাণিনী সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে সমুদয় সাঙ্কেতিক ও দ্যোতক শব্দ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, কেহ তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে সাহসী হন নাই। বাঙ্গলা ভাষায় যাঁহারা রসায়ন গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাঁহারা কেহ কাহারও ব্যবহৃত শব্দ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। প্রত্যেকেই নূতন নূতন শব্দের সৃষ্টি করিয়া মৌলিকত্ব প্রদর্শন করিতে চাহেন। সংস্কৃত ভাষায় একার্থবোধক অনেক শব্দ আছে। এই কারণে মৌলিক পদার্থগুলিরও অনেক নাম হইয়াছে। এক Hydrogenএর পরিবর্ত্তে অঙ্গান, অবজন, উদজন, উদ্জনক, উদ্জান্ ইত্যাদি। কয়েকবৎসর হইতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এই সমুদয় বৈষম্য দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এই সভা কর্ত্তৃক আহুত হইয়া শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী রাসায়নিক পরিভাষা বিষয়ক একটী প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। ত্রিবেদী মহাশয় এই অসুবিধা অপনয়নের জন্য যে অসীম শ্রম ও যত্ন স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন; কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য কতদূর সফল হইয়াছে তাহা বলা যায় না। তিনি কোন কোন স্থলে বিশেষ মৌলিকত্ব দেখাইয়াছেন, যথা—Oxygen দহনবায়ু; Oxydation দহন ক্রিয়া! Nitrogen গ্যাসের ফরাসী নাম Azote, বোধ হয় ৺ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় ইহারই অনুবাদ করিয়া 'প্রাণহৃৎ' নাম দিয়াছিলেন। রামেন্দ্র বাবু তাহার অর্থ বজায় রখিয়া ইহার নাম 'মরুতক' দিয়াছেন, ইহাতে আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু তাঁহার উদ্ভাবিত কোন কোন পারিভাষিক শব্দের ব্যবহারে আমাদের আপত্তি আছে। তিনি Chlorine শব্দের যে "হরিণ" পরিভাষা সংকলন করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের হাস্যের উদ্রেক হয়, বিশেষতঃ Oxide of Chlorine এর যে "দগ্ধ হরিণ" অনুবাদ করিয়াছেন তাহাতে সহসা পক্ক মৃগমাংসের কথা স্মৃতিপথে আইসে!

N_2O = উপদগ্ধ মরুত

N_2O_2 = আদগ্ধ মরুত

আ এই উপসর্গে ঈষদূন এই ভাব আইসে। তিনি Nitrous oxide ও Nitric oxide স্থানে যথাক্রমে উপদগ্ধ মরুত ও আদগ্ধ মরুত ব্যবহার করিয়া তাঁহার মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

যোগেশ বাবু তাঁহার পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"আমি রাসায়নিক বস্তুর খাঁটি বাঙ্গলা নাম দেওয়ার পক্ষপাতী নহি। যিনি কেবল সংস্কৃত ভাষাকেই বাঙ্গলাভাষা করিতে চান, তিনি অজ্ঞাতসারে বাঙ্গলাভাষাকে মৃত ভাষায় পরিণত করিতে ইচ্ছা করেন। বাঙ্গলা রাসায়নিক পরিভাষা সম্বন্ধে আমার অভিপ্রায় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ৩য় ভাগের ৩য় সংখ্যায় সবিস্তারে প্রদত্ত হইয়াছে।" এই মতের সমর্থন স্বরূপ তাঁহার পুস্তকে এইরূপ ভাষার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়—

"ফস্ফরস্ + অক্সিজেন = ফস্ফরস পঞ্চাক্সাইড
কালসিক হাইড্রক্সাইড + কার্ব্বন দ্ব্যকসাইড = কালসিক কার্ব্বনেট + জল।

হায়! দীনা মাতৃভাষা আর কত অত্যাচার সহ্য করিবেন? আজ পঞ্চাকসাইডের ন্যায় শ্রুতিকঠোর শব্দকেও বঙ্গভাষার ক্রোড়ে স্থান দিতে হইল! বাল্যকালে ব্যাকরণে পড়িয়াছিলাম শ্রুতিকটু দোষ হইলে সন্ধি হয় না। যথা, যদ্যপেকশত টাকা দিলাম তথাপ্যেকচালাও হইল না।" এতদ্ভিন্ন সংস্কৃত ও ইংরাজী এতদুভয়ের সংযোগে এরূপ শঙ্কর শব্দের উৎপত্তি কোনরূপেই বাঞ্ছনীয় নহে। বৈজ্ঞানিক শব্দ সংকলন বিষয়ে বঙ্গভাষার ক্ষমতা কতদূর, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার পূর্ব্বে ইউরোপীয় ভাষার বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। *

* গত আষাঢ় মাসের প্রদীপে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বাবু যথার্থই বলিয়াছেন:—"বঙ্গদর্শন পড়িয়া যাহা বুঝিয়াছিলাম, উহা পড়িবার পূর্ব্বে

জর্ম্মাণ ও রুষিয়া এই দুই ভাষায় রসায়ন বিদ্যার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চর্চ্চা ও উন্নতি হইয়াছে; কিন্তু সার্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে জর্ম্মাণ ভাষা এমন হীনাবস্থ ছিল যে, ফ্রেডরিক দি গ্রেটের ন্যায় স্বদেশবৎসল মহাপুরুষও জাতীয় ভাষায় কথোপকথন করিতে লজ্জা বোধ করিতেন। † কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী গত না হইতে শীলর ও গেটে জর্ম্মাণ ভাষায় অদ্ভুত শব্দ গ্রন্থনের ক্ষমতা, মনের ভাব প্রকাশ করিবার শক্তি ও বচন প্রয়োগ নৈপুণ্যে সকলকে মুগ্ধ করিয়া তুলিলেন। এই সময়ে মহামতি লাবোয়াশিয়ার আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের জন্মদান করিলেন এবং তাহার জন্য স্বতন্ত্র পরিভাষাও গঠন করিলেন। এই সকল পরিভাষা গ্রীক ও লাটিন ভাষামূলক বলিয়া ইউরোপীয় অন্যান্য জাতির ন্যায় জর্ম্মাণেরা তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তাঁহারা বলিলেন, যে ভাষায় শীলর ও গেটে গান গাইয়া সকলকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই ভাষায় বৈজ্ঞানিক শব্দ ও পরিভাষা সংকলনকরিয়া তাহাকে কোমল ও শ্রুতিমধুর করিতে হইবে; ইহাতেই জর্ম্মাণ ভাষায় কোমল ও শ্রুতিমধুর পরিভাষার উৎপত্তি হইল; দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটী শব্দের উল্লেখ করা যাইতেছে।

ইংরাজী (লাটিন মূলক)	জর্ম্মাণ (চলিত ভাষা মূলক)
Lactic acid	Milchsaure (=milk acid দুগ্ধাম্ল বা দ্রাবক
Formic acid	Ameisen Saure (=ant acid পিপীলিকাম্ল
Mellitic acid	Honig steinsaure (=honey Stone acid)

শেষোক্ত দ্রাবকের এই নাম দেওয়া হইয়াছে, কারণ ইহা "honeystone" নামক খনিজ পদার্থ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাঠকবর্গ দেখিবেন, জর্ম্মাণদিগের "এসিড" শব্দ পর্য্যন্তও ব্যবহারে আপত্তি; কারণ ইহা লাটিন হইতে তৎপরিবর্ত্তে উদ্ভূত। তাঁহারা "Saure" (Enlish sour) পছন্দ করেন। কেবল সংস্কৃতমূলক শব্দই ব্যবহার করিতে হইবে এমন কোন বিধি নাই। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের অভ্যুদয় কালে কাদম্বরী ও সীতার বনবাস প্রভৃতি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কাদম্বরীর সংস্কৃত-শব্দ-বহুল দীর্ঘ সমাস ঘটিত বচন-বিন্যাস পড়া দূরে থাকুক, শুনিতেও কাণ "ঝালাপালা" হইয়া যায়। কিন্তু অপরদিকে "আলালের ঘরের দুলাল" এবং "বঙ্গাধিপ পরাজয়"ও বঙ্গসাহিত্যে সম্মান লাভ করিয়াছে, এতদ্ভিন্ন বঙ্কিমচন্দ্রও উভয় কুল রক্ষা করিয়া অসাধারণত্ব দেখাইয়াছেন। সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ও দেখাইতেছেন যে, সংস্কৃত মূলক ও চলিত ভাষা মূলক এই উভয়েরই মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া সুন্দর গদ্য রচনা করা যাইতে পারে। ফল কথা "বিদ্যাসাগরী" হউক "আর বঙ্কিমী" বা "আলালী"* হউক আমরা ইহার "খাঁটি বাঙ্গালা" যে কোন ছাঁচে ঢালা শব্দে রাজী, কিন্তু কর্কশ "পঞ্চাকক্সাইড," "কালসিক অক্সাইড" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারে সম্মত নহি।

একবার দেখা যাউক রুষ দেশীয়েরা কি করিয়াছেন। এই জাতি কি উপাদানে নির্ম্মিত, তাহা এই সার্থকপ্রবাদবাক্য দ্বারা অভিব্যক্ত "Scratch a Russian and you will find a Tartan" অর্থাৎ একজন রুষীয়ের গা আঁচড়াইলেই তাহাকে তাতারদেশীয় বলিয়া চিনা যায়। ইহাদের ভাষা আর্য্য অনার্য্য উভয়ই মিশ্রিত খিচুড়ি। এতদিন রুষীয় ভাষা অনাদৃত ছিল—পণ্ডিতগণ জার্ম্মাণ ও ফরাসী ভাষায় সমস্ত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করিতেন, এমন কি অদ্যাপি ফরাসী রাজভাষা (court and diplomatic language) বলিয়া পরিগণিত। শুভক্ষণে মাণ্ডেলিয়েফ্ জন্মগ্রহণ করিলেন, এই মহাত্মার বিষয় আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই—পদার্থতত্ত্বে নিউটন মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়া এবং জীবতত্ত্বে ডার্ব্বিন বিবর্ত্তনবাদ মত প্রকাশ করিয়া যেপ্রকার নবযুগ উপস্থিত করিয়াছেন, রাসায়নিক তত্ত্বেও Periodic Law আবিষ্কার করিয়া এই পণ্ডিত তদ্রূপ বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছেন।

তাহা বুঝি নাই। বুঝিয়াছিলাম যে, বাঙ্গালা ভাষায় সকল প্রকার কথাই সুন্দররূপে কহিতে পারা যায়; আর বুঝিয়াছিলাম, ভাষা বা সাহিত্যের দারিদ্র্যের অর্থ, মানুষের অভাব"।

† The rich and energetic language of Luther, driven by the Latin from the Schools of pedants, and by the French from the palaces of kings, had taken refuge among the people. Of the powers of that language Frederic had no notion. He generally spoke of it, and of those who used it, with the contempt of ignorance. His library consisted of French books; at his table nothing was heard but French conversation.—*Macaulay's Essays.*

* রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত—বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব। ২য় সংস্করণ, ২৬৪—২৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কিছুদিন হইল এই জগদ্বিখ্যাত রাসায়নিক ও তাঁহার সহযোগীগণ স্বদেশ প্রেমে পূর্ণ হইয়া দৃঢ় সংকল্প করিলেন, আর পরকীয় ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বা গ্রন্থ রচনা করা হইবে না। পাশ্চাত্য রাসায়নিকগণ মহা সঙ্কটে পড়িলেন। কাজেই অনেকে রুষীয় ভাষা শিক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। রসায়ন বিদ্যায় লব্ধ-প্রতিষ্ঠ প্রবন্ধ লেখকের দুই জন বিলাতী বন্ধু কঠোর পরিশ্রমের পর মাণ্ডেলিয়েফ্ মূল ভাষায় পাঠ করিয়া সার্থকতা লাভ করেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, হতভাগ্য বাঙ্গলা ভাষা কি এতই অপরাধ করিল যে, ইহাকে রাসায়নিক পরিভাষা-সংকলন হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে?

প্রস্তাব সুদীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে;—যোগেশ বাবুর পুস্তক সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া ইহার উপসংহার করা যাউক। পুস্তকখানি মেডিকেল স্কুলের ছাত্রদের জন্য লিখিত। সুতরাং গ্রন্থকারকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছে এবং অল্পের মধ্যে ("multum in parvo") অধিক সন্নিবেশরূপ দোষে পতিত হইতে হইয়াছে; বিশেষতঃ অধিকাংশ স্থলে দুই এক খানা ইংরেজী পুস্তকের অবিকল নকল বলিয়া বোধ হইল। "রাসায়নিক বস্তুর খাঁটি বাঙ্গলা নাম দেওয়ার পক্ষপাতী" নহেন বলিয়া গ্রন্থকর্ত্তা "সলফ্যুরিক অম্ল" "নাইট্রিক অম্ল," "হাইড্রোক্লোরিক অম্ল" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তিনি অনুসন্ধান করিয়া দেখেন নাই যে "ভৈষজ্য রত্নাবলী" প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে "মহাদ্রাবক" "শঙ্খদ্রাবক" প্রভৃতির উল্লেখ আছে। এই আদর্শে "গন্ধক দ্রাবক" "সোরক দ্রাবক" "লবণ দ্রাবক" বা অম্ল প্রভৃতি প্রতিশব্দ প্রয়োগ করিলে ভাল হইত বোধ হয়। হিন্দুস্থানী ভাষায় সলফিউরিক এসিডের স্থলে "গন্ধক্‌কা আতর" ২।৩ শতাব্দী হইতে চলিত হইয়া আসিতেছে। ২৪ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে "সাগর জলে বিস্তর মৃত্তিকা দ্রবীভূত থাকে বলিয়া নদীজল অপেক্ষা সাগর জল ভারী।" "মৃত্তিকা" শব্দ earthy or saline or mineral matter পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে; কিন্তু সোজাসুজী "মৃত্তিকা" শব্দে শিক্ষার্থিগণ "মাটী" বুঝিবে। লবণাক্ত বা তদনুরূপ কোন শব্দ ব্যবহার করিলে সন্দেহ থাকিত না। "জলীয় বাষ্প জমিয়া ফোঁটা ফোঁটা হইয়া পড়িতে থাকে" ২৫ পৃষ্ঠা। জল জমিয়া বরফ হয়। "ঘনীভূত" লিখিলে ভাল হইত। "পোটাসিক কার্ব্বনেটের" সংস্কৃত নাম যবক্ষার, বাঙ্গলা নাম সর্জ্জিকা ক্ষার" ১০৯ পৃষ্ঠা। আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে স্মারবর্গের মধ্যে যবক্ষার ও সর্জ্জিকাক্ষার এই উভয়েরই পাশাপাশী উল্লেখ আছে। সর্জ্জিকাক্ষারের বাঙ্গলা ও হিন্দি অপভ্রংশ "সাজি" ইহা দ্বারা সোডিক কার্ব্বনেট বুঝায়। "ফেরিক অক্সাইড জলে দ্রব হয় না, অম্লেও প্রায় অদ্রাব্য" ১৩২ পৃষ্ঠা। ফেরিক অক্সাইড প্রকৃত পক্ষে অম্লে (যথা লবণাম্লে) অতি সহজে দ্রাব্য। আশা করি ভাবী সংস্করণে এই দোষ গুলির প্রতি গ্রন্থকর্ত্তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে। যোগেশ বাবু অনেক দিন হইতে সুখ্যাতির সহিত বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করিতেছেন। বাঙ্গলা ভাষায় রসায়ন গ্রন্থ প্রণয়ন করা অতি দুরূহ ব্যাপার; তাঁহার অপেক্ষা এই কার্য্যে যে কেহ অধিক কৃতকার্য্য হইয়াছেন ইহা আমরা বলিতে চাহি না; বরং অনেক স্থলে তিনি স্থূল তত্ত্ব গুলি অতি বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন দেখিয়া সুখী হইলাম। এই পুস্তকের দোষ গুণ বিচার করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

দাতা কালীকুমার।

দাতা কালীকুমার নাম শুনিয়া পাঠক মনে করিতে পারেন আমরা কোন গল্প লিখিতে বসিয়াছি। বস্তুতঃ বর্ত্তমান সময়ের চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার একজন মধ্যবিদ্ গৃহস্থের সন্তান দাতা নাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ত্রিশ বৎসর গত হইল, তিনি মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সম্পূর্ণ নাম কালীকুমার দত্ত; কিন্তু দাতা কালীকুমার নামেই তিনি সমধিক পরিচিত। পূর্ব্ববঙ্গের যুবক বৃদ্ধ অনেকেই তাঁহার নাম জানে; সকলে উপাধি অবগত নহে। কালীকুমার কি প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং কিরূপ কার্য্যের দ্বারা এমন অসাধারণ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তৎসম্বন্ধে দু'চারিটী কথা বলিব।

পূর্ব্ববঙ্গের গৌরবনিকেতন রত্নপ্রসূ বিক্রমপুর পরগণার কেন্দ্রস্থিত এক ক্ষুদ্র পল্লী কুকুটিয়া গ্রামে কালীকুমারের জন্মস্থান। এই গ্রাম মুন্সীগঞ্জ মহকুমার শ্রীনগর থানার অন্তর্গত। ভূতপূর্ব্ব জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ৺ নীলকান্ত

সরকার কুকুটিয়ার একজন আধুনিক পরিচিত সন্তান। কালীকুমারের নাম হইতেই কিন্তু কুকুটিয়ার প্রতিষ্ঠা। কালীকুমার অধিক দিনের লোক নহেন। প্রবন্ধের আরম্ভেই ইহার আভাস দিয়াছি। বয়ঃক্রম পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ না হইতেই তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। আনুমানিক ১৮২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তথাপি একথা স্বীকার্য্য যে কালীকুমারের সময়ে বিক্রমপুর ও কলিকাতা আট দিনের পথ ব্যবধান ছিল, এবং সেই সময়েই মধ্যবঙ্গের পরিহাসরসিক নাটককার বিক্রমপুরের বিদ্রুপাত্মক চিত্র প্রকাশ করিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। কালীকুমার কিছুদিন পরে জন্মগ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই তাঁহার যশঃখ্যাতি পশ্চিম বঙ্গেও ছড়াইয়া পড়িত; এবং তাহা হইলে তাঁহার জীবন-কাহিনী লইয়া "প্রদীপে" এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিবার প্রয়োজন হইত না।

সকলেই স্বীকার করিবেন যে, চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালীর অতিথিসৎকার, স্বজনপ্রতিপালন, দরিদ্র-পোষণ প্রভৃতি সদ্‌গুণ বড়ই অধিক ছিল। তখন জীবন-সংগ্রাম এত কঠোর ছিল না। লোকের স্বার্থপরতা আত্মম্ভরিতা প্রভৃতিও বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা অনেক অল্প ছিল। ধনবান ও উপার্জ্জনশীল লোকদিগের অন্তঃকরণ সাধারণতঃ অনুদার ছিল না। ঐ সময়ে যাঁহারা অর্থোপার্জ্জন জন্য বিদেশে যাইয়া বিষয়কর্ম্ম করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই সৎকার্য্যে প্রচুর ব্যয় ছিল। দেশের লোক কর্ম্মস্থলে গেলে ইহারা তাহাদিগকে আন্তরিক আদর যত্ন ও অকাতরে অন্নদান করিতেন। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে অনেকে ইহাদের নিকট পাথেয় পরিধেয় প্রভৃতি পাইত। বঙ্গের এমন ভদ্রপল্লী অতি অল্পই আছে, যেখানে আজিও এইরূপ মুক্তহস্ত দু'এক ব্যক্তির স্মৃতি জীবিত নাই। কালীকুমার এই শ্রেণীর একজন শীর্ষস্থানীয় লোক ছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কালীকুমার মধ্যবিদ্ গৃহস্থের সন্তান। সংসারে অধিকাংশ খ্যাতিমান্ ব্যক্তিই ত মধ্যবিদ্ গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে দরিদ্রতার সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে, সম্পদের উপেক্ষা অনাদরের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করিতে করিতে ইহারা উন্নতমস্তকে জীবনপথে অগ্রসর হন। পৌরুষ ও অধ্যবসায়ের বলে কমলা অল্পকাল মধ্যেই ইহাদের বশ্যতা স্বীকার করেন। শেষে সদুপায়ে অর্জ্জিত অর্থ সৎকার্য্যে ব্যয় করিয়া ইঁহারা সংসারে অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া যান।

কালীকুমার কুকুটিয়ার দত্তোপাধিধারী কায়স্থ বংশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতামহ রামজয় দত্তের তিন পুত্র; রামলোচন, রাজকিশোর ও নন্দকিশোর। কালীকুমার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রামলোচনের বংশধর। বাল্যকালে নিজের যত্নে কালীকুমার বাঙ্গালা ও পারস্যভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। শেষোক্ত ভাষায় তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান জন্মিয়াছিল। এই ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন বলিয়া তাঁহার মুন্‌সী নাম হইয়াছিল। কালীকুমার প্রথম জীবনে সামান্য বেতনে ঢাকার এক বক্‌সীর পদে প্রতিষ্ঠিত হন। কয়েক বৎসর এই কার্য্য করিয়া তিনি আদালতের কার্য্যের অভিজ্ঞতা লাভ করেন, এবং সেকালের ওকালতী পরীক্ষা দেন। প্রথমে মুন্‌সেফের উকীল হইয়া শেষে সদর আমিনী আদালতের উকীল হন। এই অবস্থাতে ইনি ময়মনসিংহে আসেন এবং এখানে আসিয়া বাপের অনুমতি লইয়া জজ আদালতে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন।

ময়মনসিংহেই কালীকুমারের জীবনের উজ্জ্বলতম অংশ যাপিত হয়। এখানেই তাঁহার উপার্জ্জন অত্যন্ত অধিক হইত এবং অর্জ্জিত অর্থ তিনি সৎকার্য্যে মুক্তহস্তে ব্যয় করিতেন। দ্বাদশ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল তাঁহার দানস্রোত অবিরল ধারায় বহিয়াছিল, এবং তাহাতে অসংখ্য নরনারী উপকৃত হইয়াছিল। কালীকুমার মাসে সহস্রাধিক মুদ্রা অর্জ্জন করিতেন। কোন কোন বৎসরে তাঁহার প্রাপ্তি পঞ্চদশ সহস্রেরও অধিক হইত। তাঁহার ব্যবসায়ে প্রতিপত্তি ও চরিত্র সম্বন্ধে ময়মনসিংহের বিজ্ঞ ও প্রবীণ উকীল শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দপ্রসাদ বসু মহাশয় বলেন, "কালীকুমার আদর্শচরিত্র উকীল ছিলেন। আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান ও ধর্ম্মভীরুতা তাঁহার বড়ই অধিক ছিল। তিনি নিজে অসদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিতেন না তাহাই নহে; কখনও জ্ঞানতঃ অন্যের আচরিত অসদুপায়ের প্রশ্রয় দিতেন না। অথচ তাঁহার উপার্জ্জন বড়ই অধিক ছিল। জীবনে তিনি দুইবার মাত্র কালেক্টরি ও ফৌজদারী কাছারীতে গিয়াছিলেন; একবার এক নামজারি—আর একবার এক হত্যাপরাধঘটিত ফৌজদারী মোকদ্দমা উপলক্ষে। প্রথম মোকদ্দমায় তিন সহস্র ও দ্বিতীয় মোকদ্দমায় একদিনে এক সহস্র মুদ্রা তিনি পাইয়াছিলেন। এই দুই মোকদ্দমাতেই দুই প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী পক্ষ ছিলেন এবং তাঁহারাই অনুরোধ করিয়া কালীকুমারকে আনেন। কালীকুমার তাঁহাদের দেওয়ানী আদালতের উকীল ছিলেন। ইহাতেই বুঝা যায় দেওয়ানী আদালতে তাঁহার কেমন পসার ছিল। ফলতঃ সে সময়ে ময়মনসিংহে কালীকুমারের প্রতিদ্বন্দ্বী উকীল কেহ ছিলেন না। কালীকুমার যেমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি তেমনই সদ্বক্তা ছিলেন।" কালীকুমারের বুদ্ধিবৃত্তি ও বক্তৃতাশক্তির প্রশংসা করা প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার অর্থাগম কেমন ছিল, ইহাই দেখাইবার নিমিত্ত আমরা শ্রীযুক্ত গোবিন্দপ্রসাদ বসু মহাশয়ের কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি। গোবিন্দ বাবু কালীকুমারের সময়ে নূতন উকীল ছিলেন এবং তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথাই জানেন। এখন তিনিই পলিতকেশ।

কালীকুমারের দানপ্রবৃত্তি এবং অতিথিসৎকার সেকালের দিনেও অসাধারণ ছিল। অসাধারণ না হইলে তিনি দাতা নাম অর্জ্জন করিলেন কেমন করিয়া? কালীকুমারের বাসায় প্রত্যহ শতাধিক লোক আহার পাইত। সাধারণতঃ প্রতিদিন এক মণ দুগ্ধই লাগিত; ইহাতেই বুঝা যাইবে আহারের ব্যয় কত ছিল। দরিদ্র বিদ্যার্থী বা অসহায় কর্ম্মপ্রার্থী যতদিন ইচ্ছা থাকিতে পারিত। কোন কোন দিন তিন চারি শত অতিথি আসিত। ফলতঃ আহার অথবা অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিয়া তাঁহার দ্বারস্থ হইলে কাহাকেও বিমুখ হইতে হইত না। শুনিলে প্রাণ আনন্দিত হয় যে সকল লোক একই ভাবে আহার পাইত এবং কালীকুমার স্বয়ং অতিথি আগন্তুকের পার্শ্বে বসিয়া তাহাদেরই একজনের ন্যায় আহার করিতেন। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় কর্ত্তার জন্য ভাল চা'ল, আর অন্যের জন্য মোটা চা'ল অন্যের বাটিতে দুধ অল্প, একটী আম, আর কর্ত্তার বাটীতে দুধ বেশী, দুটী আম, এ ব্যবস্থা কালীকুমারের বাসায় ছিল না। রাত্রিতে কালীকুমার কাজ কর্ম্ম সারিয়া প্রায়ই সকলের শেষে আহার করিতেন। একবার জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন রাত্রিতে আহারে বসিয়া দেখিলেন তাঁহার দুধের বাটীতে চারিটী আম রহিয়াছে। এক নবাগত ভৃত্য উহা রাখিয়াছিল। কালীকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কি সকলেই চারিটী করিয়া আম পাইয়াছে?" ভৃত্য উত্তর করিল "না, উহাদের একটী করিয়া দিয়াছি।" কালীকুমার তৎক্ষণাৎ তিনটী আম তুলিয়া রাখিয়া কহিলেন, এমন অখাদ্য আর কখনও আমার সম্মুখে আনিও না।

কালীকুমারের বাসায় সর্ব্বদা আট দশজন ভৃত্য থাকিত এবং ইহারা যেমন কালীকুমারের, তেমনই সমাগত লোকদিগেরও সেবা করিত। অতিথি অভ্যাগত কাহারও যত্নের ত্রুটী হইলে কালীকুমার বড়ই দুঃখিত হইতেন, এবং অনেক সময়ে ভৃত্যের দোষ নিজে সংশোধন করিয়া লইতে চেষ্টা করিতেন। কালীকুমার বড়ই মিষ্টভাষী ছিলেন। আগন্তুকদিগের মধ্যে যাহাতে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র লোকেরা উপেক্ষিত না হয় তিনি তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেন।

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সন্ন্যাসী প্রভৃতি সম্বন্ধে কালীকুমারের স্বতন্ত্র বন্দবস্ত ছিল। সন্ন্যাসী বৈষ্ণবের নিমিত্ত তিনি বাসার এক পৃথক খণ্ড নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। এমন দিন ছিল না যখন সেখানে দুচারিজন লোকও না থাকিত। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহার যেরূপ আহারে অভিরুচি কালীকুমার তাহাই সংগ্রহ করিয়া দিতেন। একাদশীর দিনে কোন ব্রাহ্মণ অতিথি আসিলে তাঁহার জলপানের প্রচুর আয়োজন হইত। যাঁহারা নিরম্বু উপবাসী তাঁহাদিগকে পরদিন থাকিয়া পারণা করিয়া যাইতে হইত। অতিথিভক্তি কালীকুমারের কেমন মজ্জাগত ছিল নিম্নলিখিত ঘটনাটী তাহার পরিচায়ক। কালীকুমারের স্বগ্রামস্থ বৃদ্ধ হরমোহন গাঙ্গুলি মহাশয়ের মুখে ইহা শুনিয়াছি। গাঙ্গুলি মহাশয় কালীকুমারের বাসায় থাকিতেন। ইনি ময়মনসিংহ রোডসেস্ আপিসে কর্ম্ম করিয়া সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন—"একবার একাদশীর দিনে মধ্যাহ্ন সময়ে একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া কালীকুমারের বাসায় অতিথি হন। কালীকুমার সে সময়ে জ্বরে শয্যাশায়ী ছিলেন। ব্রাহ্মণকে দেখিবামাত্র তিনি জিজ্ঞাসা করাইয়াছিলেন তিনি জল খাইবেন কি না। অতিথি জল খাইবেন বলিয়া উত্তর করেন। ইহার কিছুকাল পরেই কালীকুমারের শরীরে জ্বর অত্যন্ত প্রবল হয়, রাত্রি অর্দ্ধপ্রহর পর্য্যন্ত তিনি প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় থাকেন। শুনিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, ঐ সময়ে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া চক্ষুরুন্মীলন করিয়া তিনি সর্ব্বপ্রথমেই পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণকে জিজ্ঞাসা করেন, "সেই একাদশী করা ঠাকুরটীর জলপানের কি উদ্যোগ হইয়াছিল?" অন্যান্য লোকের সহিত অতিথি ব্রাহ্মণও

তখন কালীকুমারের শয্যাপার্শ্বে ছিলেন। এ অবস্থায় এমন প্রশ্ন শুনিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন; আর সেই অপরিচিত ব্রাহ্মণ হৃদয়ের অকৃত্রিম উচ্ছাসের সহিত কহিয়া উঠিলেন, "ধন্য আপনার ব্রাহ্মণভক্তি! কায়স্থকুলতিলক আপনি। আপনার ন্যায় মহাপুরুষ দর্শনেও পুণ্য।"

আমরা এখানে আর একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। এটীও গাঙ্গুলি মহাশয় বলিয়াছেন। একবার পূজার পরে কার্ত্তিক মাসে কালীকুমার বাড়ী হইতে ময়মনসিংহে আসিয়াছেন। নৌকা হইতে সমস্ত জিনিসপত্র তখনও বাসায় উঠে নাই। এমন সময়ে প্রায় তিনশত ব্রাহ্মণ অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে মুক্তাগাছার প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারিণী মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুরের মাতা লক্ষ্মীদেবী বিপুল ব্যয়ে বাড়ীতে মহাভারত পাঠ করাইতেছিলেন। দেশ দেশান্তর হইতে ব্রাহ্মণগণ আসিয়া দান লইয়াছিলেন। ইঁহাদেরই একদল ব্রাহ্মণ ময়মনসিংহে কালীকুমারের বাসায় আসিয়া উঠিয়াছিলেন। কালীকুমারের অবস্থা দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ যেন কিছু অপ্রস্তুত হইলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে একজন কহিলেন বড় অসময়ে আমরা আপনার এখানে আসিয়াছি। কালীকুমার যথাসাধ্য তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের কথার উত্তরে করযোড়ে কহিলেন "আপনাদের আগমন সুসময়েই হইয়াছে। বাড়ী হইতে আসিয়াই এতগুলি ব্রাহ্মণ অতিথি পাইয়াছি; এবার আমার বৎসরটী ভাল যাইবে। অদ্য আমি সমুচিত আয়োজন করিতে পারিব না; তথাপি যথাসাধ্য আপনাদের আহার ও বিশ্রামের উদ্যোগ করিয়া দিতেছি।" ব্রাহ্মণ শুনিয়া নিরতিশয় প্রীতি সহকারে কহিলেন "সার্থকনাম দাতা কালীকুমার! অনেক দিন হইতে নাম শুনিয়াছি আজ দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিলাম। আমাদের উদ্যোগ আমরাই করিয়া লইতেছি।" বলা বাহুল্য ব্রাহ্মণগণ পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করিয়াছিলেন।

কালীকুমারের জীবনে ঘটনা অনেক আছে। একটা প্রবন্ধে সকলগুলির সমাবেশ হওয়া সম্ভবপর নহে। কালীকুমার অন্য স্থানে বা অন্য সময়ে জন্মগ্রহণ করিলে হয়ত এতদিনে তাঁহার বিস্তৃত জীবনী প্রকাশিত হইত। ইচ্ছা থাকিলেও সম্পূর্ণ জীবনী সংগ্রহ করি এমন শক্তি, অবসর ও অধ্যবসায় আমাদের নাই। ময়মনসিংহে আসা অবধি গত তিন বৎসর ধরিয়া অনেক বিশ্বস্ত ও পদস্থ লোকের মুখে কালীকুমারের অসাধারণ গুণগ্রাম শ্রবণ করিয়া আসিতেছি। অন্তঃকরণের অকৃত্রিম ভক্তির উচ্ছ্বাসেই আমরা তাঁহার জীবনের দুচারিটী স্থূল স্থূল কথা লিপিবদ্ধ করিলাম।

একদিন একজন নূতন কর্ম্মপ্রার্থী দেশ হইতে আসিয়া সন্ধ্যার সময়ে কালীকুমারের বাসায় উপস্থিত হয়। রাত্রিতে আহারাদি করিয়া সে কালীকুমারের শয্যায় শয়ন করিয়া থাকে। পথশ্রমে ক্লান্ত ছিল বলিয়া অতি শীঘ্রই তাহার নিদ্রাবেশ হয়। কালীকুমার আহার করিতে বসিয়াছেন, এমন সময়ে একজন ভৃত্য দেখিল আগন্তুক তাহার প্রভুর শয্যায় শয়ান রহিয়াছে। ভৃত্য তাহাকে তুলিতে গেল। তাহার "উঠুন, উঠুন" শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র কালীকুমার জিজ্ঞাসা করিয়া কারণ অবগত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ কহিলেন উহাকে উঠাইবার কোন প্রয়োজন নাই। উহার জন্যে যে শয্যা প্রস্তুত করিতে হইত তাহাই আমাকে দাও। আমি তাহাতে শুইয়া থাকিব। উহাকে নিদ্রা হইতে তুলিলে উহার কষ্ট হইবে।

কালীকুমারের আর্থিক দান সম্বন্ধে এখনও বিশেষ কিছু বলা হয় নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রার্থী তাঁহার নিকট কখনও বিফলমনোরথ হইত না। কালীকুমার অনেক সময়েই যে যাহা চাহিত, তাহাকে তাহাই দিয়া দিতেন। তাঁহার মনের ভাব এইরূপ ছিল যে, প্রার্থীকে যেন অন্যের দ্বারস্থ না হইতে হয়। মুক্তহস্ত ছিলেন বলিয়া সর্ব্বদা তাঁহার হস্তে অধিক অর্থ থাকিত না। কালীকুমার অনেক সময়ে অনেককে বাসায় বসাইয়া রাখিতেন এবং আহার দিতেন, পরে হাতে অর্থ আসিলে তাহাদিগকে অর্থ দিয়া বিদায় করিতেন। একবার একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার নিকট কন্যাভারের দায় জানাইয়াছিলেন। কিছুদিন বাসায় থাকিয়া একদিন ব্রাহ্মণ কহিলেন, আমার প্রার্থনা পূরণ করিলে আমি বাড়ী যাইতে চাই। কালীকুমার বুঝিলেন, ব্রাহ্মণকে অনেক দিন রাখা হইয়াছে। কাচারি যাইবার সময়ে বলিয়া গেলেন, অদ্য যাহা পাইব, তাহা আপনার। ব্রাহ্মণের ভাগ্যক্রমে কালীকুমার সেই দিন পাঁচশত টাকা পাইয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময়ে তিনি সহর্ষে সেই অর্দ্ধ সহস্র মুদ্রা ব্রাহ্মণকে দান করিলেন। কালীকুমারের এক পিশতুত ভাই তাঁহার বাসায় থাকিতেন। তিনি এই দানের প্রতিবাদ করিয়া কহিয়াছিলেন, "ব্রাহ্মণের কন্যার বিবাহ যাহাতে মোটামুটি রকমে হইতে পারে, সেই পরিমাণ অর্থ দিলেই চলিত।" কালীকুমার বলিলেন, "এ টাকাই আমার নহে; ব্রাহ্মণের। প্রত্যহ ত আমি পাঁচশত টাকা পাই না, আজ কেবল ব্রাহ্মণের ভাগ্যে পাইয়াছি।" কালীকুমারের ভাগিনেয় ময়মনসিংহের বর্ত্তমান জেলার (Jailor) শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত বসু এই ঘটনাটী বলিতে বলিতে বলেন, মামা মধ্যে মধ্যে প্রায়ই অকৃত্রিম বিশ্বাসের সহিত কহিতেন, "আমি যে এত পয়সা পাই, সে কেবল দশজনকে দু'টী অন্ন দেই আর কিছু কিছু সাহায্য করি বলিয়া। যেদিন আমি ইহা করিতে ক্ষান্ত হইব, ভগবান্ সেইদিন আমার প্রাপ্তির অর্থ বন্ধ করিয়া দিবেন।" অর্থপ্রধান বর্ত্তমান যুগে এমন বিশ্বাস উপহসিত হইতে পারে, কেননা জগতের দুর্ভাগ্যক্রমে অনেক অর্থবান্ এবং উপার্জ্জনশীল লোক কালীকুমারের পথে না চলিয়াও আপনাপন সঞ্চয় হইতে বঞ্চিত হন না।

রজনী বাবুর মুখেই শুনিয়াছি, কালীকুমারের বাড়ীতে দুর্গোৎসব এক মহাব্যাপার ছিল। বৎসরান্তে বাড়ী যাইয়া এই সময়ে তিনি লোককে অকাতরে অন্নবস্ত্র দান করিতেন। চারি পাঁচশত লোক তাঁহার নিকট নূতন বস্ত্র পাইত। এতদ্ভিন্ন অনেক দরিদ্র সন্তানকে তিনি ছাতা জুতা প্রভৃতিও দিতেন। সংসারে দাতা নাম কি সহজে উপার্জ্জন করা যায়? জীবনে বিপুল অর্থরাশি অর্জ্জন করিয়াও পূর্ণ উন্নতির সময়ে সাতচল্লিশ আটচল্লিশ বৎসর বয়সে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে কালীকুমার যখন দেহত্যাগ করেন, তখন তাঁহার সঞ্চিত অর্থ দুই সহস্রও ছিল না। কালীকুমারের একমাত্র বংশধর শ্রীযুক্ত বাবু তারকচন্দ্র দত্ত এখন সামান্য বেতনে ফরিদপুর কালেক্টরিতে কেরাণীগিরি কার্য্য করিতেছেন। স্বর্গীয় নীলকান্ত সরকার মহাশয়ের সাহায্যে তাঁহার এই কর্ম্মপ্রাপ্তি ঘটে শুনিয়াছি। পিতার পুণ্যবলে তারকচন্দ্র জীবনে কখনও কষ্ট পাইবেন না। ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

কালীকুমারের শেষ জীবনে তাঁহার ওকালতী লইয়া একবার একটু গোল বাধিয়াছিল। কালীকুমার যখন উকীল হন, তখন ওকালতীর বিশেষ বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না। কেহ কেহ সামান্যরূপ পরীক্ষা দিয়া সনন্দ পাইতেন; কেহ বা জজের অনুমতি লইয়াই ব্যবসায় করিতেন। বরিশালের একজন উকিলের সনন্দ ছিল না বলিয়া তর্ক উপস্থিত হওয়ায় হাইকোর্ট সমস্ত সনন্দহীন উকিলের কৈফিয়ত তলব করেন। জজ আদালতের সনন্দ না থাকায় কালীকুমারকেও এই কৈফিয়ত দিতে হইয়াছিল। এই উপলক্ষে কালীকুমার স্বয়ং কলিকাতায় গিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মণ্ট্রিও সাহেব তাঁহার কৈফিয়ত লিখিয়া দেন এবং স্বনামখ্যাত জজ লুইস্ জ্যাক্সন্ সাহেব কালীকুমারের পরীক্ষা লইয়া তাঁহাকে সনন্দ প্রদান করেন। এই সময়ে ময়মনসিংহ হইতে কলিকাতা গমন আজকালকার ন্যায় সহজ ছিল না। কলিকাতায় যাত্রা করিবার সময়ে কালীকুমার বাসার সমস্ত লোককে একত্র করিয়া তাহাদের হস্তে তিনশত টাকা দিয়া যান এবং কহিয়া যান, যদি সনন্দ না পাই, তবে আর ময়মনসিংহে ফিরিব না। তাহা হইলে এই আমার শেষ সাহায্য। আর যদি সনন্দ পাই, তোমরা আমার অনুপস্থিতি সময়ে এই টাকা দিয়া চালাইবে; আমি ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় বন্দোবস্ত করিব। ফিরিয়া আসিয়া কালীকুমার দু-তিন বৎসরমাত্র জীবিত ছিলেন। ময়মনসিংহ সিটি ইন্‌ষ্টিটিউসনের সুযোগ্য হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি,এ এই ঘটনাটী বলিতে বলিতে কহেন, কালীকুমার যখন এই তিনশত টাকা দিয়া যান, তখন আমি ময়মনসিংহ স্কুলে পড়িতাম। আমার সহাধ্যায়ী কেহ কেহ কালীকুমারের বাসায় থাকিতেন এবং তাঁহার অন্নে উদর পোষণ ও তাঁহার অর্থে অধ্যয়ন করিতেন। ধন্য কালীকুমার! নিজের উপর এমন বিপদ, আপনার বিষয় কর্ম্ম লইয়া টানাটানি, ইহাতেও তুমি আশ্রিতজনকে ভুলিয়া যাও নাই। যিনি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, নিশ্চয়ই তুমি তাঁহার অজস্র আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছ। জগতে কয়জনে তোমার অবস্থায় তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে সমর্থ?

কালীকুমারের পারিবারিক ও নৈতিক জীবন সম্বন্ধে দু'চারিটী কথা বলিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কালীকুমারের পিতৃব্য স্বর্গীয় নন্দকিশোর দত্ত মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু রেবতীমোহন দত্ত এল্. এম্. এস্. বর্ত্তমান সময়ে ময়মনসিংহে ডাক্তার ও অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট। রেবতী বাবু বলেন, কালীকুমারের ন্যায় স্নেহময়

পবিত্র হৃদয় জগতে দুর্ল্লভ। বাসায় কালীকুমারের পুত্র তারকচন্দ্র, আমার অগ্রজ এবং আমি থাকিতাম। কখনও বুঝিতে পারি নাই যে, আমাদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য আছে। সকলেই এক কাপড় এক জুতা ব্যবহার করিয়াছি। বাল্যে আমি কিছু অশিষ্ট ও অমনোযোগী ছিলাম। সময়ে সময়ে অগ্রজের প্রহার খাইতে হইত। অনেক দিন রাত্রিতে রাগ করিয়া অনাহারে শুইয়া থাকিতাম। কালীকুমার আমাকে আদর করিয়া পাগলা বলিয়া ডাকিতেন। রাত্রিতে কাজকর্ম্ম সারিয়া তিনি সকলের শেষে আহার করিতেন। আহারের পূর্ব্বে প্রত্যেক রাত্রিতেই জিজ্ঞাসা করিতেন, "পাগলার খাওয়া হইয়াছে?" ভৃত্য "না" বলিয়া উত্তর করিলেই তিনি আহারের স্থানে বসিয়া ডাকিতেন, "পাগলা আমি যাব, না উঠে আসবে?" অনেক দিনই তাঁহাকে উঠিয়া আসিতে হইত না। তাঁহার স্নেহময় স্বর শুনিলেই আমার অভিমান কোথায় পলাইয়া যাইত; দাদার প্রহার ভুলিয়া যাইতাম। কোন কোন দিন রাগ অধিক থাকিলে নিদ্রার ভাণ করিয়া পড়িয়া থাকিতাম। তিনি নিজে আসিয়া আমাকে তুলিয়া লইয়া যাইতেন। অবশেষে রেবতী বাবু অশ্রুপ্লাবিতনেত্রে কহিলেন, "আমাদের সংসারে তিনি যে স্নেহের বাঁধ বাঁধিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে মৃত্যুর পরেও ষোল, সতের বৎসর পর্য্যন্ত আমরা একত্রে ছিলাম।" পাশ্চাত্য শিক্ষার যে খরস্রোত বঙ্গের শত শত পরিবারের ঐক্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, তাহারই আঘাতে চৌদ্দ, পনের বৎসর হইল কুকুটিয়ার দত্ত পরিবার পৃথক হইয়াছেন।

আজকালি অনেক শিক্ষিত লোকের ধারণা যে, একান্নবর্ত্তী পরিবার অশেষ দোষের আকর। দেশে এই কুপ্রথা প্রচলিত থাকায় আমরা দিন দিন মনুষ্যত্ব হারাইতেছি। এ পাপপ্রথার মূলোচ্ছেদ না হইলে বাঙ্গালীর উন্নতি নাই। অধুনা অনেকে নিজের জীবনে অন্যের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত দেখাইয়া পরিবারস্থ সকলকে আত্মাবলম্বন শিক্ষা দিয়া দেশের উপকার করিতেছেন, ইহাও আমরা জানি। একই সময়ে একই ভবনে উপার্জ্জনশীল ভ্রাতাকর্ত্তৃক অস্নারের আলোশোভিত সুসজ্জিতগৃহে লুচিমাংসের সদ্ব্যবহার হইতেছে, আর অর্থহীন সহোদর ক্ষুদ্র কক্ষান্তরে মৃৎপ্রদীপ সম্মুখে রাখিয়া রুটীগুড়ে কথঞ্চিৎ জঠরজ্বালা নিবারণ করিতেছেন, এ দৃশ্য এখন বিরল নহে। একান্নভুক্ত পরিবার শুদ্ধ গুণেরই আকর, ইহাতে কুফল কখনও ফলে না, আমরা এমন কথা বলিতেছি না। গৃহের অধিষ্ঠাত্রীগণের মনের সঙ্কীর্ণতানিবন্ধন ইহাতে অনেক সময়ে হলাহল উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহাও আমরা স্বীকার করি। কিন্তু এই প্রাচীন প্রথা প্রচলিত থাকায় দেশে যদি একজন কালীকুমার দণ্ডেরও জন্ম হয়, তাহা হইলে আমরা কোন ক্রমেই ইহার মূলোচ্ছেদের পক্ষপাতী নহি। পল্লীগ্রামের একান্নভুক্ত পরিবারে লালিত পালিত বলিয়াই কালীকুমার কালীকুমার হইতে পারিয়াছিলেন, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

কালীকুমার কোনদিনই পরিবারশব্দের আধুনিক সঙ্কীর্ণ অর্থ গ্রহণ করেন নাই। আজকাল যেমন "মহাশয় পরিবার আনিয়াছেন, আপনার পরিবারের অসুখ হইয়াছে?" বলিলে কেবল জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির গৃহলক্ষ্মী বা গৃহের অলক্ষ্মীকেই লক্ষ করা হয়, কালীকুমারের সময়ে অনেকেই পরিবার শব্দ এ অর্থে প্রয়োগ করিতেন না। কালীকুমারকে কেহ কর্ম্মস্থলে পরিবার আনিতে অনুরোধ করিলে তিনি কহিতেন, আমার পরিবারে অনেক লোক। সকলকে এখানে আনা সম্ভব নহে। একজনকে ছাড়িয়া আর একজনকে আনিব ইহাও হইতে পারে না। বস্তুতঃ কালীকুমার কোনদিনই বাসায় তাঁহার স্ত্রী কিম্বা পিতৃব্যপত্নী প্রভৃতি কাহাকেও আনেন নাই। বাড়ীতে সকলেই একরূপ বস্ত্র অলঙ্কার পরিধান করিতেন ইহা বলিবার প্রয়োজন আছে কি? কালীকুমারের স্ত্রীর অন্তঃকরণ তাঁহার স্বামীর ন্যায় সরল ও উদার ছিল। সুতার কাপড় ভিন্ন অন্য মূল্যবান কাপড় তিনি ভাল বাসিতেন না। একবার এক আত্মীয় তাঁহাকে একখানি সুবর্ণের অলঙ্কার উপঢৌকন দিয়াছিলেন। গৃহে আর কাহারও এরূপ অলঙ্কার নাই আমি উহা কেমন করিয়া ব্যবহার করিব? বলিয়া তিনি উহা প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। এমন না হইলে তিনি কালীকুমারের সহধর্ম্মিনী হইবেন কেন?

কালীকুমারের নৈতিক জীবনও অতিশয় উচ্চ ছিল। তিনি স্বধর্ম্মনিরত পরম বিশ্বাসী আনুষ্ঠানিক হিন্দু ছিলেন। ময়মনসিংহের বৃদ্ধগণ একবাক্যে কহেন, কালীকুমারের ন্যায় জিতেন্দ্রিয় পুরুষ সংসারে অল্পই দেখা যায়। উকিল গোবিন্দপ্রসাদ বসু মহাশয় বলেন, কোন অসৎ

স্বভাবের পুরুষ কি নারী কালীকুমারের সম্মুখীন হইতে সাহস করিত না। কালীকুমারের বাসার ধার দিয়া ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিতে যাইবার পথ ছিল। কোন কোন বারবনিতা এই পথ দিয়া স্নান করিতে যাইত। কালীকুমার বাসায় থাকিলে ইহারা প্রায়ই ঘাটের পথে বাহির হইত না। কদাচিৎ তাঁহার সম্মুখে পড়িলে দূর হইতেই দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিত।

এমন লোক যে সাধারণের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অসীম ভক্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহাতে বিচিত্র কি? ময়মনসিংহ সহরে তাঁহার সম্মান প্রভুত্বও অসাধারণ ছিল! একবার কতকগুলি পুলিস কনষ্টেবল সহরের এক বিপণিকারের সহিত বিবাদ করিয়া বিনা মূল্যে তাহার দোকানের অনেকগুলি জিনিস লইয়া যায় এবং তাহাকে প্রহার করে। ঘটনা শুনিয়া কালীকুমার বিপণিকারের পক্ষ হইয়াছেন এই সংবাদ পাইবা মাত্র অত্যাচারী লোকগুলি তাহার শরণাপন্ন হয় এবং তাঁহার আদেশ মত বিপণিকারের ক্ষতিপূরণ করিয়া দেয়। সবলের অত্যাচার হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিতেন বলিয়া এখনও অনেক দরিদ্র কালীকুমারের নাম স্মরণ করিয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কালীকুমারের জীবনের দু চারিটী স্থূল স্থূল কথা ভিন্ন প্রদীপের প্রবন্ধে স্থান হওয়া অসম্ভব। কালীকুমার অমররাজ্যে চলিয়া গিয়াছেন। রাজা রায় বাহাদুর উপাধি পাইবেন ভবিষ্যদ্বংশে নাম থাকিবে এ উদ্দেশ্যে তিনি দান করিতেন না। কেহ তাঁহার জীবনী লিখিবে এ আশাও তিনি করেন নাই। মৃত্যুর ত্রিশ বৎসর পরে আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র লোকের দুর্ব্বল লেখনী ক্ষীণস্বরে তাঁহার গুণগান করিবে, একথা অবশ্য কোন দিনই তাঁহার মনে ছিল না। তবে সাত্ত্বিক দানের এমনই মহিমা যে আজিও কালীকুমারের যশঃসৌরভ পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থান আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে। ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় দাতা কালীকুমার নাম প্রায় সর্ব্বত্র পরিচিত। বৃদ্ধ হরমোহন গাঙ্গুলি মহাশয় বলেন "কালীকুমার কায়স্থের সন্তান; কিন্তু বিক্রমপুরের অনেক ব্রাহ্মণ এখনও বলিয়া থাকেন যে প্রাতঃকালে উঠিয়া কালীকুমারের নাম করিলে দিনটী ভাল যায়। ময়মনসিংহে কালীকুমারের স্মৃতি কেমনভাবে আদৃত আমরা তাহা লিখিয়া বুঝাইতে পারিব না। এ নগরে পূর্ব্ববঙ্গের প্রৌঢ় বৃদ্ধ যত আছেন, কালীকুমারের কথা উঠিলে প্রত্যেকেই অকৃত্রিম ভক্তির উচ্ছ্বাস দেখাইয়া থাকেন। কালীকুমার যেন তাঁহাদের সকলেরই আপনার লোক। সকলের মুখেই একই কথা "তেমন প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ আর হইবে না।" অত্রত্য জজ আদালতের উকিল শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলেন;—কালীকুমারের মৃত্যুর বার তের বৎসর পরে আমি এখানে ওকালতী করিতে আরম্ভ করি। তখনও একটী চলিত কথা ছিল "কলিতে কালীকুমার।" ইহার অর্থ যে এ যুগে এমন লোক দুর্লভ। মানুষ কতদূর পূজিত হইলে ভাষায় এমন কথা প্রচলিত হইতে পারে পাঠক স্বয়ং তাহা বিবেচনা করিবেন। কালে কালীকুমারের এ কীর্ত্তি বিস্মৃতির গর্ভে লীন হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু তাঁহার তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি? পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি যে এই শ্রেণীর সৎপুরুষেরা পার্থিব প্রশংসার প্রত্যাশা রাখিয়া সৎকার্য্য করেন না। ইহাদের পুরস্কার পরলোকে। কালীকুমারের এই অসম্পূর্ণ জীবনী লিখিয়া আমরা তাঁহার গৌরব কিছুমাত্র বর্দ্ধন করিলাম তাহা নহে। পরন্তু তাঁহার পুণ্যনাম কীর্ত্তন করিয়া স্বয়ং ধন্য হইলাম ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

প্রবন্ধ লিখিত হইবার পরে দেখিলাম, বর্ত্তমান মে মাসের "মহিলা" পত্রিকায় "সংসারে সুব্যবস্থা কিরূপে হয়?" ইতি শীর্ষক প্রবন্ধে দৃষ্টান্ত স্বরূপ কালীকুমার ও তাঁহার গৃহিণী সম্বন্ধে কয়েকটী কথা লিখিত হইয়াছে। লেখক সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদের উদারতা ও বদান্যতার প্রশংসা করিয়াছেন; কিন্তু কাহাকেও কালীকুমারের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে পরামর্শ দেন নাই। যে কালীকুমার সর্ব্বদা বলিতেন যে, আপনার আত্মীয়কুটুম্ব ও দেশস্থ দশজনের সাহায্য করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট জীবনবীমা * বর্ত্তমান সময়ের গৃহিণীসর্ব্বস্ব গহনাকাগজ বিমাগতপ্রাণ গৃহস্থদিগকে আমরা কোন্ সাহসে তাঁহার পথে চলিতে বলিব? তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত অনেকে জ্ঞাতব্য বলিয়া মনে করিতে পারেন, সেই

* জীবনবিমা (Life-insurance) সম্বন্ধে কালীকুমারের এইরূপ ধারণা চিরদিন ছিল। তিনি বলিতেন, সন্তানসন্ততি ভবিষ্যতে উপকার পাইতে পারে, এ আশায় আত্মীয় বন্ধুদিগের সাহায্য করাই ঠিক্।

সাহসে আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রদীপে পত্রস্থ করিলাম। বঙ্গের খ্যাতিমান্ লেখকদিগের মধ্যে অনেকেই প্রদীপে নিয়মিতরূপে তৈল দান করিতেছেন। প্রদীপ বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজের অগ্রণীদিগেরও অধিকাংশের হস্তে যাইয়া থাকে। কালীকুমারের এই সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করিয়া যদি প্রদীপ-পাঠকের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হয়, তাঁহার বিস্তৃত জীবনী জানিবার জন্য ঔৎসুক্য জন্মে, তাহা হইলে আমরা কালীকুমারের জীবনের সম্পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহের ভার কোন মহত্তর হস্তে ন্যস্ত করিবার চেষ্টা করিব।

বড় ইচ্ছা ছিল যে, প্রদীপে কালীকুমারের একটী প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশ করি; কিন্তু তাহা অল্পায়াসসাধ্য নহে।

শ্রীচন্দ্রশেখর কর।

উত্তর।*

মধ্যাহ্ন সূর্য্যের তুলনায়, উদয় ও অস্তকালে, দিক্‌প্রান্তস্থ সূর্য্যের বৃহত্তর আকার বোধ,—মানব দর্শনেন্দ্রিয়ের ভ্রম ও অসম্পূর্ণতার একটা উদাহরণ। কেবল চক্ষের প্রমাণে বিশ্বাস না করিয়া,—কোন যন্ত্রাদি দ্বারা উদয়াস্তকালের সূর্য্যগোলকের ব্যাস নির্দ্ধারণ করিলে,—দ্বিপ্রহরের সূর্য্যের ব্যাসের তুলনায়, ইহা ঠিক্ একই দেখা যায়। দৃষ্ট দ্রব্যের নির্ভুল অবয়ব জ্ঞান বা দূরত্ব বোধের জন্য, চক্ষুর কোন অংশেই কিছুই ব্যবস্থা নাই,—বয়োবৃদ্ধি ও ভূয়োদর্শনের সহিত মানবমনে, উক্ত জ্ঞানদ্বয়ের ক্রমবিকাশ হইয়া থাকে। নানাদেশীয় পণ্ডিতগণ পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন,—কোন বয়ঃপ্রাপ্ত জন্মান্ধ ব্যক্তি,—চিকিৎসাকৌশলে হঠাৎ দর্শনজ্ঞান লাভ করিলে, তাহার চক্ষে সৃষ্টপদার্থ মাত্রই পটাঙ্কিত সমতল চিত্রের ন্যায় প্রতিভাত হয় এবং বাহ্য পদার্থ গুলির মধ্যে কোন্‌টী নিকটবর্ত্তী ও কোন্‌টীই বা দূরস্থ, তাহাও সে ঠিক্ বলিতে পারে না,—কিন্তু কিছুদিন চক্ষু ব্যবহার করিলে, দৃষ্টিশক্তির এই দুর্ব্বলতা ক্রমেই অন্তর্হিত হইতে আরম্ভ করে। চক্ষুষ্মান্ মানব, আবাল্য দর্শনেন্দ্রিয়ের ব্যবহার করিয়া, দূরত্বের অনুপাতে পদার্থের আকার কি হারে ক্ষুদ্র হয়, এবং নিকটস্থ পদার্থের তুলনায়, একটী নির্দ্দিষ্ট বস্তু কতটা ক্ষুদ্র বা বৃহৎ দেখায়,—তাহার একটা স্থূলজ্ঞান মনে গড়িয়া রাখে। কিন্তু এই জ্ঞানটা সকল সময় বিশ্বাসযোগ্য নয়,—অবসর পাইলেই ইহা মানুষকে প্রতারিত করিতে ছাড়ে না। পাঠক-পাঠিকাগণ দেখিয়া থাকিবেন,—নাট্যালয়ের দৃশ্যপটগুলি নিকটে থাকিয়াও, অতি দূরবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়;—ইহার কারণ যে চিত্রকরের অঙ্কনচাতুর্য্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই,—কিন্তু দূরত্বানুসারে পদার্থের আয়তন ক্ষুদ্র হওয়া সম্বন্ধীয় আমাদের স্থূল ও সরল জ্ঞানটী লইয়া, চিত্রকর এস্থলে দর্শকবৃন্দকে প্রতারিত করিতে ছাড়েন না; দর্শকবৃন্দ, রঙ্গমঞ্চস্থ অভিনেতৃবর্গের তুলনায় এবং অপরাপর বাহ্যপদার্থের সাদৃশ্যে, চিত্রাঙ্কিত ঘরবাড়ী অতি ক্ষুদ্রাকারে দেখেন বলিয়া,—মানবের সেই স্বাভাবিক অভ্যাসজাত জ্ঞান হইতে সে গুলি অতি দূরবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। গৃহস্থিত দ্রব্যাদির আকার সম্বন্ধে আমাদের আর একপ্রকার দৃষ্টিবিভ্রম দেখা যায়,—ঘরের পদার্থগুলিকে, সর্ব্বদাই ইহাদের পার্শ্ববর্ত্তী নানাদ্রব্যের সহিত তুলনা করিয়া,—আমরা এগুলির প্রত্যেকের আয়তন সম্বন্ধে এক একটী জ্ঞান স্থির করিয়া রাখি;—গৃহস্থিত টেবল্‌খানি চেয়ারগুলির তুলনায় বড় এবং ফুলদানি ও দেওয়ালের ছবির তুলনায় যে আরো বড়, তাহা বেশ বুঝিতে পারি। কিন্তু উক্ত টেবল্‌খানি যদি উন্মুক্ত গৃহপ্রাঙ্গনে বাহির করা যায়, তাহাহইলে, সেখানি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয়,—তখন উন্মুক্ত গৃহপ্রাঙ্গনে টেবিলের সহিত তুলনা করিবার আর কিছুই থাকে না; ইহাই এই দৃষ্টিবিভ্রমের কারণ।

উদয়াস্তকালে সূর্য্যের আয়তন বৃদ্ধি ঠিক্ উল্লিখিত উপায়ে হইয়া থাকে;—উদয় সময়ে সূর্য্য দিক্‌প্রান্তে অবস্থান করায়, বৃক্ষ ঘরবাড়ী ইত্যাদি পার্থিব দ্রব্যাদির সহিত তাৎকালিক সূর্য্যগোলকের তুলনা করিয়া, আমরা ইহার একটা অযথা বৃহৎ আকার কল্পনা করিয়া লই,—কিন্তু পরে সূর্য্য ঊর্দ্ধোত্থিত হইতে আরম্ভ করিয়া পার্থিব পদার্থজাত হইতে দূরবর্ত্তী হইলে আমরা আর তুলনা করিবার কোন বস্তুই অনন্ত নীলাকাশে দেখিতে পাই না,—কাযেই পূর্ব্বের তুলনায় সূর্য্য ক্ষুদ্রতর হইয়া পড়ে।

অনেকে মনে করেন, সূর্য্যরশ্মির বিবর্ত্তন (Refraction) অস্তগামী ও উদায়মান সূর্য্যের আয়তন বৃদ্ধির কারণ, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। আলোকপথ বিবর্ত্তন দ্বারা উদয়াস্তকালে সূর্য্যগোলকের ঊর্দ্ধাধোভাগ কিঞ্চিৎ চাপা দেখা যায় মাত্র।

২। ভূমাধ্যাকর্ষণ উপেক্ষা করিয়া, পতঙ্গ, পিপীলিকা ও সরীসৃপাদির প্রাচীরগাত্রে বিচরণ, বাস্তবিকই বিস্ময়জনক,—কিন্তু আধুনিক জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ, উক্ত প্রাণিদের অদ্ভুত ভ্রমণকৌশলের রহস্য আবিষ্কার করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, উল্লিখিত জীবগুলির পদের গঠনকৌশলই—ইহাদের বিস্ময়কর বিচরণক্রিয়ার মূল কারণ; কিন্তু এই প্রাণিগুলির মধ্যে সকলেরই পদের গঠন একপ্রকার নয়। কতকগুলি জীবের পদে একপ্রকার বায়ুকোষ থাকে,—এই কোষের নিম্নপ্রান্ত অনাবৃত; প্রাণিগণ প্রাচীরাদিতে বিচরণকালে উক্ত বায়ুকোষ প্রাচীর সংলগ্ন করিয়াই তন্মধ্যস্থ বায়ু অনায়াসে বহির্গত করিতে পারে। এই প্রকারে বায়ুশূন্য হইলে, বহিঃস্থ বায়ুর চাপে পদপ্রান্তস্থ কোষ প্রাচীরগাত্রে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইয়া যায়,—কাযেই এই শ্রেণীর পতঙ্গাদি ভূমাধ্যাকর্ষণ-শক্তির বিরুদ্ধে বেশ চলিয়া বেড়াইতে পারে।

মক্ষিকা প্রভৃতি কয়েক জাতীয় পতঙ্গের পদগুলির গঠনকৌশল কিছু স্বতন্ত্র। পদপ্রান্তস্থ কোষ হইতে ইহারা "আঠা"র ন্যায় একপ্রকার লালা যথেচ্ছা নির্গত করিতে পারে এবং এতদ্ব্যতীত পদগুলি বহুসংখ্যক সূক্ষ্ম এবং দৃঢ় "কাঁটা" দ্বারা সজ্জিত থাকে,—বিচরণকালে ইহারা যুগপৎ উক্ত "কাঁটা" ও লালা দ্বারা সুবিধামত পদ আবদ্ধ রাখিয়া যথেচ্ছা বিচরণ করে। পিপীলিকা, মশকাদি নানা জীবের পদে উক্ত অংশগুলি এত ক্ষুদ্র যে, বৃহৎ অণুবীক্ষণ ব্যতীত সেগুলি প্রত্যক্ষ করা অসম্ভব।

৩। সংসক্তি (Cohesion) অর্থাৎ,—দুইটী পৃথক জাতীয় দ্রব্যের পরস্পর মিলিবার শক্তি,—অধিকাংশ পদার্থেরই সাধারণ ধর্ম্ম। সৃষ্টির যাবতীয় কঠিন, তরল বা বাষ্পীয় পদার্থের মধ্যে, প্রত্যেক জাতিতেই অনেক সময় উক্ত শক্তির অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়,—আবার কঠিনে তরলে, এবং তরলে বাষ্পে সংসক্তির উদাহরণও জগতে বড় দুর্লভ নয়। কিন্তু সকল কঠিনের সহিত, তরল পদার্থ মাত্রেরই সংসক্তি নাই, এবং বাষ্পীয় পদার্থ মাত্রেরই সহিত সকল তরলের সংসক্তি দেখা যায় না। ম্যাজেণ্টার সহিত জলের সংসক্তি আছে, কিন্তু কর্পূরের সহিত ইহার মিলিবার শক্তি নাই, এই জন্য জলে কর্পূর মিশ্রিত হয় না;—আবার এমোনিয়া বাষ্পের সহিত জলের সংসক্তি অতীব প্রবল, এইজন্য উক্ত বাষ্প জলে মিশ্রিত থাকিতে পারে,—কিন্তু আবার জলের সহিত বায়ুর মিশ্রনে উক্ত শক্তির কার্য্য দেখা যায় না। কচুর পাতা জলসিক্ত না হওয়া, পত্রের বহিরাবরণ এবং জল,—এতদুভয় পদার্থের সংসক্তিহীনতার পরিচায়ক। সাধারণ বৃক্ষপত্রের সহিত পারদের সংসক্তি নাই,—সীস (Tin) প্রভৃতি কয়েকটী ধাতুর সহিত মিলিত হইলে, পারদ তৎসংযোগে কর্দ্দমবৎ হইয়া যায়।

৪। সময়ে সময়ে ঊর্ণনাভের জালের ন্যায় যে দীর্ঘ সূত্রগুলি আকাশে ভাসমান দেখা যায়,—সেগুলি বাস্তবিকই লূতাতন্তু। মাকড়সার মধ্যে নানা জাতিবিভাগ আছে,—তন্মধ্যে যেগুলি উন্মুক্ত স্থানে বৃক্ষাদি মধ্যে জাল নির্ম্মাণ করে,—উক্ত সূত্রগুলি সম্ভবতঃ তাহাদেরই জালের ছিন্ন অংশ। এই শ্রেণীর মাকড়সাগণ (Garden Spiders) দূরবর্ত্তী দুই বৃক্ষের ব্যবধানে জাল প্রস্তুত করিবার সময় একটী বৃক্ষের শাখা হইতে দীর্ঘ সূত্র শূন্যে ছাড়িয়া দিয়া স্থিরভাবে শাখাগ্রে বসিয়া থাকে,—পরে বায়ুদ্বারা উক্ত সূক্ষ্মসূত্র আন্দোলিত হইয়া বৃক্ষান্তরে সংলগ্ন হইলে, ইহারা এই সূত্রপথে উভয় বৃক্ষে যথেচ্ছা গমনাগমন করে এবং অল্পকাল মধ্যেই এক বৃহৎ জাল প্রস্তুত করিয়া তুলে। কিন্তু এই জাল বয়ন কালে, প্রবল বায়ু প্রবহমান থাকিলে ইহাদের প্রথম ত্যক্ত লম্বিত সূত্রগুলি এবং বায়ুপ্রবাহ খরতর হইলে অপর সূত্র সকলও, প্রায়ই ছিন্ন হইয়া যায়,—শেষে এই অবলম্বনহীন সূত্রগুলি বায়ুপ্রবাহে ইতস্ততঃ চালিত হইয়া কখন কখন আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

৫। শরদাদি ঋতুতে, যখন চন্দ্র বা সূর্য্য নাতিশুভ্র মেঘে বেষ্টিত হয়, তখন তাহার চারিদিকে কখন কখন যে আলোক-বলয় দেখা যায়,—বৈজ্ঞানিকগণ তাহার উৎপত্তিতত্ত্ব স্থির করিয়াছেন। আলোকপরিবিবেষ্টিত চন্দ্রের নিম্নভাগে, যে শুভ্রমেঘ দেখিতে পাওয়া যায়,—সেগুলি বাস্তবিকই মেঘ নয়,—অনেক সময়েই কুজ্‌ঝটিকা বা অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণা আকাশের ঊর্দ্ধতন প্রদেশে একত্রিত হইয়া মেঘাকারে প্রতিভাত হয়;—এবং এই গুলিই চন্দ্রের আলোকপথে পতিত হইয়া, উক্ত আলোক-বলয় উৎপন্ন

* গত শ্রাবণ সংখ্যক 'প্রদীপে' প্রকাশিত, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রায়ের বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন গুলির উত্তর।

করে। পাঠকপাঠিকাগণ নিশ্চয়ই দেখিয়া থাকিবেন, ধূলিব্যাপ্ত গৃহের দীপ, এবং কুজ্‌ঝটিকাচ্ছন্ন রাজপথের দীপ-শিখা অনেক সময়, চন্দ্রের ন্যায় আলোকচ্ছটায় পরিবেষ্টিত দেখা যায়,—এই উভয় ছটাই এক প্রথায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। অনেকের বিশ্বাস আছে, আলোকচ্ছটার উৎপত্তি এবং ইন্দ্রধনুর বিকাশ, একই কারণে সাধিত হয়,—কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভ্রম।

বিজ্ঞানজ্ঞ পাঠক বোধ হয় অবগত আছেন,—বাতায়নস্থ অতি সঙ্কীর্ণ ছিদ্রপথ দিয়া বহিঃস্থ সৌরালোক গৃহ-প্রবিষ্ট করিলে,—এই গৃহপতিত শুভ্র আলোক রেখার প্রান্তে, বর্ণচ্ছত্রস্থ (spectrum) নানা বর্ণের অনুরূপ আলোক দৃষ্ট হয়, এবং ছিদ্রটী যতই সঙ্কীর্ণ করা যায়, উক্ত বর্ণগুলি শুভ্র আলোক রেখার চারিদিকে ততই স্পষ্ট হইয়া প্রকাশ হইতে থাকে। এই ব্যাপারের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় আলোকবিজ্ঞানবিদ্‌গণ বলেন,—সঙ্কীর্ণ ছিদ্রপথের প্রান্ত-দেশে আলোকোৎপাদক তরঙ্গগুলি আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বক্রপথ অবলম্বন করে,—কিন্তু সকল তরঙ্গগুলি সমভাবে বাঁকিতে পারে না; শুভ্রালোকের উপাদানভূত লোহিত পীতাদি বর্ণের তরঙ্গগুলি, কেবল ইহাদের তরঙ্গের নির্দ্দিষ্ট দৈর্ঘ্যানুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বক্রপথ অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। এই প্রকারে কতকগুলি বর্ণতরঙ্গ কিঞ্চিৎ অগ্রসর এবং অবশিষ্ট গুলি ঈষৎ পশ্চাৎ-পদ হইয়া,—ছিদ্রাগত আলোক রেখার প্রান্তে আসিয়া, পৃথক্ পৃথক্ বর্ণের বিকাশ করে; আবার কতকগুলির আলোকতরঙ্গ পরস্পর ঘাত প্রতিঘাত করিয়া, তাহাদের নির্দ্দিষ্ট বর্ণগুলি হারাইয়া ফেলে। আলোক তত্ত্ববিদ্‌গণ, ছিদ্রাগত আলোকের এই কার্য্যকে, Diffraction বলেন।

চন্দ্রালোকের পথস্থ, ধূলিকণা বা কুজ্‌ঝটিকার সূক্ষ্ম অংশগুলি দ্বারাও, ঠিক্ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আলোকচ্ছটা উৎপন্ন হয়। অস্বচ্ছ পদার্থকণাগুলির মধ্যে যে সঙ্কীর্ণ ব্যবধান থাকে,—তাহা পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষায় বর্ণিত, সঙ্কীর্ণ ছিদ্রের কার্য্য করে।*

৬। আগ্নেয়গিরিবহুল স্থানে অগ্ন্যুদ্গম সময়ে প্রায়ই অধিক ভূকম্পন হইয়া থাকে,—এজন্য ভূমিকম্প জাপান ও ইটালির নিত্য সহচর। কিন্তু এতদ্ব্যতীত অপর স্থানে ভূগর্ভের কি প্রকার অবস্থায় ভূকম্পন হয়, এই প্রশ্নের মীমাংসায় আধুনিক নানা পণ্ডিতগণ মধ্যে আজও মতভেদ রহিয়াছে,—সুতরাং ঠিক কি কারণে ভূমিকম্পকালীন, গম্ভীর শব্দ ভূগর্ভনির্গত হয়, তাহা ঠিক বলা বড় কঠিন ব্যাপার। যাহা হউক, আজকাল অধিকাংশ ভূতত্ত্ববিদ্‌গণই বলেন,—সৃষ্টির প্রথমাবস্থা হইতে পৃথিবী শীতল হইতে আরম্ভ করিয়া অবধিই, ধরার আয়তন ক্রমেই সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে,—কিন্তু এই আকুঞ্চন, ধরা দেহের সর্ব্বাঙ্গে সমভাবে লক্ষিত হয় না,—কেবল ভূগর্ভের গভীরতম প্রদেশে উত্তপ্ত পদার্থগুলি আকুঞ্চিত হইয়া, সেই সকল স্থানে বৃহৎ বৃহৎ গহ্বরের উৎপত্তি করে মাত্র। এই ভূমধ্যস্থ গহ্বরগুলি চিরকাল অক্ষতভাবে থাকিতে পারে না,—ইহাদের পার্শ্বস্থ ভূস্তরগুলি ভূপৃষ্ঠের গুরুভার কিছুকাল বহন করিয়াই, দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; এবং শেষে উক্ত ভাবে গহ্বরের চারিদিকের স্তরগুলি ভগ্ন হইয়া গহ্বরসাৎ হইয়া যায়; আধুনিক অনেক পণ্ডিতের মতে এই আকস্মিক ভূস্তর সঞ্চালনে, ভূকম্পের উৎপত্তি। পাঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় অবগত আছেন,—কোন বায়বীয় পদার্থে হঠাৎ কম্পন উৎপন্ন করিতে পারিলেই শব্দের উৎপত্তি হয়; সুতরাং ভূপঞ্জরের পূর্ব্ব বর্ণিত আন্দোলনে, ভূগর্ভস্থ বায়ু ও অপর বাষ্পীয় পদার্থ কম্পিত হইয়া যে ভয়ানক শব্দ উৎপন্ন করে, এবং শেষে উক্ত শব্দই যে কঠিন মৃত্তিকা দ্বারা সম্পূর্ণভাবে সংবাহিত হইয়া আমাদের অগোচর হয়, এ সিদ্ধান্ত বোধ হয়, অযৌক্তিক নয়। যাহাই হউক, ভূগর্ভস্থ পদার্থের আকস্মিক স্থানচ্যুতি দ্বারা যে ভূমিকম্পের শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

৭। হস্তাদি দ্বারা কর্ণপথ রুদ্ধ করিলে, যে এক প্রকার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, সেটী শ্রবণেন্দ্রিয়ব্যাপ্ত নানা শিরা ও ধমনী প্রভৃতির রক্তসঞ্চালনশব্দ। অনেক জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত বলেন,—জীব শরীরে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষের অস্তিত্ব দেখা যায়, তাহাতে চলিষ্ণু রক্ত সঞ্চিত হইলেই জমিয়া যায়, এবং পরক্ষণেই আবার উত্তপ্ত রক্ত প্রবাহের মিলনে, উহা তরলীভূত হইয়া শরীরের নানা অংশে পূর্ব্ববৎ চালিত হইতে থাকে। রুদ্ধছিদ্র কর্ণের উক্ত শব্দ কর্ণ ও মস্তকের নিকটবর্ত্তী কোষস্থ উল্লিখিত ক্রিয়া দ্বারাও অনেক সময় উৎপন্ন হইয়া থাকে।* কর্ণ মুক্তাবস্থায় থাকিলে, উক্ত শব্দ শ্রবণ না করার কারণ সহজেই বুঝা যায়;—পাঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় অবগত আছেন,—বায়ুপূর্ণ সীমাবদ্ধ স্থানের একটা প্রধান ধর্ম্ম এই যে, তন্মধ্যস্থ আবদ্ধ বায়ু কোন প্রকারে কম্পিত করিলে, কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ধ্বনি (স্থানের আয়তন অনুসারে) স্বতঃই উক্ত কম্পন হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে; আবার উক্ত নির্দ্দিষ্ট ধ্বনিগুলির অনুরূপ কোন মৃদু শব্দ, উক্ত বায়ুপূর্ণ পাত্রের নিকট উৎপন্ন করিলে,—আবদ্ধ বায়ু স্বতঃই কম্পিত হইয়া, উক্ত বহিঃস্থ মৃদুধ্বনিটাকে অতি উচ্চ করিয়া তুলে। সীমাবদ্ধ বায়ুর এই ধর্ম্মকে ইংরাজি শব্দ-বিজ্ঞান শাস্ত্রে Resonance বলে,—এই ধর্ম্ম দ্বারাই তন্তুর ঘর্ষণজাত মৃদুধ্বনি বেহালার আবদ্ধ বায়ু কম্পিত করিয়া অত্যুচ্চ ধ্বনিতে পরিণত হইয়া পড়ে। কর্ণপথ মুক্তাবস্থায় থাকিলে কর্ণকুহরস্থ আবদ্ধ বায়ু পূর্ব্বোক্ত রক্তসঞ্চালনাদির মৃদুধ্বনিকে উচ্চ করিবার উপযোগী থাকে না,—কিন্তু কর্ণছিদ্র রুদ্ধ করিবামাত্র আবদ্ধ বায়ু সেই শব্দ বৃদ্ধি করিবার শক্তি প্রাপ্ত হইয়া, উক্ত মৃদু শব্দ উচ্চতর করিয়া তুলে। বলা বাহুল্য, এতদ্ব্যতীত বাহিরের নানা গোলযোগও, অনেক সময় উক্ত মৃদুধ্বনি শ্রবণের অন্তরায় হইয়া পড়ে।

৮। পাঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় অবগত আছেন,—সাধারণতঃ বিপরীতমুখী দুই প্রবল বায়ুপ্রবাহ মিলিত হইলে, ঝটিকাবর্ত্তের উৎপত্তি হয়,—আবার তাপাদি দ্বারা কোন স্থানের বায়ু স্বল্পভার-বিশিষ্ট হইয়া ঊর্দ্ধগত হইলে এবং পার্শ্বস্থ বায়ুরাশি প্রবলবেগে উক্ত শূন্য স্থান পূরণ করিবার জন্য ধাবমান হইলে,—সাধারণ ঝটিকা দেখা যায়। স্থূল কথায় আকাশস্থ নানা স্থানের তাপবৈষম্যই স্নিগ্ধ শান্ত মলয়হিল্লোল এবং সর্ব্ববিধ্বংসী ঝটিকাবর্ত্ত,—উভয়েরই মূল কারণ। পাঠক আরও দেখিয়া থাকিবেন, নানা জাতীয় পদার্থে সমপরিমাণ তাপ প্রদান করিলে, তাহাদের উষ্ণতার পরিমাণ সমান হয় না, কতকগুলি স্বল্প তাপেই শীঘ্রই অত্যন্ত উষ্ণ হইয়া পড়ে, কিন্তু অবশিষ্ট গুলির উষ্ণতা লক্ষণ অতি অল্পই দেখা যায়; আবার নানা জাতীয় দ্রব্য ঠিক সমপরিমাণে উষ্ণ করিয়া ঠিক একই অবস্থায় রাখিয়া শীতল হইতে দিলে,—কতকগুলি শীঘ্র শীতল হইয়া যায়, কিন্তু অবশিষ্ট গুলি শীঘ্র উষ্ণতা ছাড়িতে চায় না।

সমস্ত রাত্রিই তাপ-বিকিরণ (Radiation) হওয়ায়, গ্রীষ্ম ঋতুর প্রভাতে, ভূপৃষ্ঠ ও বায়ুরাশির উষ্ণতা প্রায় সমান থাকে,—এজন্য প্রাতে স্থানীয় তাপ-বৈষম্যপ্রযুক্ত বায়ুপ্রবাহ বা ঝটিকা প্রায়ই দেখা যায় না। তার পর নিদাঘসূর্য্যের খরতাপে, বায়ু এবং ভূপৃষ্ঠ অপরাহ্ন তিন ঘটিকা পর্য্যন্ত অসমভাবে উত্তপ্ত হইতে আরম্ভ করে;—কিন্তু এই তাপের বৈষম্য তৎকালে বড় অধিক থাকে না। এজন্য নিদাঘ দ্বিপ্রহরে ঈষৎ চঞ্চল বায়ু ব্যতীত অপর কোন প্রাকৃতিক উৎপাত লক্ষিত হয় না। কিন্তু অপরাহ্নে সূর্য্য হীনতেজ হইতে আরম্ভ হইলে,—আকাশের ঊর্দ্ধস্থ বায়ুরাশি ইহার নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মানুসারে তাপ-বিকিরণ করিয়া, শীঘ্রই শীতল হইয়া পড়ে,—কিন্তু ধরাতল উক্ত স্বল্পকাল মধ্যে অধিক তাপ ত্যাগ করিতে পারে না,—কাজেই ভূপৃষ্ঠ-সংলগ্ন বায়ু অত্যন্ত উষ্ণ থাকিয়া যায়। এই প্রকারে উপরে শীতলবায়ু—এবং নিম্নে স্বল্পতার উষ্ণবায়ু থাকাতে,—নিম্নস্থ জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ুরাশি ঊর্দ্ধোত্থিত হইয়া শীতল বায়ুর সংঘাতে ঝটিকা উৎপাদন করে। গ্রীষ্ম ঋতুতে সাধারণতঃ দক্ষিণদিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে। এজন্য পূর্ব্ববর্ণিত বিশাল বায়ুরাশিদ্বয়ের সংঘাতজাত মেঘ ও ঝটিকাদির কেন্দ্র স্থান প্রায়ই উত্তরাভিমুখী হইতে দেখা যায়। বলা বাহুল্য, শীতাদি ঋতুতে হীনতেজ সূর্য্য দ্বারা ধরাপৃষ্ঠ ও বায়ুরাশি মধ্যে উক্ত তাপ-বৈষম্য ঘটিবার সুযোগ হয় না,—কাজেই তৎকালে বৈশাখের আপরাহ্নিকী ঝটিকার অনুরূপ ব্যাপারও বড় দেখা যায় না।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

---

* বিষয়টী কিঞ্চিৎ জটিল, এই সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা পাঠকসাধারণের তৃপ্তিকর হইবে কিনা, জানি না; প্রবন্ধান্তরে উপস্থিত বিষয়টী সুবিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিল। শ্রীজঃ

* * * * Such are the buzzing sounds attendant on vascular congestion of the head and ear, or on aneurismal dilatation of the vessels. Frequently even the simple pulsatory circulation of the blood in the ear, is heard.—*Physiology by W. S. Kirkes, M. D.*

প্রশ্নের উত্তর।

গত শ্রাবণ মাসের 'প্রদীপে' কয়েকটি প্রশ্ন দেখিলাম। চারিদিকের প্রাকৃতিক ব্যাপারে এত জ্ঞাতব্য বিষয় আছে যে, এক একটার অনুসন্ধানে এক এক

ব্যক্তির জীবন অতিবাহিত হইতে পারে। আমাদের অলস দেশে জ্ঞানেচ্ছা ও অন্বেষণশীলতা বড় একটা দেখিতে পাই না। তাই 'প্রদীপে' প্রকাশিত প্রশ্নগুলি পড়িয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। আশা করি, প্রষ্টা জ্ঞানেপ্সু হইয়াই এই সকল প্রশ্ন করিয়াছেন। কোন কোন পাঠককে বলিতে শুনিয়াছি যে, জ্ঞানেচ্ছা থাকিলেও উপযুক্ত পুস্তক ও উপদেশের অভাবে তাঁহারা নিরুদ্যম হইয়া পড়েন। সকল বিষয়েই পথপ্রদর্শক আবশ্যক। 'প্রদীপে'র ক্ষীণ আলোকে পথ স্পষ্ট হইতে পারে কি না, তাহা সম্পাদক মহাশয় বলিতে পারেন। কোন কোন প্রশ্নের উত্তর দুই এক কথায় শেষ হইতে পারে, আবার কোন কোনটার সম্যক্ উত্তর দিতে হইলে 'প্রদীপে' স্থানাভাব ঘটিবার সম্ভাবনা। জানি না, 'প্রদীপ' সম্পাদক এই প্রকার প্রশ্নের উত্তরের জন্য কতখানি স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহা হউক, আজ কয়েকটার উত্তর সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। বলা বাহুল্য, একই ব্যক্তি সকল প্রকার জিজ্ঞাসার উত্তরও সম্যক্ দিতে পারেন না।

১। ক্ষিতিজস্থ চন্দ্রসূর্য্যবিম্ব বড় দেখায় কেন?

প্রথমে বিষয়টা বুঝা যাউক। যখন সূর্য্য পূর্ব্বক্ষিতিজে (ক্ষিতিজ = horizon) উদিত কিংবা পশ্চিমক্ষিতিজে অস্তগত হয়, তখন নভঃস্থ বিম্ব অপেক্ষা সে বিম্ব (disc) বড় দেখায়। চন্দ্রবিম্বেও এই প্রকার প্রভেদ দেখা যায়। নভঃস্থ সূর্য্যে দৃষ্টিপাত করা সুখকর নহে। এজন্য নভঃস্থ চন্দ্রবিম্ব দেখিলে প্রভেদটা সহজে ধরা পড়ে। এখানে পুনঃ পুনঃ চন্দ্রসূর্য্য না বলিয়া কোন একটির উল্লেখ করা যাইবে।

এই প্রভেদ জানিবার আর এক সহজ উপায় এই যে, পূর্ব্বক্ষিতিজে চন্দ্রোদয় সময়ে খালি চোখে এবং কাগজের একটা নল দিয়া অন্য চোখে বিম্ব দেখা। কিন্তু খানিকক্ষণ খালি চোখে দেখিতে দেখিতে ভ্রান্তিটা চলিয়া যায়।

কেবল যে এই দুই গ্রহবিম্বেই এই প্রকার ভ্রম জন্মে, তাহা নহে। নক্ষত্রসমূহের (নক্ষত্র = constellation) উদয় ও অস্ত যাইবার সময় তাহাদিগকে বড় দেখায়। এমন কি, ক্ষিতিজের কাছের দশ, পনর অংশ (degree) যত বড় দেখায়, ঊর্দ্ধ আকাশের তত অংশ তদপেক্ষা ছোট দেখায়। ক্ষিতিজ ও খ-মধ্য (zenith) ৯০ অংশ। কোন যন্ত্র ব্যতিরেকে মনে মনে ঐ অন্তর দুই সমভাগে বিভক্ত করিতে গেলে নীচের ভাগটা প্রকৃত অপেক্ষা প্রায়ই অনেক কম করিয়া ফেলি। ক্ষিতিজ হইতে ৩০।৩৫ অংশ ৪৫ অংশের সমান বোধ হয়। এইরূপে নির্ম্মল আকাশের ঊর্দ্ধ পার্শ্ব সমুদয় দেখিলে আকাশ ঠিক গোলাকার বোধ হয় না। বিপর্য্যস্ত কটাহ বা কূর্ম্মপৃষ্ঠের মত বোধ হয়।

এই বিষয় আমরাই যে আজকাল প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহা নহে। আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষীরা ইহা লক্ষ্য করিয়া গ্রহণগণনার সময় সংস্কারবিশেষ (correction) দিতেন। বরাহমিহিরের পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় এই বিষয়ের প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাই। তিনি প্রায় দেড়হাজার বৎসর পূর্ব্বে ছিলেন। তিনিও আবার পুরাতন শাস্ত্র দেখিয়া এই বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। ব্যাপারটা এত সামান্য যে, গগনপরিদর্শক জ্যোতিষীর অজ্ঞাত থাকাই বিচিত্র হইত। পুরাতন জ্যোতিষীরা সকলেই কিন্তু ক্ষিতিজস্থ ও নভঃস্থ বিম্বের অন্তর এক মনে করিতেন না। বরাহ * লিখিয়াছেন, "ক্ষিতিজস্থ বিম্ব-ব্যাস যত কলা (minutes of arc) হইবে, তাহার দুই কলায় এক অঙ্গুল এবং খ-মধ্যস্থ বিম্বব্যাসকলার তিন কলায় এক অঙ্গুল গ্রহণ করিবে। খ-মধ্য এবং ক্ষিতিজ মধ্যবর্ত্তী আকাশে অবস্থানভেদে অনুপাত দ্বারা দৃক্ ও গণিতের ঐক্য সাধন করিবে।"

ইহার অর্থ এই যে, ক্ষিতিজেই হউক আর খ-মধ্যেই হউক, গ্রহবিম্ব একই থাকে; কিন্তু চাক্ষুষভ্রান্তিবশতঃ যখন উহাতে তারতম্য দেখা যায়, তখন গ্রহণাদি প্রত্যক্ষ করিবার সময় গণিতাগত ফলে এই ভ্রান্তির সংস্কার আবশ্যক; নতুবা গণিতের সহিত দৃকের ঐক্য হইবে না। এজন্য বরাহাচার্য্য ক্ষিতিজস্থ বিম্বের ২ কলা খ-মধ্যস্থ বিম্বের ৩ কলার সমান ধরিতে বলিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার মতে খ-মধ্যস্থ বিম্ব অপেক্ষা ক্ষিতিজস্থ বিম্ব ⅓ বৃহৎ দেখায়। অন্যান্য সিদ্ধান্তেও এই সংস্কারের উল্লেখ আছে। সূর্য্য-

* মল্লিখিত এবং সম্প্রতি যন্ত্রস্থ "আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ" নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল। আশা করি, পাঠক অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

সিদ্ধান্তমতে উদয়াস্তকালের বিম্বের ৩ কলা খ-মধ্যস্থ বিম্বের ৪ কলার সমান; শিরোমণিমতে উদয়াস্তকালের ২॥ কলা গগনমধ্যে ৩॥ কলার সমান।

শ্রীপতি ভাস্কর প্রভৃতি কেহ কেহ এই প্রত্যক্ষ ভ্রান্তির কারণ ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীপতি (খৃঃ ১০ম শতাব্দী) বলেন, "দ্রষ্টা পৃথিবীর পৃষ্ঠে অবস্থিত। সুতরাং তিনি ভূগর্ভ (centre of the earth) হইতে ভূব্যাসার্দ্ধ উচ্চে থাকেন। এই অবস্থায় তিনি নভঃস্থ সূর্য্যের নিকটস্থ হন। কেশর দ্বারা পঙ্কজ যেমন ব্যাপ্ত, নভঃস্থ সূর্য্যবিম্বও কিরণমালা দ্বারা তেমনই ব্যাপ্ত থাকে। এজন্য তৎকালে সূর্য্য সূক্ষ্ম দেখায়। কিন্তু যখন সূর্য্য ক্ষিতিজে অবস্থিত থাকে, তখন পৃথিবীর গোলতাবশতঃ সূর্য্যের কিরণসমূহ নিরুদ্ধ হয় এবং সূর্য্যও তখন দূরস্থিত থাকে। এই দুই কারণবশতঃ তখন সূর্য্য সুখদৃশ্য হয় বলিয়া তাহার বিম্ব বৃহৎ দেখায়।"

"অর্থাৎ শ্রীপতি মতে করজালের তীক্ষ্ণতার প্রভেদে বিম্ব কখনও বৃহৎ, কখনও স্বল্প দেখায়। বলা বাহুল্য, শ্রীপতি যে দুই কারণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সত্য হইলেও এস্থলে প্রযোজ্য নহে। নভঃস্থ বিম্ব ভূপৃষ্ঠস্থ দ্রষ্টার নিকটস্থ হয় এবং আবহের (atmosphere) স্থূলতার হ্রাসবশতঃ তখন কিরণসংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ইহাদের ফলে নভঃস্থ বিম্ব বৃহৎ দেখাইবার কথা। যেহেতু কোন বস্তুর প্রভা বৃদ্ধি হইলে তাহাকে নিকটস্থ সুতরাং বৃহৎ বোধ হয়। ভূষারঞ্জিত কাচখণ্ড দ্বারা ক্ষিতিজস্থ ও নভঃস্থ বিম্ব দেখিলে উভয়ই এক দেখায়। ইহাতে আপাততঃ মনে হয় যেন রশ্মির প্রাখর্য্যের তারতম্যবশতঃ প্রত্যক্ষ পরিমাণে তারতম্য ঘটে। বোধ হয়, ইহা দেখিয়াই আর্য্যগণ ঐ প্রকার ব্যাখ্যা দিয়াছেন।"

উপরে অনেকগুলি কথার অবতারণা করা গিয়াছে। বোধ করি কথাগুলি আর একটু স্পষ্ট করা আবশ্যক। দ্রষ্টা ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত। এজন্য যখন সূর্য্য তাঁহার মাথার উপরে আসে, তখন সূর্য্য তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ নিকটে থাকে এবং উদয়াস্ত সময়ে কিঞ্চিৎ দূরে থাকে। অবশ্য সূক্ষ্ম মানযন্ত্র ব্যতিরেকে এই ন্যূনাধিক্য পরিমিত হইতে পারে না। যাহা হউক, এই কারণে ক্ষিতিজস্থ বিম্ব কিছু ছোট দেখাইবার কথা। দ্বিতীয়তঃ ক্ষিতিজের নিকটে সূর্য্য থাকিলে তাহার অনেক কিরণ আবহকর্ত্তৃক শোষিত হয়, এজন্য তৎকালে তাহা সুখদৃশ্য হয়। এখানে কিরণ-প্রসারণ (irradiation) কারণ বলা হইয়াছে। প্রাতঃ ও সায়ংকালে দূরস্থ গৃহবৃক্ষাদি দেখিতে দেখিতে সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টি পড়িলে, চক্ষুতে তৎক্ষণাৎ অনেক আলোক পড়ে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু সেই প্রখর আলোকে অভ্যস্থ হয় না। খানিকক্ষণ একদৃষ্টে দেখিতে থাকিলে ভ্রান্তিটা চলিয়া যায়। একটু কোয়াসা হইলে উহা অনেকক্ষণ থাকে। এই কিরণ প্রসারণ বশতঃ রাত্রে দীপশিখা বড় দেখায়। কাগজে ছিদ্র করিয়া দীপশিখা দেখিলে উহা ছোট হইয়া যায়। কারণ ছিদ্র দিয়া শিখার কিরণ আসিবার সময় শিখার চারিপার্শ্বের অনেক কিরণ কাগজ দ্বারা নিরুদ্ধ হয়।

কাগজে ছিদ্র করিয়া কিংবা কাগজের নল দিয়া ক্ষিতিজস্থ চন্দ্র দেখিলে তাহাকে ছোট দেখি। নভঃস্থ চন্দ্রকেও ছোট দেখি। কেহ কেহ বলেন, এইরূপে দেখিলেও ক্ষিতিজস্থ চন্দ্র বড় দেখায়। কাহারও দৃষ্টিতে এই প্রকারে দেখিলে বিম্বব্যাস একই বোধ হয়। তবেই কিরণ প্রসারণ কারণ হইলে এপ্রকার বিসম্বাদ হইত না। সকলের পক্ষেই সমান দেখাইত। বস্তুতঃ উহা যে কারণ নহে, তাহার আর এক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। বেলুনে চড়িতে দেখিয়াছেন কি না, জানি না। কিন্তু দেখিয়াছি যখন বেলুনটা মাথার উপরে আসে, তখন তাহাকে ক্ষুদ্র দেখি, এমন কি হয়ত একটা কণার মত দেখি; কিন্তু তেমনই উপরে থাকিতে থাকিতে বাতাসে যখন বেলুনটা দুই তিন মাইল দূরে চলিয়া যায় এবং আমাদের পক্ষে ক্ষিতিজের নিকটস্থ হয়, তখন তাহাকেই বড় দেখি। বেলুন অবশ্য চন্দ্রসূর্য্যের মত দীপ্তিশালী নহে, কাজেই এস্থলে কিরণ প্রসারণও ভ্রান্তির কারণ হইতে পারে না।

এই ভ্রান্তির কারণ অন্য প্রকার বলা হইয়া থাকে। মধ্য আকাশে চন্দ্র থাকিলে, তাহাকেই কেবল দেখিতে পাই, তখন সেখানে আমাদের জ্ঞাত কোন বস্তু দেখিতে পাই না। কাজেই তখন চন্দ্রবিম্বকে কোন বস্তুর সহিত তুলনা করিতে পারি না। এজন্য চন্দ্রবিম্বের পরিমাণ সম্বন্ধে তৎকালে কোনও জ্ঞানই হয় না, যেমন তেমন একটা অনুমান করিয়া লই। চন্দ্র কত বড় দেখাইতেছে জিজ্ঞাসা করিলে বিভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দেয়।

কেহ বলিলেন, যেন একটা থালা, কেহ যেন একখানা রেকাব, কেহবা একটা বাটীর মত বলিবেন। যাহা হউক যখন চন্দ্র ক্ষিতিজের নিকটে থাকে, তখন দূরস্থিত গৃহ বৃক্ষাদির সহিত তাহার বিম্ব তুলনা করিতে থাকি। চক্ষুতে এই সকল জ্ঞাত বস্তুর এবং চন্দ্রবিম্বের প্রতিরূপ (image) একই সময়ে পড়ে। দূরস্থ উচ্চ বৃক্ষের প্রতিরূপ যতটুকু পড়ে, চন্দ্রবিম্বের প্রতিরূপ তদপেক্ষা একটু বড় পড়ে। কাজেই মনে হয় যেন চন্দ্রবিম্ব অনেক বড়। ইহার প্রমাণস্বরূপ বলা হইয়া থাকে যে তৎকালে কাগজের ছিদ্র দিয়া চন্দ্রবিম্ব দেখিলে কাগজের আবরণে বৃক্ষাদি দেখিতে পাই না ; কাজেই চন্দ্রবিম্ব ছোট দেখায়।

এই মানসিক ভ্রান্তিই উক্ত বিষয়ের একমাত্র কারণ বলিয়া আমার মনে হয় না। উচ্চ অশ্বত্থ বৃক্ষের পত্রাদির ভিতর দিয়া চন্দ্র দেখিলে, ক্ষিতিজের কাছে যত বড় দেখায়, একটু উপরে উঠিলে আর তত বড় দেখায় না। অথচ উভয় স্থলে সেই একই বৃক্ষের পাতার ভিতর দিয়া দেখিতে থাকি। এমন কি চন্দ্রোদয়ের সময় একখান বহির উপর দিয়া দেখি, বহির আবরণে দূরের ঘরবাড়ী কিছুই দেখি না, অথচ চন্দ্রবিম্ব বড় দেখি। কিন্তু ক্ষিতিজ হইতে একটু উপরে উঠিলে আর বড় দেখি না। এজন্য আমার মনে হয় কিরণ-প্রসারণও এই ভ্রান্তির আর এক কারণ। সুখদৃশ্য বস্তু দেখিবার সময় চক্ষুর তারা বড় হয়, সেই বস্তুই দীপ্তিমান্ হইলে তারা ছোট হয়। কাজেই উভয় স্থলে চক্ষুতে একই পরিমাণের প্রতিরূপ পড়ে না। কোন দীপশিখা ছোট বড় ছিদ্র দিয়া দেখিলে যেমন দেখায়, চক্ষুতেও তাহাই হয়। অতএব কিরণ-প্রসারণ যে কারণ নহে তাহা বলিতে পারা যায় না। বলা বাহুল্য, আবহ-বায়ু দ্বারা আলোক-বিবর্ত্তন (refraction) এই ভ্রান্তির কারণ নহে। সে কারণে বিম্বের তির্য্যগ্‌ব্যাস অপেক্ষা ঊর্দ্ধাধঃ ব্যাস ছোট দেখি। দুইটা কটাহ সম্পুটাকারে রাখিলে যেমন আকার হয়, ক্ষিতিজস্থ বিম্বের আকার প্রায় সেই প্রকার দেখা যায়।

২। রবিশশীর পরিবেষ।

সচরাচর লোকে যাহাকে 'চন্দ্র সভা' বলে, তাহার সংস্কৃত নাম পরিবেষ। এসম্বন্ধে আমাদের দেশের পুরাতন মত জানিতে কোন কোন পাঠকের কৌতূহল হইতে পারে। এজন্য আমার পুস্তক হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম।

"চন্দ্রসূর্য্যের পরিবেষ সম্বন্ধে বরাহ লিখিয়াছেন, চন্দ্রসূর্য্যের কিরণসমূহ বায়ু দ্বারা বৃত্তাকার হইয়া আকাশে অল্প মেঘে প্রতিফলিত হইলে নানা বর্ণাকৃতি দেখায়। এইরূপে বিচিত্রবর্ণাকৃতি পরিবেষ হইয়া থাকে। পরিবেষে রক্ত নীল পাণ্ডুর (আপীত) প্রভৃতি বহুবিধ বর্ণ দৃশ্য হয়, কিন্তু তন্মধ্যে তিনটি বর্ণ প্রায়ই দেখা যায়। কোনটার বৃত্ত সম্পূর্ণ কোনটার খণ্ড ; কোনটার মণ্ডল একটি কোনটার দুইটি ; ইত্যাদি। চন্দ্রসূর্য্যের পরিবেষের ন্যায় অন্য গ্রহেরও হয়।"

"চন্দ্র বা সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া যে বলয়াকৃতি দেখা যায়, তাহার সামান্য নাম পরিবেষ (halo)। চন্দ্রের পরিবেষ সহজেই দেখা যায়, কিন্তু সূর্য্যের প্রখর কিরণ বশতঃ তাহার পরিবেষ সহজে দেখা যায় না। কৃষ্ণবর্ণ রঞ্জিত কাচ ব্যবহার করিয়া সূর্য্যপরিবেষ সুখদৃশ্য হয়, এবং পরিবেষ দর্শনে অভ্যাস থাকিলে অন্যান্য গ্রহ এবং তারারও পরিবেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। আজকাল ইংরাজিতে halo ও corona মধ্যে প্রভেদ করা হইয়া থাকে। চন্দ্র বা সূর্য্যের চারিদিকে যে সকল ক্ষীণপ্রভ বিচিত্রবর্ণ বলয় দেখা যায় তাহাদিগকে corona * বলে। ইন্দ্রচাপে যেমন রক্তবর্ণ চাপের বহির্দ্দিকে থাকে, coronaতেও তাই থাকে। উহার যে বলয়টি বিম্বের নিকটে থাকে, সেটি নীলবর্ণ, শেষেরটি রক্তবর্ণ এবং মধ্যেরটি শুভ্রবর্ণ। কিন্তু haloতে অন্তর্ভাগে রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয় এবং তাহাতে বর্ণবৈচিত্র্য প্রায় থাকে না। এতদ্ভিন্ন corona অপেক্ষা halo বৃহৎ। কখন কখন অনেকগুলি বিভিন্নসংস্থিত পরিবেষ পরস্পর ছেদন করে। এই সকল ছেদস্থানে প্রতিসূর্য্য ও প্রতিচন্দ্র দৃষ্ট হয়। ইংরাজিতে ইহাদের চলিত নাম mock-sun এবং mock-moon, বিজ্ঞানের ভাষায় parhelion এবং paraselina।

"প্রতিসূর্য্যের কারণ সম্বন্ধে বরাহ বলেন যে, 'সূর্য্যোদয় হইতে এক প্রহর বেলা পর্য্যন্ত স্বল্প মেঘ সূর্য্যের সমীপস্থ হইলে তাহাতে সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইয়া দ্বিতীয় সূর্য্যবৎ প্রতীয়মান হয়। ইহাকে প্রতিসূর্য্য বা পরিধি বলে। সায়ংকালেও প্রতিসূর্য্য হইতে পারে।" ইত্যাদি।

* এই corona এবং সূর্য্যের পূর্ণ গ্রহণ সময়ে দৃষ্ট corona অবশ্য এক নহে।

দেখা যায়, পরিবেষের সঙ্গে corona অধিক মিলে। কারণ সম্বন্ধেও প্রাচীনেরা ঠিক অনুমান করিয়াছিলেন। মেঘ দুই প্রকার হইয়া থাকে, হয় অতীব সূক্ষ্ম জলকণিকার সমষ্টি কিম্বা সূক্ষ্ম তুষারকণিকার সমষ্টি। স্বল্প মেঘের জলকণিকার ভিতর দিয়া কিরণ ভঙ্গ হয়, তাহাতেই বলয়ের উৎপত্তি। কিরণ ভঙ্গের (diffraction) সময় নানাবর্ণ কিরণ বিশ্লিষ্ট হয়, তাহাতেই ইন্দ্রধনুর বর্ণের উৎপত্তি। কুয়াসা হইলে দূরস্থ দীপশিখার এই প্রকারে পরিবেষ দেখা যায়। পরিবেষের প্রথম রক্তবর্ণ বলয়ের ব্যাস প্রায়ই ২ অংশ হইতে ৬ অংশ হইয়া থাকে এবং ১৬ অংশের অধিক দেখা যায় না। দুই তিনটি বলয় হইলে, দ্বিতীয়টির ব্যাস প্রথমটির দ্বিগুণ, তৃতীয়টির ব্যাস তিনগুণ অধিক হইয়া থাকে। সূর্য্যের কিংবা চন্দ্রের ব্যাস প্রায় অর্দ্ধ অংশ। ইহা হইতে পরিবেষের ব্যাস কতকটা পরিমিত হইতে পারে।

পরিবেষের ব্যাস নিয়ত এক থাকে না। মেঘের জলকণিকা যেমন ছোট বড় হইতে থাকে, তেমনই পরিবেষের ব্যাসের তারতম্য হয়। এজন্য পরিবেষ দেখিয়া আকাশের অবস্থা জানিতে পারা যায়। যদি পরিবেষ প্রথমে বড় থাকিয়া পরে ছোট হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে জানা যায় যে জলকণিকা সমূহ বড় হইতেছে, কাজেই বৃষ্টি সম্ভাবনা ; যদি পরিবেষ বড় হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে জলকণিকা ছোট হইতেছে এবং মেঘও বাষ্পীভূত হইতেছে।

Halo অর্থে পরিধি করায় দোষ হইবে না। কেননা halo হইতেই প্রতিসূর্য্য বা পরিধির উৎপত্তি। যাহা হউক, পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, পরিবেষ অপেক্ষা পরিধি বৃহত্তর। কিন্তু পরিবেষের ব্যাসের যেমন স্থিরতা নাই, পরিধির সেরূপ নহে। ইহার ব্যাস ৪৫ অংশ কিংবা ৯২ অংশ হইয়া থাকে। এক সময়ে এই প্রকার দুইটা পরিধি প্রায় দেখা যায় না। সূর্য্যের পরিধিতে ইন্দ্রধনুর বর্ণ দেখা যায়, নীলবর্ণ শেষের দিকে থাকে। চন্দ্রের আলোক কম বলিয়া চন্দ্রের পরিধিতে ইন্দ্রধনুর বর্ণ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, মেঘের হিমানী কণিকায় কিরণ পড়িয়া পরিধি হইয়া থাকে। হিমানীকণিকা ষট্‌কোণ ; তাহার ভিতর দিয়া আলোক গেলে কতখানি বাঁকিয়া যায়, তাহাও জানা আছে। এই দুই বিষয় অবলম্বন করিয়া পরিধির ব্যাস গণনা করিলে প্রায় ৪৫ অংশই আসে। রক্তবর্ণ অপেক্ষা নীলবর্ণ কিঞ্চিৎ অধিক বিবর্ত্তিত (refracted) হয়। এজন্য পরিধির শেষ দিকে নীলবর্ণ দেখা যায়।

পরিবেষের ন্যায় পরিধি দেখিয়া আকাশের অবস্থা জানিতে পারা যায়। য়ুরোপে অল্পদিন হইল এ বিষয়ে দৃষ্টি পড়িয়াছে। আমাদের দেশে পূর্ব্বকালে এ বিষয় সবিশেষ বিবেচিত হইত। পরিধির উদয়ে নাকি ঝড়ের সম্ভাবনা বুঝায়। পরিবেষ পরিধি প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়া উহাদের উদয়কাল, মেঘের আকার, আকাশের অবস্থা লিপিবদ্ধ করিতে থাকিলে আবহবিদ্যার (meteorology) সবিশেষ উন্নতি হইতে পারে ; অথচ এ সকলের জন্য অধ্যবসায় ও চক্ষু ব্যতীত কোন যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না।

৩। পশ্চিমে ঝড়।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বঙ্গদেশে যে ঝড় বৃষ্টি হয়, তাহা অপরাহ্নেই হয় কেন ? এই সময়ে কোন দিন গরম ও নির্বাত হইলে অপরাহ্নে প্রায় ঝড় হইয়া থাকে। এজন্য লোকে 'কাল বৈশাখীর' অপরাহ্নে দূরদেশে যাত্রা করে না। বঙ্গদেশের কোন স্থানে ঐ ঝড় পশ্চিমে কোন স্থানে বা পশ্চিমোত্তরে বহিতে থাকে। এই ঝড়ের কারণ কি এবং কেনই বা পশ্চিম হইতে আসে ?

এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক। কোন ঝড়ের কারণ নির্ণয় করার তুল্য দুরূহ বিষয় আবহবিদ্যায় অল্পই আছে। ঝড়ের কারণ মোটামুটি জানা থাকিলেও বলিতে পারা যায় না, এই ঝড়টি কেন এই প্রকার। 'মোটামুটি' বলিলাম, কেননা এত ছোট বড় কারণ ঝড়ের সহিত জড়িত রহিয়াছে যে, সমুদয়ের ফল বিচার করা দুর্ঘট। বায়ু যদি সর্ব্বত্র সমান উষ্ণ এবং সমান আর্দ্র হইত, তাহাহইলে তাহা নিশ্চল থাকিত। কিন্তু এই নিশ্চলতার দুইটি প্রধান অন্তরায় সর্ব্বদা বর্ত্তমান রহিয়াছে। বিভিন্ন স্থানের বায়ু কদাপি সমান গরম হয় না। যখন কোন স্থানের বায়ু অধিক উষ্ণ কিংবা অধিক আর্দ্র হইয়া উঠে, অন্য স্থানের বায়ু অপেক্ষা তাহা লঘু হওয়াতে ঊর্দ্ধগামী হয়। তখন চারিদিকে ভারী

বায়ু আসিয়া ঊর্দ্ধগামী বায়ুর স্থান পূরণ করিতে থাকে। ঝড় বাতাসের ইহাই মুখ্য কারণ। অন্য রকমে বলিতে হইলে বলা যায় যে, যে স্থানে বায়ুর চাপ কম তাহার দিকে বেশী চাপের বায়ু বহিতে থাকে, যেন কোন স্থানে বায়ু স্তূপীকৃত কোন স্থানে বা স্বল্প। উচ্চ জল যেমন নিম্নগামী হয়, উচ্চ বায়ুও তেমনই নিম্নগামী হয়। বস্তুতঃ যদি আবহের উপরে উঠিয়া দেখা সম্ভব হইত, তাহা হইলে দেখিতাম যে উহার উপরে কোথাও বায়ুর পাহাড় পর্ব্বত কোথাও বা নিম্ন উপত্যকা রহিয়াছে।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের পশ্চিমে ঝড় এক সময়ে অনেক খানি স্থানে বহিলেও স্থানীয়। এখন এখানে ঝড় বহিতেছে, দুই দশ ক্রোশ দূরে হয়ত নাই। এইরূপ কেন হয়, তাহা বলা কঠিন। তবে দেখা যায়, এ সময়ে বঙ্গদেশে দক্ষিণ কিংবা পূর্ব্ব দক্ষিণদিক্ হইতে বাতাস বহিতে থাকে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এ সময়ে পশ্চিম দিক্ হইতে বহে। তথাকার এই নীচের পশ্চিমে বাতাস বঙ্গদেশে উপরে বহিতে থাকে। বঙ্গদেশের নীচের বায়ু এ সময়ে উষ্ণ ও আর্দ্র, কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলের বায়ু অপেক্ষাকৃত শীতল ও শুষ্ক। তবেই বঙ্গদেশের উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু যেমন উপরে উঠিতে থাকে, উপরের শীতল বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া শীতল হইয়া পড়ে। ইহাতেই মেঘের উদয় ও বৃষ্টি হয়। আর এক কথা। নীচে যেদিকে বাতাস বহিতে থাকে, উপরে তাহার বিপরীতদিক্ হইতে বহে। এজন্য উভয়ের সংঘর্ষে বায়ুর আবর্ত্তের উৎপত্তি। ঝড় মাত্রেই বায়ুর আবর্ত্ত। সেই বায়ু-আবর্ত্তই ঘুরিতে ঘুরিতে আর্দ্র বায়ুর স্থানের দিকে বহিতে থাকে! যাহা হউক, দেখা যাইতেছে, বিলক্ষণ গ্রীষ্ম না হইলে বায়ুর উল্লিখিত অবস্থা হইতে পারে না। রাত্রে বায়ু উষ্ণ হয় না। কাজেই প্রাতঃকালে এই সকল স্থানীয় ঝটিকা প্রায় হয় না।

'প্রদীপে' প্রকাশিত ৮টি প্রশ্নের মধ্যে এই তিনটী আবহসম্বন্ধীয়। ইহাদেরই উত্তর করিতে 'প্রদীপের' অনেক খানি স্থান লইয়াছি। অন্য প্রশ্নে আজ হাত দিলে সম্পাদক মহাশয় নিশ্চিত 'স্থানাভাব' বলিতে বাধ্য হইবেন। ইতি।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

আনন্দমোহন বসু।

বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর প্রতি অনেকের অভিযোগ এই যে, ইহা আমাদের গন্তব্য পথ উত্তমরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছে, সেই পথ সমুচিতরূপে সর্ভে করিয়া তাহার উৎকৃষ্ট ম্যাপ ও 'গাইড বুক' প্রস্তুত করিয়াছে, এমন কি পথিকদিগের সুবিধার জন্য সে পথে রেল পাতিয়া দিয়াছে, কিন্তু যে ষ্টীম বা বাষ্পের সাহায্যে লোক সে পথে সত্বর অগ্রসর হইবে, সে ষ্টীম যোগাইতে পারে নাই; মনুষ্যত্ব ও মহত্বের আদর্শ চক্ষের সমক্ষে আনিয়াছে, কিন্তু মনুষ্যত্ব ও মহত্বে উঠিবার শক্তি দিতে পারে নাই; বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ভাল কথা আমাদের হাতে আনিয়া দিয়াছে, কিন্তু যে মানসিক আবেগে মানুষ ভাল হয়, সে আবেগ উৎপন্ন করিতে পারে নাই। বলিতে গেলে বর্ত্তমান শিক্ষা জ্ঞানরাজ্যেই আবদ্ধ আছে, হৃদয়রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই। যে মানসিক আবেগের কথা বলিতেছি, তাহা হৃদয়রাজ্যেরই কথা। প্রেম হইতেই আবেগ উৎপন্ন হয়; প্রেমের উৎস হৃদয়ে। জ্ঞানের সাধ্য নাই যে মানুষকে পরার্থে বা পরমার্থে অভিনিবিষ্ট করে; সেটা প্রেমের কাজ।

যদি কেবলমাত্র বিচারের উপর নির্ভর করি, পরার্থ প্রবৃত্তির কারণ খুঁজিয়া পাই না, যেহেতু স্বরক্ষা ও স্বপরিপোষণ, কি উদ্ভিদরাজ্যে কি প্রাণিরাজ্যে, সর্ব্বত্রই স্বভাবের নিয়ম। ইহা যদি সত্য হয়, এ জগতে সবল সর্ব্বদাই দুর্ব্বলকে সংহার করিতে চাহিতেছে, তাহা হইলে বুদ্ধির বিচারে আত্ম-রক্ষাই সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। আত্মরক্ষা স্বভাবেরও কার্য্য। প্রবল মানসিক আবেগ ভিন্ন এই স্ব-তৎপরতাকে পর-তৎপরতাতে পরিণত করিতে পারে না। সে আবেগের উৎস হৃদয়ের গভীর অন্তস্তলে; মানবের ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির মধ্যে। বর্ত্তমান শিক্ষা বাহিরের জ্ঞানকে স্পর্শ করিয়াছে, সেই অন্তস্তলকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

সৌভাগ্যক্রমে এ জীবনে কতকগুলি লোক দেখিয়াছি, যাঁহাদের শিক্ষা জ্ঞান ও প্রেমকে অধিকার করিয়াছে। আমার হৃদয়ের অকপট প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন যৌবনসুহৃৎ আনন্দমোহন বসু মহাশয় ইহার একজন। ইনি কি, তাহা যাহারা দেখিতে ও জানিতে চান, তাঁহারা ইহাকে গৃহ

পরিবারে, বন্ধুবান্ধবের মধ্যে আসিয়া দর্শন করুন। অনেক সময় ভাবি, আনন্দমোহনের গভীর বিদ্যা ও ক্ষুরধারসমান বুদ্ধির অধিক প্রশংসা করিব, কি তাঁহার হৃদয়ের কোমলতা ও সাধুতার অধিক প্রশংসা করিব! কেবলমাত্র বিদ্যা বুদ্ধির দিক্ দিয়া দেখিলে আনন্দমোহন বঙ্গদেশে অদ্বিতীয়। বিদ্যালয়ে পদার্পণের দিন হইতে খ্যাতি তাঁহাকে বরণ করিয়াছে। অতি শৈশবে তিনি বাঙ্গালা স্কুলে পড়িয়া, ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিয়া বৃত্তি পাইয়াছিলেন। তৎপরে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে, পঞ্চদশ বৎসর বয়সে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষাতে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দশটী বৃত্তির মধ্যে একটী প্রাপ্ত হইলেন। তৎপরে কলিকাতায় আসিয়া এল্,এ ও বি,এ পরীক্ষাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্থান অধিকার করিলেন; গণিতে এম্,এ পরীক্ষা দিয়া সর্ব্বাগ্রগণ্য হইলেন এবং তাঁহাকে উপাধি দিবার সময় ভাইস চ্যানসেলার বলিলেন যে, গণিতের প্রশ্নের তিনি যে উত্তর দিয়াছেন, ইংলণ্ডের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রগণ তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে উত্তর দিতে পারে না। তৎপরে রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি লইয়া তিনি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে গমন করিলেন; এবং সেখানে চারি বৎসর থাকিয়া কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রেঙ্গ্লার' উপাধি লইয়া স্বদেশে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

তদবধি তাঁহার আর বিশ্রাম নাই। একটীর পর একটী দেশহিতকর কার্য্যে লিপ্ত হইয়া আপনার সমগ্র শক্তি তাহাতে নিয়োগ করিতেছেন। আমরা ভিতরের কথা জানি, আমরা জানি এজন্য তাঁহার অবলম্বিত বারিষ্টারি কার্য্যের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে, তিনি কখনই সে কার্য্যে সম্পূর্ণ মনোনিয়োগ করিতে পারেন নাই। দেশে ফিরিয়াই ১৮৭৫ সালে ছাত্রদিগকে লইয়া একটী ছাত্রসভা স্থাপন করিলেন। ওদিকে কিছুদিন পরে কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে রাজনীতির চর্চ্চার উদ্দেশে 'ভারতসভা' নামে এক সভা স্থাপন করিলেন। এই সভা স্থাপন বিষয়ে ইনি যে পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাহা কেবল আমাদের ন্যায় অন্তরঙ্গ বন্ধুরাই জানেন, কারণ তাঁহারাই তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, প্রথম কয়েক বৎসর ইনিই ভারতসভার প্রাণ ও প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ১৮৭৬ সালে মহিলাগণের উচ্চশিক্ষার উদ্দেশে ইহার বন্ধু দুর্গামোহন দাসের সহিত সম্মিলিত হইয়া 'বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়' নামে একটী উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। তাহার অধিকাংশ ব্যয়ভার ইঁহারা দুই বন্ধুতে বহন করিতেন। ১৮৭৮ সালে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপিত হয়, তাহার উদ্যোগকর্ত্তাদিগের মধ্যে ইনি একজন প্রধান ছিলেন। ১৮৭৯ সালে সিটী স্কুল স্থাপিত হয়, ইনিই তাহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। উক্ত স্কুলের স্বত্বাধিকারিত্বে ইনি অনেক সহস্র টাকা নিজে ঋণ করিয়া দিয়া একটী বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। মনে করিলে অপরাপর সত্বাধিকারীর ন্যায় ইনি ঐ বিদ্যালয়কে আপনার অর্থাগমের এক উপায়স্বরূপ করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি কলেজটী কয়েকজন ট্রষ্টীর হাতে দিয়া উহাকে সাধারণের সম্পত্তি করিয়া দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি কয়েকবার কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল কমিশনাররূপে মনোনীত হন, দুইবার ছোটলাট বাহাদুরের সভার সদস্যরূপে মনোনীত হন, লর্ড রিপণ বাহাদুর যে শিক্ষাসম্বন্ধীয় কমিশন নিয়োগ করেন, ইনি তাহার অন্যতম সভ্য নিযুক্ত হন; ১৮৭৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোরূপে মনোনীত হন। এই সকল পদেই তিনি যথাশক্তি স্বদেশের কল্যাণ সাধনে আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। সর্ব্বত্রই অকুতোভয়ে আপনার বিশ্বাস ও ধর্ম্মবুদ্ধি অনুসারে কার্য্য করিয়াছেন। কাহারও অনুরাগ বিরাগের প্রতি দৃক্পাত করেন নাই।

পূর্ব্বোক্ত কার্য্যগুলি সাধন করিতে কিরূপ শ্রমের প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। আমরা অনেকে সাক্ষ্য দিতে পারি যে, এই সকল বিষয়ে তাঁহার সহিত খাটিতে খাটিতে আমরা অনেকে ক্লান্ত হইয়া গিয়াছি, তাঁহার ক্লান্তির চিহ্ন কখনও দেখি নাই। কতদিন প্রায় সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, নিদ্রাবেশে আমরা কাতর হইয়া পড়িয়াছি, তিনি অক্লান্তভাবে বসিয়া কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। স্বদেশের জন্য, অপরের জন্য, চিন্তা ও শ্রম করা তাঁহার একটা নেশা। একদিন এক ঘণ্টা বৃথা যাপন করিলে বা আলস্যে কাটাইলে, তাঁহাকে সমস্ত দিন হায় হায় করিতে দেখিয়াছি। অধিক কি গুরুতর শ্রমের জন্য আনন্দমোহন অকাল বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইতেছেন।

এত বৎসরের শ্রমের পর বিগত বৎসর যখন ইংলণ্ডে গমন করিলেন, তখন তাঁহার পরিবার পরিজন, ও আত্মীয় বন্ধুগণ প্রীত হইলেন ; ভাবিলেন, অনেকদিনের শ্রমের পর কিছুদিনের বিশ্রাম ঘটিবে এবং অপরিমিত পরিশ্রম হেতু তিনি যে রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন, জর্ম্মানিতে যাইয়া তাহার চিকিৎসা করিতে পারিবেন।

এস্থলে বলা বোধ হয় অনাবশ্যক হইবে না যে, বিলাতে ভারতবর্ষীয় রাজনীতির আন্দোলন সম্বন্ধে আনন্দ বাবুই একজন প্রথম নেতা। প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে তিনি ব্রাইটনে এক বক্তৃতা করেন, অনেক ইংলণ্ডবাসী এখনও সেই অদ্ভুত বাগ্মিতার কথা বলিয়া থাকেন। কিয়দ্দিন পূর্ব্বে সারজন লাবকের (Sir John Lubbock) বাড়ীতে পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বরদের এক ভোজ হয়। তাহাতে একজন বিখ্যাত মেম্বর বলিয়াছিলেন যে, আনন্দমোহন পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করিলে তাঁহার বাগ্মিতায় ইংলণ্ড চমৎকৃত হইত। সুবিখ্যাত ভারতবন্ধু ফসেট সাহেব সর্ব্বদা বলিতেন যে, ভারতের দুর্ভাগ্য যে আনন্দমোহনকে দেশে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছে। নতুবা ইংলণ্ডে থাকিলে তিনি একদিন রাজমন্ত্রী হইতে পারিতেন, এবং বিলাতে থাকিয়া ভারতবর্ষের অনেক রাজনৈতিক দুর্দ্দশা ঘুচাইতে পারিতেন।

আনন্দমোহন বাবু যখন গতবৎসর বিলাতে পৌঁছেন, তখন ভারতবর্ষের দুর্গতির পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল। রয়টার ও টাইম্‌স্ পত্রিকায় প্রকাশিত মিথ্যা টেলিগ্রাম সকল পাঠ করিয়া ভারতবর্ষের উপর ইংরাজ জাতির বিরাগ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছিল। দূর হইতে ইংরাজগণ ভাবিতে লাগিলেন যে, বুঝি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের ন্যায় আর এক বিদ্রোহ উপস্থিত। বিলাতে একদিন টেলিগ্রাম বাহির হইল যে, কলিকাতার সমস্ত কসাই ইংরাজ মহিলা ও বালক বালিকাদিগকে বধ করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছে। সকলে অনুমান করিতে পারেন, এরূপ চিত্তবিক্ষেপকর সংবাদ শ্রবণে সাধারণ প্রজাকুলের মন কিরূপ আন্দোলিত হইবার সম্ভাবনা। ইংলণ্ডের লোক ভাবিতে লাগিল, না জানি ভারতবর্ষ কিরূপ দেশ, সেখানকার প্রজারা এতদিনের সুশাসনের ফল ভোগ করিয়াও কিছুমাত্র কৃতজ্ঞ নহে, প্রত্যুত সেই উপকারী জাতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পতাকা উড্ডীন করিতেছে! এই ভাবিয়া তাহাদের মনে এদেশীয়দিগের প্রতি ঘোর বিদ্বেষ উৎপন্ন হইতে লাগিল। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া আনন্দমোহন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ইংলণ্ডের লোককে প্রকৃত কথা জানাইবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন।

বিলাতে রাজনৈতিক আন্দোলন কত ব্যয়সাধ্য তাহা আমরা এখানে বসিয়া কল্পনাও করিতে পারি না। তিনি যে সকল সভাতে উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা করিতে লাগিলেন, যদিও তাহার প্রধান ব্যয় উদ্যোগকর্ত্তৃগণ বহন করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু সর্ব্বত্র গতায়াত করা, লোকের সহিত সাক্ষাৎ করা ও অপরাপর আয়োজনে তাঁহার প্রচুর অর্থ ব্যয়িত হইতে লাগিল। তিনি আনন্দিত অন্তরে সেই সমুদয় শ্রম ও ব্যয় বহন করিতে লাগিলেন। গুরুতর শ্রমে তাহার শরীর দিন দিন রুগ্ন ও ভগ্ন হইতে লাগিল। তথাপি তাঁহার শ্রম ও উৎসাহের বিরাম হইল না। তিনি যখন দেশে ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া বন্ধুগণ অনুভব করিলেন যে বার্দ্ধক্য বাড়িয়াছে ও শরীরের শক্তি কমিয়াছে। তাঁহার স্বাস্থ্য যে কতদূর ভগ্ন হইয়াছে তাহার প্রমাণও আমরা ত্বরায় পাইলাম। তাঁহার অভ্যর্থনার্থ ১৬ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা টাউনহলে যে মহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে বলিতে গিয়া তিনি দুর্ব্বলতা দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়িলেন। আশু তাঁহার প্রাণনাশের আশঙ্কাতে সভা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

বল স্বদেশের এমন হিতৈষী মিত্র কতজন আছে, বল এত অল্প দিনে এত কাজ কে করিয়াছেন ? কিন্তু আনন্দমোহনের কথা যখন ভাবি তখন এই বিদ্যাবুদ্ধি অথবা এই সকল কাজের কথা আমাদের মনে আসে না। বাহিরের লোকের মনে আসিতে পারে, বন্ধুদের মনে আসে না। আনন্দমোহন কি মানুষ তাহাই আমাদের মনে হয়। অসত্যময়, অসারতাময়, প্রদর্শনময় জগতে আনন্দমোহন প্রদর্শনবিহীন সাধুতা। চক্‌চকে গিল্টীর বাজারে আনন্দমোহন খাঁটি সোণা। যখন অপর লোকে বলিবার কহিবার, মুখে খৈ ফুটাইবার ও ফাকা আওয়াজ করিবার জন্য ব্যস্ত, তখন আনন্দমোহন কাজ করিবার জন্য ব্যস্ত। সকলের পিছনে থাকিয়া, বন্ধুদের আড়ালে লুকাইয়া কাজ করিবার জন্য ব্যস্ত! ইংরাজীতে একটা কথা শুনিয়াছি

self-effacement অর্থাৎ আত্ম-বিলোপ, তাহার অর্থ আনন্দমোহনে দেখিয়া শিখিয়াছি। নিজের গৌরব অপরকে দিয়া আনন্দমোহন কাজ দেখিয়াই সুখী। কাজের প্রতি দৃষ্টি এবং ঈশ্বরে নির্ভর বলিয়াই লোকের ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষ, বিরাগের প্রতি আনন্দমোহনের দৃষ্টি নাই। তাঁহার অতি বড় শত্রুর নিন্দার কথা একটীও তাঁহার মুখে কখনও শুনি নাই, বরং আমরা নিন্দা করিলে তিনি তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করিয়া থাকেন!

আনন্দমোহন ক্ষুদ্র চিন্তা, ক্ষুদ্র কথা, ক্ষুদ্র কাজ লইয়া থাকেন না, থাকিবার অবসরও নাই। একদিকে তাঁহার বুদ্ধি ক্ষুরধারসমান তীক্ষ্ণ, বিষয়কর্ম্মে তিনি সুচতুর, কিন্তু ক্ষুদ্রাশয় ব্যক্তিরা নিকৃষ্ট অভিসন্ধিতে কিরূপ বাঁকা পথে চলে তিনি তাহা বুঝিতে পারেন না, কারণ সেরূপ পথ তিনি জীবনে কখনও দেখেন নাই। আমরা অনেকে পাপ কি তাহা দেখিয়াছি, জানিয়াছি, ভুগিয়াছি, এক্ষণে পাপের সহিত সংগ্রাম করিয়া পুণ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু আনন্দমোহন পবিত্র চিত্ততাতে শিশু! বলিতে কি তাঁহার পবিত্র চিত্ততাই তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুদিগের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা মনোমুগ্ধকারী সদ্‌গুণ।

সাধুতার প্রতি ও সাধুজনের প্রতি তাঁহার ভক্তি এমনি প্রগাঢ় যে, লোকে ঈশ্বরোপাসনা করিয়া সচরাচর যে ফললাভ করে, তিনি সংবাদপত্রের স্তম্ভে একটী ভাল কথা পড়িয়া অনেক সময় সেরূপ ফললাভ করিয়া থাকেন। একটী ভাল কথা শুনিলে তাঁহার মন একেবারে গলিয়া যায়। সাধুভক্তি তাঁহাদের বংশের গুণ। তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়ে আশ্চর্য্য সাধুভক্তি দেখিয়াছি। তাঁহার আরাধ্যা জননী দেবী এমনি সাধুভক্তিসম্পন্না ছিলেন যে, তিনি হিন্দু রমণী হইয়াও কখনও মুসলমান পীরের সমাধির সম্মুখ দিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া যাইতেন না। নামিয়া গলবস্ত্রে সমাধিক্ষেত্র প্রদক্ষিণ করিয়া তবে অপর পাড়ে গিয়া গাড়িতে উঠিতেন। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন—"সাধুর আবার হিন্দু মুসলমান কি ?" আনন্দমোহনও সাধুজনের সাধুতা দেখিলে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ব্রাহ্মের বিচার রাখেন না। তিনি ব্রাহ্মদিগের আচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চরণে যে ভাবে ভক্তিতে অবনত, জেনারেল বুথের চরণেও সেই ভাবে ভক্তিতে অবনত।

আনন্দমোহনের এই নির্ম্মল সাধুতা, এই অবিশ্রান্ত কার্য্যতৎপরতা ও এই অক্লান্ত পরহিতৈষণার পশ্চাতে একটী সঙ্কেত আছে, সেটী এই,—তিনি আপনার জীবনকে ঈশ্বরের গচ্ছিত নিধি স্বরূপ মনে করেন। তিনি সর্ব্বদাই অনুভব করেন যে, গচ্ছিত ধনের রক্ষা ও সদ্ব্যবহার না করিলে যেমন অপরাধ হয়, তেমনি এ জীবনকে ঈশ্বরের কাজে না লাগাইলে পাপী হইতে হয়। আমরা বাহিরের আনন্দমোহনকে কাজে কর্ম্মে দেখি, ভিতরের আনন্দমোহন ধনীর ঘরের দ্বারবানের ন্যায়, কৃতাঞ্জলিপুটে প্রভুর সন্নিধানে সর্ব্বদা দণ্ডায়মান, কখন কি হুকুম হয়। কিছুমাত্র অত্যুক্তি করিতেছি না। জীবনটাকে গচ্ছিত সম্পত্তি ভাবেন বলিয়াই এক ঘণ্টার আলস্য করিলে মনটা এত ম্লান হইয়া যায়। ঈশ্বরের ইচ্ছা সাধনে আপনার জীবনের সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার প্রাণে যেন আগুনের মত জ্বলিতেছে। যতই খাটেন, মন বলে এখনও অবশিষ্ট আছে। এ বিষয়ে আনন্দমোহন জগতের মহৎ ব্যক্তিদের মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য। এ জগতে মহামতি গ্লাডষ্টোনের ন্যায় যে সকল কর্ম্মযোগী পুরুষ জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের চরিত্রের ভিতরকার সঙ্কেত এই—সাধারণ লোকে ভাবে জীবনের কি কি কর্ত্তব্য, ইঁহারা ভাবেন জীবনটাই কর্ত্তব্য। ইহাকে জ্ঞানে উন্নত না করিলে পাপ, কর্ত্তব্যসাধনে দৃঢ় না করিলে পাপ, বিবিধ সদনুষ্ঠানে পূর্ণ না করিলে পাপ। এই দুর্ভাগ্য দেশে জীবনের এই মহৎভাব ধারণ করিবার লোক এখনও অধিক জন্মে নাই। আনন্দমোহনের মত মানুষ এ বিষয়ের শিক্ষা গুরু, এই জন্যই তাঁহাকে ভালবাসি। তাঁহার সমগ্র চরিত্র প্রগাঢ় ধর্ম্ম বিশ্বাসের উপরে স্থাপিত ; তিনি লজ্জানত মুখ ফুটিয়া অনেক সময়ে ঈশ্বরের স্তুতি করিতে পারেন না, কিন্তু তাঁহার জীবনটাকেই ঈশ্বরের স্তুতি করিয়া তুলিয়াছেন। আমি বলি তাহার জীবনটা তান লয় সংযুক্ত অরগ্যাণের সংগীত, তাহাতে গাম্ভীর্য্য সম্বলিত ভক্তিও আছে, আবার হৃদয়-দ্রবকারী মিষ্টতাও আছে।

উপরে কর্ম্মযোগী পুরুষের উল্লেখ করিয়াছি। দেশের বর্ত্তমান অবস্থাতে কর্ম্মযোগী পুরুষদিগের বড়ই প্রয়োজন হইয়াছে। প্রাচীন সংস্কৃত কবি বলিয়াছেন, লক্ষ্মী উদ্যোগী পুরুষ সিংহকেই বরণ করিয়া থাকেন। জগতের ধনধান্য

তোমার জন্যও আছে, অপরের জন্যও আছে, মহৎ কীর্ত্তি ও মহৎ কাজ তোমার জন্যও আছে, অপরের জন্যও আছে, যে উদ্যোগে অগ্রসর সেই অগ্রে তাহা অধিকার করিয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে দেখা যাইতেছে সমুদয় কৃষ্ণকায় ও পীতকায় জাতি শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয়গণের করকবলে পতিত হইতেছে; আফ্রিকা দেশের কৃষ্ণকায় জাতি সকল একটীর পর একটী ইউরোপীয় জাতি সকলের দাসত্ব স্বীকার করিতেছে, মধ্য আসিয়া, রুসিয়া ও দক্ষিণ আসিয়া ইংলণ্ড দুইদিক হইতে চাপিয়া আসিয়া দেশীয় জাতি সকলকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিয়াছেন। ইহার মূলে উদ্যোগ। ইউরোপীয়গণ উদ্যোগে অগ্রসর। কর্ম্মশীলতা ইউরোপীয় চরিত্রের প্রধান গুণ। অপর দিকে উদ্যোগ ও কর্ম্মশীলতার অভাব আমাদের চরিত্রের প্রধান গুণ। কাজেই উভয়ের সমাগমে একের জয় ও অপরের পরাজয় ঘটিতেছে। আনন্দমোহনের জীবনে প্রাচ্য প্রেম ভক্তি ও প্রতীচ্য কর্ম্মশীলতা অপূর্ব্বভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, ইহাতেই তাঁহাকে অনেক পরিমাণে আমাদের আদর্শ স্থানীয় করিয়াছে।

আবার বলি, যে কতিপয় ব্যক্তির চরিত্রে জ্ঞান ও প্রেমের দিক্ যুগপৎ ফুটিতে দেখিয়াছি, আনন্দমোহন তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান। বর্ত্তমান শিক্ষা যদি এ ছাঁচের মানুষ অধিক গড়িতে পারে, তবে তাহার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হউক।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল।

সুপণ্ডিত বহুশ্রুত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় কিয়ৎকাল মালদহ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ঘটনা বশতঃ তাঁহার সহিত আমার আলাপ হয়। আলাপের পর হইতে তিনি আমাকে ভাল বাসিতেন। তিনি মধ্যে মধ্যে আমাকে ডাকিয়া পাঠাইতেন এবং আমার সহিত ধর্ম্ম, সাহিত্য, আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অসঙ্কোচে আলাপ করিতেন। আমার ন্যায় সামান্য লোকের প্রতি তাঁহার সসম্মান ব্যবহার দর্শনে অনেকে বিস্মিত হইয়াছিলেন।

আমি সংক্ষিপ্ত ভারতাখ্যান নামক পুস্তক রচনা করিয়াছিলাম। উহা তাঁহাকে দেখাইবার জন্য লইয়া যাই। তিনি পুস্তকের কিয়দংশ পাঠ করিয়া বলিলেন, "পুস্তকের ভাষা মন্দ হয় নাই। একটা কাল্পনিক বিষয় অবলম্বনে পুস্তক রচনা না করিয়া, কোন বাস্তবিক বিষয় অবলম্বন করিয়া পুস্তক লিখিলে আমি অধিকতর সন্তোষ লাভ করিতাম।" আমি বলিলাম, মহাভারতে বিস্তর কাল্পনিক বিষয় আছে বটে, কিন্তু উহার মূল ঘটনার ঐতিহাসিকতা আছে। তিনি বলিলেন, "আমি মহাভারতকে জগতের অদ্বিতীয় গ্রন্থ বলিয়া বিশ্বাস করি। উহাতে ভারতীয় আর্য্যসমাজের ভিন্ন ভিন্ন সময়ের আচার ব্যবহার জ্ঞান ধর্ম্মের বিস্তর কথা আছে। উহাতে এত নীতিকথা আছে যে, তাহার সংখ্যা হয় না। কিন্তু উহার পঞ্চপাণ্ডব, দ্রৌপদী, ভীষ্ম, দ্রোণাদি সম্পূর্ণ কাল্পনিক।" আমি বলিলাম, আপনি কোন্ প্রমাণে এমত সর্ব্বজন বিশ্বাসনীয় ব্যক্তিও ঘটনাগুলিকে কাল্পনিক বলেন? তিনি বলিলেন, "আপনার সঙ্গে আমার তর্ক করিতে হইল। আপনি রাজসূয় যজ্ঞের কথা ধরুন্। আমি বলি, যুধিষ্ঠির নামক কোন রাজা রাজসূয় যজ্ঞ করেন নাই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে কতক গুলি রাজসূয় যাজী রাজার নাম আছে। তাহাতে জন্মেজয় পরীক্ষিৎকে রাজসূয় যাজী বলা হইয়াছে। মহাভারতের মতে যুধিষ্ঠির, জনমেজয় পরীক্ষিতের পূর্ব্বপুরুষ। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়, এক বিখ্যাত ঘটনা। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে তাহার উল্লেখ না থাকার কারণ কি? অনেক আরণ্যক ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থে কুরু পঞ্চালবাসিগণের আচার ব্যবহার ও রাজগণের বিবিধ বৃত্তান্ত প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু পাণ্ডবদের নাম নাই কেন? এইজন্য আমার বিশ্বাস; পাণ্ডবগণ রাজসূয়যজ্ঞ, এমন কি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধও কবির কল্পনামূলক। মহাভারতের কথায় মহাভারতকে বিশ্বাস করা যায় না। প্রমাণের নিয়ম এই,—"এই বলিয়া তিনি স্মৃতিশাস্ত্রের কয়েকটী বচন পাঠ ও সে গুলির ব্যাখা করিলেন। সেগুলি এখন আমার মনে আসিতেছে না।

আমি বলিলাম, আপনি যে জনমেজয় পরীক্ষিতের নাম করিলেন, তিনি একব্যক্তি। জনমেজয় পদটী পরীক্ষিৎ পদের বিশেষণ। মহাভারতমতে জনমেজয় পরীক্ষিতের পুত্র। পরীক্ষিৎ নামক কোন রাজা যুধিষ্ঠিরের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। কুরুবংশে একাধিক পরীক্ষিৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভাবুন না কেন, সেই পরীক্ষিতের

রাজসূয়যজ্ঞ, ব্রাহ্মণগ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ সম্ভবতঃ খৃষ্টের চতুর্দ্দশশত বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছে। কিন্তু ঐতরেয় ব্রাহ্মণের রচনা কাল খৃষ্টের পূর্ব্ব সপ্তদশ শতাব্দী বলিয়া অনুমিত হয়। আমার কথায় বটব্যাল মহোদয়ের স্বীয় মতের উপর যেন কিছু সন্দেহ জন্মিয়াছিল। বটব্যাল মহাশয় বলিলেন, "পরীক্ষিতের সময় একবার কৌরব ও পাঞ্চালদের মধ্যে দারুণ যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তাহাতে উভয় পক্ষই ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কৌরব ও পাণ্ডবদের যুদ্ধ না বলিয়া উহাকে কৌরব ও পাঞ্চালদের যুদ্ধ বলিতে পারি। আমার বিশ্বাস, পরীক্ষিতের সময়ে যে যুদ্ধ হয়, তাহাই প্রকৃত কুরুক্ষেত্র সমর।" আমি বলিলাম, কৌরব ও পাঞ্চাল নামক দুইটী পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় জাতির আবসথ সংলগ্ন ছিল। উহারা কখনও মিত্রতায়, কখনও শত্রুতায় বাস করিত। ইউরোপে ফরাসী ও জর্ম্মন জাতির বিষয় চিন্তা করুন। বহুবার উহাদের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ ঘটিয়াছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে উভয় জাতি নির্ম্মূলপ্রায় হয়।

বটব্যাল মহাশয়ের বিশ্বাস ছিল, হিন্দুজাতি কখনও গোমাংস ভক্ষণ করিত না। গোজাতি চিরকাল হিন্দুজাতির নিকট অবধ্যা বলিয়া বিবেচিত হইত। পাণিনি ব্যাকরণে তজ্জন্য "অবধ্যা গৌঃ" এই কথাটী আছে। আমি তাঁহাকে বলিলাম, পাণিনি ব্যাকরণে যেমন "অবধ্যা গৌঃ" আছে, তেমনি "আলম্ভ্যা গৌঃ" কথাটীও আছে। আলম্ভ্যা শব্দের অর্থ মারণীয়া। আমি পুরাণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থের শতস্থানে দেখাইতে পারি যে, যজ্ঞের জন্য গোবধ হইত, হিন্দুগণ গোমাংস ভোজন করিতেন। গোমাংসে পিতৃশ্রাদ্ধ হইতে পারিত। মহাপণ্ডিত শ্রীধর স্বামী বিষ্ণুপুরাণের টীকায় উহাকে যুগান্তরীয় ব্যবস্থা বলিয়াছেন। ভবভূতির উত্তরচরিতে ও বীরচরিতে গোমাংস ভোজনের উল্লেখ আছে। বটব্যাল মহোদয়ের পুরাণশাস্ত্রের প্রতি কোন শ্রদ্ধা ছিল না। যাহা হউক, ইহার পর বটব্যাল মহোদয় উক্ত বিষয় লইয়া কোন তর্ক করেন নাই।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন (বর্ত্তমান পাণ্ডুয়া) নগরের কোন মস্‌জিদে বটব্যাল মহোদয় সেখ শুভোদয়া নামক সংস্কৃত গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া উহা হইতে অনেক ঐতিহাসিক বিবরণ অবগত হওয়ার আশা করেন। উহা হলায়ুধ মিশ্রের রচিত বলিয়া লিখিত ছিল। পাঠ করিয়া দেখা গেল, উহা একরূপ অশুদ্ধ সংস্কৃতে লিখিত। উহাতে মোকদমসাহজালালের বঙ্গদেশে আগমন বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। আমার প্রতি উহার সারসঙ্কলনের ভার অর্পিত হয়। আমি তাহা সম্পাদন করিয়া প্রদান করিলে বটব্যাল মহোদয় উহা সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশার্থ প্রেরণ করেন। উহা সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

শ্রীমান্ হরিদাস পালিতের নিকট আমি অবগত হই যে, খালিনপুর গ্রামের এক কৃষকের গৃহে একখানি তাম্রশাসন আছে। কৃষক তাহা কাহাকেও প্রদান করিতে চায় না। আমি এই সংবাদ জেলা স্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু মোহিনীমোহন বসু মহাশয়কে জানাই। তিনি বটব্যাল মহাশয়কে বলেন। বটব্যাল মহোদয়, ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারকে সঙ্গে লইয়া কৃষকের বাটীতে গমন করেন। সাঙ্গোপাঙ্গ জেলার কর্ত্তাকে দেখিয়া কৃষক বাঙনিষ্পত্তি না করিয়া তাম্রশাসনখানি প্রদান করিল। কৃষকের বিশ্বাস ছিল, উহাতে ভূগর্ভ নিহিত রত্নরাশির কথা লিখিত আছে। কৃষক, দশটী টাকা পুরস্কার লাভ করিল। এই তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধারকল্পে মাদৃশ সামান্য ব্যক্তি কিছু সাহায্য করিতে পারিয়াছিল বলিয়া অত্যন্ত সমাদর লাভ করিয়াছিল। একবার পূজার ছুটীর পর বাটী হইতে আসিয়াই আমাকে আহ্বান করেন। আমি পরদিন সাক্ষাৎ করিলে আমাকে জানান যে, "লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর আমার নিকট, ভারতবর্ষের মধ্যে কয়টী গৌড় ছিল জানিতে চাহিয়াছেন, আপনি আমার সাহায্য করিতে পারেন কি না? আমি বলিলাম, আমাকে সময় দিলে পারিব। তিনি এক দিন মাত্র সময় দিলেন। আমি নির্দ্দিষ্ট দিনে ভারতের পঞ্চগৌড় ও তাহাদের অবস্থানের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে দিলাম। উহা আমার সংগ্রহ পুস্তকে লিখিত ছিল বলিয়াই পারিয়াছিলাম। বটব্যাল মহোদয়, পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

চৈতন্যদেব সম্বন্ধে বটব্যাল মহোদয়ের অদ্ভুত মত ছিল। তিনি চৈতন্যদেবকে, কিঞ্চিৎ বিকৃতমনা বিবেচনা করিতেন। বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম্ম যে বাঙ্গালীর মহা অনিষ্টজনক তাঁহার এরূপ বিশ্বাস ছিল। পুরুষকে প্রকৃতি সাজিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের যাজন করিতে হইবে, পরকীয়া ভাবে ভজনা করিতে

হইবে, এসকল কথা শুনিলেই তিনি হাসিয়া ব্যাকুল হইতেন। রূপসনাতনকে দুইজন পলায়িত রাজদ্রোহী বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। এসম্বন্ধে বটব্যাল মহোদয় ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। চৈতন্যের ধর্ম্ম কি? এই নাম দিয়া তিনি একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করেন, উহার মর্ম্ম চৈতন্য ও রায় রামানন্দের কথোপকথন হইতে গৃহীত হয়। পুস্তিকাখানি মুদ্রিত হইয়াছে কি না জানিনা। আমি নির্ব্বন্ধ সহকারে উহার মুদ্রণ নিষেধ করিয়াছিলাম।

দর্শন সমূহের মধ্যে সাংখ্য দর্শন তাঁহার প্রিয়তম ছিল। তিনি অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিতেন। সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে প্রস্তাব লিখিয়া সাধনা পত্রিকায় পাঠাইতেন। এক বার শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়, তাঁহাকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। রবীন্দ্র বাবু লিখিয়াছিলেন যে, "আমি আপনার লেখার একজন ভক্ত পাঠক"। পত্রখানি আমাকে দেখান হইয়াছিল। বটব্যাল মহোদয় "সোহং ও তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্য দ্বয়ের সরল অর্থ করিতেন। তিনি বলিতেন, এখন ঐ দুই বাক্যের যে অর্থই হউক না কেন, উহার আদিম অর্থ এই যে, কল্য যে 'আমি' ছিলাম, অদ্য সেই 'আমি'। কল্য যে 'তুমি' ছিলে, অদ্য সেই 'তুমি'।

বেদশাস্ত্রের উপর বটব্যাল মহোদয়ের গভীর ভক্তি ছিল। তিনি যে সমস্ত বৈদিক প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। তাঁহার ওজোগুণময়ী ভাষা, পাঠকের হৃদয়ের অবসন্নতা দূর করিত। বেদশাস্ত্র হইতে আর্য্য জাতীর প্রাচীন ইতিহাস সঙ্কলন ক্ষমতায় তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। সত্য বটে, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও এবিষয়ে একজন কৃতী পুরুষ, কিন্তু তিনি ইয়ুরোপীয় শাব্দিকগণের প্রতি কিছু অধিক ভক্তি সম্পন্ন। বটব্যাল মহোদয়ের বেদশিক্ষায়, ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের মত কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছিল মাত্র। তিনি স্বাধীন ভাবে নিজের মত প্রকাশ করার ক্ষমতা রাখিতেন।

বটব্যাল মহোদয় কোনরূপ দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতেন না। ব্যবহারে তিনি কলঙ্কশূন্য ছিলেন। কোনরূপ কুসংস্কার তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পরিত না। পৌত্তলিকার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না। উপনিষৎপ্রোক্ত ব্রহ্মোপাসনাই প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম একথা তাঁহার মুখে ব্যক্ত হইত। উচ্চশ্রেণীর সংস্কৃত শিক্ষার সহ উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী-শিক্ষা মিলিত হইলে কি অমৃতময় ফলপ্রসব করে, তাহা তাঁহার জীবনে পরিলক্ষিত হইত। তাঁহার কোনরূপ আড়ম্বর ছিল না। তাঁহার রামনগরবাসাবাটীতে গিয়া এক সঙ্গে কম্বলাসনে বসিয়া নানা আলাপ করিয়াছি। যখনই গিয়াছি, কিছু না কিছু শিখিয়া আসিয়াছি। নিয়ম পথ হইতে তিনি রেখা মাত্র বিচ্যুত হইতেন না। পুত্র বিদ্যালয়ে বিনা কারণে অনুপস্থিত হইলে জরিমানা দিতে একটুও আপত্তি করেন নাই। আবার এমন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটও দেখিয়াছি, পুত্রের বেতন চারি আনার মধ্যে ছয়পয়সা পাঠাইয়া দিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, এবার এই পর্য্যন্ত!!!

বগুড়ায় যাইবার কালে যখন তিনি সাধারণ পুস্তকালয়ের সহ সম্পর্কত্যাগ করিয়া বাসায় যান, তখন তাঁহারসহ আমার সাক্ষাৎ হয়। সেই সময়ে তিনি আমাকে পুণ্ড্র-জাতির ইতিহাস সঙ্কলনের ভার দিয়া যান। আমি তাহাতে অক্ষম হইয়াছিলাম। আশা ছিল, বগুড়ায় যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আবার ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আশা পূর্ণ হইল না।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

গ্রন্থসমালোচনা।

কবিতা-প্রসঙ্গ। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত প্রণেতা শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু, বি,এ, প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত। দুই প্রকারে এই পুস্তক খানির সমালোচনা করা আবশ্যক; প্রথমতঃ, ইহার কবিতাগুলি উৎকৃষ্ট কবিতা কি না; দ্বিতীয়তঃ, সে গুলি বিদ্যালয়ে বা অন্যত্র বালকবালিকাগণের শিক্ষার্থ ব্যবহৃত হইতে পারে কি না। কারণ, কবি পুস্তক খানি প্রধানতঃ বিদ্যালয়ে ব্যবহারার্থ লিখিয়াছেন। সৌন্দর্য্য কবিতার দেহ, সত্য তাহার প্রাণ। সর্ব্বপ্রকার সত্য কিন্তু কাব্যের বিষয়ীভূত হইবার উপযোগী নহে। নৈতিক (moral) এবং ভাবিক (emotional) সত্যই প্রধানতঃ কাব্যের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। ধর্ম্মোপদেষ্টার ন্যায় কবিও শিক্ষক। কবিও, কিসে মানব

জীবন সুন্দর ও উন্নত হইতে পারে, তাহাই শিক্ষা দেন। কবির শিক্ষাপ্রণালী কিন্তু স্বতন্ত্র। তিনি সাক্ষাৎ ভাবে ইহা কর, উহা করিও না; এইরূপ হও, ওরূপ হইও না; এরূপ বলেন না। বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয়ের গোচর সর্ব্ববিধ সৌন্দর্য্য কবি আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করেন। সেই সৌন্দর্য্যের প্রভাবে ও আকর্ষণে আমাদের হৃদয় মার্জ্জিত হয় ও আমরা সুন্দর ও উন্নত হই। আমাদের সকলের মধ্যে যে প্রকৃত মনুষ্যত্ব আছে, (যাহাকে অনেকে দেবত্ব বলেন), তাহা অনেক সময় সুপ্ত থাকে। কবি ঐন্দ্রজালিকের মত নিজ করস্পর্শে সেই নিদ্রিত মনুষ্যত্বকে জাগাইয়া তুলেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই, কবিতা-প্রসঙ্গে সৌন্দর্য্য আছে কি না এবং সে সৌন্দর্য্যে আমরা মোহিত, আকৃষ্ট ও উন্নত হই কি না। আমাদের বিবেচনায় এইরূপ সৌন্দর্য্য কবিতা-প্রসঙ্গের প্রত্যেক কবিতাতেই আছে। কবি ভিন্ন ভিন্ন কবিতাতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উদ্দীপন করিয়া আমাদিগকে নানা শিক্ষা দিয়াছেন। "মহাপ্রস্থানে" আশ্রিতবাৎসল্য, "মাতৃস্নেহে" জননীর অপত্যস্নেহ, "পুরুরাজ ও আলেকজান্দরে" প্রকৃত বীরত্ব ও তাহার সম্মান, "প্রবাসীপুত্রের মাতা"য় মনুষ্যত্ব ও বীরত্বের তিনটি ক্রমোচ্চ আদর্শ, "শ্রীচৈতন্যের প্রতি বিষ্ণুপ্রিয়া"য় সতীর নিষ্কাম উদার পতিপ্রেম, "অনাথিনী"তে দারিদ্র্যের ও মাতৃস্নেহের একটি হৃদয়বিদারক দৃশ্য, "তুকারামচরিতে" বৈরাগ্য, বিনয়, ভগবৎপ্রেম ও তেজস্বীতা, "কপিলাশ্রমে" পুরাকালীন আশ্রমপদের শান্ত পবিত্র সুন্দর জীবন, "একনাথ স্বামী"তে জাতিনির্ব্বিশেষে মানবপ্রেম, "আত্মোৎসর্গে" উক্ত গুণের একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত, "দধীচির তনুত্যাগে" আর্য্যঋষিগণের পবিত্র জীবন ও স্বজাতিপ্রেম, "মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার স্বপ্নে" বিপন্নের প্রতি দয়া, "ধ্রুবের তপস্যা"য় ঈশ্বরান্বেষণে ব্যাকুলতা, "চিত্রদর্শনে" ভারতের পূর্ব্ব গৌরব, বর্ণিত ও চিত্রিত হইয়াছে। আলেক্‌জান্দরের সম্মুখে পুরুরাজের ব্যবহার আমাদের দুর্ব্বল হৃদয়েও বীরত্বের সঞ্চার করে। আলেক্‌জান্দরও বীরের মর্য্যাদা জানিতেন বলিয়াই এত বড় বীর হইতে পারিয়াছিলেন। "প্রবাসী পুত্রের মাতা" আমাদের বড় ভাল লাগিয়াছে। প্রবাসে পুত্রের জন্য মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা কবি যেন নিজ হৃদয়ে অনুভব করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মা একদিন শুনিলেন তাঁহার পুত্র যেখানে থাকেন তথা হইতে একজন পথিক আসিয়াছেন।

"আলুথালু কেশ বাস, ছুটিলা জননী,
যথায় পথিক সেই; জিজ্ঞাসিলা তাঁয়,
হেরেছ কি তুমি মোর নয়নের মণি?
কি বলেছে বাছা তার অভাগিনী মায়?"

পথিক বলিলেন, "ভদ্রে, আপনার পুত্রের সহিত পরিচয় ছিল না। কেমন করিয়া তাহার সংবাদ বলিব?" বিশাল সে পুরী, ক্ষুদ্র গ্রাম ত সে নয়।" মাতা নিরাশমনে "উদ্বেলিত অশ্রুধারা করি সম্বরণ, কহিলা পথিকে ধীর মধুর বচনে"—

পরিচয়ে, পান্থবর! নাহি প্রয়োজন,
নিজগুণে পরিচিত তনয় আমার:
যেদেশে যেখানে থাক সেথা সর্ব্বজন
চিনিবে তাহারে, জানি ব্যবহার তার।
বীরত্বে, ধীরত্বে, প্রেমে, আত্মবিসর্জ্জনে
থাকে যদি পরিচিত সেথা কোন জন,
বল শুনি, কার্য্যতার বিচারিয়া মনে,
বুঝিব সে বটে কিনা আমার নন্দন॥

পথিক বিস্মিত হইয়া তিনটি দৃশ্য ক্রমে ক্রমে বর্ণনা করিলেন। প্রথম রণক্ষেত্রে একজন যুবকের অতুল পরাক্রমে জাতীয় কেতন রক্ষা, জয়োল্লাসে নগর প্রবেশ এবং পুরজন ও রাজার সম্মান লাভ।

"সেই কি তনয় তব, কহগো জননী!"
জিজ্ঞাসিলা পান্থ; মাতা করিলা উত্তর,
"এহেন তনয় যাঁর ধন্যা সে রমণী,
কিন্তু পান্থ! পুত্র মম আরো গুণধর॥

পথিক বিস্মিত হইয়া দ্বিতীয় দৃশ্যের বর্ণনা করিলেন। ঝড়ে একটি নৌকা ডুবিয়া যায়। সকলেই নিজ প্রাণ রক্ষায় ব্যস্ত। এমন সময় একজন যুবা নিজপ্রাণ তুচ্ছ করিয়া অমিত সাহসে একটি শিশু ও তাহার মাতার প্রাণরক্ষা করিলেন। "সেই কি তনয় তব? কহ গো জননি।"

"চিন্তি ক্ষণকাল, মাতা করিলা উত্তর,
না পারি বুঝিতে আমি কেবা এই জন;
মম পুত্র যোগ্য যুবা; কিন্তু পান্থবর!
হেরে থাক অন্য কিছু, কর নিবেদন॥"

ইহার পর পথিক যাহা বলিলেন, স্থান থাকিলে আমরা তাহা সমগ্র উদ্ধৃত করিতাম। একটি সুরম্য উদ্যানে সুন্দর আশ্রমে কুষ্ঠরোগগ্রস্তগণের সেবা করিতে করিতে এক যুবা নিজে মহাব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছেন, "কর্ত্তব্য সাধনে যুবা তবু অবিচল, সে সহাস্য মুখচ্ছবি তেমনি সুন্দর।"

"সঙ্গে লয়ে, স্নেহভরে, ব্যাধিগ্রস্তগণে
করেন আনন্দে যুবা হরিগুণ গান ;
দিবানিশি এই মন্ত্র জপ মনে মনে,
হ'ক প্রভো! হ'ক এই বিশ্বের কল্যাণ ॥
দেবব্রত নাম তাঁর ; মানব সমাজে
নাজানে না চেনে কেহ ; কে করে আদর ?
একাকী বিরলে যুবা রত নিজ কাজে ;
সাক্ষীমাত্র শুধু সেই ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর ॥
নীরব পথিক ; মাতা ধ্যানমগ্ন প্রায়
আছিলেন এতক্ষণ ; বিষাদ আঁধার
ক্ষণেক সে মুখচ্ছবি ঢেকেছিল, হায়!
মেঘমুক্ত শশিসম শোভিল আবার ॥

মা বুঝিলেন, এই ছেলে তাঁহার। তাহার পর আর কেহ তাঁহাকে প্রবাসীপুত্রের জন্য কাঁদিতে দেখে নাই। মায়ের উপযুক্ত পুত্র এবং পুত্রের উপযুক্ত মাতা! রণবীর অপেক্ষা ধর্ম্মবীরের উত্তেজনা জনিত সাহস অপেক্ষা জীবন-ব্যাপী আত্মোৎসর্গের মহত্ব যে অধিক, কবি তাহা বিশদ-রূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। "শ্রীচৈতন্যের প্রতি বিষ্ণু-প্রিয়া" বড়ই মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে।

"কপিলাশ্রম" ও "দধীচির তনুত্যাগে" কবি তপোবনের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া মনে হয়, এই আড়ম্বর প্রিয় সভ্যতার কোলাহল ও ধূলি দূরে পরি-হার করিয়া সেই প্রাচীন আড়ম্বর শূন্য শান্তস্বভাব জ্ঞান-গরীয়ান্ ঋষিগণের সংসর্গে কালযাপন করি। বস্তুতঃ প্রাচীন ভারতের গৌরব করিবার যাহা কিছু ছিল, কবি আমাদিগকে তাহার অনেকগুলির প্রতি আকৃষ্ট করিয়া-ছেন। "চিত্র দর্শন" কবিতাটী কবির স্বদেশ প্রেমের অন্য-তম দৃষ্টান্ত।

আজ কালিকার কবিতায় অনেক সময় সুস্পষ্ট ভাব ও চিত্রের অভাব দৃষ্ট হয়। অতি সূক্ষ্ম ভাবের বর্ণনা করিতে গিয়া অনেক কবি অকৃতকার্য্য হন। বর্ত্তমান পুস্তকখানিতে প্রকৃতির বর্ণনা বিশদ ও সুন্দর, এবং সমুদয় ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহার ভাষার পারিপাট্য এবং শব্দ নির্ব্বাচন ও যোজনার নৈপুণ্য প্রশংসনীয়। কবিতাগুলি নানা ছন্দে লিখিত হওয়ায় ছন্দ শিক্ষার পক্ষেও পুস্তকখানি উপযোগী হইয়াছে।

পুস্তকখানি বালক বালিকাগণের পাঠোপযোগী কিনা, তাহাও বিচার্য্য। আমাদের বোধ হয়, "ধ্রুবের তপস্যা" ব্যতিরেকে আর সমুদয় কবিতাগুলিই এই উদ্দেশ্যের উপ-যোগী। এই কবিতাটী কাব্যাংশে হীন নহে। ঈশ্বর দর্শন লাভে ধ্রুবের ব্যাকুলতা অতিশয় সরল ও হৃদয়গ্রাহী। অল্প বয়স্ক ছাত্রগণের অনুপযোগী বলিবার কারণ এই যে, ঈশ্বরা-ন্বেষণ অল্প বয়সে মানুষের বেশ বোধগম্য হয় না ; বাল্য ও কৈশোরে ইহার গুরুত্ব ও প্রকৃত অর্থের উপলব্ধি হইবার সম্ভাবনা কম।

সমালোচ্য পুস্তকখানির এবং বাঙ্গলা প্রায় সমুদয় বিদ্যালয়পাঠ্য সাহিত্যপুস্তকের একটি অসম্পূর্ণতার উল্লেখ করিতে ইচ্ছা হইতেছে। তাহা এই যে গ্রন্থকারগণ প্রায়ই ভুলিয়া যান, যে বাঙ্গলা দেশে হিন্দু ব্যতীত অপর ধর্ম্মাবলম্বী লোকও বাস করে ; বাঙ্গালা তাহাদেরও মাতৃ ভাষা। বাঙ্গালা সাহিত্য পুস্তকে রাখাল কি যাদব কিম্বা সুরেন যে সুশীল বা দুরন্ত বালক, ইহাই প্রায় দেখিতে পাই। আব-দুল বা মামুদ নামক বালকও বাঙ্গালা দেশে আছে এবং সেও যে বাঙ্গলা বহি পড়ে, সেও যে ভাল কি মন্দ হইতে পারে, তাহার উল্লেখ কেহ করেন না কেন? কাব্য বা ইতিহাস হইতে মহৎ চরিত নির্ব্বাচন ও বর্ণনা করিবার সময় পূর্ব্বে পূর্ব্বে অধিকাংশ স্থলে পাশ্চাত্য দৃষ্টান্তই উল্লি-খিত হইত। আজকাল হিন্দু আদর্শ পুরুষগণেরই উল্লেখ অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। ইহাতে আমরা দুঃখিত নহি, বরং সুখী। কিন্তু মুসলমান সাধু মহাত্মাগণকে প্রায়ই বাদ দেওয়া হয় কেন? নানা কারণে এইরূপ হইতে পারে; যথা, গ্রন্থকারগণের সঙ্কীর্ণতা, মুসলমান ইতিহাস ও জীবনচরিতের জ্ঞানাভাব, পাঠ্যনির্ব্বাচনসমিতির ভয়, বঙ্গীয় মুসলমানগণের বঙ্গ সাহিত্যকে নিজ জাতীয় সাহিত্য মনে না করা, বা এ বিষয়ে লেখকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট না হওয়া ইত্যাদি। সুখের বিষয় আজকাল অনেক শিক্ষিত মুসলমান সুন্দর বাঙ্গালা লিখিতেছেন। বঙ্গ সাহিত্যের অতীত কোন কোন যুগে মুসলমানেরা যে উহার অনেক উপকার করিয়াছিলেন, তাহাও ক্রমে জানা যাইতেছে। সুতরাং আশা করা যায়, বিদ্যালয় পাঠ্য গ্রন্থ সমূহের উল্লি-খিত অসম্পূর্ণতা আর অধিক দিন দেখা যাইবে না।

আমরা বলিতে বিস্মৃত হইয়াছি যে, ইহার সমুদয় কবি-তাই এক নৈতিক উদ্দেশ্যে লিখিত হওয়ায়, পুস্তকখানি নীতি শিক্ষার বিশেষ উপযোগী হইয়াছে।

সাম্যযন্ত্রে শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

INDRA BHUSHON DE
CALCUTTA.

সরদার দয়াল সিংহ।

KUNTALINE PRESS, CALCUTTA.

প্রদীপ

প্রথম ভাগ। } অগ্রহায়ণ, ১৩০৫। { ১২শ সংখ্যা।

বঙ্গলক্ষ্মী।

তোমার মাঠের মাঝে, তব নদীতীরে,
তব আম্রবনেঘেরা সহস্র কুটীরে,
দোহন-মুখর গোষ্ঠে, ছায়াবটমূলে,
গঙ্গার পাষাণ ঘাটে দ্বাদশ দেউলে,
হে নিত্যকল্যাণী লক্ষ্মী, হে বঙ্গ-জননী,
আপন অজস্র কাজ করিছ আপনি
অহর্নিশি হাস্যমুখে। রাখ না সন্ধান
ধর্ম্মহীন কর্ম্মহীন তোমার সন্তান
দীনচিত্ত কত দূর! এ বিশ্বসমাজে
তোমার পুত্রের হাত নাহি কোন কাজে
নাহি জান সে বারতা! তুমি শুধু, মা গো,
নিদ্রিত শিয়রে তার নিশিদিন জাগো
মলয় বীজন করি! রয়েছ মা ভুলি
তোমার শ্রীঅঙ্গ হতে একে একে খুলি
সৌভাগ্য-ভূষণ তব, হাতের কঙ্কণ,
তোমার-ললাট-শোভা সীমন্ত-রতন,
তোমার গৌরব, তারা বাঁধা রাখিয়াছে
বহুদূর বিদেশের বণিকের কাছে!
নিত্যকর্ম্মে রত শুধু, অয়ি মাতৃভূমি,
প্রত্যূষে পূজার ফুল ফুটাইছ তুমি,
মধ্যাহ্নে পল্লবাঞ্চল প্রসারিয়া ধরি'
রৌদ্র নিবারিছ,—যবে আসে বিভাবরী
চারিদিক হতে তব যত নদ নদী
ঘুম পাড়াবার গান গাহে নিরবধি
ঘেরি ক্লান্ত গ্রামগুলি শত বাহুপাশে!
শরৎ মধ্যাহ্নে আজি স্বল্প অবকাশে
ক্ষণিক বিরাম দিয়া পুণ্য গৃহকাজে
হিল্লোলিত হৈমান্তিক মঞ্জরীর মাঝে
কপোত-কূজনাকুল নিস্তব্ধ প্রহরে
বসিয়া রয়েছ মাতঃ, প্রফুল্ল অধরে
বাক্যহীন প্রসন্নতা; স্নিগ্ধ আঁখিদ্বয়
ধৈর্য্যশান্ত দৃষ্টিপাতে চতুর্দ্দিকময়
ক্ষমাপূর্ণ আশীর্ব্বাদ করে বিকিরণ!
হেরি সেই স্নেহপ্লুত আত্মবিস্মরণ,
মধুর মঙ্গলচ্ছবি মৌন অবিচল,
নতশির কবিচক্ষে ভরি আসে জল!

শরৎ।

আজি কি তোমার মধুর মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে!
হে মাত বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে!
পারে না বহিতে নদী জল-ধার,
মাঠে মাঠে ধান ধরে নাক আর,
ডাকিছে দোয়েল, গাহিছে কোয়েল
তোমার কানন-সভাতে!
মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে জননী
শরৎকালের প্রভাতে!

জননী তোমার শুভ আহ্বান
গিয়েছে নিখিল ভুবনে,—
নূতন ধান্যে হবে নবান্ন
তোমার ভবনে ভবনে !
অবসর আর নাহিক তোমার,
আঁঠি আঁঠি ধান চলে ভারে ভার,
গ্রামপথে পথে গন্ধ তাহার
ভরিয়া উঠিছে পবনে।
জননী তোমার আহ্বান লিপি
পাঠায়ে দিয়েছ ভুবনে !

তুলি মেঘভার আকাশ তোমার
করেছ সুনীলবরণী ;
শিশির ছিটায়ে করেছ শীতল
তোমার শ্যামল ধরণী !
স্থলে জলে আর গগনে গগনে
বাঁশী বাজে যেন মধুর লগনে,
আসে দলে দলে তব দ্বারতলে
দিশি দিশি হতে তরণী !
আকাশ করেছ সুনীল অমল
স্নিগ্ধ শীতল ধরণী !

বহিছে প্রথম শিশির-সমীর
ক্লান্ত শরীর জুড়ায়ে,—
কুটীরে কুটীরে নব নব আশা
নবীন জীবন উড়ায়ে !
দিকে দিকে মাতা কত আয়োজন ;
হাসিভরা মুখ তব পরিজন
ভাণ্ডারে তব সুখ নব নব
মুঠা মুঠা লয় কুড়ায়ে !
ছুটেছে সমীর আঁচলে তাহার
নবীন জীবন উড়ায়ে !

আয় আয় আয়, আছ যে যেথায়
আয় তোরা সবে ছুটিয়া,
ভাণ্ডারদ্বার খুলেছে জননী
অন্ন যেতেছে লুটিয়া !

ওপার হইতে আয় খেয়া দিয়ে,
ওপাড়া হইতে আয় মায়ে ঝিয়ে,
কে কাঁদে ক্ষুধায় জননী শুধায়
আয় তোরা সবে জুটিয়া !
ভাণ্ডারদ্বার খুলেছে জননী
অন্ন যেতেছে লুটিয়া !

মাতার কণ্ঠে শেফালি-মাল্য
গন্ধে ভরিছে অবনী।
জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত
শুভ্র যেন সে নবনী !
পরেছে কিরীট কনক কিরণে,
মধুর মহিমা হরিতে হিরণে,
কুসুম-ভূষণ জড়িত-চরণে
দাঁড়ায়েছে মোর জননী !
আলোকে শিশিরে কুসুমে ধান্যে
হাসিছে নিখিল অবনী !

সমরু।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, নবাব মীর কাসেম সমরুর সহিত উজীর সুজা উদ্দৌলার শরণাপন্ন হন, সুজা এলাহাবাদে মীরকাসেমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ও সমরুর অধীনস্থ তাঁহার শিক্ষিত সৈন্যগণের কৃত্রিম রণক্রীড়া পরিদর্শন করিয়া যারপরনাই সন্তোষ লাভ করিলেন, উজীর বাদসাহের সহিত মীরকাসেমকে পরিচিত করিয়া দিলেন। এই সময়ে মীরজাফরও ইংরাজদিগের সহিত উহার ও বাদসাহের পত্র লেখালেখি চলিতেছিল, তাঁহারা ইংরাজদিগের জয়লাভে আনন্দ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। ক্রমে মীরকাসেম ও সমরুর সহিত ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হওয়ায়, ইঁহাদের পরামর্শক্রমে তাঁহারা ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইলেন, এবং যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। ১৭৬৪ খ্রীঃ অব্দের এপ্রেল মাসের প্রারম্ভে বাদসাহ, উজীর ও নবাব মীরকাসেমের মিলিত সৈন্য গঙ্গা পার হইয়া পাটনার দিকে অগ্রসর হইল। ২রা মে তাহারা পাটনায় পঁহুছায়, মীরজাফর ও

কাপ্তেন কার্ণাক তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। বাদসাহ প্রভৃতির মিলিত সৈন্য মীরজাফরও ইংরাজ সৈন্যকে আক্রমণ করে। সমরু ইহাতে বিশেষ কোন বীর্য্যবত্তা দেখাইতে পারে নাই। এই আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ায় বাদসাহ ও উজীরের সহিত ইংরাজদিগের সন্ধির প্রস্তাব হয়, কিন্তু ইংরাজেরা মীরকাসেম ও সমরুকে তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করার প্রার্থনা করায় বাদসাহ ও উঁহারা তাহাতে সম্মত না হইয়া বক্সারে উপস্থিত হন।

এই সময়ে মীরকাসেমের অবস্থা এতদূর শোচনীয় হইয়াছিল যে, তিনি তাঁহার সৈন্যদিগের বেতন প্রদানে অপারগ হইয়া পড়িয়াছিলেন। সমরু তাহার প্রতি নবাবের পূর্ব্বোপকার বিস্মৃত হইয়া তাঁহার নিকট বেতনের দাবী করিয়া বসিল। নবাব বলিলেন যে, আমার এরূপ অবস্থায় আমি বেতন দানে অক্ষম, কিন্তু তোমাদের নিকট যে সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র আছে তাহা আমার কর্ম্মচারীর নিকট প্রত্যর্পণ করিয়া যাও। সমরু উত্তর করিল, কামান, বন্দুক ও অন্যান্য দ্রব্য যাহার দখলে আছে, সে সমস্ত তাহারই হইবে। * সমরু ইতিপূর্ব্বে সুজা উদ্দৌলার অধীনে নিযুক্ত হওয়ার পরামর্শ স্থির করিয়াছিল বলিয়া নবাবকে ঐরূপ উত্তরদানে সাহসী হইয়াছিল। ২৩এ অক্টোবর উক্ত মিলিত সৈন্য মেজর মনরোর অধীন ৭।৮ সহস্র ইংরাজ সৈন্যের দ্বারা আক্রান্ত হয়। সমরু ও মাডক নামে একজন ফরাসী নবাব সৈন্যের-মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিতেছিল। তাহারা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আপনাদিগের বীর্য্যবত্তা প্রদর্শন করিয়াছিল। সমরু এই যুদ্ধে নিজের রণকৌশলের পরিচয় প্রদানে ত্রুটি করে নাই। কিন্তু মীর ইসায়া খাঁ নামে জনৈক সেনাপতির মৃত্যুতে তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ায় সমরু ও মাডক রণস্থল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, এবং ইংরাজেরা বক্সর যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপ জয়লাভ করেন। ইহার পর আবার ইংরাজদিগের সহিত উজীরের সন্ধির প্রস্তাব হয়, সেবারেও ইংরাজেরা মীরকাসেম ও সমরুকে তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিবার প্রার্থনা করেন। যুদ্ধের পূর্ব্বদিন উহারা মীর কাসেমের সমস্ত দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া তাঁহাকে এক ভগ্নপাদ হস্তিপৃষ্ঠে চাপাইয়া শিবির হইতে বিদায়প্রদান করেন, কাজেই তাঁহাকে ত সমর্পণ করিতে পারিলেন না, অধিকন্তু, সমরুকেও নিজে সমর্পণ না করিয়া এইরূপ বলিয়া পাঠাইলেন যে, ইংরাজেরা সমরুকে এক নাচের মজলিসে নিমন্ত্রণ করিয়া পরে তাহাকে গোপনে হত্যা করিতে পারেন। বলা বাহুল্য,—ইংরাজেরা এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন।

সমরু ক্রমে তাহার প্রতি নবাব-উজীরের অসন্তোষভাবের চিহ্ন দেখিয়া তলে তলে জাঠদিগের সহিত যোগ দিবার পরামর্শ করিতে লাগিল। উজীরও সমরুকে বিদায় দিবার জন্য যারপরনাই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, অবশেষে তিনি ১৭৬৫ খ্রীঃ অব্দে তাহাকে অবসর প্রদান করিলেন, কিন্তু তাহার প্রাপ্য বেতনের কিছুই দিলেন না। সমরুও ছাড়িবার পাত্র নহে। সে অযোধ্যার বেগম ও তাঁহার পরিজনবর্গকে আটক করিয়া আপনার প্রাপ্য সমস্ত অর্থ পরিশোধ করিয়া লইল, তাহার এক কপর্দ্দকও বাকী রহিল না। ইহার পর সে প্রকাশ্যভাবে জাঠদিগের সহিত যোগদান করিল, জাঠদিগের সহিত যোগদানের পূর্ব্বে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে সমরু কিছুদিনের জন্য রোহিলা-সর্দ্দার হাফেজ রহমতের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল।

জাঠদিগের সহিত যোগ দিয়া সমরু কিরূপ ভাবে কার্য্য করিয়াছিল তাহার বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। সমরু কিছুকাল পরে জাঠসর্দ্দার সূর্য্যমল্লের সহিত বিবাদ করিয়া জয়নগরের (জুনাগড় ?) রাজার অধীনে কার্য্যে নিযুক্ত হয়। তাহার পর পুনর্ব্বার জাঠদিগের সহিত মিলিত হয়। এই সময়ে জেব উন্নেসার সহিত তাহার পরিণয় সংঘটিত হয়। জেব উন্নেসা ইতিহাসে বেগম সমরু নামে প্রসিদ্ধ। বেগম সমরু সম্বন্ধে আমরা পরে বলিতেছি। ১৭৭৬ খ্রীঃ অব্দে দিল্লীর তদানীন্তন মন্ত্রী নজফ খাঁ সমরুকে আহ্বান করেন। সমরু জাঠদিগের সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীতে উপস্থিত হয়। ইংরাজেরা সমরুকে তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করার জন্য নজফ খাঁকে বারম্বার অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু নজফ খাঁ কিছুতেই সম্মত হন নাই। ১৭৭৭ খৃঃ অব্দে এই বিষয়ের জন্য তাঁহারা নজফ খাঁকে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করেন। নজফ খাঁ সে বারেও প্রত্যাখ্যান করেন। সমরুর নিজ সৈন্য ব্যতীত নজফ খাঁ তাহার প্রতি আর এক দল মোগল সৈন্যের পরিচালনের ভার অর্পণ করেন। এই সমস্ত সৈন্যের বৃত্তির জন্য নজফ খাঁর যত্নে সমরু দিল্লী দরবার হইতে সাহারণপুর জেলার মধ্যস্থলে প্রসিদ্ধ সার্দ্ধানা পরগণা জায়গীর স্বরূপ

* Mutaqherin (Trans.) Vol II. P. 307.

প্রাপ্ত হয়। সার্দ্ধানার জন্য সমরুকে অতি সামান্য মাত্র কর দিতে হইত। সার্দ্ধানার আয় প্রায় ৬ লক্ষ টাকা ছিল, সমরুর মৃত্যুর পর উহা বেগম সমরুর হস্তে পতিত হয়। ১৭৭৮ খ্রীঃ অব্দের ৪ঠা মে দিল্লীর নিকট তাহার নিজ শিবির মধ্যে সমরুর প্রাণবায়ুর অবসান হয়।

সমরুর সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদত্ত হইল। সমরুর জীবন হইতে কোন কোন বিষয়ের শিক্ষালাভও হয়; মনুষ্য হীনাবস্থায় নিপতিত হইলেও যদি অদম্য অধ্যবসায়সহকারে একদিক লক্ষ্য করিয়া ছুটিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে, কালে ভাগ্যলক্ষ্মী তাহার মস্তকে আশীর্ম্মাল্য নিক্ষেপ না করিয়া থাকিতে পারেন না। সমরুর জীবনী হইতে ইহা সুস্পষ্টরূপেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। সমরু সামান্য সূত্রধরের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া প্রথমতঃ জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হয়, পরে সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হইয়া আপনার অধ্যবসায়, সাহস ও বুদ্ধিমত্তার বলে ৬ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়াছিল। সমরুর সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া মহা রাজনৈতিক বিপ্লব উপস্থিত হয়, মুসলমান ভাগ্যচন্দ্রমা তখন ধীরে ধীরে অস্ত যাইতেছিল, এবং ইউরোপীয়গণের ক্ষমতা তখন ভারতবর্ষে এক অভাবনীয় কাণ্ডের অবতারণা করিয়াছিল, সমরু ইউরোপীয় হওয়ায় যদিও সে অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল, কিন্তু তাহার অধ্যবসায় যে তাহার প্রধান সহায় ছিল, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সমরু সামান্যাবস্থা হইতে অবশেষে লক্ষ লক্ষাধিপতি হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার চরিত্র আলোচনা করিলে তাহার প্রতি শ্রদ্ধা সঞ্চার হওয়ার বিশেষ কোন কারণ দেখা যায় না। বিশেষতঃ যখন পাটনার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথা মনে হয়, তখন তাহার প্রতি ঘৃণা আপনা হইতেই উপস্থিত হয়। যে কেবল প্রভুর মনস্তুষ্টি করিয়া ভবিষ্যতে অর্থ বা উচ্চপদ লাভের আশায়, বিনা উত্তেজনায় স্বজাতির রক্তে নিজ হস্ত রঞ্জিত করিতে পারে, তাহার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ না করিয়া থাকা যায় না। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখি যে, ঐরূপ চরিত্র যে কেবল এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে দেখা যায় বলিয়া যে সকল ইউরোপীয় উল্লেখ করিয়া থাকেন, তাঁহারা অনুসন্ধান করিলে তাঁহাদের স্বজাতির মধ্যে দৃষ্টান্ত অনেক দেখিতে পাইবেন। সমরুই তাহার একটী প্রধান দৃষ্টান্তস্থল। সমরু যে সাহসী যোদ্ধা ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু কেহ কেহ ইহাতেও আপত্তি করিয়া থাকেন। আমরা তাঁহাদের আপত্তি সমীচীন বলিয়া মনে করি না। সমরু যে অনেক সময়ে সাহসের সহিত বীর্য্যবত্তা দেখাইয়াছে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তবে সে দুঃসাহসিকের ন্যায় মিছামিছি আপনার বহুযত্নের গঠিত সৈন্যদিগের রক্তে রণস্থল রঞ্জিত হইতে দিত না বটে, কিন্তু, সে বিষয়ে তাহাকে ভীরু না বলিয়া বুদ্ধিমানই বলা উচিত; কারণ সেই সৈন্যগুলিই তাহার জীবিকাস্বরূপ ছিল। সে জানিত তাহাদের ধ্বংস হইলে, তাহাকে আবার দরিদ্রতার কুক্ষিগত হইতে হইবে। সেইজন্য সে তাহাদের প্রাণরক্ষার নিমিত্ত অনেক সময়ে সতর্কতা অবলম্বন করিত। সমরু ধর্ম্মবিশ্বাসে রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান ছিল, কিন্তু তাহার জীবনে কণামাত্র নীতি বা ধর্ম্মের আলোক নিপতিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। সমরু মোগল পরিচ্ছদ পরিধান করিত। তাহার লেখাপড়ার বিশেষ কোন জ্ঞান ছিল না, ফারসী ও উর্দ্দু ভাষা কতক পরিমাণে শিক্ষা করিয়াছিল। সমরুর বিশেষ কোন গুণপণা ছিল না সত্য, কিন্তু ইংরাজেরা তাহাকে অত্যন্ত কুচক্ষে দেখিতেন বলিয়া তাহার নিন্দা সাধারণের নিকট কিছু অধিক পরিমাণে প্রচারিত হইয়া পড়ে। আমরা একজন সমসাময়িক ইংরাজের কথা উদ্ধৃত করিতেছি:—

"As to his capacity and character, Sombre is illiterate to the full extent of the word; he can neither read nor write. but when necessary. makes his mark. He is however, versed in the Persian and Moorish tongues both of which he speaks fluently and accurately enough. He is, as may be judged from his conduct at Patna, of a cruel and merciless disposition, several instances of which he has given in the exercise of what he thought justice and authority, but which could not be called by any other name than murderous and bloody acts. As to the fair side of his character, he is a plain man, both in his dress, equipage, and way of life; not disowning or attempting to conceal his mean origin, and the humble state in which he had formerly been. His principal merit is his prudence. It is that which has hitherto kept his party entire and unbroken in the several engagements in which he has been. He is much afraid of the English; he dreads their very name, and not without reason. This makes him keep ever on his guard; no person can enter or approach his camp without having been stopped or examined; in short, his whole deportment shows he is under apprehensions lest he should be seized and delivered up. He has entirely adopted the manners aud customs of the country He wears Mogul dress, has a Zenanah, and has absolutely dropped all thoughts of returning to Europe." (Major Polier's letter to a friend at Belgium from Delhi in 1776.)

মেজর পলিয়ার তবুও সমরুর আড়ম্বরহীনতা ও বুদ্ধিমত্তার সম্বন্ধে দুই এক কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু অনেক ইংরাজ সমরুকে সেটুকু পর্য্যন্তও দিতে নারাজ।

সমরুর মৃতদেহ আগরাতে সমাহিত করা হইয়াছিল। প্রথমতঃ তাহার নিজ উদ্যানে তাহার সমাধি রচিত হয়। ৩ বৎসর পরে বেগম মুসলমান ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, সমরুর অস্থ্যবশেষ দেহ আগরার গির্জাপ্রাঙ্গণে সমাহিত হয়। সমাধিতে পর্টুগীজ ভাষায় তাহার মৃত্যুর সময় লিখিত আছে।

"AGVI TAZO WALTER REINHARD MORREO AOS 4 DE MAYO, NO ANNO DE 1778."

(Here lies Walter Reinhard, on the 4th of May, in the year 1778.)

---

(৪)

সমরুর প্রসঙ্গ শেষ হইল বটে, কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর যাঁহার জন্য তাহার নাম আরও স্মরণীয় হইয়া উঠে, সেই বেগম সমরুর কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদান না করিলে সমরুর প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়, সেইজন্য আমরা সেই প্রতিভাশালিনী রমণীরও কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। সমরুর মৃত্যুর পর বেগম ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বিপ্লবে অনেক অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সমরু যে অভিনয় আরম্ভ করিয়া যায় বেগম প্রায় তাহা পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন, কাজেই সমরুর জীবনীর সহিত বেগমের জীবনীও গ্রথিত থাকা সর্ব্বতোভাবে উচিত, ইহা মনে করিয়া আমরা বেগমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদানে প্রবৃত্ত হইতেছি।

বেগম সমরুর জন্মসম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন যে বেগম কোন সম্ভ্রান্ত মোগলবংশীয়ের কন্যা। উক্ত মোগলবংশ তৎকালে অত্যন্ত হীনাবস্থায় পতিত হইয়াছিল।* আবার কেহ কেহ বলেন যে, কাশ্মীর দেশে কোন জর্জিয়ান বংশে তাঁহার জন্ম হয়। পরে তিনি নর্ত্তকীসমাজে প্রতিপালিত হইয়া নিজেও নর্ত্তকীর ব্যবসায় অবলম্বন করেন। ম্যালীসন তাঁহাকে নর্ত্তকী বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। বেগমের প্রকৃত নাম কি তাহা জানা যায় না, তবে তিনি বাদসাহ সাহ আলমের নিকট হইতে জেব উন্নেসা বা রমণীভূষা উপাধি প্রাপ্ত হন এবং তদবধি জেব উন্নেসা নামেই অভিহিত হইয়া আসেন। জেব উন্নেসা ইতিহাসে বেগম সমরু নামেই প্রসিদ্ধ।

সমরুর মৃত্যুর পর সার্দ্ধানার জায়গীর ও সমরুর সেনাগণের ভার বেগমের নিজ হস্তেই নিপতিত হয়। বেগম অতীব দক্ষতা সহকারে সেনাগণের পরিচালন ও জায়গীরের সুবন্দোবস্ত করেন। সার্দ্ধানার আয় প্রথমতঃ ৬ লক্ষ টাকা ছিল, বেগমের সুবন্দোবস্তে তাহা ১০ লক্ষ হইয়া উঠে। বেগম সার্দ্ধানাতেই অবস্থিতি করিতেন। নগরের নিকট একটী দুর্গে তাঁহার সৈন্যগণ অবস্থান করিত। ৫ দল সিপাহী ও ৪০টী কামান বেগমের তত্ত্বাবধানে ছিল। প্রায় দুইশত ইউরোপীয় তাঁহার সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহাদের অধিকাংশই গোলন্দাজী করিত। বাদসাহ সাহ আলম বেগমকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। বাদসাহ যে সময়ে চতুর্দ্দিক হইতে বিদ্রোহানল দগ্ধপ্রায় হইতেছিলেন, সেই সময়ে বেগম তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া অনেক বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। বাদসাহের প্রধান মন্ত্রী নজফ খাঁ পর্য্যন্তও বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। যখন চারিদিকে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, সে সময়ে বেগম অনেক স্থলে আপনার সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি পাণিপথ ক্ষেত্রে জয়পুরের রাজা প্রতাপ সিংহের বিরুদ্ধে সৈন্য লইয়া গমন করেন। বিদ্রোহীদিগের মধ্যে অনেকে বেগমকে আপনাদের পক্ষভুক্ত করিবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছিল, বেগম তাহাদের প্রস্তাব ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করেন।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বেগম বাদসাহকে অনেক বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এক সময়ের সেইরূপ একটী ঘটনার কথা উল্লেখ করা যাইতেছে। তাহা হইতে বেগমের তেজস্বিতা ও প্রভুভক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে। ১৭৮৮ খ্রীঃ অব্দে বাদসাহ সাহ

* Franklin's Saha Alam P. 149,

আলম জুনাগড়ে উপস্থিত হইলে তথাকার রাজা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। বাদসাহ তথা হইতে ক্রমেই অগ্রসর হইতে থাকেন। নজফ কুলী খাঁ নামে গোকুলগড়ের শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে বাধা প্রদান করে। বাদসাহের সহিত তাহার যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সে বাদসাহের নিকট আমীর উল ওমরা পদের প্রার্থনা করায় বাদসাহ তাহাতে অস্বীকৃত হন। তখন সে আর যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে চাহে না। এই যুদ্ধে বাদসাহের অনেক সৈন্য হত ও আহত হওয়ায়, এবং কতক বা পলায়ন করায়, নজফ কুলী খাঁ বাদসাহকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার অপমান করিবার চেষ্টা করে। বেগম সমরুও সেই সময়ে বাদসাহের সঙ্গে ছিলেন। তিনি এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া বাদসাহকে সাহস প্রদান করিয়া নিজে শিবিকারোহণে যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে অগ্রসর হন, এবং আপনার গোলন্দাজ সৈন্যদিগকে গোলাগুলি চালাইতে আদেশ প্রদান করেন। বেগমের সৈন্যগণ অপরিসীম সাহস সহকারে বিপক্ষ পক্ষকে আক্রমণ করায় নজফ কুলীর পক্ষীয় লোকেরা পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। বাদসাহ বেগমের জন্য অপমান ও কষ্টের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া প্রকাশ্য দরবারে তাঁহাকে খেলাত প্রদান করিয়া, আপনার প্রিয়তমা কন্যা বলিয়া সম্বোধন করেন। * এই সময় হইতে বেগমের সম্মান দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

বেগম প্রথমতঃ পাউলী নামে একজন জার্ম্মানের হস্তে আপনার সৈন্য পরিচালনের ভার প্রদান করেন। পাউলীর মৃত্যুর পরে, বাডার, ইভান্স ও দুদ্রেনী নামে তিন জন ইউরোপীয় ক্রমান্বয়ে বেগমের সৈন্যগণের ভার প্রাপ্ত হয়, পরিশেষে লি-ভেসো নামে একজন শিক্ষিত ফরাসী বেগমের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করে। লি-ভেসো সমস্ত সৈন্য ৬টী রেজিমেণ্টে বিভক্ত করিয়া তাহাদিগকে নূতন নূতন রণক্রীড়ার শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হয়। অশ্বারোহী, পদাতিক ও গোলন্দাজ তিন প্রকার সৈন্যই লি-ভেসোর শিক্ষাগুণে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠে। এই সময়ে জর্জ টমাস নামে একজন ইংরাজ বেগমের সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হয়। টমাস পূর্ব্বে জাহাজের কাপ্তেনী করিত। টমাস আপনার প্রতিভা ও তেজস্বিতার বলে বেগমের সৈন্যদিগকে যুদ্ধে অজেয় করিয়া তুলে। ক্রমে টমাস বেগমের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠে। এইরূপ কথিত আছে যে, যে সময়ে বেগম বাদসাহের পক্ষ হইতে নজফ কুলী খাঁকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে টমাস অদ্ভুত বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল।

জর্জ টমাসের ক্ষমতা বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া লি-ভেসো যারপরনাই চিন্তিত হইয়া পড়িল। সে বেগমের উপর নিজ ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহার সহিত বিবাহের প্রস্তাব করিয়া বসিল। বেগমও তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। কিন্তু কি জন্য তিনি সম্মত হইয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। এই বিবাহের পর জর্জ টমাস বেগমের সৈন্যদল পরিত্যাগ করিয়া নিজে এক নূতন দলের সংগঠন করে। তাহার ক্ষমতা দিন দিন যেরূপ ভাবে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছিল তাহাতে সে পঞ্চনদের আধিপত্য লাভ করিতে পারিত, কিন্তু পেরন প্রভৃতি ফরাসী সেনাপতির প্রতিযোগিতায় তাহার ক্ষমতার হ্রাস হইয়া পড়ে। লি-ভেসো সদ্বংশজাত ছিল। বেগমকে বিবাহ করায় তাহার যে সম্মানের হানি হইয়াছিল ইহা সে বুঝিতে পারিয়াছিল, সে কেবল বেগমের সৈন্যগণের উপর আপনার আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। বেগমের অধীনে অন্যান্য যে সমস্ত ইউরোপীয় সেনাচালক ছিল, তাহাদের আচার ব্যবহার ইতরশ্রেণীর লোকের ন্যায় হইলেও, বেগম কখনও কখনও তাহাদের সহিত একত্র আহারাদি করিয়া তাহাদিগকে সম্মানিত করিতেন। লি-ভেসো এই প্রথা রহিত করিয়া দেয়। এইরূপ আরও নানা কারণে ক্রমে অন্যান্য ইউরোপীয়গণ যারপরনাই অবাধ্য হইয়া উঠিল। লি-গো নামে একজন ফরাসী সেনাপতি সৈন্যদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলে। বেগম তাহাদিগকে শান্ত করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ক্রমে তাহারা এতদূর অবাধ্য হইয়া উঠিল যে, বেগম তাহাদিগের সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে বাস করিতে বাধ্য হইলেন।

তৎকালে ইংরাজ সেনাধ্যক্ষ কর্ণেল ম্যাকগোয়েন অনুপসহরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। অবাধ্য সৈন্যগণের হস্তে লাঞ্ছিত, এমন কি নিহত হইবারও আশঙ্কায় লি-ভেসো ইংরাজাধিকারে আশ্রয় লইবার জন্য কর্ণেলকে লিখিয়া পাঠায়। নানারূপ গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনায়

* Franklin's Saha Alam P. 169.

কর্ণেল লি-ভেসোর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এই সময়ে সিন্ধিয়া দিল্লী অধিকারের চেষ্টা করিতেছিলেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে এইরূপ নানা প্রকার রাজনৈতিক গোলযোগ ঘটায় তাহার নিবারণের জন্য গবর্ণর জেনারেল সার জন শোর, মেজর পামারকে পাঠাইয়া দেন। লি-ভেসো কর্ণেলের নিকট বিশেষ কোন সুবিধা করিতে না পারায় স্বয়ং গবর্ণর জেনারেলের নিকট পত্র চালাইতে থাকে। ইতিমধ্যে মেজর পামার আসিয়া ১৭৯৫ খ্রীঃ অব্দে সিন্ধিয়ার শিবিরে উপস্থিত হইলেন। বেগম সমরুর দুর্দ্দশা দেখিয়া, এবং তিনি আর তাঁহার সৈন্যদিগকে বশে রাখিতে অক্ষম বুঝিতে পারিয়া, উক্ত সৈন্যদিগকে নিজ দলভুক্ত করিবার জন্য সিন্ধিয়ার ইচ্ছা হইল। সিন্ধিয়া মেজর পামারের নিকট এইরূপ প্রস্তাব করিলেন যে, বেগম যদি তাঁহার সৈন্যদিগকে ও নগদ বার লক্ষ টাকা আমায় প্রদান করেন তাহা হইলে আমি উক্ত সৈন্যদিগকে নিজ সৈন্যমধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লই, অন্যথা আমিই তাঁহার ইংরাজাধিকারে প্রবেশের বাধা প্রদান করিব। মেজর পামার বেগমকে এই কথা জানাইলেন। কিন্তু বেগমও সহজে নত হইবার ছিলেন না, তিনি তদুত্তরে বলিয়া পাঠাইলেন যে, সিন্ধিয়াকে টাকা দেওয়া দূরে থাকুক, তিনি এই সৈন্যরক্ষার জন্য অস্ত্রশস্ত্রাদি ও অন্যান্য ব্যয়ের বাবদ নগদ ৪ লক্ষ টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন কি না? যাহা হউক, অবশেষে মেজর পামারের মধ্যস্থতায়, এইরূপ স্থির হইল যে, সিন্ধিয়া বেগমের সপত্নী পুত্রকে যাবজ্জীবন মাসিক ২ সহস্র টাকা বৃত্তি প্রদান করিবেন, এবং তাঁহার সৈন্যগণ সিন্ধিয়ার অধীনস্থ হইবে। বেগমও ইংরাজাধিকারে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিবেন।

বেগমের সৈন্যেরা যখন শুনিল যে, বেগম তাহাদিগকে সিন্ধিয়ার নিকট বিক্রয় করিতেছেন, তখন তাহারা আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহারাই তখন বেগমের ইংরাজাধিকারে প্রবেশের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। একদিন রাত্রিতে গোপনে বেগম শিবিকারোহণে সার্দ্ধানা হইতে ফরক্কাবাদের দিকে পলায়ন করিতেছিলেন, তাঁহার হস্তে একখানি শাণিত ছুরিকা ছিল। লি-ভেসো একখানি তরবারি ও দুইটী পিস্তল হস্তে অশ্বারোহণে তাঁহার পাশে পাশে চলিল। কতকদূর যাইতে না যাইতে উন্মত্ত সৈন্যগণ পঁহুছিয়া উভয়কেই ঘেরাও করিল। তাহারা বলপ্রয়োগে উদ্যত হইলে বেগম হস্তস্থিত ছুরিকার দ্বারা বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। লি-ভেসো বেগমের রক্তাক্ত পরিচ্ছদ দেখিয়া তাঁহার প্রাণবায়ুর অবসান হইয়াছে মনে করিয়া পিস্তলের দ্বারা আত্মহত্যা সম্পাদন করিল। ছুরিকাঘাতে কিন্তু বেগমের জীবনাবসান হয় নাই। অতঃপর তাহারা বেগমকে ও লি-ভেসোর মৃতদেহ লইয়া সার্দ্ধানার দিকে ফিরিয়া যায়। লি-ভেসোর মৃতদেহের উপর তাহারা কাপুরুষোচিত ব্যবহার করিয়াছিল। সার্দ্ধানায় আসিয়া তাহারা বেগমের অপমানের একশেষ করিল। তাঁহাকে কামানের সম্মুখে রাখিয়া পাহারাবন্দী করে। সাতদিন তাঁহাকে অনাহারে থাকিতে হয়। পরে কদর্য্য আহারে ও পরিচারিকাদের উচ্ছিষ্টে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে বাধ্য হন। লি-ভেসোর দেহের উপর কাপুরুষোচিত ব্যবহারে বেগম কিছুই বলিতে সাহসী হন নাই। তিনি তখনও প্রকাশ করেন নাই যে, লি-ভেসোর সহিত তাঁহার আবার বিবাহ হইয়াছে। গ্রেগরি নামে একজন পাদরী ব্যতীত এই বিবাহের কথা আর কেহ জানিত না। লি-ভেসো গবর্ণর জেনারল সার জন শোরের নিকট দুই একখানি পত্রে এই বিবাহের কথা উল্লেখ করিয়াছিল। সৈন্যেরা যদি জানিতে পারিত যে সমরুর বিধবা স্ত্রী আবার অপরের সহিত বিবাহিত হইয়াছেন, তাহা হইলে তাহারা আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিত। কারণ, সমরুর প্রতি তাহাদের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল।

এই সময়ে টমাস আসিয়া উপস্থিত হইল। লি-ভেসোর মৃতদেহের অবমাননা হইতেছে দেখিয়া সৈন্যদিগকে নিরস্ত করিয়া টমাস মৃতদেহ সমাহিত করিল। তাহার পর টমাস দেখিল যে, বেগম স্বপদে প্রতিষ্ঠিত না থাকিলে, বাদসাহ সার্দ্ধানার জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিতে পারেন, কারণ সার্দ্ধানা বেগমের নামেই লিখিয়া দেওয়া হয়। টমাস সৈন্যদিগকে ইহাই বুঝাইয়া বেগমকে আবার স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিল, এবং সেলিয়ার নামে একজন ফরাসীর হস্তে সেনাগণের তত্ত্বাবধানের ভার দিল।

সেলিয়ারের যত্নে ও অধ্যবসায়ে আবার বেগমের সৈন্যগণের প্রতিপত্তি চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। সৈন্যগণ ১৭৯৭ খ্রীঃ হইতে ১৮০২ পর্য্যন্ত চারি পল্টন হইতে ক্রমে

ক্রমে ছয় পল্টন হইয়া দাঁড়াইল। সেলিয়ার এই সমস্ত সৈন্য লইয়া সিন্ধিয়ার সহিত যোগ দিল ও তাঁহার প্রধান সহায় হইয়া উঠিল। বেগম কামান ও বন্দুকাদি নির্ম্মাণের জন্য নিজেই কারখানা করিয়াছিলেন। তাঁহার সৈন্যেরা রীতিমত বেতন ও পেন্সন প্রাপ্ত হইত। এই সৈন্যরক্ষা ও পরিচালনের জন্য বেগমের বাৎসরিক ৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হইত।

বেগম সিন্ধিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইংরাজদিগের সহিত যখন সিন্ধিয়ার বিবাদ বাধিয়া উঠে, তখন তিনি সিন্ধিয়াকে পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজদিগের সহিত যোগ দেন। প্রথম মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধে বেগম সিন্ধিয়ার পক্ষে ছিলেন, তাহার পর হইতে ইংরাজ পক্ষ অবলম্বন করেন। দিল্লীর যুদ্ধের পর তিনি ইংরাজ পক্ষ অবলম্বন করিবার জন্য সেনাপতি লর্ড লেককে লিখিয়া পাঠান, ও শিবিরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। এই সাক্ষাতের উপলক্ষে একটী রহস্যজনক ব্যাপার ঘটিয়াছিল। ঘটনাটী উল্লেখযোগ্য বলিয়া আমরা প্রকাশ করিতেছি। দিল্লীর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া লর্ড লেক মদিরা পানে আমোদের মাত্রাটা একটু বাড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন। বেগম শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অভ্যর্থনা-গৃহে উপস্থিত হইলে, লেক আনন্দভরে সেই বহুলোকপরিপূর্ণ গৃহমধ্যে বেগমকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিয়া বসিলেন! বেগমের সহচরবর্গ ইহাতে একটু ভাবান্তরিত হওয়ায় প্রত্যুৎপন্নমতি বেগম তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, খ্রীষ্টান পাদরীরা তাঁহাদের স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগকে এইরূপ ভাবেই অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন। বেগমও খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী ও সেনাপতিও পাদরীদলভুক্ত! সুতরাং ইহাতে কোন দোষ নাই। * ১৮০৩ খ্রীঃ অব্দ হইতে বেগম ইংরাজদিগের আশ্রয় অবলম্বন করেন, তাহার পর যাবজ্জীবন তিনি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও দীন দুঃখীর প্রতিপালনে সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টও তাঁহার প্রতি সম্মান দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই।

বেগম তাঁহার পুরুষোচিত সাহস, অদম্য অধ্যবসায়, ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। সমরুর সহিত মিলিত হওয়ায় তাঁহার প্রথম জীবন অনেক স্থলে কঠোরতার পরিচয় দিয়াছিল। দুই একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। এক সময়ে বেগম বাদসাহের সাহায্যের জন্য মথুরায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার আগরার বাটী অগ্নিদাহে দগ্ধ হয়। অনুসন্ধানে প্রকাশ পায় যে, তাঁহার দুই ক্রীত দাসী সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত করার মানসে তাহাদের উপপতির পরামর্শে গৃহে আগুন লাগাইয়া দেয়। বেগম মথুরায় দাসীদিগকে আনাইয়া বিচারে দোষ প্রমাণিত হওয়ায় তাহাদিগকে কশাঘাতের দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করেন। কশাঘাতে তাহারা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলে, বেগম তাহাদিগকে দুইটী গর্ত্তমধ্যে জীবন্ত প্রোথিত করিবার আদেশ দেন। তাহার সে আদেশ পালিতও হইয়াছিল। এইরূপ কঠোরতা যে রমণী-হৃদয়ে দুর্লভ তাহা বলা যাইতে পারে। যাহা হউক বেগমের সে কঠোরতার হ্রাস হইয়া তাঁহার হৃদয়ে রমণীজনসুলভ দয়া মমতা প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে দেখা দিয়াছিল। তাঁহার শেষ জীবন অনাথ, দরিদ্র, ও আর্ত্ত লোকদিগের সেবায় উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। ঐ শ্রেণীর লোকেরা মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা ও কল্যাণ কামনা করিত। একবার অনাথদিগের সাহায্য ও অন্যান্য ধর্ম্ম কার্য্যের জন্য তিনি কলিকাতার বিশপের নিকট দেড় লক্ষ টাকা পাঠাইয়া দেন, মীরাট প্রভৃতি স্থানে গির্জা নির্ম্মাণের জন্য তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টের প্রতিও তিনি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতেন। গবর্ণর জেনারেল, প্রধান সেনাপতি ও অন্যান্য প্রধান কর্ম্মচারীকে নিমন্ত্রণ করিয়া মধ্যে মধ্যে ভোজ প্রদানও করিতেন। এই সময়ে তিনি হস্তী বা গাড়ীতে চড়িয়া প্রকাশ্যে বাহির হইতেন। তাঁহার দীনদুঃখী পালনের জন্য গবর্ণমেণ্ট যে তাঁহাকে সম্মান করিতেন স্বদেশগমনোন্মুখ লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের এই পত্রখানি হইতে বেশ বুঝা যায়।

"To Her Highness the Begum Sumroo—
My esteemed friend,

I cannot leave India without expressing the sincere esteem for your highness's character. The benevolence of disposition and extensive charity which have endeared you to thousands have excited in my mind sentiments of warmest admiration and I may trust that you may be preserved for many years, the solace of the orphan and widow, the sure source of your numerous dependants. To-morrow morning I embark for England and my prayers and best wishes attend you, and all others who like you exert themselves for the benefit of the people of India.

I remain,
With much consideration,
Your sincere friend,
Sd. M. W. Bentick,
Calcutta, March 17th, 1835."

* Fraser's Memoir P. 293

বেগমের নিজের কোন সন্তানাদি ছিল না। জাফর ইয়ার খাঁ বা আলয়সিয়স রেনহার্ড নামে সমরুর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত এক পুত্র ছিল। সে জুলিয়ানা নামে একটী কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করে। কন্যাটীকে বেগম সমরু প্রতিপালিত করিয়াছিলেন। জর্জ ডাইস নামে একজনের সহিত জুলিয়ানার বিবাহ হয়। জর্জ ডাইস বেগমের সেনাগণের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইয়াছিল। ইহাদের একটী পুত্র ও দুইটী কন্যা জন্মে। পুত্রটীর নাম ডেভিড-ও-ডাইস। ডেভিড ডাইস ইংলণ্ডে বিবাহ করে। কন্যাদ্বয়ের মধ্যে একটীর সহিত বেঙ্গল সৈন্যদলের মেজর ট্রোপের বিবাহ হয়, অপরটী ব্যারণ সোলারলির সহিত বিবাহিত হইয়াছিল। বেগমের উত্তরাধিকারীরা সম্ভবতঃ আজিও সার্দ্ধানায় বিদ্যমান আছেন।

আমরা সংক্ষেপে সমরু ও বেগম সমরুর বিবরণ * সাধারণের নিকট উপস্থিত করিলাম। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে রাজনৈতিক [illegible] না বর্ত্তমান প্রবন্ধ হইতে সাধারণে তাহা বুঝিতে পারিবেন। প্রচলিত ইতিহাস ইহাদের সম্বন্ধে নীরব বলিয়া, আমরা এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম।

সমরুকৃত হত্যাকাণ্ডের স্মৃতিস্তম্ভ লিপি।

IN MEMORY OF CAPTAIN JOHN KINCH.

First Lieutenants Richard Perry and George Hockler.

Lieutenants-fire-workers John Brown, Ardean Deckers;

John Read and Benjamin Adamson, of the Hon'ble East India Company's Artillery;

Captains charles Earnest Joccker,

Henry sommers, James Tabby George Wilson

Lieutenants Richard Holland, George Abston and sir William Hope Baronet Ensigns John Greentree Robert Roberts Duncan Macleod,

William crawford William Hincles Isaac Hemphries, John Robert Roach, John Perry and Walter Mackay of the Hon'ble East India Company's infantry,

Doctors Campbell and Anderson.

Messrs. Hay, Ellis and Lushington servants of the Hon'ble East India Co.

Who with many other captives were on the night of the fifth or sixth and the eleventh of the October 1763 brutally massacred near this spot by the troops of Mir Kasim Nawab subohdar of Bengal under command of walter Reinhardt, alias Samru, a base renegade Ededecore Hostium Nata Est Gloria Eorum.

Calcutta L. LEWELYN & CO.

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

* বেগম সমরু সম্বন্ধে ১৩০২ সালের চৈত্র মাসের সাহিত্যে শ্রীযুক্ত বাবু হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ইতিপূর্ব্বে একটী সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

অকাল-মৃত্যু।

Do we indeed desire the dead
Should still be near us at our side?
Is there no baseness we would hide?
No inner vileness that we dread? Tennyson.

দ্বাপর চলিয়া গেল, কলিঃপ্রে বৎসর শত
হইল অতীত;
একদিন বিশ্বপতি সহসা মন্ত্রণা-গৃহে
আসি উপনীত।
বদনে বিষাদ ছায়া, চক্ষু তাঁর ছল ছল
করুণার জলে,
বসিল মন্ত্রীর দল শঙ্কিত বিস্মিত মনে
রাজপদতলে।
কি যেন ভাবের স্রোত বহিতে লাগিল ব্যাপি
বিশ্বচরাচর;
বিশ্ব কি থাকিতে পারে, আকুল আপনি যবে
মহা-মহেশ্বর?
কতক্ষণ গেল চলি; প্রভু তবে কহিলেন—
"শুন মন্ত্রিগণ,
রাজ্যের বিধানগুলি পরিবর্ত্তনের কিছু
আছে প্রয়োজন।

TORN PAGES

কলিকালে জীবকুল আচরিছে কত পাপ,
কত হিংসা দ্বেষ ;
সে পাপের প্রতিফল— গুরু লঘু দণ্ড নানা
করেছি নির্দ্দেশ।
সকল দণ্ডের মাঝে, অকাল মরণ দিয়া
প্রিয়জনক্ষয়,
কঠিন হইতে যেন কঠিন হয়েছে আহা,
নিঠুরতাময় !
শতটি বৎসর মাত্র প্রবর্ত্তন করিয়াছি
কলির বিধান,
পৃথিবীর আর্ত্তনাদে পাষাণ গলিয়া গেল,
স্বর্গ কম্পমান !
আর দণ্ড সমুদয় বরঞ্চ করিয়া দিয়া
সুকঠিনতর,
অকাল-মরণ হতে আমার সন্তানগণে
অব্যাহতি কর।
যাহাদের প্রিয়জন অকালে পৃথিবী হতে
আনিয়াছ হরি,
ফিরাইয়া দেহ সবে পৃথিবীতে পুনর্ব্বার,
বিলম্ব না করি।"

এ শুভ সম্বাদ নব নিমেষে প্রচার হল
স্বর্গলোকময়।
কোটি কণ্ঠ সমস্বরে স্বর্গ কাঁপাইয়া দিল
গাহি জয় জয়।
প্রিয়জনবিরহিত স্বর্গগত বহুজন
উৎসব পুলকে
সাজাল অমরাবতী লক্ষ কোটি পারিজাতে,
অসংখ্য আলোকে।
কিন্তু বহু নারীজন মন্ত্রীরে কহিল আসি
মিনতি করিয়া—
"আমাদের সর্ব্বজনে কেমন করিয়া প্রভু
দিবে ফিরাইয়া ?
আমরা এসেছি ফেলে আমাদের পতিগণে
গৃহশূন্য করে',
কিন্তু সে সকল গৃহ আজিও কি শূন্য আছে
আমাদের তরে ?
যদি পূর্ণ হয়ে থাকে,— যদি দেখি আমাদের
স্থান আর নাই,—
কি হবে তা হলে প্রভু ? স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, রসাতলে
কোথা পাব ঠাঁই ?"
ইহা শুনি মন্ত্রিবর চিন্তাগ্রস্ত রহিলেন
ধরি বহুক্ষণ।
কহিলেন অবশেষে— "সত্য কি হইতে পারে
হেন অঘটন ?
অবশ্য এ কলিকাল, আচরিছে বহু পাপ
মর্ত্ত্যবাসিগণে ;
প্রেম-অপমান, যাহা ঈশ্বরের অপমান,
করিবে কেমনে ?
বিভুর আদেশ তবে আপাততঃ কিছুকাল
স্থগিত রাখিয়া,
পরীক্ষার তরে দিব তোমাদের একজনে
মর্ত্ত্যে পাঠাইয়া।
যে ছিলে জীবিতকালে সকলের সমধিক
স্বামীসোহাগিনী,
পৃথিবী ভ্রমণ করি আসিয়া বর্ণনা কর
সকল কাহিনী।"

স্বর্গ খানি আলো করি একটি রমণী ছিল
—যমুনাসুন্দরী।
সবে মিলি, পৃথিবীতে পাঠাতে চাহিল তারে
নির্ব্বাচন করি।
কে না জানে যমুনায় কত ভালবাসিত সে
যমুনার স্বামী,
যমুনা ছাড়িয়া আর কিছু নাহি ভাবিত সে
সারা দিন যামি'।
অমরার কত নারী (পরে আসিয়াছে যারা)
দেখিয়াছে চোকে,
উন্মাদ যমুনা-পতি পথে পথে কেঁদে ফিরে
যমুনার শোকে।

যমুনার দেশ হতে যে রমণী আসিয়াছে
সবার নূতন,
সে কহিল—"শুনিয়াছি কেমনে প্রেমিক করে
বিরহ-যাপন।
কারে না কহিয়া কিছু এক'দিন গঙ্গাধর
ছাড়ি গেল দেশ।
বহুকাল বন্ধুগণ কিছু না সম্বাদ পায়,
কিছু না উদ্দেশ।
অবশেষে একদিন পরিচিত পান্থজন
কহিলেক আসি—
মথুরায় গঙ্গাধর যমুনা-নদীর কূলে
ফিরিছে উদাসী।
সেইখানে নিজহাতে রচিয়াছে একখানি
মৃত্তিকা-আলয়,
মসীবর্ণ লেপিয়াছে গৃহের উপরে, নিম্নে,
চারি ভিত্তিময়।
যমুনার যাহা ছিল বসন, ভূষণ আদি,
গিয়াছে লইয়া ;
রাখিয়াছে সমুদয় পরম যতন করি
গৃহে সাজাইয়া।
কহিয়াছে, জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি
সেথা করি বাস,
যমুনার সুশীতল সুমধুর কোলে লবে
অন্তিম নিশ্বাস।"
শুনিয়া সকল কথা দুটি বিন্দু বরষিল
যমুনার আঁখি।
সে দুর্লভ সুধা-ফল নিমেষে হরিয়া নিল
নন্দনের পাখী।
যমুনার ছিল এক সুরকন্যা প্রিয়সখী,
সঙ্গে লয়ে তায়,
চন্দ্রিকা সাগর খানি সন্তরণ করি দোঁহে
নামিল ধরায়।

মথুরা নগরী দিয়া যমুনা বহিয়া যায়
নদী কলস্বনা।
যমুনা তাহার তীরে বহু অন্বেষণ করি
পতি পাইল না।
সখী দুটি, জ্যোৎস্না হতে, ফুল-পরিমল হতে,
লঘুতরা অতি—
পলকে অনেক দেশ পাতি পাতি অন্বেষিল,
মিলিল না পতি।
যখন হইল নিশা সুগম্ভীর দ্বিপ্রহরা,
চন্দ্র তন্দ্রাতুর,
পাইল যুগল সখী সুনিভৃত শৈলদেশে,
পুরী বহুদূর।
যমুনার আঁখি দুটি তথা কি দেখিল হায় !
—গঙ্গাধর তার
বিবাহ করিয়া পুনঃ পেতেছে নূতন করি
সুখের সংসার।
আর সে সন্ন্যাসী নাহি উদ্‌ভ্রান্ত বিরহী যুবা,
নাহি ছাই দেহে ;
সেজেছে নবীন সাজে, সমর্পি সে ছাইগুলি
যমুনার স্নেহে !
জানালা রয়েছে খোলা ; শয়ন-মন্দিরে তার
জ্যোৎস্না প্রবাহিত,
নিদ্রা-সুখে অচেতন, নবীনা প্রেয়সী বালা
কণ্ঠে বিলম্বিত।
স্বর্গবাসী প্রেতাত্মার অতি সমীপতা হেতু,
স্বপ্ন দেখে তায়,
আকুল ক্রন্দনে জাগে ; ভুলিতে পারেনি, আহা,
আজো যমুনায় !
জাগিয়া উঠিয়া বসি, নতনেত্রে ছলছল
চাহি প্রিয়ামুখে,
অপরাধীটির মত শিহরিয়া শিহরিয়া
অনুতাপ-দুঃখে।
জীবনের ফুলবনে যেন যমুনার ছায়া
তুহিন-সম্পাত !
বহুযত্নে সুরবাঁধা হৃদয়বীণার তারে
লৌহ-দণ্ডাঘাত !
কি দারুণ মর্ম্মব্যথা বাজিল যমুনা-বুকে
পূর্ব্বকথা স্মরি !

মানুষ হইত যদি, দয়াবতী মূর্চ্ছা আসি
নিত জ্ঞান হরি।
ধরিয়া সখীর গলা কাঁদিল যমুনা কত
ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া।

কহে বালা, দেখ সখি, দেখ ঐ কত জন,
কত লক্ষজন,
এইরূপে পৃথিবীতে করিয়াছে প্রণয়ের
বিশ্বাসঘাতন।

প্রিয়সখী সুরবালা কি বলে' সান্ত্বনা দিবে
পায় না খুঁজিয়া।

যত কহে দেববালা, পশে না সান্ত্বনা বাণী
যমুনার প্রাণে,
অবশেষে লয়ে তারে ফিরিয়া চলিয়া গেল
স্বর্গধাম পানে।

সকল শুনিয়া মন্ত্রী ভাবিলা কেমনে হবে
আদেশ পালন।
যমুনার মত যারা, তাদের ফিরায়ে দিলে
মর্ত্ত্য জ্বালাতন!
শুধু যদি তারা যায়, যাদের পাইলে মর্ত্ত্য
কোল পাতি লবে,
এ মহাবিশ্বের রাজা পক্ষপাত দোষে দোষী
হইবেন তবে।
যথাকালে মন্ত্রিবর জানাইলা সব কথা
বিশ্বপতি-পায়।
শুনিয়া বিষাদে বিভু আপন আদেশ-বাণী
রোধি দিলা হায়।

২রা কার্ত্তিক, ১৩০৫।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

উর্ব্বশী।*

উর্ব্বশী, রম্ভা, মেনকা, তিলোত্তমা। এই সুরললনাদিগের নাম কে না জানে? স্বর্গনর্ত্তকীদিগের সংখ্যা বিস্তর, কিন্তু এই নামগুলি সুপরিচিত। প্রাচীন গ্রন্থে আরও বহু নামের উল্লেখ আছে—ঘৃতাচী, পূর্ব্বচিত্তি, স্বয়ম্প্রভা, মিশ্রকেশী, দণ্ডগৌরী, বরূথিনী, গোপালী, কুম্ভযোনি, প্রজাগরা, চিত্রসেনা, চিত্রলেখা, সহা প্রভৃতি। পৃথিবীতে যে ভোগের প্রবৃত্তি, স্বর্গে সেই ভোগের কল্পনা। যে কালে এই সুন্দরীদিগের নাম আর্য্যাবর্ত্তে প্রচলিত ছিল, সে কালে মনে হয় স্বর্গের কল্পনা এ সময়কার মত ছিল না। পূর্ব্বকালে স্বর্গ এরূপ দূরস্থিত, নিরুদ্দিষ্ট, অস্পষ্ট স্থান ছিল না। হয় কাশ্মীরে, না হয় হিমালয়ের অন্য কোন স্থানে স্বর্গ ছিল। স্বর্গে মর্ত্ত্যে সাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিল, মানুষের সঙ্গে দেবতাদিগের কুটুম্বিতা ছিল, মানুষের সকল কর্ম্মে দেবতার দখল ছিল। এই কারণে প্রাচীন স্বর্গকল্পনায় তেমন অলৌকিকতা নাই। যাহা পৃথিবীতে দেখিতে পাই তাহাই স্বর্গে কল্পিত হইত। সেই লালসা, সেই ভোগ, সেই সুখ, সেই দ্বন্দ্ব কলহ, সেই বিচ্ছেদ মিলন। তবে পৃথিবীতে যাহা অসম্ভব, স্বর্গে তাহা সহজসম্ভব। পৃথিবীতে যাহা নশ্বর, ক্ষণভঙ্গুর, স্বর্গে তাহা অবিনশ্বর, চিরস্থায়ী। পৃথিবীতে ফুল ফুটিয়া ঝরিয়া পড়িয়া যায়, ঐশ্বর্য্য নিঃশেষিত হয়, যৌবন ফুরাইয়া যায়, নিত্যতা কিছুতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। স্বর্গের কল্পনায় সমস্ত অনন্ত—জরা নাই, মৃত্যু নাই, ভোগে অতৃপ্তি নাই, যৌবনের পর বার্দ্ধক্য নাই। সেই স্বর্গবাসিনী অনন্তযৌবনা উর্ব্বশী। অক্ষয় রূপ, অক্ষয় যৌবন, অক্ষয় বিলাসলালসা। এই সকল সুরকামিনীগণ একদিকে যেমন চিরসুন্দরী অপর দিকে সেইরূপ ভয়ঙ্করী। যে স্থলে ইন্দ্রের বজ্র ব্যর্থ হইত সে স্থলে ইঁহারা সফল হইতেন। যখন কোন কঠিন তপস্বীর সাধনায় ইন্দ্রাসন টলিত, দেবরাজ শঙ্কিত হইতেন, তখন তিনি সেই কঠোর সাধকের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিতেন না, কারণ বজ্র তপস্যাবলে প্রতিহত হইত। কিন্তু বজ্রাপেক্ষা অমোঘ অস্ত্র এই সুরনর্ত্তকীদিগকে হতভাগ্য তপস্বীর প্রতি নিক্ষেপ করিতেন; বজ্রাঘাতে যে যোগাসন টলিত না, অপ্সরার বিলোল কটাক্ষে তাহা বিচলিত হইত, তাহার লীলাভঙ্গীতে তপস্যা ভঙ্গ হইত। ইন্দ্র পুনর্ব্বার নিশ্চিন্ত হইয়া ইন্দ্রাসনে উপবেশন করিতেন।

এই মন্দারপারিজাতশোভিত, দেবসঙ্কুল, শুচিস্মিতা ইন্দ্রাণীকর্ত্তৃক পবিত্রিত, বিদ্যাধরগন্ধর্ব্বগীতে ধ্বনিত, অপ্সরাশিঞ্জিনীমুখরিত অমরাবতী কিয়দংশ কবিকল্পিত, কিছু বিশ্বাসগঠিত। কবি যেমন দেখাইয়াছেন আমরা সেইরূপ দেখিয়াছি। প্রাচীন কাব্যাদিতে যে সকল অপ্সরাদিগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে কোন বিশেষত্ব লক্ষিত হয় না। অসামান্য সৌন্দর্য্য এবং অক্ষুণ্ণ যৌবন, এবং সেই কারণে অহিত সাধন করিবার ক্ষমতা অসাধারণ—ইহাতে স্বর্গে মর্ত্ত্যে বলের ন্যূনাধিক্য ব্যক্ত হয়, বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। কবির বর্ণনাও সেইরূপ।

উর্ব্বশী বেদের সমসাময়িক। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে ৯৫ সূক্তে উর্ব্বশী ও পুরূরবার আখ্যান কথিত হইয়াছে। সে উপাখ্যান রূপকার্থ। মহাভারতে উর্ব্বশীকে মানুষী মূর্ত্তিতে প্রথম দেখিতে পাই। বনপর্ব্বে অর্জ্জুন ইন্দ্রলোকাভিগমন করিয়াছেন। দেবরাজের ইঙ্গিতে উর্ব্বশী রাত্রিকালে অর্জ্জুনের গৃহে অভিসারে গমন করিতেছেন। মহাভারতের বর্ণনা কিছু বাদ দিয়া উদ্ধৃত করিতেছি।

* গীতিকবিতা। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত।

"তখন সেই পৃথুনিতম্বিনী স্বীয় নিবাস হইতে বহির্গত হইয়া পার্থ-ভবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। সেই লাবণ্যবতী ললনার সুকোমল, কুঞ্চিত, কুসুমগুচ্ছসুশোভিত, সুদীর্ঘ কেশপাশ, ভ্রূবিক্ষেপ, আলাপমাধুর্য্য ও সৌম্যাকৃতি অনির্ব্বচনীয় সুষমা সম্পাদন করিয়াছিল। তাহার বদন-সুধাকরসন্দর্শনে শশধরও লজ্জিত হইলেন। সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দিব্যচন্দনচর্চ্চিত, বিলোল হারাবলি-ললিত, পীনোন্নত পয়োধরযুগল বিকম্পিত হওয়াতে পদে পদে নমিতাঙ্গী হইয়া গমন করিতে লাগিল। তাহার ত্রিবলীদামমনোহর কটিদেশের কি অনির্ব্বচনীয় শোভা! কিঙ্কিণীকিণলাঞ্ছিত পাদদ্বয় কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় উন্নত; গূঢ়গ্রন্থি অঙ্গুলি সকল তাম্রবর্ণ ও আয়ততল। একে ত সেই সুরসুন্দরী সহজেই মদনোন্মত্ত, তাহাতে আবার পরিমিত সুরাপানে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া বিবিধ বিলাস বিভ্রম সহকারে বাক্‌পথাতীত প্রিয়দর্শনা হইয়া উঠিল। সেই সুরকামিনী মেঘবর্ণ অতি সূক্ষ্ম উত্তরীয় বসন ধারণ করাতে যেন অভ্রাবৃতকৃশ চন্দ্রলেখার ন্যায় বিরাজিত হইতে লাগিল।"

এরূপ বর্ণনার জন্য স্বর্গের আবশ্যক নাই। এই পৃথিবীতে অদ্যাবধি এইরূপ ঘটিয়া থাকে। উর্ব্বশীকে প্রত্যাখ্যান করায় অর্জ্জুনের মহত্ত্ব প্রকাশ পায়; কিন্তু উর্ব্বশীর আচরণে কোনরূপ অসাধারণতা লক্ষিত হয় না। বিষ্ণুপুরাণেও পুরূরবা-উর্ব্বশী-সংবাদ লিখিত আছে। মহাভারতের যুগ ত্যাগ করিয়া কাব্যের আর এক যুগে বিক্রমোর্ব্বশীতে আমরা উর্ব্বশীকে দেখিতে পাই। কালিদাস রূপের কবি। রূপের এমন কবি এ পর্য্যন্ত আর জন্ম গ্রহণ করে নাই। কালিদাসের কালে আর এ কালে তেমন অধিক প্রভেদ নাই। মহাভারতের মত কাব্য কল্পনা তখন উঠিয়া গিয়াছে। পুরূরবা ও উর্ব্বশীর উপকথা কালিদাস নিজের মনের মত করিয়া, নূতন করিয়া নাটকাকারে বলিলেন। বিক্রমোর্ব্বশী নাটকে উর্ব্বশীর পূর্ণ বর্ণনা কোন স্থানে নাই। কালিদাসের এই অপূর্ব্ব কৌশল। বর্ণনায় যেমন অদ্বিতীয়, সেইরূপ প্রতিভা-বলে কোথায় বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন তাহাও বুঝিতে পারিতেন। উর্ব্বশী ঋষিবর্ণিতা স্বর্গসুন্দরী—তাহার আর নূতন করিয়া বর্ণনা করিয়া কি হইবে? কালিদাস সে প্রয়াস পান নাই। কেবল চতুর্থ অঙ্কে অতি বিচিত্র কৌশলের সহিত বিরহব্যাকুল রাজার বিলাপে উর্ব্বশীর খণ্ড বর্ণনা গ্রথিত করিয়াছেন। পুরূরবা বলিতেছেন,

"আরক্তরাজিভিরিয়ং কুসুমৈর্নবকন্দলী সলিলগর্ভৈঃ।
কোপাদ্ অন্তর্বাষ্পে স্মরয়তি মাং লোচনে তস্যাঃ॥"

পুনশ্চ, কালিদাসের প্রিয় পদচিহ্ন বর্ণনা,—

"পদ্ভ্যাং স্পৃশেদ্ বসুমতীং যদি সা সুগাত্রী
মেঘাভিবৃষ্টসিকতাসু বনস্থলীষু।
পশ্চান্নতা গুরুনিতম্বতয়া ততোস্যা
দৃশ্যেত চারুপদপংক্তিরলক্তকাঙ্কা॥"

সর্ব্বত্র উর্ব্বশীর এই রূপ কল্পনা। হাবভাবলীলাময়ী রূপসী, স্থিরযৌবনা, তপস্যাবিঘ্নকারিণী মায়াবিনী। মহাভারতের যুগ এখন বহু দূরে, কালিদাসও সুদূর অতীতে। এখন উর্ব্বশীকে আমরা কি চক্ষে দেখিব? সে কালে অন্য রূপ কল্পনার প্রয়োজনই হয় নাই। যে স্বর্গসুখাভিলাষী, তাহার চিত্তে লালসা, যে যোগী সে কামনা ত্যাগ করিত। সে কালের বিশ্বাস, সে কালের কল্পনা ত্যাগ করিয়া এখনকার কবি আমাদিগকে উর্ব্বশীর আর এক মূর্ত্তি দেখাইয়াছেন। রবীন্দ্র বাবু উর্ব্বশীর যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা সুরসুন্দরীর উপযুক্ত হইয়াছে। অতি অপূর্ব্ব, অমূর্ত্ত রূপের কল্পনা। উর্ব্বশীর অতি মহীয়সী প্রতিকৃতি—কামগন্ধবর্জ্জিত, অথচ মদনমদোন্মাদকারী। বন্ধনশূন্য, ভুবনমোহন রূপ, সেই রূপে বিশ্বের যৌবন মুগ্ধ, লুব্ধ হইয়া রহিয়াছে। উর্ব্বশীর কল্পনা আর ব্যক্তিগত রহিল না, প্রকৃতির মূর্ত্তিমতী উদ্দাম যৌবনে লীন হইয়া গেল।

রবীন্দ্র বাবুর এই উৎকৃষ্ট কবিতা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া দিলে পাঠক ইহার চমৎকারিত্ব বুঝিতে পারিবেন। যেমন ছন্দ, তেমনি ভাষা, তেমনি ভাব। প্রথমে কবি উর্ব্বশীকে মানবীর ন্যায় কল্পনা করিতেছেন। এই বন্ধনমুক্তা, স্বেচ্ছাচারিণীকে কে আপনার বলিবে?

"নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসি,
হে নন্দনবাসিনী উর্ব্বশি!"

কিছুই না! যে সকল সম্বন্ধে রমণী পুরুষের সহিত আবদ্ধ এই রমণীর সহিত কোন পুরুষেরই সেরূপ কোন সম্বন্ধ নাই। স্বর্গেও না, পৃথিবীতেও না। কিন্তু এই সম্পর্কশূন্য, স্বেচ্ছাবিহারিণী রমণীকে নির্লজ্জা, সামান্যা নারীর তুল্য মনে করিও না।

"উষার উদয় সম অনবগুণ্ঠিতা
তুমি অকুণ্ঠিতা।"

ঋগ্বেদের মন্ত্রে উর্ব্বশী পুরূরবাকে বলিতেছেন, "আমি প্রথম উষার ন্যায় চলিয়া আসিয়াছি।" অনেকের মতে উর্ব্বশীর আদি অর্থ উষা। ইহার লজ্জাহীনতাও স্বর্গেরই উপযোগী, উষার বিকাশের সহিত তুলনীয়। তাহার পর কবির মানবসুলভ কৌতূহল। চিরকাল প্রাচীন কাব্য গ্রন্থাদিতে উর্ব্বশীর প্রসঙ্গ দেখিয়া আসিতেছি। কে এই উর্ব্বশী? কোথা হইতে অনন্ত রূপ, অনন্ত যৌবন, অনন্ত রাগরঙ্গ লইয়া ইন্দ্রের অনন্ত নৃত্যশালায় উপনীত হইল?

"বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি,
কবে তুমি ফুটিলে উর্ব্বশি!"

এ প্রশ্নের উত্তর কবি স্বয়ং দিতেছেন।

"আদিম বসন্তপ্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে,
ডান হাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে;

* * * *

কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্রবন্দিতা,
তুমি অনিন্দিতা।"

হয় ত সমুদ্র-মন্থনের মোহিনী এই উর্ব্বশী! যে রূপ দেখিয়া সুরাসুর বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় চাহিয়াছিল, হয় ত সেই রূপের অংশ এই উর্ব্বশীতে বর্ত্তিয়াছে। তাহাতেও কৌতূহল পরিতৃপ্ত হইল না। সমুদ্র-মন্থনের পূর্ব্বে অগাধ জলতলে এই বিশ্ববিমোহন রূপ কোথায় লুক্কায়িত ছিল? উর্ব্বশী কি কোন কালে "মুকুলিকা বালিকা" ছিল না? কাহার ঘরে এমন কন্যা জন্মিয়াছিল, কে ইহাকে লালন পালন করিয়াছিল?

"মণিদীপদীপ্তকক্ষে সমুদ্রের কল্লোল সঙ্গীতে
অকলঙ্ক হাস্যমুখে প্রবাল পালঙ্কে ঘুমাইতে
কার অঙ্কটিতে?
যখনি জাগিলে বিশ্বে, যৌবনে গঠিতা
পূর্ণ প্রস্ফুটিতা।"

এই পূর্ণপ্রস্ফুটিতা উর্ব্বশীই বিশ্বসংসারে পরিচিত। বাল্যকাল সমুদ্রগর্ভের অন্ধকারে লুপ্ত, কখন ছিল কি না তাহাও কেহ জানে না। এই বিশ্বপরিচিত উর্ব্বশীকে কেমন করিয়া সম্ভাষণ করিতে হইবে!

"যুগ যুগান্তর হতে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী
হে অপূর্ব্বশোভনা উর্ব্বশি!
মুনিগণ ধ্যান ভাঙ্গি দেয় পদে তপস্যার ফল,
তোমারি কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবন যৌবন-চঞ্চল,
তোমার মদির গন্ধ অন্ধ বায়ু বহে চারিভিতে,
মধুমত্ত ভৃঙ্গসম মুগ্ধ কবি ফিরে লুব্ধ চিতে,
উদ্দাম সঙ্গীতে।
নূপুর গুঞ্জরি যাও আকুল-অঞ্চলা
বিদ্যুৎ-চঞ্চলা।"

বিশ্বের প্রেয়সী তুমি! ত্রিভুবনের যৌবন তোমার কটাক্ষে, নহিলে তুমি স্বর্গবাসিনী কেন? কবির কল্পনা তোমাকে বেষ্টন করিয়া থাকে, বিশ্ব সংসারের যৌবন প্রসারিত হস্তে তোমার মিলন যাচ্ঞা করে। ত্রিভুবনে যৌবন জাগ্রত করিয়া দিয়া তুমি ক্ষান্ত হও না, সর্ব্বত্র উন্মাদনা উৎপাদিত কর।

"সুরসভাতলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লসি
হে বিলোল-হিল্লোল উর্ব্বশি!
ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধুমাঝে তরঙ্গের দল,
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি ওঠে ধরার অঞ্চল,
তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা,
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা,
নাচে রক্তধারা।
দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে
অয়ি অসম্বৃতে!"

এইরূপ আর একটী শ্লোক বঙ্গভাষায় আবার দেখিব বড় সাধ আছে। উর্ব্বশীর বর্ণনা বিশ্বপরিপূরিত রূপ। নক্ষত্রের মালা গলায়, কটিতে বিদ্যুতের মেখলা। যে সে রূপসী হইলে কি বিশ্বের প্রেয়সী হয়, দেবতা মানবকে চিরকাল মোহিত করিতে পারে?

কিন্তু এই যে অতুলনীয়, অক্ষয় রূপ, রূপের মোহ, ইহা কি কেবল সুখের কারণ? তাহা নহে। এত রূপ অসীম দুঃখের মূল। যাহার রূপ আছে সে দুঃখ পায় না, কিন্তু যে সেই রূপে আকৃষ্ট, সেই দুঃখ পায়। চরণনিপতিত কত হৃদয় দলিত করিয়া রূপগর্ব্বভরে উর্ব্বশী চলিয়া গিয়াছে কে তাহার গণনা করিবে? কত তপস্যাচ্যুত তপস্বীর অনুতাপ, কত প্রণয়ীর বিরহ উর্ব্বশীকে আশ্রয়

করিয়া আছে, কে জানে? এই জন্য কবি কহিতেছেন,

"জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা,
ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণ-শোণিমা,
মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ব-বাসনার
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতি লঘুভার!"

অকস্মাৎ কবি বর্ত্তমানের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন, কোথায় উর্ব্বশী! তখন আকুল প্রশ্ন উঠিল,

"আদিযুগ পুরাতন এ জগতে ফিরিবে কি আর—
অতল অকূল হতে সিক্তকেশে উঠিবে আবার?
প্রথম সে তনুখানি দেখা দিবে প্রথম প্রভাতে,
সর্ব্বাঙ্গ কাঁদিবে তব নিখিলের নয়ন আঘাতে
বারিবিন্দুপাতে!"

উত্তর আসিল,

"ফিরিবে না ফিরিবে না—অস্ত গেছে সে গৌরব-শশী,
অস্তাচলবাসিনী উর্ব্বশী।"

আর কি ফিরিবে না? উর্ব্বশীর অনন্ত যৌবন, অর্জ্জুনের দৃঢ়তা, আর কি ফিরিবে না?

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

তুষার কাহিনী।

এই সুজলা শস্যশ্যামলা মাতৃরূপিণী ভারতভূমির অভ্যন্তরে প্রকৃতি দেবী কত মনোহর বেশ ধারণ করিয়া ভ্রমণকারীর ব্যাকুল চক্ষু তৃপ্ত করিতেছেন তাহা সঙ্কীর্ণ গৃহাভ্যন্তরে জীবন অতিবাহিত করিয়া আমরা বুঝিতে পারি না। রৌদ্রতাপিত, ধূলিধূসরিত, এই কলিকাতা নগরীর জনতাজাত কোলাহলমধ্যে বাস করিয়া কেহ কি কল্পনা করিতে পারেন যে ভারতে ধবল তুষারাচ্ছাদিত মনোহর দেশ বিরাজ করিতেছে? আমরা মাতৃভূমির অভ্যন্তর ভাগে কোন্ স্থানে প্রকৃতি কি ভাবে ক্রীড়া করিতেছেন তাহা দর্শন না করিয়াই বিদেশ ভ্রমণ জন্য ব্যস্ত হই। আমার বিশ্বাস এই বিশাল ভারতভূমির সকল স্থান দর্শন করিলে স্বদেশ-প্রেম বর্দ্ধিত না হইয়া থাকিতে পারে না। বাল্যকাল হইতে দেশ-ভ্রমণ-বাসনা আমার একান্ত প্রবল। দেশ ভ্রমণের সুযোগ পাইলেই হৃদয় এক নূতন উৎসাহ ও আনন্দে নাচিয়া উঠে। এই ভাবে উত্তেজিত হইয়া হঠাৎ একদিন রাত্রির ট্রেণে কুমায়ুন রাজ্যের অন্তর্গত তুষার'দেশ দর্শন করিতে যাত্রা করিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য উৎসাহের আতিশয্য বশতঃ প্রয়োজনীয় গুরুভার শীতবস্ত্রাদি সংগ্রহ করিতেও ভুলিয়া গিয়াছিলাম। বেরেলী পর্য্যন্ত পঁহুছিতে ভয়ানক গ্রীষ্মে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। "কাঠগুদামে" পঁহুছিবার পর কুমায়ুন রাজ্যের শ্যামল শান্তিপূর্ণ গ্রাম্য দৃশ্য চক্ষু মোহিত করিল। অদূরে গিরিমালা আকাশপথে মস্তক উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান। এই শ্রান্ত পথিককে যেন সাদর অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। আমরা ত্বরিতপদে শকট হইতে লগেজ প্রভৃতি নামাইয়া ষ্টেসন-সংলগ্ন বিশ্রামগৃহে স্নান ও প্রাতরাশ সম্পন্ন করিয়া পর্ব্বতারোহণ পর্ব্ব আরম্ভ করিলাম। অশ্ব ও ডাণ্ডি নামক যান এদেশে গমনাগমনের একমাত্র সম্বল। যাঁহাদের ভাগ্যে দার্জ্জিলিং দর্শন ঘটিয়াছে তাঁহারাই বুঝিতে সক্ষম হইবেন এই ভাবে ভ্রমণ কতদূর আরামজনক। তবে মন্দের ভাল এই যে দার্জ্জিলিংএর ভুটিয়া ডাণ্ডিওয়ালাদের তুলনায় এই পার্ব্বত্য হিন্দুবাহকগুলি শতগুণে বিনীত ও আজ্ঞাবহ। কুমায়ুন রাজ্যের রাজধানী "আলমোরা" নগরী আমাদের গম্যস্থান। চারি দিন বিজন পার্ব্বত্য বনস্থলী অতিক্রম করিয়া তথায় পঁহুছিতে হইবে। উন্নত গিরিমালা প্রাচীরের ন্যায় ক্রমশঃ আকাশপথে উঠিয়াছে। সোপানস্তরের ন্যায় উচ্চ পর্ব্বত-দেহ বেষ্টনপূর্ব্বক সঙ্কীর্ণ বক্র পথ অবলম্বন করিয়া আমরা প্রকৃতির অপূর্ব্বগম্ভীরতাবিরাজিত সৌন্দর্য্যরাশিতে ডুবিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। প্রদোষ কালের বিরল অন্ধকার মধ্যে আমরা রাত্রিযাপন জন্য একটী পান্থশালায় আশ্রয়-গ্রহণ করিয়া যে আরাম বোধ করিলাম, তাহা বর্ণনীয় নহে। অতি প্রত্যূষে স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া আবার যাত্রা করিলাম। "ভীমতাল" নামক পরম রমণীয় হ্রদের তীরস্থিত বিশ্রামগৃহে আশ্রয়লাভ করিয়া দ্বিতীয় রজনী দিবস যাপনের বন্দোবস্ত করা গেল। পর্ব্বতের ক্রোড়াভ্যন্তরে লুক্কায়িত এই স্থানে বিশাল নীলবর্ণ জলরাশিপূর্ণ "ভীমতাল" হ্রদ ও তাহার তীরস্থিত হিন্দু দেবদেবীর মন্দির দর্শন করিয়া হৃদয় মন মুগ্ধ হইল। এমন কি এস্থানে আজীবন কাটাইতেও প্রস্তুত হইয়াছিলাম। মহা উচ্চ গিরিশ্রেণীর অন্তরালে এই ক্ষুদ্র গ্রামটী অবস্থিত। অত্যন্ত দুরারোহ পথ অতিক্রম

হইতেছিল। সূর্য্যের দিকে মুখ রাখিয়া ক্রমাগত উচ্চ পর্ব্বতারোহণ করিতে করিতে অল্পকালমধ্যেই মহাক্লান্তি বোধ ও শ্বাসক্রিয়া যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। সহযাত্রিগণ পশ্চাতে ছিলেন, তাঁহাদের আগমন প্রতীক্ষার ছলে ঘনপত্রবিরাজিত এক মহাকায় তরুতলে বিশ্রাম ও ঝরণার জল অঞ্জলিযোগে পান করিয়া যেন নূতন প্রাণ পাইলাম। আবার পর্ব্বতের উপত্যকা দেশে অবতরণ করিয়া খরস্রোতা এক নদীর মুখে যাইয়া পড়িলাম। নদীবক্ষে পারাপারের জন্য বৃহৎ সেতু ছিল; তাহা অবলম্বন পূর্ব্বক বাগেশ্বর নামক স্থানের ডাক বাঙ্গলায় অপরাহ্ণ সময়ে পঁহুছিলাম। চারিদিকে উন্নত পর্ব্বতমালা নীলাকাশ ভেদ করিয়া দণ্ডায়মান। পর্ব্বতদেহ পাইন প্রভৃতি বিশাল তরুরাজীপূর্ণ। সম্মুখে পার্ব্বতীয়া নির্ঝরিণী কুলু কুলু ধ্বনিতে বাঙ্গলার পাদদেশ ধৌত করিয়া বহিতেছে। এমন মহিমাপূর্ণ দৃশ্য দর্শন করিয়া সকল পথ-শ্রান্তি দূর হইল। নদীর কূলদেশে বৃহৎ একখণ্ড পাষাণে উপবেশন পূর্ব্বক বিধাতার অপূর্ব্ব শিল্প-কৌশল লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। স্থানটী এমনই অপূর্ব্ব শোভা ও শান্তিপূর্ণ, লেখনী দ্বারা তাহার প্রকৃত বর্ণনা হয় না। এস্থানে অসহ্য গ্রীষ্মতাপে সকলেই অত্যন্ত ক্লেশ ভোগ করিলাম। বাতাস যেন আগুনের তাপ ঢালিতেছিল। স্নানাদি করিয়াও তৃপ্তি বোধ হইল না। রাত্রিযোগে বারাণ্ডায় শয়ন করা গেল। কিঞ্চিৎ প্রাতরাশ সঙ্গে লইয়া প্রত্যূষে আবার যাত্রা করিলাম। আবার পর্ব্বতারোহণ পর্ব্ব আরম্ভ হইল। অনেক কালের পুরাতন হিন্দু দেবদেবীর অনেক মন্দির পর্ব্বতের নানাস্থানে বিরাজ করিতেছিল। দুই একটী দর্শনও করিলাম। এই পার্ব্বত্য রাজ্যে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী লোক এত বিরল যে শতের মধ্যে একজনও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। মধ্যাহ্নসময়ে লোহাক্ষেত নামক উচ্চ পার্ব্বত্য বাঙ্গলায় আশ্রয় লইলাম। এস্থানে পঁহুছিতে ক্ষুধা তৃষ্ণা ও পথশ্রমে যে ভয়ানক ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম তাহা বর্ণনীয় নহে। পথিমধ্যে বৃহৎ জাতীয় অনেক মৎস্য ক্রয় করিলাম, কিন্তু রন্ধনাদির সুবিধা কোথায় ঘটিবে কিছুই জানিতাম না। লোহাক্ষেতের মহা দুর্গমপথ ভেদ করিয়া যে বাঙ্গলায় পঁহুছিব সে আশায় হতাশ হইয়া একটী সঙ্কীর্ণ পর্ব্বতের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া বল সঞ্চয় করিয়া লইলাম। তৃষ্ণায় যেন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছিলাম। হঠাৎ সম্মুখবর্ত্তী বৃক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল ঝুলিতেছে দেখিয়া এক কুলীর সাহায্যে প্রচুর ফল সংগ্রহ ও ভক্ষণ করিয়া যে অপূর্ব্ব তৃপ্তি লাভ করিলাম তাহা বর্ণনীয় নহে। এই ফল, "কাফল" নামে এখানে প্রসিদ্ধ। আমার সহযাত্রিগণের জন্য ৩ ঝুড়ি ফলপূর্ণ করিয়া বাঙ্গলায় পঁহুছিলাম। সকলেই এত ক্লান্ত হইয়াছিলাম যে নড়িবার শক্তিও যেন হারাইয়াছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে সুস্বাদু ঘোল ও উৎকৃষ্ট মধু অনেক পাওয়া গেল। সকলেই মহা আগ্রহের সহিত প্রচুর ঘোল মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিতে করিতে অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি বোধ করিলাম। এস্থানেই "পানসিংহ" নামক একটী পথপ্রদর্শক আমাদের তুষার দেশে গমনোপযোগী সকল ব্যবস্থা করিবার জন্য সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইল। "নন্দাদেবী" নামক সর্ব্বোচ্চ তুষারাবৃত শৃঙ্গ দর্শন করিয়া মনে হইতে লাগিল সত্যই তুষার দেশে আসিয়াছি। বরফ কাটিয়া পথ প্রস্তুত করিবার জন্য ৪ জন কুলী কোদালী হস্তে অগ্রে অগ্রে চলিল, কিন্তু তাহারা কি ভাবে আমাদের কার্য্যে আসিবে তাহা বুঝিতে না পারিয়া নিতান্ত "পাড়াগেঁয়ে" লোকের ন্যায় বিনা প্রশ্নে পথ চলিতে লাগিলাম। প্রকৃতির অবর্ণনীয় লাবণ্যরাশিতে হৃদয় ডুবিয়া গেল। পানসিংহ পথে চলিতে চলিতে কতই আত্মকাহিনী বলিয়া আমাদিগকে আমোদিত করিতে লাগিল। এমন প্রফুল্লস্বভাব মানুষ অল্পই দেখিয়াছি। মেঘে "নন্দাদেবীর" অমল শুভ্র মূর্ত্তি ঢাকিতেছে দেখিলেই সে পাহাড়ী ভাষায় সৈনিক বিক্রমের সহিত যে ভাবে মেঘকে সরিয়া যাইতে আদেশ দিত, তাহা শুনিতে শুনিতে কেহই উচ্চ হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। তুষার দেশে যাত্রা অবধি "স্বপাক সাধন" ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলাম। লোহাক্ষেতে পঁহুছিয়া দুরন্ত শীত অনুভূত হইল। মোটা শীতবস্ত্র সঙ্গে ছিল তাহা শরীরে জড়াইয়াও উষ্ণতা বোধ করিলাম না। ঘরের চিমনী ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছিল। তাহারই নিকটে বসিয়া পাক ও আহারাদি আগ্রহের সহিত সম্পন্ন করা গেল। পরদিন বিজন বনস্থলী ভেদ করিয়া চলিতে চলিতে প্রকৃতির কতই নবীন সজ্জা দর্শন করিয়া এ ক্ষুদ্রহৃদয় বিমোহিত হইতে লাগিল, তাহা ক্ষীণ লেখনী প্রকাশ করিতে অক্ষম।

মধ্যাহ্ন সময়ে এক নদীর তীরদেশে উপনীত হইলাম। এ স্থান হইতেই অশ্ব, ডাণ্ডিওয়ালা প্রভৃতি সকলকেই বিদায় দিতে হইল। কারণ তুষাররাশির উপর ইহারা কোন উপকারেই আসিবে না। পঞ্চপাণ্ডবের স্বর্গারোহণ সময়ে যেমন একে একে সকলই পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল, আমাদেরও যেন সেই অবস্থাই আসিয়াছে স্মরণ করিয়া এক অননুভূত গাম্ভীর্য্যরাশির মধ্যে হৃদয় মগ্ন হইল। নদী পার হইয়া কি অপূর্ব্ব দৃশ্যের মধ্যেই উপস্থিত হইলাম!! যে তুষাররাজ্য দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় এত ক্লেশ স্বীকার করিয়া গৃহ পরিবার হইতে এই সুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি আজি তাহা সার্থক হইল। শ্যামলবসনা প্রকৃতি আজি ধবল বেশে যোগিনীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নয়নমন বিমুগ্ধ করিতে লাগিলেন। তুষাররাশির মধ্যে পাদুকাশুদ্ধ চরণযুগল ডুবিতে লাগিল। সকলেরই হাতে ত্রিশূলাগ্র যষ্ঠি খণ্ড ছিল। তাহার সাহায্যে অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। চিনীর গাদার ন্যায় কোমল তুষার সর্ব্বত্র বিকীর্ণ রহিয়াছে। বারবার গ্রীষ্মদগ্ধ কলিকাতার অধিবাসীদিগের কথা স্মরণ হইতে লাগিল। বৃহৎ তুষার গোলক নির্ম্মাণপূর্ব্বক সহযাত্রিগণের গাত্রে ছুড়িয়া উপহার দিতে লাগিলাম। সকলেরই কেশ শ্মশ্রু ও বস্ত্রাদি তুষারাবৃত হইয়া শুভ্র বর্ণ ধারণ করিল। পথপ্রদর্শক পান সিংহ অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া কোথায় তুষাররাশি আমাদিগের দেহভার বহনের উপযোগী, তাহা বলিয়া দিতেছিল। এই তুষাররাশির নিম্নদেশ ভেদ করিয়া কত বেগবতী নদী প্রবাহিত হইতেছে তাহা ভাবিতে ভাবিতে কতই বিস্ময়সাগরে ডুবিয়া গেলাম। যদি কোথাও ভঙ্গুর তুষাররাশিতে পদ নিক্ষিপ্ত হয় তবে নিশ্চয় মৃত্যু, পানসিংহ বারবার একথা স্মরণ করাইতে লাগিল। ক্রমে তুষারাচ্ছাদিত পর্ব্বত ও ঝরণা অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে চলিতে হইল। এই পথ কতদূর বিপদসঙ্কুল তাহা বর্ণনীয় নহে। কুলীগণ কোদালীর সাহায্যে তুষার কাটিয়া সোপানের ন্যায় ধাপ যেই কাটে অমনি আমরা লম্ফ প্রদান করিয়া অগ্রসর হইতেছিলাম। কারণ মুহূর্ত্তেই আবার সে গর্ত্ত তুষারে ডুবিয়া যাইতে লাগিল। আর এক বিপদের ভয়ে আমরা দ্রুতপদে এই হিমানীপূর্ণদেশে চলিতেছিলাম। পর্ব্বতশৃঙ্গ দেশ হইতে সর্ব্বদা মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড তুষাররাশি ভীষণ শব্দে গ্রামসুদ্ধ গ্রাস করিয়া খাদে গড়াইয়া পড়ে। কখন এই দুর্ঘটনা ঘটিবে বুঝিবার উপায় নাই বলিয়াই এ পথে পথিকদিগকে প্রাণ হাতে রাখিয়া চলিতে হয়। বিপদ দূর করিবার উদ্দেশ্যে "পানসিংহ" কতই তন্ত্রমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে চলিল! উচ্চ পর্ব্বতারোহণ সময়ে পদ স্খলিত হইয়া অনেকবার পতন ঘটিয়াছিল। তুষাররাশির উপর সূর্য্য কিরণ প্রতিফলিত হইয়া যে রামধনু উৎপন্ন হইতেছিল তাহার শোভা জীবনে ভুলিব না। প্রচুর পরিমাণ শীতবস্ত্রে শরীর আবৃত করিয়াছিলাম তথাপি উত্তরীয় তুষারমিশ্রিত তীব্র বায়ুহিল্লোল সর্ব্বাঙ্গ অবশপ্রায় করিয়া ফেলিল। যষ্ঠিগাছা অবলম্বন করিয়া যে অগ্রসর হই হাতে সে শক্তিও ছিল না। বিধাতার অঙ্গুলী নির্দ্দেশে এমন স্থানে আসিয়া পড়িয়াছি বলিয়া হৃদয় অসীম কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইল। ভারতের অভ্যন্তরেই এমন হিমানী-আচ্ছাদিত দেশ বিরাজ করিতেছে পূর্ব্বে কল্পনাবলেও তাহা ভাবিতে পারি নাই। বিধাতার বিধানে কলিকাতার পিঞ্জরাবদ্ধ জীব প্রকৃতির এমন বিচিত্র লাবণ্যমাখা ক্রীড়াকাননে উপনীত হইতে সক্ষম হইয়াছি ভাবিতে ভাবিতে হৃদয় অসীম কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইল।

শুভ্রবসনা প্রকৃতি যোগিনীবেশে হৃদয়ে কতই স্বর্গের মহান্ দৃশ্য জাগাইয়া তুলিল। পাঠকমহাশয় তুষার ও বরফ একশ্রেণীভুক্ত না করেন, এই প্রার্থনা। তুষার বরফের ন্যায় কঠিন নহে। অতি কোমল তুলার রাশির মত হাতের উষ্ণতাতে নিমেষ মধ্যে দ্রব হইয়া যায়। তৃষ্ণাতুর হইয়া আগুনের উত্তাপে এ তুষার গলাইয়া পান করিলাম। শ্যামলা ধরণীর সকলই তুষারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। দুরন্ত শীতে যে প্রকার অবশদেহ হইয়াছিলাম, তাহাতে একপদও চলিতে পারিব সে ভরসা রহিল না। "হাঁটিবার গর্ব্ব কোথায় গেল" সহযাত্রীদের এ উপহাস শ্রবণ করিয়াও পদযুগলকে সম্মুখ সংগ্রামে অগ্রসর করিতে পারিলাম না। অপরাহ্ন সময়ে হিমানীপীড়িত দেহটীকে অতি কষ্টে শেষ আশ্রয়স্থল ডাক বাঙ্গলায় পঁহুছাইয়া বাঁচিলাম। দুইজন সহযাত্রী ইতিপূর্ব্বেই বাঙ্গলায় পঁহুছিয়া চিমনীতে প্রকাণ্ড আগুন জালিয়া আমাদের অভ্যর্থনা জন্য দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিলেন। গৃহে প্রবেশমাত্র কম্বল প্রভৃতি যাহা সম্মুখে ছিল তদ্দ্বারা আপাদমস্তক জড়াইয়া

করিয়া আশ্রয়স্থলে পঁহুছিলাম। ৪।৫ মাইল বিস্তৃত চঞ্চল নীলবর্ণ জলরাশির উপর পর্ব্বতচ্ছায়া ও তারকাপূর্ণ আকাশচ্ছবি প্রতিফলিত হইয়া কি মনোহর দৃশ্য দেখাইতেছিল তাহা বর্ণনীয় নহে। এই হ্রদ প্রকাণ্ডজাতীয় মৎস্যপূর্ণ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকাগুলি নিশান উড়াইয়া মৎস্যজীবীদের দ্বারা চালিত হইতেছে। অল্পসময় মধ্যেই বৃহৎ মৎস্যে নৌকা পূর্ণ করিয়া ভ্রমণকারিগণ প্রত্যাগত হইলেন দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। পরদিন অতি প্রত্যূষে আবার যাত্রা করিলাম। আজি ভীম-কল্লোলিনী পার্ব্বত্য-নদীর তীরভূমি অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এমন দুর্দ্দমনীয়া স্রোতস্বতী পূর্ব্বে দর্শন করি নাই। উন্নত পর্ব্বতমালা গগনপথ ঢাকিয়া রহিয়াছে। নিম্নে প্রবাহিণী ভীমগর্জ্জন-ধ্বনিতে এ নীরব পার্ব্বত্য রাজ্য প্রতিধ্বনিত করিয়া রণরঙ্গিণীবেশে নৃত্য করিতে করিতে ছুটিয়াছে। সুকণ্ঠ বিহগকূজনে বনস্থলী পরিপূর্ণ। স্থানটী মুনিজনমনোহর তপোবনের শোভা ধারণ করিয়াছে। দর্শনমাত্র সকল পথশ্রান্তি অপসারিত হইল। মখমলের ন্যায় কোমল শৈবাল-আচ্ছাদিত পাষাণখণ্ডে উপবেশনপূর্ব্বক প্রকৃতির এমন লাবণ্যপূর্ণ সুকোমল ছবিটী ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। আরো দুই দিন নিবিড় গহনপূর্ণ উচ্চ পর্ব্বতরাজ্য ভেদ করিয়া চলিতে চলিতে চতুর্থ দিবস মধ্যাহ্নকালে গন্তব্য স্থান আলমোরা নগরীতে পঁহুছিলাম। একজন সদাশয় বন্ধু আমাদের অভ্যর্থনার জন্য সুসজ্জিতগৃহ ও প্রচুর আহারীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের গৃহটী একটী পর্ব্বতের উপর নির্ম্মিত। গৃহদ্বারে ফলভরে অবনত দ্রাক্ষালতা ঝুলিতেছে। সম্মুখে নানা জাতীয় মনোহর বিকশিত পুষ্পপূর্ণ উদ্যান। এই স্থানে কয়েকদিন বিশ্রাম করিয়া আকাঙ্ক্ষিত স্থান তুষাররাজ্য দর্শন করিতে যাত্রা করিব স্থির করিলাম। আমাদের বন্ধু সেই দুর্গম দেশভ্রমণোপযোগী সকল আয়োজন করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

কুমায়ন রাজ্যের প্রধান নগরী আলমোরা একটী দুরারোহ পর্ব্বতের উপর স্থাপিত। দূর হইতে মেঘমুক্ত আকাশপথে অমল শুভ্র চিরতুষারাবৃত শৃঙ্গগুলি দর্শনমাত্র তুষার রাজ্যে গমনজন্য মন চঞ্চল হইয়া উঠিল! আলমোরা নগরীতে দর্শনীয় স্থান অধিক নাই। দেখার যোগ্য যে দুই একটী স্থান, ২।১ দিন মধ্যেই তাহা দেখিয়া লইলাম। কুষ্ঠাশ্রমটী বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এস্থানে কুষ্ঠ রোগের এত প্রাদুর্ভাব যে আসিবার সময়ে পথে তাহার সর্ব্বনাশক হস্তের চিহ্ন দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকদের অসীম যত্ন ও পরিশ্রমে এমন পুণ্যজনক আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়া এতগুলি দুর্গতিগ্রস্ত অসহায় মানবের যন্ত্রণা দূর হইতেছে দর্শন করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলাম। গবর্ণমেণ্টও এই কার্য্যে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য করিয়া থাকেন। আমরা এক দিন দুরারোহ সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া কুষ্ঠাশ্রমে পঁহুছিলাম। ফলফুলে শোভিত বিস্তীর্ণ উদ্যান ও দীর্ঘ শ্রেণীবদ্ধ গৃহগুলি দূর হইতে অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। প্রবেশ মাত্রই তত্ত্বাবধায়ক মহাশয় বিশেষ সমাদর প্রদর্শন করিয়া সকল স্থান দেখাইতে লাগিলেন। অল্প ব্যাধিগ্রস্ত লোকেরা হলাকর্ষণ, শস্য রোপণ ও স্কুলে শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। বহুদূরবিস্তৃত ভূমিখণ্ড কৃষিকার্য্যের জন্য অভিপ্রেত। কুষ্ঠরোগীরা কৃষিকার্য্য দ্বারা যাহা উৎপন্ন করে, তাহা তাহাদেরই নিজস্ব হয়। অনেকে শস্য ও ফল মূল বিক্রয় দ্বারা কিঞ্চিৎ অর্থসঞ্চয়ও করিয়া থাকে। নিতান্ত পীড়িত ভিন্ন সকলেই আপন আপন আহারীয় প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত রহিয়াছে দেখিলাম। তাহারা সাধারণতঃ যে সচ্ছন্দ ভাবে বাস করিতেছে মুখের প্রফুল্ল ভাবই তাহা প্রকাশ করিতেছিল। কতকগুলি রোগীর অসহ্য রোগযন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করিয়া মন এত ক্লিষ্ট হইল যে ৩।৪ দিন সেই দৃশ্য হৃদয় হইতে দূর করিতে সমর্থ হই নাই। কলিকাতা হইতে কয়েকটী বন্ধু তুষাররাজ্যে সহযাত্রিরূপে গমনের আশা দিয়াছিলেন। সেইজন্য আমরা তাঁহাদের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। আলমোরাতে শীতের প্রভাব অনুভূত হওয়া দূরে থাকুক পাখা কয়েক খানা সঙ্গে আনি নাই বলিয়া আক্ষেপ জন্মিল। মাছির এমন দৌরাত্ম্য কোথাও ভোগ করি নাই।

মাছির বিষম উৎপাতে রাত্রিকালে পর্য্যন্ত নিদ্রা যাইতে পারি নাই। দিনেও সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ডে শরীর মুখ আচ্ছাদিত করিয়া যে কষ্টে সময় কাটাইতে হইত তাহা বর্ণনীয় নহে। বাজারের নির্জ্জীব ও নীরব ভাব দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলাম। মোটা আটা, লবণ, ঘৃত প্রভৃতি জীবন ধারণের জন্য একান্ত আবশ্যক ২।৪টী দ্রব্য ছাড়া তরকারী মৎস্য ফল প্রভৃতির নাম গন্ধও নাই। এই দেশ নিতান্ত দরিদ্র।

আহারীয় দুর্মূল্য বলিয়া অল্পাহারেই ঐ দেশের লোকেরা পরিতৃপ্ত হয়। মোটা মোটা ঘুটের ন্যায় কদর্য্য রুটী ও একটু লবণ মাত্র সাধারণতঃ ইহাদের আহার্য্য। এইরূপ আহারের ফলে অধিবাসিগণ একান্ত কৃশ ও দুর্ব্বলকায়। অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতিদের ন্যায় সবল উন্নতকায় লোক অতি বিরল। এই দেশে বিবিধজাতীয় উৎকৃষ্ট ফল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিদেশে ফল প্রেরণ দ্বারা অনেকে বিলক্ষণ অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকেন। এমন উৎকৃষ্ট গোলাব কোথাও দর্শন করি নাই। বন্ধুর পর্ব্বতগাত্রদেশে গোলাবগাছগুলি ফুলভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে। সেই মনোহর দৃশ্য কখনও ভুলিতে পারিব না। ক্রমে কলিকাতার বন্ধুগণ আসিয়া একটী ন্যাতিক্ষুদ্র দল গঠন করিলেন। মহা উৎসাহে যাত্রার আয়োজন আরম্ভ হইল। পথে কোথাও আহারীয় দ্রব্য পাইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ৩ সপ্তাহের উপযোগী প্রচুর আহার্য্য, হাঁড়ি, বাসন, মোটা শীতবস্ত্র, দস্তানা প্রভৃতিও ক্রয় করা গেল। আলমোরায় গ্রীষ্ম অনুভব করিয়া ভাবিতেও পারি নাই, এত গরম বস্ত্রাদি কোন দিনও প্রয়োজনে আসিবে। ৪০ জন কুলীর প্রয়োজন। তাহা সংগ্রহ করিতে অনেক বিলম্ব হইল। কনট্রাক্টারের নিকট টাকা জমা দেওয়া হইয়াছিল। যাত্রার সমস্ত আয়োজন শেষ করিয়া রাখিয়াছিলাম। অপরাহ্ণে ৪০ জন ক্ষীণকায় লোক শ্রেণীবদ্ধ রূপে দেখা দিল। নিতান্ত অল্পবয়স্ক ও দুর্ব্বলকায় লোকগুলি বিদায় দিয়া সবল লোকের জন্য পুনর্ব্বার লেখা গেল। পর দিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই যাত্রা করিতে হইবে। রাত্রি ৩টা হইতে উঠিয়া মহা উৎসাহসহকারে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম। ৩।৪টা অশ্ব ডাণ্ডিও সংগৃহীত হইয়াছিল। আমি শ্রীচরণ দুইখানির ভরসায় বিলক্ষণ আশ্বস্ত ছিলাম। সেই জন্য কোনরূপেই যানারোহণে সম্মত হই নাই। সর্ব্বাগ্রে সেই সিদ্ধিদাতা মহাপুরুষের নাম স্মরণ পূর্ব্বক যাত্রা করিলাম। সেই প্রশান্ত প্রভাতের নির্ম্মল নীরব লাবণ্যরাশি প্রাণে কতই আনন্দ ঢালিয়া দিল। দূরের উন্নত গিরিশৃঙ্গগুলি প্রহরীর ন্যায় নীল আকাশপথে দণ্ডায়মান থাকিয়া এই অচেনা পথিকদলকে আদরে অভ্যর্থনা করিতেছিল। যাত্রাটী যেরূপ নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন হইবে আশা করিয়াছিলাম দুঃখের বিষয় তাহা হয় নাই। কুলীদল আমাদের দ্রব্যাদি গুরুভার বলিয়া তাহা বহনে অস্বীকৃত হইয়া মহা কোলাহল আরম্ভ করিল। আমি এসব অশুভ লক্ষণ দর্শনে সকলের পূর্ব্বেই অগ্রসর হইয়া চলিলাম। দলপতি দুই জন এই গণ্ডমূর্খ কুলীদলকে বশীভূত করিবার জন্য অনেক বচসা, ভয় ও মৈত্রী প্রদর্শন পূর্ব্বক অনেক বিলম্বে আমাদের সহিত মিলিত হইলেন। অধিকাংশ পর্ব্বত অভ্রপূর্ণ বলিয়া সূর্য্যের কিরণে ঝক্‌মক্ করিতে করিতে চক্ষুর বিশেষ পীড়া জন্মাইতে লাগিল। মধ্যাহ্নকালের প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে অগ্রসর হইয়া সকলেই ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। ঘনঅটবীবিরাজিত এক পর্ব্বতশৃঙ্গে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামপূর্ব্বক আহারকার্য্য সম্পন্ন করা গেল। পানীয় জলের কোন ঝরণা না পাইয়া তৃষ্ণায় বিষম ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল। অপরাহ্ণে মহাঝড় ও শিলাবৃষ্টি সহ্য করিয়া সন্ধ্যাসময়ে নির্জ্জন গিরিশৃঙ্গের উপর একটী জীর্ণ গৃহে আশ্রয় লাভ করিয়া পরম সৌভাগ্য বোধ করিলাম। চিমনীর আগুনে অনেক পরিশ্রমের পর একমাত্র খিচুড়ী প্রস্তুত করা গেল। পথশ্রমে সকলেই একান্ত ক্লান্ত ও বুভুক্ষাপীড়িত ছিলাম। পরম সমাদরের সহিত খিচুড়ীর সম্মান রক্ষা পূর্ব্বক বিশ্রামার্থে গমন করিলাম। প্রত্যূষে গাত্রোত্থানের পর চারিদিকে উন্নত পর্ব্বতমালার অন্তরালে লুক্কায়িত গম্ভীরতাপূর্ণ নানাজাতীয় বিহগকূজিত গহনের দৃশ্য হৃদয় মন মুগ্ধ করিল। সম্মুখে আরো কত মনোহারী দৃশ্য দেখিব, এই আশায় মন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। প্রাতরাশ সমাপনান্তে আবার অজ্ঞাত দুরারোহ পার্ব্বত্য পথে যাত্রা করিলাম। আজি গন্তব্য পথ অত্যন্ত দুর্গম বোধ হইল। সর্পগতিতে পর্ব্বতদেহ বেষ্টন করিয়া যে সঙ্কীর্ণ পথ চলিয়াছে, তাহা ধরিয়া অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পার্শ্বে ভীষণ খাদ। একটু এদিক ওদিক হইলেই গড়াইতে গড়াইতে কোথায় যাইয়া পড়িতে হইবে নিশ্চয় নাই। অশ্বারোহী সহযাত্রীরাও এ বিপদসঙ্কুল পথে পদব্রজে চলাই বুদ্ধিমানের কার্য্য মনে করিলেন। যাঁহারা পার্ব্বত্য পথে চলিয়াছেন তাঁহারাই জানেন যে "অধিরোহণ অবতরণ" বা "চড়াই উৎড়াই" কাজটা কত দুরূহ ব্যাপার। আমার হাঁটা সম্বন্ধে যে একটু সুখ্যাতি ছিল, এবার তাহা পাছে বিসর্জ্জন দিতে হয় এই আশঙ্কায় মন আন্দোলিত

শিশু সর্দ্দারের বিষয় কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে আইসে। বাল্যকালেই সর্দ্দার শ্রমশীলতা, বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানলিপ্সার পরিচয় দিয়াছিলেন। ইংরাজী ও পারসী ভাষা তিনি অল্পায়াসে শিখিতে সমর্থ হন, কিন্তু গণিত তাঁহার ভাল লাগিত না। ইহা কিয়ৎ পরিমাণে বিস্ময়কর বলিয়া মনে হইতে পারে, কারণ তাঁহার পিতা গণিতবিদ্যাবিশারদ ছিলেন। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে পুত্র পিতার সকল গুণের অধিকারী হয় না। তিনি সাবালক হইবা মাত্রই নিজের বিষয়পত্রের তত্ত্বাবধান ও অপর সর্ব্ববিধ কার্য্য নির্ব্বাহে সক্ষম বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন। ইহার পর তিনি দুই বৎসর য়ুরোপে যাপন করেন। এই প্রবাস কালের অধিকাংশ সময় তিনি ইংলণ্ডেই ছিলেন। তিনি তথায় সম্ভ্রান্ত সমাজে মিশিতেন; এবং সম্ভ্রান্ত শিখদিগের মধ্যে তিনিই প্রথমে বিলাত যাওয়ায় তথায় তাঁহার সমাদরও যথেষ্ট হইয়াছিল। তিনি ইংরাজ চরিত্র ও ইংরাজ জাতির নানাবিধ সভাসমিতির ও অনুষ্ঠানাদির একান্ত অনুরাগী ছিলেন। তিনি মনে করিতেন একমাত্র ইংরাজজাতিই ভারতবর্ষের মত নানাধর্ম্মী ও নানাজাতীয় লোক কর্ত্তৃক অধ্যুষিত দেশের শাসনকর্ত্তা হইবার উপযুক্ত। তাঁহার মতে ইংরাজ জাতির সহিত য়ুরোপীয় অপর কোন জাতির তুলনাই হইতে পারে না; তাঁহারা যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী ও পরাক্রমশালী জাতির পদে অধিরূঢ় আছেন, তাহার উপযুক্ত গুণও তাঁহাদের আছে।

এই য়ুরোপ-প্রবাস তাঁহার জীবনে প্রভূত পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত করে। তাঁহার চরিত্রে এই একটি প্রধান গুণ ছিল যে, তিনি যাহা ভাল বলিয়া বুঝিতেন তাহা করিতেন। কপটাচরণকে তিনি বড় ঘৃণা করিতেন। তদনুসারে তিনি যখন য়ুরোপ হইতে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন প্রকাশ্য ভাবে আপনাকে অন্ধ গোঁড়ামির বিরোধী বলিয়া প্রচার করিলেন। এই বিষয়ে তাঁহার মত ও আচরণে সামঞ্জস্য ছিল। এইজন্য অনেকে তাঁহার কুৎসা করিতে আরম্ভ করে। তাঁহার বিরুদ্ধে নানাবিধ অলীক গল্প প্রচার করিতে থাকে, অনেকে এরূপ বলাবলিও করিতে থাকে যে তিনি খৃষ্টান হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি ইহাতে ভীত না হইয়া নিজ অভিপ্রেত ও সঙ্কল্পিত কার্য্যে অগ্রসর হইতে থাকেন।

তিনি স্বদেশবাসিগণের উন্নতির জন্য অনেক সময় ও শক্তি নিয়োগ করেন। অমৃতসহরেই তাঁহাদের পরিবারের আবাস স্থান ছিল। কিন্তু তিনি সাধারণহিতকর নানা অনুষ্ঠানে সহজে যোগ দিতে পারিবেন বলিয়া, য়ুরোপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রধানতঃ লাহোরেই অবস্থিতি করিতেন। সেখানে নানা শ্রেণীর লোকে তাঁহার বাটীতে গতিবিধি করিত। সাহায্যপ্রার্থী লোকেই বেশী যাইত। সকলেই সহজে তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিত। তিনি অতিশয় শিষ্টাচারসম্পন্ন ছিলেন; কেহ তাঁহাকে কখনও ক্রুদ্ধ হইতে দেখে নাই।

পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে লাহোরের অপরাপর সর্দ্দারেরা যেরূপ আমোদ প্রমোদে কালহরণ করিতেন, দয়ালসিংহও তদ্রূপ আমোদ প্রমোদ ভালবাসিতেন। তিনি মৃগয়ানুরাগী ছিলেন। কেহ তাঁর চেয়ে ভাল ঘুড়ি উড়াইতে পারিত না, সঙ্গীতবেত্তা ও কুস্তিগীরদিগের তাঁহা অপেক্ষা মুক্তহস্ত উৎসাহদাতা কেহ ছিল না, তাঁহার পক্ষিশালা লাহোরের একটি দ্রষ্টব্য জিনিস ছিল। কিন্তু এসকল বাহিরের কথা। অপর সর্দ্দারগণ ও তাঁহার মধ্যে একটি বিশেষ প্রভেদ এই ছিল যে তিনি তাঁহার বিশাল সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও উৎকর্ষ সাধনে সর্ব্বদা যত্নশীল ছিলেন, এবং প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা ইংরাজী গ্রন্থাধ্যয়নে যাপন করিতেন। তিনি যে কেবল উপন্যাসাদি পাঠ করিতেন, তাহা নয়, রাজনৈতিক বিজ্ঞান, দর্শন ও ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থাদিও পাঠ করিতেন। তিনি নিজ মাতৃভাষায় ধর্ম্ম বিষয়ক প্রবন্ধাদি লিখিয়া প্রথমে সাহিত্যক্ষেত্রে পদার্পণ করেন। অল্পবয়সেই তিনি ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ও কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে তিনি আন্তরিক ভক্তি করিতেন। রাজা রামমোহন রায়ের অনেকগুলি লেখা তিনি উর্দ্দু ভাষায় অনুবাদ করেন, এবং নিজেও কয়েকখানি পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় দানশীল ছিলেন। সর্ব্বপ্রকার জনহিতকর কার্য্যের সাহায্যার্থ তিনি মুক্তহস্তে জাতি ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে দান করিতেন। কিন্তু তিনি অযোগ্য পাত্রে দান করিতেন না। যোগ্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া তবে দান করিতেন। তাঁহার চরিত্রে গুরুতর

দোষও ছিল। কিন্তু তাহার সমালোচনার সময় এখনও আসে নাই।

তিনি ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা গমন করেন, এবং তথায় বিশেষ আদর অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হন। এই সময়ে লাহোরস্থ ভারতসভা স্থাপিত হয়। সর্দ্দার উহার সভাপতিত্ব গ্রহণ করেন। কলিকাতার কোন রাজনৈতিক সমিতির সভাপতি হওয়া এক কথা, আর পঞ্জাবের মত প্রদেশে সভাপতি হওয়া আর এক কথা। তিনি বাস্তবিকই পঞ্জাবের রাজনৈতিক নেতা ছিলেন।

বেদান্ত ও নূতন জর্ম্মান দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার গভীর দৃষ্টি ছিল। সুফী সম্প্রদায়ের পারসী কবিতার মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে তাঁহার মত অল্প লোকেই পারিত। রত্নপরীক্ষা ও তাহার মূল্য নির্ণয়ে তাঁহার খুব সখ ছিল। পেশাদার মণিকারও এ বিষয়ে তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিত না। যৌবনে তিনি অতিশয় দক্ষতার সহিত সেতার বাজাইতে পারিতেন। এদেশের প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রে তাঁহার অসামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল। প্রকৃত ওস্তাদদিগকে তিনি রাজোপযোগী পুরস্কার দিতেন।

পঞ্জাবের প্রসিদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র ট্রিবিউন তিনিই স্থাপন করেন। উহাদ্বারা পঞ্জাব যে কত বিষয়ে ও কি পরিমাণে উপকৃত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা বলা যায় না। বালক ও যুবকগণের সৎশিক্ষা বিধানার্থ তিনি একটী বিদ্যালয় ও তৎসংসৃষ্ট একটি ছাত্রাবাস স্থাপন করেন। পঞ্জাব ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক স্থাপন কার্য্যেও তাঁহার কর্ত্তৃত্ব ছিল। এক কথায় বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হয় যে পঞ্জাবে অধুনা দেশীয় লোকের অনুষ্ঠিত দেশহিতকর এমন কোন কার্য্যই হয় নাই, যাহা তাঁহার সাহায্য ও উৎসাহ লাভ করে নাই।

সর্দ্দার দয়ালসিংহের এরূপ ক্ষমতা ছিল যে, যদি তিনি দরিদ্র বংশে জন্মগ্রহণ করিতেন, এবং নিজ জীবিকা অর্জ্জন করিতে বাধ্য হইতেন, তাহা হইলেও তিনি দেশের একজন নেতা হইতে পারিতেন। তিনি অতিশয় স্বাধীনচেতা ছিলেন। তিনি ইংরাজ শাসনের অনুরাগী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার রাজভক্তি অপেক্ষা স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি প্রেম কম ছিল না। স্বার্থান্বেষণকে তিনি সমুদয় হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করিতেন। এইজন্য তিনি স্বদেশের উন্নতিসাধনার্থ আজীবন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন; যে রাজসম্মান তিনি অনায়াসে পাইতে পারিতেন, তজ্জন্য কোনই চেষ্টা করেন নাই।

তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার উইলের কোন কোন অংশ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দুইটী প্রধান কার্য্যের উল্লেখ দেখা যায়। একটি সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপনার্থ তিনি ৬০।৭০ হাজার টাকা এবং মাসিক ৩০০ টাকা আয়ের একটি বাটী দিয়া গিয়াছেন। এই পুস্তকালয়ে প্রধানতঃ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পুস্তকই থাকিবে। আমাদের দেশে পুস্তকালয়ের, বিশেষতঃ উক্তপ্রকার পুস্তকালয়ের, বিশেষ অভাব আছে। সুতরাং ইহাদ্বারা জ্ঞানলিপ্সু ব্যক্তিগণ যে বিশেষভাবে উপকৃত হইবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পুস্তকালয়ের জন্য যাহা দিয়াছেন, তদ্ব্যতীত তাঁহার আর প্রায় সমুদয় সম্পত্তিই একটি উচ্চশ্রেণীর কলেজ স্থাপনার্থ দিয়াছেন। কলেজের জন্য প্রদত্ত সম্পত্তির মূল্য আনুমানিক ১৫ লক্ষ টাকা হইবে। ইহা হইতে যে আয় হইবে তদ্দ্বারা একটি উৎকৃষ্ট কলেজের "চলিত" খরচ বেশ চলিবে; যদিও ইহা হইতেই কলেজের গৃহ, পুস্তকালয়, গবেষণাগার প্রভৃতি নির্ম্মাণ ও তজ্জন্য সমুদয় পুস্তকযন্ত্রাদি সরঞ্জাম সংগ্রহ হইতে পারে না। এরূপ দান এপর্য্যন্ত বঙ্গদেশে কেহ করেন নাই; ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও বিরল।

কোনও কলেজের জন্য উৎসৃষ্ট সম্পত্তি হইতে উহার ব্যয়নির্ব্বাহ হইলে অনেক সুবিধা হয়। ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধিই অধ্যক্ষের প্রধান লক্ষ্য হয় না; তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া ছাত্রগণকে সুশাসনে রাখিয়া সচ্চরিত্র ও বিনীত করিতে পারেন। প্রত্যেক শ্রেণীতে যতগুলি ছাত্র রাখিলে প্রত্যেক ছাত্রের ব্যক্তিগত অভাব ও ত্রুটীর প্রতি অধ্যাপকগণ দৃষ্টি রাখিতে পারেন ততগুলি ছাত্রই রাখা যায়। এরূপ না হইলে সুশিক্ষা হয় না। বর্ত্তমানে কলিকাতা ও অন্যান্য কোন কোন সহরে কলেজের এক এক শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যা এরূপ অধিক হয়, যে অধ্যাপক প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে ত পারেনই না, পরন্তু অধিকাংশের নাম পর্য্যন্ত জানেন না, অনেকের হয় ত মুখও চিনেন না। আর, শাসন ও নীতির কথা না বলাই ভাল।

সর্দ্দার দয়ালসিংহের উইলে কলেজ সম্বন্ধে আর দুটি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা আছে। কলেজের সঙ্গে একটি ছাত্রাবাস

চিমনীর সম্মুখবর্ত্তী স্থান অধিকার করিয়া লইলাম। বাঙ্গলাতে একটীমাত্র গৃহ। তাহাতে ৬ জন লোকের শয়ন, রন্ধন আহারাদি সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিতে হইয়াছিল। কিঞ্চিৎ জলযোগের পর বাহিরে আসিয়া তুষার রাজ্যের যে অপূর্ব্ব শোভা লক্ষ্য করিলাম তাহা অবর্ণনীয়। দার্জ্জিলিং হইতে কাঞ্চনঝিঙ্গা দর্শন করিয়া কতই মুগ্ধ হইয়াছি। এস্থানে তুষারাবৃত গিরিমালা অনন্ত প্রসারিতা, যতদূর দৃষ্টি চলে কেবলই অমল-শুভ্র-বসনাবৃতা প্রকৃতির নূতন ছবি হৃদয় বিমুগ্ধ করিতে লাগিল। এই হিমানীবিরাজিত স্থানে পরম মনোহারী পারিজাত কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া কঠিন গিরিবক্ষ আলোকিত করিয়া তুলিয়াছিল। একটী গাছ ফুলে আচ্ছাদিত। এই তুষাররাজ্যে এমন অমল সৌন্দর্য্যপূর্ণ কুসুমরাশি বিধাতার আশীর্ব্বাদ বলিয়া মনে হইতেছিল। আমরা চিহ্নস্বরূপ অনেক ফুল তুলিলাম। চিমনীর আগুনে আহারীয় প্রস্তুত ও ভোজন কার্য্য বিশেষ আগ্রহের সহিত সম্পন্ন করিয়া পরম তৃপ্তি বোধ করিলাম। চন্দ্রালোকে চারিদিকের তুষারাচ্ছাদিত পর্ব্বতমালা যেন ময়ূরপুচ্ছের বর্ণ-শোভা বিস্তার করিতেছিল। শীতের তাড়ন তুচ্ছ করিয়াও সেই অপূর্ব্ব শোভা অনেক রাত্রি পর্য্যন্তও বাহিরে থাকিয়া দর্শনপূর্ব্বক কৃতার্থ হইলাম।

পর দিন বাঞ্ছিত তুষার ক্ষেত্র দর্শন করিলেই আমাদের সকল শ্রম ও আশা সফল হইবে সেই আলাপ করিতে করিতে বিশ্রামার্থে গমন করিলাম। সারা রাত্রি চিমনীতে ধূধূ করিয়া আগুন জ্বলিতেছিল। সম্মুখের দরজা কাচাবরণে গঠিত। সমস্ত রাত্রি ধবল তুষারাচ্ছাদিত পর্ব্বতের ছবি গৃহাভ্যন্তর এমন আলোকিত করিয়াছিল, যে সেই শোভা লক্ষ্য করিতে করিতে অল্পই নিদ্রা গিয়াছিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই বাঙ্গলা আমাদের শেষ আশ্রয়স্থান। শুনিলাম শীত কালে ইহা সর্ব্বতোভাবে তুষাররাশিতে প্রোথিত হইয়া যায়। অতি প্রত্যূষে কিঞ্চিৎ আহারীয় ও প্রচুর শীতবস্ত্র সঙ্গে লইয়া প্রভুভক্ত পানসিংহের সহিত তুষার ক্ষেত্রে যাত্রা করিলাম। পূর্ব্বদিন অপেক্ষা আজ পথ শতগুণে দুর্গম ও পিচ্ছিল। একবারে সোজা জমাট ঝরণাগুলির উপর দিয়া কেমন করিয়া উঠিব নীচ হইতে তাহা ভাবিতে ভাবিতে মাথা যেন ঘুরিতে লাগিল। কুলীগণ পূর্ব্বের ন্যায় বরফ কাটিয়া পথ করিতে লাগিল। আমাদের এক এক জনের দুই পার্শ্বে বলবান দুই জন পাহাড়ী লোক সাহায্যজন্য সতর্ক ভাবে অগ্রসর হইতেছিল। এমন বিপদসঙ্কুল পথে চলিতে চলিতে প্রভাতকুমারবাবুর নৈতিক জগতে পদস্খলনের উপমাটী অত্যন্ত সুযোগ্য বলিয়া বারবার স্মরণ হইতেছিল। আমরা বিস্তীর্ণ তুষারাবৃত ক্ষেত্রগুলি একে একে অতিক্রম পূর্ব্বক নদীর উৎপত্তি স্থান দর্শন করিবার জন্য মহা উচ্চ, দুরারোহ এক পর্ব্বত শৃঙ্গে অনেক কষ্টে আরোহণ করিলাম। মনে হইতে লাগিল সংসারের মলিন আবিলতাপূর্ণ ভূমি হইতে উচ্চে উঠিতে পারিয়াছি। অসীম শব্দহীন জগত, আমাদের শিক্ষাগুরু। কি অকাট্য ভৌতিক নিয়মে বিশ্বসংসারের এক দিক ভাঙ্গিতেছে অপর দিক আবার নূতনরূপে গঠিত হইতেছে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া মহাশক্তির প্রভাব গভীরভাবে উপলব্ধি হইল। বিশাল পর্ব্বতদেহ তুষারাঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। তুষার স্রোত বিগলিত হইয়া তাহা ধৌত করিতে করিতে বালুকারেণুতে পরিণত করিয়া অনন্তসাগর উদ্দেশে ছুটিতে ছুটিতে আবার উর্ব্বরতাপূর্ণ শস্যশ্যামল কত স্থান মানবের জন্য সৃষ্টি করিয়া দিতেছে, তাহা ভাবিতে ভাবিতে অপার সৃষ্টিকৌশলতত্ত্বে হৃদয় মন ডুবিয়া গেল। সেই অসীম তুষাররাজ্যে দণ্ডায়মান হইয়া বুঝিয়াছিলাম, মানবের শক্তিসামর্থ্য কত ক্ষুদ্র, আমরা সেই রাজাধিরাজের সিংহাসন তলে দাঁড়াইবার কতদূর অযোগ্য। জ্ঞানগর্ব্বে স্ফীত মানব এই সৃষ্টিপ্রহেলিকার অদ্ভুত তত্ত্ব নির্ণয় করিতে যাইয়া হতবুদ্ধি হইয়া যায়। আমরা অনিমেষ নয়নে এই মহান্ দৃশ্য ভোগ করিতেছিলাম।

"তোমার মধুর রূপে ভরেছে ভুবন। মুগ্ধ নয়ন মম পুলকিত মন॥" এই সঙ্গীতটী অনেকবার গাহিয়া নিম্নে অবতরণ করিলাম। হঠাৎ দুরন্ত তুষার ঝটিকা বৃষ্টি আমাদিগকে যেরূপ ব্যতিব্যস্ত করিয়া ফেলিল তাহা বর্ণনীয় নহে। একেত হিমের তাড়নায় হস্ত পদ অবশ ও নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাহার উপর প্রবল বায়ুতাড়িত তুষারমিশ্রিত বৃষ্টিধারা, ধারার প্রতিকূলে একপদ অগ্রসর হওয়া অসাধ্য হইল। ছাতা শুদ্ধ উড়িয়া কতবার দূরে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিলাম। প্রথম ২ ৩ বার বহুকষ্টে উঠিয়াছিলাম কিন্তু পরিশেষে শরীরে এমন এক বিন্দুও শক্তি রহিলনা যাহার বলে উঠিতে পারি। এদিকে বেলা

অবসান। ঘোর অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছাদিত। এমন সময় আমরা যে পুনরায় আশ্রয় স্থান বাঙ্গালায় পঁহুছিতে সক্ষম হইব তাহার কোন সম্ভাবনাই রহিল না। পানসিংহের যত্ন ও সাহায্য ভিন্ন সেই দিনে প্রাণ রক্ষা হইত না। একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ের আড়ালে অনেক কষ্টে পঁহুছিলাম। প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া হস্তপদ সেকিতে সেকিতে মনে হইল অবশ দেহে আবার যেন নূতন জীবন প্রবাহ চলিতেছে। রাত্রিকালে কোথায় আশ্রয় লইব সেই চিন্তায় সকলেই বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলাম। অনেক অনুসন্ধানের পর পর্ব্বতের অন্তরালে একটা ভেড়ার খোয়াড় দৃষ্ট হইল। শুষ্ক তৃণরাশি সংগ্রহ করিয়া তাহার মধ্যেই রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করা গেল। ভেড়ার দুধের সহিত চা ও শুষ্ক কয়খণ্ড রুটী আহার করিয়া পরম কৃতজ্ঞহৃদয়ে হামাগুড়ি দিয়া সেই খোঁয়াড়ে প্রবেশ করিলাম। কোথা হইতে কোথায় আসিয়া এই অপূর্ব্ব গৃহে আশ্রয় লাভ করিলাম ভাবিতে ভাবিতে কত আশ্চর্য্যই বোধ হইতে লাগিল। এস্থানে তুষার-ব্যাঘ্রের উৎপাত বিলক্ষণ আছে শুনিয়াছিলাম। দ্বার বন্ধ করিবারও কোন উপায় ছিলনা সেই জন্য রাত্রিতে অল্পই নিদ্রা আসিল। পার্শ্বে সমস্ত রাত্রি অগ্নি জ্বলিতেছিল। প্রত্যূষে বিধাতার নাম স্মরণপূর্ব্বক জনপ্রাণিহীন সেই নীরব তুষারক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক অপরাহ্ন কালে বাঙ্গালাতে আসিয়া পঁহুছিলাম। প্রত্যাগমন সময়ে আবার একটু নূতন পথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছিলাম। বদ্রিনাথ তীর্থ দর্শনের জন্য ও ব্যগ্র হইয়াছিলাম, কিন্তু পথের দুর্গমতা ও সময়াভাব জন্য তথায় যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। পথিমধ্যে আহার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছিল। জঙ্গলের ভেড়ার মাংসের সহিত এক প্রকার শাক আহারীয় রূপে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলাম। এখনও তুষারদেশ যাত্রার কাহিনী হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দ জন্মাইয়া দেয়।

সর্দ্দার দয়াল সিংহ।

সর্দ্দার দয়াল সিংহ মাজীথিয়া পঞ্জাবের এক সুপ্রসিদ্ধ শিখ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই বংশের ইতিবৃত্ত লিখিতে হইলে পঞ্জাবের বর্ত্তমান শতাব্দীর শিখ রাজত্বের ইতিহাস লিখিতে হয়। নিজ পঞ্জাবে ধনী, দরিদ্র, পল্লীবাসী বা নাগরিক এমন কেহ নাই মাজীথিয়া সর্দ্দারগণের অবদানপরম্পরা যাহার কর্ণগোচর হয় নাই। সর্দ্দার দয়াল সিংহের পিতামহ সর্দ্দার দেশা সিংহ শেরঘিল নামক বিখ্যাত যুদ্ধপ্রিয় জাঠ গোষ্ঠীর অধিনায়ক ছিলেন। মহারাজা রণজিত সিংহ তাঁহারই সাহায্যে পার্ব্বত্য রাজপুত রাজ্যগুলি অধিকার করিতে সমর্থ হন। মহারাজা তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পার্ব্বত্য প্রদেশগুলির নাজিম বা প্রধান শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। এইজন্য তিনি পাহাড় বাদসাহ নামে পরিচিত ছিলেন। দেশাসিংহ যেরূপ দক্ষতার সহিত দেশকালপাত্রবিশেষে দৃঢ়তা ও কোমলতার যথাযোগ্য সংমিশ্রণমূলক নীতি অবলম্বনপূর্ব্বক নিজ অধীনস্থ প্রদেশগুলি শাসন করেন, তাহাতে মহারাজা অতীব প্রীত হইয়া তাঁহাকে অমৃতসরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। অন্যান্য কয়েকটী প্রদেশও তিনি কিছুকাল শাসন করেন। তাঁহার পুত্র সর্দ্দার লেহনা সিংহও যশস্বী পুরুষ ছিলেন। তিনি খালসা সৈন্যের নায়ক ছিলেন। এবং অন্যান্য অনেক উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি মাঞ্জা প্রদেশের ও অমৃতসরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া যে অবসর পাইতেন, তাহা বিদ্যানুশীলনে যাপন করিতেন। তিনি সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় বুৎপন্ন ছিলেন। গণিতে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। আবিষ্কারক বলিয়া তাঁহার সুদূরব্যাপী খ্যাতি ছিল। লাহোর দরবারে আসিয়া কোনও য়ুরোপীয় তাঁহার পাঠগৃহ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার না দেখিয়া যাইতেন না। তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে নির্ম্মিত অনেকগুলি কামান পঞ্জাব যুদ্ধে ইংরাজদের হস্তগত হয়। তাঁহার উদ্ভাবিত নূতন জিনিসের মধ্যে তাঁহার নির্ম্মিত একটি ঘড়ির উল্লেখ করিতে পারা যায়। উহাতে তারিখ ও তিথি জানিতে পারা যায়। উহা এখনও চলিতেছে। রণজিৎ সিংহের অনুরোধে লেহনা সিংহ হিন্দু পঞ্জিকার সংস্কার করিয়া হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মধ্যে প্রতিপত্তি লাভ করেন। প্রাচীন পণ্ডিতেরা বলেন যে ফলিত জ্যোতিষেও তাঁহার সমকক্ষ অতি অল্প লোকই ছিল। ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে কাশীধামে তাঁহার মৃত্যু হয়। তখন তাঁহার পুত্র সর্দ্দার দয়াল সিংহের বয়স পাঁচ বৎসর মাত্র। তাঁহার পিতার মৃত্যুর কিছুদিন পরেই তাঁহার মাতারও মৃত্যু হয়।

থাকিবে। ছাত্রাবাসের বন্দোবস্ত ভাল হইলে, উহার তত্ত্বাবধায়ক সচ্চরিত্র ও দক্ষ লোক হইলে, উহা হইতে অনেক শুভ ফল উৎপন্ন হইতে পারে। যদি কলেজের হাতায়, ছাত্রাবাস,অধ্যক্ষের বাসগৃহ এবং অন্ততঃ দুএকজন অধ্যাপকের বাসবাটী থাকে, তাহা হইলে ছাত্রগণ তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়া উপকৃত হইতে পারে। আজকালকার দিনে আর গুরুগৃহে বাস সম্ভবপর নয়। উপকারিতার হিসাবে উক্ত প্রকার ব্যবস্থা গুরুগৃহবাসের পরেই উল্লেখযোগ্য। কলেজ সম্বন্ধে দ্বিতীয় ব্যবস্থা এই আছে যে ইহাতে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হইবে, এবং এই শিক্ষা যতদূর সম্ভব শিক্ষক ও অধ্যাপকগণের জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা দিতে হইবে। ইহা বড় সুন্দর ব্যবস্থা। আমরা ধর্ম্মমতের বিশুদ্ধতার উপকারিতা অস্বীকার করি না। কিন্তু শিক্ষাবিষয়ে ধর্ম্মানুগত আচরণকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দি।

দুঃখের বিষয় এই যে সর্দ্দারের উইল লইয়া মোকদ্দমা হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। যদি উহা বজায় না থাকে, তাহা হইলে পঞ্জাবের, শুধু পঞ্জাবের কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের, দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

জীবদ্দশায় দয়ালসিংহ কংগ্রেসের একজন প্রধান সহায় ছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহারই সাহায্য ও উদ্যোগে লাহোরে কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল। তিনি উইলে কংগ্রেসের জন্য বা কোনপ্রকার রাজনৈতিক অনুষ্ঠান বা আন্দোলনের জন্য কিছু দিয়া যান নাই বলিয়া কোন কোন "ইংঙ্গ-ভারতীয়" সংবাদপত্র আন্তরিক হর্ষ চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই। কিন্তু ইঁহারা বৃথা হর্ষ প্রকাশ করিয়াছেন। কংগ্রেস যে বৃক্ষের ফল, সর্দ্দার সেই শিক্ষাতরুর মূলে জলসেচনের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। যে প্রদেশে শিক্ষার সমধিক বিস্তার হয় নাই, তথায় রাজনৈতিক আন্দোলন সুন্দররূপে চলিতে পারে না। যে দেশে আম হয় না, সে দেশে অন্যজাতীয় গাছে দু চারিটা পাকা আম বাঁধিয়া দিয়া কি ফল? তার চেয়ে সে দেশে আম গাছ জন্মাইবার চেষ্টা করাই ভাল নয় কি? *

কলিকাল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শিবচরণ বেশী দিন গৃহে থাকিতে পারিলেন না। দুই জন 'কৃষাণ' ও একজন 'রাখাল' নিযুক্ত করিয়া চাষ আবাদের সমস্ত ভার সম্বন্ধী-কুল-তিলক শ্রীমান্ রাজীবলোচনের প্রতি দিয়া তিনি ব্যবসায়স্থানে ফিরিলেন। শিবচরণের 'গৃহস্থালি' এখন খুব বাড়িয়া উঠিয়াছে, কাজেই গৃহের কাজকর্ম্ম এবং ঝঞ্ঝাটও বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে! কিন্তু কাজের লোক বাড়ে নাই! শিবচরণের পূজনীয়া শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী জামাতৃ-গৃহে আসিয়াছেন, কুটুম্বগৃহে কুটাখানা ভাঙ্গিয়া দুখানা করিলেও অপমান আছে! সুতরাং 'শাশুড়ী ঠাকুরাণী'হাত পা গুটাইয়া 'গলাজাহির করিয়া' একটী বৃহৎ 'খুদে ননদ' রূপে কুটুম্বগৃহে অধিষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

সাহিত্যক্ষেত্রে যেমন অনেক সময় বিদ্যা-বুদ্ধির বিনা অপব্যয়ে, গ্রন্থকারের প্রতি দুই চারিটা শ্লেষ, গোটাকতক বিদ্রূপ করিতে পারিলেই এবং কিঞ্চিৎ 'মাতব্বরি চাল' চালিলেই, এমন কি সমালোচ্য গ্রন্থের বিশেষ পরিচয় না রাখিয়াও, সমালোচকরূপে ফুড়িয়া উঠা যায়,—গৃহস্থালিক্ষেত্রেও, তেমনই গৃহকার্য্যের কোন খোঁজ খবর না রাখিয়া, গৃহস্থের সর্ব্বকার্য্যে অনভিজ্ঞ থাকিয়া, ন্যায় হোক, অন্যায় হোক, খুঁৎ ধরিতে পারিলেই "পাকা গিন্নি" নাম পাওয়া যাইতে পারে! তথাকথিত 'গিন্নি'-গুণকীর্ত্তনে বহুবিধ 'ছড়া' বহুদিন হইতে রচিত হইয়া আসিতেছে! একটীর নমুনা,

"কাজে কুঁড়ে, ভোজনে দেড়ে,
বচনে মারে পুড়িয়ে পুড়িয়ে॥"

জয়কালীর জননী নয়নতারাও এই শ্রেণীর অগ্রণী! "তৈয়ারি ভাতে কাটী দিতে, ইনি বিষম ওস্তাদ!"

জয়কালীর অনেকগুলি 'ছেলে পুলে', তাঁর ত কাজকর্ম্ম করিবার অবকাশই থাকে না! তা ছাড়া হিষ্টিরিয়ার জন্য তাঁর কোন কঠিন কাজ করিবার 'যো' নাই! তবে সংসারের কাজ কে করে বল? ছাই ফেলিতে 'ভাঙ্গা কুলা' সুতরাং সকল ভার পড়িল সুষমার উপর!

ভোর হইতে রাত্রি দশটা, ইহার ভিতর, সুষমার আর বিরাম, বিশ্রাম রহিল না! সকালে উঠিয়া, ছোট ছেলেদের 'পোরের ভাত', তার পর স্কুলের ছেলেদের ভাত, তার পর বড় হেঁসেল, আঁশ-হেঁসেলের কাজ শেষ হইলে, স্নানান্তে আবার "হবিষ্যির" ব্যবস্থা! আহারান্তে, রাখাল কৃষাণদের পরিবেশন—ইহাতেই বেলা প্রায় তিনটা বাজিয়া যায়—তারপর আবার রাত্রির পালা আরম্ভ! ইহার মধ্যে আবার স্কুল-ফেরত ছেলেদের 'খাওয়ান' আছে! কিন্তু এত করিয়াও সুষমার 'পার' নাই!

নয়নতারা কাজেকর্ম্মে, রন্ধনে পরিবেশনে, চলনে ফেরণে পদে পদে খুঁৎ ধরেন, আর বলেন, "যা কর্‌তে হবে তা অমন বেগারটানা করে সারা ভাল নয়—আমার কাছে বাছা স্পষ্ট কথা।" ইত্যাদি!

এদিকে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত হাঁড়ি ঠেলিয়াও, সুষমার নিস্তার ছিল না। রায়েদের বড় কুটম্ব শ্রীমান্ রাজীবলোচনের বেড়াইয়া আসিতে কোন কোন দিন এগারটাও

---

* ট্রিবিউন-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক সর্দ্দার দয়ালসিংহের একটি ফোটোগ্রাফ পাঠাইয়া দেন। তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। সর্দ্দারের চরিত সম্বন্ধে যাহা লেখা হইল, তাহাও প্রধানতঃ ট্রিবিউন অবলম্বন করিয়া।—

প্রদীপ-সম্পাদক।

বাজিয়া যাইত! আর সুষমাকে তাহার ভাত 'আগুলিয়া' থাকিতে হইত! ফিরিতে যত রাত্রিই হোক, রাজীবের ভাত কিছু গরম থাকা চাই! তা না থাকিলেই আর যাবে কোথায়, শ্রীমানের মেজাজ অমনি দারুণ গরম হইয়া উঠে! কোন কোন দিন শ্রীমান সান্ন-ব্যঞ্জন থালাখানি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিত! থালের ঝন ঝন শব্দে এবং সঙ্গে সঙ্গে "এ ছাই পাঁশ কি গেলা যায়," প্রভৃতি ভীষণ নিনাদে ও জননীর কুটুম্ববাড়ী এসে এত অপমান ইত্যাদি করুণ আর্ত্তনাদে, নিদ্রাতুরা জয়কালীরও ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত! তখন জয়কালী শয্যাত্যাগ না করিয়াই, সুপ্তোত্থিতা সিংহীর মত গভীর গর্জ্জনে বলিতেন," হ্যাগা মেজো বউ, পার্‌বে না ত স্পষ্ট ক'রে বল্লেইত চুকে যায়, অমন কোরে রোজ রোজ ছোঁড়াটাকে ভাতে মেরে আমার সঙ্গে "ভায়াদি বাদ' সাধার কি দরকার? ওকি আর পেটের দায়ে এখানে পড়ে আছে? আজকের রাত্তিরটেত কাটুক, কাল হ'তে কোন্ শালী আর তোমাকে কিছু কর্‌তে দেয়," —(কিন্তু হায়, সে কাল আর আসিল না।)

সুষমা তখন অপ্রতিভ হইয়া বাঁচিত না! তত রাত্রে রাজীবের জন্য আবার রান্না চাপাইত! সে দিন আর তার মুখে তৃষ্ণার জলটুকুও উঠিত না!

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রাজীবলোচন ইহারই মধ্যে এখানে বেশ একটু প্রতিপত্তি করিয়া লইয়াছে! চাষার দলে, সে এখন মামাঠাকুর! প্রত্যহ সন্ধ্যার পর, "মোড়লদের" বাহিরের 'চৌকিতে' যে একটী সাধারণের বৈঠক বসে, মামাঠাকুর হচ্ছেন তার সর্ব্বজনসম্মত স্থায়ী প্রেসিডেণ্ট! সে বৈঠকে সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, অর্থনীতি, উদ্ভটনীতি, সকল নীতিরই আলোচনা হয়! সেখানে বক্তা একমাত্র মামাঠাকুর, আর সকলে শ্রোতা! মামাঠাকুর অবাদে বলিয়া চলিয়াছে, হাইকোর্টের জজ-গুলা গণ্ডমূর্খ, কলিকাতার বড়লোক সব গোলাপ-জলে স্নান করে, ইংরাজের ছেলেগুলোকে আঁতুড়ঘরে মদে ভিজিয়ে রাখে, ব্রাহ্মরা খেষ্টান্, তারা ঈশ্বর মানে না, ভারতের মধ্যে রামনগরের রাজাই বড়, ইত্যাদি। এই সকল মন্তব্যের অপ্রতিহত প্রভাবে শ্রোতৃমণ্ডল চমকিয়া উঠিত! একদিন কোঁয়ারদের দুর্ভাগ্য 'ফনু' বলিয়াছিল, মামাঠাকুর বর্দ্ধমানের 'আজা'ই নাকি সব চেয়ে বড়? আর যাবে কোথা? মামাঠাকুরের কথার উপরে কথা! তেলে বেগুনে জলিয়া রাজীব বলিল—'তুই ভারি জানিস? রামনগরের কাছে আবার বর্দ্ধমান? হাতীর কাছে মশা!—আমার পিশের মামাত ভাইয়ের সম্বন্ধীর খুড়শ্বশুর হলো গিয়ে বর্দ্ধমানের রাজার মুন্সী। আমি আর বর্দ্ধমানের খবর জানিনে। তুই বেটা চাষা, রাজা-রাজড়ার খবর জান্‌বি কি ক'রে রে? তখন 'ফনু' ভিন্ন বাকী শ্রোতৃবর্গ বলিয়া উঠিল, "তাইত, মামাঠাকুর তাইত, ফনুর কথা আবার কথা!" ফনু বেচারা ত মহা অপ্রতিভ হইয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল "না, না, তাই বল্‌চি!"

সে "বৈঠকের" সকল কথা বলিতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায়! সুতরাং এই খানেই ক্ষান্ত হওয়া গেল! খোস গল্পের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গীতবাদ্যের আসরও খুব জমিত! গুণধর, মামাঠাকুরের আবার গানও আসে! বাজনার হাতও আছে! রাজীব যখন, মা—আ—আ—আ করিয়া রাগিণী ছাড়েন, তখন তাহাকে একজন পাকা ওস্তাদ বলিয়াই শ্রোতৃবর্গের ভ্রম হয়। রাজীবকে ত মতিরায় চল্লিশ টাকা মাইনে স্বীকার হয়ে তাঁর দলে 'জুড়ি' হবার জন্য সাধাসাধি, কিন্তু কে যায়? রাজীবের পৈতৃক সম্পত্তি যা আছে, তাই বা কে খায়? এইরূপে চাষামহলে, রাজীব আপন বিদ্যাগরিমার মাহাত্ম্য ও পসার প্রতিপত্তির গুরুত্ব বজায় রাখিত!

এতগুলো গুণের উপর শ্রীমান্ রাজীবের আরও কয়েকটী গুণ বর্ত্তমান ছিল! তন্মধ্যে 'গঞ্জিকা' সেবন অন্যতম! এই গুণপ্রসাদে তথায় শীঘ্রই রাজীবের অনেক-গুলি শিষ্য জুটিল! তাহারা প্রথম প্রথম মামাঠাকুরের 'প্রসাদ' পাইয়াই তৃপ্ত হইত। কিন্তু সত্বরেই দেখা গেল, কলিকাপ্রসাদে,—'কণিকা' নহে—আর এ ভক্তবৃন্দের পরিতোষ-সাধন হয় না! সকলেই তখন স্বতন্ত্র ভোগের ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হইল, গৃহে অন্ন নাই, তবু এ 'ভোগ' চাই! রাজীবের এই সকল চেলার মধ্যে যে যাহা উপায় করিত, তাহার অধিকাংশই, এইরূপে ভস্মীভূত হইতে লাগিল। তাহাদের গৃহে পিতামাতা, পুত্রপরিবার অনাহারে হাহাকার করিত, আর রাজীবের পিতৃপুরুষের উদ্ধার সাধন করিয়া দিত।

তা হোক, প্রথম প্রথম, এজন্য কিছু দিন রাজীবের ঘরের 'রেস্ত' কিছু কিছু বাহির হইয়া গেলেও, শেষে সম্পূর্ণ বেরিং পোষ্টেই তাহার এ নেশার 'সখ' মিটিতে লাগিল। শরীরটা নিজের হইলেও, পয়সাটাত পরের, সে জন্য এক এক দিন রাজীবের 'টান'টা বেশী হইয়া যাইত, ধূম-পানে ব্যোমপথে কিছু অধিক অগ্রসর হইয়া রাজীব রাত্রে আহারের সময় থালাবাটী ভাঙ্গাভাঙ্গির পালা অভিনয় করিত। সুষমারও লাঞ্ছনার সীমা থাকিত না।

এ ছাড়া রাজীব আবার জলপথের যাত্রী ছিল! কিন্তু 'বোতলে' সহজে কেহ ঘেঁষিত না, সুতরাং সে কারবারটী আর বড় যোথে চলিত না। একা রাজীবকেই সে ভার বহন করিতে হইত।

পানেমুগ্ধ রাজীবের মেজাজ কিছু অন্যরূপ হইত। সে দিন রাত্রিতে সুষমা তাহার 'কোলে' ভাত দিতে

রাজি হইত না! ইহাতে নয়নতারা অনেক অনুযোগ করিয়া 'ও আমার দুধের ছেলে, ওকে আবার লজ্জা কি ভয়ই বা কি' ইত্যাদি বাক্যবাণ সুষমার প্রতি প্রয়োগানন্তর স্বয়ং ভাতের থালা রাজীবের কাছে দিতেন। রাজীব তখন ঢুলু ঢুলু নয়নে জড়িতকণ্ঠে, বলিত, 'দেখ দেখি মা, আ—আ আমাকে আবার সুষমার ভয়, আমি কি বাঘ না ভালুক?' সে দিন রাজীব এইরূপে সুষমার প্রতি অনেক আদর অনেক সোহাগ বর্ষণ করিত, কিন্তু সুষমার সে সব ভাল লাগিত না। তার কাণে যেন বিষ ঢালিয়া দিত।

সুষমা এক এক দিন সাহসে ভর করিয়া, জয়কালীকে এ কথা বলিত, কিন্তু জয়কালী অতি উচ্চ হাস্যে, সে কথা উড়াইয়া দিয়া বলিতেন, ছি, ছি, অমন কথা মুখে এনো না, এনো না। সে যে তোমার দাদা। ও কথা কি মনে আন্‌তে আছে?" নয়নতারার কাণেও যে এ কথা না উঠিত তা নয়, নয়নতারা তখন মুখকচ্ছপখানির অবয়ব-গুলি সঙ্কুচিত করিয়া বলিতেন,

"ওরে আমার সতীপনা"!

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

জ্বালা বাড়িল, সুষমার দিন দুঃখে কষ্টে, পরিশ্রমে, একরূপে কাটিতেছিল! ইহার উপর, আবার নূতন জ্বালা ঘটিল! রাজীবলোচনের ব্যবহার দিন দিন বড়ই সন্দেহজনক হইতে লাগিল। সুষমা যদিও রাজীবের সহিত কথা কহিত না, তাহার সমক্ষে বাহির হইবার প্রয়োজন হইলে, ঘোমটা না দিয়া বাহির হইত না, তথাপি সে রাজীবের পাপচক্ষুর অন্তরালে থাকিতে পারিল না! সুষমা যখন মুখের ঘোমটা মাথায় তুলিয়া সাংসারিক কাজ কর্ম্মে ব্যাপৃত, রাজীব তখন কোথা হইতে কোন ফাঁকে গুটি গুটি আসিয়া অন্তরালে দাঁড়াইয়া "চুরি করিয়া" সুষমার মুখের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিত! মনে আশা, একবার সুষমার সহিত 'চোখোচোখি' হইলে হয়! সে আশা অবশ্য বেশীক্ষণ অপূর্ণ থাকিত না, সুষমা মুখ তুলিয়া সে দিকে চাহিলেই রাজীবের সহিত 'চোখোচোখি' হইত; পাপিষ্ঠ অমনি, চক্ষু মটকাইয়া, হাসিয়া গলিয়া যাইত! ভয়ে সুষমার প্রাণ যেন 'কাঠ' হইয়া আসিত! সে তাড়াতাড়ি, একগলা ঘোমটা টানিয়া ছুটিয়া ঘরে পলাইত! জয়কালীকে এসব বলিলে তিনিত আমলেই আনিতে দিতেন না! "হেসেছে তাতে আর কি মহাভারত "অশুদ্ধ" হয়েছে? যা বল আর তা বল তোমার মনটা কিন্তু মেজো বৌ বড় কু!" সুষমা অবাক্!

রায়েদের বাড়ীর সেই বৃদ্ধা ঝির কথাটা পাঠক পাঠিকার স্মরণ থাকিতে পারে। সম্প্রতি সেই ঝি, আপনার 'বোন-ঝি'কে কাজে দিয়া কাশীবাসিনী হইয়াছে! ঝির সেই বোনঝির নাম মোহিনী! মোহিনীর বয়স ত্রিশের অধিক নহে! সন্তানাদি কিছু হয় নাই! দুই তিন বৎসর হইল, সে বিধবা হইয়াছে। সে গরিবের মেয়ে, গরিবের বধূ, তবু আপনার 'কুলখানি' অনেক প্রলোভনেও যত্নে "নির্ম্মল" রাখিয়াছিল! সম্প্রতি, তার মাসীর পরামর্শে নিরাপদ ভাবিয়া সে রায়েদের গৃহেই আশ্রয় লইয়াছিল,—কিন্তু এখানেও আপদ জুটিল! রাজীবের কুনয়ন তাহার অনুসরণ করিল, পাপ মন, তাহার দিকে ধাবিত হইল! কিন্তু মোহিনী মেয়ে বড় শক্ত, সে রাজীবকে এমন মিঠা মিঠা বোল শুনাইয়া দিল, যে কাপুরুষ রাজীব আর তার দিকে ঘেঁষিতে সাহস করিত না। মোহিনী রাজীবকে 'মামা বাবু' বলিয়া ডাকিত এবং সেই সম্বন্ধ ধরিয়াই "আপনারা কেমন ভদ্রলোক" ইত্যাদি ভূমিকা ফাঁদিয়া, কঠিন বাক্যবাণে রাজীবকে তাহার নিকট 'হারি' মানাইয়া দিল, তখন রাজীবের সেই প্রহত মনোবেগ সবেগে সুষমার দিকে ধাইল! সুষমার সম্বন্ধে কোন প্রকার 'বাধা' না পাইয়া রাজীবের সাহস একে একে বাড়িয়াই চলিল! সে সুষমাকে একটু নির্জ্জনে দেখিলেই কোন না কোন অছি-লায় ঠাট্টা করিতে আরম্ভ করিল, ক্রমে সে ঠাট্টা শীলতার সীমা অতিক্রম করিয়া উঠিল! সুষমা প্রমাদ গণিল!

শেষ এক দিন রাজীব কিছু 'বাড়াবাড়ি' করিল। সুষমা রাত্রে যখন তাহাকে ভাত দিয়া ফিরিয়া যায়, দুর্বৃত্ত তখন সুষমার অঞ্চল ধরিয়া টানিল—আর মুখে যাহা বলিল, তাহা শুনিয়া সুষমা লজ্জায় মরিয়া গেল! নয়ন-তারা তখন রাজীবের দুধ আনিতে গৃহান্তরে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, সুষমা 'হাপুষ'নয়নে কাঁদিতেছে, "আজ আবার কি হলো'? নয়নতারার কথার উত্তরে সুষমা কিছু বলিতে না বলিতে, রাজীব বলিয়া উঠিল, "দেখ ত মা, ভাতের থালাখানা দেবার ছিরিখানা, একবার দেখ ত; কলা বউটীর মত মুখ ঢেকে কি আর খেতে দেওয়া চলে? তাই বলেছি বলে বুঝি আবার কান্না হচ্চে? আমি ভাশুর না মামা শ্বশুর? তাই আমায় এত লজ্জা?" "তা ত সত্যি" বলিয়া নয়নতারা সুষমাকে উপলক্ষ করিয়া আরম্ভ করিলেন, "ছেলেটাকে অমন বিষ-নয়নে দেখ কেন বল ত? সে তোমার কি এমন পাকাধানে মই দিয়েছে? তার একটা কথাও যে তোমার গায়ে সয় না? আর বাছা, মেয়েই হও আর যাই হও, আমার কাছে ঢাক-ঢাক গুড়গুড় নেই, অতটা সতীগিরিও কিন্তু ফলান ভাল নয়!"

সুষমা কিছু বলিল না, চক্ষু মুছিয়া জয়কালীর ঘরে গেল,—ডাকিল, দিদি, "দিদি, দিদি কি ঘুমুলে",—দিদির তখন অর্দ্ধেক রাত্রি! সুষমা আবার ডাকিল—এবার জয়-কালী 'হ্যা' করিয়া পাশ ফিরিলেন,—সুষমা তখন তাঁহার

কাছে গিয়া গায়ে হাত দিয়া বলিল, 'দিদি'! জয়কালী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন! কাঁচা ঘুমে বাধা পাইয়া জয়কালী বিরক্ত হইয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন, তখন সুষমা কাঁদিতে কাঁদিতে আজিকার সমস্ত ঘটনা বলিয়া জয়কালীর পা ধরিয়া বলিল, 'দিদি আমায় রক্ষা কর!' কীচক-ভয়ে ভীতা সৈরিন্ধ্রীও বুঝি এমনই করিয়া বিরাট-মহিষীর চরণ ধরিয়া, কাতরে অভয় মাগিয়াছিল! জয়কালী, আর যাই হোক, সতীত্ব-গর্ব্বিতা রমণী, সতীর দুর্দ্দশা শুনিয়া, সত্যই তার মনটা কেমন হইয়া গেল—তবে ত মেজো বৌ যা বলিত, তা মিথ্যা নহে, সত্যই কি রাজীব—সহসা গৃহ ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল, "তবে রে দজ্জাল," বলিতে বলিতে নয়নতারা সপ্তমে গলা ছাড়িয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন—! সুষমার প্রতি ভীষণ বক্রদৃষ্টি করিয়া, "তবে রে দজ্জাল" বলিয়া আরম্ভ করিলেন, "তুমি নাকি কিছু জান্ না, আর কি বলে আর আমাদের তাড়াবে তাই বুঝি, এই মতলব এটেছো? তা দিক না জয় তোমার কথায় আমাদের তাড়িয়ে দিক না!"—তখন নয়নতারা পুত্রমুখে শ্রুত বর্ণনা কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জিত করিয়া কন্যা সমীপে পেশ করিলেন! সুষমাই যে নষ্টের গোড়া, সুষমারই যে মতলব খারাপ, অতি বিশদ ভাষায় নজির টীকা সম্বলিত করিয়া, তাহা বিচারাসনে উপবিষ্টা শ্রীমতী জয়কালীকে নয়নতারা বুঝাইয়া দিলেন—তখন জয়কালী "ছি মেজো বৌ" বলিয়া সংক্ষিপ্ত রায়ে সুষমার নালিশ ডিস্‌মিস্ করিয়া, আবার নিদ্রার শরণ লইলেন। নিদ্রার সাধনে জয়কালী দ্বিতীয় নেপোলিয়ন বোনাপার্ট! সুষমাও আপনার শয়ন ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল—দারুণ অপমানে, বেদনায় আজ তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—"সে অনাথা, তাই আজ লোকে তাহাকে এরূপ ভাবে অপমান করিতে সাহস পায়? আজ যদি"—বালিকা আর ভাবিতে পারিল না, বালিশে মুখ লুকাইয়া আজ সে বড় কান্নাই কাঁদিল!

ঝি মোহিনী রাত্রিতে সুষমার ঘরে শুইত। দুই জনে অনেক 'দুঃখ ধান্দার' কথা কহিত! কোন দিন বা অতীত জীবনের দুই একটী সুখের কাহিনীও উঠিত! অদ্যকার ঘটনা, মোহিনী সকলই শুনিল। সুষমাকে কিছুক্ষণ নীরব থাকিতে দেখিয়া মোহিনী বলিল, "খুড়ি না কি ঘুমুলে?" 'না,' সুষমা একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার বলিল, —"মোহিনি, এ পাপ পুরীতে আর থাকা নয়! শেষে কি আবার" বলিতে বলিতে সুষমার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। যা হোক সুষমার প্রস্তাবে মোহিনীও আন্তরিক সম্মতি জানাইল—"কিন্তু কোথা যাবে?" মোহিনীর কথায় সুষমা কহিল, আর ঠাঁই কোথা? "যমালয়!"

মোঃ। একাই কি?

সুঃ। সঙ্গী কোথায় পাব?

মোঃ। সে হবে, কিন্তু বিট্‌লে বামুন বড় জ্বালানই জ্বালালে, ওকে একবার ফাঁদে ফেলে, নাস্তানাবুদ করে গেলে, তবে গায়ের জ্বালা ঘুচ্‌ত। "আমর পোড়ার মুখো," বলিয়া, মোহিনী কি একটা ষড়যন্ত্রের কথা সুষমাকে বলিল—। শুনিয়া সুষমা জিভ কাটিল—কহিল, "ছি, মোহিনী! ধর্ম্ম আছেন, সব বিচার তিনি কর্‌বেন—আমি এখন ধর্ম্মে ধর্ম্মে বেরুতে পাল্লেই বাঁচি।"

তার পর উভয়ে অনেকক্ষণ কি পরামর্শ হইল। শেষ মোহিনী বলিল

'তবে তাই'!

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আজ মধু মাসের মধুর প্রভাতটী বড় সুন্দর। পূর্ণা-বয়বা যুবতীর অঙ্গসৌষ্ঠব প্রতিপাদবিক্ষেপে যেমন উছলিয়া উঠে, মলয়সমীরসঞ্চারণে পুষ্পিতালতা, পল্লবিত শাখা-পরিশোভিতা, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যও তেমনই উছলিয়া পড়িতেছে। প্রস্ফুটিত কুসুমের, স্তবকাবনম্র চূতমুকুলের সৌরভে দশদিক আমোদিত। দৈয়াল, পাপিয়া, কোকিল, প্রভৃতি প্রকৃতির কলানিপুণা সখাগণ এই মধুর বসন্তে পুরুষের হৃদয় আকর্ষণ করিতে নৃত্য-গীতের অবতারণা করিয়াছে! এমন সময়ে নরেন্দ্র নগরের ডেপুটী বাবু প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। ডেপুটী বাবু প্রত্যহ অন্যূন তিন মাইল ভ্রমণ না করিয়া গৃহে ফিরিতেন না; আজ আবার তাঁহার ভ্রমণের মাত্রা বাড়িয়া গিয়াছে! আজ যে পথে আসিয়াছেন, সচরাচর সে পথে তিনি ভ্রমণ করেন না। এ পথ কিছু নির্জ্জন; প্রকৃতির শোভা এ দিকে বড়ই মনোহারিণী, মুগ্ধ ডেপুটী বাবু আপন মনে ভ্রমণ করিতে করিতে একটা গভীর আম্র কাননে প্রবেশ করিলেন, কিছু শ্রান্তি বোধ হওয়ায়, পকেট হইতে রুমাল খানি বাহির করিয়া এক আম্র বৃক্ষ তলে, সেখানি পাতিয়া উপবেশন করিলেন! ক্ষণেকের জন্য ট্রেজারির চিন্তা, জেল পরিদর্শন, গাঁজার ওজন, বিচারের গুরুভার, মাজিষ্ট্রেটের তাড়না, জজের গঞ্জনা, সমস্ত ভুলিয়া গেলেন। হৃদয়ে কি যেন একটা অনাবিল আনন্দ দেখা দিল! কিন্তু সে শুধু ক্ষণেকেরই জন্য! সহসা সেই গভীর আম্র কাননের সঙ্গে সঙ্গে ডেপুটী বাবুর শূন্য হৃদয় আলোড়িত করিয়া, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে পাখী ডাকিল, "বৌ কথা কও"। মর্ম্মতল ভেদ করিয়া ডেপুটী বাবুর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল! "সুশীলা, প্রাণাধিকা, কোথায় তুমি!" ডেপুটী বাবু এইরূপে আত্মচিন্তায় বিভোর হইয়া পড়িতেছিলেন! কিন্তু মুহূর্ত্তে তাঁহার সে চমক ভাঙ্গিয়া গেল! "প্রাণ যে যায় মা"। কাতর করুণ কণ্ঠে কে কাঁদে ঐ?

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

এই ডেপুটী বাবুই আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত, সুধাংশু নাথ। এখন তাঁহার বয়ঃক্রম সাঁইত্রিশের অধিক নহে। প্রায় পাঁচ বৎসর অতীত হইল, তাঁহার পত্নী সুশীলা পরলোক গমন করিয়াছেন। নিঃসন্তান হইলেও সুধাংশু নাথ আর বিবাহ করেন নাই। পিতৃমাতৃহীন সুধাংশু নাথের জ্যেষ্ঠ সহোদরও আজ কয়েক বৎসর হইল, অনেকগুলি সন্তান সন্ততি রাখিয়া, অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন! সুধাংশুর দুইটী কনিষ্ঠ ভ্রাতা, দুইটীই বিবাহিত, কিন্তু এখনও তাহাদের পঠদ্দশা। একটী ভগ্নী, কিন্তু অদৃষ্টগুণে সেটীও বাল বিধবা! সুধাংশুনাথের বৃহৎ পরিবার তাঁহারই নিকটে কর্ম্মস্থানে থাকেন।

সুধাংশু নাথকে অনেকে হিন্দু বলিয়াই জানেন। প্রাতে ও সন্ধ্যায় তিনি নির্জ্জনে প্রায় অর্দ্ধপ্রহর ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন। কিন্তু তাঁহার অর্চ্চনা বা উপাসনার প্রণালী সাধারণে অবগত নহেন। সে জন্য কেহ কেহ সন্দেহ করেন, বোধ হয় খাঁটি হিন্দুত্ব তাঁহাতে বর্ত্তমান নাই। তাঁহার বিশ্ব-জনীন শাস্ত্রে আস্থা এবং উদারতা দৃষ্টে কেহ কেহ বলেন তিনি থিয়সফিষ্ট। সর্ব্বজীবে দয়া দেখিয়া, কেহ বলেন তিনি, বৌদ্ধ! পৌত্তলিকতায় শ্রদ্ধা না দেখিয়া কেহ বা ভাবেন তিনি ব্রাহ্ম। ডেপুটী বাবু নিরামিষভোজী। তিনি বিধবা ভগ্নী ও ভ্রাতৃবধূর অনুরূপ আহার এবং একাদশী করিয়া থাকেন! সাংসারিক কর্ত্তৃত্বভার বিধবা ভগ্নী গৌরীর প্রতি দিয়া, অবসর সময় তিনি ধর্ম্ম ও সাহিত্য চর্চ্চায় কাটান! গৌরীও সংসারের কাজ কর্ম্ম এবং পূজা অর্চ্চনা সমাধা করিয়া, দাদার নিকট বসিয়া ধর্ম্ম গ্রন্থের উপদেশ শ্রবণ করে এবং দাদার নির্দ্দেশ মতে গ্রন্থাদিও পাঠ করিয়া থাকে! কিন্তু অবসর বড় বেশী হয় না। বড় দাদার ছেলে মেয়েগুলি সদাই তার অঙ্গের ভূষণ! তারা 'পিসিমা' বই কিছু জানে না, মার ধার বড় ধারে না! বৌগুলিও সংসারিক গিন্নিপনার কোন খবর রাখেন না, রাখিতেও চাহে না! যা করে, ঠাকুরঝি! ঠাকুরঝি গৌরী তাঁহাদের চক্ষে কাল ননদিনী রূপে প্রতিভাত নহে! ঠাকুর ঝির যত্নে, আদরে, তাঁহারা নিতান্তই বাধ্য! তাঁহারাও গৌরীকে আন্তরিক ভক্তি প্রীতি করিয়া থাকে! সুধাংশুনাথের দয়াদাক্ষিণ্য উদারতা এবং পরসেবা প্রবৃত্তি গৌরীরও যথেষ্ট ছিল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সুষমা গৃহ ত্যাগ করিয়াছে, কলঙ্কে গাঁ ঢি ঢি হইয়া গেল। "ভদ্র ঘরে কি এমন কলঙ্কিনী জন্মায় গা?" এখন জয়কালীর জননী নয়নতারার মুখে সদাই এই কথা! "সেই কালামুখী! ধিক জীবনীকে এখন পেলে হয়! তার সতীগিরি ফলান একবার বের করে দি! ওমা সেই পেটে এত ফন্দী! ভিজে বিড়ালকে চিন্‌তে জুয়ায় না!" আর সেই মিট্ মিটে ডানটার হাত হইতে তাঁহার সোণার চাঁদ ছেলেটী যে রক্ষা পাইয়াছে, এ আনন্দের কথাও তিনি দিনে দশবার প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না! মাঝে মাঝে জয়কালীকে উদ্দেশ করিয়া বলেন, "দেখ্‌লি, মা জয়, আমিত এসেই বলেছিলাম, তোদের মেঝো বৌয়ের হাটনটা, যেন কেমন কেমন? অষ্টাঙ্গ না দুলিয়ে তাঁর আর হাঁটা হতো না। চেটো বিধবা হাঁট্‌বে, কেউ বুঝবে, কেউ বুঝবে না। তা নয়, হাঁটনেও যেন গিদের মাখা! ও মেয়ে যে একটা কাণ্ড বাধাবে তা আমি অনেক দিনই জান্‌তাম। ঘরের মধ্যে এক গলা ঘোমটা, ওসব অতিভক্তি চোরের লক্ষণ।" জয়কালী কিন্তু জননীর এসব কথার সারবত্তা প্রথম প্রথম স্বীকার করিয়া উঠিতে পারিত না! কেননা সুষমাকে জয়কালী ভাল করিয়াই জানিত! জয়কালী মুখে যদিও নানা অছিলায় সুষমাকে গঞ্জনা দিতে ছাড়িতনা, কিন্তু অন্তরে সে সুষমার উদারতা ও চরিত্রের উৎকর্ষ, বিশেষ রূপে অনুভব করিত! তাই সে সহসা বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না যে, সুষমা কোন মন্দ অভিপ্রায়ে গৃহ ত্যাগ করিয়াছে। সে দিন রাত্রে সুষমা যে কথা বলিয়া কাঁদিয়াছিল বুঝি তাহা মিথ্যা নহে। তবে সেই জন্যই কি সুষমা গৃহত্যাগ করিল? আসল ব্যাপার ভগবান জানেন, তবু কেমন একটা খট্‌কা কয়েক দিন জয়কালীর মনে বাধিয়া রহিল। কিন্তু নয়নতারা, পুত্ররত্নের সাহায্যে বিবিধ প্রমাণ সংযোগে সত্বরেই জয়কালীর সে সন্দেহ অনেকটা অপনোদন করিয়া দিলেন। সুষমা যদি ভালই হইবে, তবে মোহিনীর সঙ্গে তার অতটা ঘনিষ্ঠতা হইবে কেন? নিশ্চয়ই তার মনে "কু" ছিল! জয়কালী ভাবিল হবেও বা! কেননা, মোহিনীকে সে কখনই ভাল চক্ষে দেখে নাই!

এইখানে বলিয়া রাখি সুষমা যাইবার সময়ে শয্যায় জয়কালীর নামে যে পত্র রখিয়া গিয়াছিল পদ্মলোচন তাহা গোপন করিয়াছে।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সুষমার গৃহত্যাগের সংবাদে শিবচরণ বিস্মিত হন নাই, কেন না তাঁহার জানা আছে, "অঙ্কেস্থিতাপি পরিশঙ্কনীয়া"; তবে বড় মর্ম্মাহত হইলেন, কেন না, তাঁহার নির্ম্মল কুলে কালিমা পড়িল! উন্নত মস্তক এতদিনে হেঁট হইল। তা সে গেছে যাক! কিন্তু তাহার অলঙ্কার ও অর্থের কি দশা হইল? তাহাদের জন্য শুধু কি সে কলঙ্কই রাখিয়া গিয়াছে! তখন শিবচরণ গৃহে চলিলেন। গৃহে আসিয়া শিবচরণ শাশুড়ী ঠাকুরাণীর মুখে, সুষমা-সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ শুনিলেন, পলায়নের পূর্ব্বে,

সুষমার চরিত্রে সন্দিহান হইয়া পদ্মলোচন যে তাহাকে কিছু শাসন করিয়াছিল, এবং সে শাসন যে কিরূপ নিষ্ফল হইয়াছিল, একে একে নয়নতারা, জামাতা শ্রীমানকে সমস্তই জানাইয়া দিলেন! শিবচরণ গম্ভীরভাবে শুনিয়া গেলেন—কেবল বলিলেন, "সে কি তবে এক বস্ত্রে গিয়াছে?" শিবচরণের মুখের কথা বাহির হইতে না হইতে, নয়নতারা জামাতার মনের ভাবটী লুফিয়া লইয়া বলিলেন "না বাবা, তার অলঙ্কারপাতি যা ছিল সবই নিয়ে গেছে, কিছু রেখে যায় নি বাবা, কিছু রেখে যায় নি!" নয়নতারা তখন অঞ্চল-প্রান্তে নয়ন-প্রান্ত মুছিলেন!

* * * *

শিবচরণ বাটী আসার দুই এক দিন পরেই, জয়কালীর নামে ডাকে এক পত্র আসিয়া উপস্থিত। পত্রের উপরে অপরিচিত পুরুষের হস্তাক্ষর দেখিয়াই শিবচরণের আপাদমস্তক জলিয়া উঠিল। এ আবার কার অনুগ্রহ? পত্রমর্ম্ম অবগত হইয়া, শিবচরণের নূতন মর্ম্মদাহ উপস্থিত হইল। এ যে সেই বিশ্বাসঘাতিনী কুলকলঙ্কিনী, সুষমার পত্র! নিজে সে পত্রখানি লেখে নাই, স্বাক্ষর টুকুই কেবল তার। কিন্তু এ যে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা! সে একটী বড় লোকের আশ্রয়ে আছে, লোকত তাহাই জানাইবার জন্য এ পত্র লিখিয়াছে! কি নির্লজ্জ! শিবচরণ দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন, এত অপমান! এর প্রতিশোধ লইতেই হইবে! এ পত্রের কথা নয়নতারার অজ্ঞাত রহিল না। সুষমার পলায়নের এক মাস পূর্ব্বে, কেন যে হাকিমের তাঁবু শিবচরণের বাটীর নিকট পড়িয়াছিল, নয়নতারা এতদিনে তাহার প্রকৃত তথ্য বুঝিলেন এবং প্রমাণাদিসহ সকলকে বুঝাইলেন! তখন শিবচরণ স্বহস্তে জয়কালীর পক্ষ হইতে সুষমাকে এক পত্র লিখিলেন, এবং সুষমা সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার লোকমারফতে পত্রে ভূপেন্দ্রকে জানাইলেন। হায়, আবার সেই সুধাংশুনাথ! সুধাংশু তাহাকে বড়ই জ্বালায় জ্বালাইল! পুরাতন স্মৃতি আসিয়া শিবচরণকে অধীর করিয়া দিল। আর যাই কর সুধাংশুনাথ, শিবচরণের বংশের অর্থ তুমি ভোগ করিতে কখনই পারিবে না! শিবচরণ এইবার বুঝিবে, তুমি কেমন সুধাংশু! কেমন ডেপুটী!

বার বার বাছা তুমি খেয়ে যাও ধান!
এ বার তোমার যাদু বধিব পরাণ।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সরোজ এখন তাঁহার পিত্রালয়ে। ভূপেন্দ্রও "ল" পরীক্ষা দিয়া সরোজের নিকট আসিয়াছেন। সুতরাং অনেক দিনের পর দম্পতীর দিন বেশ সুখে কাটিতেছিল। সহসা একটা ঘটনায় তাঁহাদের সে শান্তিসুখে বাধা পড়িল। ভূপেন্দ্র শিবচরণের পত্রে এবং বিশ্বাসী ভৃত্যের মুখে সমস্ত শুনিলেন, তাঁহার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। এমন যে হইবে, ইহাত তিনি স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই। সুষমাকে ত তিনি অতিমাত্র পবিত্রা বলিয়াই জানিতেন, তাঁহার যে কখন পদস্খলন হইবে, ইহা সম্ভব বলিয়া তাঁহার ধারণা ছিল না। তবে মানুষেরই ত মন। হবেওবা, মুণীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। সুষমাকে প্রথমে এজন্য বিশেষ অপরাধী মনে না হইলেও ভূপেন্দ্র মনে বড়ই দাগা পাইলেন। যৎশগৌরব ক্ষুণ্ণ হইয়া পবিত্র কুলে কালিমা স্পর্শিল, দেশে দেশে কলঙ্ক রটিল, ইহা ভাবিয়া তাঁহার হৃদয়ে একটা বিষম অশান্তি উপস্থিত হইল। আর সুষমার প্রতিও যে একটা দারুণ ঘৃণার ভাব ক্রমে ক্রমে না হইল এমন নহে। নিতান্ত বিষণ্ণ ভাবে তিনি সরোজকে এ সংবাদ শুনাইলেন। সরোজত একথা বিশ্বাসই করিল না, কিন্তু এত বড় একটা গুরুতর বিষয় লইয়া, স্বামী যে তাহার সহিত মিথ্যা রহস্য করিতেছেন ইহাও তাহার ধারণা হইল না! সরোজ বসিয়াছিল, এ কথায় চকিত হরিণীর মত লাফাইয়া উঠিল! রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বলিল,—"কি বলগো তুমি"! অবিচলিত কণ্ঠে ভূপেন্দ্র কহিলেন—"সত্যই সরোজ, সত্যই মেজবধূ কুলত্যাগ করিয়াছেন?" "না—না মিছে কথা সে, তোমাকে কে মিথ্যা সংবাদ দিয়াছে,—এই কি তোমার বিশ্বাস হয়?" বলিয়া সরোজ অতিমাত্র আগ্রহে, স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল! ভূপেন্দ্র আবার বলিলেন, "মিথ্যা নহে সরোজ, অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই"! 'অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই' তুমি একি বলিতেছ? সাক্ষাৎ ধর্ম্ম আসিয়া যদি একথা বলেন, তবু জানিও একথা মিথ্যা। এ মিথ্যা কথা, শুনিলেও পাপ আছে," বলিয়া সরোজ মুখ নামাইল! তার স্বামীও সুষমাকে অবিশ্বাস করিতেছে ভাবিয়া সরোজ হৃদয়ে বড় বেদনা অনুভব করিল! স্বামী যে তাঁহার সত্যই এ সকল কথা বিশ্বাস করিয়াছেন ইহাও সরোজের বিশ্বাস হইতেছিল না! ক্ষণেক উভয়েই নীরব; এমন সময়ে সরোজের ছোট ভগ্নী তরু,—'দিদি তোমার চিঠি' বলিয়া একখানি পত্র দিয়া গেল!

* * * *

সরোজের মলিন মুখে শুভ্র হাসি ফুটিল—সে তাহার স্বামীর হাতে পত্রখানি দিয়া,—বলিল, "দেখ্‌লে"? কিন্তু সরোজের সে হাসি, নিমেষেরই জন্য--তারপরে একটা দারুণ উদ্বেগে, তাহার হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল—"সরোজ একবার দেখা দে বোনটী"! সরোজের আসন টলিল—সে স্বামীকে বলিল,—"চল"!

"ক্ষেপি!" বলিয়া ভূপেন্দ্র গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মানুষ গড়ে, দেবতায় ভাঙ্গে। সুষমা কোথায় স্থির করিয়াছিল সে গভীর নিশীথে গৃহ ত্যাগ করিয়া তাহার পর দিবস সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সরোজের নিকট পৌঁছিয়া, মনের বোঝা নামাইবে! আর আজ কিনা সে পথে জ্বরে পীড়িত হইয়া পড়িল! এমন জ্বর সুষমার কখনও হয় নাই! এত কষ্ট জীবনে সে কখনও পায় নাই। মোহিনী সুষমাকে লইয়া বড়ই বিপদে পড়িল। সুষমা আর চলিতে পারে না। তবে আজ এই জনশূন্য স্থানে, অপরাহ্নে তাহারা কোথায় আশ্রয় পাইবে? কোথায় সুষমাকে রাখিবে?—হায়, কেন সে তখন অগ্রপশ্চাৎ ভাবে নাই;—নানা চিন্তায়, নানা উদ্বেগে মোহিনী বড়ই অস্থির হইয়া পড়িল। তাহার পর অতিকষ্টে পথিপার্শ্বস্থ আম্র কাননে সুষমাকে লইয়া গেল, বাগানে একখানি জীর্ণ শূন্য কুটীর ছিল, তাহাতেই আশ্রয় লইল। তখন মোহিনী ভাবিতে লাগিল, কেন সে সুষমার নিষেধ না মানিয়া, সুষমার গহনার বাক্‌স সঙ্গে আনিল, যাহাহোক, সে বাক্সটি কোলের কাছে রাখিয়া, সুষমার মস্তক উরুদেশে স্থাপন করিয়া, সমস্ত রাত্রি সে জাগরণে কাটাইল! সুষমাও সারা রাত্রি যন্ত্রনায় ছট ফট করিতেছিল, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিতেছিল, জ্বরের ঘোরে জল মা জল, বলিয়া অস্ফুট ধ্বনি করিতেছিল; মোহিনী, দুই এক বার মনে করিল, অধর্ম্ম হয় আমার হবে একটু জল দি, তাই সে, মুখ ফুটিয়া বলিল, "খুড়িমা, "জল খাবে"?—"জল,--কই,"? সুষমা আপনার অজ্ঞাতে মুখব্যাদান করিল। মুহূর্ত্তের জন্য তখনই আবার তাহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল,—জিভ কাটিয়া বলিল, "না না না, আজ যে একাদশী মোহিনি!"

প্রত্যূষে সুষমার একটু তন্দ্রা আসিয়া দণ্ড দুই যে তন্দ্রার ঘোরে ছিল, তার পর আবার যন্ত্রনা আরম্ভ হইয়া অতি ক্ষীণ কণ্ঠে, সুষমা ডাকিল প্রাণ যে যায় মা"!

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ডেপুটী বাবু মোহিনীর মুখে সমস্ত অবগত হইয়া, তাহাকে অভয় দিয়া দ্রুতপদে গৃহে ফিরিলেন! গৌরীকে সমস্ত, বলিবামাত্র গৌরী তখনই নিজে গিয়া রোগিনীকে আপনাদের আলয়ে আনিবার প্রস্তাব করিলেন! সে দিন দ্বাদশী, বাটীর সকলে একটু "জল খাইয়া" যাইবার জন্য গৌরীকে অনুরোধ করিল, কিন্তু গৌরী তাহা শুনিল না, সুষমার অবস্থা শুনিয়া, তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, হইলইবা অপরিচিতা, সে যে বিপন্না বাল বিধবার দুঃখ, বাল বিধবা বুঝিল, তখনই পাল্কী করিয়া, [illegible]নী ঝি ও চাকরাণী সঙ্গে লইয়া, গৌরী সুষমাকে আনিতে [illegible] সে অবস্থাতে অপরিচিত [illegible] করিতেছিল, কিন্তু গৌরীর সস্নেহ বাক্যে আন্তরিক আগ্রহে, সে আর অধিক আপত্তি করিতে পারিল না! গৌরী যখন মধুর কণ্ঠে বলিল, "আপত্তি কি বোন আমিও ব্রাহ্মণ কন্যা, আমিও তোমারই মত"—গৌরীর অপাঙ্গে অশ্রু দেখা দিল, গৌরী কথাটী ফিরাইয়া আবার বলিল, "ব্রাহ্মণ-কন্যা ব্রাহ্মণের বাটীতে যাইতে কি অমত করিতে আছে? সে আপনার ঘর বলেই জেনো।" এতক্ষণে মোহিনী অনেকটা নিশ্চিন্ত হল। তবে বুঝি বিধাতা মুখ তুলিয়া চাহিলেন! সুষমার জীবন রক্ষার উপায় বুঝি হইল।

* * * *

সুষমা বুঝিয়াছিল, এ যাত্রা তাহার রক্ষা পাওয় কঠিন। তাই সে মাকে দেখিবার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়াছিল। কিন্তু মা তখন, বহুদূরে, বৃন্দাবনে। যাইহোক সুষমার আগ্রহ দেখিয়া, গৌরী দাদাকে বলিয়া বৃন্দাবনে টেলিগ্রাম করাইল। এ দিকে কবিরাজের সুচিকিৎ বিশেষ, গৌরীর শুশ্রূষায় ক্রমে সুষমার জীবনের হইল। গৌরী, ঘর সংসার ভুলিয়া, আহার নিদ্রা করিয়া, দিবা রাত্রি সুষমার সেবা করিতে লা সুষমা ইহাতে কিছু অপ্রতিভ হইত, মোহিনীও বা আমিত আছি, আপনি তবে কেন শরীর মাটি করিতেছে "শরীর মাটি" শুনিয়া, গৌরী শুধু মৃদু মন্দ হাসি মোহিনী, গৌরীর যে কাজই এই!

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

সুষমা বড় আগ্রহে জয়কালীর চিঠি খুলিল।—

"আমাদের মুখ হাসাইবার জন্য তুমি কি তবে আ বাঁচিয়া আছ! কলঙ্কিনি, তোমার ধিক জীবন লইয়া সুখ ঐশ্বর্য্য লইয়া, তুমিই থাক, ও কালামুখ আর কাহ কেও দেখাইতে হইবে না! সরোজের নিকট যাই সরোজ ও ভূপেন্দ্র যে তোমার জন্য ফুল চন্দন লইয়া বা আছে! ছি, ছি, ছি, বলিতে লজ্জা করে না! পা বোঝা আর ভারি করিও না,—পোড়া মুখে আর পে ইওনা।"

"মা-গো" বলিয়া সুষমা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। হইতে, পীড়া বড় কঠিন আকার ধারণ করিল! য আসিয়াছিল, গৌরী তখন কার্য্যান্তরে ছিল, মোহি কারণ অনুমানে বুঝিয়া পত্রখানি লুকাইল, সহসা পীড়া কেন বৃদ্ধি হইল, সে কারণ আর কেহ জা সেই দিন রাত্রে রোগিনীর অবস্থা সংশয়াপন্ন হ রাত্রি দুঃসহ যন্ত্রণার পর প্রত্যূষে তন্দ্রাভিভূতা দেখিল, যেন সে মার বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁ [illegible] ধীরে ধীরে [illegible]

ম্মুখে স্নেহময়ী মা। তবে এও কি স্বপ্ন? না, সত্যই যে
া কাঁদিতে কাঁদিতে তার নিকটে গিয়া বসিলেন! সুষমা
ার দিকে চাহিয়া চাহিয়া কাতর কণ্ঠে, আকুল হৃদয়ে এক-
ার মা বলিয়া ডাকিল; সেই এক "মা" সম্বোধনে, মার
বুক বিদীর্ণ হইয়া গেল! বুঝি দুঃখিনী জনকনন্দিনীর
দুঃখে ধরণীর বুক এমনই করিয়া বিদীর্ণ হইয়াছিল! তখন
সেই জন্মদুঃখিনী সুষমা জনকনন্দিনীর ম ত মার কোলে
মুখ লুকাইল!

"দিদি,—দিদি' আমি এসেছি" একটা স্নেহ-বিকম্পিত
াকুলি-ব্যাকুলি মাখা কণ্ঠস্বর, সুষমার শ্রবণে পশিল!
চনা গলায়, একে ডাকিল? সুষমা চক্ষু মেলিল, তাইত,
রোজই ত বটে। সরোজ ভিন্ন এত মধুমাখা কণ্ঠে আর
ডাকিবে?

"এসেছ ভাই, দিদি বলে তবে মনে পড়েছে",—অতি ধা
ক্ষীণ কণ্ঠে কয়টী কথা বলিয়া অতি ক্ষীণ হাসি হাসিয়া, ত্যর
সুষমা সরোজকে বুকের কাছে লইল! তপ্ত বুক বুঝি ত
কতক শীতল হইল! "তবে ত সরোজ"—সুখে দুঃখে বেদ- ত
নায় সুষমার চক্ষে জলধারা ছুটিল! সরোজ তখন সুষমার া
বুকে বুক রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"দিদি বাড়ী- ,
চল"—! "যা-ই" বলিয়া সুষমা চক্ষু মুদিল—মুহূর্ত্তে সব া
ফুরাইল! সকল জ্বালা নিভিল!

সমাপ্ত।

শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার।

বিষম
যে
।
ই-
ড

আ
পত্র
উপ
সুষ
টুকু
ছি
ত
ি

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
কলিকাতা।

ব
১
জা
সু
আ
কর
করি
তুমি

সরে
পরীক্ষা
অনেক দিনের পর দম্পতীর দিন বেশ সুখে কাটিতেছিল।